শনিবারের চিঠি
২৪শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ভাদ্র ১৩৫৯

লক্ষ্মণ-তর্পণ

বড় ব্যথা দিয়ে গেলে, এ উচিত হয় নি তোমার,
আমার আগেই তুমি পঁহুছিলে মৃত্যুর ওপার।
সাড়া দিলে শেষ ডাকে, সহি বক্ষে দারুণ বেদনা,—
আজ তুমি রোগাতীত, এইটুকু সান্ত্বনার কণা।
ছিলে জন্মান্তর-সাথী, যোগ-সূত্রে দিলে এসে ধরা,
তব প্রীতি-নিদর্শন 'বিস্মরণী'—রসের পসরা।
ধ্বনিরূপ দিয়ে রসে উচ্ছ্বাসিলে অক্ষর-সঙ্গীতে,
ছন্দের সে পদ্ম-বন্ধে, অপরূপ অলৌকিক শ্রীতে।
কবে কোন্ শুভক্ষণে আমাদের প্রথম মিলন,
আনন্দ-মুহূর্তগুলি ভরিল তোমার গুঞ্জরণ।
কত বড় কবি তুমি বুঝেছিনু হে মোহিতলাল,—
চ'লে গেলে নাম রেখে বরণীয় বাণীর দুলাল।
'স্মর-গরলে'র কবি, কাঁদে তব মানসী মাধবী,
মঞ্জরী হারায়ে মরি ঝুরে লতা-কস্তূরী-সুরভি।
আমার দুয়ার-পথে কতবার আসিতে যাইতে,
মুচুকুন্দ-তরুছায়ে ধূলা-মাখা ফুল কুড়াইতে;
"ফুল ভালবাস ভাই?"—শুধাইনু অচেনা তোমায়,
হাসি-মুখে নত-চোখে পশিলে আমার আঙিনায়।
স্তব্ধ হয়ে গেছে মন, হে 'স্বপন-পসারী'র কবি,
লভি তব ভালবাসা হইয়াছি পরম-গরবী।
হেদুয়ার পাড়ে গিয়া দূর্বাদলে বসিতাম মোরা,
পাসরিয়া সুখ-দুঃখ, বাস্তবের সাদা-কালো ডোরা।

রসবোদ্ধা ছিলে তুমি, গুণবতী কনক-তুলায়
বিচারিলে বহু লেখা, সত্য কথা ঢাক নি মিথ্যায়।
হে কাব্য-তন্ময় শিল্পী, পেলে কৃচ্ছ্র তপস্যার ফল,
বর পেলে যশোদীপ্ত বিজয়ীর কবচ-কুণ্ডল।
বাগ্‌-দেবতার পদে উৎসর্গিলে অমৃতের ঘট,
অলঙ্কৃত ক'রে গেলে বাংলার সারস্বত মঠ।
অবগাহি গঙ্গাজলে বিরাটের ধ্যানে নিমগন
আত্মার উদ্দেশে তব করিলাম 'লক্ষ্মণ-তর্পণ'।

শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়

মোহিতলাল

মোহিতলাল আমার চেয়ে বয়সে ছোট ছিলেন ;—তাঁহার স্মৃতিকথা আমাকে লিখিতে হইবে ভাবি নাই, বরং তিনিই আমার স্মৃতিকথা শুনাইবেন ইহাই আশা করিয়াছিলাম।

মোহিতলালের সঙ্গে আমার আলাপ সর্বশেষে, আমার জীবনের গোধূলি-বেলায়। তবে তাঁহার কবি-প্রতিভা, প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ও সূক্ষ্ম রসানুভূতির পরিচয় আগেই পাইয়াছিলাম। তাঁহার পৌরুষ ও পারুষ্যের সরস কাহিনী শুনিয়া তাঁহাকে দেখিবার কৌতূহল হইত।

কবিবর করুণানিধানের সরকারী বৃত্তি সম্বন্ধে একটা সমবেত চেষ্টার আবেদন লইয়া আমি অপরিচিত হইয়াও মোহিতলালকে ঢাকায় পত্র লিখি। সে পত্রের উত্তর পাই বাগনান (হাওড়া) হইতে ইংরেজী ১২ই সেপ্টেম্বর ১৯৪৪। ইহাই আমাদের আলাপের সূত্রপাত। চিঠিখানির কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি—

"পূজনীয় কবিবর,

আপনার পত্র যথাসময়ে পাইয়াছি। আমি বর্তমানে সর্বপ্রকারে বিপন্ন এবং অসুস্থ আছি। আপনার পত্রখানি শ্রীমান সজনীকান্তকে

দিয়াছি এবং এ বিষয়ে যতটুকু সাধ্য তাহার দ্বারা করাইবার চেষ্টা করিতেছি। বিশেষ কিছু হইবে এমন মনে করি না, তবে উহা আমাদের একটা বড় কর্তব্য বটে। যে দিনকাল পড়িয়াছে তাহাতে নিকটতম আত্মীয় ও বন্ধুর নিকটও এতটুকু উপকার প্রত্যাশা করা ভুল।"

দুর্বাসা-গোত্রীয় অপরিচিত লোকটির নিকট হইতে 'পূজনীয়' এবং 'কবিবর' এই দুইটি লোভনীয় গুণবাচক বিশেষণ লাভ করিয়া একটু গর্ব অনুভব করিয়াছিলাম। শনিমণ্ডলের সজনীকান্ত ও তারাশঙ্করের বিনয় ও আত্মীয়তার স্পর্শ বহুদিন হইতেই পাইতেছি, কিন্তু মোহিতলালকে আমি একটু পৃথক শ্রেণীর লোক মনে করিতাম; কিন্তু দেখিলাম তাহা নহেন।

কবিশেখর কালিদাস রায় প্রমুখ বঙ্গের সমগ্র সাহিত্যিকবৃন্দ কর্তৃক অনুষ্ঠিত কবি করুণানিধানের সম্বর্ধনা-উৎসব-উপলক্ষে মোহিতলালের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশিবার সুযোগ আমার ঘটে। তারপর হইতেই চিঠিপত্রের আদান-প্রদান চলিতে থাকে।

একখানি সুদীর্ঘ পত্রে তিনি একবার লেখেন, "বাংলা-সাহিত্যের অরাজক অবস্থা আমাকে এতই পীড়িত করে যে আমি আজ প্রায় ১৫।১৬ বৎসর নিজের কাব্যচর্চা ছাড়িয়া বাংলা-সাহিত্যের কোষ্ঠী ও দশা বিচার করিতে আমার সকল শক্তি নিয়োগ করিয়াছি। কিছু ফল হইয়াছে, হাওয়া একটু ফিরিয়াছে। সাহিত্যের ধর্ম ও তাহার সত্যকে আমি যথার্থ-শিক্ষিত বাঙালীর মনে একটু জাগাইয়া তুলিতে পারিয়াছি বলিয়া মনে হইতেছে। কেন না আমার লেখার প্রতি শ্রদ্ধাপূর্ণ দৃষ্টি অনেকের পড়িয়াছে। সাহিত্য, বিশেষত কাব্য, যে কি বস্তু তাহা বাঙালী প্রায় ভুলিতে বসিয়াছে—সহজ রসবোধও হারাইয়াছে। এজন্য আমি সাহিত্যের কয়েকটি মূল তত্ত্ব পণ্ডিত-সমাজে ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইতে যেমন চেষ্টা করিয়াছি তেমনই কবি মধুসূদন হইতে রবীন্দ্রনাথ এবং রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী কবি ও সাহিত্যিকগণের রচনা

হইতে রস-বিচার করিয়া যতদূর সম্ভব সাধারণের রুচি ও রসবো জাগ্রত ও মার্জিত করিবার চেষ্টাও করিতেছি। কাব্যের আদ আধুনিক অরাজকতা ও উচ্ছৃঙ্খলতার মধ্যে প্রায় লুপ্ত হইতে বসিয়াে এজন্য আমি একালের কয়েকজন বিশিষ্ট কবির কাব্য লইয়া আলোচ করিতে মনস্থ করিয়াছি।"

ইহার পর ১৯৪৯ সনে মোহিতলালের বড়িশার বাসাবাটিে আমি সাক্ষাৎ করিতে যাই,—সে এক সাধু-দর্শন। দেখিলাম, সাহিত্যে একজন তন্ময় সাধক। তিনি সমস্ত অন্তঃকরণ দিয়া বাংলা ভাষা বাংলা ও বাঙালীকে ভালবাসেন। বঙ্গ-সাহিত্যের এ এক 'বামা ক্ষেপা'—মা মা বলিতেই আকুল। বহু আলোচনা হইল। তাঁহা অনন্যসাধারণ আবৃত্তি শুনিলাম। সৌজন্য সদালাপ ও আতিথেয়তা যেমন প্রীত হইলাম, বাংলার রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে তাঁহা উদ্বেগ ও অগ্র্যদশার দেখিয়া তেমনই ভীত হইলাম।

মোহিতলালকে যেমনটি দেখিয়াছিলাম, তাহাই এখনকার এই কবিতাটিতে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছি।—

মনীষী তবুও একগুঁয়ে আর রাগী,
আনন্দ পায় হতে যেন দুখভাগী।
মোটেই বশ্য, নমনীয় সে যে নয়,
কেহই তাহাকে করিতে পাবে না ক্রয়।
দেশ ও জাতির প্রতি কি দারুণ টান!
দিয়াছেন বিধি তারে যে বিরাট প্রাণ!
ভৈরব সম বিল্বতরুর তলে—
থাকে সে ধেয়ানে, ধুনিটি তাহার জলে,
অল্প-আহারী বিল্বেই মিটে ক্ষুধা,
গ্রাহ্য করে না ইন্দ্রের দেওয়া সুধা।
পূজে না সত্য-শিব-সুন্দর ছাড়া,
মতভেদে করে চিমটা লইয়া তাড়া।

বচন তাহার নয় মোর মনোহারী,
দূর থেকে তাই বেলপাতা ছুঁড়ে মারি।

বড়িশায় সাক্ষাতের পর মোহিতলাল আমাকে লেখেন, "শুনিলাম আমার জন্যই এবার আপনি কলিকাতায় আসিয়াছিলেন, জানিয়া যেমন আহ্লাদ হইয়াছে, তেমনই বড় লজ্জিত হইয়াছি। আপনার কোন যত্ন আদর অভ্যর্থনা আমি করিতে পারি নাই। যাহাকে বলে ভালবাসার অত্যাচার আমি তাহাই করিয়াছি—আপনি আমাকে কত ভালবাসেন তাহারি প্রমাণ পাইলাম।"

যত্ন আদর অভ্যর্থনা মোহিতলাল প্রচুর করিয়াছিলেন। চিঠিখানি তাঁহার কোমল কৃতজ্ঞ হৃদয়ের পরিচয় দেয় মাত্র।

মোহিতলালের আত্মমর্যাদাজ্ঞান অত্যন্ত প্রবল ছিল। যেন বলিতে চাহিতেন—

দয়া ক'রে মান কি করিবে দান?
কবি সে করুণা চায় না।

যে দান অগর্বিত নহে, তাহা যত উচ্চ যত বৃহৎ হউক, তিনি প্রতিগ্রহ করিতেন না। কোন রাজসম্মানের তিনি প্রত্যাশী ছিলেন না—এ বিষয়ে তিনি অশূদ্রপ্রতিগ্রাহী নৈষ্ঠিক সাধক ছিলেন। তাঁহার উঁচু মাথা এক শ্রীভগবানের চরণ ছাড়া নীচু করিতে কুণ্ঠা বোধ করিতেন।

দেশের প্রাপ্ত-স্বাধীনতাকে তিনি স্বাধীনতা বলিয়া স্বীকার করিতেন না, আমাকে লিখিয়াছিলেন, "আমরা স্বাধীনতা পাইয়াছি এ ধারণা আপনারও হইয়াছে দেখিলাম, দুঃখিত হইলাম। ইংরেজ চলিয়া গিয়াছে উহা আপনিও বিশ্বাস করেন। ইংরেজ কি সত্যই গিয়াছে? ছোটবেলায় যাত্রার 'রাবণবধ' পালায় রাবণ বধ হইল দেখিয়া শিশুমনে কষ্ট হইয়াছিল, পরে দেখিলাম সেই লোকটিই আসরে বসিয়া বিড়ি খাইতেছে। মনটা সুস্থ হইল। ইংরাজ তেমনই মরে নাই, যায় নাই, আসরে বসিয়া বিড়ি খাইতেছে।"

মোহিতলালের কাছে আমি এক বিষয়ে ঋণী, তাই তাঁহাকে

বলিয়াছিলাম, তুমি আমাকে 'ভক্ত কবি' এই উর্দি পরাইয়া দিয়াছ, কাজেই আজকাল ডিউটি ঠিক বজায় রাখি, ভগবানের আরাধনা একটু নিয়মিত ভাবেই করি। এখন আর 'ম্যয় চাকর রাখো জী' বলি নে, তোমার সুপারিশে চাকরি পাইয়া গিয়াছি, এখন বজায় রাখিতে পারিলেই মঙ্গল। তোমার শ্রীমুখে ফুল-চন্দন পড়ুক।

ইদানীং মোহিতলালের শারীরিক অসুস্থতার জন্য একটু উদ্বিগ্ন থাকিতাম। মোহিতলাল লিখিয়াছিলেন, "বড় কষ্ট পাচ্ছি, তবু গুরুকে স্মরণ করি এবং আপনার ন্যায় পরম শুভাকাঙ্ক্ষীদের আশীর্বাদে একটু ভরসা পাই। কবি ও সাহিত্যিক কোন অগ্রজ এমন শুভকামনা করেন না, এক করুণাবাবু ছাড়া। কষ্ট খুবই পাচ্ছি, সবাকার চেয়ে কষ্ট পাচ্ছি দিকে দিকে মিথ্যা ও মিথ্যাচারের সর্বব্যাপী বিস্তার দেখে। বাংলা ও বাঙালীর বড় দুর্দিন। দেহ-জীবনটা বড় কষ্টে গেল, বুকেও অনেক দুঃখ পেলাম, তবে ভরসা গুরু আমাকে পথ-কুকুরের মত মরতে দেবেন না।"

ইহার উত্তরে আমি মোহিতলালকে লিখি, তুমি দুশ্চিন্তা করিবে না। শ্রীভগবান বলিয়াছেন, "ন মে ভক্ত প্রণশ্যতি"। তুমি দীর্ঘজীবী হইবে— ওয়ার্ড্‌সওয়ার্থের কথায় বলি—

"An old age serene and bright
And lovely as the Lapland night
Shall lead thee to thy grave.

কিন্তু আমার আশীর্বাদ সার্থক হইল না, মোহিতলাল চলিয়া গেলেন। যিনি বাংলা ও বাঙালী বলিতে পাগল, তাঁহাকে আমরা তাঁহার উপযুক্ত সম্মান দিই নাই। যাহা পাইয়াছেন তাহা নগণ্য, অকিঞ্চিৎকর, এমন কি অবমাননাকর বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তবে এখন সে পরিতাপ বৃথা।

প্রার্থনা করি, বাংলার এই একান্ত মাতৃভক্ত সুসন্তান শ্রীভগবানের পাদপদ্মে স্থান লাভ করুন। যদি তাঁহাকে জন্মই পরিগ্রহ করিতে হয়, তবে যেন এই বাংলায় তাঁহার পুনরাগমন হয়। ওঁ শান্তি

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

হুতাশন-কবি

দেশলাই ঠুকে ঘুঁটে কেরোসিন
কয়লার যোগাযোগে
যে আগুন জ্বলে উনোনে উনোনে
মোদের অন্নভোগে,
যে ফুটায় নিতি আফিসের ভাত
বার্লি ও সাগুদানা,
মৃদু আঁচে আঁচে দালদা পেঁয়াজে
বানায় মোদের খানা,
উদর-পোষণ সে পোষা-আগুন
ঘরে ঘরে মোরা চিনি,
রসনা-রসন তারি রসায়ন
মোড়ে মোড়ে মোরা কিনি।

* *

যে আগুন জ্বলে যজ্ঞকুণ্ডে
অরণি-সমুত্থিত
হবি ও সমিধে কভু প্রোজ্জ্বল
কখনো বা ধূমায়িত,
যার রসনায় অশনি-শাণিত
দৃপ্ত শিখার জ্বালা,
যার ধূমজালে গগনের ভালে
ছেয়ে আসে মেঘমালা,
ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু যম যার
প্রসাদ কামনা করে,
স্বর্গশাসন সেই হুতাশন
কদাচিৎ চোখে পড়ে।

নিবিয়া গিয়াছে সারা বাংলার
সেই হুতাশন-কবি,
পড়িয়া রহিল হোমের ভস্ম
অহুত সমিধ্ হবি।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

চল্লিশ বছরের বন্ধু মোহিতলাল

শিশুকালে যখন গাঁয়ে থাকতাম, তখন মনে পড়ে, আমাদের খিড়কি-পুকুরের ঘাটের উপর একটা বিরাট অশথগাছ ছিল। দিনের অধিকাংশ সময় সেই গাছতলায় কাটত, মায়ের উপর বা ভাতের উপর রাগ ক'রে তার শিকড়ের আড়ালে লুকিয়ে থাকতাম, ওই অশথগাছটা ছিল আমার খেলার সঙ্গী। একদিন ঝড়-বাদলের রাত পোহালে বাড়ির বাইরে এসে দেখি, গাছটা উপড়ে প'ড়ে আছে পুকুরের অর্ধেকটা জুড়ে। দেখে কি ব্যথাই না পেয়েছিলাম! আমি কেঁদেছিলাম, আমার কান্না দেখে অনেকে হেসেছিল। মোহিতলালের পতনে আজ ছাপ্পান্ন বৎসর পরে সেই ব্যথাই পেয়েছি। মোহিতলালের তিরোধানে আমাদের ক্ষুদ্র সাহিত্যক্ষেত্রে একটা দিকই শূন্য হয়ে গেল।

কিছুদিন আগে মোহিতলাল চিঠিতে জানিয়েছিলেন, "ভাই, আমি এখন শরশয্যায় শায়িত। আলপিনের খোঁচায় আমার কি হবে?" সত্যই, কবি শেষজীবনে নানা আধিব্যাধি, দুঃখদৈন্য, উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার শরশয্যাতেই শায়িত ছিলেন। তবু তাঁর রচনায় ও রসনায় বিশ্রাম ছিল না, তবে ভীষ্মের মত শান্তিপর্বের নয়, অশান্তি-পর্বেরই ব্যাখ্যা করছিলেন।

বিধাতা মোহিতলালকে অফুরন্ত জীবনীশক্তি দিয়েছিলেন। সংসার-সংগ্রামে অক্লান্ত অধ্যবসায়, একনিষ্ঠ সারস্বত সাধনায়, দেশের নানা প্রতিষ্ঠানের অনাচার ও অবিচারের বিরুদ্ধে অভিযানে, উত্তেজনায়

জীবনীশক্তির ভাণ্ডার প্রায় নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল, যেটুকু বাকি ছিল তা শেষজীবনে অর্থাভাব দূর করবার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রমে নানা দুঃখ-কষ্টে নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল। জীবন-দীপের তেল ফুরিয়ে গিয়েছিল, প্রদীপের বুকে সলতেটা পুড়ছিল—নিবে গেল।

কবির যৌবনকালটাও স্বচ্ছল অবস্থার মধ্য দিয়ে কাটে নি। ছাত্রজীবনে অনেক সুবিধা সুযোগ পান নি। ছাত্রব্রত-উদ্যাপনের আগেই চাকরি নিতে হয়েছিল। মাস্টারি করতে হয়েছে অনেক দিন। পরে ঢাকায় অধ্যাপক হয়েছিলেন। কিন্তু দশটি সন্তানের (তিনটি মারা গেছে) পিতার পক্ষে সংসার-সংগ্রামটা সোজা ছিল না।

অধ্যাপনা যাঁরা করেন, আমরা জানি, তাঁদের খাটুনি সবচেয়ে কম। মোহিতলাল সে শ্রেণীর অধ্যাপক ছিলেন না। তাঁর অধ্যাপনার একটা নেশা ছিল, বাংলা-সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন ব'লে তা সাহিত্য-সেবার অঙ্গীভূত হয়ে পড়েছিল। এজন্য যতটা খাটবার কথা, তার চেয়ে ঢের বেশি খাটতেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপনার জের তাঁর বাড়ি পর্যন্ত চলত, অনেক সময় রাত এগারোটা বারোটা পর্যন্ত। তা ছাড়া তাঁর অধ্যাপনা ছিল প্রত্যেক বৈঠকে, মজলিসে, সুহৃৎ-সভায়। তাঁর বাচনভঙ্গী ছিল 'প্রভুসম্মিত'। চারি পাশের সকলকেই ছাত্র মনে করতেন, নিজের আচার্যের আসনটা ছিল সর্বত্রই চিরন্তন। এতে জীবনীশক্তির ব্যয় কম হয় নি।

মোহিতলাল যদি শুধু কবিই থেকে যেতেন, তা হ'লে জীবনীশক্তির এতটা ব্যয় হ'ত না। 'তিনি সমালোচক ও চিন্তানায়ক হয়ে ওঠার পর তাঁর আর লেখনী চালনায় বিশ্রাম ছিল না। লেখনী চালনা ছাড়া আমাদেরও গতি নেই, কিন্তু আমাদের নানা ব্যাপারের আহ্বানে বিশ্রাম আছে। বিশেষত কেউ দেখা করতে এলে তার সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় বিশ্রাম পেয়ে যাই। মোহিতলালের তা ছিল না। যে কেউ কাছে আসুক না কেন—সে একটা স্কুলের ছেলে হ'লেও তাকে নিজের লেখা শোনাতেন, নয়তো তাকে কোন তত্ত্ব বোঝাবার জন্য বৃথা

শ্রম করতেন। রচনায় ও রসনায় তাঁর জীবনীশক্তির অনেকটা ব্যয় হয়ে গেছে।

অপব্যয়ও কম হয় নি। অপব্যয় হয়েছে উত্তেজনায় ও অপ্রকৃতিস্থতায়। যা তাঁর পক্ষে অপ্রিয় ছিল, তা যত তুচ্ছ ব্যাপার হোক না কেন, তা তাঁকে তাতিয়ে ও মাতিয়ে তুলত। যা তাঁর পক্ষে অসহ্য বোধ হ'ত, তার বিরুদ্ধে আগ্নেয়গিরির জ্বলন্ত লাভা-নিঃস্রাবের মত জ্বালাময় বাক্যোচ্ছ্বাস তাঁর কণ্ঠ হতে উদ্গীর্ণ হ'ত। নতুন যাদের সঙ্গে পরিচয় বা দেখা-সাক্ষাৎ হ'ত, তারা স্তম্ভিত হয়ে যেত।

কবি ছিলেন অত্যন্ত অভিমানী, অতি সামান্যেই আঘাত পেতেন। সব সময়ই ভাবতেন, তাঁর সম্মান হানি হচ্ছে—তাঁর প্রতি অনাদর হচ্ছে, সে জন্য অবিরত চারদিক হতে কেবল আঘাত পেতেন। অধিকাংশ আঘাত তাঁরই কল্পনাপ্রসূত বা ভুল বোঝার ফল। আঘাতে আঘাতে তাঁর বক্ষঃস্থল খণ্ডবিখণ্ড হয়ে গিয়েছিল। তাতে তাঁর জীবনীশক্তিরও অপব্যয় হয়ে গেছে।

শেষ-জীবনে তাঁর উপার্জনের আর কোন পথ ছিল না। তাই তাঁকে নগর হতে বহুদূরে জঙ্গলের মধ্যে ব'সে অনবরত লেখনী চালনা করতে হয়েছে। যাঁরা উপন্যাস গল্প বা পাঠ্যপুস্তক লেখেন না, তাঁরা যত বড় সাহিত্যিকই হোন, লেখনী-চালনার দ্বারা একটা বড় সংসারের অভাব দেশের বর্তমান দুর্দিনে কখনও দূর করতে পারেন না। সেজন্য তাঁর জীবনীশক্তিই নিঃশেষিত হয়েছে, অভাব দূর হয় নি।

আজকাল কোন কোন পত্রিকায় লেখা দিলে কিছু কিছু পাওয়া যায়। মোহিতলালের লেখা বইয়ের আকারে বেরবার আগে অনায়াসে সাময়িক-পত্রে প্রকাশিত হতে পারত।

কিন্তু তিনি কোন পত্রিকার উপর প্রসন্ন ছিলেন না। পত্রিকার সম্পাদকেরাও ভয় ক'রে তাঁর কাছ হতে স'রে থাকত। সাময়িক-পত্রে লিখতে গেলে অনেকটুকু সহিষ্ণুতার প্রয়োজন হয়। সে সহিষ্ণুতা তাঁর ছিল না। কেউ বর্জাইসে ছাপে, কেউ একটা লেখাকে দু জায়গায়

ছাপে, কেউ অপকৃষ্ট লেখাকে প্রথম স্থান দিয়ে সাহিত্যরথীর লেখা পরে ছাপে, যে লেখা এক সংখ্যায় যাওয়ার কথা সে লেখাকে টুকরো টুকরো ক'রে একাধিকবারে ছাপে, প্রুফ চাইলে প্রুফ দেয় না, ছাপা হ'লে ফাইল দেয় না, চিঠি লিখলে জবাব দেয় না। এ সব আমরা সহ্য ক'রে চলি ব'লেই সাময়িক-পত্রের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক আছে। কোন অভিমানী লেখকের সাময়িক-পত্রের সঙ্গে সম্পর্ক রাখা চলে না। অভিমানী মোহিতলাল এসবের একটাও সহ্য করতে পারতেন না। একটি মাত্র ছাপার ভুল থাকলেও তাঁর ধৈর্যচ্যুতি হ'ত। দ্বিতীয় লেখা আর সে পত্রিকায় দিতেন না। এ জন্য তাঁর লেখা আমরা অনেক দিন কোন পত্রিকায় দেখতে পাই নি। 'শনিবারের চিঠি'তে তাঁর লেখা বেরুত, সম্পাদক ভৃত্যের মত তাঁর সেবা করতেন, শিষ্যের মত ছিলেন আজ্ঞাবহ। তিনি অত্যন্ত সাবধানে চলতেন, বিন্দুমাত্র ত্রুটি ঘটতে দিতেন না। কাজেই সেখানে লেখা ছাপা সম্ভব হ'ত। অন্যে 'শনিবারের চিঠি'র সম্পাদকের মত সতর্কতা অবলম্বন করতে রাজী হয় নি ব'লে অন্যত্র লেখা ছাপা সম্ভব হয় নি।

শুধু অভিমান নয়, মোহিতলালের আত্মমর্যাদাবোধ ছিল অত্যন্ত বেশি। বিন্দুমাত্র আত্মমর্যাদা ক্ষুণ্ণ হ'লে তাঁর ধৈর্যচ্যুতি হ'ত। সাহিত্যকে তিনি খেলার জিনিস মনে করেন নি—সাহিত্য ছিল তাঁর প্রাণাধিক বস্তু।

সমগ্র বাংলা-সাহিত্য তাঁর আলোচনার বস্তু ছিল না। তিনি বলতেন, "এক বৈষ্ণব-পদাবলী ছাড়া প্রাচীন সাহিত্যে আলোচ্য কিছু নেই। বৈষ্ণব-পদাবলীরও ২০।২২টার বেশি সাহিত্যপদবাচ্য হতে পারে না। বাকিগুলি ঐ ২০।২২টারই বিভিন্ন ছন্দে ও ভাষাভঙ্গীতে পুনরাবৃত্তি মাত্র।" তাঁর মতে, আসল বাংলা-সাহিত্যের সূত্রপাত হয়েছে শ্রীমধুসূদন হতে। ঊনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্যে যা কিছু আলোচ্য তার সম্বন্ধে তিনি যা কিছু বলবার তা নিঃশেষ ক'রেই ব'লে গেছেন। বর্তমান সময়ে যে সাহিত্য রচিত হচ্ছে, তার প্রতি তাঁর কোন আগ্রহ

ছিল না। বিংশ শতাব্দীর সাহিত্য সম্বন্ধে আর কিছু লেখবার জন্য উৎসুক ছিলেন না। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে তাঁর যা কিছু বলবার ছিল তা 'সঞ্চয়িতা'র ভাষ্য-রচনা প্রসঙ্গে সবই বলেছেন। তার এক খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে, এক খণ্ড যন্ত্রস্থ, বাকি দুই খণ্ডের পাণ্ডুলিপি তৈরি আছে। সে পাণ্ডুলিপির অনেকাংশ আমার শোনা আছে। মৃত্যু আসন্ন জেনেই তা অবিশ্রাম পরিশ্রম ক'রে শেষ ক'রে গিয়েছেন। এ বিষয়ে তাঁর প্রকাশকের কাছে একটা দায়িত্ব ছিল। তাঁর দায়িত্ববোধ ছিল অসাধারণ। মনে হয়, বাংলা-সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁর আর বিশেষ কিছু বলবার ছিল না।

বাংলা-সাহিত্যক্ষেত্রের পরিসর অত্যন্ত কম, প্রাচীন সাহিত্য বাদ যাওয়ায় এবং বর্তমান সাহিত্য উপেক্ষিত হওয়ায় তাঁর কাছে এ পরিসর ছিল আরও কম। এই ক্ষুদ্র পরিসরের পক্ষে তাঁর বিচার-ব্যাখ্যানের শক্তি ও রসপ্রমাতৃত্ব ছিল অনেক বড়। তাঁর উন্নতশ্রেণীর মার্জিত রুচির পক্ষে উপাদেয় উপভোগ্যের পরিমাণ সামান্যই। বাংলা-সাহিত্য সম্বন্ধে বলবার কথা ফুরিয়ে এসেছিল ব'লেই হয়তো তাঁর চিন্তাশীলতা বিষয়ান্তর খুঁজেছিল। মনে হয়, এজন্যেই দেশের রাজনীতি তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল। তাঁর মত সাহিত্যসর্বস্ব সারস্বতের পক্ষে সাহিত্যেতর বিষয়ে চিন্তাশীলতার নিয়োগ স্বধর্মচ্যুতি ব'লে আমাদের মনে হয়। কবিতা-রচনার ক্ষেত্রে তিনি স্বপ্নলোক হতে সত্যের কঠোর ভূমিতে অবতরণ করেছিলেন। তার পর তাত্ত্বিকতার গহন অরণ্যে প্রবেশ করেছিলেন। তখনই মনে হয়েছিল, এইবার কবি কবিতা ছেড়ে চিন্তানায়ক হয়ে উঠবেন। কবিতা ছাড়লেন কেন?—জিজ্ঞাসা করলে বলতেন, "রসের উৎসমুখ শুষ্ক হয়ে গেছে, কবিতার প্রেরণা আর পাই না। এখন জোর ক'রে লিখতে গেলে হয় পুনরাবৃত্তি হবে, নয়তো অপকৃষ্ট পদ্য হবে। সময় থাকতে বন্ধ করাই ভাল।" কোন কোন সমসাময়িক-কবিদের নাম ক'রে বলতেন, "দেখ না, এ দের এখন কি অবস্থা!" তাঁর শেষ উল্লেখযোগ্য কবিতা "দারার ছিন্নমুণ্ড"—এ কবিতা

এখনও প্রকাশিত হয় নি। কবিতার যে অনবদ্য রচনাভঙ্গী বহু সাধনায় তিনি আয়ত্ত করেছিলেন, সেটি আর কাজে লাগল না, কতকগুলি উৎকৃষ্ট ইংরেজী কবিতার অনুবাদ ক'রে সেই সাধনার বস্তুকে কিছু কাজে লাগিয়েছিলেন।

তিনি বলতেন, "সাহিত্যসেবার অর্থ শুধু নিজে লিখতে পারা নয়, ভাল লেখার রস উপভোগ, এবং সকলকে সে উপভোগের আনন্দের ভাগ দেওয়া। আমি নিজেই লিখি আর অন্তেই লিখুক, ভাল লেখা হ'লে তা আমার মাতৃভাষার সম্পদ। কাজেই আমারই সম্পদ। এই সম্পদ যাতে সাধারণের ভোগে লাগে, তার জন্ত সকল প্রয়াসই সাহিত্যসেবা। ভাল লেখা যা সাধারণের চক্ষের অগোচরে থেকে গেছে তাকে লোকচক্ষুর সামনে মেলে ধরলেও সাহিত্যসেবাই হয়। যা উপেক্ষিত হয়ে রয়েছে তাকে যথাযোগ্য মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা করাও সাহিত্যসেবা। অন্তান্ত ভাষায় যে সব উৎকৃষ্ট লেখা আছে সেগুলোর অনুবাদ, অন্তত সন্ধান দেওয়াও সাহিত্যসেবা।" মোহিতলাল নবপর্যায় 'বঙ্গদর্শনে'র মারফতে তাই করতে শুরু করেছিলেন। দেশের দুর্ভাগ্য, সে পত্রিকাখানি উঠে গেল।

আমি রাজনীতিকে বিষয়ান্তর বলেছি, কিন্তু মোহিতলালের কাছে তা নয়। মোহিতলালকে বাণীর উপাসক না ব'লে বাণীরূপা বঙ্গমাতার উপাসকই বলতে হয়। বঙ্কিমচন্দ্র বাণীবিদ্যাদায়িনীকে বঙ্গমাতার সঙ্গে একাত্মিকা ক'রেই দেখেছিলেন। এ বিষয়ে মোহিতলাল বঙ্কিমের যোগ্য শিষ্য। বাংলার সংস্কৃতি ঐতিহ্য, বাংলার নিজস্বধর্ম (বিশেষ ক'রে তান্ত্রিকতা ও বৈষ্ণবতা), বাংলার জীবনযাত্রা, গৃহধর্ম, বাংলা-ভাষা, বাংলার নিজস্ব দেশাত্মবোধ—সবই বাংলা-সাহিত্যের উপজীব্য। এই হিসাবে বাংলার নিজস্ব রাজনীতি তাঁর কাছে সাহিত্যসেবার অঙ্গীভূত হয়ে উঠেছিল। বাংলা-সাহিত্যকে বাংলার প্রাণধর্ম হতে পৃথক ক'রে ভাবতে তিনি পারতেন না। যে সাহিত্যে বাংলার প্রাণের স্পন্দন নেই, তাকে আসল বাংলা-সাহিত্য ব'লে স্বীকার করা তাঁর পক্ষে কঠিন

হয়েছিল। আশ্চর্যের বিষয়, তাঁর নিজের রচিত কবিতাগুলির অধিকাংশেই বাংলার নিজস্ব প্রাণধর্মের কোন সম্বন্ধ নেই। আমি এ রহস্যের কোন সমাধান করতে পারি নি। আমি এইরূপ আরও অনেক পরস্পর-বিসংবাদী মনোভাব তাঁর চরিত্রে লক্ষ্য করেছি। তাঁর মনে নিশ্চয়ই এ সবের একটা 'সিন্‌থেসিস' ছিল। আলোচনার মধ্যে তা ধরতে পারি নি।

মোহিতলাল বলতেন, "প্রত্যেক কবি জন্ম হতে একটা কবিমানস নিয়ে জন্মে, বিধাতাপুরুষ সূতিকাগৃহে তার কানে একটা মন্ত্র দেন। প্রত্যেক কবির উচিত তার নিজস্ব কবিমানসটিকে বিকশিত করা, আর যে মন্ত্র সে সূতিকাগৃহে পেয়েছে সেই মন্ত্রটিই জপ করা।" তিনি বলতেন, "একতারাতে একটি যে তার আপনমনে সেইটি বাজা।" কোন কবি যদি তা না ক'রে পরের অনুকরণে দেশকালপাত্রের মুখ চেয়ে নিজের জন্মগত অধিকার ও ক্ষেত্র ছাড়িয়ে যায়, তবে তার স্বধর্মচ্যুতিই হবে। এই স্বধর্মচ্যুতিকে তিনি নিন্দা করতেন। শরৎচন্দ্রের শেষজীবনের লেখাগুলি সম্বন্ধে তিনি এই অভিমত পোষণ করতেন। রবীন্দ্রনাথের শেষবয়সের কবিতা সম্বন্ধেও এই অভিমত ছিল।

এ বিষয়ে তাঁর সঙ্গে মতভেদ হ'ত। যদি কেউ পরধর্ম আশ্রয় ক'রে উৎকৃষ্ট সাহিত্য রচনা করতে পারে, তবে স্বধর্মচ্যুতির অজুহাতে তাকে নিন্দা করা চলে না। স্বধর্ম যাই হোক—সংস্কার, সংস্কৃতি, শিক্ষাদীক্ষা, আবেষ্টনী ইত্যাদির সাহায্যে ও প্রভাবে কবিধর্ম দেহ-মনের সঙ্গে গ'ড়ে ওঠে। এ কবিধর্ম অনেকটা বিশ্বজনীন। কবির নিজস্ব কবিব্রতের গণ্ডীর বাইরে গিয়েও কবি যদি উৎকৃষ্ট সাহিত্য রচনা করেন, তবে তা স্বধর্মচ্যুতি হতে পারে, কবিধর্মচ্যুতি নয়, কারণ তাঁর ঐরূপ রচনায় কবিত্বের অভাব নেই। এ কথাই আমি আত্মসমর্থনের জন্য বলতাম। তিনি বলতেন, "স্বধর্মচ্যুত হয়েও যদি কেউ উৎকৃষ্ট কবিতা রচনা করেন, তবে তা অ্যাক্‌সিডেণ্ট, এবং তাতে কলাকৌশল থাকতে পারে, কবির প্রাণের গভীর স্পন্দন থাকবে না, তা কখনও অকৃত্রিম ও প্রাণবন্ত হবে না।"

স্কুলের পাঠ্যপুস্তকে সকলেরই কবিতা আছে, মোহিতলালের নেই। পাঠ্যপুস্তকে দেওয়া যায়, এমন কতকগুলি কবিতা তাঁকে লিখতে অনুরোধ করেছিলাম। তাতে তিনি লিখেছিলেন, "বরাতী লেখা আমি লিখতে পারব না।" তার উত্তরে লিখেছিলাম, বরাতী নয়, কারণ বিষয়-বস্তু তো নির্দেশ ক'রে দেওয়া হচ্ছে না। বালক ও কিশোরদের কথা মনে রেখে কোন কোন ভাব-অনুভূতিকে সহজ ভাষায় প্রকাশ করলেই হ'ল। সে ভাষা তো আপনার আসে, "শিউলির বিয়ে" কবিতার রচনাভঙ্গী ও ভাষা হ'লেই হবে। কিশোর বয়সে ছেলেরা যে কবির কবিতার আস্বাদ পায়, পরবর্তী জীবনে সেই কবির কবিতাই খোঁজে। অনেকের পাঠ্যপুস্তকের কবিতাপাঠই জীবনে শেষ কবিতাপাঠ। বাংলার ছেলেমেয়েদের কাছে পরিচিত হওয়ারও দরকার আছে। তা ছাড়া কিশোরদের মন থাকে 'আন্‌প্রিডিস্‌পোজ্‌ড্‌' আর 'আন্‌সফিস্‌টিকেটেড্‌', তারা অনেক কবিতা প্রাপ্তবয়স্কদের চেয়ে ঢের ভাল বোঝে। তার উত্তরে তিনি বলেছিলেন, "আমার কবিতা স্কুলের অযোগ্য শিক্ষকদের হাতে পড়লে তার মর্যাদা থাকবে না, তাদের ব্যাখ্যার দোষে ছেলেরা রসগ্রহণ করতে পারবে না। স্কুলের পড়ানো পরীক্ষার সম্ভাব্য প্রশ্নের উত্তর দিতে শেখানো ছাড়া আর কিছু নয়।"

স্কুলেও যা, কলেজেও তো তাই! কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁর 'স্মর-গরল' বি. এ. অনার্সের পাঠ্য ক'রে ফেলেছিল এক রকম ভুল ক'রেই। না পড়লেও 'স্মর-গরল' কথাটাতেই বোঝা উচিত ছিল, এতে কি বস্তু আছে। প্রত্যেক কলেজে 'স্মর-গরলে'র কবিতাগুলি কি ভাবে পড়ানো হচ্ছে মোহিতবাবু তার খোঁজ নিতেন। যা শুনতেন ছাত্রদের মুখে অথবা অধ্যাপকদের কাছে, তাতে তিনি খুশি হতে পারতেন না।

তরুণ অধ্যাপক তারাচরণ বসু তাঁর অন্তরঙ্গ শিষ্য। তারাচরণ তাঁর কবিতাগুলির যে ভাবে রসগ্রহণ করে, তেমনটি আর কাউকে করতে দেখি নি। যথাযথ ব্যাখ্যানের জন্য মোহিতলাল একমাত্র তার উপর নির্ভর করতে পারতেন। কিন্তু সে তখন ছিল স্কুলের

শিক্ষক। আমি তাকে 'স্বর-গরলে'র কবিতাগুলির ব্যাখ্যা লিখতে বলি। মোহিতলালও তাকে উৎসাহিত করেন। তার ব্যাখ্যা লেখা হ'লে মোহিতবাবু আগাগোড়া পাণ্ডুলিপি দেখে দিয়েছিলেন; আমিও আগাগোড়া প'ড়ে ছাপবার ভার নিয়েছিলাম। সে বই অধ্যাপকদের হাতে পৌঁছেছিল কি না জানি না, তবে অনেক ছাত্র কিনেছিল।

অধ্যাপকদের বিপদ হয়েছিল ব্যাখ্যা করতে গিয়ে। 'স্বর-গরলে'র কবিতাগুলির মধ্যে যে 'গরল' তাত্ত্বিকতা ও ভাষার আলঙ্কারিক আভিজাত্যের মধ্যে নিগূহিত ছিল, ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সেটা ছাত্র-ছাত্রী-পরিষদে অনাবৃতভাবে প্রকট হয়ে পড়েছিল। ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে 'এরোটিক সেন্টিমেন্টে'র রচনার বিশদ ব্যাখ্যা দিতে অধ্যাপকরা সঙ্কোচ বোধ করতেন। ছাত্রেরাও বিপদে পড়েছিল ভাষার জন্য। 'স্বর-গরলে'র কবিতার পদবিন্যাসের সঙ্গে ছাত্রগণ তো নয়ই—অনেক অধ্যাপকও পরিচিত নন, এ ভাষা উচ্চশ্রেণীর ইংরেজী কবিতার পদবিন্যাসের রূপান্তর মাত্র। এ ভাষা মোহিতলালের নিজেরই সৃষ্টি। উচ্চশ্রেণীর ইংরেজী কবিতা যার ভাল ক'রে পড়া নেই—এ ভাষা বোঝা তার পক্ষে শক্ত, তার কাছে এ ভাষা অস্বচ্ছ। অনেক স্থলে ইংরেজীতে অনুবাদ ক'রে নিয়ে ইংরেজীনবিসদের বুঝতে হয়।

মোহিতলাল স্কুলের উচ্চতম শ্রেণীর ছেলেদের জন্য 'কাব্য-মঞ্জুষা' নামে যে কবিতা-সঙ্কলন-পুস্তক প্রকাশ করেন, সে পুস্তকে প্রত্যেক কবিতার রসগ্রহণের ভূমিকা এবং বহু অংশের ব্যাখ্যা নিজেই লিখে তাতে "পরিশিষ্ট"-রূপে যোগ করেছিলেন—শিক্ষকদের উপর নির্ভর করতে পারেন নি। তিনি তাতে যে টীকা সংযোগ করেছিলেন, তাতে শিক্ষকদেরই পাঠনার সূত্র ধরিয়ে দিয়েছিলেন।

মোহিতবাবু বলতেন, "সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্র যত উঁচুদরের বস্তুই হোক, ওর দ্বারা বর্তমান যুগের বাংলা-সাহিত্যের বিচার হতে পারে না। সাহিত্যিকদের ও-শাস্ত্র পড়বার প্রয়োজন নেই। ওটা 'অ্যাকাডেমিক স্টাডি' হিসাবেই চলতে পারে। বর্তমান যুগের বাংলা-সাহিত-

ইউরোপীয় সাহিত্যের ভাব, ভঙ্গী, রচনাশৈলী ও আদর্শে গঠিত। তাই ব'লে ইউরোপীয় 'রেটরিক' বা 'পোয়েটিক্‌স্' সাহিত্যিকদের পড়তে হবে তাও বলি না। 'আর্ট অব ক্রিটিসিজ্‌ম্' স্বতন্ত্র বিদ্যা। ইংরেজীতে এ সম্বন্ধে ভাল ভাল বই আছে। বাংলার এম. এ. ক্লাসে এ শ্রেণীর বই অবশ্যপাঠ্য থাকা উচিত। বাংলার সাহিত্যিকদের, বিশেষ ক'রে সমালোচক, ব্যাখ্যাতা ও অধ্যাপকদের এসব বই পড়া খুবই কর্তব্য।"

এ সব বই তিনি মন দিয়ে পড়েছিলেন ব'লেই তিনি বাংলা দেশে সমালোচনা-ক্ষেত্রে নবধারার প্রবর্তক হতে পেরেছিলেন।

তিনি বলতেন, "কবির দ্বিতীয় কিংবা তৃতীয় শ্রেণীর কবিতাই পপুলার হয়, প্রথম শ্রেণীর কবিতা কখনও পপুলার হয় না, প্রথম শ্রেণীর কবিতা কেবল রসজ্ঞ ব্যক্তিরই উপভোগ্য। যে কবি দ্বিতীয় বা তৃতীয় শ্রেণীর কবিতা লেখে না, তার কবিতার রসগ্রাহী হয়তো দু-চারজনের বেশি নেই—অনেক ক্ষেত্রে রসগ্রাহীর জন্য প্রতীক্ষা ক'রে ব'সে থাকতে হবে। হয়তো তার রসগ্রাহী কোথাও না কোথাও আছে, তার সঙ্গে পরিচয়ই হ'ল না এ জীবনে। হয়তো জীবদ্দশায় সেই সমানধর্মা রসগ্রাহী মিললই না। এর জন্য কাউকে দায়ী করা যায় না, নিজের মধ্যকার কাব্যপুরুষই দায়ী।"

তিনি কবিতার রচনায় পারিপাট্য পরিচ্ছন্নতা এবং গঠনের অনবদ্যতার পক্ষপাতী ছিলেন। এজন্য নিজের কবিতাগুলিকে বার বার পরিমার্জিত ক'রে তবে ছাপতে দিতেন। তাঁর কাছে যে যেত, সে মূর্খই হোক আর পণ্ডিতই হোক, ছাত্রই হোক আর অধ্যাপকই হোক, তাকেই নিজের কবিতা উদাত্ত কণ্ঠে প'ড়ে শোনাতেন। এই যে শোনানো—প্রকৃতপক্ষে আগন্তুকদের নয়, নিজেকেই। কারণ, কারও মতামতের প্রতি তাঁর আস্থা ছিল না। যে সুখ্যাতি করত তার বিপদই ছিল বেশি,—কেন ভাল লাগল, তা তাকে বলতে হ'ত। নিজের কবিতা নিজের কণ্ঠে নিজের কানে শুনে তিনি দোষত্রুটি

ধরতেন এবং পরে সেগুলির সংশোধন করতেন। কানকেই তিনি কবিতার প্রধান বিচারক মনে করতেন।

তিনি বলতেন, "যে কবিতা অপকৃষ্ট, তাতে খুঁত থাকে থাকুক, তাকে সংশোধন ক'রে লাভ নেই। কারণ, গাধা পিটিয়ে ঘোড়া হয় না। যে কবিতাটা উতরে গেছে, তাতে কিছু খুঁত না থাকে তাই দেখতে হবে। তবে যদি ভাগ্যগুণে কোন কবিতা 'পপুলার' হয়ে পড়ে, তবে তা দ্বিতীয় শ্রেণীর হ'লেও তাতে কোনও খুঁত থাকলে তা দূর করতেই হবে।" তিনি একবার আমাকে লিখেছিলেন, "আপনার 'অন্ধকার বৃন্দাবনে'—

'আজিকে ব্রজে লেহন করে মৃগপদারবিন্দ কার'

এ লাইনটা আমার মনে এমন একটা অস্বস্তির সৃষ্টি করে যে সমস্ত কবিতাটা তাতে আমার কাছে অপ্রিয় হয়ে ওঠে। অন্ধকার, চন্দ্রহার, চন্দনার ইত্যাদির সঙ্গে 'বিন্দকার' মিলে চলতে পারে না। গোপীরা যে দুধে নবনীমন্থ করছে, সে দুধে এই একবিন্দু গোমূত্র কেন? তিনিই ও-লাইন বদলে লিখে দিয়েছিলেন, কি আমিই নিজে লিখে তাঁর অনুমোদন নিয়েছিলাম তা আমার মনে নেই। পরিবর্তিত হয়েছিল—

হরিণী আজ লেহন করে চরণসুধাগন্ধ কার?

'এপিগ্র্যামাটিক' করার লোভে অনেক সময় অর্ধসত্য বা আংশিক সত্যকে আমরা কবিতায় স্থান দিই। আর্টের খাতিরে 'সাহিত্যের সত্য' ব'লে এগুলোকে আমরা উপভোগ করি। জি. বি. এস. এ বিষয়ে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। আমাদের রবীন্দ্রনাথও তা করেছেন। যেমন—

সাত কোটি সন্তানেরে হে মুগ্ধ জননী,
রেখেছ বাঙালী ক'রে মানুষ কর নি।

মোহিতলাল কবিতায় আর্টের খাতিরেও অসত্যকে তো নয়ই, এরূপ আংশিক সত্যকেও সহ্য করতে রাজী ছিলেন না।

'স্বপন-পসারী'র স্তর অতিক্রম ক'রে তিনি স্বপ্নকেও কবিতায় ঠাঁই

দেন নি। তিনি বলতেন, "যতই অপ্রিয় হোক, কঠোর হোক, বীভৎস হোক, পূর্ণ অবিসংবাদিত সত্যই কবিতার উপজীব্য। কেবল প্রকাশ করতে হবে সত্যকে সুন্দর ক'রে, প্রত্যেক কবিকেই সত্যসুন্দরদাস হতে হবে।"

রঙ্গরসের কবিতাতেও তিনি অসত্য বা আংশিক সত্যকে সহ্য করতে পারতেন না। আমি একটা কবিতায় যা লিখেছিলাম তার ভাবটা এই—

যে যতই অহঙ্কার কর, ডুবব আমরা সবাই, কেউবা বিশ বাঁও জলের নীচে, কেউবা এক বাঁও জলের তলে, সাড়ে তিন হাত পার হ'লে সবারই দশা সমান। রবি আর হয়তো শরৎচন্দ্র জলের উপরে আকাশে থেকে যাবেন।

এতে তিনি রাগ ক'রে আমাকে যথোচিত তিরস্কার ক'রে চিঠি লেখেন। আমি শুধু উত্তরে লিখি—

পরিহাসবিজল্পিতং সখে
পরমার্থতয়া ন গৃহ্যতাং বচঃ ॥

তার উত্তরে তিনি লেখেন—

"এত বড় অসত্যকে মনে পোষণ করা এবং তাকে সাহিত্যের ভাষায় প্রকাশ করা অমার্জনীয় অপরাধ—কতবড় দুর্বলতা, আত্মপ্রত্যয়হীনতা ও ইন্‌ফিরিয়রিটি কম্‌প্লেক্‌সের পরিচয় আছে ওই কটা লাইনে, তা বুঝতে পারছেন না। মনে রাখবেন, একটামাত্র রচনার দ্বারাও একজন লেখক অমর হয়ে থাকতে পারে। পরিহাসে রসিকতাতেও কখনও অসত্যকে প্রশ্রয় দেবেন না।"

এমনি কত কথাই মনে পড়ছে—কোন্‌টা বাদ দিয়ে কোন্‌টা লিখব? চল্লিশ বছরের বন্ধু আমার—এরূপ একটানা এতদিন ধ'রে বন্ধুত্ব তাঁর সঙ্গে বজায় রাখা কত যে কঠিন, তা অনেকেই জানেন। তিনি আমাকে সার্টিফিকেট দিয়ে গেছেন, "অসীম আপনার ধৈর্য, অপরিমেয় আপনার সহনশীলতা—আপনি সত্যই বৈষ্ণব।" সেই সঙ্গে বলেছেন,"

"আমি কিন্তু শাক্ত, আমি তান্ত্রিক, আমি বাংলার শ্মশানে শবসাধনা করছি। আমি নিঃসঙ্গ,—চারি দিকে ভূতপ্রেত, গৃধ্র-শৃগাল।"

ইদানীং তিনি বড় 'সিনিক' হয়ে পড়েছিলেন, অপটিমিজ্‌ম্‌ একেবারে তাঁকে ত্যাগ করেছিল। তিনি বাংলা দেশের কিছুতেই আশার চিহ্নমাত্র দেখতে পেতেন না। কোথাও কোন মঙ্গলের লেশও তাঁর চোখে পড়ত না। তাঁর শেষ আশার আশ্রয় ছিলেন সুভাষচন্দ্র। তিনি বলতেন, "বাংলার নাভিশ্বাস উঠেছে, তার সর্বাঙ্গে অরিষ্ট লক্ষণ দেখা যাচ্ছে।" এই কথাই তাঁর মুখে বার বার শুনেছি। একদিন বললাম, গর্জিল মোহিতলাল 'নিকট শমন'। এ রসিকতায় তিনি রস পেলেন না। তখন তিনি উত্তেজিত। তিনি অত্যুচ্চকণ্ঠে বললেন, "কি! দেশের মৃত্যুদশা নিয়ে রসিকতা? সত্যই বাংলার 'নিকট শমন,' আর আমারও 'নিকট শমন'—এ কথা আমি গর্জন ক'রেই ব'লে যাচ্ছি।"

দ্বিতীয় কথাটা সত্য হ'ল। ভগবানের কাছে মোহিতলালের সন্তপ্ত আত্মার শান্তি প্রার্থনার সঙ্গে প্রার্থনা করি, তাঁর প্রথম কথাটা যেন সত্য না হয়।

শ্রীকালিদাস রায়

আমার সাহিত্য-জীবন

মোহিতলাল

পূর্বের অধ্যায়ে আচার্য মোহিতলালের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের কথা লিখেছি এবং বলেছি মোহিতলাল আমার জীবনে একদা সত্য সত্যই আচার্যের কাজ করেছেন। জীবনের বিচলিত মুহূর্তে তাঁর অভয় এবং উৎসাহ পেয়েছি তপস্যাসিদ্ধ উত্তরসাধকের মত। তাঁর চরিত্র, তাঁর সাধনার নিষ্ঠা, জীবন ও জগৎ-রহস্য উদ্‌ঘাটন ক'রে তার লীলা প্রত্যক্ষ করার মত বিচিত্র দৃষ্টি আমার উপর এমনই প্রভাব বিস্তার করেছিল যে, তাঁকে লিখলাম—আমি দীক্ষা গ্রহণের জন্য গুরু অনুসন্ধান করিতেছি। আপনি কি আমাকে দীক্ষা দিতে পারেন?

এ একেবারে প্রথম দিকের কথা। অর্থাৎ 'প্রবাসী'তে 'রসকলি'র সমালোচনা প্রকাশের অনেক আগের কথা। সে সময় আমার যে কন্যা-শোকের কথা এর পূর্বে লিখেছি এই সময়ের। 'বঙ্গশ্রী' প্রকাশিত হবার কিছুকাল, বোধ করি ছ-সাত মাস, পরের কথা। তখন আমাদের কুলগুরুর শেষপুরুষ দেহরক্ষা করেছেন। এর বৎসর তিনেক পূর্বে, তাঁর তখন তল্পীবহনের চেষ্টা করেছি, তখন তিনি বলেছিলেন, এ পথে তো তোমার তৃপ্তি হবে না বাবা। তোমার মন ছুটেছে আলাদা সড়ক ধ'রে। তার দু ধারে বাড়ি, কাতারে কাতারে লোক। এ পথ যে জনমানবহীন পথ। আর দশজন যেমন, তোমার ধাত তেমন হ'লে আমি 'না' করতাম না। দিতাম কানে তিন ফু। ব্যবসা, তেজারতি, চাষ, মামলা—দেওয়ানী ফৌজদারী ক'রে ঘরে ফিরে কাপড় ছেড়ে আসনে ব'সে কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে বীজমন্ত্রটি স্মরণে এনে জপে ব'সে যেতে; কারণের বোতল পেলেই 'কালী কালী বল মন, জয় তারা' ব'লে অকারণে চক্রের নামে কুচক্রে ব'সে যেতে। বাবা, আমরা তান্ত্রিক বামুন পণ্ডিত লোক, ইংরিজী মত বুঝি না, মনেও করি—ওতে ইহলোকের খুব ভাল মন্ত্র আছে। একশোটা ধনদা-কবচ ধারণ করলে যা না হবে, ওই মতে দীক্ষা নিলে তাই হবে। তবে ও-মন্ত্রে তার পর এগিয়ে যাওয়া বড় কঠিন। যারা চেষ্টা করে, তারা প্রায়ই দেখি নাস্তিক হয়ে যায়। তুমি বাবা সেই পথ ধরেছ। খানিকটা না এগুলে তোমার যে কি মতি হবে, তা তো বুঝতে পারছি না। যারা এক পা এপথে, এক পা ওপথে ফেলে চলে, ইহকালের জন্যে ইংরিজী মত আর পরকালের জন্যে দেশী মত ধরে, তাদের ধরনের মানুষ তুমি নও। কাজেই মন্ত্রদীক্ষা এখন তোমার নেওয়াও উচিত নয়, আমার দেওয়াও উচিত নয়। আগে তোমার মন স্থির হোক।

এ কথা আমার কন্যা-বিয়োগেরও পূর্বের কথা। ১৯৩০ সালের আন্দোলনেরও দু-এক বৎসর আগের কথা। কথাটি তখন আমার

মনে রেখাপাত করেছিল। এবং আন্দোলন জেল ইত্যাদির প্রতিক্রিয়ায় ও জেলের মধ্যে ইউরোপীয় বিপ্লববাদের ইতিহাস ও দর্শন কিছু পড়াশুনা ও আলোচনার ফলে মনের গতি এমনই পশ্চিমাভিমুখী হয়ে দাঁড়াল যে, ওই গুরুটিকে অজস্র ধন্যবাদ জানিয়েছিলাম এই উপদেশের জন্য। তিনি অবশ্য তখন দেহরক্ষা করেছেন, জীবিত থাকলে ধন্যবাদের উত্তরে কি বলতেন জানি না।

যাই হোক, ১৯৩২ সালে কন্যা-বিয়োগের ফলে যে নিদারুণ আঘাত পেলাম, তাতে মনের গতির কাঁটা উদ্‌ভ্রান্তের মত পাক খেতে লাগল। এই সময় মনে দারুণ তৃষ্ণা জেগেছিল পরলোকতত্ত্ব জানবার। তখন লাভপুরে থাকলে নিত্যই গিয়ে শ্মশানে ব'সে থাকতাম। এ সেই সময়ের কথা। কিন্তু দীক্ষা নেব কার কাছে? কি মন্ত্রে দীক্ষা নেব?

মোহিতলালের সঙ্গে পরিচয় হওয়ার পর অকস্মাৎ একদিন মনে হ'ল, এঁর কাছে দীক্ষা নিলে হয় না?

এ কথায় অনেকের মনে সংশয় জাগতে পারে। সেই কারণে এখানে এই প্রসঙ্গটি পরিষ্কার করা প্রয়োজন। নূতন কালের মানুষ যাঁরা, যাঁরা পুরাতন কালকে দেখেন নি, তাঁদের কাছে হয়তো সমগ্রভাবে দীক্ষার কথাটাই প্রকাণ্ড একটা ভ্রান্তি এবং ব্যক্তিবিশেষের কাছে হাস্যকর। কিন্তু আমি যে হিসাবে দীক্ষার কথা বলছি, সেটা ঠিক হাসির কথা নয়। দীক্ষা তাঁদেরও একটা ক'রে আছে। জীবনে বিশেষ একটি মতবাদে পূর্ণ আস্থা স্থাপন ক'রে সেই মতবাদসম্মত একটি দৃষ্টিভঙ্গিতে জীবন ও জগৎকে দেখা ও বুঝতে চেষ্টা করার কথাই আমি বলছি; মতবাদে বিশ্বাস স্থাপন করাটাই দীক্ষাগ্রহণ এবং সেই মতবাদসম্মত দৃষ্টিভঙ্গিতে জীবন ও জগৎকে দেখা, বুঝতে পারা এবং সেই মতবাদ-অনুমোদিত পন্থায় নিজের জীবনযাত্রা নির্বাহ করাই হ'ল সেই সাধনা।

যাঁরা সেকাল দেখেছেন, তাঁদের মনে সংশয় জাগবে, আমি ব্রাহ্মণ-

সন্তান হয়ে বৈদ্যসন্তান মোহিতলালের কাছে দীক্ষা চাইলাম কি ক'রে ? আয়ুর্বেদও অবশ্য পঞ্চম বেদ ব'লে স্বীকৃত। তবুও প্রচলিত সমাজ-বিধানে চতুর্বেদ-অন্তর্গত ব্রাহ্মণ ছাড়া এই গুরুর কাজে অধিকার অন্যের ছিল না। অন্তত গৃহীর ছিল না। তবে সন্ন্যাসীর এ বাধা নেই। কারণ সন্ন্যাসীর জাতি নেই, বর্ণ নেই, ইহলোক পরলোক কিছুই নেই তাঁর, তাঁর আছে শুধু তপ এবং সাধনা। সেই তপ এবং সাধনা তাঁর কাছে সকলেই গ্রহণ করতে পারে, তিনিও বিতরণ করতে পারেন।

মোহিতলালকে আমার সন্ন্যাসী ব'লেই মনে হয়েছিল সেদিন। এবং অন্য দিক দিয়ে বিকৃত বর্ণাশ্রম ধর্মের গণ্ডীকে লঙ্ঘন ক'রে যাওয়ার মত সাহস ও প্রবৃত্তি দুইই তখন আমি পেয়েছি। জ্ঞানযোগে তাঁর দৃষ্টির গভীরতা, ধ্যানযোগের মত সাহিত্যতন্ময়তা, নিজের মতের দৃঢ়তা, জীবন ও জীবন-ব্যাখ্যায় শুচিতা ও অশুচিতার ঊর্ধ্বস্তরের অনুভূতি অথচ তার প্রকাশে জ্যোতির্ময় পবিত্রতার ধারণা, সাধনফল সম্পর্কে নির্লোভ অনাসক্তি দেখে আমি তাঁকে সন্ন্যাসী ভাবতে দ্বিধা করি নি। দু-একবার ঢাকা গিয়ে সংসারের মধ্যেও মোহিতলালের সন্ন্যাসের আসন আমি দেখে এসেছি। এই দেখেই আমি গভীর বিশ্বাসের সঙ্গে তাঁকে লিখেছিলাম, আপনি আমাকে দীক্ষা দিতে পারেন ?

কি দীক্ষা নেব, সে সম্পর্কেও আমার ধারণা একটা ছিল।

আমাদের কুলগুরু আমাকে বলেছিলেন, শক্তিতন্ত্রে তোমাকে দীক্ষা নিতে হ'লে 'তারা'-মন্ত্রে নিতে হবে। শক্তিতন্ত্রে তারাই হলেন সরস্বতী। তারার অপর নামই হ'ল—নীল সরস্বতী। কালী হলেন মহালক্ষ্মী।

কথাটা আমার মন মেনে নিয়েছিল। শক্তিতন্ত্রমতে দীক্ষাই যদি নিই, তবে এই মন্ত্র ছাড়া আর কোন্ মন্ত্র আমি নিতে পারি ?

মোহিতলালকে যখন পত্র লিখলাম, তখন শক্তিতন্ত্রমতে দীক্ষা আমি নিতে চাই নি। আমি চেয়েছিলাম সারস্বত-তন্ত্রমতে দীক্ষা। এমন কোন

তন্ত্র বর্তমানে আমাদের দেশে প্রচলিত নেই, কিন্তু অতীত কালে তো ছিল। ভারতবর্ষে মহাকবি বাল্মীকি এবং মহর্ষি বেদব্যাসের জীবন থেকে তো এর আভাস পাই। আদিকবি রামচন্দ্রকে পূর্ণব্রহ্মের অবতার ব'লে স্বীকার ক'রেও তাঁর মনুষ্যজীবন বর্ণনায় মহাকালের অমোঘ নিয়ম থেকে অব্যাহতি দেন নি। বেদব্যাস শ্রীকৃষ্ণকে জরা-ব্যাধের শরাঘাতে দেহত্যাগ করিয়েছেন, যদুবংশকে কুরুক্ষেত্রের প্রতিফলে গৃহযুদ্ধে ধ্বংস হতে দিয়েছেন। এই অনুভূতি এই দৃষ্টিলাভের জন্য অবশ্যই একটা সাধনা তাঁরা করেছেন। একটি ইষ্টকে তাঁরা ধ্যান করেছেন। এবং তাঁদের জীবনে যে পরিশুদ্ধতা, যে প্রসন্নতা, যে শান্ত কাঠিন্য আমরা দেখতে পাই, তাঁদের যে মহর্ষিত্ব স্বীকারে কোন সংশয় জাগে না, তার নিশ্চয়ই একটি সাধনপন্থা আছে। সে পথ ও সে তন্ত্র পরবর্তী কালে যেন হারিয়ে গেছে। কালিদাস মহাকবি, কিন্তু মহর্ষি আখ্যা পান নি। অথচ নূতন কালে রবীন্দ্রনাথ ঋষিত্ব অর্জন করলেন আমাদের চোখের সামনে।

মধ্যযুগে কবিরা ঋষিত্বের পরিবর্তে ভক্তত্ব অর্জন করেছেন। তাতে তাঁরা জীবনে যাই পেয়ে থাকুন, ঋষিত্বের এবং ভক্তত্বের মধ্যে পার্থক্য থাকুক্ বা না থাকুক, একটু হিসেব ক'রে দেখলেই দেখা যাবে যে, খাঁটি সারস্বত-সাধনা বা সরস্বতী-তন্ত্রমতে সাধনা তাঁদের মূল সাধনা ছিল না। তাই ঋষিদৃষ্টি তাঁরা অর্জন করেন নি। কথাটা সম্পর্কে আমার বাল্যকালে আমি যে সেকালের ঘরোয়া আলোচনা শুনেছি, সেই কথা এখানে বললে কথাটা পরিষ্কার হয়ে যাবে।

মধ্যযুগে চণ্ডীদাস থেকে রামপ্রসাদ পর্যন্ত কবিরা সাধক। ও-দিকে কবীর তুলসীদাসও তাই, ভক্ত-সাধক। এঁদের কাব্য সার্থক কাব্য, তবুও একটি বিশেষ রসের অভিসিঞ্চনে এমনি অভিষিক্ত যে বৈষ্ণব কাব্যের মাল্যখানি যদি বলি, অগুরুচন্দনে এমনি চর্চিত যে মালতী-মল্লিকা-যূথী প্রভৃতি বিভিন্ন পুষ্পের বর্ণ এবং গন্ধ সেখানে ঢাকা প'ড়ে বা চন্দনগন্ধের সঙ্গে মিশে অন্য এক রূপ ও গন্ধ ধারণ করেছে তবে অন্যায়

বলা হবে না। শাক্ত কাব্যেও তাই, সে রক্তচন্দনের শোভাই বড়। সেকালে আমাদের শাক্ত কর্তারা বলতেন, মা সরস্বতী হলেন শক্তি এবং শিবের ঘরের গিন্নী কন্যা। মা-বাপের হাল-হদিস রুচি-অরুচি এমন কি তাঁদের আসল তত্ত্ব পর্যন্ত সব জানেন। তাই সাধকেরা শক্তি বা শিব যাকেই জানতে হোক, ধরে গিয়ে দিদিঠাকরুনটিকে। বলে—ঠাকরুন, তুমি দয়া করলেই ঠিক সুনজরে পড়ব এবং বেশি সুনজরে পড়ব। এখন ব'লে দাও দেখি, কি ভাবে কথা বললে, কি নামে ডাকলে ওঁরা খুশি হন? তোমার মা-বাপের আসল তত্ত্বটাও ব'লে দাও তো!

বৈষ্ণবেরা বলেন, ঠাকরুন, তোমার ঠাকুরটিকে তুমি যে-ভালবাসায় পেয়েছ, সেই ভালবাসার তত্ত্বটা আমাদের ব'লে দাও দেখি। কিসে খুশি হন, কেমন ক'রে ডাকলে খুশি ব'লে দাও তো!

অর্থাৎ সরস্বতী এ যুগে স্বাধীন সত্তা হারিয়েছেন। ঋষিদৃষ্টিতে কাব্যসাধনা বিলুপ্ত হয়েছে।

নূতন কালে, বাংলা দেশে নবজাগরণের সময় সরস্বতী অর্থাৎ জ্ঞানযোগ নতুন ক'রে স্বাধীন আসন পেয়েছেন। সারস্বত-তন্ত্রের পুনরুত্থান হয়েছে। বঙ্কিম রবীন্দ্রনাথ ঋষিত্ব অর্জনের স্বীকৃতি পেয়েছেন।

অবশ্য সাধারণভাবে মা-সরস্বতীর দুঃখ আরও বেড়েছে। সেখানে বণিকের মানদণ্ডটি রাজদণ্ডে পরিণত হওয়ায় বণিকের একমাত্র দেবতা, যিনি নাকি বাংলা দেশের মতে সরস্বতীর সহোদরা এবং সপত্নী একাধারে, তিনি অর্থাৎ মা-লক্ষ্মী ওই দাঁড়িপাল্লার দণ্ডটির তাড়নায় সরস্বতীকে করেছেন নিজের অধীন। একালে একেবারে হালে বি. কম., আই. কমে.র সংখ্যাবৃদ্ধি সে সত্যটিকে একেবারে প্রকট ক'রে দিয়েছে। সে দিক দিয়ে সরস্বতী এখন লক্ষ্মীর রাজমহলে দাসীবাঁদী-সরবরাহের আড়কাটিতে পরিণত হয়েছেন। যাই হোক স্বল্প কয়েকজন সাধকের জীবনে একালে সেই প্রাচীন সারস্বত-তন্ত্রের নবজাগরণে আমি প্রত্যাশা করেছিলাম, এই দীক্ষাই নেব। দীক্ষার উপর তখন আমার একটা আকর্ষণ হয়েছিল, সে আমি পূর্বেই বলেছি।

আমি শুধু সাহিত্যসৃষ্টিই করতে চাই নি; আমি জানতে চেয়েছিলাম জন্ম-মৃত্যুর রহস্যকে—বায়োলজি এবং মেডিকেল সায়েন্সের পরও যা আছে তাই, তাকে অনুভব করতে চেয়েছিলাম। অন্তত মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েও চিত্তের আনন্দ অনুভবের শক্তি অর্জন করতে চেয়েছিলাম। সংযম নয়, ভয় সংবরণ নয়, আনন্দ-অনুভব-শক্তি, যা আজ নেই। নূতন কালের ভাবের ভাবুক কারও নেই। তাকে অর্জন করা যায় ব'লেই আমার আজও দৃঢ় বিশ্বাস। এ দীক্ষা দিতে পারতেন রবীন্দ্রনাথ। জীবনে তাঁর সাকার না হ'লেও নিরাকার একটি দেবতা ছিলেন। তিনি তাঁকে ধ্যান করেছেন নিত্য নিয়মিত; কিন্তু তাঁর কাছে যাওয়ার আমার সাহস ছিল না, পূর্বেই বলেছি। তাই মোহিতলালকে লিখলাম।

মোহিতলাল লিখলেন, "দীক্ষা লইয়া কি করিবেন? দীক্ষায় আমার নিজের কোনও বিশ্বাস নাই। আমার দীক্ষা সাহিত্যের দীক্ষা, সে মন্ত্র আপনি স্ফুরিত হয়। অন্তরে বীজ থাকিলে সাধনার উত্তাপে নিষ্ঠার অভিসিঞ্চনে সে বীজ আপনি উপ্ত হইবে, মন্ত্র-চৈতন্ত আপনি ঘটিবে।"

আমি মনে মনে বিষণ্ণ হলাম। এবং এ কথা আর কখনও তাঁর কাছে লিখি নি। উত্তরকালে শাক্তন্ত্র নিয়ে অনেক কথাই তিনি আমাকে লিখেছেন। শাক্তন্ত্রের প্রতি তাঁর একটা বিপুল আকর্ষণ ছিল। কিন্তু এ মন্ত্রে দীক্ষা নিতে তাঁর বাধা যেন কোথাও ছিল। সম্ভবত নূতন কালের ইউরোপীয় সাহিত্য-মাধ্যমে নাস্তিক্য-মতবাদের প্রভাবই ছিল সেই বাধা।

বাংলা দেশের কয়েকজন কবি—যাঁরা মোহিতলালের সমসাময়িক বা কিছু পূর্ববর্তী—তাঁদের জীবন দেখে মনে হয় এবং আমার দৃঢ়বিশ্বাসও ঘটে যে, মোহিতলাল যদি জীবনে দীক্ষা নিয়েই হোক বা না নিয়েই হোক কোন দেবতাকে অনুভব করতেন, নিত্য-নিয়মিত ধ্যান করতেন, তবে তাঁর কাব্যসৃষ্টির প্রতিভা প্রদীপ্ততর হয়ে উঠত। বর্তমানে বাংলা দেশের সর্বাগ্রজ কবি করুণানিধান, কবি কুমুদরঞ্জন, কবি কালিদাস

রায়কে দেখেই এই কথা বলছি। কথা বললেই এঁদের প্রসাদতৃপ্ত অন্তরের পরিচয় মেলে। মাত্র জ্ঞানযোগে সিদ্ধি অত্যন্ত কঠিন। সেখানে মধ্যপথে শূন্যবাদের মত্ততায় আচ্ছন্ন হওয়ার আশঙ্কা প্রবল। শূন্যবাদের মত্ততা মোহিতলালকে কোনদিন আচ্ছন্ন করে নি, তিনি জগৎ ও জীবনের বৈজ্ঞানিক নিয়মের মধ্যেও একটি নীতিকে আবিষ্কার করেছিলেন। তাকে তিনি জানতেন। মনে মনে মানতেনও। কিন্তু মনে মানা এক কথা এবং নিঃসংশয় বিশ্বাসে তার অনুশীলন আর এক কথা। কবি কুমুদরঞ্জন সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, "ইহার প্রধান লক্ষণ রূপপিপাসা।" অর্থাৎ কবি কুমুদরঞ্জনের বৈষ্ণবীয় দৃষ্টিভঙ্গি ও সৃষ্টির ধারার লক্ষণ। "ইহার ভগবান যিনি তিনি আর কিছুই নন, তিনি পরম সুন্দর; বিশ্বের বিরাট দেউলে সেই পরম সুন্দরই তৃণ হইতে তারকা পর্যন্ত সর্বত্র বিরাজ করিতেছেন। বেদান্ত যাহাকে ব্রহ্ম নাম দিয়াছে, যাহাকে সর্বত্রগ, সর্বব্যাপী ও সর্বময় বলিয়াছে।..." এ সম্পর্কে আলোচনা ক'রে শেষে তিনি নিজেই লিখেছেন, "ওই দেউল, ওই বিগ্রহ, ওই আরতির আনুষ্ঠানিক যাহা-কিছু সকলই সেই রূপপিপাসার শুধুই প্রতীক নয়, শুধুই রূপক নয়, কোন্ অর্থে (অর্থাৎ কোন্ দিক দিয়া) একেবারে একটা সাক্ষাৎ রূপ হইয়া উঠিয়াছে।"

মোহিতলাল শূন্যবাদী হ'লে কাব্যরসটুকু স্বীকার ক'রেও বক্রহাস্য হাসতেন। তা তিনি হাসেন নি। তিনি জ্ঞানবাদী হতে চেয়েছিলেন এবং কঠোর সাধনায় জ্ঞানযোগের শূন্যবাদের ধাপ অতিক্রমও করেছেন। কিন্তু বিশেষ ইষ্ট এবং সেই ইষ্টের সপ্রেম ধ্যান করেন নি। সেই কারণেই তাঁর জীবনের কঠোরতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে।

ইউরোপীয় ধারায় যাঁরা সাহিত্য সাধনা করেছেন, তাঁদের কথা আমি বলছি না। তাঁদের প্রকৃতির ধাতু আলাদা। তাঁদের একটি বড় দল এবং বড় ধারাও এ দেশে আছে। আজও পর্যন্ত "বীরবল" তাঁদের অগ্রণী। একালে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, সমর সেন প্রভৃতি সেই দলের ধারা টেনে চলেছেন। বুদ্ধদেবও এঁদের দলের।

এঁদের কথা যাক্। মোহিতলালের কথা এবং নিজের কথা বলি।

প্রথমে দীক্ষার কথাই বলি।

মোহিতলালের সঙ্গে এই পত্রালাপের পরও আমার গুরুসন্ধানে আমি ক্ষান্ত হই নি। অকস্মাৎ এক সন্ন্যাসীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হ'ল। তিনি তান্ত্রিক নন, বৈষ্ণব নন, খাঁটি যোগী—এবং সাগ্নিক তপস্বী। সন্ন্যাস গ্রহণের দিনে যে হোমকুণ্ড প্রজ্জ্বলিত ক'রে দীক্ষা নিয়েছিলেন সেই অগ্নিকে তিনি একমাত্র স্নান আহার ইত্যাদি জৈব-কৃত্যের সময় ছাড়া অহরহ স্পর্শ ক'রে থাকেন। এই লোকটিকে দেখে আমার দীক্ষা-গ্রহণের আকাঙ্ক্ষা আবার প্রবল হয়ে উঠল। আত্মসংবরণ করতে পারলাম না। প্রথম দিন প্রথম দর্শনেই তাঁকে প্রার্থনা জানালাম, বাবা, আমার চিত্ত বড় অশান্ত, দীক্ষার জন্য আমি ব্যাকুলতা অনুভব করি। আপনি আমাকে দীক্ষা দেবেন?

সন্ন্যাসী তখন দীর্ঘপথশ্রমে ক্লান্ত, সদ্য আসন গ্রহণ ক'রে তাঁর বহন-করা অগ্নি দিয়ে অগ্নিকুণ্ড প্রজ্জ্বলিত করছেন। তিনি উত্তর দিলেন, বাবা, সুধা রাখতে গেলে হিরণ্ময় পাত্র অর্থাৎ স্বর্ণপাত্রের প্রয়োজন হয়, মৃৎপাত্রে হয় না।

মনে কঠিন আঘাত পেলাম। কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা ক'রে 'নমো নারায়ণায়' ব'লে প্রণাম জানিয়ে চ'লে এলাম। এই প্রণাম-পদ্ধতির তুল্য অপরূপ প্রণাম-পদ্ধতি আর নেই। মানুষকে প্রণাম কেউ করে না। মানুষের অন্তরস্থ নারায়ণ অর্থাৎ দেবত্ব বা মহত্ত্বকে প্রণাম জানায়।

এর পর এই সন্ন্যাসীর সঙ্গে আমার এক অদৃশ্য দ্বন্দ্ব শুরু হ'ল। বিচিত্র সে দ্বন্দ্ব! সেই দ্বন্দ্বের শেষে সেই অদ্ভুত সন্ন্যাসী নিজে আমাকে বুকে টেনে নিয়ে ত্রুটি স্বীকার ক'রে আমাকে পরাজিত করলেন। সে পরাজয়ে যে আনন্দ, তার আস্বাদ আজও আমার অন্তরলোকে অমৃতের মতই অক্ষয় হয়ে আছে। তাঁর প্রসঙ্গ আমার জীবনকে ধন্য ক'রে দিয়েছে। সে অমৃতে সেদিন আমার সকল অশান্তির দাহ জুড়িয়ে গিয়েছিল।

তিনি আমাকে দীক্ষার কথায় বলেছিলেন, দীক্ষার জন্য অধীর হ'য়ো না। জীবনে যার সাধনা থাকে, তার গুরু আপনি আসেন। তোমার গুরু আসবেন। তোমার সাধনা তুমি ক'রে যাও। শুনেছি, তুমি জ্ঞানের সাধনা কর। তার সঙ্গে এই রকম কর্মের সাধনা কর। নইলে পূর্ণ হবে না সাধনা। আমি তখনকার মত গুরুর সন্ধানে বিরত হলাম। রত হলাম সাহিত্য-সাধনায়।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

কবি মোহিতলালের মহাপ্রয়াণে

১

স্বপ্ন-নীল জ্যোৎস্না রাতে যাহার সন্ধানে
বাহির হইয়াছিলে, হে কস্তুরী মৃগ,
বিহ্বল আপন গন্ধে উদ্বেলিত প্রাণে
কহ, কহ, অবশেষে, পেলে তারে কি গো?

প্রখর তপন-তাপে স্বপ্নের মঞ্জরী
ঝ'রে পড়েছিল জানি, রুক্ষ মরীচিকা
জেগেছিল পথ-প্রান্তে; যাহার বাঁশরী
তবু মুগ্ধ করেছিল কোন্ সে অলীকা?

কে সে, বন্ধু, যার লাগি কঙ্করে কণ্টকে
ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটেছিলে বিক্ষত চরণে,
তুচ্ছ করি শত্রু মিত্র স্তাবকে বঞ্চকে
পরিশ্রান্ত অবশেষে বন্দিলে মরণে।

বাহিরে ছিল না তাহা চেয়েছিলে যারে
হৃদয়-শোণিতাবর্তে ছিল তাহা হায়,
হৃদয় বিদীর্ণ করি পেতে হ'ল তারে
মৃগ সে মরিয়া গেল মৃগ-তৃষ্ণিকায়।

পুনরায় প্রশ্ন করি, হে অগ্রজ কবি,
দেখিলে কি অবশেষে, সে অদৃষ্ট-ছবি ?

২

সত্যের অনন্ত রূপ ঃ সন্ধানীর মন
আপনার মত করি পায় যে তাহারে,
প্রতি সন্ধানীর সত্য স্বকীয় সৃজন
তার মূল্য অন্তে বল কেবা দিতে পারে !

তোমার মানস-দৃষ্টি যাহারে ঘিরিয়া
আরতি করিয়াছিল সে সত্য তোমারি,
তারই অর্ঘ্য রচেছিলে মরম চিরিয়া
হে একক, একনিষ্ঠ, হে স্বতন্ত্রচারি !

রসের নিরিখে কিম্বা যশের নিরিখে
যে মূল্যই পেয়ে থাক, হে নিঃসঙ্গ কবি,
যে সত্য বিচিত্ররূপে মূর্ত দিকে দিকে
তারই মাঝে চিরন্তন তব সত্য ছবি।

তোমার আগ্রহ-ভরা ব্যগ্র ব্যাকুলতা
যে বাণীরে খুঁজেছিল প্রতি পলে পলে
সহ্য করি নিন্দা-গ্লানি হতাশা-ব্যর্থতা
সে বাণী হয়েছে মূর্ত ক্ষোভ-শতদলে।

সে বাণীর দেউলেতে সভয়ে এলাম
প্রণাম-প্রদীপটিরে রাখিয়া গেলাম।

"বনফুল"

বাগনানে-বড়িশায়

বহুদিন পূর্বের কথা, দুজনে বি. এন. আর.-এর একখানি কলিকাতাগামী ট্রেনের কক্ষে ব'সে আছি—আমি আর জেনারেল প্রিণ্টার্সে'র সুরেশবাবু। সমস্ত কক্ষটিতে মাত্র আমরা এই দুজন, তবু যে চুপ ক'রে আছি তার কারণ—একই অনুভূতির আবেগে মন আমাদের পূর্ণ। এক সময় দুজনের মধ্যে কে একজন বললাম, যেন তীর্থ ক'রে ফিরছি। এর পরেই ওই আলোচনাতে আমরা মুখর হয়ে উঠলাম, একেবারে শেষ পর্যন্ত চলল সে আলোচনা।

আমরা ফিরছি বাগনানে মোহিতবাবুর সঙ্গে দেখা ক'রে। স্টেশন থেকে নেমে খানিকটা ডান দিকে গিয়ে উন্মুক্ত পরিবেশের মধ্যে বেশ বড় একটি পুষ্করিণী, দীর্ঘিকা বলাও চলে, শ্যাওলা জ'মে আছে, তবু যে খুব খারাপ অবস্থা এমন নয়, একটু অসাধারণত্ব এই যে প্রচুর নীল রঙের কুমুদ রয়েছে ফুটে। এই পুষ্করিণীর ওপর দিয়ে চমৎকার একটি পুল, যতদূর মনে পড়ছে বাহারে লোহার রেলিং দেওয়া। পুল পেরিয়ে ওপারে টানা একটি দোতলা বাড়ি। স্টেশনের কাছাকাছি আর অন্য বাড়ি বিশেষ কিছু নেই, অন্তত তখন ছিল না। স্টেশন থেকেই আমরা এ হেন জায়গায় এমন একটি বাড়ি দেখে বিস্মিত হয়েই বাড়ির মালিকের রুচির যুগপৎ প্রশংসা এবং নিন্দা করতে করতে এগুচ্ছিলাম। একজন পথিককে প্রশ্ন ক'রে জানলাম—কবি মোহিতলাল মজুমদার এখানে ওই বাড়িটাতেই থাকেন। যত দূর মনে পড়ছে, শুনেছিলাম বাড়িটা কবির একজন ধনী ভক্তের, শরীর অসুস্থ ব'লে চেঞ্জের দরকার হওয়ায় তাঁরই অনুরোধে উনি এখন এখানে এসে রয়েছেন। বাড়ির মালিক অবশ্য এখানে থাকেন না। বাগনানে মোহিতবাবু আছেন, এই পর্যন্তই জানি। বেশ একটু নূতন লাগল, কবি-দর্শনের ব্যাপারটা যে এতখানি কাব্যময় হবে মোটেই আশা করি নি আমরা।

পুল পেরিয়ে আমবা বাড়ির সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। নীচের অংশটা খণ্ড খণ্ড ক'রে ভাড়া দেওয়া, পুলের সামনের অংশটাতে একজন

দোকান বসিয়েছে, তারই কাছে শুনলাম—মোহিতবাবু থাকেন ওপর-তলায়। পাশ দিয়েই সিঁড়ি উঠে গেছে, আমরা গিয়ে উপস্থিত হলাম।

চিঠি দিয়ে যাওয়া নয়। মোহিতবাবু একেবারে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন। মাঝারি সাইজের একটি ঘর, মাদুর পাতা, চারিদিকে বই ছড়ানো, কি লিখছেন, পাশের একটা র‍্যাকে বই ঠাসা। সমস্ত ঘরটার মধ্যে ঠিক অপরিচ্ছন্নতা না থাকলেও একাগ্র পরিশ্রমের একটা অবিন্যস্ত ভাব রয়েছেই, আমরা মাদুরের ওপর পাশাপাশি বসলাম।

দিনটি মনে গেঁথে আছে। ওপরতলা, তার চারিদিক খোলা, বড় বড় জানলা ঘরে, প্রচুর আলো প্রবেশ করছে, হু-হু ক'রে ঢুকছে মুক্ত বাতাস, সামনে সরোবর, তার একটু একপাশ ঘেঁষে কটিবন্ধের মত শৌখিন লোহার পুলটিরও আরও বাহার খুলেছে ওপর থেকে। আমাদের গল্প চলেছে। এতক্ষণ ধ'রে এত নিভৃতে ওঁর সঙ্গে কাটাবার অবসর আগে হয় নি আমার। এর আগে দেখা হয়েছে মাঝে মাঝে 'শনিবারের চিঠি'র ঘরে—লোকে ঠাসা, তর্কে-বিতর্কে উষ্ণ ছোট্ট ঘর, কিংবা সুরেশবাবুর আপিসে; আর পাঁচকথার মধ্যে একটু একান্ত হয়ে দু-চার কথা ক'য়ে নেওয়া। আজ মন খোলসা ক'রে চলল আলাপ।

সাহিত্য-সাধনার পথে উনি তখন মোড় ফিরেছেন, কবিতা প্রায় ছেড়েই দিয়েছেন, 'শনিবারের চিঠি'তে গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ বেরুচ্ছে একটার পর একটা—বাংলার নবযুগ বা নবযুগের বাংলা নিয়ে। দেশের ঐতিহ্যের পরিপ্রেক্ষিতে রাজনৈতিক আর সাহিত্যিক ক্রমবিকাশের আলোচনা এ রকম ভাবে পূর্বে বাংলা দেশে হয়েছে কি না আমার জানা নেই। স্টাইল এবং পদ্ধতিটা অবশ্য বঙ্কিমী, তবে এটা বেশ স্পষ্ট যে ইতিমধ্যে জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রেই উপাদানের যে বৃদ্ধি হয়েছে কতকটা সে সুযোগের জন্যে এবং কতকটা চিন্তারাজ্যের অগ্রগতির জন্যে, মোহিতলাল বঙ্কিম থেকে যেন আরও খানিকটা এগিয়ে সমালোচনা-সাহিত্যে একটা অভিনবত্ব এনেছেন। বেশ একটা সাড়া প'ড়ে গেছে।

স্বভাবতই ওঁর এই দিক-পরিবর্তনের কথাই উঠল, কেননা সাহিত্যে একটা নূতন সম্পদের আমদানি হ'লেও কবি মোহিতলালকে হারাবার আশঙ্কাটাও উঠেছে অনেকের মনে। আমাদের প্রশ্নের উত্তরটা কি দিয়েছিলেন ঠিক মনে নেই, তবে একটা কথা সেদিনকার আলাপে স্পষ্টই হয়ে উঠেছিল—এই যে প্রচণ্ড নূতন আবেগের স্রোত নেমেছে তা আর সব কিছুই দেবে ভাসিয়ে।

মোহিতলালের সঙ্গে যাঁর সাক্ষাতের সুযোগ হয়েছে তিনিই জানেন যে, ওঁর আলাপটা প্রায় হ'ত একতরফা। ইনি নিজের চিন্তায় এত আকণ্ঠ পূর্ণ হয়ে থাকতেন আর অনর্গল ব'কে যাবার এমন একটা ক্ষমতা ছিল যে, শ্রোতা আর বক্তা হবার অবসরই পেত না। এই অনর্গল বাক্য-স্রোতে সেদিন মোহিতলাল আমাদের তাঁর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কথা ব'লে গেলেন। সে যে কি বিরাট পরিকল্পনা, মোহিতবাবুর ক্ষমতার তখন কিছু কিছু পরিচয় পেয়েও সেদিন আমাদের আশ্চর্য ক'রে দিয়েছিল। তবে ঠিক স্তম্ভিত হই নি, অন্তত আমি হই নি, কেননা আজ বলতে সঙ্কোচ নেই, উনি যে সত্যি ওঁর পরিকল্পনা কাজে পরিণত করতে পারবেন এটা অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করতে পারি নি। তার কারণ কতকটা পরিকল্পনার গুরুত্ব তো বটেই; কিন্তু আসল কারণ তাঁর অসুস্থতা। হার্ট বেশ দুর্বল, যতদূর মনে পড়ছে হাত-পাও ফুলতে আরম্ভ হয়েছে দেখেছিলাম; এ অবস্থায় এমন সব সাহিত্যিক প্ল্যান কাজে পরিণত করা, যা শুধু কাব্যরচনার মত ভাব আর চিন্তার ব্যাপারই নয়, পরন্তু সুগভীর অধ্যয়নসাপেক্ষ, এটা খুব সম্ভব ব'লে মনে করতে পারি নি। এই ছিল বাস্তবপক্ষে আমার প্রথম দিনের সাক্ষাৎকার।

সেদিন ওঁর প্ল্যান সম্বন্ধে একটু সন্দেহ নিয়েই যে ফিরেছিলাম, তার কারণ মোহিতলালের সাধনা যে কী বস্তু, তার পরিচয় পূর্ণভাবে পাই নি তখনও। সেটা পরে পেয়েছিলাম তিনি যখন তাঁর বড়িশার বাসায় এসেছেন। তখন শুধু সাধনারই পরিচয়ই নয়, সিদ্ধিরও। সাধনার জায়গাটিও অনেক কথা মনে করিয়ে দেয়। সত্যই যেন

একটি তাপসের আশ্রম। ডায়মণ্ডহারবার রোড ছেড়ে যতই ভেতরের দিকে এগুনো যায়, বড়িশার লোকালয় আসে জনবিরল হয়ে। বাস-লরির আওয়াজ যখন আর একেবারেই কানে আসছে না, প্রায় মাইলখানেক এসে পড়া গেছে,—তেমাথায় এক শীতলাতলা, একটা বেশ বড় অশত্থগাছের নীচে। নিবিড় গাছপালা, তার পর এই দেবস্থান, মনে হবে যেন সেই বাংলার মাঝখানটিতে হঠাৎ এসে পড়েছি, মোহিতলাল যাকে এত অন্তর দিয়ে বেসেছেন ভাল। ডাইনের রাস্তা ধ'রে এগুতে এগুতে ক্রমেই আরও ঘন গাছপালা, এক দিকটায় বড় বড় বাগানের মধ্যে বাড়ি, এক-আধটাতে হয়তো আছে লোক; বাঁয়ে ডোবা, বাঁশঝাড়, কচিৎ দু-একখানা নিম্নশ্রেণীর গৃহস্থের বাড়ি, চোখে পড়বে—কোন বর্ষীয়সী বাঁশঝাড়ের নীচে আনারসের বনে হেঁট হয়ে ফল তদারক ক'রে বেড়াচ্ছে, কোন দাওয়ায় একটি শিশু খেলার সরঞ্জাম নিয়ে ঘর পেতেছে, কোন ডোবার রানা বেয়ে তরুণী উঠছে কাপড় কেচে কিংবা থালা মেজে। আরও এগিয়ে যেতে হবে; অরণ্য আরও ঘন, লোকচলাচল খুবই অল্প ব'লে বহুদিন পূর্বে কবে রচিত ইটের রাস্তায় সবুজ ছাতলা ধরেছে। তবুও ম্যুনিসিপালিটি, তবুও রাস্তার নাম কৈলাস ঘোষ রোড। মাঝামাঝি এসে, বেশি নয়, ডায়মণ্ডহারবার রোড থেকে হদ্দ মাইল দেড়েক, ডান দিকে কবির বাসা। গেটের ভেতর ঢুকে বাঁ দিকে একটি ছোট পুকুর, ওপারে বাঁধানো ঘাট, চারিদিক থেকে নানা রকম গাছ পড়েছে ঝুঁকে; বাঁ দিকে বাগান—আম নারকেল, আমের ডালে অরকিড (orchid) ঝুলছে। সোজা রাস্তায় কয়েক পা গিয়েই বাড়িটা। বেশ পাকা বাড়ি, উঁচু রক। পুকুরের কোণে একটা কাঁটালীচাঁপার ঝাড়।

বাগনান থেকে এসে মোহিতলাল বোধ হয় মাত্র অল্প দিনের জন্য অন্য দু-এক জায়গায় ছিলেন, তার পর শেষজীবন পর্যন্ত এইখানেই কাটিয়ে গেছেন। উত্তরজীবনের তাঁর যা কিছু সাহিত্যকৃতি তা এইখান থেকে। মাত্র অল্প কয়েকটা বছরের মধ্যে প্রায় বরাবরই

অসুস্থ থেকে এই নৈমিষ থেকে যা উনি সৃষ্টি ক'রে গেছেন তা যেমনই আকারে বিপুল তেমনই ভাব-সম্পদে গভীর। ওঁর পরিকল্পনার কথা শুনে বাগনানে সেদিন যদি বিস্মিত হয়ে থাকি তো সৃষ্টি দেখে যে কতটা বিস্মিত হয়েছি ব'লে ওঠা যায় না। তার কারণ উনি আমাদের যা যা বলেছিলেন, এক আধুনিক কয়েক জন লেখকের শ্রেষ্ঠ-গল্প-সঞ্চয়ন ছাড়া, তার সব কিছুই মূর্ত ক'রে তো গেছেনই, বরং সে সবকেও ছাড়িয়ে গেছে তাঁর সৃষ্টি। শুধু তাই নয়, যতই সৃষ্টি ক'রে চলেছেন, ততই আরও নব নব সৃষ্টির উন্মাদনায় পেয়ে বসেছে তাঁকে, অতন্দ্রিত সাধনায় ক্রমাগতই সিদ্ধির পথে এগিয়ে গেছেন।

যতই দিন যাচ্ছিল, বড়িশার এই জায়গাটি সাহিত্যিকদের তীর্থ হয়ে উঠছিল। উত্তরকালে নানা কারণে যাঁদের সঙ্গে ওঁর কিছু কিছু মতভেদ হয়েছে, তাঁরাও ওঁর একটা জিনিসকে অন্তর দিয়ে শ্রদ্ধা ক'রে গেছেনই—ওঁর সাহিত্যিক নিষ্ঠা। তা ভিন্ন বর্তমান সাহিত্যিকদের প্রায় সকলেরই উনি বয়োজ্যেষ্ঠ। এই দুইয়ে মিলিয়ে, বাইরের সম্বন্ধটা যাই থাক্, ওঁর আসনপীঠ কারও শ্রদ্ধা থেকে বঞ্চিত হয় নি।

আমার সঙ্গে এইখানেই ওঁর পরিচয় গাঢ় হয়ে ওঠে আরও। কলকাতায় গেলেই একবার ক'রে হাজরি দেওয়া নিয়মে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল, নইলে মনে স্বস্তি তো পেতামই না, ওঁরও অনুযোগের সীমা থাকত না। সংলাপের স্মৃতিগুলো বড় মধুর, যদিও এক হিসাবে বলতে গেলে বৈচিত্র্যহীন; কেননা আলোচনা সেই এক রাস্তা ধ'রে প্রায় একভাবেই চলত। না হয়ে উপায় ছিল না, তার কারণ দেখেছি একটি মাত্র চিন্তাই ওঁর মনকে নিরবশেষভাবে আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছিল—বাংলা। এর কৃষ্টি, এর সাহিত্য, এর রাজনীতি। পাগল হয়ে যেতেন, যখন সর্বক্ষেত্রেই বাংলার দুর্দশার কথা বলতে আরম্ভ করতেন—অবশ্য ওঁর নিজের দৃষ্টিকোণ অনুযায়ী, বিশেষ ক'রে ভ্রান্ত এবং হৃদয়হীন দেশবিভাগের বিষময় ফলস্বরূপ যে দুর্দশাটা দাঁড়াল—এই নিয়ে ওঁর মতটা কত উগ্র ছিল, যাঁরা 'বঙ্গদর্শন' পড়েছেন তাঁরা জানেন।

প্রায় একমত দুজনেরই। অনর্গল ব'লে যাচ্ছেন, শুনে যাচ্ছি। যেখানটায় মিলত না, টুকতাম, অবশ্য মোলায়েম ক'রেই। ওঁর ধাত জানা ছিল, তা ভিন্ন রাজনৈতিক বা সাহিত্যিক বিতণ্ডা করবার জন্যেই কিছু যাই নি আমি। হেসে ফেলতেন, হঠাৎ নরম হয়ে গিয়ে বলতেন, "না, আপনি বোঝেন না, অবশ্য আমার ব্লাড-প্রেসার আছে, রক্ত মাথায় চ'ড়ে যায়, কিন্তু প্রত্যেক কথা যা বলছি তার প্রমাণ সংগ্রহ করা আছে আমার, গোড়া থেকেই ওদের পলিটিক্স আমি ফলো ক'রে যাচ্ছি। আমি লিখে রেখে যাব, সবাই যে এদের ভাঁওতায় ভোলে নি, ফিউচার এ কথা জানবে…"

ওঁর বক্তৃতার (বক্তৃতাই বলি) এইটে ছিল মাধুর্য, এই হঠাৎ একটু হেসে নরম হয়ে যাওয়া; কখনও টুকে দেওয়ার ওপর, কখনও নিজে হতেই—হঠাৎ যেন সাড় হয়েছে, বড় একতরফা হয়ে যাচ্ছে আর বড় উগ্র। বলতেন, না, নিজের কথাই পাঁচকাহন করছি। আপনাদের খবর বলুন ওদিককার।

বেশি দূর এগুতে হ'ত না, বাংলার দুঃখ যে ওঁকে পেয়ে বসেছে! তুচ্ছ রাজনীতি গিয়ে ঘুরে ফিরে সাহিত্যের হ'ত অবতারণা।

শুধু আমার কথাই নয়, আর সবাইয়ের মুখেও শুনেছি, আসতে দিতে চাইতেন না।

ন-মাস ছ-মাসে আসবেন, তাও রিক্শওলাকে ধ'রে রাখবেন! ছেড়ে দিন ওকে; আনিয়ে দোব রিক্শ।

যেতে হবে যে সেই বোটানিক্যাল গার্ডেন।

যখনই যাই, হয়েই যেত প্রায় সন্ধ্যা। শেষের দিকে রিক্শকে বিদায় ক'রেই দিতাম।

সবশেষ যে দেখা—এই সেদিন, গত ২৩শে জুন—সেদিন যাইও নি রিক্শ ক'রে, অর্থাৎ তীর্থযাত্রাটা সম্পূর্ণ পদব্রজেই হয়েছিল। এই দিনটিতে দৈবক্রমেই যেন আমাদের আলাপটা সাহিত্য ঘেঁষেই চলল

বেশি। সুতরাং আমি আলোচনায় অংশ নেবার সুযোগ পাওয়ায় জ'মে উঠল কথাবার্তা। এর আগেরবার গিয়ে দেখা পাই নি, উনি কলকাতায় চ'লে এসেছিলেন; কাজেই মাঝখানে প্রায় মাস ছয়েকের ব্যবধান প'ড়ে গেছে। কথাও জমেছে অনেক, উভয়তই।

প্রসঙ্গক্রমে 'শ্রীকান্তের শরৎচন্দ্রে'র কথা উঠল, আমিই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে তুললাম, কেননা ওইখানাই ছিল শেষ বই, যা ওঁর হাত থেকে পেয়েছি।

প্রসঙ্গটা তুলেই আমি উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিলাম। বললাম, আমি যতটা বুঝেছি সমালোচনা-সাহিত্যে এইটিই আপনার মাস্টারপীস—ভালবাসাকে এত দিক দিয়ে দেখা, এ রকম সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ আর কোথাও চোখে পড়েছে ব'লে মনে তো হয় না—একজনের প্রত্যক্ষ উপলব্ধি, একজনের পরোক্ষ; এই বইটিতে দুটি কবিতে যেন একত্র হয়েছেন আপনারা।

ওঁর সাহিত্য-সৃষ্টি গভীরভাবে উপভোগ করেছি; কিন্তু সাক্ষাতে বেশি কম্‌প্লিমেণ্ট দিতে যেন কোথায় বাধত ব'লে দিই নি কখনও। আমার নিতান্তই অন্তরের বিশ্বাসটা যে সেদিন কি ভাবের ঘোরে ফেলেছিলাম ব্যক্ত ক'রে, চিরদিনের জন্যে একটা সান্ত্বনা র'য়ে গেছে।

ঠিক এ ধরনের দীপ্তি এর পূর্বে কখনও দেখি নি ওঁর মুখে, সত্যিই যেন একটি আলো ফুটে উঠল। বললেন, আপনারও এই মত? শুনে বড় আনন্দ হ'ল।

এটা ওঠবার সময়কার কথা। 'শ্রীকান্তের শরৎচন্দ্রে'র আলোচনা মুখে ক'রেই বেরিয়ে এলাম আমরা। ওঁর আনন্দের মধ্যে দিয়ে হঠাৎ অনুভব করছি—দুজন নয়, আমরা তিনজনে হয়ে গেছি একত্র—একজন কবি না হয়েও।

বর্ষার বিষণ্ণ সন্ধ্যা। পায়ে হেঁটে ফিরছি। আবার কবে দেখা হবে…এত অসুস্থ…হবে কি দেখা আবার?…

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

সত্যসুন্দর মোহিতলাল

মোহিতলালের উদ্দেশে আমার পূজা-প্রণোদিত প্রণাম নিবেদন করি। প্রথম যৌবনে তিনি আমাদের কাছে সুন্দরের প্রতিমূর্তিরূপে প্রতিভাত ছিলেন—ভক্তি-ভালবাসার উচ্ছ্বাসে তাঁকে অর্ঘ্য দিয়েছি মনে মনে। মধ্যাহ্নে দেখেছি তাঁর নিদারুণ কঠোরতা—মধুর তখন দেখা দিয়েছিলেন নিষ্ঠুররূপে। কিন্তু তাঁর সেই দীপ্তি মুক্তকৃপাণ কৃপাহীন সত্যের দীপ্তি, তাঁর বীর্যবত্তার কাঠিন্য। দূরে স'রে দাঁড়িয়ে সেই দারুনিরুদ্ধবীর্য অনলশিখাকে শ্রদ্ধা করেছি মনে মনে। সমস্ত ধূমাঙ্কিত ক্লিন্নতার ঊর্ধ্বে বিরাজমান দেখেছি সেই দীপপ্রভা। শ্রীমদ্ভাগবতের সেই কথাই বারে বারে মনে পড়েছে, 'তেজীয়সাং ন দোষায় বহ্নেঃ সর্বভুজো যথা।' তার পর তাঁর শেষ-জীবনে যখন আবার তাঁকে দেখলাম, দেখলাম দীপ্তচক্ষু জ্ঞানদগ্ধদেহ এক সন্ন্যাসী ব'সে আছেন, তাঁর বাহ্যিক কার্কশ্যের অন্তরালে বৈরাগ্যের নির্মল শান্তি ব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে। আবার তাঁর পায়ে প্রণতি রাখলাম। তৃষাবিদীর্ণ মাঠের অন্তরে দেখলাম, শুভ্রস্রোত স্নেহফল্গু, কাঠিন্যের অন্তরালে দেখলাম সৌশীল্যকারুণ্য। সত্য সত্যই দেখলাম সত্যসুন্দরকে।

এই প্রসঙ্গে, কিছুকাল পূর্বে, 'কল্লোলযুগ' প'ড়ে তিনি আমাকে যে চিঠি লিখেছিলেন, তার কিয়দংশ উদ্ধৃত করি :

"বহুদিন আমি আপনাদের কোন সংবাদ পাই নাই—আমার সংবাদও আপনারা রাখেন না। আমি ইহলোকেই পরলোকবাসী হইয়াছি। আপনার মনে আমার প্রতি আপনার সেই পুরাতন শ্রদ্ধা এখনো অটুট আছে দেখিয়া বুঝিলাম—আমার মধ্যে যাহা সত্য তাহাকে আপনি ভুল করেন নাই, মানুষ-আমি যেমনই হই। সত্যের প্রতি এই শ্রদ্ধা সব চেয়ে বড় সম্পদ—আপনি ভাগ্যবান।

"আমি এক্ষণে আমার জীবনের শেষ দেনা পরিশোধের চেষ্টা করিতেছি। সকল দিকে এত নিরাশ হইয়াছি এবং দেহ-মন এত ভাঙিয়া পড়িয়াছে যে জন্মান্তরের অপরিমেয় ঋণ এবারেও শোধ করিতে বোধ হয় পারিলাম না। এ জীবনেও অনেক ঋণ করিয়াছি—বহু

বান্ধব বিমুখ হইয়াছে—সেই হৃদয়ঘটিত দেনা-পাওনার দেনাটাই বাড়িয়া উঠিয়াছে। তাই এখন আমি এই নির্বান্ধব বনবাসে শেষ কয়টা দিন কাটাইতেছি।

"আপনার 'কল্লোলযুগ' আমাকে একজন দেখাইয়াছিল, তাহাতে আমি আপনার হৃদয়ের সরলতা ও সহজ-বিশ্বাসের পরিচয় পাইলাম। আপনি ছোট-বড় সকলকে শ্রদ্ধা করিয়াছেন: এই শ্রদ্ধাশীলতাই আপনার চরিত্রের একটি মহৎ গুণ। কিন্তু সাহিত্যের ও সাহিত্যিকের সম্বন্ধে আর একটু critical হইতে পারিলে ভাল হইত। বইখানি সুপাঠ্য হইয়াছে। আমার সহিত নজরুলের পরিচয় ও তাহার সহিত যে সম্বন্ধ দাঁড়াইয়াছিল তাহার একটা মোটামুটি সত্য বিবরণ আপনিই বোধ হয় সর্বপ্রথম প্রকাশ করিলেন। ওই বিষয় এ পর্যন্ত কেহ কিছু জানে না; তার কারণ আমি চিরদিনই নিজের সম্বন্ধে নির্মম, কখনো আমার কোন কৃতিত্ব বা কোন শুভচেষ্টার ঘোষণা করি নাই। নজরুল সম্বন্ধে আমি যে কঠিন মৌনব্রত অবলম্বন করিয়াছি তাহার একাধিক কারণ আছে; আমার জীবনে ওইটাই প্রথম বড় shock—তাহার পরিমাণ বা গভীরতা অন্যে বুঝিবে না। যদি আমার 'স্মৃতিকথা' লিখিয়া যাইতে পারি, তবে তাহার একটা বড় অধ্যায় হইবে ওই কাহিনী। আপনি যাহা লিখিয়াছেন তাহার অধিকাংশই শোনা কথা—কয়েকটি বড় ভুলও আছে; তাই ভাবিয়াছিলাম, যখন কথাটা আপনি এখন প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন, তখন আর চুপ করিয়া থাকা উচিত নয়, আমার কর্তব্য আপনার অজ্ঞানকৃত ভুল সংশোধন করিয়া দেওয়া। তথাপি আপনি যে কয়েকটি সত্য ও তথ্য নানা জনের নানা কথা হইতে উদ্ধার করিয়া নিজের বিচারশক্তি ও সত্যনিষ্ঠার বলে এমন করিয়া সকলের সম্মুখে ধরিতে পারিয়াছেন, তাহাতে আপনি একটি বিশেষ গৌরবের অধিকারী হইয়াছেন। এ কালে আত্মপ্রচার ও মিথ্যা রটনা এত বাড়িয়াছে যে যেখানে যেটুকু সত্যজিজ্ঞাসা ও সত্যনিষ্ঠা আছে তাহার গৌরব আরও বেশি।...

"অনেক লিখিয়া ফেলিলাম, আশা করি এমন কিছু লিখি নাই যাহাতে আপনি ক্ষুণ্ণ হন। আমার সাহিত্যিক আদর্শ ও মতামত চিরদিন কিছু কঠোর তাহা আপনি জানেন; কিন্তু সাহিত্যিকের প্রতি নির্মম হইলেও, আমি 'মানুষের' প্রতি কখনই শ্রদ্ধাহীন হই নাই। জীবনে এত আপশোষ রহিল যে সেই 'মানুষ' খুঁজিতে গিয়া এবং বিশ্বাস করিয়া বড় ঠকিয়াছি—বার বার আঘাত পাইয়াছি। আপনার ভিতরে একটু সেই বস্তুর পরিচয় পাইয়া এত কথা লিখিতে উৎসাহ হইল।

"আমার প্রীতিপূর্ণ নমস্কার ও স্নেহালিঙ্গন জানিবেন। ইতি।"

এই পত্রই বহন ক'রে আনছে সত্যসুন্দরের স্বর্ণস্বাক্ষর।

শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

বাঙালী মোহিতলাল

ইন্দ্রপাত হয়েছে। রবীন্দ্রোত্তর বাংলা-সাহিত্য এবং নেতাজী-বিহীন বাংলা দেশ আরও দরিদ্র হ'ল। উনবিংশ শতকে বাঙালী নামে আত্মসচেতন উদার সংস্কৃতিবান বলিষ্ঠ স্পষ্টবাক্ এক জাতি ছিল, তার শেষ বংশধর বিগত হলেন।

রবীন্দ্রনাথের প্রদীপ্ত স্বর্ণচ্ছটার মধ্যে মোহিতলাল স্বকীয়তায় সমুজ্জল। প্রগাঢ় রসাবেশ, প্রখর অনুভাবনা, বিষয়ানুপ্রবেশে অতুল মনস্বিতা, ব্যঞ্জনার অভিনবত্ব—সমস্ত মিলে তাঁর কালজয়ী পরমাশ্চর্য সাহিত্যকর্ম। রসিকজন তার যোগ্য মূল্য নিরূপণ করবেন। আমরা যেদিন কেউ থাকব না—সাহিত্যপ্রেমী উত্তরপুরুষদের নবীন উপলব্ধিতে তাঁর কাব্য নব নব মহিমায় অনুরঞ্জিত হবে, বারম্বার বহু বিচিত্র রূপে কবি মোহিতলাল সমুদিত হবেন তাদের চিৎ-কমলে। সেজন্য কিছু ভাবি নে। দুঃখ শুধু, জ্যোতির্লোকের এই মানুষটিকে ধরিত্রীর ধূলায় আমাদের মধ্যে আর কোনদিন পাব না।

প্রাণ ভ'রে ভালবাসতেন বাংলা দেশ আর বাঙালী জাতিকে। ভালবাসা বললে যথেষ্ট হ'ল না, সাহিত্য আর জাতি ছিল তাঁর জীবন,

ধ্যান-জ্ঞান, ইহকাল-পরকাল—সর্বস্ব। আর কোন কামনা ছিল না, ধন, মান, প্রতিষ্ঠা—কিছুই চিনলেন না জীবনে। সাহিত্য ও সমাজ সম্পর্কে যে কেউ ভণ্ডামি বা কোন ক্ষতিকর কাজ করেছে, সে তাঁর ঘৃণ্যতম শত্রু। যত বড় প্রভাব ও শক্তিধারী হোক না কেন, নিস্তার ছিল না তাঁর হাতে। কাপালিক সন্ন্যাসীর নিষ্ঠুরতম খড়্গ আপতিত হ'ত তার উপর। প্রেমের একনিষ্ঠতায় ভুল বুঝেছেন হয়তো অনেককে—অকারণে সন্দেহ করেছেন; কিন্তু ওই প্রেম তাঁকে মহিমাভাস্বর করেছে। সত্য আর সুন্দরের পূজারী—এ ছাড়া আর কোথাও কখনও মাথা নোয়ান নি। নিজের নাম নিয়েছিলেন তাই 'সত্যসুন্দর দাস'।

সাহিত্য তাঁর তপস্যা। এই তপস্যা-মন্দিরে কণামাত্র অশুচিস্পর্শ না লাগে—এই ছিল তাঁর জীবনপণ। এইজন্যই 'দণ্ডপাণি সাহিত্যিক' বিশেষণে অভিহিত করেছেন কেউ কেউ। কিন্তু অমৃতনিষেকে সাহিত্যপ্রাণতা উদ্বুদ্ধ করেছেন কত ক্ষেত্রে, কজনে তার খবর রাখে? আমি একজন সাক্ষী। অপ্রত্যাশিতভাবে একদা তাঁর কাছ থেকে নির্মম অবিচার পেলাম কঠিন এক চিঠির মারফতে। কোন খ্যাতনামা সাহিত্যিকের উপর তিনি বিরক্ত হয়েছিলেন, তাঁর ধারণা—আমিও সেই সূত্রে জড়িত। দীর্ঘদিন চলল এমনই ভাবে। আমার প্রতি তিনি অতিমাত্রায় বিরূপ—এই জেনে ব'সে আছি। যক্ষ্মারোগগ্রস্ত আমার এক স্নেহাস্পদ তরুণ সুদূরবর্তী স্যানিটোরিয়াম থেকে চিঠিতে জানালেন, শরৎচন্দ্রের উপন্যাস বিশ্লেষণ উপলক্ষে মোহিতলাল আমার কয়েকটি লেখার ধারণাতীত অভিনন্দন জানিয়েছেন। সে সংখ্যাটি দেখি নি, পত্রে উদ্ধৃত কথাগুলিই কেবল জানি। ভালবাসায়-অন্ধ আমার অতি-বড় বন্ধুও অত বেশি বলতে পারতেন না আমার সম্বন্ধে। এই ব্যাপারে অনেকের ধারণা, তাঁর সঙ্গে আমার বুঝি অত্যধিক ঘনিষ্ঠতা ছিল। কিন্তু সাহিত্য-বিচারে ব্যক্তিগত পরিচয় এবং ক্রোধ-দুঃখ মান-অভিমান একেবারে বাহুল্য ছিল তাঁর কাছে। বড়িশার বাড়িতে সবসুদ্ধ আমি তিন-চারবারের বেশি যাই নি।

শিক্ষণ-ব্যাপারেও তিনি নতুন ঐতিহ্য সৃষ্টি করেছেন। অবহেলিত বাংলা-সাহিত্য নতুন মর্যাদা পেয়েছে। ঢাকার প্রাক্তন ছাত্রদের কাছে শুনেছি এবং এখানে বঙ্গবাসী কলেজে তার পরিচয় প্রত্যক্ষ করেছি। যারা ছাত্র নয়, তারাও ভিড় করত পাঠনা শুনতে। সাহিত্য ও জাতির প্রতি তাঁর সীমাহীন প্রীতি অতি সহজে সংক্রমিত হ'ত শ্রোতৃবর্গের মধ্যে। বড়িশার বাড়িতেও সেই অনুভূতি হয়েছে, ফেরবার সময় অপরূপ আত্মবিশ্বাস ও সাহিত্যপ্রেমে ভরপুর হয়ে আসতাম। শেষবার গিয়েছিলাম মাস তিনেক আগে। ঢাকার ভাষা-আন্দোলনের কথা উঠল। বলেছিলাম, আমাদের বঙ্কিম-রবীন্দ্রের গর্ব ভেঙে দিল ঢাকার ছেলেরা; রক্তের মূল্যে তারা বাংলা-ভাষা ও বাংলা-সাহিত্যের উপর দাবি প্রতিষ্ঠা করেছে। মোহিতলাল বললেন, সমস্ত বিভেদের মধ্যে ওই আশা—বাংলা-সাহিত্য সম্পর্কে তাদের বিপুল উন্মাদনা; তোমারে মারিবে যে, গোকুলে বাড়িছে সে—অনেক আগে বলেছিলাম এ কথা; সাম্প্রদায়িকতার সবচেয়ে বড় প্রতিষেধক, তরুণদের বাংলা-ভাষা-প্রীতি। আর এই ভাষা ও সাহিত্য-প্রীতির মূলে মোহিতলালের সুদীর্ঘ শিক্ষণ-সাধনা নিঃসংশয়ে অমোঘ শক্তি সঞ্চার করেছে।

শ্রীমনোজ বসু

শেষযাত্রা

১

দুয়ারে প্রস্তুত গাড়ি, বেলা দ্বিপ্রহর—
কবিও অবশেষে মনে মনে প্রস্তুত হলেন।
প্রেসিডেন্সি জেনারেল হাসপাতালে পাঠানোই স্থির হ'ল।

সর্বনাশের সূত্রপাত হয় ১০ই জুলাই বৃহস্পতিবার দুপুরে। হঠাৎ পেটে ও বুকে অসহ্য যন্ত্রণা হতে থাকে। তার আগে কদিন

অমানুষিক পরিশ্রম গেছে। চারদিন পেট পরিষ্কার হয় নি, সেদিকে খেয়ালই ছিল না। খেয়াল হ'ল যখন, তখন হৃদ্‌যন্ত্র মারাত্মকভাবে জখম হয়ে পড়েছে। পারিবারিক ডাক্তার গুপ্তকে ডাকা হ'ল। এ অবস্থায় তিনি সাহস ক'রে চরম ব্যবস্থাই অবলম্বন করলেন। মরফিন্ ইন্‌জেক্‌শন দিলেন। তাতে আকস্মিক অভিঘাতকে ঠেকিয়ে রাখা গেল বটে, কিন্তু বিপদ কাটল না। আক্রমণের আগে ব্লাডপ্রেসার ছিল একশো সত্তর। ধাঁ ক'রে তা উঠেছিল দুশো দশে। কিন্তু ডাক্তার সত্যকার ভয় পেলেন, যখন প্রেসার সেই তুঙ্গশিখর থেকে অনিবার্য বেগে নিম্নমুখে ধাবিত হ'ল। একশো ষাট, পঞ্চাশ, চল্লিশ, পঁয়ত্রিশ, ত্রিশ। ওষুধে ইন্‌জেক্‌শনে এই ভয়াবহ নিম্নগতি কিছুতেই রোধ করা যাচ্ছে না। ডাক্তার গুপ্ত শুধু ডাক্তারই নন, আত্মীয় এবং পরিবারের অকৃত্রিম শুভৈষী। যথাসাধ্য তিনি করেছেন। কিন্তু এবার একজন্ বিশেষজ্ঞের পরামর্শ অত্যাবশ্যক ব'লে জানালেন। আশঙ্কার কথা তিনি গোপন করলেন না।

পরিবারের বাইরে অনুরাগী ও অন্তরঙ্গ মহলে প্রথম এই বিপদের খবর এল শনিবার। "সংস্কৃতি-ভবনে" সেদিন মোহিতলালের ক্লাস নেবার কথা। বরাবর ঘড়ির কাঁটার মত কর্তব্যপরায়ণ। প্রথম দিন থেকে শুরু ক'রে একদিনও অনুপস্থিত নেই। সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেল দেখে চিন্তিত হলাম। এমন সময় মুখে দুশ্চিন্তার ছায়া নিয়ে ঘরে ঢুকলেন মথুর ভায়া—অধ্যাপক মথুরেন্দ্রনাথ নন্দী, মোহিতলালের প্রিয় শিষ্য ও শেষজীবনের অন্তরঙ্গতম অনুষঙ্গী। ছেলেরা 'বড়দা' ব'লে ডাকে। পরিবারের দুঃখে সুখে প্রিয়ছাত্র গুরুর জ্যেষ্ঠপুত্রের স্থান নিয়েছেন। সণ্টুর লেখা চিঠি দেখালেন—বাবা হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, তাঁকে কিছুতেই সামলানো যাচ্ছে না; আপনি পত্রপাঠ চ'লে আসুন। চিঠিতে অসুখের বিবরণ কিছুটা দেওয়া ছিল। তাঁকে তখনই পাঠিয়ে দিলাম। বললাম, পৌঁছেই যেন খবর দেন, কেমন আছেন তিনি।

উৎকণ্ঠিত উদ্বেগে কাটল শনিবারের সারারাত। মথুর রাতটা

কবির কাছেই র'য়ে গেলেন। আমার কাছে তাঁর লেখা চিঠি যখন পৌঁছল, তখন রবিবারের বিকেল অনেক দূর গড়িয়ে পড়েছে। এক পৃষ্ঠা চিঠি। গুছিয়ে লেখা কথাগুলোর বুকে একটা অজানা ভয়ের কানাকানি শুনতে পেলাম। মথুর লিখছেন, ডাক্তার গুপ্ত একজন হৃদ্‌রোগ-বিশারদকে অবিলম্বে দেখাবার কথা বিশেষভাবে বলছেন। কিন্তু—

সাহিত্য-সাধকের সেই চিরকালের 'কিন্তু'—'আসলে একেবারে শূন্য।' বাণীর বরপুত্র যাঁরা, এ শূন্য তো তাঁদের কোনদিনই পূর্ণ হবার নয়। তা ব'লে কি প্রয়োজনীয় চিকিৎসাটুকুও হবে না?

ছুটে গেলাম। মহানগরীর দক্ষিণ উপকণ্ঠ। বেহালা পেরিয়ে ডায়মণ্ডহারবার রোড ধ'রে শখের বাজার। সেখান থেকে পূব দিকে মাইল খানেক গাঁয়ের পথে বোড়শের কৈলাস ঘোষের বাগান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অবসর গ্রহণের পর কয়েক বছর বাগনানে কাটিয়ে এখানেই কবি শেষ বাসা বেঁধেছিলেন। জীর্ণ দোতলা বাড়ি। নিঃসঙ্গ নির্জন। প্রায়ই বলতেন, আমি তো শ্মশানবাসী। শ্মশানই বটে! বাংলার মহাশ্মশানে ব'সে যিনি শবসাধনার ব্রত নিয়েছিলেন, এ তাঁরই উপযুক্ত বাসগৃহ।

দোতলায় একখানি মাত্র ঘর। মেজের উপর মাদুরের বিছানায় কবি অর্ধশায়িত। দেখলাম, শ্মশানের বুকে শেষ প্রাণের শিখা মিটুমিটু ক'রে জ্বলছে।

পরামর্শ ক'রে স্থির হ'ল, ডাক্তার হিমাংশু রায় এম. ডি.কে ডাকা হবে। কলকাতা ফিরে তাঁর সঙ্গে দেখা করলাম। কথাবার্তা ব'লে সম্ভাব্য দক্ষিণার সসঙ্কোচ ইঙ্গিত করতেই তিনি বললেন, সেজন্যে আপনারা বিশেষ ভাববেন না, মোহিতলালের আমিও একজন ভক্ত।

সোমবার সকালে তাঁকে নিয়ে যাবার কথা ছিল। কিন্তু সেদিন ভোরে কলকাতার বুকে চেরাপুঞ্জীর বর্ষা নামল। মঙ্গলবার তাঁকে নিয়ে

গেলাম। যথারীতি পরীক্ষা ক'রে বললেন, আমাদের আশঙ্কাই ঠিক। করনারি থ্রম্বসিস। ডাক্তার গুপ্তর চিকিৎসা-পদ্ধতি অনুমোদন ক'রে নিজেও বিস্তৃত ব্যবস্থাপত্র লিখে দিয়ে এলেন। অক্সিজেনের ব্যবস্থাও রাখতে বললেন।

নতুন উদ্যমে সেবা ও চিকিৎসা চলল। কিন্তু অবস্থার কোনও উন্নতি হ'ল না। বরং ব্লাডপ্রেসার আরও নেমে যেতে লাগল। নিশ্বাসের কষ্ট বাড়ল। শোবার উপায় নেই। সারারাত নিদ্রাহীন, ঠায় ব'সে কাটানো। অবর্ণনীয় সেই যন্ত্রণার সঙ্গে সংগ্রাম ক'রে ক'রে কবি ক্লান্ত হয়ে পড়তে লাগলেন। কি ক'রে তাঁর যন্ত্রণার লাঘব করা যায়, কি ক'রে আধুনিক চিকিৎসা-বিজ্ঞানের পূর্ণ সুযোগ নেওয়া যায়?—সেই প্রশ্নই সবার মনে অগ্রগণ্য হয়ে উঠল। চব্বিশ পরগনার সিভিল সার্জন ডাঃ সুবোধ গুপ্ত অসুখের প্রথম থেকেই সর্বদা খোঁজ-খবর নিচ্ছিলেন। তিনি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়াই সমীচীন ব'লে মত দিলেন এবং প্রেসিডেন্সি জেনারেল হাসপাতালে ভরতি করার ব্যবস্থা করলেন।

২২শে জুলাই মঙ্গলবার দুপুরে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া ঠিক হ'ল। হাসপাতালের নামে কবি প্রথমে আপত্তি করেছিলেন। সবাই বোঝাতে লাগলেন, অনুক্ষণ ডাক্তারের সাহায্য, চব্বিশ ঘণ্টা নিখুঁত সেবাশুশ্রূষা—এ ব্যবস্থা তাঁকে শান্তি দেবার জন্যই করা হচ্ছে, যাতে তিনি তাড়াতাড়ি সেরে উঠেন। তা ছাড়া বাড়িও যে একটা হাসপাতাল হয়ে উঠেছে! কবিজায়া অনেক আগে থেকেই শয্যাশায়িনী। একটি ছেলের টাইফয়েড, আর একটিও জ্বরে আক্রান্ত হয়েছে। পথ্যই বা কে দেয়, রাতদিন সেবাই বা কে করে! একটি আত্মীয় বালিকা দৈবপ্রেরিত হয়েই যেন অসুস্থ পিসীমাকে দেখতে এসেছিল। সে নীরবে সংসারের ভার নিয়েছে ব'লেই তবু দু বেলা দু মুঠো ভাত ছেলেগুলোর মুখে উঠছে।

কি ভেবে কি জানি, কবি আর আপত্তি করলেন না, হাসপাতালে

যেতেই রাজী হলেন। নেতাজীর নামে উৎসর্গিত সেবা-বাহিনী। তারই অ্যাম্বুলেন্স ক'রে হাসপাতালে পৌঁছে দেবার বন্দোবস্ত হ'ল। কাত হবার বা শোবার উপায় নেই। একটি বেতের গোল চেয়ারে বসিয়েই নেওয়া হবে। ডাঃ গুপ্ত তাঁর শেষকৃত্য করলেন। পথের ঝুঁকিতে যাতে হঠাৎ কোন বিপদ না ঘটে, সেজন্য একটি ইন্‌জেকশন দিলেন। কবি ছেলেকে ডেকে মাথায় গঙ্গাজল দিতে বললেন। গুরুগ্রন্থ মাথায় ছুঁইয়ে উদ্দেশে তাঁকে প্রণাম করলেন; জপ করলেন ইষ্টমন্ত্র।

চেয়ারে বসলেন আসন ক'রে। এক পায়ের উপর আর এক পা তুলে। গায়ে লংক্লথের হাফশার্ট। ডান হাতের তর্জনী চিরদিনের অভ্যাসমতই উঁচিয়ে আছে। বসবার এ ভঙ্গীটি বড় পরিচিত। যেন নতুন কোন বিষয় নিয়ে এখনই তর্কযুদ্ধ শুরু হবে, প্রতিপক্ষের সঙ্গে আপোসহীন সংগ্রাম চলবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা।

ওই অবস্থায় ধরাধরি ক'রে দোতলা থেকে নামানো হ'ল। কবিজায়া রয়েছেন একতলায়। রোগা পাতলা মানুষটি, রোগে উদ্বেগে একেবারে যেন শয্যার সঙ্গে লীন হয়ে গেছেন। কবিকে তাঁর এতটা শক্ত অসুখের কথা জানানো হয় নি। একতলায় ডান দিকে রান্নাঘর, বাঁ দিকে শোবার ঘর। দোতলার সিঁড়ি নেমে এসে মাঝখান দিয়ে বাইরের ঘরে বেরোবার পথ।

আজীবন-সঙ্গিনীর কাছ থেকে শেষ-বিদায়। তাঁকে লক্ষ্য ক'রে কবি অনুচ্চ কণ্ঠে বললেন, ওগো, শুনেছ, সণ্টু পাস করেছে?

আজকের এই মহাদুর্দিনে ওই ছিল সবচেয়ে আশার কথা। আজই বি. এ. পরীক্ষার ফল বেরিয়েছে। মেজ ছেলে সণ্টু (মণিলাল) পাস করেছে—সে খবর মথুরই কলকাতা থেকে সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন। একটানা দুঃখের মধ্যে ওই যেন শেষ আশার কথা। তাই বলবার ছিল গৃহলক্ষ্মীকে। তাই বললেন। ব'লে চিরদিনের অভ্যাসমত তাকালেন রান্নাঘরের দিকে। অসহায় চোখ দুটো বৃথাই সেখানে তাঁকে খুঁজতে

পাগল। তিনি যে বাঁ দিকের ঘরে আত্মীয় মেয়েটিকে আশ্রয় ক'রে গাড়ির কাছে শেষ দেখা দেখবার জন্তে ব'সে আছেন। শেষবারের মত চার চোখের মিলন আর হ'ল না। তাড়াতাড়ি গাড়িতে তুলতে হবে। ভাবলাম, বলি—এদিকে নয়, ওদিকে তাকান। কিন্তু বলা উচিত হবে কি না সে কথা ভাবতে না ভাবতেই ওয়া ঘরের সীমানা পেরিয়ে গেল। পিছন ফিরে তাকালাম কবিজায়ার দিকে। মনে পড়ল, 'স্বপন-পসারী'র কবি তাঁর প্রথম জীবনের স্বপ্নের পসরা সঞ্চয় ক'রে তাঁর হাতেই তুলে দিয়েছিলেন। প্রৌঢ় জীবনের ধ্যানে যে নারীস্তোত্র রচনা করেছিলেন নারীরূপা প্রকৃতির, সেই বিচিত্র রূপের মধ্যে গৃহলক্ষ্মীর কবিকল্পিত মূর্তিটিকে যেন প্রত্যক্ষ করলাম—

> সেই এক-মূর্তি নারী!—গৃহলক্ষ্মী, জায়া ও জননী—
> সেই ভোগসুখতরে সেই নিত্য আত্মবলিদান!
> দেহের মৃত্তিকা দলি' রাসমঞ্চ গড়িছে তেমনি,
> শিশুরে পিয়ায় সুধা, রতি-বিষে পুরুষ অজ্ঞান!
> হৃদয়ের ক্ষুধা তার মানে না যে ন্যায়ের বিধান,
> যত দুঃখ তত সুখ, নাই পুণ্য-পাপের ভাবনা;
> সর্বত্যাগী অন্ধ কাম—সেই তার প্রেমের প্রমাণ!
> নিঃশেষে বিলায়ে দেহ হয় তার স্নেহ-উদ্দীপনা,
> যে তার সর্বস্ব হরে—সেই পতি, তারি কণ্ঠে সুচির-লগ্না।

বারান্দাটুকু পেরিয়ে বাইরের ঘর দিয়ে বেরুতে হবে। সেখানে টাইফয়েডে আক্রান্ত ছেলেটি তক্তপোশে শুয়ে আছে। তার দিকে তাকিয়ে কবি জিজ্ঞাসার ভঙ্গিতে আমার দিকে চোখ তুললেন। বললাম—মিথ্যা ক'রে বললাম, ওর সামান্য একটু জ্বর হয়েছে।

ধীরে ধীরে চেয়ারে বসানো অবস্থাতেই চেয়ারসুদ্ধ কবিকে অ্যাম্বুলেন্স গাড়িতে তোলা হ'ল। সঙ্গে বড় ছেলে মঞ্জুলাল, ডাঃ গুপ্ত, রঘুর, আমি, আরও দু-এক জন। গাড়ি স্টার্ট দিলে। বর্ষায় দুর্গন্ধ

পল্লীপথ। চার চাকায় হেঁটে গাড়ি ঘণ্টায় তিন মাইল বেগে ধীরে ধীরে চলতে শুরু করল। পিছন ফিরে দেখলাম, কবিজায়া বাইরের ঘরে দরজার চৌকাঠ ধ'রে ব'সে আছেন। মাথাটি সেই বালিকার বুকে লগ্ন। অপলক চোখের দৃষ্টি শেষ-দর্শনের জন্য কাঙাল। মূর্তিখানি মর্ত্যজীবনের আদিঅন্তহীন ট্রাজেডির চিরন্তন হাহাকারের প্রতিচ্ছবি—

> এ অনন্ত চরাচরে স্বর্গমর্ত্য ছেয়ে
> সবচেয়ে পুরাতন কথা, সবচেয়ে
> গভীর ক্রন্দন, "যেতে নাহি দিব।" হায়,
> তবু যেতে দিতে হয়, তবু চ'লে যায়।

২

গাড়ির ভিতর গুমট গরম। পাশে ব'সে তালপাতার পাখা দিয়ে হাওয়া করছিলাম। কথা বলা বারণ, বলতে কষ্টও হয়। হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন, মধুসূদন এই হাসপাতালেই গত হয়েছিলেন, না? প্রশ্ন শুনে চমকে উঠলাম। কিন্তু শাসনের ভঙ্গিতে বললাম, কি যা-তা বলেন তার ঠিক নেই! মধুসূদনকে কোথায় কোন্ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছিল, তার অস্তিত্বও নাকি আছে!

কিন্তু কত বড় মিথ্যা দিয়ে সত্যকে ঢাকতে চাইলাম, সে তো আমার অজানা নয়! কবি শ্রীমধুসূদনের ভক্ত ও ভাষ্যকার মোহিতলালকেই কি এই মিথ্যায় ভোলানো গেল? তিনি আর প্রশ্ন করলেন না বটে, কিন্তু তাঁর মনের মধ্যে কি হচ্ছে তা তো কেবল তাঁর অন্তর্যামীই জানলেন।

তবে কি ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হবে? উনআশী বছর আগে সেদিনও ছিল মাসের বাইশে। ১৮৭৩ সালের বাইশে জুন। মহাকবি মধুসূদনকে এই প্রেসিডেন্সি জেনারেল হাসপাতালেই পাঠানো হয়েছিল। মধুসূদন নিজেকে যে অবিস্মরণীয় জীবন-ট্রাজেডির নায়ক-রূপে রচনা করেছিলেন, তার করুণতম দৃশ্য হচ্ছে তাঁর মৃত্যুদৃশ্য। স্বামী

স্ত্রী একসঙ্গেই শেষশয্যা নিলেন। কে আগে যাবেন, শেষনিশ্বাস পর্যন্ত তার জন্যই উৎকণ্ঠা। অসহায় পুত্রকন্যাগুলি। কপর্দকহীন বন্ধুনির্ভর মহাকবির শেষযাত্রা! সাদৃশ্য যে একেবারে নেই তা নয়। বুকটা দুরুদুরু ক'রে উঠল। কবিভাগ্য কি একই নিয়তির পথে এগিয়ে চলেছে?

পথের প্রতিকূলতার সঙ্গে অতি সন্তর্পণে সংগ্রাম ক'রে প্রায় পঁচিশ মিনিটে এক মাইল পথ পেরিয়ে গাড়ি পৌছল শখের বাজার। এবার পিচ-ঢালা মসৃণ রাস্তা। মেঘমুক্ত আকাশে অপরাহ্নের রোদ স্তিমিত হয়ে আসছে। মুক্ত হাওয়ার কোমল স্পর্শ লাগছে কবির ক্লান্ত মুখে। হঠাৎ কাঁধে তাঁর বাঁ হাতের চাপ অনুভব করলাম। এমন দু-একটি ব্যক্তিগত কথা বললেন, যার মধ্যে কবির মনে যে আশা-নিরাশার দ্বন্দ্ব চলছে, তারই আভাস ফুটে উঠল। মধুসূদনের কথায় যেমন মনে হয়েছিল, কবি যেন তাঁর অন্তিম পরিণাম সম্বন্ধে প্রস্তুত হয়েই হাসপাতালে রওনা হয়েছেন, শেষের কথায় তেমনই মনে হ'ল, তিনি সুস্থ হয়ে হাসপাতাল থেকে ফিরে আসবেন, এ আশাও তাঁর অন্তরে রয়েছে।

জলে স্থলে অন্তরীক্ষে আত্মরক্ষা করে জীবদল
নিয়ত সংগ্রামশীল, বাজিতেছে কালের বিষাণ!
দণ্ডে ফুটি' দণ্ডে লয়—জীবাণুরা মরণ-পাগল!—
সহস্র মৃত্যুর 'পরে জীবনের উড়িছে নিশান,
মৃত্যুর নাহিক শেষ, দুঃখময় জীবনের নাহি অবসান!

'দুঃখময় জীবনের নাহি অবসান'—এও সত্য; আবার 'যেতে মন নাহি সরে, জীবন যে মরণ-অধিক'—এও সত্য।

প্রেসিডেন্সি জেনারেল হাসপাতালের গেটে গাড়ি প্রবেশ করল। তখন ভারতীয় ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার পদে ছিলেন ডাক্তার অনিলকুমার

মৈত্র। বলার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি সব ব্যবস্থা ক'রে দিলেন; আমাদের একটুও বেগ পেতে হ'ল না। ডাঃ সুবোধ গুপ্ত আগে থেকেই ফোনে সব ব'লে রেখেছিলেন, তা ছাড়া ডাক্তার মৈত্র এমনই এক অদ্ভুত মানুষ যে, কয়েক মিনিটের মধ্যেই তিনি আমাদেরই অন্তরঙ্গদের একজন হয়ে উঠলেন। ম্যাকেঞ্জি ওয়ার্ডের একতলার সাধারণ একটি বিছানাতেই (Bed) খাতায়-পত্রে ভরতি করা হ'ল; দেয় দৈনিক তিন টাকা ক'রে দশ দিনের আগাম ত্রিশ টাকা। কিন্তু ডাঃ মৈত্র বিরাট 'হলে' না পাঠিয়ে 'সেপারেশন ওয়ার্ডে' একটি বিশেষ বিছানার ব্যবস্থা ক'রে দিলেন। সে ঘরে সেদিন মাত্র আর একটি বিছানায় এক অবাঙালী ভদ্রলোক ছিলেন, পরদিনই তিনি মুক্তি পান। কাজেই যদিও নামে ওয়ার্ড, কিন্তু কেবিনের মতই সব সুযোগ-সুবিধা পাওয়া গেল। সাধারণ বিধি-নিষেধের কড়াকড়িও কিছু রইল না।

হাসপাতালের ব্যবস্থা দেখে বিশ্বাস হ'ল, মানুষের হাতে যতটা সম্ভব তার কোনও ত্রুটিই হবে না। কিন্তু মৃত্যুর সঙ্গে সংগ্রামে মানুষের হাতে কতটাই বা সম্ভব!

প্রাথমিক পরীক্ষাদির পর কবি একটু চা খেতে চাইলেন। তক্ষুনি ডাঃ মৈত্র নিজে গিয়ে চায়ের ব্যবস্থা ক'রে দিলেন। মনের মধ্যে একটু ক'রে আশা ফিরে আসছিল; যখন এতটাই সম্ভব হ'ল তখন হয়তো এ যাত্রা তাঁকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারা যাবে। কিন্তু নিজের হাতে বার কয়েক চায়ের বাটি তুলে নিয়ে চুমুক দেবার পর যখন শূন্য হাত মুখের কাছে তুলে নিয়ে অদৃশ্য বাটিতে চুমুক দিতে লাগলেন, তখন সমস্ত আশাই মরীচিকা ব'লে মনে হ'ল। সেই তন্দ্রাচ্ছন্ন ভাব ডাঃ মৈত্রও লক্ষ্য করছিলেন। বললেন, সংগ্রামের একেবারে শেষ-সীমায় এসে পৌঁছেছেন। ব্লাডপ্রেসার একশো কুড়িতে নেমে এসেছে।

আত্মীয়-পরিজনদের কেউ কেউ রাত্রে তাঁর পাশে থাকতে পারবেন—এ অনুমতি পাওয়া গেল। ভূমীন্দ্রনাথ দত্ত মোহিতলালের প্রথম যুগের ইস্কুলের ছাত্র। কলকাতার এক বনেদী পরিবারের ছেলে।

অকৃতদার। বাগনানে প্রবাসকালে মোহিতলাল কলকাতা এলে এঁদের বাসাতেই থাকতেন। ভূমীন ভায়া আহার-নিদ্রা ছেড়ে গুরুর সেবায় আত্মনিবেদন করলেন। তাঁর স্বভাবসুলভ মাধুর্যে হাসপাতালেই পারিবারিক পরিবেশ রচিত হ'ল।

২৬শে জুলাই বুধবার আমার বাসায় এলেন শঙ্করদা (তারাশঙ্কর) আর সজনীদা। আগে থেকেই ঠিক ছিল। হাসপাতালে সেবা-শুশ্রূষার দিক দিয়ে আর কি কি করা যেতে পারে তারই পরামর্শ করা হবে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে। ডাক্তার কুমারকান্তি ঘোষের সঙ্গে আলাপ হ'ল, তিনি পরিচয় করিয়ে দিলেন হাসপাতালের হৃদ্‌রোগ-বিশেষজ্ঞ ডাক্তার অমিয়কুমার বসুর সঙ্গে। ঠিক হ'ল, রাত্রের জন্য একজন নার্স রেখে দেওয়া হবে, দিনের বেলা একজন বেয়ারা। দৈনিক ষোলো টাকা আর দেড় টাকা। অনুরোধপত্রে আর্থিক দায়িত্ব গ্রহণের জন্য নাম লিখতে চাইলেন সজনীদা। নানা কথা ভেবে তাঁকে নিরস্ত ক'রে আমারই নাম সেখানে লিখলাম।

সজনীদা বললেন, যথাসাধ্য চিকিৎসার যেন কোনও ত্রুটি না হয়। টাকার দরকার হ'লেই বলবে। শঙ্করদাও বললেন, সরকারের কাছ থেকেও পাওয়া যাবে। কাজেই কোনও চিন্তা নেই।

চিন্তা সত্যি ছিলও না। সরকারের কাছ থেকে পাওয়া যাক আর নাই যাক, মোহিতলালের অনুরাগী ও ভক্তগণ এগিয়ে এলেন স্বতঃস্ফূর্ত শ্রদ্ধায়। জেনারেল প্রিণ্টার্সের সুরেশ দাস, বঙ্গভারতীর শ্যামসুন্দর মাইতি, অধ্যাপক শ্রীশ দাস, অধ্যাপক তারাচরণ বসু, অধ্যাপক বিশ্বরঞ্জন ভাদুড়ী, অধ্যাপক অনিল সরকার এবং মোহিতলালের আরও অনেক ছাত্র ও ভক্ত। সবার মুখে এক কথা— টাকার জন্য যেন চিকিৎসার কোনও ত্রুটি না হয়। শুধু কথাই নয়, শিষ্যবৃন্দের শ্রদ্ধাঞ্জলিতে গুরুর শূন্য ভাণ্ডার পূর্ণ হয়ে উঠল। এমন কি, কারা প্রিয় শিষ্য, কারা নন, কাদের দান নিলে তিনি তৃপ্ত হবেন, কাদের

মিলে হবেন না—এমন কথাও কানাকানি হতে লাগল। সবচেয়ে আনন্দ হ'ল, যখন শ্যামসুন্দরের পিতৃদেব পুত্রের মুখে ব'লে পাঠালেন, হাসপাতালের চিকিৎসার যা খরচ লাগবে তিনি দেবেন।

শঙ্করদা আর সজনীদা হাসপাতালে গিয়েও কবির সঙ্গে দেখা করার সাহস করলেন না। যদি তিনি অসন্তুষ্ট হন, যদি কোন অঘটন ঘ'টে যায়!—কারণেই হোক আর অকারণেই হোক, তাঁদের সম্বন্ধে কবির মনের যে তিক্ততা, দেখা হ'লে যদি তার কোনও প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়া হয় তা হ'লে আপসোসের সীমা থাকবে না। তাই তাঁরা সেই অবাঞ্ছনীয় অবস্থার সম্মুখীন না হওয়াই সমীচীন মনে করলেন।

আমি একা কবিকে দেখতে গেলাম। হাসপাতালে আসার পর থেকেই অক্সিজেন দেওয়া হচ্ছিল। পিঠের দিকে স্তূপীকৃত বালিশ, সামনে বিছানার উপরে একটি কাঠের লম্বা চৌকি। কবি তার উপর দু হাত রেখে সামনের দিকে সামান্য ঝুঁকে চোখ বুজে ব'সে আছেন। হাতের স্পর্শ পেতেই চোখ মেলে তাকালেন। জিজ্ঞাসা করলাম, কেমন আছেন, কোনও অসুবিধা হচ্ছে কি না, হাসপাতাল কেমন লাগছে? বললেন, ভাল, সেবাযত্ন ত্রুটিহীন। নার্স আর বেয়ারা নিয়োগ করা হয়েছে—সে কথা জানালাম। হয়তো খুশি হলেন।

চুপ ক'রে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম। একটু পরে পরেই একটা তন্দ্রাচ্ছন্ন ভাব। তন্দ্রার ঘোরে অস্ফুট ভাষায় অনুক্ষণ কি যেন ব'লে চলেছেন। বক্তৃতা দেওয়ার ভঙ্গিতে হাত ওঠা-নামা করছে। ঠোঁট নড়ছে। শব্দ নেই। কিন্তু মুখে অন্তহীন কথার অনর্গল প্রবাহ। মনে পড়ল, একবার আমাকে লিখেছিলেন, 'আমি যদি আর সব ছেড়ে দিয়ে এখন অধ্যাপনা নিয়ে থাকতাম, তা হ'লে একটু সুস্থ ও শান্ত হতে পারতাম। ওটা আমার একটা Refuge।' আচার্য গিরিশচন্দ্র সংস্কৃতি-ভবনে সে Refuge-এর ব্যবস্থা ক'রে দেওয়া হয়েছিল। এ যুগের বাংলা-সাহিত্যের ছেলেমেয়েরা তাঁর কাছে পড়বার সৌভাগ্য

থেকে বঞ্চিত হবে, এটা কিছুতেই উচিত হবে না—ভেবেই সে ব্যবস্থা করা হয়েছিল। তাতে ভুল-বোঝাবুঝিও কম হয় নি। ক্লাসের সুযোগ নিয়ে তাঁর দুর্বাসা-কণ্ঠ আমাদের শ্রদ্ধেয়, এমন কি অন্তরঙ্গ কারও কারও সম্পর্কে তীব্র ভাষায় মুখর হয়ে উঠেছে—এ অভিযোগও বাইরে থেকে শুনতে হয়েছে। শুনে দুঃখ পেয়েছি, বিব্রত বোধ করেছি, ক্ষুণ্ণ ও ক্ষুব্ধ হয়ে তাঁকে রূঢ় ভাষায় চিঠিও লিখেছি। আশ্বাস দিয়ে তিনি জানিয়েছেন, 'তোমার কোনও ভয়ের কারণ নেই—অধ্যাপক মোহিতলাল স্বতন্ত্র ব্যক্তি, সেখানে আমার ধর্ম এতটুকু টলবে না।' পরে বুঝেছি, অধ্যাপনা তাঁর পক্ষে ছিল মুক্তির ক্ষেত্র, সমস্ত দুঃখ ও বেদনা থেকে নিষ্কৃতি পাবার পরম আশ্রয়—একটা Refuge। রোগের বিমিশ্র তমিস্রায় অধ্যাপক মোহিতলাল যেন ওই Refuge-এ ফিরে যাবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছেন। দীর্ঘশ্বাস চেপে ফিরে এলাম।

কবির সঙ্গে দেখা করার জন্য সজনীদা যে ছটফট করছিলেন, সে কথা আমার কাছে গোপন ছিল না। সাম্প্রতিক বাংলা-সাহিত্যের ইতিহাসে মোহিতলাল-সজনীকান্তের সম্পর্কটি একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। সজনীকান্ত মোহিতলালের দীক্ষিত শিষ্য। সুদীর্ঘ আঠারো বছর ধ'রে 'শনিবারের চিঠি'র পৃষ্ঠায় গুরু-শিষ্য দুজনে মিলে আধুনিক বাংলা-সাহিত্যের গতিপথ-নির্ণয় ও মূল্য-নিরূপণে একক্রিয় ছিলেন। স্বভাবতই সম্পর্কটি ব্যক্তিগত ও পারিবারিক অন্তরঙ্গতায় গিয়ে দাঁড়ায়। প্রিয়তম শিষ্যকে গুরু পুত্রস্নেহে বুকের একেবারে বাঁ ধারে টেনে নিয়েছিলেন। কিন্তু নিয়তির বিধানে একদিন সেই ঘনিষ্ঠতম বন্ধন ছিন্ন হ'ল। ঢাকায় থাকতেই বিচ্ছেদের সূত্রপাত হয়। কলকাতায় আসার পর একেবারে মুখ-দেখাদেখি বন্ধ। মাঝে একবার মোহিতলালের বন্ধু ধীরেন্দ্রনাথের মধ্যস্থতায় পুনর্মিলনের চেষ্টা হয়েছিল, কিন্তু তা সাময়িক মাত্র। ত্যাজ্যপুত্রকে পিতা যেমন ভর্ৎসনা করে, অভিশাপ দেয়, শেষ ক বছর

মোহিতলাল তাই করেছেন। এ নিয়ে তিনি যে অবর্ণনীয় মর্মজ্বালা অনুভব করেছেন, কবির অন্তরঙ্গমাত্রের কাছেই তা সুবিদিত।

সজনীকান্তের ভিতরে কি হয়েছে তা তিনিই জানেন, কিন্তু বাইরে তিনি বরাবর আশ্চর্য ধৈর্য ও সংযমের সঙ্গেই আঘাতগুলি গ্রহণ করেছেন। একটি কথাও মুখ ফুটে বলেন নি। একটি অক্ষরও কোথাও লেখেন নি।

শুক্রবার প্রভাতী পত্রিকায় সংবাদ বেরুল, কবির জীবনদীপ ধীরে ধীরে নিবে আসছে। বেলা তিনটার সময় সজনীদা ছুটে এলেন। বললেন, মিত্র ঘোষে শুনে এসেছেন, ওরা ফোনে খবর নিয়ে জেনেছে, অবস্থা ভাল নয়।

সজনীদা অসহায় প্রশ্ন করলেন, যাবে একবার?

কি উত্তর দোব তাঁকে ভেবে পেলাম না। নিয়ে যাওয়া কি ঠিক হবে? তা ছাড়া অবস্থা খুব খারাপ তো মনে হ'ল না। আমাকে ইতস্তত করতে দেখে সজনীদা কি ভাবলেন জানি না, কিন্তু পরক্ষণেই এমন একটা কাণ্ড করলেন, যা আমাকে একেবারে বিমূঢ় ক'রে দিলে।

সজনীদা বললেন, পিতাপুত্রে ঝগড়া। তুমি ছোট ভাই; তুমি যখন অনুমতি করবে তখন দেখা করতে যাব। তার আগে নয়।

ব'লেই আমার কাছ থেকে প্রায় পালিয়ে গিয়ে গাড়িতে উঠলেন। বুঝলাম, আমার কাঁধে তিনি এক বিরাট দায়িত্বের বোঝা চাপিয়ে দিয়ে গেলেন।

২৬শে জুলাই শনিবার। সকাল নটায় হাসপাতালে কবিকে দেখতে গেলাম। মনে হ'ল, আজ অনেকটা শান্ত। জিজ্ঞাসা করলাম, নার্স কেমন দেখাশোনা করছে? বললেন, রায়বাঘিনী।

তবে কি বদলে দেব?—না না, বড় কড়া শাসন। পান থেকে চুন খসবার উপায় নেই। বুঝলাম খুশি হয়েছেন। কর্তৃপক্ষ সেবা-পটীয়সী এই ফিরিঙ্গিনীর হাতে তাঁর রাত্রের সেবার ভার দিয়েছিলেন।

নাম মিস রবার্ট্‌স। দিনের বেয়ারাকে সব সময় পান না ব'লে অনুযোগ করলেন। নাম তার নন্দকিশোর। নন্দকিশোরের নাম নিয়ে রসিকতায় কবির ওষ্ঠাধরে পাণ্ডুর হাসি ফুটে উঠল।

কথা বলা নিষেধ, বলানোও নিষেধ। চুপ ক'রে ঘণ্টা খানেক পাশে দাঁড়িয়ে রইলাম। অসুখের প্রথম থেকেই লক্ষ্য করেছি, একটা শান্ত আত্মসমর্পণের ভাব। কোনও আক্ষেপ, কোনও নালিশ নেই। যন্ত্রণার কোনও কাতরোক্তিও শুনি নি।

ডাক্তার মৈত্রকে বললাম, আজ যেন একটু ভাল মনে হচ্ছে। তিনি বললেন, অন্তত খারাপের দিকে যায় নি। তাঁর সঙ্গে সজনীদার কথা আলোচনা হ'ল। বললেন, দুটো থেকে তিনটের মধ্যে নিয়ে আসবেন। তখন একটা আচ্ছন্ন ভাব থাকে। নীরবে দেখে যেতে পারবেন। ভাবলাম, কাল রবিবার আছে, বিকেলে সজনীদাকে নিয়ে আসব।

তা ছাড়া, রবিবার সকালে সবাইকে আমার কাছে আসবার জন্য বলাও হয়েছে। এক জায়গায় টাকা-পয়সার একটা হিসাব রাখা দরকার। কে কতটা দায়িত্ব নিতে পারবেন, সে কথাও পরিষ্কার হওয়া প্রয়োজন।

কিন্তু কবি নিজে আমাদের সমস্ত দায়িত্ব ও দুর্ভাবনা থেকে মুক্তি দিয়ে গেলেন। শনিবার রাত নটা পনেরো মিনিটে সব শেষ হয়ে গেল। সকালে ভাল দেখে এসেছি। অনেকটা নিশ্চিন্তমনে সন্ধ্যায় একটি সামাজিক কর্তব্যপালনে গিয়েছিলাম। ফিরতে একটু রাত হয়েছে। শুতে যাব, এমন সময় বিশ্বরঞ্জন আর শ্রীশবাবু এসে হাজির। রেডিওতে হাহাকার বেজেছিল, শুনি নি। তাঁদের দেখেই বুঝলাম, সব শেষ। নীরবে ট্যাক্সিতে উঠে বসলাম।

বিকেলের দিকে দেহের উত্তাপ নেমে এসেছিল ছিয়ানব্বই থেকে সাতানব্বইয়ের মাঝামাঝি। ওইটুকু মাত্র হুঁশিয়ারি। তা ছাড়া

আর কোনও পূর্বলক্ষণ ছিল না। নাড়ীর গতিপরীক্ষার সময় মথুর ভায়া ছিলেন পাশে। জিজ্ঞাসু চোখে তাকাতেই কবি রসিকতা ক'রে বললেন, 'মজাসে চল্ রহেঁ।' সন্ধ্যার পরে বুকের কষ্ট বাড়লে অন্যান্য দিন ইন্‌জেক্‌শন দেওয়া হয়। আজ নটার সময় বললেন, আমার বড় কষ্ট হচ্ছে, ওরা ইন্‌জেক্‌শন দিচ্ছে না কেন? ভূমীন, মথুর, অনিল, বিশ্বরঞ্জন, সণ্টু—ঘরের ভিতরে বিছানার পাশেই ছিলেন; নটা দশে ওঁরা ডাক্তারের সঙ্গে আলোচনা করবার জন্য বেরিয়ে এলেন। পাঁচ মিনিট যেতে না-যেতেই মিস রবার্ট্‌স ছুটে এল।—সব শেষ।

আপাদমস্তক সাদা চাদরে ঢাকা। চাদরের বুকে মানুষের চরম পরাজয়ের দলিল গেঁথে দেওয়া হয়েছে—তারিখ ও সময় দেওয়া মৃত্যুর পরোয়ানা। মুখের আবরণ খুলে দেখলাম, কোন যন্ত্রণা, কোন বিকৃতির চিহ্ন সেখানে নেই। শান্ত সমাহিত মহাযোগী যেন মহা-সমাধিতে লীন হয়েছেন।

৩

মহাপ্রস্থানের যাত্রাপথ বেঁধে দেওয়া হয়েছে। রবিবার ভোরবেলা, হাসপাতাল থেকে লোয়ার সারকুলার রোড ধ'রে বঙ্গবাসী কলেজ, সেখান থেকে বিশ্ববিদ্যালয় হয়ে বিদ্যাসাগর কলেজে বাণীতীর্থ পরিক্রমা শেষ ক'রে বিডন স্ট্রীট ধ'রে নিমতলা মহাশ্মশান।

শ্রাবণের ঊষা চোখ মেলেই অশ্রুমোচন করলে। মেঘে মেঘে মেদুর অম্বর। শ্রাবণের এই রোদন-ভরা দিনগুলি বাঙালীর চোখের জলে গাঁথা হয়ে রইল। বিদ্যাসাগর গিয়েছিলেন তেরোই শ্রাবণ, রবীন্দ্রনাথ বাইশে, মোহিতলাল গেলেন দশুই।

হাসপাতালে শেষদর্শনের জন্য এলেন একে একে অধ্যক্ষ পি. কে. গুহ, অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর, সজনীকান্ত। এল নারায়ণ নগ্নপদে। বললাম, এই দীর্ঘপথ খালি পায়ে হেঁটে যেতে

ারবি ? বক্তৃতামঞ্চে অনর্গল মঞ্জুভাষী অধ্যাপক নারায়ণ গাঙ্গুলী
ভরঙ্গ শিষ্টাচারে একান্তই মুখচোরা। চোখ নামিয়ে বললে, এই
্নতম কৃত্যটুকু না করলে মনে শান্তি পাব না দাদা।

এলেন লাহা-পরিবারের শিল্পী সতু ভায়া। আর এলেন ঢাকার
াত্রছাত্রীরা প্রায় সবাই। আরও অনেক অধ্যাপক ও সাহিত্যিককে
াশা করেছিলাম। কিন্তু সে প্রসঙ্গ না-তোলাই ভাল।

শেষযাত্রার আয়োজন হচ্ছে। হঠাৎ চোখে পড়ল সিঁড়ির এক
কাণে ব'সে আছেন তারাচরণ। ছাত্র নন, ছাত্রপ্রতিম। সংস্কৃতের
ধ্যাপক, পঞ্চতীর্থ। বড়িশা-প্রসাদে কবির সাহিত্যসাধনায় ঘনিষ্ঠতম
ন্তেবাসী। মোহিতলালের মল্লিনাথ। দেখলাম, তাঁর দু চোখে
াবণের ধারা নেমেছে। মোহিতলালের আর এক ভক্তশিষ্যের ছবি
াখে ভেসে উঠল, অধ্যাপক পৃথ্বীশ নিয়োগী। সর্বদা সবার অগোচরে
কে প্রতিটি নির্দেশ নিষ্ঠার সঙ্গে পালন ক'রে চলেছে। গুরুকে
াবদেখা দেখবার সুযোগ হবে তখন, যখন সব কাজ শেষ হবে।

সারাটা সকাল বৃষ্টির আর বিরাম নেই। ভয় হ'ল, তবে কি
তদূর নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে না ? কেওড়াতলার কথাও কেউ কেউ
াবতে লাগলেন। কিন্তু কলেজের অত ছেলে থাকতে ভয় কিসের ?
ামাদের ছাত্রাবাসের ছেলেদের ডেকে পাঠালাম। আশুতোষ-
লেজ-হস্টেলেও খবর দিলাম। ছেলেরা প্রস্তুত হয়েই ছিল। বৃষ্টিতে
ান ক'রে তারা ছুটতে ছুটতে এল। ছাত্রসমাজ চিরদিনই জাতির
রক্ষা করেছে। আজও তারাই এগিয়ে এল দলে দলে।
াহিত্যিককে তারা ভালবাসে, কৃতী শিক্ষককে মাথায় ক'রে রাখে।
বি সমালোচক অধ্যাপক মনীষী মোহিতলালকে তারা মাথায় তুলে
ল। শুরু হ'ল শেষযাত্রা।

বঙ্গবাসী কলেজে আরও অনেক ছাত্র বিভিন্ন কলেজ ও প্রতিষ্ঠানের
ক থেকে শ্রদ্ধানিবেদনের জন্ম প্রতীক্ষা করছিল। কবি, সাহিত্যিক
অধ্যাপকদের মধ্যে যাঁরা হাসপাতালে যেতে পারেন নি, তাঁদেরও

কেউ কেউ ছিলেন। শ্বেতপদ্ম আর রজনীগন্ধার মালা আর স্তবকে প্রীতি ও শ্রদ্ধার সে কি শুভ্রমূর্তি বহন ক'রে পরিপুষ্টতর শোভাযাত্রা এগিয়ে চলল শেষতীর্থের পরিচিত পথে। পথের দুই ধারে উৎসুক নরনারী। কেউ চুপ ক'রে চেয়ে রইল। কেউ প্রশ্ন করলে, কে যায় মশাই? কেউ বললে, কবি মোহিতলাল; কেউ বললে, অধ্যাপক মোহিতলাল। আর কি তাদের কিছু বলার ছিল না?

নিমতলার মহাতীর্থ। মর্ত্যমন্দাকিনী তখন সাগরসঙ্গম থেকে গঙ্গোত্রী-মুখে উজান ব'য়ে চলেছেন। মনে হ'ল, মা-গঙ্গা যেন তাঁর প্রিয় সন্তানকে কোলে তুলে নেবার জন্ম এগিয়ে আসছেন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের ডান পাশে গঙ্গার আরও কাছে কবির শেষশয্যা রচিত হ'ল। শ্রাবণ-অপরাহ্নের আকাশ তখন চোখের জল মুছে ভিজে চোখে মর্ত্যলোকের এই করুণতম দৃশ্য প্রত্যক্ষ করছে। এই তো জীবের পরিণাম, দেহের অন্তিম নিয়তি।

হিংসাপ্রেম খরস্রোতা প্রকৃতির প্রাণকল্লোলিনী
বহে শুধু নিত্যকাল জন্ম-মৃত্যু লহরী-লীলায়!

দেখতে দেখতে চোখের সামনে সব শেষ হয়ে গেল। ঘনিয়ে এল শ্রাবণ-সন্ধ্যা। আকাশগঙ্গার ধারা এসে মিলিত হ'ল মর্ত্যগঙ্গার বুকে সুদূর দিক্‌চক্রবালের ক্রমবিলীয়মান সীমার শেষে।

আমাদের মোহিতলালকে আমরা চিরকালের জন্ম হারালাম। আমরাও আমাদের ঈর্ষা ও অসূয়া, বিদ্বেষ ও নিন্দা, শ্রদ্ধা ও ভালবাসা নিয়ে একদিন এমনই ক'রে হারিয়ে যাব। আসবে আমাদের উত্তর-পুরুষেরা। তারা পাবে মোহিতলালের মৃত্যুঞ্জয়ী সাধনাকে। পাবে দেহাত্মবাদের কবিকে, পাবে বাংলা-সাহিত্যবিচারের প্রথম সংহিতাকার মোহিতলালকে। আর যদি কোনদিন এই আত্মবিস্মৃত জাতি আবার তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে জেগে ওঠে, যদি আবার সে তার আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্ম দৃঢ়ব্রত হয়, তা হ'লে আজকের এই অভিশপ্ত

হতভাগ্য জাতির ভবিষ্যদ্বংশীয়েরা পাবে বাংলা ও বাঙালী সংস্কৃতির সর্বশেষ অগ্নিহোত্রীকে। কিন্তু আমরা যাঁকে হারালাম, তাঁকে আর কোনদিনই ফিরে পাব না। 'দেহের রহস্যে বাঁধা অদ্ভুত জীবনে' যে রুদ্র-মধুর মূর্তিটিকে সুখে-দুঃখে, আনন্দে-বেদনায় প্রত্যক্ষ করেছি, যাঁর স্নেহ ও আদর, প্রশংসা ও ভৎর্সনা সমানভাবেই গ্রহণ করেছি, তাঁকে চিরকালের জন্যই হারালাম। আমাদের এ 'মৃত্যু-শোকে'র ভাষা তিনিই একদিন রচনা করেছিলেন। ভাগীরথীতীরের শেষতীর্থে ব'সে আজ বার বার তাঁর কথাই মনে পড়ছে—

হায় দেহ !—নাই তুমি ছাড়া কেহ-
জানি তাহা প্রাণে-প্রাণে,
মূরতি-পাগল মনের মমতা
তাই ধায় তোমাপানে।
তোমারি সীমায় চেতনার শেষ,
তুমি আছ তাই আছে কাল-দেশ,
দুঃখ-সুখের মহা পরিবেশ !—
দেহলীলা-অবসানে
যা থাকে তাহার বৃথা ভাগাভাগি
দর্শনে-বিজ্ঞানে !

শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য

মজাসে চল*

'দুঃখের আঁধার রাত্রি'—এল তব দ্বারে
বেদনায় মুহ্যমান অর্থহীন দৃষ্টি মেলি
কবি, হেরিলে কাহারে ?
হেরিলে কি দুর্যোগের বিকৃতি-আড়ালে
শুভ্র জ্যোতির্জালে।

* কবি মোহিতলালের শেষ-উচ্চারিত বাণী—'মজাসে চল।'

অপরূপ মৃত্যুর মহিমা
ক্লিষ্ট ক্লান্ত জীবনের শেষ-পরিসীমা ?
'জীবন যে মরণ-অধিক'—তা হতে অধিক প্রেম
জীবনের পদ্মকোষে মধু,
কল্যাণী, লাবণ্যময়ী চিরন্তনী বধূ—
ভুলিলে সে কথা
পরম আনন্দময় জীবনের ব্যথা ?
মৃত্যু দিল মন্ত্র পড়ি
দৃষ্টি হতে খসি ঝরি প'ড়ে গেল মোহস্বপ্ন
নন্দনের মন্দারমঞ্জরী ?
নৈঃশব্দ্যের অন্তহীন অন্ধ মহার্ণবে
অমৃত বৈভবে
জাগিল কি দেহ-হীন আত্মা শতদল,
অমর্ত্য পরাগ-রসে নিত্য টলমল ?
তাহারি আশ্বাসে চিত্তে
জাগি উঠে দিব্য বিভা বাণীর কল্লোল
অভিনব রূপকথা—'চল রে মজাসে চল'।

'চল রে মজাসে চল'—দিব্য এ কাহিনী
ভারতী আপনি আনি
ললাটে তোমার দিল আঁকি জয়োদৃপ্ত টীকা
মৃত্যুজয়ী আগুনের শিখা।
কবি, এই তব জীবনের পূর্ণাহুতি
মৃত্যুলগ্নে বিশ্বরুচি নব বাণীস্তুতি।
ভাল তুমি বেসেছিলে এই ধরণীরে।
দেহ-তটিনীর তীরে তীরে
রূপের তরঙ্গমাঝে লুটে

উরসে অধরপুটে
পান করি প্রাণের মদিরা
খুঁজে নিতে চেয়েছিলে 'কামনার কাচমণি হীরা'।
এই সত্য—সৃষ্টিমূলে কাম-যজ্ঞানল
বিচিত্র রূপের বর্ণে নিত্য সমুজ্জ্বল।
এই রূপ-তৃষা-তৃপ্তি, দেহ-দীপে দেহের আরতি
প্রেমের পূর্ণতা লাগি হৃদয়-সর্বস্ব দান—
পরম সদ্গতি।
প্রাণের উৎসবে এসে মানবের কাম্য পরিণাম।
ইহারে লভিয়া বীর সিদ্ধ মনস্কাম
ব্যাধিক্লিষ্ট অযুত বেদনা
মরণের সহস্র যাতনা
নির্ভয়ে বরিয়া লয় ধন্য মা।ন এ জীবন।
পৌরুষের পাঞ্চজন্যে বিদারি গগন
মৃত্যুর সম্মুখে সদম্ভে ঘোষণা করে আনন্দ-বিহ্বল
অভিনব বজ্রবাণী—'চল রে মজাসে চল'।

প্রাণের সহজ নিমন্ত্রণে পূর্ণকাম তুমি
সুন্দরী এ মর্ত্যভূমি
বীর্যশুল্কে করিয়া গ্রহণ
কামনার হোমানলে জীবনেরে করিলে শোধন—
'জানিতে চাহি না আমি কামনার শেষ কোথা আছে
ব্যথায় বিবশ তবু হোম করি জ্বালি কামানল—
এ দেহ ইন্ধন তার, সেই সুখ নেত্রে মোর নাচে
উলঙ্গিনী ছিন্নমস্তা—পাত্রে ঢালি লোহিত গরল
মৃত্যু ভৃত্যরূপে আসি ভয়ে ভয়ে পরসাদ যাচে।'
বীরাচারী হে মহাতান্ত্রিক,

নারীর মহিমা মাঝে হেরিলে যে অনিমিখ
পরিপূর্ণ জীবনের অনিন্দিত শোভা
দিব্যকান্তি সর্বনাশী নিত্য মনোলোভা
অমৃত-আসবদানে ঘুচাইছে মৃত্যু-বিভীষিকা
ললাটিকা
যে মহিমা দুঃখেরে করিয়া তুচ্ছ করে ঝলমল
অপূর্ব গায়ত্রীমন্ত্রে—'চল রে মজাসে চল'।

অতি ক্ষুদ্র দুটি কথা—'চল রে মজাসে চল।'
মরণ-মুহূর্ত-বৃন্তে বাণীর বিদ্যুৎদীপ্ত অপূর্ব কমল।
কবি, কি তব ইঙ্গিত ?
কিবা সে সঙ্গীত
মৃত্যুর নির্মমাঘাতে হৃদয় বিদারি
উঠিল ঝঙ্কারি ?
হেরিলে কি মৃত্যুর খর্পর ভরি
অমৃত আশিস্‌রাশি পড়িতেছে ঝরি ?
'কষ্টের বিকৃত ভান' এ মৃত্যু আঁধার
'অন্ধকারে ছলনার ভূমিকা তাহার।'
পার হয়ে শান্তি-পারাবার
যেথায় জ্বলিছে জ্যোতি ধ্রুব-তারকার ?
অথবা এ জীবনের নিত্য মহোৎসবে
পূর্ণ তুমি, সিদ্ধ তুমি কামনা-বৈভবে
তাই তুচ্ছ হ'ল বেদনার সহস্র সূচিকা
নিভে-যাওয়া জীবনের হৈম বহ্নিশিখা ?

বৃথা মোরা প্রশ্ন করি
যুগ যুগ ধরি

অজানিত
সে রহস্য ভেদ করা মানবের চির সাধ্যাতীত।
জানি শুধু এই সত্য—বন্ধু, তুমি মরণ-অধিপ,
দেহাধারে জ্বালাইলে যে মহা-প্রদীপ
স্থিরকান্তি তাহারি আলোকে
অমৃত আশ্বাস লভি এই মর্ত্যলোকে।

শ্রীজীবনকৃষ্ণ শেঠ

কবি মোহিতলাল

"আকাশের তারা যেমন জ্বলিছে—জ্বলুক অসীম রাতি,
ওর পানে চেয়ে ভয়ে ম'রে যাই, চাহি না অমৃত-ভাতি!
ধরার কুসুম বার বার হাসে, বার বার কেঁদে যায়—
আঁধারে-আলোকে শিশিরে-কিরণে আমি হব তার সাথী।"

(স্বপন-পসারী)

-মোহিতলালের এই জীবন-তৃষ্ণা নতুন কথা নয়, রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে হু বিচিত্র সুরে এই পৃথিবী-বন্দনা আমরা শুনেছি। কিন্তু মূলত বীন্দ্রগোত্রের শিল্পী হয়েও মোহিতলাল রবির আলোয় হারিয়ে যান নি, স্তার স্বাতন্ত্র্যে তিনি স্বয়ম্প্রকাশ। তাই রবীন্দ্রনাথের অব্যবহিত রবর্তী কবিগোষ্ঠীতে মোহিতলালের ভূমিকা সব চাইতে মূল্যবান। ধু সাহিত্যিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে নয়, ঐতিহাসিক প্রেক্ষিতেও এ কথা ঃসন্দেহে বলা যেতে পারে।

বাংলা দেশে রবীন্দ্র-বিরূপতার অধ্যায়ের মধ্যেই ক্রোড়পত্র হ'ল ারতী'। সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের নেতৃত্বে এই গোষ্ঠীর লেখকেরা ীন্দ্রনাথকে পূর্ণ মর্যাদায় দেশের কাছে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। াদের দায়িত্ব তাঁরা পালন করেছেন, কিন্তু সে জন্যে মূল্যও তাঁদের দিতে হয় নি। রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্বের কাছে আত্মসমর্পণ ক'রে

তাঁরা অনেকেই সূর্যমুখীর মত ফুটেছেন, নিজেদের প্রদীপ জ্বেলে নেবার শুভলগ্ন তাঁদের আসে নি। নিষ্ঠুর হ'লেও কথাটা সত্য।

কিন্তু নিয়ম থাকলেই ব্যতিক্রম থাকে, এবং মোহিতলালকে বলা যেতে পারে সর্বোজ্জ্বল ব্যতিক্রম। এই যুগের কবিদের মধ্যে রবীন্দ্র-ব্যতিরিক্ত নতুন কিছু কথা মোহিতলালের কাছে থেকেই প্রধানত আমরা শুনেছি। আধুনিক বাংলা-কাব্যে বুদ্ধিবাদ ও দেহবাদের প্রথম প্রবক্তা মোহিতলাল।

আবেগজীবী বাংলা-কাব্য রবীন্দ্রনাথে এসে তার সম্পূর্ণ ঐশ্বর্য নিয়ে আত্মপ্রকাশ করলে; অনুভূতি ও অনুধ্যানের গভীরতায় রবীন্দ্র-কাব্য লাভ করল সমুদ্র-সাযুজ্য। কিন্তু ডারউইনের যুক্তিবাদে দীক্ষিত ইউরোপে ইতিমধ্যেই বিপর্যয়ের পালা আরম্ভ হয়ে গেছে; সেই পালায় ফ্রয়েড্-বার্নার্ডশ-লরেন্সের আবির্ভাব ঘটল অনিবার্যভাবেই। প্রথম মহাযুদ্ধের প্রতিক্রিয়া মানুষকে যুক্তি ও জিজ্ঞাসার কঠিন ভিত্তিতে নামিয়ে নিয়ে এল।

যুক্তিবাদী আধুনিক মননকে 'সবুজপত্রে' গ্রহণ করলেন প্রমথ চৌধুরী, আর কাব্যে গ্রহণ করলেন মোহিতলাল। এ দিক থেকে এ কালের বাঙালী কবির কাছে মোহিতলালের দান যে কতখানি তা ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। আর যুক্তিবাদের অন্যতম প্রধান বিভাব যে দেহ, তাকেও মোহিতলাল সম্পূর্ণ নতুনরূপে বাংলা-সাহিত্যে প্রতিষ্ঠা করলেন।

এ কথা মনে রাখা দরকার যে, দেহ-কামনা সম্পর্কে শুচিবায়ু প্রাচীন বাঙালীর ছিল না। জয়দেবকে সরিয়ে রেখেও বলা যায়, বৈষ্ণব-সাহিত্যের সমস্ত তাত্ত্বিকতা সত্ত্বেও কামনার প্রাকৃত-রূপটা সেখানে কখনও কখনও আমাদের রুচিতে অশোভন মাত্রাতেই নয়। অষ্টাদশ শতকের 'অবক্ষয় পর্বে' কবিওয়ালারা বৈষ্ণবী-প্রেমের এই প্রাকৃত-লীলাটিকে কোন্ স্তরে নামিয়ে এনেছিলেন এবং ফারসী কেচ্ছা কী ভাবে সে লালসায় ঘৃতাহুতি দিয়েছিল, তার নজিরের অভাব নেই। কিন্তু

মিশনরী শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে এই আদিরসের ধারা শুকিয়ে আসতে লাগল। ঈশ্বর গুপ্ত যদি বা কিছু প্রশ্রয় দিয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর শিষ্য বঙ্কিম সে অপরাধের জন্যে গুরুকে শুধু ধিক্কার দিতে দ্বিধা করেন নি।

রবীন্দ্রনাথে এসে এই দেহ-কামনা শৈলীর সৌন্দর্য-পিপাসায় জ্যোতির্ময় মুক্তি লাভ করল। দেবেন্দ্রনাথ সেনের ক্ষীণকণ্ঠ তাতে হারিয়ে গেল, ভাওয়ালের কবি গোবিন্দ দাসের সুর পদ্মা পার হয়ে বেশি দূর পর্যন্ত ছড়াতে পারল না। কিন্তু বাঙালীর এই লুপ্ত ঐতিহ্যকে সাহিত্যে নতুন ক'রে ফিরিয়ে আনলেন মোহিতলাল। রবীন্দ্রনাথের জীবনপ্রেমের সঙ্গে এসে মিশল হুইট্‌ম্যানের পেশল দেহ, লরেন্সের দেহ-কামনার দার্শনিকতা তাকে বহু-বিস্তীর্ণ ক'রে দিলে। আর সেই সঙ্গে বাংলার তান্ত্রিক বীরাচার রক্তটীকা পরিয়ে দিলে মোহিতলালের ললাটে।

এই বহু-বিচিত্রের মিলনে মোহিতলালের দেহবাদ সরলরেখা তো নয়ই, তা রিরংসাবাদও নয়। তাই 'কল্লোলে' বেদনাবাদী নারী-নিন্দক দার্শনিক সোপেনহাওয়েরের প্রতিবাদে "পান্থ" কবিতায় যেমন তিনি শোনালেন :

স্থষ্টিমূলে আছে কাম, সেই কাম দুর্জয় দুর্বার!
যূপবদ্ধ পশু আমি ?—ভরিতেছি মৃত্যুর খর্পর
তপ্ত শোণিতের ধারে ?—না, না, সে যে মধু'র উৎসার!
দুই হাতে শূন্য করি পূর্ণ সেই মধুচক্র প্রতি পূর্ণিমার!" (বিস্মরণী)

তেমনই পরের বছরেই 'ভিরেট' থেকে অনুভাবিত "প্রেতপুরী" কবিতায় তাঁর আর্ত হাহাকার শোনা গেল 'কল্লোলে'র পাতাতেই :

আমারও মিটেছে সাধ,
চিত্তে মোর নামিয়াছে বহুজন-তৃপ্তি-অবসাদ।
তাই যবে চাই তোমাপানে—
দেখি, ওই অনাবৃত দেহের শ্মশানে

প্রতি ঠাঁই আছে কোনো কামনার সন্ত-বলিদান।
—চুম্বনের চিতাভস্ম, অনঙ্গের অঙ্গার-নিশান।
. যবে তোমা বাঁধিবারে যাই বাহুপাশে—
অমনি নয়নে মোর কত মৌনী ছায়ামূর্তি ভাসে।
(হেমন্ত-গোধূলি)

মোহিতলালের দেহবাদে এই ছুটি দিকই সত্য; অথবা এই ছুটিকেই অতিক্রম ক'রে একটি তৃতীয় সত্য তাঁর কাব্যে ব্যঞ্জিত হচ্ছে। আর এই তৃতীয় সত্যটিকে আলোচনা করলেই মোটামুটি মোহিতলালকে চিনতে পারা যাবে।

এ কথা অস্বীকার ক'রে লাভ নেই, মোহিতলালও প্রথমত রবীন্দ্রনাথেরই শিষ্য। কিন্তু এই শিষ্যত্ব সব সময়েই সরল বিশ্বাস আর অটুট ভক্তির দ্বারা চালিত হয় নি, তার মধ্যে দুর্বিনয় আছে। আর কে না জানে, দুর্বিনীত শিষ্যই অধিকাংশ ক্ষেত্রে গুরুর সর্বশ্রেষ্ঠ গৌরব হয়ে দাঁড়ান।

যে জীবনপ্রেম রবীন্দ্র-কাব্যের স্থায়ী-ভাব, মোহিতলালও তারই ওপরেই নির্ভর করেছেন। রবীন্দ্রনাথের মতই তাঁর শিষ্য জন্মে জন্মে পৃথিবীর ঘাটে ঘাটে কলস ভ'রে নেবার প্রার্থনা করেছেন, জগৎকে ছাড়িয়ে কোনও মুক্তিই তাঁকে প্রলুব্ধ করে নি। এই জীবনপ্রেমে রবীন্দ্রনাথের কাছে পৃথিবীর ধূলি পর্যন্ত মধুমান, বিপুল ব্যাপ্ত মহাসৌন্দর্যে তাঁর দেহ বিদেহী। কিন্তু সব কিছুর অন্তরালেই রবীন্দ্রনাথের মূল কথা রয়েছে, 'জ্যোতির্ময় মুক্তি'। কায়িক-আসক্তির বস্তুবন্ধনে রবীন্দ্রনাথের কবিসত্তা বেশিক্ষণ স্বস্তি বোধ করতে পারে নি; ক্রমশই তা ক্লান্ত আর উদাস হয়ে এসেছে, দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেছে, 'মাটির বুকের মাঝে বন্দী যে জল মিলিয়ে থাকে, মাটি পায় না তাকে'। এই সিদ্ধান্তের ফলেই জীবনের ক্ষীর-নীর থেকে তার ভাবরূপ ক্ষীরটুকুকেই গ্রহণ করেছেন তিনি, ফুলটিকে ছিঁড়ে না এনে পরিপূর্ণ দুই চোখে নিতে চেয়েছেন তার লাবণ্যকে।

কিন্তু ক্ষীরের উৎকর্ষ সর্বতোভাবে স্বীকার ক'রেও বলা উচিত, নীরটা মায়া নয়। এবং মানুষমাত্রেই হংস নয় যে 'ক্ষীরাম্বুমধ্যাৎ' সব সময়ে সে শ্রেয় বস্তুকে বেছে নিতে পারবে। তাই ক্ষীর-সন্ধানী হয়েও মোহিতলাল নীরকে উপেক্ষা করতে পারেন নি, বরং নীরের প্রতি আসক্তিটাই তাঁর কবিতায় প্রবলতরভাবে প্রকাশ পেয়েছে। আরও সংক্ষেপে বলা যায়, জীবনপ্রেম রবীন্দ্রনাথ এবং মোহিতলাল দুজনেরই আলম্বন-বিভাব, কিন্তু উদ্দীপন-বিভাবের ক্ষেত্রে শিষ্য স্বতন্ত্রচারী।

"মৃত্যু-শোক" কবিতায় মোহিতলাল যে দেহ-বন্দনা করেছেন, বাংলা-সাহিত্যে তা অবিস্মরণীয়। মোহিতলাল এই কবিতায় দেহকে স্থান দিয়েছেন দেবতারও উর্ধ্বলোকে, ভুবনেশ্বরের চাইতেও নশ্বর দেহ তাঁর কাছে বেশি বাঞ্ছিত। ভগবান শাশ্বত, এক জন্মে না হোক, জন্মান্তরের সাধনায় তিনি লভ্য; কিন্তু মর্ত্যের রূপরেখায় গঠিত এই দেহ একবার মাত্রই মূর্তিপরিগ্রহ করে—"For no man under the sky lives twice outliving his day"! সুতরাং এই ক্ষণবিম্ব কায়ার প্রতি তাঁর বন্দনা এইভাবেই উৎসারিত :

> যার সাথে দেখা শুধু একবার, অসীমের সীমানায়,
> জন্ম-নদীর জল-বুদ্বুদ মৃত্যুর মোহানায়!—
> চল-তরঙ্গ তটের কিনারে
> আছাড়ি' পড়িয়া গড়িছে যাহারে,
> তার সে ভঙ্গি ধরিতে কে পারে স্রোতোমুখে পুনরায়?
> তাই জীব যে গো শিবেরও অধিক দুর্লভ-কামনায়! (বিস্মরণী)

অতএব এই বুদ্বুদ-বিকাশ দেহকে স্বল্পবৃত্ত জীবনের মধ্যে পরিপূর্ণ আস্বাদনই তাঁর কাম্য। আর এই দেহ প্রকটিত হয়েছে অর্ধনারীশ্বর রূপে, এক দিকে তার যোগস্থ পুরুষ—অপর দিকে লীলাচঞ্চলা প্রকৃতি। এই প্রকৃতিকে অস্বীকার করার অর্থ সত্তাকে খণ্ডিত করা। মোহিতলাল এই খণ্ডতাপন্থীদের তীব্র ভাষায় ধিক্কার দিয়েছেন তাঁর "মোহমুদ্গরে", তাঁর "বুদ্ধ" কবিতায়।

দেহলীলার যে অংশে প্রকৃতি, সেখানে তত্ত্ব-সন্ধান বিড়ম্বনা। প্রকৃতির মৌল-শক্তি কামনা, প্রকৃতির লক্ষ্য হ'ল সৃষ্টি। তা পাপও নয়, পুণ্যও নয়। "নারীস্তোত্রে" মোহিতলাল বলেছেন—

দেহই অমৃত-ঘট, আত্মা তার ফেন-অভিমান!
সেই দেহ তুচ্ছ করি' আত্মা-ভয়-বন্ধন-জর্জর
ভ্রমিছে প্রলয়-পথে অভিশপ্ত প্রেতের সমান—
আত্মার নির্বাণ-তীর্থ নারীদেহে চায় তবু আত্মার সন্ধান!

(স্মর-গরল)

একচক্ষু হরিণের মত প্রকৃতির এই সত্যলীলাকে অস্বীকার করেছেন বিকৃতবুদ্ধি সোপেনহাওয়ের, চির-পলাতক শঙ্করাচার্য শুনিয়েছেন—নরকস্য দ্বারো নারী। কিন্তু কে এই নারী? সে তো জীবনের মধ্যে প্রক্ষিপ্ত একটা আকস্মিক বিপর্যয় নয়; পুরুষের কামনা থেকেই তার আবির্ভাব। অনন্তশায়ী বিষ্ণুরূপী পুরুষের হৃদয় থেকেই লক্ষ্মীরূপা নারীর অভ্যুদয়—আদমের পঞ্জর থেকেই ইভের সৃষ্টি। তাই নারীকে অস্বীকার করার অর্থ যে নিজেকেই অস্বীকার করা! প্রতি মুহূর্তে বাঁচবার জন্যে যেমন প্রয়োজন আকাশের সূর্য, যেমন প্রয়োজন জল, যেমন প্রয়োজন বাতাস, তেমনই কামনার সুধাবিষ-করঙ্কবাহিনী নারীও একটা অপরিহার্য প্রাকৃতিক দা।ব।

প্রকৃতির প্রাণরূপা, স্বতস্ফূর্ত আহ্লাদিনী রতি—
স্বচ্ছন্দ-স্বৈরিণী ও যে, নিত্যশুদ্ধা—নহে সতী, নহে সে অসতী।

(স্মর-গরল)

পাপপুণ্য নির্ধারণের দায়িত্ব রইল বাকি অর্ধাংশের—যে অংশ পুরুষ। কিন্তু পাপের সংজ্ঞাই বা কে দিতে পারে? ফুলফোটা যদি পাপ না হয়, সূর্যোদয়ের মধ্যে যদি পাপ না থাকে, তা হ'লে প্রকৃতির প্রাণরূপা রতিময়ী নারীকেই বা নরকের দ্বার বলা যাবে কোন্ অধিকারে? এ কথা ঠিক, কামনায় আঘাত আছে, বাসনায় আছে [illegible] এই আঘাতেই চিরকাল কবির কণ্ঠে

গান উঠেছে, এই জ্বালাই চিরকাল মানুষকে সাহিত্যের আদি-প্রেরণা এনে দিয়েছে ; "কণ্টকে ফোটে রক্ত-কুসুম বাসনা-সুরভি ঢালা"।

জীবন-রসিক মোহিতলাল বিশ্ব-পৃথিবীর আকাশ-বাতাসের সঙ্গে লালসাকে তাই সহজ স্বভাবধর্মরূপে গ্রহণ করেছেন। তাঁর 'পাপ' কবিতায় তিনি স্পষ্ট বলেছেন :

> কামনার মণি, বাসনার সোনা, আশার রতন-খনি—
> জানে না—জীবন কল্পলতিকা, ধরণী কি ধনে ধনী।
> বেদনার মূলে বিকাইছে তাই নাম হ'ল তার পাপ।
> এইটুকু দিতে তবুও কৃপণ, হায় এ কি অভিশাপ।

এবং

> পাপ কোথা নাই—গাহিয়াছে ঋষি, অমৃতের সন্তান ;
> গাহিয়াছে, আলো বায়ু নদীজল তরুলতা মধুমান্।
> প্রেম দিয়ে হেথা শোধন-করা যে যজ্ঞের সোমরস।
> সে রস বিরস হ'তে পারে কভু—হ'তে পারে অপযশ।

(স্বপন-পসারী)

লক্ষ্য করা দরকার—পরিপার্শ্ব থেকে, পৃথিবী থেকে মোহিতলাল দেহকে কখনও বিচ্ছিন্ন ক'রে আনেন নি। তা যদি হ'ত, তা হ'লে নিঃসন্দেহে তাঁকে রিরংসাপন্থীই বলা যেতে পারত। কিন্তু ঐকান্তিক জীবনপ্রেমে মোহিতলাল দেহকে প্রতিষ্ঠা করেছেন বিশ্বব্যাপী একটি সমগ্রতার সৌন্দর্যের মধ্যে, রূপ-রস-বর্ণ-গন্ধের সহস্রদল পৃথিবীপদ্মের সৌরভরূপে কামনাকে তিনি উপলব্ধি করেছেন। এই পটভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে আনলেই দেহ তার সম্পূর্ণ তাৎপর্য হারায়। বৃন্তছিন্ন ফুল যেমন অসময়েই শুকিয়ে আসে, সেই রকম পরিবেশবিহীন দেহ সম্ভোগ-ক্লিন্নতার পঙ্কে বীভৎস হয়ে ওঠে। এই সহজ সত্যটি মনে না রাখলে মোহিতলালকে ভুল বোঝবার প্রচুর সম্ভাবনা আছে। 'হেমন্ত-গোধূলি'র "নাগার্জুন" যখন বলছে, "কামের পূজারী আমি হে মহেশ,

গেলেই বিপর্যয় বাধবে। রবীন্দ্রনাথের 'আনন্দরূপমমৃতম্'-এর মৃত্তিকা থেকেই মোহিতলালের বাসনা-লতা প্রাণরস আহরণ ক'রে এনেছে, বিদ্রোহী হ'লেও মোহিতলাল রবীন্দ্রমন্ত্রেরই সাধক।

কিন্তু দেহ-ধর্মের এই অনিবার্যতাকে স্বীকার করাই কি মোহিত-লালের শেষকথা?

আমার পীরিতি দেহ-রীতি বটে, তবু সে যে বিপরীত—
ভস্মভূষণ কামের কুহকে ধরা দিল স্মরজিৎ।
ভোগের ভবনে কাঁদিছে কামনা—
লাখ' লাখ' যুগে আঁখি জুড়াল না।
দেহেরি মাঝারে দেহাতীত কার ক্রন্দন-সঙ্গীত! (স্মর-গরল)

ভোগকে এমনভাবে আরতি ক'রেও এই ক্রন্দন-সঙ্গীত কিসের জন্মে?

বার্নার্ড শ তাঁর 'মানব ও অতি-মানবে' এক 'লাইফ ফোর্সে'র কাছে নতি-স্বীকার করেছেন। তাঁর একান্ত বুদ্ধিবাদী বিদ্রোহী ট্যানার পর্যন্ত শেষে ধরা দিয়েছে এই শক্তির কাছে। কৌতুকের ভঙ্গীতে সে যাই বলুন, এর মধ্যে একটা গভীর সত্য আছে—পরাজিত পুরুষের একটা আকুল আর্তনাদ বেজে উঠেছে এর অন্তরাল থেকে। পুরুষ—অর্ধনারীশ্বরের যোগীসত্তা—চিরকাল বৃহত্তর-মহত্তরের সাধনা ক'রেই চলেছে। কিন্তু প্রকৃতি বারে বারে তার যোগভঙ্গ করে, সৃষ্টির প্রয়োজনে তাকে নামিয়ে আনে তার স্বাধিষ্ঠানক্ষেত্র থেকে। এই পরাজয়-স্বীকারে পুরুষের গৌরব নেই। অনিবার্যকে সে মেনে নেয় বটে, কিন্তু একটা ক্ষুব্ধ প্রতিবাদ মনের মধ্যে সব সময়েই তার ফেনিল হয়ে থাকে।

মোহিতলালও এই বেদনা অনুভব করেছেন। আর সে অনুভূতির প্রমাণ—ভোগের মধ্যে তাঁর ভোগ-বিরতির ব্যাকুলতা। তাই বাসনার শিখায় যখন ইন্দ্রিয় তাঁর মশালের মত জ্ব'লে ওঠে, কামনার বন্যা দেহকে যখন ভাসিয়ে নিয়ে যেতে চায়, তখন অকস্মাৎ কেন "অকাল-সন্ধ্যা"র হিমাক্ত ক্লান্তি তাঁকে স্পর্শ করে?

মর্ত্ত্য-পারিজাত ওই দু' অধর শোণিত-বরণ,
পিপাসার মৃত-সঞ্জীবনী—
নিবিড় চুম্বন যার—মুমূর্ষুর সূচিকাভরণ,
নেচে ওঠে সকল ধমনী—
তা'ও আজ ম্লান, সখি, নাহি তায় জ্বালা উন্মাদন,
এ হৃদয় মধুথ-বর্তিকা
গলিল না, জ্বলিল না প্রাণ-যজ্ঞে সঘৃত ইন্ধন,
ধূম্রনীল বাসনার শিখা! (বিস্মরণী)

আপাত-বিরোধী হ'লেও মোহিতলালের বিখ্যাত "নারীস্তোত্রে" একটি জিনিস লক্ষ্য করার আছে। এই স্তোত্র কি সর্বাঙ্গীণভাবে নারীর বন্দনা? ইস্‌লামে নাকি নারীর আত্মাকে স্বীকার করা হয় নি এবং সে জন্যে যথেষ্ট বিদ্রূপতাও প্রকাশ করেছেন সহৃদয়েরা। কিন্তু এই কবিতাতে মোহিতলালও নারীকে বলেছেন "আত্মার নির্বাণ-তীর্থ"। প্রকৃতি যেমন একটা অন্ধ সৃষ্টিশক্তি, নারীও তাই, এবং সেই জন্যে তিনি সতী ও গণিকার মধ্যে কোনও প্রভেদের সীমারেখা টানেন নি। তাঁর প্রেম অপক্ষপাত :

আমি যে বেসেছি ভাল দুই জনে, সমান দোঁহারে—
শুভ্রমুখী যশোধরা—নিশিপদ্ম বসন্তসেনারে! (হেমন্ত-গোধূলি)

"নারীস্তোত্রে"র সমস্ত স্তব-স্তুতির অন্তরালে পরোক্ষভাবে এই 'লাইফ ফোর্সে'র স্বীকৃতি। নারীকে মোহিতলাল একটা বিশেষ রূপের মধ্যেই সীমিত ক'রে ফেলেছেন ব'লে, ভোগৈকরূপ নারীদেহ কখনও কখনও তাঁর পুরুষ-সত্তার মহত্তর সাধনাকে আঘাত করেছে, "আমি যে বধূরে কোলে করে কাঁদি, যত হেরি তার মুখ!" এর ফলে, জীবন-রসিক মোহিতলালও কোনও কোনও দুর্বল মুহূর্তে জীবনে বীতস্পৃহ হয়ে উঠেছেন, 'স্মর-গরলে'র "নির্বাণ" কবিতাতেই তার নিদর্শন মেলে। দেহ-সর্বস্ব নারীর কাছে যোগস্থ পুরুষের পরাভব স্বতঃসিদ্ধ জৈব-নিয়তি। মোহিতলালের জীবনদর্শনের সর্বশ্রেষ্ঠ

অভিব্যক্তি "পান্থ" কবিতায় পর্যন্ত এই পরাভব-বেদনার আভাস আছে :

নিঃসঙ্গ হিমাদ্রি-চূড়ে জ্বলিয়াছে হর-কোপানল,
মদন হয়েছে ভস্ম, রতি কাঁদে গুমরি' গুমরি' !
উমা সে গিয়েছে ফিরে, অশ্রু-চোখ ম্লান ছল-ছল—
ফুলগুলি ফেলে গেছে ঈশানের আসন-উপরি ;
আঁখিতে আঁকিয়া গেছে অধরোষ্ঠ—পক্ক বিম্বফল !
শ্মশানে পলায় যোগী তারি ভয়ে ধ্যান পরিহরি'—
বধূর দুকূলে তবু বাঘছাল বাঁধা প'ল—আহা, মরি মরি ! (বিস্মরণী)

কিন্তু ভারতীয় মোহিতলাল এই শেভিয়ান 'লাইফ ফোর্স'কেই সমাপ্তি-সিদ্ধান্তরূপে মেনে নেন নি। দেহ-কামনার এই অনিবার্য নিয়মকে ভারতীয় তান্ত্রিকতার মধ্যে তিনি আরোপ করেছেন।

মোহিতলাল বার বার বলেছেন, তিনি শাক্ত, তিনি বীরাচারী। শক্তিসাধনায় তান্ত্রিককে যেমন পঞ্চমকারকে আশ্রয় করতে হয়, যা পরিহার্য তাকে অবলম্বন ক'রে সিদ্ধির পথে অগ্রসর হতে হয়, মোহিতলালও সেই রকম নারী এবং কামনাকে জীবন-সাধনার উপকরণ-রূপে গ্রহণ করেছেন। বীরাচারী মদ্য-মাংস-মৈথুনকে ব্যবহার করেন সিদ্ধির উর্ধ্বতম লোককে লাভ করবার জন্যে, মোহিতলালও দেহ-কামনাকে পূর্ণতর সাফল্যের উপায়ন হিসাবে মেনে নিয়েছেন। অর্ধ-নারীশ্বরের যোগী-পুরুষকে মোহিতলাল অস্বীকার করেন নি, নারীকে তিনি দেখিয়েছেন তার উত্তরসাধিকার প্রমূর্তিতে। সেই জন্যেই "দেহের মাঝারে দেহাতীত কার ক্রন্দন-সঙ্গীত"। তাই তান্ত্রিক মোহিতলাল তাঁর বামাচারকে উপকরণের মধ্যেই রেখেছেন, "আমার সঙ্গিনী" হিসাবে নারীকে যে মর্যাদা রবীন্দ্রনাথ দিয়েছেন, সে গৌরব দান করা মোহিতলালের পক্ষে সম্ভব হয় নি।

তার আর একটি কারণ, কবি-প্রতিভায় মোহিতলাল পরিপূর্ণ পুরুষ। এই পুরুষ শক্তিমান ও বীর্যবান, এই পুরুষ দুর্যোগের কালরাত্রি পার হওয়ার জন্যে নিঃসঙ্গ ও নিঃশঙ্ক যাত্রায় অগ্রসর। এই অগ্রগামী

পুরুষের ওপর কবির বিশ্বাস যেমন অসীম, তেমনই নারীর আহ্লাদিনী রতিরূপকেও তিনি স্বীকার করেন। সুতরাং তান্ত্রিক মোহিতলাল এই ভাবেই দুটির সামঞ্জস্য নির্ণয় করেছেন। তাই তাঁর "পীরিতি দেহরীতি বটে, তবু সে যে বিপরীত"। বৈষ্ণব-মানস রবীন্দ্রনাথের মধ্যে চির-বিরহের নিত্যলীলা, আর তান্ত্রিক মোহিতলাল বলেন :

ফুলের হিয়ার মধু,
চাহি না চাহি না, বঁধু!
রেশ্‌মী-রঙীন্‌ পাপড়ি যদি না
চারিধারে পড়ে লুটে'! (স্বপন-পসারী)

পৌরুষ-ধর্মী কবি মোহিতলালের শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলির প্রায় সব কটিই খরধার অক্ষরবৃত্তে রচিত। এর কারণও সুস্পষ্ট। অক্ষরবৃত্তের বলিষ্ঠ তীক্ষ্ণতা তাঁর ভাব প্রকাশে সহায়তা করেছে। শব্দ-নির্বাচনে বুদ্ধিবাদীর সতর্কতা তাঁর আর একটি লক্ষ্যণীয় বিশেষত্ব। আবেগকে তিনি বুদ্ধির বর্ম পরিয়ে পাঠিয়েছেন, তাই শব্দচয়নেও তিনি সর্বদা সজাগ।

কাব্য-নাট্যে মোহিতলালের সাফল্য রবীন্দ্রনাথের পরেই। কেবল এইগুলির মধ্য দিয়েই তিনি বাংলা-সাহিত্যে স্থায়ী আসন পেতে পারতেন। তার প্রমাণ "মৃত্যু ও নচিকেতা," তার প্রমাণ "নূরজাহান ও জাহাঙ্গীর"। "নাদিরশাহের জাগরণ" এবং "নাদিরশাহের শেষ"ও সম্ভবত এই পর্যায়েই পড়ে। তা ছাড়া বাংলা-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সনেট-সঙ্কলনেও মোহিতলাল অপরিহার্য, মাইকেলের পরে সনেট রচনায় এতখানি কৃতিত্ব বাংলা দেশে আর কেউ দেখিয়েছেন কি না সন্দেহ।

শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

আচার্য মোহিতলাল

মোহিতলালের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় কবি বা সাহিত্যিকরূপে নয়—গুরুরূপে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হিসাবে স্বাভাবিক অধিকারেই তাঁর শিষ্যত্ব লাভ করেছিলাম। কবি হিসাবে তাঁর নাম জানতাম মাত্র। তাঁর লেখা কাব্য তখনও পাঠ করি নি—দুর্বোধ্য ব'লে নয়, দুষ্প্রাপ্য ব'লেই তখন পর্যন্ত তাঁর কবিতার সঙ্গে পরিচয় ঘটে নি। তখন নজরুল ইসলাম, জসীমউদ্দীনের কবিতা আমাদের কিশোর মন হরণ ক'রে নিয়েছিল। এ নিয়ে গুরুদেবের সঙ্গে দু-একবার কথাও হয়েছিল। তাঁর কবিতা এবং কবি-প্রতিভা সম্বন্ধে আমার অজ্ঞতা আমি লুকোই নি। তিনি একটুও বিস্ময় বোধ না ক'রে বলেছিলেন, "এর জন্য আমার কিছুমাত্র দুঃখ নেই। আমি তো জনপ্রিয় কবি হবার সাধনা কোন কালেই করি নি। জনপ্রিয়তা শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় বহন করে না—রবীন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি, কিন্তু তাই ব'লে তিনি জনপ্রিয় নন।"

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই একবার তাঁকে কবি-সংবর্ধনা জানানো হয়—জগন্নাথ-হলে অনুষ্ঠানটির আয়োজন হয়েছিল। সে দিন প্রথম কবি-কণ্ঠে কবির স্বরচিত কবিতা "কালাপাহাড়"এর আবৃত্তি শুনলাম। অমন উদাত্ত কণ্ঠস্বর, স্পষ্ট ও সবল উচ্চারণভঙ্গী, আবৃত্তিকালে একটি ধ্যান-তন্ময় আত্মহারা ভাব আমি ইতিপূর্বে আর কোথাও দেখি নি। বিমুগ্ধ শ্রোতৃমণ্ডলীর সম্মুখে দেখতে দেখতে একটি সাঙ্গীতিক পরিমণ্ডল সৃষ্টি হয়ে গেল—তার মধ্যে কবি আপন কবি-স্বপ্নের ধ্যানে যেন আত্মসমাহিত।

ঠিক এই ধ্যান-সমাহিত তন্ময় মূর্তি দেখেছি ক্লাসে অধ্যাপনাকালে। সেখানে কবি একা বক্তা, ছাত্রদল শ্রোতা। বিশ্ববিদ্যালয়ের ষাট মিনিটে ঘণ্টা—প্রায় পুরো ঘণ্টাটাই তিনি পড়াতেন। আবার এমনও দিন দেখেছি, ঘণ্টা বেজে গেলেও তিনি অধ্যাপনায় বিরত হতে চাইতেন না। অধ্যাপনা যে ধ্যানকর্ম হতে পারে—অধ্যাপনাকেও যে সাহিত্যের স্তরে উন্নীত করা চলে, এই প্রথম গুরুদেবের কাছ থেকে

উপলব্ধি করলাম। কাব্যবিচার-প্রসঙ্গে অথবা কোন উপন্যাস কিংবা প্রবন্ধের বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তিনি তার অতি গভীর মর্মলোকে গিয়ে পৌঁছতেন—আমরা মুগ্ধ ভক্ত শিষ্যের ন্যায় তাঁকে অনুসরণ ক'রে এক অনাবিষ্কৃত কাব্যলোকে গিয়ে পৌঁছতাম। মনে হ'ত, এও যেন একজন নিপুণ কবিশিল্পীর রচিত একটি অপূর্ব কাব্য। কবিতা কিংবা উপন্যাস পাঠকালে আমাদের মনে পূর্বে যে সংশয় থাকত, কাব্যের মধ্যে যে অসামঞ্জস্য ও বিরোধ দেখা দিত, তাঁর অধ্যাপনার মধ্য দিয়ে আমাদের কাছে সে-সব একটি গভীরতর ও গূঢ়তর অর্থের মহিমায় সার্থক হয়ে উঠত। কাব্য ও উপন্যাসের মর্মোন্মেষণের মধ্য দিয়েই যেন কবির সঙ্গে আমাদের নূতন ক'রে পরিচয় ঘটত।

গুরুদেবের পঠন-পাঠনপদ্ধতি একান্তভাবেই তাঁর নিজস্ব ছিল। কাব্যের মধ্যে কিংবা সমালোচনা-সাহিত্যের মধ্যে কবি ও সমালোচক মোহিতলালের যে একটি পৌরুষ-ব্যক্তিত্বের ছাপ স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে, তেমনই তাঁর অধ্যাপনার মধ্যেও আচার্য মোহিতলালের একটি বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব ফুটে উঠত। ছাত্রেরা সেই ব্যক্তিত্বের সম্মুখে অভিভূত হয়ে পড়ত। সম্ভবত সেই কারণেই সাহিত্যক্ষেত্রে মোহিতলালের অনুরাগী ও ভক্তের চাইতে ছাত্র ভক্ত ও অনুরক্তদের সংখ্যাই অনেক বেশি। অধ্যাপনা ব্যাপারে অন্যান্য অধ্যাপকদের সঙ্গে তাঁর মিল ছিল না। বইখানি যে পাঠ্য, এ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্ন আসবে এবং সে প্রশ্নের জবাব লিখতে হবে—সে দিকে দৃষ্টি রেখে তিনি পড়াতেন না। কবিসুলভ একটি অখণ্ড ও সমগ্র দৃষ্টি নিয়ে তিনি গ্রন্থের মর্মলোকে প্রবেশ করতেন; সৃষ্টির মধ্যে স্রষ্টাকে এবং স্রষ্টার মধ্যে সৃষ্টিবীজকে আবিষ্কার করতেন। তার পর ধীরে ধীরে সমালোচনাচ্ছলে তিনি তাঁর বিভিন্ন সৌন্দর্যরসের দিকটা শতদল পদ্মের এক-একটি পাপড়ির মত মেলে ধরতেন। বিকশিত পদ্মের ন্যায় সেই কাব্য কিংবা গ্রন্থের সৌন্দর্য বা রসরূপ আমরা অপরোক্ষ করতাম, বাংলা সংস্কৃত ও ইংরেজী সাহিত্যের ত্রিবেণী সঙ্গমে অবগাহন ক'রে আমরা ধন্য হতাম। গুরু-

শিষ্যের অন্তরঙ্গ সান্নিধ্যে সাহিত্যের সেই রসাস্বাদন বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাসগুলোকে সুধাস্নাত ক'রে রাখত। তাঁর অধ্যাপনা ছিল সৃষ্টি। বস্তুত সাহিত্যের অধ্যাপনা যদি সৃষ্টিক্রিয়ায় না গিয়ে পৌঁছয়, তা হ'লে তা কখনই সহৃদয়-হৃদয়-সংবেদ্য হতে পারে না। গুরুদেবের অধ্যাপনায় সেই অপূর্ব সৃষ্টিশক্তির পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ হয়েছি। বাংলা-সাহিত্যের পঠন-পাঠনে তিনি ছিলেন নবযুগের পথিকৃৎ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনাকালে মোহিতলাল প্রথম জীবনের কাব্যের স্বপ্নলোক থেকে সমালোচকের কঠিন ও দৃঢ় মৃৎভূমিতে নেমে এসেছিলেন। কিন্তু সেখানেও তাঁর সেই কবির রস-দৃষ্টি নষ্ট হয় নি, সেই বোধি বা প্রজ্ঞা তাঁর মধ্যে তেমনই অটুট ছিল। তাই মোহিতলালের সমালোচনা-গ্রন্থগুলি শুধু বিশ্লেষণী আলোচনায় পর্যবসিত হয় নি, তা সার্থক সাহিত্য-সৃষ্টি হয়েছে। বাংলা-সাহিত্যে মোহিতলাল যে সাহিত্য-বিচারের নবসংহিতা রচনা ক'রে গেলেন, এ কৃতিত্ব সম্পূর্ণ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের। কবির সঙ্গে সমালোচকের মূলগত কোনও বিরোধ নেই। কিন্তু কবি ও সমালোচকের মিলন যে কোন সাহিত্যেই দুর্লভ। বাংলা-সাহিত্যে মোহিতলালের মধ্যে কবি-সমালোচকের মণিকাঞ্চন যোগ ঘটেছিল। আমাদের সাহিত্যের পক্ষে তা যে অতিশয় শুভপ্রদ হয়েছিল তাতে কোন সন্দেহই নেই। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-সমাজের পক্ষে এ এক দুর্লভ গৌরব যে, একদা তারা মোহিতলালকে শিক্ষাচার্যরূপে পেয়েছিল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীবৃন্দ সে দুর্লভ সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিতই র'য়ে গেল।

শ্রীপৃথ্বীশ নিয়োগী

তবু

নিশীথ রাত্রির বুকে স্বতঃদীপ্ত তারাদল মাঝে
শোভা পায় যে গ্রহেরা আমাদেরি রবিকরোজ্জ্বল—
ছিলে তার মধ্যমণি ; অকস্মাৎ নক্ষত্রসমাজে
ঠাঁই নিলে চিরন্তন—তবু মোরা বেদনাবিহ্বল।

কবি মোহিতলাল-স্মরণে

বঙ্গভারতীরে আর কে পরাবে সৌন্দর্যকুসুম,
বাঙালীর ক্লান্ত ভালে কে আঁকিবে কেশর-কঙ্কুম,
হে কবি মোহিতলাল, একনিষ্ঠ বাণীর পূজারী !
অনুরাগ পুষ্পিত করে কে মুছাবে বেদনার বারি !
আঁধার বিক্ষুব্ধ রাতে বাঙালীরে কে দেখাবে পথ ;
দিগ্বিজয়ী বাঙালীর স্বর্ণময় ঐতিহ্যের রথ—
কে তাহারে দিবে গতি, সারথিত্ব করিবে গ্রহণ ?
সাহিত্য-সাধনব্রতে কে করিবে বল মৃত্যুপণ !
আরতির লগ্ন যায়, শূন্য আজি তোমার আসন,
বাণীর মন্দির বুঝি দীপহীন ক্রন্দসী শাওন।
শ্রাবণ-মেঘালি রাত নতনেত্রে কাঁদিছে অঝোরে
বাণীর মোহিতলাল, কোথা গেলে কোল শূন্য ক'রে ?

দৈন্য-জীর্ণ আশাহত বাঙালীর চোখের সম্মুখে
কে ধরিবে ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ মূর্তিখানি ; ভগ্ন বুকে
কে বাজাবে উচ্চাশার প্রণব-সঙ্গীত ; উর্ধ্ব শির
কে তুলিবে যুক্ত করে বিজয়-নিশান—কোথা বীর
যে ঘোষিল সর্বমুক্ত জীবনের পূর্ণ জয়গান,
অমর বীণার তারে যে গাহিল সঞ্জীবন-তান।
সাহিত্য-যজ্ঞের তুমি হে ঋত্বিক বাণীর কুমার !
বাঙালী মানুষ হোক—এ সাহিত্য-সাধনা তোমার।
শরৎ-সূর্যাস্ত সম আকাশের বিচিত্র বর্ণালি
বঙ্গভারতীর দ্বারে কাব্য তব আনন্দ-দীপালি।
সাহিত্য-গগনে তুমি কখনো বা ইন্দ্রধনুচ্ছটা
সৃষ্টির দিগন্তে তুমি কখনো বা শ্যাম ঘন-ঘটা।
অতন্দ্র আঁধারে তুমি দীপ্তালোক জ্যোতিষ্কের মত
বাঙালী-মনন-পথে ; সুন্দরের ধ্যান-স্বপ্নে রত।

শুষ্ক, জীর্ণ, পাণ্ডু-দগ্ধ সাহিত্যের মরুভূ-প্রান্তরে
আষাঢ় প্রার্থনা তুমি। সৃষ্টির প্রাচুর্য নিয়ে করে

কৃষ্ণকান্ত ভারনম্র প্রাণদাত্রী জলভরা মেঘ
নিশীথ তামসীরাতে পূর্বাশার তুমি রক্তরেখ।
বসন্তের প্রাণবন্যা শীতদীর্ণ নিরানন্দ দেশে
তুমি ছিলে ফাল্গুনের পুষ্পালি বন্দনা। সূর্যবেশে
ভাঙিতে জড়ের ঘুম—রথচক্র ঘর্ঘরিয়া তুমি।
সৃষ্টিহীন বন্ধ্যা হ'ত রসোময় শ্যাম-শষ্পভূমি।
সৃষ্টি যেথা ব্যভিচার নিষ্ঠাহীন ফেনিল প্রলাপ
বিকারের ঘোরে, দুর্বাশার তুমি তীব্র অভিশাপ
ক্ষমাহীন ভীষণ নিষ্ঠুর। সাহিত্যের আবর্জনা
পঙ্গুসার বিকলাঙ্গ অধমের বাণীর বন্দনা
তুমি সেথা রুদ্রসম হীনবীর্যে হানিতে আঘাত।
প্রচণ্ড শরতে তুমি শীত সম আসি অকস্মাৎ
রুগ্ন উচ্ছ্বাসেরে দিতে পূর্ণ স্তব্ধ করি। শিবময়
সত্য পথে তোমার আনন্দ গতি মহাজ্যোতির্ময়।
নিষ্করুণ শীত তুমি সুপ্তবুকে চৈতালি স্বপন
শিল্প কুরুক্ষেত্রে তুমি তেজময় দিব্য নারায়ণ।

গাঙ্গেয় সাহিত্যভূমে অগ্রগামী তুমি ভগীরথ,
যা কিছু সুন্দর সৃষ্টি তারে তুমি দিয়ে গেছ পথ।
হে আচার্য! বাণীপুত্রদের তুমি করিতে বরণ
পুষ্পমাল্যে আরক্ত চন্দনে, পাঞ্চজন্যে করিতে গ্রহণ
সাহিত্যের অমর-সভায়। যুগন্ধর হে যুগদিশারী!
সাহিত্য-শোধন-যজ্ঞ ক'রে গেছ শিব মন্ত্রোচ্চারি।
হোতা তুমি, ঋষি তুমি, হে কবীন্দ্র, হে মহাযাজ্ঞিক!
সাহিত্য-বিচারে তব শুনি আজো হোমমন্ত্র ঋক।

যেদিন রবীন্দ্ররশ্মি পূর্বাশার দিক্‌চক্রতলে,
প্রথম জাগিতেছিল পুঞ্জীভূত অন্ধকার দ'লে—
সেদিন সে সূর্যরথে তুমি ছিলে অরুণ সারথি
সপ্তাশ্বের রথরশ্মি করে। সূর্যস্বপ্নে অগ্রদূত তুমি
আলোর উদয়-বাণী বিঘোষিলে ; সুপ্ত বঙ্গভূমি।
রবীন্দ্র-প্রকাশ-বহ্নি তোমার পতাকা-শীর্ষে আঁকি
সূর্যালির আগমনী গেয়ে গেছ ঘুমন্তেরে ডাকি।
অগ্রগামী হে সৈনিক, মৃত্যুঞ্জয়ী, তোমারে প্রণাম,
তোমার প্রাণের স্পর্শে প্রাণময় ছিল বঙ্গধাম।
রবিহীন বঙ্গে তুমি জ্যোতিষ্কের মহা প্রতিনিধি
বঙ্গবাণী রূপকার—হে প্রজ্ঞাতনা, ওগো কলানিধি!
'বিস্মরণী' রবে তব স্মরণের স্বর্ণতীর্থ 'পরে
তোমার অমর নাম বঙ্গ-ভারতীর ঘরে ঘরে।
'স্মর-গরলে'র বুকে অমৃতের অনন্ত ভাণ্ডার
নীলকণ্ঠ শিব তুমি ভার নিলে সুধা বিলাবার।
মৃণ্ময়ী মায়ের কোলে আজ তুমি রূপছন্দে নাই,
কাব্যরসলোকে কবি তোমার নিবিড় স্পর্শ পাই।
আত্মার আত্মীয় তুমি, হে ভাস্বর, হে অবিনশ্বর!
মৃত্যু আজি নতশির,—কালজয়ী সিংহাসন 'পর
তোমার আসন পাতা। গুরু, বন্ধু, সখা ছিলে তুমি,
তোমার স্মরণস্পর্শে রক্তরাঙা আজি চিত্তভূমি।
সৌন্দর্যের রসলোকে আনন্দের তীর্থভূমি 'পরে
হে পূর্বজ! নিয়ে যেতে প্রেমচিত্তে হাতখানি ধ'রে।
বাঙালী মোহিতলাল! পূর্ণতার ওগো মহাকবি!
বাঙালীর চিত্তপটে এঁকে গেছ স্বর্ণদীপ্ত ছবি।
হে আচার্য, হে মহান, বাণীপুত্র, হে শ্রেষ্ঠ বাঙালী!
তোমারে প্রণাম করি অন্তরের ভক্তিদীপ জ্বালি!

আজি এই শ্রাবণের মেঘক্ষুব্ধ ব্যথিত সন্ধ্যায়,
অশ্রুর আনত অর্ঘ্য সাজাইয়া দিনু তব পায়।

শ্রীনচিকেতা

'স্মর-গরলে'র কবি মোহিতলাল

স্মর-গরলে'র কবি মোহিতলাল "বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্" যেমন রূপায়িত করেছেন, 'রীতিরাত্মা কাব্যস্য' ওজঃ, প্রসাদ, মাধুর্যধ্বনি ও ব্যঞ্জনার মধ্যে সর্বজনীন, সর্বগ্রাহ্য সত্যের মানবচেতনা রেখেছেন। মোহিতলাল মাটির ধরণীতে মাটির প্রতিমা গড়েছেন, মাটির প্রতিমার অন্তরে দেহমাতার, দেহবধূর, দেহলক্ষ্মীর এবং দেহবিশ্ববিধাতার রূপ ভালবাসা দিয়ে গড়েছেন। মোহিতলালের যাকে ধরা যায়, চেনা যায়, বোঝা যায়, অমৃতলোকের, আত্মনিবৃত্তির অদেহী বা অশরীরী জীবাত্মা বা পরমাত্মা যা তাতে নেই—মাটি বিনা যে সবই নশ্বর, মাটির মার অবলম্বন ছেড়ে আমরা যে একেবারে ছন্নছাড়া হয়ে যাই, এবং এই দেহের তুষ্টি-পুষ্টি-স্থিতি-মেধা-বৃদ্ধি ছাড়া যে সৃষ্ট জগৎ একেবারে বিকৃত এবং বিলুপ্ত, সেই পূর্ণসত্য কোন কবি পূর্ণরূপে উপলব্ধি এর পূর্বে করেছেন কি না সন্দেহ। কবি তাই প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করেছেন, নারী যদিও চিরপ্রহেলিকা তবু প্রস্ফুটিত শেফালিকা। নারী 'প্রেম-বৃন্দাবনে' হৃদয়-রাধিকা, মোহিনী হয়েও সিদ্ধেশ্বরী ঈশ্বরী। নারী একা, যদিও সে তার অনন্ত সৃষ্টির প্রকাশ। জীবন-মরণ জয় ক'রে নারী আনে কৃষ্টির সৃষ্টির উল্লাস। কাজেই নারী 'মৃণ্ময়ী' অথচ 'চিন্ময়ী,' 'ধর্মহারিণী' অথচ 'ধর্মচারিণী', 'নিন্দিতা' অথচ 'নন্দিতা,' 'যৌবন-হ্লাদিনী' অথচ 'বার্ধক্যবিনাশিনী,'—ছায়া-মায়া-কায়া-রূপে তার দেহের অনন্ত প্রকাশ—"রমণীর দেহমণি-পথেই আলোক উথলে।" সৃষ্টি-প্রলয়ের কালস্রোতে সৃষ্টির মানসলক্ষ্মী দেবীপ্রতিমা নারী কমলাসনা হয়ে বিশ্বধাত্রীর উপাসনা করেছেন—জন্ম-মৃত্যু বাধ্য আছে সেই অন্ধ অনুরাগে। কবি মোহিতলালের 'মাতৃস্বর্গ,

এই দেহস্বর্গেই সৃষ্ট হয়েছে। তিনি যে মানুষ, তাঁর নারী যে মানবী, —মানবীর বন্দনায়, মানবীর ব্যথার আঘাতে, মরালীর শুভ্রলীলায়, কামনার মধুগন্ধে নারী যেন পূর্ণতা নিয়ে প্রত্যক্ষীভূতা হয়ে রয়েছে। "স্বচ্ছন্দ স্বৈরিণী ও যে, নিত্যশুদ্ধা—নহে সতী, নহে সে অসতী সেই এক-মূর্তি নারী"। গৃহে সে লক্ষ্মী—জায়া ও জননী—সুখ দুঃখ দুইই আছে, পাপপুণ্যের ভাবনাতে কোন অভাব নেই—যে তার সর্বস্ব হরে সেই পতি "তারি কণ্ঠে সুচির-লগনা।" কবি মোহিতলাল জীবন-দায়িনী দেববন্ধা মানবীকে বন্দনা করছেন।

কবি মোহিতলাল "অন্ধ শাস্ত্রের বন্ধ কথা" দূরে রেখে মানবের ও মানবীর প্রেমকে দেহপিঞ্জরাবদ্ধ করেছেন। এই অমৃত দেহকে যিনি প্রসব করেন, এই অমৃতবাণীর ঋষিকে যিনি মর্ত্যে আনেন, তিনি নিত্যশুদ্ধা, তাঁর দোষ কোথায়? মোহিতলালই কবিদের মধ্যে পুরাণ কোরাণ বেদ উপনিষদের নূতন অর্থগৌরব এনেছেন। নারীকে অসতী ব'লে, নারীকে স্বৈরিণী ব'লে, নারীকে নরকের পথগামিনী ব'লে পুরুষ যুগে যুগে যে পাপ করেছে, আত্মার প্রমাদ এনেছে, নিখিলের প্রাণ-প্রবাহিনীকে প্রাণঘাতিনী ব'লে অপমানিতা বা লাঞ্ছিতা করেছে, যে দেহ মিথ্যা স্বর্গ ব'লে যা রচনা করেছে, তার কৈফিয়ৎ দিতে হবে যুগে যুগে।

কবে স্বর্গ ঘুচে যাবে? ঘুচে যাবে আত্মার প্রমাদ?
মৃত্যুমুক্তি হবে কবে—ঘুচে যাবে চিরতরে অমৃতের সাধ।

মোহিতলালের কবিত্ব এই সত্যের সন্ধানে, মোহিতলালের বিদ্রোহ-বৈশিষ্ট্য এই অনিত্য দেহ সত্যের নিত্য দেহধর্মের রক্ষণে, ধারণে, আভরণে এবং আনন্দের নিত্য জাগরণে।

'স্মর-গরলে'র কবি বাস্তব সত্যের অন্তরে বাস্তবদেহের সত্য দৃষ্টি নিয়ে এই মিথ্যার মন্থনেও কালকূট পান করেছেন—তাই সাবধানবাণী দিয়েছেন—"অমৃতের শুভ্র ফেনায়" প্রলয় পয়োধির বিষ ছড়ানো রয়েছে। নরপশুদের মন্ত্রপূত মিথ্যার হাহাকার নারীশিশুদের

ছিন্নকণ্ঠে গীতোৎসব, উদ্বন্ধন-মৃত্যুর নৃত্যবিলাস, সত্যশিবের নির্ধাতিত ফাঁস এবং নরকঙ্কালের লৌহভগ্ন নির্মম হাসি কোন্ সত্যদেবতার পূজার্চনা করবে? দেহের দহনে সুরভি হিয়া নিত্য নিত্য বেদনার বেদীমূলে অগ্নি প্রজ্বলিত করেছে।

মাটি ফেটে ফোটে নামহারা ফুল
লতার বিতানে দোলে এলোচুল

কবি আশ্চর্যরূপে মানবীয়ভাবে মানবীয় প্রেম এবং মানবীয় রূপের বন্দনা করেছেন। মানুষ যখন দেবতা হয়, তখনই পিশাচের কার্য আরম্ভ হয়। "মানুষ দেবতা হয়ে আরম্ভিল পিশাচের ব্রত।"

"বুদ্ধ" কবিতায় কবি জগদ্বাসীকে প্রশ্ন করেছেন—মার কি মেনেছে বশ? ঘুচেছে কি ধরিত্রীর ব্যথা, তোমার সে আত্মজয়ে ফুরায়েছে মৃত্যুর সম্বল, ফোটে না কি রাধাপদ্ম কৃষ্ণ-অশ্রুসায়রের মাঝে?

তবু সে নির্বাণ? তবু সে মুক্তি?
তবু সে মুক্তির উদ্দাম প্রয়াস?

প্রাণের রহস্য এক দেহেই—কামেরই ভিন্ন প্রকাশ প্রেম-ত্যাগ-সত্য। এই কাম বিনা আমরণের ক্ষুধা মেটে না। শাস্ত্র তাই মেনে নিয়েছে—ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ চতুর্বর্গপ্রাপ্তি। 'প্রেমে ও ফুলে, প্রেমে ও জীবনে' পুরুষের দুর্বলতার সমস্ত গলদ কবি এমনভাবে ফুটিয়েছেন যার বিশিষ্ট রূপ আছে, ব্যথাও আছে। প্রেমফুলে জীবন মূল, প্রেমমূলে দেহজীবন ফুল। দুর্বলতায়, ভিক্ষায়, কাতরতায় এর শান্তি হয় না, তৃপ্তি হয় না, রসপিপাসা হয় না—জীবন্ত যৌবনদেহ হয় না।

হাত পেতে যে সদাই থাকে ব'সে
নিজের ক্ষুধায় অন্ধ হয়েই আছে;
পিপাসা যার কণ্ঠতালু শোষে
কি চায় নারী তেমন নরের কাছে!

'স্বর-গরলে' দেহমন্দির ছাড়াও দেহীর মন্দির বিরাজমান। যে দেহী দেহকে মূল ক'রে দেহগত 'সত্য শিব সুন্দর'কে পেতে চান সেই

দেহীতেই নূতন গৃহ তৈরি হয়, সেখানে নূতন পুরুষের আহ্বান হয়, সেই আহ্বানে রয়েছে দিশাহীন ধরণীর নিত্য কর্ণধার। ধ্বংসপ্রাপ্ত দেশে মহামারী আর শ্মশান। শকুনি-গৃধিনীর প্রাণহীন দেহের চিৎকারে আকাশ-বাতাস বিদীর্ণ হচ্ছে। তবু পার হয়ে যেতে হবে; পাল তুলে হাল ধ'রে দৃঢ়বদ্ধ মুষ্টি নিয়ে চলতে হবে। রবীন্দ্রনাথ গেয়েছেন—

দূর হতে কি শুনিস মৃত্যুর গর্জন, ওরে দীন
ওরে উদাসীন,
ওই ক্রন্দনের কলরোল
লক্ষ বক্ষ হতে মুক্ত রক্তের কল্লোল। (বলাকা)

"আহ্বান" কবিতাটিতে এবং 'বলাকা'র প্রলয় ঝড়ের খেয়া কবিতাটিতে যে মিল রয়েছে, সে মিলের অন্তরে নিত্য যেন জাগে মোহিতলালের সেই দীপ্তবাণী :—

মুমূর্ষু এ জাতির শিয়রে
জেগে বসেছিল যেই মহামন্ত্র সে কর্ণকুহরে
উচ্চারিয়া বার বার—সে যে তুমি, হে চিরকুমার!
জ্ঞান-ভক্তি-কর্মবীর, বীরবীর্য, প্রেমিক উদার
ইহপরত্রের বন্ধু, রথিশ্রেষ্ঠ সঙ্কট সমরে—

বিংশ শতাব্দীর কাব্য-রাজ্যে মোহিতলাল রোমান্টিসিজ্‌মের ও ক্ল্যাসিজ্‌মের সামঞ্জস্য নিয়ে স্বপ্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। তিনি এক দিকে 'প্রাণের পূর্ণকুম্ভ' স্বস্তিকতায় মঙ্গলপূর্ণ করেছেন, অন্য দিকে আঁধারে অলকার দীপশিখা জ্বালিয়ে 'অপরূপ উথলরূপ' রূপান্বিত করেছেন। জীবনের যবনিকায় যখন কবি 'দেহেরি মাঝারে দেহাতীত কার ক্রন্দন-সঙ্গীত' শ্রবণ করেন, তখন আমরা মোহিতলালের মনোমোহন সুন্দর কাব্য রূপ রস গন্ধ শব্দ স্পর্শ অনুভব করি এবং প্রত্যক্ষ ভাবি। তাঁর সৌন্দর্যানুভূতিতে কীট্‌সের যেমন শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ অঙ্গরাগ রূপ ইন্দ্রিয়ের উপচার (Sensuous beauty) রয়েছে, আবার অতীন্দ্রিয় রূপের অরূপ সৌন্দর্যও শোভিত রয়েছে—

আলোকের সভাতলে নহে সে উর্ব্বশী
সুগভীরা রজনী রূপসী
হেরি পুন পৃথিবীর শবাসনে বসি
হাসে যেন ষোড়শী রূপসী।

মোহিতলাল ছন্দে, কাব্যে, রসে মোহিতলালই। এ কবিকে ধরা যায়, পাওয়া যায়; কিন্তু তৃপ্ত করা যায় না। কোন্ কাব্যরসের আস্বাদনে কবি মোহিতলাল যেন বিশিষ্ট স্থান নিয়ে গেয়ে গেলেন—

কবিচিত্তে রূপের পিপাসা
মিটে না প্রীতির রসে—রূপ আগে, পরে ভালবাসা।

মোহিতলালের এই রূপে রয়েছে 'অরূপ রতন'। এই রূপের মধ্যে তাপ নেই, তৃপ্তি রয়েছে, এই রূপের ভালবাসায় দেহের অমৃত সম্পদ রয়েছে, দেহাতীত তান্ত্রিক শক্তির পঞ্চভৌতিক মাতৃকাবোধনশক্তি রয়েছে, এই দেহসৌন্দর্যের মধ্যে মায়ামরীচিকা নেই, মৃত্যুবিভীষিকায় ছায়াহীন ছলনা নেই, মাধুর্য গাম্ভীর্য বীর্য রয়েছে। মোহিতলালের 'স্মর-গরলে' দেহধারিণী শক্তিরূপিণী ছন্দিতা বন্দিতা অর্পিতা হ্লাদিনী দেহময়ী নারী মূর্তিমতী হয়ে রয়েছে—সে-ই চিন্ময়ী হয়ে চিত্ত জয় করেন চেতনার পবিত্র দীপ্তিতে, চাঞ্চল্যের উদ্দাম অলস তৃপ্তিতে নয়, সে-ই মৃন্ময়ী মূর্তিতে ইন্দ্রিয়গ্রাহিণী হয়ে ঘরে ঘরে দশভুজার দশমঙ্গলধারিণী এবং অসুরদানবঘাতিনী বা দলনী মূর্তিতে সাধনা-চেতনা-উদ্দীপনা দান ক'রে 'বিস্মরণী' ও 'স্মর-গরলে'র কাব্যমাহাত্ম্য এবং কবিমাহাত্ম্য প্রচারিত ও প্রতিষ্ঠিত করেছেন। দশভুজার পূজারীর দেশে মোহিতলালের বাস্তব সত্য দেহের, মনের ও আত্মার সত্যে "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্যবরান্ নিবোধত" মন্ত্র গ্রহণ করবে কি? ধন্য বাংলার কবি মোহিতলাল, ধন্য তোমার 'স্মর-গরল' কাব্য, ধন্য তোমার দেহকাব্য-তত্ত্ব—চিরসুন্দরের সত্যে এবং ভারতীয় বীরত্বের বীর্যে সফল হোক তোমার শবদেহসাধনা।

শ্রীরাইহরণ চক্রবর্তী

মোহিতলাল-স্মরণে

অশান্ত প্রাণের কান্না শেষ হয়ে এল,
ভোর হ'ল আর এক আকাশে
যেখানে কান্নারা সব মুক্তার মতন
চিরোজ্জ্বল হাসি শুধু হাসে—
হাওয়ায় হাওয়ায় গান ভাসে।

আমাদের ছোট দেশ
তার চেয়ে ছোট ছোট মন—
তাই নিয়ে হাসি কাঁদি
করি বিচরণ—
মেনে চলি সীমান্ত-বাঁধন।

তুমি বেসেছিলে ভাল,
তাই প্রাণে উঠেছিল ঝড়;
মানুষের ঈর্ষা-প্রেমে
সে দৃশ্য সুন্দর—
জনপদ গ'ড়ে গেছ, পুড়েছে নগর।

দিয়েছ, নিয়েছ তুমি
দুই-ই সত্য কথা;
আমাদের যত শোক
সকলই অযথা—
কবি ও কাব্যের মাঝে কোথায় অন্যথা?

শ্রীগোপাল ভৌমিক

স্মৃতি-পূজা

বাংলা দেশ তার একজন কবির মৃত্যু দেখলে। আমি কবি-সমালোচক মোহিতলালের কথা বলছি।

এই তো সেদিনকার কথা। শনিবার। তিনি আচার্য গিরিশচন্দ্র সংস্কৃতি-ভবনের স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে অধ্যাপনা সেরে নীচে এসে বসলেন। মুগ্ধ ভক্তের দল আমরা তাঁকে ঘিরে বসেছি তাঁর মুখ থেকে কিছু শোনবার জন্যে। প্রায় ঘণ্টাখানেক ধ'রে নানা বিষয়ে নানা কথা হ'ল। কথার ফাঁকে একবার ব'লে উঠলেন, আমি বোধ হয় আর বেশি দিন তোমাদের বিরক্ত করব না। চশমা-পরা হাসি-মাখা, পৌরুষ-ভরা সেই মূর্তি এখনও যেন চোখের সামনে ভাসছে; সেই গম্ভীর কণ্ঠস্বর এখনও কানের ভিতর বাজছে। কে জানত, ওই উক্তি তাঁর কবি-মনের 'প্রিমনিশন'! তিনি হয়তো অনেক দিন ধ'রেই মনের গোপনে মৃত্যুর পদধ্বনি শুনতে পাচ্ছিলেন, কিন্তু আমরা সেদিন তা বুঝতে পারি নি বা বুঝতে চাই নি।

পরের শনিবারে তিনি এলেন না; দু বছরের নিয়মিত আসা-যাওয়ার মাঝে সেই প্রথম না-আসা। খবর এল, সহসা তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। তার পরের শনিবার অসুস্থতায় কাটল, তার পরের শনিবারে সব শেষ। একান্ত কাছের মানুষ একেবারে দূর হয়ে গেল—

প্রিয়া তারে রাখিল না, রাজ্য তারে ছেড়ে দিল পথ,
রুধিল না সমুদ্র পর্বত।

আমার সঙ্গে মোহিতলালের চাক্ষুষ পরিচয় তাঁর জীবনের শেষ দুটি বছরে। তার আগে মানস পরিচয় হয়েছিল সাহিত্যের মাধ্যমে। যত দূর মনে পড়ে, পুরনো 'প্রবাসী'র পৃষ্ঠায় প্রথম তাঁর 'বিস্মরণী' কবিতাটি পড়ি। "ভাঙনের মুখে ভেসে গেল সব কীর্তিনাশার কূলে"। বড় ভালই লেগেছিল ঐ ছত্রটি। বহুদিন ধ'রে মনের মধ্যে গুঞ্জরণ ক'রে ফিরেছে সে। তার পর পড়ি তাঁর 'স্মর-গরল', 'স্বপন-পসারী,' 'আধুনিক বাংলা সাহিত্য' প্রভৃতি গ্রন্থ।

মোহিতলালের কবি-সত্তার পরিচয় দিতে গিয়ে কেউ কেউ রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তুলনা ক'রে বলেন, রবীন্দ্রনাথ ছিলেন অধ্যাত্মবাদী কবি, মোহিতলাল দেহবাদী। রবীন্দ্রনাথ মানুষের দেহের অস্তিত্ব স্বীকার করেন নি, আর মোহিতলাল মানুষের মন আত্মা স্বীকার করেন নি। এই যদি বক্তব্য হয়, তা হ'লে সেটা বিচারের বিষয়। আর দুজনেই যদি দেহ-মন-আত্মার অস্তিত্ব মেনে থাকেন, তা হ'লে এ ধরনের স্থূল শ্রেণীবিভাগের কোনও প্রশ্নই ওঠে না। আত্মা নেই, মন নেই, শুধু দেহ আছে—এ ব্যাপার যেমন কল্পনা করা কঠিন, দেহ নেই, মন বা আত্মা শূন্যে ঝুলে আছে—এ অবস্থাও কল্পনা করা তেমনই হাস্যকর। দেহের দর্পণেই তো আমরা দেখতে পাই মন ও আত্মার মুখচ্ছবি। কবি গেয়েছেন—

মোর কামকলা—কেলি-উল্লাস
নহে মিলনের মিথুন-বিলাস—
আমি যে বধূরে কোলে ক'রে কাঁদি, যত হেরি তার মুখ!

এই ভাবটি আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে যখন তিনি গান—

আমার পীরিতি দেহ-রীতি বটে, তবু সে যে বিপরীত—
ভস্মভূষণ কামের কুহকে ধরা দিল স্মরজিৎ!
ভোগের ভবনে কাঁদিছে কামনা,
লাখ' লাখ' যুগে আঁখি জুড়াল না—
দেহের মাঝারে দেহাতীত কার ক্রন্দন-সঙ্গীত!

—এ কি স্থূল দেহবাদী কবির বাণী? তাই যদি হ'ত, তা হ'লে কবি কখনও নারীকে এ চোখে দেখতে পারতেন না—

সেই এক-মূর্তি নারী!—গৃহলক্ষ্মী, জায়া ও জননী—
সেই ভোগসুখতরে সেই নিত্য আত্ম-বলিদান!
দেহের মৃত্তিকা দলি' রাসমঞ্চ গড়িছে তেমনি,
শিশুরে পিয়ায় সুধা, রতি-বিষে পুরুষ অজ্ঞান!

শুধু দেখা নয়, বিচিত্ররূপিণী নারী-প্রকৃতির অন্তরালে কস্তুর মত

ব'য়ে চলেছে যে সনাতন সত্তার স্রোতোধারা, কবি সেই তীর্থজলে শুচিস্নান করেছেন; নারীর বিচিত্র ছদ্মবেশ পুরুষ-মনে যে ভাবের লহর তোলে, কবির মনও তাতে আশা-আশঙ্কায় দুলেছে, কিন্তু যখনই ছদ্মবেশের আড়াল থেকে আসল স্বরূপটি বেরিয়ে এল, তখনই সসম্ভ্রমে কবি মাথা নত করেছেন। "নারীস্তোত্র" কবিতাটি সেই দিক থেকে একটি সার্থক সুন্দর কবিতা। দেহ-মন-আত্মা—এই তিনের সমন্বয়েই সমগ্র অস্তিত্ব। অস্তিত্বের শ্রীক্ষেত্রে কেউই অশুচি নয়, অস্পৃশ্য নয়, সবারই অধিকার সমান। তাই কবি বলেছেন—

আমার অন্তর-লক্ষ্মী দেহ-আত্মা-মানসের
শেষ-তীর্থে শুচি-স্নান করি'…

মোহিতলালকে যেদিন প্রথম দেখি, সে দেখা দূরের থেকে সসঙ্কোচে দেখা। আগে আর যাঁকে দেখি নি অথচ যাঁর মনের স্পর্শ পেয়েছি মনে মনে, তাঁকেই প্রথম চোখের সামনে দেখছি। কিছু বিস্ময়, কিছু সংশয়-ভরা সে দেখা। ছোট্ট একটি সান্ধ্য আসর, তিনিই বক্তা, আর সবাই শ্রোতা। প্রসঙ্গ—সাহিত্য। কিন্তু সাহিত্যের কথা টেনে আনছে দেশের কথা, সমাজের কথা।

বাংলা দেশের কথা উঠছে, বাঙালী সমাজের কথা উঠছে, আর তিনি উত্তেজিত হয়ে উঠছেন; কণ্ঠস্বর কঠিন হয়ে পড়ছে। বাংলার যে শত্রু, বাঙালীর যে নিন্দুক, তাঁর কাছে তার ক্ষমা নেই। সেখানে তিনি জাতির প্রতিনিধি, কোনও স্বার্থচিন্তা তাঁকে পিছিয়ে আনতে পারবে না সেই কঠিন কর্তব্য থেকে।

সেদিন দু চোখ ভ'রে দেখে এলাম, একজন দরদী বাঙালী কাঁদছে। আজকের দিনে যখন প্রাদেশিকতা ও সাম্প্রদায়িকতার ভয়ে 'আমরা বাঙালী, আমরা হিন্দু' এ কথা বলতে সঙ্কোচ বোধ করি, দেখলাম তখন একজন বীর বাঙালী নির্ভীকচিত্তে তাঁর সামাজিক সত্তাকে ঘোষণা ক'রে চলেছেন। তিনি যেন আজীবন ধ'রে বলতে চেয়েছেন—আমি আমি আগে বাঙালী, পরে ভারতীয়; আগে হিন্দু, পরে আর সব।

আগে আমার দেশ, জাতি, তার পর সাহিত্য। দেশ গেলে, জাতি গেলে, সাহিত্য বাঁচে কি নিয়ে? আর আমি যদি বাঙালী হয়ে, হিন্দু হয়ে বাঁচতে না পারি, তা হ'লে সে বাঁচা হবে শুধু দেহে বাঁচা, পশুর মত বাঁচা।

মনে প'ড়ে গেল পুরনো কথা। কয়েক মাস আগে 'কথা-সাহিত্যে'র "তারাশঙ্কর-অভিনন্দন-সংখ্যা"য় "এপার থেকে" নাম দিয়ে পাঠানো তাঁর অভিনন্দন-বাণীর কয়েক ছত্র।

"...আমি যতটুকু বাঙালী, ততটুকুই সাহিত্যিক; আজ সেই বাঙালী জাতটাই আমার চোখের সামনে ম'রে গেল,—বাংলা সাহিত্যে আমার কি কাজ!

...নিজের দেশ, জাতির বাসভূমি ও স্বজাতি-সমাজের প্রতি যে নিগূঢ় প্রেম ধার্মিক মাত্রেরই থাকে এবং যে প্রেম না থাকলে কেউ সত্যিকার সাহিত্য রচনা করতে পারে না..."

মোহিতলাল রবীন্দ্রোত্তর যুগের কাব্যরীতির পথিকৃৎ, মোহিতলাল প্রতীচ্য রীতিতে বাংলা-ভাষায় সমালোচনা-সাহিত্যের স্রষ্টা—এই উক্তিগুলি সত্য, কিন্তু সম্পূর্ণ নয়। তাঁর প্রধান পরিচয়, তিনি স্বজাতি ও স্বধর্মপ্রাণ বাঙালী। সাহিত্য ও স্বদেশের মাঝে যদি কোনদিন দ্বন্দ্ব বাধত এবং সে দ্বন্দ্বে তাঁকে এক পক্ষ অবলম্বনের প্রয়োজন হ'ত, তা হ'লে মনে হয় সাহিত্য ছেড়ে স্বদেশের পক্ষ অবলম্বন করতেন।

তাঁর জন্ম হয়েছিল মহাজাগরণ-যুগের সোনার বাংলায়। তাই আজকের এই দ্বিধাদীর্ণ, ছত্রভঙ্গ, ছন্নছাড়া বাঙালীর শোচনীয় অবস্থা তাঁর মনে কখনও কখনও একটু নৈরাশ্যের উদ্রেক করলেও পরাজিতের মনোভাব তাঁর চিন্তায় প্রশ্রয় পায় নি। তাঁর শেষ-জীবনের একটি সাহিত্য-সম্মেলনের ভাষণের কয়েক ছত্র সমগ্র জাতির স্মরণীয়।

"...যদি বাঙালী আর বাঙালী হইয়াই বাঁচিয়া না থাকে তবে ভারতও মরিবে—অন্তত ভারতের আত্মা যে নির্বাণ প্রাপ্ত হইবে তাহাতে কোন সন্দেহই নাই। অতএব আমি যে বাঙালীর জন্তই

কাঁদি তাহাতে ভারতের অকল্যাণ হয় না...বিদ্যাসাগর, বঙ্কিম, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, সুভাষচন্দ্রের জাতি কি এমন করিয়া মরিতে পারে?...এ জাতি বিশেষ করিয়া প্রাণধর্মী, ইহার এক আশ্চর্য প্রাণবত্তা আছে...আর কিছুতেই এ জাতি জাগিবে না, একমাত্র—কোন মহাপ্রাণ পুরুষের সাক্ষাৎ সংশ্রয় ব্যতিরেকে। যদি এখনও তেমন পুরুষের আবির্ভাব হয়—তবে সেই একজনের আহ্বানে এই শ্মশান-ভূমিতেও শবদেহ উঠিয়া বসিবে, ইহার মৃত্তিকাতল হইতেও অস্থি-কঙ্কাল বাহির হইয়া কলেবর-শোভিত হইবে। এ জাতির প্রাণ-মাহাত্ম্য এমনই!..."

এই উজ্জ্বল আশাবাদের ক্ষেত্রে মোহিতলাল এ যুগের একক নমস্য।

মাইকেল ছিলেন মোহিতলালের বড় প্রিয় কবি। কাব্য-সমালোচক হিসাবে তাঁকে মাইকেলের মল্লিনাথ বলা চলে। এমন কি তিনি রবীন্দ্রকাব্যের নানামুখী ছন্দোধারার মূল উৎস আবিষ্কার করেছেন মাইকেলের কবিতার ছন্দের মধ্যে।

মোহিতলালের জীবন-নাট্যের শেষ দৃশ্যটি ইতিহাসের অদৃশ্য ইঙ্গিতে কেমন ক'রে যেন মাইকেলের জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছিল। বিদ্রোহী কবি শেষশয্যায় শুয়ে, পাশের ঘরে রুগ্ণা কবি-পত্নী শয্যাশায়ী, একটি ছেলে টাইফয়েডে ভুগছে। দারিদ্র্য সংগ্রামের শেষ শক্তিটুকু কেড়ে নিয়েছে। এই অবস্থায় কবিকে আনা হ'ল প্রেসিডেন্সি জেনারেল হাসপাতালে। হাসপাতালে ঢোকবার সময় কবি জিজ্ঞাসা করলেন, এই হাসপাতালেই মাইকেল মারা গিয়েছিলেন, তাই না?

তার পর এক সপ্তাহের মধ্যে সব শেষ।

কালের বুকে মোহিতলালের লেখা কতদিন টিকে থাকবে তা নিয়ে আমার দুর্ভাবনা নেই। কারণ কোনও লেখাই চিরকাল হয়তো বেঁচে থাকে না। লেখকের মত লেখারও কৈশোর আছে, যৌবন আছে, জরা আছে, মৃত্যু আছে। কালের অমোঘ নিয়মে পুরনো লেখকের মত পুরনো লেখাকে একদিন না একদিন ফসিল হয়ে স'রে দাঁড়িয়ে নতুন

লেখাকে পথ ছেড়ে দিতে হবেই। কিন্তু যুগ-চেতনার সমুদ্রে দুর্বার ঢেউ জাগানো—যা শ্রেষ্ঠ চিন্তাশীলের লক্ষণ, মোহিতলালের তা ছিল। আর কেউ বাঙালীর দুঃখে এমন ক'রে কাঁদবে না, বাঙালীর 'পরে অত্যাচার-অবিচারের বিরুদ্ধে আর কেউ তেমন জোর গলায় একক প্রতিবাদ জানাবে না। সে ক্ষতি অপূরণীয়।

তাই ব্যথাতুর প্রাণে তাঁরই কবিতার কয়েক ছত্র তাঁর উদ্দেশ্যে নিবেদন ক'রে প্রণাম জানিয়ে আমি আমার গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজার ইতি করছি :

তোমারে স্মরণ করি, স্মরে যথা তীর্থশেষে ফিরি'
আপনার গৃহকোণে দীন গৃহী দূর গিরিচূড়া—
দেবতা নিবসে যেথা—চন্দ্রমৌলী, তুষার-ধবল।
পাদমূলে বহে বারি পিপাসার, শির রহে ঘিরি,
চিরস্তব্ধ তারাস্তোম, বক্ষে তার বজ্র হয় গুঁড়া।
জানে, আর হেরিবে না, জানে তবু—সে গিরি অচল।

শ্রীশিবদাস চক্রবর্তী

অ্যাল্‌বার্ট হল

(৮)

রূপ সিংয়ের দাঁড়াবার ফুরসৎ নেই। ছোট সাহেবকে হাসপাতালে পৌঁছে দিতে দুজন ওয়েটার ডিউটি ফেলে গিয়েছে অ্যাম্বুলেন্সের সঙ্গে। সেই দুজন লোকের বাড়তি কাজ সকলের ঘাড়ে এসে পড়েছে। ঠিক এই সময়েই খরিদ্দারদের ভিড় সবচেয়ে বেশি। দুপুরেও ভিড় বেশি থাকে। তবে তখন একটা সুবিধে—যারা ভিড় করে তারা অধিকাংশই ছাত্র-ছাত্রী, তারা বেশির ভাগই কফির কাপ টেবিলে রেখে গল্প ক'রে আড্ডা দিয়ে সময় কাটায়। টেবিল দখল ক'রে পাখার হাওয়া খেয়ে খোশগল্প করাটা তাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। তাদের হুকুম তামিল করতে দেরি হ'লে মোটেই বিরক্ত হয় না, বরং

খুশি হয়। কিন্তু এখন যারা এসে বসে, তারা হাতে হাতে খাবার চায়, বিলম্বে বিরক্ত হয়, এই বিকেলের খরিদ্দারদের বকশিশের বহরটা ছোট নয়, ফলে ওয়েটাররা উৎসাহিত। এই ঘণ্টাখানেক সময় খুব হুঁশিয়ার হয়ে কাজ করা দরকার। সারা দিনের মোটা ফসল এই বিকেল।

যে টেবিলে রূপ সিংয়ের ডাক পড়েছিল সেখানে এই পাঁচ মিনিটের মধ্যে বার চারেক তাকে হাজিরা দিতে হয়েছে। কাজেই পঞ্চমবারে হুকুম তামিল করবার আগে সে বললে, বাবুসাব, ইয়ে খেয়াল রাখ্ না, হাম্‌লোগ ভি ইনশান্!

সুট-পরা নিখুঁত দুটি বাঙালী সে টেবিলের অধিকারী। তাদের একজন রূপ সিংকে বললে, যাও, বেশি বকবক করতে হবে না। চাকর চাকরের মত থাকবে।

রূপ সিংহ রুখে দাঁড়াল, চাকরি করি ব'লে আপনাদের পায়ে মাথা লুটিয়ে দিতে হবে নাকি?

মেঝেতে সজোরে পা ঠুকে একজন বললে, জান তোমার চাকরি খেয়ে দিতে পারি? এখুনি রিপোর্ট ক'রে দিচ্ছি, দাঁড়াও।

সঙ্গে সঙ্গে সে ভদ্রলোক উঠে দাঁড়াল ম্যানেজারের কাছে নালিশ করতে যাবে ব'লে। গমনোদ্যোত ব্যক্তিটিকে তার সঙ্গী নিরস্ত করতে করতে বললে, আহাঃ, অতটা ইয়ে করা ঠিক নয়। এবং রূপ সিংকে বললে, যাও, তুমি আর এক কাপ কফি নিয়ে এস।

তা নয় এনে দিচ্ছি। কিন্তু ও-রকম চোখ গরম করাটা ওঁর কি উচিত হ'ল?

আলবৎ হয়েছে।

ঘটনাস্থলে সন্তোষকে দেখা গেল। সে বললে, কি হয়েছে, কি?

আরও দু-একজন ওয়েটার এসে জমেছে। ওয়েটাররা রূপ সিংকে সরিয়ে নিয়ে যেতে চেষ্টা করছে। সন্তোষ পুনরায় প্রশ্ন করলে, কি হয়েছে রূপ সিং?

সন্তোষের দিকে তাকিয়ে রূপ সিং বললে, আপনারাও তো আসেন

বাবু, আরও তো কত স্যাব আসেন ; কিন্তু কোনদিন কারও সঙ্গে আমার গোলমাল হয়েছে, বলুন ?

তা আজই বা তুমি এ-রকম ঝামেলা করছ কেন ?

আমিও তো মানুষ ! পাঁচ মিনিটের মধ্যে চারবার ফরমাশ হয়ে গেছে। এক-একবার এক-একটা, চার বারে দু প্লেট পোটাটো চিপ্‌স্‌ আর দু কাপ কফি। এই ভিড়ের সময়, এক দফায় যেটা হয় সেটা চার দফায় ! ঝকমারি সম্‌ঝাবেন কিনা আপনি বলুন বাবু ?

সন্তোষ রূপ সিংকে বললে, সে কথাটা বাবুদের একটু বুঝিয়ে বলাই ভাল।

ততক্ষণে সেই দুই ভদ্রলোক রুখে উঠেছেন—দিস্‌ ইজ ব্যাড। ওদের আদর দিয়ে দিয়ে আপনাদের মত লোক মাথায় তুলেছে। দে শুড বি ট্রিটেড প্রপারলি।

তার আগে নিজেকে তৈরি করুন। আপনার ওকে হুকুম করবার যোগ্যতা আছে কি না ভেবে দেখেছেন ?

এ কমিউনিস্ট হিরো ! আপনি নিশ্চয় জানেন যে, কাজের জন্যেই ওদের মাইনে দিয়ে রেখেছে ইণ্ডিয়ান কফি বোর্ড। ফরমাশ করবার জন্যেই ওদের সৃষ্টি।

কাজ আর জুলুম এক নয়।

জুলুম কে করেছে ?

আপনারা। একবারের কাজটা দশবারে করানোটা জুলুম।

তা ব'লে আমার দরকার থাকলে—

কাউণ্টারে যে দুজন ব'সে কাজ করছিলেন, তাঁদের মধ্যে থেকে এক ভদ্রলোক উঠে এসেছেন। ইনি বাঙালী। এঁকে দেখে সন্তোষ বললে উত্তেজিত ভাবে, রূপ সিংয়ের কোনও দোষ নেই। আপনি কিন্তু অবিচার করতে পারবেন না।

ম্যানেজার শান্তকণ্ঠে বললেন, কি হয়েছে বলুন তো ?

কলহরত দুই ভদ্রলোকের মধ্যে একজন বরাবর দর্শকের মত প্রায়

নীরবই ছিলেন। তিনি এবারে বলতে শুরু করলেন, মশাই, আপনাদের এখানে ওয়েটারদের আচার-ব্যবহার খুব খারাপ।

সন্তোষ বাধা দিয়ে বললে, মোটেই নয়। আমি আজ পাঁচ বছর তিন শ তেষট্টি দিন এখানে আসছি, আমার তো কোনদিন তা মনে হয় নি।

ম্যানেজার সন্তোষকে নিরস্ত করতে সচেষ্ট হন—ওঁদের বলতে দিন।

ওঁরা কি বলবেন, ওঁরা হচ্ছেন ট্রু ম্যান! আমি যা বলি শুনুন—

এখানকার ওয়েটার অপমান করল আমাদের, আর আপনার আপ্তবাক্য শুনতে হবে?—যুযুধান ভদ্রলোক বললেন।

ম্যানেজার ওয়েটারদের ইশারা করলেন, যাও, তোমরা কাজ কর গে। রূপ সিংও ওদের সঙ্গে চ'লে গেল। অন্যান্য টেবিলের খরিদ্দাররা উৎসুক দৃষ্টিতে এদিকে তাকিয়ে থাকলেও কেউই নিজের আসন ছেড়ে ওঠে নি। মিনিট খানেকের মধ্যেই ব্যাপারটা মিটে গেল। ম্যানেজার তাঁর কাঠের সিংহাসনে গিয়ে বসলেন আবার।

সন্তোষ নিজেদের টেবিলে ফিরে গিয়ে অম্বিকাচরণকে বললে হাসতে হাসতে, হুঁঃ, ওরা তো জানে না যে, এ কাদের রাজত্ব!

অরুণ বললে, এরা সব রাজার ছেলে।

অম্বিকা উৎসুক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, কই? কে? কোথাকার রাজা?

সন্তোষ বললে, মাথায় ওদের সোনালী পাগড়ি, কোমরে জরির কটিবন্ধ, সোনার রঙের তক্‌মা, হ'লই বা পেতলের! রঙটাই হ'ল আসল। মেকি তো সব কিছুই, স্রেফ রঙের জোরেই চলছে সব তাই। এই সব ওয়েটার হচ্ছে রাজার ছেলে।

অম্বিকার কাছে হেঁয়ালি ঠেকছে—এদের কথাবার্তা, এদের চাল-চলন সবই অচেনা, একেবারে আনকোরা নতুন মনে হচ্ছে।

অরুণ গম্ভীরভাবে এক টিপ নস্যি হাতে ধ'রে বললে, এদের চেয়েও জমকালো রাজার ছেলেরা সেকেণ্ড ক্লাস ট্রামে যাচ্ছিল দেখে এলাম। ওদের আবার পায়ের জুতোও জরিতে মোড়া, পাগড়ি নয়, খাঁটি জরির

টুপি। আহা, সেই সব রাজপুত্র কাঁধে ব্যাগপাইপ আর ব্যাণ্ড আর কেউ কেউ গদা নিয়ে বিয়ের শোভাযাত্রায় হেঁটে হেঁটে চলবে! কি কষ্ট! কি কষ্ট ওদের!

অম্বিকা প্রশ্ন করলেন, এরা কারা? কাদের কথা বলছেন আপনারা?

কেন? ব্যাণ্ড বাজায় যারা, যারা রূপোর পাতে মোড়া গদা ঘাড়ে ক'রে বিয়ের মিছিলে যায়, যারা ইয়া বড় বড় পাখা নিয়ে পথ জুড়ে আস্তে আস্তে পা ফেলে চলে, তাদের দেখতে পান নি?—ব'লে সন্তোষ যেন নিজের মনের পানে তাকিয়ে আপনা-আপনি বললে, এরাই হচ্ছে সত্যিকার রাজপুরুষ। রাজা নেই, রাজ্য আছে—এই যদি আমাদের রাজনৈতিক অবস্থা হয়, তা হ'লে এদেরই তো বলা যায়—রাজ্য নেই, রাজ-পোশাকওয়ালা রাজপরিবেশের হাওয়াওয়ালা মানুষ; ব্যাণ্ড বাজায়, তাতে কি—

অরুণ বললে, খাঁটি চেহারা আমাদেব যুগের ওই ওদের মধ্যে রয়েছে।

অম্বিকা ধরতে পারলেন না এদের এই ভাষার মারপ্যাঁচ। বিশেষ আগ্রহও নেই তাঁর। তিনি নির্লিপ্তভাবে আপন চিন্তার জাল দিয়ে ঘিরতে লাগলেন সময়ের ফাঁকা অবসরটুকু।

রাজারাজড়ার কথায় মনে প'ড়ে গেল একটা কথা। আমরা তখন ফার্স্ট ইয়ারে পড়ি। অ্যাল্‌বার্ট হলে একেবারে খাশ-রাজদরবার হয়েছিল। ওঃ, সে কি অসি-ঝন্‌ঝন্ ঝনাৎকার! হ'ল কংসবধ পালা, খুব নামডাক ভাণ্ডারী-অপেরা-পার্টির। নইলে অ্যাল্‌বার্ট হলে যাত্রা করতে আসে এমন সাহস হয়?—অরুণ নস্যি টেনে নিয়ে হাত মুছল ময়লা রুমালে।

সন্তোষ বললে, যাত্রা হ'ত অ্যালবার্ট হলে? যাঃ।

হবে না কেন? পাবলিশার্স অ্যাসোসিয়েশন ওদের ভাড়া ক'রে এনেছিল। বিকেলবেলা উৎসবের এক নম্বর, তেতলার ছাদে

পাতা পেতে ব'সে লুচি আলুর দম আর দরবেশ খাওয়ালে। পড়ন্ত রোদ মাথায় লাগছে। তাতে কি, খুব খেয়েছিলাম। তার পর শুরু হ'ল হলে রাত দশটা পর্যন্ত যাত্রা। গমগম করছে রাজসভা, বাজখাঁই গলা কংস মামার। কোথায় লাগে বিপিন পালের বক্তৃতা!

অম্বিকাচরণ মন দিয়ে শুনছিলেন, কিন্তু বিপিন পালের প্রসঙ্গে তিনি ন'ড়ে-চ'ড়ে ব'সে বললেন, বিপিন পালের বক্তৃতা শুনেছেন?

না। তবে শুনেছি, তিনি খুব বড় বক্তা ছিলেন।

তাঁর গলার জোর ছিল সাংঘাতিক, সব সময়ে কেমন ভাঙা ভাঙা ভাব, আর কথাগুলো যেন লাফিয়ে গলার ভেতর থেকে উঠে বাইরে এসে ফেটে পড়ত। বিপিন পালের সঙ্গে অন্য বক্তার তুলনা করবেন না।

পর-মুহূর্তে অম্বিকাচরণ উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, নমস্কার আপনাদের, আমি বিদায় হই।

সন্তোষ বললে, আপনি যেন রেগে চ'লে যাচ্ছেন?

না, রাগ নয়, তবে কি জানেন, আমাদের বয়েস হয়েছে, ছেলেমানুষি ভাল লাগে না।

অরুণ বললে, ছেলেমানুষি চ্যাংড়ামি কি করা হয়েছে?

অম্বিকা কোনও জবাব না দিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

সন্তোষ বললে, যাঃ, তুমি লোকটাকে তাড়িয়ে দিলে! ওর কাছে অনেক বস্তু ছিল।

বস্তু ছিল, না, ডিম ছিল।

দেখ অরুণ, তুমি মানুষকে বড় অশ্রদ্ধা কর, এটা কিন্তু খুব খারাপ।

লেখাপড়া শিখে শেষে ইস্কুল-মাস্টারকে শ্রদ্ধা করতে হবে? তা ছাড়া, শ্রদ্ধা কথাটার খাঁটি সেন্স যদি ধর, তবে ওটা একেবারে আদিম সেন্টিমেণ্ট, বাংলায় বলতে গেলে ভক্তির আধুনিক সংস্করণ হচ্ছে—শ্রদ্ধা। অশিক্ষিত মানুষের অজ্ঞতাজনিত যে ভয়, তার নামই ভক্তি।

যথেষ্ট হয়েছে। কিন্তু ইস্কুল-মাস্টারের দৌলতেই না তুমি আজ

এই কথায় ফুলঝুরি ছড়াতে পারছ! তাকে হেনস্থা করা মানে বুনিয়াদকে অগ্রাহ্য করা।

বাঃ, কি কথাই কইলে! শিকড়ের ওপর গাছের প্রাণ বেঁচে থাকে ব'লেই বুঝি গাছ আর আকাশের দিকে তাকাবে না! শিকড়টা গাছের কাছে আকাশের দিকে তাকাবার পক্ষে সহায়মাত্র। গাছের লক্ষ্য আকাশই হবে, শিকড় নয়। আলো, আকাশ, বাতাসের প্রতি গাছের আসক্তি, বাসনা—তারই লক্ষণ পাচ্ছি ফুল আর ফলের রূপায়ণে। মিথ্যে শিকড়ের দিকে মন ফেলে রাখলে মনটা জগতের কি দেখতে পায়? কিচ্ছু না।

ওদের কথার মাঝে ছেদ পড়ল। বছর পঁচিশেক বয়সের একটি যুবক একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে ব'সে পড়ল ওদের টেবিলে—যেখানে অম্বিকা মাস্টার ব'সে ছিলেন ঠিক সেই চেয়ারে। ছোকরাটি হাফ-শার্টেরও হাতা গুটিয়ে প্রায় কাঁধের ওপর তুলেছে, গলার বোতাম খোলা, গায়ে গেঞ্জি নেই, তার ফলে বক্ষের লোমশ অংশ অনাবৃত। অরুণের ভ্রূকুটি তার নজরে পড়ল না। অন্যের অনুমোদন বা অসমর্থন কিছুই স্পর্শ করে না এমনই মানুষ এই মঙ্গল সেন।

সন্তোষ বললে, গরিব ব্রাহ্মণের ছেলে, নেই কো কারো কথাতে—ড্যাশের ড্যাশ, ড্যাশের ড্যাশ দাঁড়িয়ে দেখি তফাতে। এই যে!

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে মঙ্গল একবার তাকিয়ে বললে, খুব ক্ষিদে পেয়েছে, কিছু খাওয়াবে?

আগেই তো বলেছি, দাঁড়িয়ে দেখি তফাতে। পয়সা নেই।

তোমরা কিছু খাবে?

না, ধন্যবাদ।—অরুণ জবাব দিলে।

ওয়েটার এল হাঁপাতে হাঁপাতে, বললে, নমস্তে!

[ক্রমশ]

শ্রীগৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য

উপন্যাসের উপকরণ

(১২)

কিশোর অন্ধ পূর্ণিমা যখন চ'লে গেল, তখন বেলা বারোটা। সরিকে ডেকে বললাম, খিদে নেই। সে কিছু বললে না। সম্ভবত তার ধারণা হয়েছিল, সকালের চায়ের মজলিসে অনেক কিছু খাবার এসেছিল এবং আমি নিজেও তাতে অংশগ্রহণ করেছি। স্বযত্নকৃত এক পেয়ালা চা খেয়ে শয্যাগ্রহণ করি। দিবানিদ্রায় অভ্যস্ত ছিলাম না, তবু কোন কোন দিন ঘুমিয়ে পড়তাম। আজও ঘুমিয়ে পড়ি।

অনেকক্ষণ ঘুমিয়েছিলাম। বৈকালে ঘুম থেকে উঠে অনেকটা সুস্থ বোধ করি। বুঝতে পারি, আমার মনের ক্ষত থেকে বেশ একটু রক্ত ঝরেছে। বৃদ্ধবয়সের রক্তাল্পতায় এই ক্ষরণ সহ্য করবার শক্তি আমার ছিল না। হতে পারে মন জিনিসটা এই বয়সে খুব শক্ত হয়ে যায়, রৌদ্রে বৃষ্টিতে ভিজে তেতে জমাট বেঁধে যায়, স'য়ে স'য়ে আঘাত সইবার শক্তি বাড়ে।

আমি এক অতিবৃদ্ধাকে দেখেছিলাম। সকালবেলায় তার পুত্রের মৃত্যু হ'ল, বুক চাপড়ে কাঁদলে খানিক, চোখে জল দেখা গেল না। আশ্চর্য, সন্ধ্যাবেলায় আহার্যদ্রব্যের ভাগাভাগি নিয়ে নাতি-নাতনীদের সঙ্গে ঝগড়া করছে বুড়ী!

ভগবান আমাকে রক্ষা করুন, তত দিন যেন আমি বেঁচে থাকি না।

আমার মনের গায়ে কোনও একটা জায়গা পূর্বক্ষতের দরুন দুর্বল ছিল, তুচ্ছ আঘাতেই ফেটে গিয়ে রক্ত ঝরে। এ ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। যাই হোক, চিকিৎসার দরকার হয় নি, ভাল ধাত্রীর হাতে প'ড়ে রক্তস্রাব বন্ধ হয়ে গেছে।

সর্বক্ষতের শুশ্রূষাকারিণী জগদ্ধাত্রী নিদ্রা, তোমাকে নমস্কার!

আমার ছোট বন্ধুদের চরিত্র ভাল নয়। সামান্য কারণেই অভিমানে গাল ফুলিয়ে বসে। অন্তরঙ্গ মেলামেশার ফলে তাদে' চরিত্রের প্রভাব আমার উপরে পড়েছে কি? ঘটনাটা তুচ্ছ। আজ

পাখি বটবৃক্ষের নূতন নীড়কে অবহেলা ক'রে পাশ কাটিয়ে উড়ে চ'লে গেছে। এখন থেকে সাবধান হতে হবে।

চেষ্টা ক'রে চাঙ্গা হয়ে ব'সে এটা ওটা সেটা নিয়ে বেশ কিছুক্ষণ খেলা করি। চশমাটা মুছে ফেলি। ফাউণ্টেন-পেনটায় কালি ভ'রে সই কালিটা ফেলে দিয়ে পেনটাকে খুলে ফেলে ধুয়ে মুছে আবার তাতে কালি ভরি। একটা চুরুট ধরাই। নিজের তৈরি এক কাপ চা। তার পর চুরুটের বদলে সিগারেট। আমার নাম-ঠিকানা লেখা প্যাকিং পেপারে মোড়ক করা 'নন্দিনী'খানা তুলে নিয়ে আবার তা নামিয়ে রাখি। সিগারেটের গন্ধ বেশিক্ষণ ভাল লাগে না। আবার একটা চুরুট। 'শুষ্কং কাষ্ঠং' কবিতাটায় চোখ বুলিয়ে যাই।

এমন সময়ে রিক্‌শ নিয়ে গোবরা এল। তাকে পাঠিয়ে দিতে সরিকে বলেছিলাম, রিক্‌শ আনতে বলি নি। ভাবলাম, ভালই হ'ল। বেশ পরিবর্তন না ক'রে এবং চটি প'রেই রিক্‌শয় উঠে চালককে নির্দেশ দিলাম, বাজার। বাজার থেকে শিবতলা। শিবতলা থেকে মাঠ। মাঠ থেকে শালবন। শালবন থেকে কলেজ। কলেজ থেকে নতুন ইস্কুল। বাজারেও কিছু কাজ ছিল না, নিছক ভ্রমণই আমার উদ্দেশ্য ছিল।

ঠিক সন্ধ্যায় বাসায় ফিরি। দীর্ঘ ভ্রমণের ফলে দেহমন বেশ প্রফুল্ল। বৈকালের দিকে আকাশে কিছু মেঘ ছিল। গুমট কেটে গিয়ে ঠাণ্ডা বাতাস বইতে শুরু করেছে। আশেপাশে বৃষ্টি হয়েছে। অসমাপ্ত কবিতাটা আজ শেষ করতে হবে। 'শুষ্কং কাষ্ঠং'।

রিক্‌শ থেকে নেমে একখানি দশ টাকার নোট গোবরার হাতে গুঁজে দিলাম। নোটটা ফিরিয়ে দিতে দিতে গোবরা বললে, ভাড়া নিতে মা মানা করেছে। নোটটা খুলে দেখে সবিস্ময়ে বললে, দশ টাকা যে!

মুখে রুষ্টভাব এনে জিজ্ঞাসা করি, বউকে মেরেছিলি?

এক ঘণ্টা তার রিক্‌শয় ছিলাম, একটিও কথা বলি নি। বরাবর গম্ভীর।

লজ্জিত না হয়ে ঘাড় নেড়ে সে স্বীকার করলে, হাঁ, মেরেছিল।

কেন?

আমাদের ঘরের কথা আপনি বুইতে লারবেন স্তার্, মাঝে মাঝে ধোলাই না দিলে ইস্ত্রিলোক দোরস্ত থাকে না।

বটে! এর পর যদি শুনতে পাই, তোমাকে আমি দুরস্ত করব, বুঝলে? টাকা দশটা নিয়ে যা, জামাকাপড় কিনে বউকে দিবি—রঙিন শাড়ি। বুঝলি?

লারব, স্তার্। আপনারও তো লাতবউ ব্যাটে, আপনি দিয়েন। আমি লারব।—এই ব'লে নোটখানা আমার টেবিলে নামিয়ে রেখে রাগ ক'রে সে চ'লে গেল।

তার পৌরুষে আঘাত করা হয়েছে। কালকে 'ধোলাই' ক'রে আজ যদি নিজে হাতে শাড়ি কিনে দেয়, বউ তার ঘাড়ে চড়বে—এই তার শঙ্কা। শেষ পর্যন্ত সামলাবে কেমন ক'রে?

লারব স্তার্—'লারব' তার মাতৃভাষা, রিক্শ-চালকের দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় 'স্তার্'টা তার অভিজাত-সম্প্রদায়ের সৎ-সংসর্গের ফল।

একটা বিষয়ে সে আমাকে নিশ্চিন্ত করেছে। তার মহত্ত্বে আমি খুশি হয়েছি। তার বউকে শাড়ি উপহার দেওয়ার অধিকার পাওয়া গেছে। কবিতাটায় মন দিতে পারব। আহা, আমার জন্যে সে মার খেয়েছে! পায়ের তলায় কাঁটা বিঁধলে যেমন হয়, মন যেন তেমনই ঠিক চলতে পারছিল না।

সরি এতক্ষণ বাড়িতে ছিল না। দরজায় তালা বন্ধ ছিল। আগেই বলেছি, দরজার দুটো চাবি, একটা আমার কাছে থাকে, আর একটা তার কাছে। হঠাৎ ঝড়ের মত এসে টেবিল ঝেড়ে আলোটা রেখে সে চ'লে গেল। এই তার শেষ নিত্যকর্ম।

কবিতার খাতাখানা খুলে বসি। উজ্জ্বল আলোয় তার অক্ষরগুলো আমার চোখে উজ্জ্বলতর হয়ে উঠল। উৎসাহিত হয়ে লিখতে শুরু করি—

মহারাজ বিক্রমাদিত্য, উজ্জয়িনীর পথে,
সঙ্গে নিয়ে দুজন কবি, যাচ্ছেন চ'ড়ে রথে।
এক ধারে তাঁর ব'সে আছেন অমর কালিদাস।
কাব্য-কমল-কাননচারী নিত্য মধুমাস!
অপর পাশে বররুচি—

একমনে লিখছি, এমন সময়—

তা তা তা দ্দাঃ

মৃদু মৃদু করতালির সঙ্গে উক্তরূপ অনির্বচনীয় মধুর কাকলিতে আকৃষ্ট হয়ে চোখ তুলে দেখি, থপ থপ ক'রে আমার দিকে হেঁটে আসছে একটা কালো-কোলো নাদুস-নুদুস ছেলে, সবে ডানা বেরিয়েছে—মানে, হাঁটতে শিখেছে।

পথ খুব অন্ধকার ছিল না, কিন্তু যে কোনও পথ তার পক্ষে বিপজ্জনক ছিল। আমার ঘরে আলো দেখে এবং দরজা খোলা পেয়ে ঢুকে পড়েছে।

বেশ ছেলেটি, দেখতে ঠিক গোপালের মত। কিন্তু এই সাঁঝের আঁধারে মা-যশোদার কোল আঁধার ক'রে আমার ঘরে কেন? "শুষ্কং কাষ্ঠং" ছেড়ে কবি-রবির 'শিশু' কাব্যে মন চ'লে গেল—

তোমার কটিতটের ধটী কে দিল রাঙিয়া?
কোমল গায়ে দিল পরায়ে রঙিন আঙিয়া!

তার পর একটু পরিবর্তন ক'রে নিলেই কবিতাটি খাপে খাপে মিলবে—

সাঁঝের বেলা আমার ঘরে,
এলে যে তুমি কী মনে ক'রে!
চরণ দুটি চলিতে ছুটি
পড়িছে ভাঙিয়া।

[ক্রমশ]

শ্রীভোলা সেন

সংবাদ-সাহিত্য

১৩৪৫ বঙ্গাব্দের ১১ই কার্তিক মোহিতলাল মজুমদার তাঁহার জীবনের অর্ধশতাব্দীকাল সম্পূর্ণ করেন, এই প্রসঙ্গে 'শনিবারের চিঠি'তে তাঁহার একটি কবিতা বাহির হয় "পঞ্চাশত্তম জন্মদিনে" (কার্তিক, ১৩৪৫)। তাহাতে তিনি লেখেন :

"সবশেষে আর রহিবে না কিছু বাহির ভুবনে মোর,
জন্মতিথি যে মিলাইয়া আসে মৃত্যুতিথির সনে !
তবু যতখন জাগিব আঁধারে—রহিব নেশায় ভোর,
তোমারে দেখেছি—এই কথা শুধু জপিব পরাণপণে।"

এই কবি-কামনা পূর্ণ হয় নাই ; অন্ধকারে যতক্ষণ জাগিয়া ছিলেন গানের নেশায় ভোর রহিতে পারেন নাই, ততদিন পর্যন্ত যাহা পাইয়াছিলেন এবং যাহা দিয়াছিলেন, সে-স্মৃতির মঞ্জুষা রতনে-হিরণে গানের গাঁথনি দিয়া বাঁধিয়া রাখা আর হয় নাই, তিনি তখনই অন্তরে অন্তরে অনুভব করিয়াছিলেন :

"সেই দিন মোর নিতেছে বিদায়, আসিল গোধূলি-বেলা—
দেউল-দুয়ার বন্ধ হবে যে প্রথম-প্রহর রাতে।"

যে অপরূপ সুন্দর দিনের আলোয় ধরা দিয়াছিলেন, 'হেমন্ত-গোধূলি'তেই তিনি বিদায় লইয়াছিলেন। এই ট্র্যাজেডি তাঁহার পক্ষে যেমন মর্মান্তিক হইয়াছে তেমন আর কোনও বাঙালী সাহিত্যিকের পক্ষে হয় নাই। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র স্বদেশ ও স্বজাতির কল্যাণ-চিন্তায় নিছক সাহিত্য ছাড়া অপর ক্ষেত্রে বরাবর তৎপরতা দেখাইয়াছেন, কিন্তু মোহিতলালের মত সর্বস্ব খোয়াইয়া এমন তলাইয়া ডুবিয়া যান নাই। বঙ্কিমচন্দ্র 'কমলাকান্ত' লিখিতে লিখিতেই 'বিষবৃক্ষ' 'কৃষ্ণকান্তের উইল' সৃষ্টি করিয়াছেন, 'ধর্মতত্ত্ব' ও 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা' ব্যাখ্যান করিতে করিতে 'সীতারাম' রচনা করিয়াছেন ও 'রাজসিংহ'কে নবজীবন দান করিয়াছেন। স্বদেশী-যুগের রবীন্দ্রনাথ স্বদেশকে ধিক্কার দিয়া কাপালিক-ব্রত গ্রহণ করেন নাই, সাহিত্যে নব নব বৈচিত্র্য সৃষ্টির

উন্মাদনায় বারংবার স্বদেশের পরিণাম-চিন্তা ভুলিয়াছেন। কারা-যাত্রী শরৎচন্দ্রও শ্রীকান্তকে সরাসরি হিমালয়ে পাঠাইয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারেন নাই, কখনও বীরভূমে কখনও হুগলীতে সাধের কুঞ্জবন রচনা করিয়াছেন। কিন্তু কবি মোহিতলাল শিল্পী ও কবির নির্মম নির্লিপ্ততা চিত্তে আনয়ন করিতে পারেন নাই; ১৩৫১ বঙ্গাব্দের মাঘ মাসের 'শনিবারের চিঠি'তে তাঁহার 'বাংলার নবযুগ' গ্রন্থ এই বলিয়া সমাপ্ত করিয়াছেন—

"সর্ব্বশেষে, এই আলোচনা-প্রসঙ্গে আমার কিছু কৈফিয়ৎ আছে—পাঠক-পাঠিকাগণের নিকটে তাহাই আমার বিদায়-বাণী। এই দীর্ঘ ও দুরূহ চিন্তাকার্যে আমার মুখ্য অভিপ্রায় ছিল—বাঙালীর আত্মপরিচয়-সাধন।...এই একাকার অন্ধকারে আমি যদি সেই চেতনা এতটুকুও উদ্রেক করিয়া থাকিতে পারি, তবে আমার এই অসাধ্য সাধনের চেষ্টা সফল হইয়াছে মনে করিব, আমার সাহিত্যিক জীবনও ধন্য হইবে। আজিকার এই অতি-উদার কালচার-বাদ ও বিশ্ব-মানবীয় ভাববিলাসের দিনে, আমি আমার স্বজাতির ভাবনাই বিশেষ করিয়া ভাবিয়াছি, এবং তাহার গৌরব-প্রতিষ্ঠায় প্রয়াসী হইয়াছি, সেজন্য আমি কিছুমাত্র লজ্জিত নই;...বাঙালীকেও যদি বাঁচিতে হয় তবে তাহাকে বাঙালী হইয়াই বাঁচিতে হইবে;...'অখণ্ড ভারত' নামে মাটির উপরে, মানচিত্রে কোন দেশ নাই; ভারতীয় সংস্কৃতি বলিতে যাহা বুঝায় তাহাকে আত্মসাৎ করিয়া পুনঃসৃষ্টি করিবার শক্তি বাঙালীর আছে,...এমন কথা বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না যে, ভারতীয় সংস্কৃতিকে বাঁচাইবার—সেই অখণ্ড ভারতকে উদ্ধার করিবার প্রতিভাশক্তি বাঙালীরই আছে; বাঙালী ঘুমাইলে সেই ভারতের সকলেই ঘুমাইবে, তাই, বাঙালী সাধকের উদ্দেশে, কবির ভাষায় বলিতে ইচ্ছা হয়—

> স্থির থাক তুমি, থাক তুমি জাগি'
> প্রদীপের মত আলস তেয়াগি'
> এ নিশীথ মাঝে তুমি ঘুমাইলে
> ফিরিয়া যাইবে তারা।"

এই অসাধ্য সাধন করিতে গিয়া, তাঁহার কল্পিত এই একাকার অন্ধকারে একা জাগিতে গিয়া তিনি সত্য সত্যই সাহিত্য-সংসারে চিরবিদায়-বাণী উচ্চারণ করিয়াছেন এবং ওই দিনই 'শনিবারের চিঠি'র সহিত তাঁহার সম্পর্ক ছিন্ন হইয়াছে। ইহার পর তিনি তৃতীয় পর্যায় 'বঙ্গদর্শনে' মাত্র আর একটি সাহিত্যকীর্তি অংশত সম্পাদন করিয়াছেন, তাহা হইতেছে তাঁহার 'শ্রীকান্তের শরৎচন্দ্র' প্রকাশ, এই কীর্তিও বাঙালীত্বের মহিমাবিকাশ চেষ্টায় খণ্ডিত। এতদ্ব্যতীত এই কালে যে সাহিত্যকর্ম তিনি করিয়াছেন তাহা রুটিন-ওয়ার্ক, স্বতঃস্ফূর্ত নহে।'

'শনিবারের চিঠি'তে তাঁহার শেষ নিবন্ধ "শারদীয়া ১৩৫১" ওই বৎসরের ভাদ্র মাসে বাগনানে বসিয়া রচনা করিয়াছিলেন, আজ হইতে ঠিক আট বৎসর আগেকার কথা। দেশের সাময়িক ও রাষ্ট্রিক কুৎসিত পরিবেশে তখন প্রকৃতির সুন্দরও তাঁহার চোখে বীভৎস হইয়া উঠিয়াছে। তিনি বলিতেছেন—

"আমার ঘরের নীচে মাঠের পর মাঠ কচিধানের পাতায় সবুজ হইয়া উঠিয়াছে—জানালা খুলিলেই, পশ্চিম আকাশপ্রান্তের নীল নারিকেলশ্রেণী পর্যন্ত, সেই ক্রোশব্যাপী হরিৎ-শোভা মুহূর্তে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। কিন্তু সে দৃশ্য দেখিয়া তখনই প্রাণ কাঁপিয়া উঠে, জানালা বন্ধ করিয়া দিই। ওই হরিতের মধ্যে অন্নপূর্ণার সে সুধাহাস্য আর নাই, ওই সতেজ সরস তৃণরাশির অঙ্গে ধনলুব্ধ পিশাচের লালসা-বহ্নি এখন হইতেই জ্বলিতে আরম্ভ করিয়াছে, উপবাসকাতর বঞ্চিত বুভুক্ষুর দীর্ঘশ্বাস উহাকে আন্দোলিত করিতেছে। তাই ওই শোভা এত ভয়ঙ্করী।"

অতঃপর তিনি সত্য সত্যই জানালা রুদ্ধ করিয়া দিয়া মুমূর্ষু বাংলার দেহাসনে বসিয়া ঘোরতর তান্ত্রিক সাধনা করিয়াছেন, তাহাতে দেশ কতখানি লাভবান হইয়াছে জানি না, বাংলা-সাহিত্য সমৃদ্ধ হয় নাই এবং তিনি নিজে নিদারুণ ক্লেশ ভোগ করিয়াছেন। অনেকগুলি সাহিত্য-গ্রন্থ এইকালে প্রকাশিত হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহার পনেরো আনাই পুরাতন 'শনিবারের চিঠি'র রচনারই পুনর্মুদ্রণ। সাহিত্য-

সমালোচনার ক্ষেত্রে তাঁহার যে কীর্তি তাহা তাঁহার পুরাতন 'আধুনিক বাংলা সাহিত্য' (৩য় সং, জেনারেল প্রিণ্টার্স অ্যাণ্ড পাব্লিশার্স লিমিটেড, কলিকাতা) ও 'সাহিত্য-কথা'কে কেন্দ্র করিয়াই অক্ষয় হইয়া রহিল। এই কালে মাতৃভাষা-শিক্ষার্থীদের কল্যাণের জন্ত তিনি 'বাংলা প্রবন্ধ ও রচনা-রীতি' (দি সিটি বুক কোম্পানি, কলিকাতা) নামে যে গ্রন্থখানি প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে বাংলা ভাষার শুদ্ধতা রক্ষায় তাঁহার চির-জাগ্রত মন ও মমতার পরিচয় মেলে, এই পর্যন্ত।

১৩৪৬ বঙ্গাব্দের মাঘ মাসের 'শনিবারের চিঠি'তে আমরা সেইদিন পর্যন্ত মোহিতলালের সাহিত্য-জীবন বিবৃত করি। উক্ত জীবনীটিই গত ৩রা আগস্ট (১৯৫২) রবিবাসরীয় 'যুগান্তরে' সম্পূর্ণ পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে, আরও কয়েকটি পত্রিকাতেও উহা প্রকাশিত হইয়াছে। ১৩৪৬-এর পর হইতে ১৩৫৯, ১০ই শ্রাবণ মৃত্যু পর্যন্ত মোহিতলালের জীবন এবং তাঁহার রচনাপঞ্জীর তালিকা এখনও অলিখিত আছে। আশা করি, তাঁহার কোনও ভক্ত অচিরাৎ এই অবশ্যকর্তব্য পালন করিবেন।

মোহিতলাল স্বয়ং তাঁহার সঙ্কলিত ও সম্পাদিত বিদ্যালয়-পাঠ্য 'কাব্য-মঞ্জুষা' গ্রন্থে নিজের একটি কৌতুকাবহ সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রকাশ করিয়াছেন। নিম্নে তাহা সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করিলাম :

"মোহিতলাল মজুমদার—(১৮৮৮—)—বাংলা ১২৯৫ সালে (১১ই কার্তিক) নদীয়া জেলার কাঁচড়াপাড়া গ্রামে মাতুলালয়ে বৈদ্যবংশে জন্ম ; পৈতৃক নিবাস হুগলী জেলার বলাগড় গ্রাম। পিতার নাম নন্দলাল মজুমদার, মাতার নাম হেমমালা দেবী। পিতা ছিলেন কবি দেবেন্দ্রনাথ সেনের নিকট জ্ঞাতি-ভ্রাতা ;—দেবেন্দ্রনাথের পিতারও পূর্ব উপাধি ছিল 'মজুমদার'। কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের বংশও তাঁহার মাতুলবংশেরই এক শাখা। মোহিতলালের কৈশোর ও স্কুল-জীবন বলাগড় গ্রামেই অতিবাহিত হয় ; বাল্যে কিছুদিন কাঁচড়াপাড়ার নিকটবর্তী হালিশহরে মায়ের মাতুলালয়ে থাকিয়া তথাকার স্কুলে বিদ্যাভ্যাস করিয়াছিলেন। নিজের সম্বন্ধে মোহিতলালের যে একটি

কথা বলিতে ইচ্ছা হয়, তাহা এই। স্কুলের ও কলেজের (তিনি তখনকার 'মেট্রোপলিটন ইনষ্টিটিউশন' ও এখনকার 'বিদ্যাসাগর কলেজ' হইতে ১৯০৮ সালে বি-এ পাশ করেন) শিক্ষা তিনি সম্যক গ্রহণ করিতে পারেন নাই। তাঁহার মানস-প্রকৃতির উন্মেষে ও সাহিত্যিক সাধন-পন্থার নির্দেশে তাঁহার পিতার চরিত্র ও তন্নিহিত আদর্শ, এবং পিতারই কবি-স্বভাব ও কাব্য-প্রীতি প্রকৃত সহায় হইয়াছে—সে বিষয় পিতাই তাঁহার শিক্ষা ও দীক্ষাগুরু। বাংলাসাহিত্যের সেবায় মোহিতলালের যদি কিছুমাত্র অধিকার জন্মিয়া থাকে, তবে তাহার জন্য তিনি সর্বতোভাবে তাঁহার পিতার নিকট ঋণী। মোহিতলালের কবি-খ্যাতি সাহিত্যসমাজেই সীমাবদ্ধ—সেখানেও তাঁহার কবিত্ব সম্বন্ধে সকলে একমত নহেন। তাঁহার কবিতার ভাব ও ভাষা এমনই গুরু ও গম্ভীর যে, তরল-মতি তরুণ, অথবা সৌখীন-হৃদয় বৃদ্ধ, কাহারও পক্ষেই তাহা সুখসেব্য নহে। তৎসত্ত্বেও, আধুনিক কবিগণের মধ্যে তাঁহাকে একটা স্থান দেওয়া চাই—নহিলে, নাকি অন্যায় করা হইবে। মোহিতলাল এ পর্যন্ত এই কয়খানি কাব্য প্রকাশিত করিয়াছেন—'স্বপন-পসারী', 'বিস্মরণী', 'স্মর-গরল', ও 'হেমন্ত-গোধূলি'।"

১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে শিক্ষক মোহিতলাল কেমন ছিলেন, তাহার একটি চমৎকার চিত্র তাঁহার প্রথম দিককার ছাত্র, কিছুকাল 'শনিবারের চিঠি'র সম্পাদক শ্রীনীরদচন্দ্র চৌধুরী তাঁহার সদ্যপ্রকাশিত *The Autobiography of an Unknown Indian* (১৯৫১) গ্রন্থে এইভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন :

"Shortly afterwards a second personal influence entered my life. It was that of a teacher. Our headmaster one day entered the class with an almost boyish young man by his side and introduced him as our new teacher of English. He was very dark, but possessed of decidedly handsome features, his eyes particularly being very fine. Though short and plump, he was not so much so as to repel me with a suggestion of corpulence. He provoked notice and criticism by being dressed in a navy-blue striped suit instead of in *dhoti* and shirt. He

drew on himself greater criticism by introducing an unwonted fervour into his teaching of poetry. It was reported that he moved in literary circles and even contributed to magazines. The general opinion of his pupils was that he was no good, for literary enthusiasm was considered bad form in teaching and useless, if not worse, for examinations... For my brother and me, however, this teacher completed what my father and uncle Anukul had begun. He not only communicated to us his love of literature but also taught us to be exacting in writing the two languages we used. I remember him as something more than one of my teachers, for as Mr. Mohitlal Mazumdar, the distinguished contemporary poet and critic, he exerted a very strong and beneficial influence on my later life. He introduced me to the literary society of Calcutta and made a writer of me almost by main force." (p. 289)

সাহিত্যিক জ্যোতিষী শ্রীদ্বারেশচন্দ্র শর্মাচার্য বিশেষ পরিশ্রমের সহিত মোহিতলালের একটি জন্মকুণ্ডলী প্রস্তুত করিয়াছেন। ভবিষ্যৎ-জীবনীকারের সুবিধার জন্য উহা শর্মাচার্য মহাশয়ের সংক্ষিপ্ত মন্তব্যসহ নিম্নে মুদ্রিত করিলাম :

"মোহিতলাল মজুমদার মহাশয়ের জন্মকুণ্ডলী
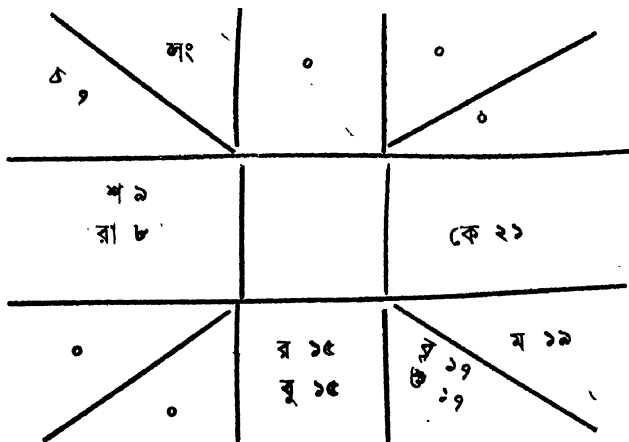
সাহিত্যাচার্য মোহিতলাল মজুমদার মহাশয়ের জন্ম ১২৯৫ বঙ্গাব্দের ১১ই কার্তিক, শুক্রবার (২৬ অক্টোবর ১৮৮৮ খ্রীঃ) রাত্রি ৮টা ১৫ মিনিট। তাঁহার বৃষ লগ্ন, পুনর্বসু নক্ষত্র, মিথুন রাশি। কাব্যকলার কারক শুক্রের সপ্তমে অবস্থান ও তৎসহ জ্ঞান ও প্রজ্ঞার কারক বৃহস্পতির সম্মিলন রহিয়াছে। দ্বিতীয়ে বুধের ক্ষেত্রে চন্দ্র, তৃতীয়ে শনি ও রাহু, ষষ্ঠে রবি ও বুধ, অষ্টমে মঙ্গল, নবমে কেতু। মিথুন রাশির দ্বন্দ্বভাব, বৃষ লগ্নের অনমনীয় দৃঢ়চিত্ততা ও বৃহস্পতি-শুক্র এই দুই গুরুর বিরুদ্ধ সম্মিলন তাঁহার জীবনের বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করিয়াছে।"

বিজ্ঞপ্তি

'শনিবারের চিঠি'র "পূজা-সংখ্যা" প্রতি বৎসরের ন্যায় বর্ধিত আকারে ও বর্ধিত মূল্যে মহালয়ার পূর্বেই প্রকাশিত হইতেছে। খ্যাতনামা সাহিত্যিকদের গল্প-কবিতা-প্রবন্ধ ছাড়া নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের একটি সম্পূর্ণ উপন্যাস এ সংখ্যার আর এক আকর্ষণ। দাম গত বৎসরের মত এক টাকা চার আনাই থাকিবে। গ্রাহক এবং এজেন্টগণ অনুগ্রহপূর্বক তাঁহাদের দেয় টাকা ২৫শে ভাদ্রের মধ্যে আমাদের কার্যালয়ে জমা দিবার ব্যবস্থা করিলে সকল দিকেই সুবিধা হয়। বিজ্ঞাপন দিবারও শেষ তারিখ ২৫শে ভাদ্র। অপ্রাপ্ত সংখ্যার জন্য ১০ই আশ্বিনের মধ্যে পত্র লিখিবেন।

শনিরঞ্জন প্রেস, ৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, বেলগাছিয়া, কলিকাতা-৩৭ হইতে শ্রীসজনীকান্ত দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ফোন : বড়বাজার ৬৫২০

শনিবারের চিঠি
২৫শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, কার্তিক ১৩৫৯

বৈরাগ্য ও বিলাস

প্রায় সকল অধ্যাত্মসাধনাই মানুষকে চিরদিন ব'লে আসছে যে, বিলাস যেমন সাধক মাত্রেরই বর্জনীয়, বৈরাগ্যও তেমনই তার একান্ত ভজনীয়। পাঠক মনে রাখবেন যে, এ প্রবন্ধে আমরা শুধু সাধকের কথা বলছি, গৃহস্থ স্ত্রী-পুরুষ অশনে বসনে ভূষণে শয়নে ভোগ-বিলাস কতকটা পরিহার করবেন বা না করবেন, তা আমাদের আলোচ্য নয়। তেমনই মায়াবাদীর কথাও আমরা আলোচনা করব না, কারণ তার লক্ষ্য হ'ল—

"মায়াময়মিদং অখিলং হিত্বা
ব্রহ্মপদং প্রবিশাশু বিদিত্বা ॥"

আমাদের কেবল এইটুকু জানা আবশ্যক যে, পূর্ণযোগের সাধকের পক্ষে কোন্ বৈরাগ্য আবশ্যকীয় বা অনুমত পন্থা, আর তার সাধনার সঙ্গে ভোগবিলাস সমঞ্জস না অসমঞ্জস। কথাটা একটু তলিয়ে দেখা দরকার। শ্রীঅরবিন্দ সকল প্রকার বৈরাগ্যকে পরিহার্য বলেন নেই। আবার তেমনই hedonism বা epicuranism বা 'যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ, ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ' এ রকম উপদেশও তিনি দেন নেই। সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী, যিনি নিবৃত্তিমার্গ নিয়েছেন, তাঁর বৈরাগ্য শ্রীঅরবিন্দ কাউকে নিতে বলেন না। কারণ পূর্ণযোগের মূল স্বরূপই হ'ল ক্ষর-অক্ষর দুই তত্ত্বেরই উপলব্ধি; বিশ্বকে বাতিল করা পূর্ণযোগীর শিক্ষা নয়; বরঞ্চ তার শিক্ষা, তার লক্ষ্য হ'ল যে বিশ্বে সব কিছুতে ভগবানকে দেখতে হবে। শ্রীঅরবিন্দ বেদান্তের এই কথা মেনে নিয়েছেন :—

এখানে যদি জানলে তো সেইটাই সত্য।
এখানে যদি না জানলে তো বিষম অনর্থ ॥

জ্ঞানীজন সর্বভূতে ভগবানকে দেখে ইহলোক থেকে বেরিয়ে অমরত্ব

লাভ করেন—এ কথা যেমন উপনিষদে সত্য, তেমনই পূর্ণযোগেও সত্য। তা হ'লে সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর বৈরাগ্য আমাদের চলবে না।

তেমনই চলবে না গুরুবর যাকে বলেছেন তামসিক বৈরাগ্য, যার মূলে রয়েছে আলস্য, মোহ, অক্ষমতা। একজন মানুষ জীবনে সব দিকে ফেল ক'রে তারপর ঠিক করলে, এ জীবনে আছে কি ছাই! সে ব্যক্তি তার সেই বৈরাগ্যের জোরে আধ্যাত্মিক পরীক্ষা-ক্ষেত্রে সোনার পদক পাবে, এ রকম কোন সম্ভাবনা নেই। অতএব এ হাল-ছেড়ে-দেওয়া বৈরাগ্যও আমাদের পক্ষে অচল।

তা হ'লে বাকি রইল রাজসিক ও সাত্ত্বিক বৈরাগ্য। বিচার ক'রে দেখা যাক, এরা পূর্ণযোগের পথে আমাদিকে কি দিতে পারে! এ সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দের কথা হ'ল :—

"আমি ইতিপূর্বে সন্ন্যাসীর বৈরাগ্য ও তামসিক বৈরাগ্যে আপত্তি করেছি।...কিন্তু যে জন জগতের অবদান ও উপহাররাজিকে ভোগ ক'রে দেখেছে এবং শেষ পর্যন্ত তাদিকে অপূর্ণ ও বিস্বাদ জেনে একটা উচ্চতর আদর্শের দিকে ফিরেছে; কিংবা যে জন জীবন-যুদ্ধে আপন কাজ ক'রে বুঝেছে যে তার আত্মার কাছে আরও বড় কিছু দাবি করা হচ্ছে; তার বৈরাগ্য যোগ-সাধনার পক্ষে বিশেষভাবে অনুকূল এবং যোগপথে প্রবেশের উত্তম তোরণ।" তা হ'লে বেশ বোঝা যাচ্ছে যে, সংস্কৃত সাহিত্য যাকে উদ্যোগী পুরুষসিংহ বলেছে, সে যদি তার সংসার-জীবনকে সার্থক ক'রে একটা উচ্চতর আধ্যাত্মিক জীবনের সন্ধানে প্রবৃত্ত হয় তো তার পূর্বতন অভিজ্ঞতা তাকে সাহায্য করবেই, কেন না সে তো তামসিক ভয় বা আশাভঙ্গ বা অক্ষমতা ব'লে সংসার থেকে পালিয়ে আসে নেই!

সন্ন্যাসীর বৈরাগ্য বললে বোঝায় সেই মনোভাব, যা ইহজীবনকে একেবারে প্রত্যাখ্যান ক'রে অনির্দেশ্যের মাঝে বিলীন হয়ে যেতে চায়; এতে গুরুবরের ঘোর আপত্তি এই জন্য যে, তিনি ভগবানকে নামিয়ে আনতে চান এই জীবনে। মানুষের বর্তমান জীবন, যাকে

গীতা অনিত্য ও অসুখকর বলেছে, তা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে না পেরে কোন লোক যদি নিত্য ও আনন্দময় জীবনের সন্ধানে রত হয় তো তার মনোভাবকে দোষাবহ বলা যায় না। বরঞ্চ এক দিক দিয়ে দেখলে সে মনোভাব পূর্ণযোগে অপরিহার্য। কেন না, সেই নিত্য আনন্দময় জীবন, যা পূর্ণযোগীর ধ্যেয়, তা তো এই বিশ্বের দৃশ্যমান রূপেরই পশ্চাতে সদা প্রচ্ছন্ন রয়েছে!

এসব কথা আমরা আরও পরিষ্কার বুঝতে পারব যদি বিবেচনা করি যে, আমাদের যোগে ভোগবিলাসের, বাবুগিরির স্থান আছে কি না! ভোগ নিন্দনীয় নয়, যদি তার মধ্যে লালসা বা কামনা-তৃপ্তি না থাকে। কথাটা হেঁয়ালীর মত লাগতে পারে, তাই বেদান্তের বাক্য তুলে দিচ্ছি:—"এই বিশ্ব ও বিশ্বের বস্তুরাজি ভগবানের আবাস; তাকে তুমি ভোগ করবে, কিন্তু ত্যাগের দ্বারা; লোভের বশীভূত হবে না।" এ রকম করলে "ন কর্ম লিপ্যতে নরে"—মানুষ কর্মে আসক্ত হয় না। সাধারণত ভোগী মানুষ সংসারে তার লালসার জিনিসকে অপরিহার্য বস্তু ব'লে প্রতিপন্ন করতে চেষ্টা করে। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দের মতে সাধকের যথার্থ অপরিহার্য বস্তু অতি অল্পসংখ্যকই হওয়ার কথা, কেন না, খুব কম জিনিসই আছে যা নইলে তার চলে না। বাকি সব কিছু তার জীবনের সাজসজ্জা বা বিলাস মাত্র, শখের জিনিস। সে রকম জিনিসকে যোগী ভোগ-দখল করতে পারেন, শুধু (১) যদি তিনি সাধনার পথে আসক্তি বা কামনা বিনা বস্তুরাজিকে অধিকার করা অভ্যাস করতে চান, যদি তিনি ভাগবত ইচ্ছার সঙ্গে সমঞ্জসভাবে তাদের যথাযথ ব্যবহার শিখতে চান, (২) যদি সাধক তৎপূর্বেই বাসনা ও আসক্তির খর্পর হতে যথার্থ মুক্তি পেয়ে থাকেন। এসব বড় কঠিন শর্ত; সাধারণত মানুষ ভাগবত ইচ্ছা ও নিজের আসক্তি নিয়ে খুব sophistry—বৃথা তর্কবিতর্ক ক'রে থাকে। সে রকম তর্ক আত্মপ্রবঞ্চনা বই কিছু না। যদি সাধকের অন্তরে লালসা-বাসনা, দাবি-দাওয়া থাকে, যদি সে ভোগের বস্তু থেকে বঞ্চিত হ'লে তার

রাগ দুঃখ বিক্ষোভ আসে, তা হ'লে তার যোগসাধনা বিড়ম্বনা। আসল কথা যদি সে বেঁচে থাকতে চায় ভগবানের জন্য, যদি সে বস্তুরাজিকে ভোগ-দখল করতে চায় ভগবানের জন্য—নিজের জন্য নয়, ভগবানের যন্ত্ররূপে, তবেই তার অধিকার বা ব্যবহার হবে তাঁর অনুমত, নইলে নয়। তোমার যদি সাধনা করা অভিপ্রেত হয়, তা হ'লে সকল বিষয়ে, বড় ও ছোট, তোমার যোগীজনোচিত মনোভাব রাখতে হবে। তবে পূর্ণযোগের পথে এই ভাবের মানে এ রকম নয় যে কামনার বস্তুকে তুমি বলপূর্বক উৎপাটন ক'রে ফেলে দেবে। যা একান্ত দরকারী, তা হ'ল অনাসক্তি ও সমতা। কোন বস্তু পেলেও যা, না পেলেও তাই। সজোরে উৎপাটন আর অবাধ ভোগ—দুইয়ের মূল্যই এক; কেন না, কামনা থেকে যায়—এক রকমে আস্কারা পেয়ে কামনার জোর বেড়ে যায়; আর এক রকমে, নিগ্রহের ফলে ক্রুদ্ধ হয়ে, ভীত হয়ে কামনা নীচে লুকিয়ে পড়ে। আসলে কামনাবলী আসে বাহিরের থেকে; মন সেটা জানে না ব'লে নানা ভুল ক'রে বসে। কামনা আমাদের অন্তরে নেমে এলে তাকে নজর ক'রে দেখতে হবে, অটল দৃঢ় হয়ে তাকে প্রত্যাহার করতে হবে। তাকে নিজের জিনিস মনে ক'রে মায়া করলে চলবে না।

আমাদের ভোগবিলাসের মধ্যে পান-ভোজন একটা খুব সাধারণ জিনিস। আহারে আসক্তি, তার প্রতি লোভ, তাকে জীবনে একটা অযথা বড় স্থান দেওয়া, যথার্থ যোগ-সাধনার সঙ্গে খাপ খায় না। শ্রীঅরবিন্দ বলেন যে, কোন ভোজ্য বস্তুর প্রতি আকাঙ্ক্ষা বা কোন বস্তুর প্রতি বিরাগ থাকবে না। ভাল জিনিসকে ভাল জিনিস ব'লে জানা দোষাবহ নয়, কিন্তু সেই ভাল জিনিসের প্রতি লোভ কিংবা তাকে না পেলে বিরক্তি, এ সব চলবে না। এ সমস্ত কথা হয়তো আমরা ভেবে দেখি না, কেউ কিছু বললে রেগে উঠি, কিন্তু যোগ ও ঔদরিকতা একসঙ্গে চালাতে যাওয়া একটু হাস্যকর বইকি!

আর একটা বিষয়ে দু-চার কথা ব'লে এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধ শেষ করি।

আমাদের পুরানো একটি শ্লোক আছে :—"অর্থকে সর্বদা অনর্থ ভাববে; তার থেকে লেশমাত্র সুখ পাওয়া যায় না।" কথাটা খুবই সত্য, যদি আমরা লোভবশে, আসক্তিবশে ধনসঞ্চয়ে মন দিই। এ সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দের কথা গভীর অর্থপূর্ণ :—"অর্থশক্তি এবং অর্থশক্তি যে-সকল উপায় ও উপকরণ এনে দেয়, বিরাগীর মত সসঙ্কোচে তা হতে মুখ ফিরিয়ে নেবে না। অন্য দিকে আবার এ সকলের উপর কোন রাজসিক আসক্তিও পোষণ করবে না, বা এদের ভোগে আপনাকে ছেড়ে দেবে না।" আসল কথা ধনসঞ্চয় করতে গিয়ে সাধক প্রবৃত্তির বা আসক্তির দাস হবে না। সে অর্থ উপার্জন করবে ভগবানের জন্য। ভাগবত ইচ্ছা আর ভাগবত আনন্দই হবে তার একমাত্র পুরস্কার। কামনা-বাসনার তুষ্টি প্রাণভূমির বস্তু, চেতনা যখন উর্ধ্বে চৈত্যভূমিতে উঠে যায়, তখন সকল কর্মের মূলে থাকে শুধু আস্পৃহা।

মোট কথা, আমরা এরূপ মনে করব না যে, গুরুবর সকল প্রকার বৈরাগ্যকে বাতিল ক'রে দিয়েছেন; তা তিনি দেন নেই, বরঞ্চ পূর্ণযোগে রাজসিক ও সাত্ত্বিক বৈরাগ্যের যে প্রয়োজনীয়তা আছে তা তিনি স্পষ্ট দেখিয়ে দিয়েছেন। ভোগবিলাস যোগপথে নিষিদ্ধ বস্তু, যদি না এমন হয় যে সাধক আসক্তি-প্রবৃত্তির খর্পর থেকে আগেই মুক্ত হয়েছেন এবং এখন অনাসক্তভাবে, ভগবানের জন্য ভোগদখল করছেন। তবে এ রকম একটা ভান করা, কুতর্ক করা খুব সহজ। অনেকেই ক'রে থাকে। কিন্তু যোগে তো প্রবঞ্চনা চলে না, না অপরকে ঠকানো, না নিজেকে।

চারুচন্দ্র দত্ত

—

ভোগ ও বৈরাগ্য

কে টানিবে সীমারেখা ভেদ করি বৈরাগ্যে-বিলাসে ?
রাজার পুত্রই পারে সহসা ত্যজিয়া সিংহাসন
কঠিন তপস্যা-শেষে মহাভিক্ষু বুদ্ধের আশ্বাসে
বিলাসের পঙ্ক হতে উদ্ধারিতে এ বিশ্বভুবন।

অশ্রু-শারদীয়া

পূজা পূজা আভা সোনা-রাঙা কচি প্রভাতী রোদের গায়ে,
দেখি নি তো কবে এসেছে শরৎ পাষাণ-পুরীর ছায়ে!
বিরহী মনের ধু-ধু বালুচরে ছিল না রঙের লেশ,
ছিল না ফুল্ল শিশির-সিক্ত শেফালীর পরিবেশ।
আলো-হারা এক শূন্যপুরীর দীপ-নিবে-যাওয়া ঘরে
বন্দী ছিলাম একা কতকাল! সহসা হাতের 'পরে
কোথা হতে এল কোন্ সুদূরের নীলচিঠি একখানি!
খুলে দেখি, অতি-পরিচিত লেখা; বন্ধু লিখেছে জানি।—
লামডিঙে আছি, বোধ হয় জানিস, চিঠি লিখে সাড়া নাই,
এবার পূজার ছুটিতে কিন্তু এখানে আসাই চাই।
খাসা জায়গাটি, বেশ ফিটফাট, উদ্যানময় ভাব,
তা ব'লে কিন্তু রেলের কালি ও ধোঁয়ার প্রাদুর্ভাব
একেবারে নেই—সে কথা বলি না, তথাপি মন্দ নয়,
তিন ধারে উঁচু পাহাড়-প্রাচীরে ঘিরেছে দিগ্বলয়,
পায়ের তলায় রেলের সড়ক পূবে-পশ্চিমে টানা,
বড় জংশন;—স্টেশন, কলোনি, বাজার, বিপণি নানা,
জানালা খুলিলে সবুজ পাহাড়; নীল-পরী থাকে কি না
সে কথা জানি না।—দেখিলে সে ছবি কোনদিন ভুলিবি না।
পাহাড়ে পাহাড়ে সাগরের ঢেউ, আকাশে বিলীন শেষে;
প্যাগোডার দেশে সে গিরি-চূড়ার অকূল-সিন্ধু মেশে।
মনোরম শোভা! পাহাড়ের গায়ে শ্যাম ফসলের ক্ষেত,
লেবু, আনারস, চায়ের বাগান, আমলকি, বাঁশ, বেত,
তারই ফাঁকে ফাঁকে গিরি-গ্রামগুলি ঝরনার ধারে ধারে
তুই না আসিলে একা একা আর সে ছবি দেখাই কারে?
শহরের দূরে ধু-ধু বনপথ গিয়াছে শৈল-শিরে
সেথা দুর্গমে ন্যাংটা-নাগারা নির্ভয়ে ঘোরে ফিরে।

পুরুষেরা নাকি কৃষ্ণ-বরণ, নারীরা গৌরী বটে,
দেখি নি কখনো, তুই এলে যদি এবার ভাগ্যে ঘটে।
একা প'ড়ে থাকি, রেল-কলোনির বাসাটিও খুব ভালো,
সামনে বাগান, ঘাসে ভরা লন্ মরসুমী ফুলে আলো,
খুব কাছে নদী। নদী নয় ঠিক, গভীর শৈল-ধারা
এঁকেবেঁকে আরও কত দূরে গিয়ে না জানি হয়েছে হারা!
তা ব'লে বন্ধু, ভেবো নাকো পাবে নৌকা-চড়ার সুখ,
এ নহে তোমার পদ্মার খাল, তেমনি চওড়া বুক!
এ শুধু ঝরনা, চলে পাথরের শৈবালে মাথা ঠুকে
গয়নার নাও চলে না কখনো ঢেউ কেটে এর বুকে।

* * *

গয়নার নাও, গয়নার নাও—তার পরে কি যে লেখা!
বন্ধুর চিঠি ঝাপসা আঁখিতে ভাল যায় নাকো দেখা।
গয়নার নাও পদ্মার ঢেউ ধলেশ্বরীর পার!
কোথা লামডিং?—আসামে বঙ্গে সোনাজলে একাকার!
গুণ-টানা গান শুনি মেঘনার বাদামী-মাঝির নায়
গাঙ পাড়ি দেওয়া যাত্রী-জাহাজ রাত্রি বিদরি যায়
চকিত-প্রেক্ষ সন্ধানী-আলো ঝলকে ডাইনে বামে
জেলে নৌকায়, দূর প্রান্তরে, সুখ-ঘুমন্ত গ্রামে।···
ঘুম ভেঙে যায় আলো-ঝলমল প্রভাতী পদ্মাতীরে
কলের জাহাজ বংশী বাজায়ে ধীরে ধীরে ঘাটে ভিড়ে।
নতুন বাতাসে নরম মাটিতে শীতল ক্লান্ত দেহ,
এই বুঝি ডাকে পিছু হতে এসে প্রিয় পরিচিত কেহ।
কূলে কূলে ভরা জল-টলমল খাল-বিলগুলি ডাকে,
গাবগাছতলে ডিঙি নাওগুলি লগ্‌গিতে বাঁধা থাকে:
দূরে শোনা যায় হাটের কাকলি মাঠের অন্তরালে,
পা দুখানি ধুয়ে নৌকায় উঠি: হাওয়া-ফুরফুর পালে

চিত হয়ে শুই গলুয়ের 'পরে, মাঝিটা তামাক টানে,
তাহারই ধোঁয়ায় লেখা মুছে যায়, বন্ধু কি তাহা জানে?

* * *

পার হয়ে নীল আড়িয়ল বিল, মধুমতী নদী ধ'রে
হিজলের ফুলে রাঙা জলপথ মিশেছে গ্রামান্তরে
নাও ছুটে চলে : এ-কূলে ও-কূলে দূরে কাছে হাঁকডাক,
পূজা-মণ্ডপে প্রভাতী বোধন, ঢাকীরা বাজায় ঢাক।
নাও থেকে নামি। বাক্স-বিছানা মাঝিটা নামায় নীচে,
আঃ, কি আরাম! দু পায়ের তলে ফোস্কা পড়েছে পীচে,
কতকাল পরে শীতল মাটির প্রলেপে জুড়াল তাহা—
কেউ ব'লে—আয়, কেউ বলে—ব'স, কেউ বলে—আহা আহা,
সে শরীর নেই। ঠাকুর-ঘরের পাদপীঠে গিয়া বসি,
অবারিত রোদে হাসিতে হাসিতে অঙ্গনে গিয়া পশি।
খিড়কি-পুকুরে মুখ ধুতে নামি জলপাইতলা দিয়ে,
রাঙা-ডুরে পরা বকুল-বাড়ির বউ ওঠে জল নিয়ে,
ঘোমটার ফাঁকে পলকের চাওয়া, লাজদুর্লভ হাসি,
পাশে খাল-পারে কুটুম-বাড়ির নৌকা ভিড়িল আসি—
সানাই, শঙ্খ, কাঁশি, ঢাক, ঢোল, বহু কণ্ঠের রব
বাড়িতে বাড়িতে প্রতিমা-বরণ—পূজার মহোৎসব,
পাড়ায় পাড়ায় পুরো তিন দিন পূজার নিমন্ত্রণ
মহাপ্রসাদের পরমান্নের আনন্দ বিতরণ।
খুশিতে লাফাই, কোন কাজ নাই, শুধু হাসি খেলা গান,
নাকে লাগে শুধু আকাশে বাতাসে হারানো দিনের ঘ্রাণ।
পুকুরে ঝাঁপাই, গাব পেড়ে খাই, লাফ দিয়ে উঠি গাছে,
প্রতি পল্লবে প্রতিটি পাতায় মোর নাম লেখা আছে।
কতকাল পরে প্রতি স্বাক্ষর পড়ি তার নেচে নেচে,
পাথর পুরীর বন্দী মন কি প্রজাপতি হয়ে গেছে?

পাখার নাচনে, বন্ধু, তোমার নীল চিঠি উড়ে যায়—
আমার মনের আলোক নিবেছে বেদনার বরষায়।
নদী-নন্দিনী সে দেশের ধ্বনি আর বুঝি শুনিব না,
বৎসর ভরে পথ চেয়ে চেয়ে আর দিন গুনিব না,
শুভ শারদীয়া নীরব পত্রে দেবে না নিমন্ত্রণ—
ঝড়ে ভেঙে গেছে জীবন-প্রতিমা, ধুয়ে গেছে চন্দন,
হাল ভেঙে গেছে, পাল ছিঁড়ে গেছে ময়ূরপঙ্খী নায়
স্মৃতি জেগে আছে শূন্য আকাশে, তাও বুঝি নিবে যায়!
পূজার ছুটিতে নির্বাসিতেরে আর কেন কাছে ডাকো?
অশ্রুমতীর কূলে ব'সে আছি, লামডিং যাবে নাকো।

শ্রীদীনেশ গঙ্গোপাধ্যায়

অ্যাল্‌বার্ট হল

(পূর্বানুবৃত্তি)

এর পর সন্তোষ আর কোন কথা খুঁজে পায় না। একটা শুব্ধ মুহূর্তে যেন এরা প্রত্যেকেই অনুভব করল আপন একাকীত্ব। পারিপার্শ্বিক কোলাহলকে যেন কোন্ বিরাট অতল সমুদ্রের দূরাগত গর্জন মনে হচ্ছে।

সহসা বিজয় বললে, আপনার সঙ্গে একটা কথা ছিল সন্তোষবাবু। তার পর অরুণের দিকে তাকিয়ে সে ম্লান কণ্ঠে অনুরোধ করলে, কিন্তু আপনি যেন এ কথা আর কাউকে ফাঁস করবেন না!

অরুণ একটু যেন অপ্রতিভ হয়ে পড়ল, ব্যস্তভাবে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে সে বললে, এই সন্তোষ, আমার একটু কাজ আছে, উঠি।

বিজয় তার হাত ধ'রে টেনে চেয়ারে লগ্ন ক'রে দিল।—আমি আপনার কাছে শুধু ভদ্রতাই আশা করি না, সাহায্য চাই। অরুণবাবু, সন্তোষবাবু, মঙ্গল—সবাই আমাকে সাহায্য করবেন, নইলে বাঁচব কি ক'রে?

সন্তোষের কণ্ঠস্বর হঠাৎ পরম নমনীয়তায় কোমল হয়ে উঠল—বলুন, আপনার জন্যে সবকিছু করতে রাজী আছি।

বিজয় ঘন ঘন ঘাড় নেড়ে মাথা নিচু ক'রে বললে, আমি পারব না, আপনারা মঙ্গলের কাছে শুনুন। পৃথিবীকে খোলাচোখে দেখতে জানেন—সেই ভরসাতেই আমি আজ আপনাদের শরণ নিচ্ছি। ওঁদের কাছে সব কথা খুলে বল মঙ্গল।

মঙ্গলকে যেমন দেখতে তেমনই ওর কথাবার্তা অগোছাল। ওকে দেখে মনেই হয় না যে, ওর নীরস চেহারার আধারে কোন কোমল বৃত্তি সদা সক্রিয়—তেমনই ওর কথা বলার ভঙ্গিতেও কোন জোর নেই, দরদ নেই ওর কণ্ঠে, সবটুকু দরদ যেন মনের মধ্যেই কাজের জন্যে জমা থাকে ওর।

মঙ্গল বললে, বিজয়ের এক খুড়তুতো বোন আছে, তার নাম রঞ্জনা। আমরা তাকে নিয়ে রাতারাতি পালিয়ে আসব। তার পর রঞ্জনার সঙ্গে আমার বিয়ে হবে। আমি বিয়ে করব, কিন্তু রঞ্জনা হবে বিজয়ের স্ত্রী।

ওদিকে বিজয় অত্যন্ত বিচলিত হয়ে উঠেছে। মঙ্গলের শেষ কথাটা মুখ থেকে বেরুবার আগেই সে টেবিলে একটা চাপড় মেরে বললে, ও গড, সেভ মি ফ্রম ফুল্‌স্‌! মঙ্গল, তোমার এতটুকু হুঁশবুদ্ধি নেই! তোমাকে দিয়ে আমি কি ক'রে কি করব?

সন্তোষের দিকে তাকিয়ে বিজয় বললে, আপনারা আমায় ভুল বুঝবেন না সন্তোষবাবু। রঞ্জনা আমায় ভালবাসে। সে আমাকে অন্ধের মত পূজো করে। যদিও লৌকিক সংজ্ঞায় সে আমার বোন, তবু সে আরও বেশি কিছু। ছেলেবেলা থেকে ওরা মাদ্রাজে ছিল। চিনি না, চোখে দেখি নি। হঠাৎ কয়েক বছর আগে গ্রামের বারোয়ারী পূজোর আসরে একটি মেয়েকে দেখলাম, বিস্মিত মুগ্ধ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে কি যেন দেখছে। আমার ভাল লাগল। কী যে মনে হ'ল, তা ব'লে বোঝাতে পারব না। মনে হ'ল, যেন জীবনে

অমন করুণা, অমন তৃষ্ণা, অমন গভীরতা আমায় কেউ ঢেলে দেয় নি। সে বছর বিজয়ার প্রণাম করতে গেছি আমার মামার বাড়ি। মামীমা বললেন, তোরা আজকালকার ছেলে, না ব'লেও পারি নে, আজ দেড় মাস হতে চলল তোর কাকা এসেছেন মাদ্রাজ থেকে, তা একবার দেখা পর্যন্ত করলি নে। তোর কাকা কাকীমা সবাই এই একটু আগে এসেছিল—কত দুঃখ ক'রে গেল। এখন মা-বাপ নেই তোদের, আমাকেই সব শুনতে হয় বাপু। যা, একবার দেখা ক'রে আয়, খুশি হবে।—গেলাম, খুশি খুবই হলেন ওঁরা। আর আমি? যখন রঞ্জনা আমাকে প্রণাম ক'রে উঠে দাঁড়িয়ে তাকাল আমার দিকে, তখন আবার দেখলাম সেই অতলগহিন চাহনি।

অরুণ বললে, আহা!

বিজয় ভ্রূকুঞ্চিত করল বারেকের জন্য। তার পর বললে, আমি কিন্তু তাতে আত্মহারা হই নি। আমার কাছে তখন রাজনীতির আদর্শ জ্বলন্ত। যাক, সে সব অনেক কথা। পরে আপনাদের কাছে বলব, এখন অবশ্য আমি তাকে ভালবাসি। তার জন্যে আমি সব কিছু ভাসিয়ে দিয়েছি। দেখুন, আমার দিকে চেয়ে দেখুন।

সন্তোষ তার চুলের অরণ্যে অধীরভাবে আঙুল নাচাতে নাচাতে মনের ভারসাম্য বজায় রাখবার চেষ্টা করছে। শান্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করলে সে, আমরা এখন আপনাকে কি ভাবে সাহায্য করতে পারি?

বিজয় বললে, এর আগেও একবার রঞ্জনাকে নিয়ে চ'লে আসবার চেষ্টা করি, গ্রামের লোকেরা আমাকে ধ'রে ফেলেছিল। মারধোর খুব বেশি করে নি—রঞ্জনা রুখে দাঁড়িয়ে তাদের নিরস্ত করে। পাড়ার লোকে বললে, ঘরের কেলেঙ্কারি আর বাইরে চাউর ক'রে কাজ নেই। তোমাদের বনেদী বংশ। তার চেয়ে এক কাজ কর, বিজয়কে গ্রামে ঢুকতে দেওয়া বন্ধ কর, আর মেয়েটাকে পাত্রস্থ কর অবিলম্বে।

অরুণ বললে, মশাই, উপন্যাস শুনে কি হবে, আমাদের কর্তব্য নির্ধারণ করুন।

সন্তোষ ধমক দিলে, বড় ব্যস্তবাগীশ হচ্ছ তুমি অরুণ। বলুন আপনি—

বিজয় হঠাৎ গলার স্বর নামিয়ে বললে, আজ রাত্রি বারোটার পর দুখানা মোটর গাড়ি নিয়ে মঙ্গল তার দলবল শুদ্ধু আমাদের গ্রামে রওনা হবে। একখানা মোটর গাড়ি গ্রামের বাইরে অপেক্ষা করবে। আর একখানি চ'লে যাবে একেবারে রঞ্জনাদের বাড়ি পর্যন্ত।

অরুণ বললে, কেন, রঞ্জনা তো কালও আপিসে আসবে। আপিসের পর বাড়ি না ফিরলেই তো চুকে যায় ল্যাঠা।

বিজয় বিরক্তিভরে বললে, কি সব আজেবাজে কথা বলছেন মশাই! রঞ্জনা কোন দিন চাকরি করে নি। আর এখন তো কড়া পাহারা সব সময়। এর মধ্যে সাত-আটটা সম্বন্ধ এসেছে ওর বিয়ের। কিন্তু যারা মেয়ে দেখতে এসেছে তাদের আড়ালে গালাগালি দেয়—যা-তা বলে। সেইজন্যে ওর বিয়ের সম্বন্ধ করতে ভরসাও হয় না বড় কারুর।

সন্তোষ বললে, আচ্ছা, আপনাদের কি বজবজের কাছে অন্তারামপুরে বাড়ি?

বিজয় অবাক হয়ে গেল—আপনি কি ক'রে জানলেন?

আরে মশাই, আমার এক বন্ধু ধ'রে নিয়ে গেল পাত্রী দেখবার জন্যে, তা সেখানে গিয়ে একটা কড়া শিক্ষা হয়েছে আমার বন্ধুর। মানে, আপনার কথার ভাবে মনে হচ্ছে যেন আমরাও আপনার বোনের কোপে পড়েছিলাম। রঙ খুব ফরসা, না?

হ্যাঁ, ঠিক ধবধবে সাদা ফরসা নয় বটে, তবে স্বর্ণচাঁপার মত হলদে হচ্ছে ওর রঙ।

আচ্ছা, বেশ দীঘল ছিপছিপে চেহারা তো?

আর বলতে হবে না। বাঁ দিকের গালে একটা তিল আছে দেখেছেন?

সন্তোষ বললে, মশাই, অত কাছে ঘেঁষতে দিলে কই? প্রথমেই

জেরা শুরু করলে। বললে কি, আপনারা কি বাজারের আলু-বেগুনের সামিল ধরেন মেয়েদের? কি জন্যে এখানে এসেছেন? মেয়ে দেখতে? আপনাদের কি অধিকার আছে আমাকে এভাবে অপমান করবার? আপনারা যদি যথার্থ শিক্ষিত মানুষ হতেন, তা হ'লে বিয়েটাকে এই বাছাই ক'রে গরু কেনার মত শুধু নিজের স্বার্থসিদ্ধির দৃষ্টিতে দেখতেন না। আপনারা কি চান? আমরা তো মেয়ের মুখে এই সব শুনে বোকা ব'নে গেলাম। মেয়েটির বাবা খুব লজ্জিত হয়ে আমাদের কাছে মাপ চাইলেন। বন্ধু তো মহা খাপ্পা। আসলে মেয়েটির চেহারা স্বাস্থ্য সব কিছুই মারাত্মক রকমের লোভনীয়, সেই-জন্যেই হয়তো বন্ধুটি আরও চ'টে গেল, বললে, মশাই, পাগলা মেয়ে গছিয়ে দেবার মতলবে ছিলেন!

বিজয় অর্ধনিমীলিত দৃষ্টিতে দেওয়ালের গায়ে আঁকা একটা পাখির দিকে চেয়ে মৃদু কর্কশ কণ্ঠে বললে, সন্তোষবাবু, পাগল ও হয়েছে সত্যিই। অমন প্রেমে পাগল হওয়ার মত মন আজকের দিনে দেখা যায় না। সত্যি বলতে কি, যদি ওর ওই গভীর অন্ধ তন্ময়তার কণিকামাত্রও আমার নিজের মধ্যে থাকত, তা হ'লে ধন্য হয়ে যেতাম।

অরুণ বললে, আপনি কি ওকে ভালবাসেন না?

বিজয় একটু হাসলে—না। ভালবাসা আমার মধ্যে নেই।

তবে কিসের জন্য এত কাণ্ড করছেন? সন্তোষ বিস্মিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল।

বিজয় কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে আস্তে আস্তে উত্তর দেয়, ওর ওই প্রেমের মর্যাদা দেবার চেষ্টা করছি। থাক্‌গে, ঠিক কি জন্য যে করছি তা আমিও নিজের কাছে জবাবদিহি করতে পারি নি। তবে এইটুকু বুঝতে পেরেছি যে, রঞ্জনা তার গ্রামে, তার বাবার কাছে থাকলে বেশিদিন বাঁচবে না। শেষে পাগল হয়েই যদি যায়! উঃ, সে কথা ভাবতে পারি না। যাক্‌গে, শুনুন, আপনাদের কাছে যখন সাহায্য চাইছি তখন শুধুই ভিক্ষা চাইছি না—বিচার ক'রে দেখুন, আপনারা নীতিগতভাবে

সহায়তা করতে পারবেন কি না! আমাদের প্ল্যানটা শুনে নিন। একখানা মোটর নিয়ে মঙ্গল একলা গ্রামের মধ্যে চ'লে যাবে। রাত বারোটার সময় রঞ্জনা বেরিয়ে আসবে, দরজা খুলেই গাড়ি দেখবে রাস্তায়, চড়বে। গাড়ি স্টার্ট ক'রে সোজা গ্রামের বাইরে এসে রঞ্জনা আর মঙ্গল নেমে পড়বে। তার পর দ্বিতীয় যে গাড়িখানা গ্রামের বাইরে অপেক্ষা করছে সেটাতে ওরা চড়বে। প্রথম গাড়িটার নম্বর যদি গ্রামের লোক নিয়ে থাকে এবং পিছু নেয়, তাতে কিছুই লাভ হবে না। দ্বিতীয় গাড়িটা ওদের নিয়ে একেবারে কলকাতা চ'লে আসুক। প্রথম গাড়িটা আস্তে আস্তে এদিক ওদিক ক'রে গ্রামের লোকদের বিভ্রান্ত করবে। তার পর এখানে এসে মঙ্গলের সঙ্গে রঞ্জনার লোক-দেখানো একটা বিয়ে হবে। বিয়ের পর কিন্তু মঙ্গলের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক থাকবে না—রঞ্জনা আমার কাছেই থাকবে। মঙ্গলের সঙ্গে ওর বিয়ে হবে কোর্টে, আপনারা সাক্ষী থাকবেন এই বিয়েতে। ব্যাপারটা বুঝতে পারলেন?

ব'লে বিজয় সন্তোষের দিকে তাকাল। সন্তোষ মাথা না তুলেই ঘাড় হেঁট ক'রেই উত্তর দিলে, অবশ্যই বুঝেছি। আচ্ছা, আপনি এতে সুখী হবেন? রঞ্জনা তো আইনত মঙ্গলের সঙ্গে বিবাহিত হ'ল!

ওটা তো ফর্ম্যাল। ওটুকু আইনের হাতে থেকে বাঁচবার জন্যে।—বিজয় তাচ্ছিল্যসহকারে উত্তর দিল।

মঙ্গল উত্তেজিত ভাবে সমর্থন করে বিজয়কে,—মানে সিভিল ম্যারেজও তো ভাই-বোনে হয় না। নইলে আমাদের এত কাণ্ড করার কি দরকার ছিল!

অরুণ ঘাড় নাড়লে—আমি কিন্তু বলি, বিজয়বাবুরই সোজাসুজি বিয়ে ক'রে ফেলা ভাল। তার পর কোর্টে যদি কখনও মামলা ওঠে তখনই এ বিয়ে নাচক হওয়ার প্রশ্ন উঠবে, তখনও আমরা বিজয়কে সাপোর্ট ক'রে সাক্ষী দেবো। আমার মনে হয় একবার বিয়ে হয়ে গেলে দেখবেন সব ঠাণ্ডা মেরে যাবে। লোকের খেয়ে-দেয়ে কাজ আছে তো! মিথ্যে একটা বাজে ফ্যাকড়া রাখছেন কেন? আপনারা

যা করতে যাচ্ছেন তাতে হয়তো পরে মঙ্গলের মনে খচখচানি লেগে যাবে। রঞ্জনারও কি মনোভাব হবে বলা যায় না।

বিজয় চ'টে গেল—আপনি আমাদের এত হাল্কা ক'রে দেখছেন কেন? এতে এতটুকু ছ্যাবলামি নেই।

অরুণ নস্যি নিয়ে বিজ্ঞভাবে জবাব দিলে, সবাই ছ্যাবলা হ'লে এ কথা বলতেই পারতাম না। যা বলি শুনুন, আপনিই বিয়েটা করুন, সাক্ষী থাকব। অবশ্য মঙ্গলের এই বন্ধু-প্রীতির দুঃসাহসকে প্রশংসা করতেই হয়।

মঙ্গল বললে, আমি বিয়ে করলে আপনারা সাক্ষী হবেন না?

সন্তোষ বললে, হতে বাধা কি?

অরুণ দৃঢ়স্বরে উত্তর দিলে, আমার আপত্তি আছে। রঞ্জনা বিজয়কে ভালবাসে, বিজয়ের সঙ্গেই বিয়ে হওয়া উচিত। নতুবা কারুর সঙ্গে বিয়ে না হয়ে সোজাসুজিই সে বিজয়ের সঙ্গিনী থাকুক। বিয়ে নিয়ে তামাশা করা চলে না বিজয়বাবু। আমি বলছি, আপনি বিয়ে করুন, কোনও ভয় নেই। রঞ্জনা আপনার কাছে একবার এসে গেলে, ওর গার্জেনদের এতটুকু জোর থাকবে না। সে যুগ নেই।

বিজয় অত্যন্ত উদ্ধতভাবে উঠে দাঁড়িয়ে বললে, আচ্ছা নমস্কার। আপনারাও সেই ছকের ঘরে পাক-খাওয়া ঘুঁটি হয়ে গেছেন তা ভাবতে পারি নি।

সন্তোষ বললে, আরে, বসুন বসুন। আমি তো বলেছি সাক্ষী থাকব।

অরুণ বাধা দিলে, আপনি যদি বিয়ে করেন, আমরা তো আছি। কিন্তু বিয়ের নামে তামাশায় থাকব না—সন্তোষও থাকবে না।

অরুণের কথা শেষ হওয়ার আগেই বিজয় চ'লে গিয়েছে। মঙ্গলও তার পিছু পিছু ছুটল।

সন্তোষ গম্ভীর হয়ে গেল।

অরুণ আর এক টিপ নস্যি নিয়ে বললে, এই! এই পাগলা!

যাও, আমার সঙ্গে কথা বলতে এসো না। নিজে তো কুয়োর ব্যাঙ হয়েই রইলে, যদি অন্য কেউ নিজেকে সার্থক করবার চেষ্টা করে, যদি দুনিয়ার সামনে সাহস ক'রে কেউ লড়াইয়ের জিগির দেয়, লড়াই করে, তাকে সাবাস বলবার মত ভরসাও নেই! ছি-ছি-ছি! আমি সাক্ষী দোব, আলবাৎ দোব। তোমার সঙ্গে আর কোনো ইয়েতে নেই আমি। যাও, চ'লে যাও। দূর হও আমার সামনে থেকে।

অরুণের ওষ্ঠপ্রান্তে মৃদু হাসি ফুটে উঠল। সে সন্তোষের হাতের ওপর হাত রেখে বললে, বাদ দাও ওসব ঝুট্ ঝামেলা। নিজের জ্বালায় জ্ব'লে মরছি। আচ্ছা সন্তোষ, একটা কথা তুমি ভাবছ না কেন?

সন্তোষ বললে, তোমার কোন কথা শুনতে চাই না।

শোনই না।

কি?

আচ্ছা, মনে কর, মঙ্গল রঞ্জনাকে বিয়ে করল। তার পর, তুমি যা বললে আর বিজয়ের মুখে রঞ্জনার যা বর্ণনা পেলাম, তাতে করে মঙ্গলের চোখে যদি রঙ ধরে, রঞ্জনাকে সে যদি ভালবেসে ফেলে?

বেশ তো। ভালবাসা পাপ নয়। আর রঞ্জনাকে ভালবাসা খুব উচিত। আরে ভাই, তাকে দেখে আমার এত ভাল লেগেছিল, তোমায় কি বলব! তার ওপর তার কথা বলার ধরনটি আরও সুন্দর! দুনিয়ার সব মানুষ তাকে ভালবেসে পাগল হয়ে যেতে পারে, এমনই সে মেয়ে। সে তোমার আপিসের চাকরি করা সফিস্টিকেশনের ছাপমারা মিস্ রঞ্জনা নয়।

এখন, তা হ'লে ধরা যাক, রঞ্জনাকে মঙ্গল ভালবাসলে। তার পর আস্তে আস্তে সে যদি মনে করে যে, রঞ্জনা তার বিবাহিত স্ত্রী, সেই অধিকারটুকু প্রয়োগ করতে চায়, তখন জগাখিচুড়িটা কেমন দাঁড়াবে? বিজয় সম্বন্ধে আমি কিছু বলছি না। রঞ্জনার অবস্থাটা একবার ভাব।

সন্তোষ বললে, সব কিছুর মধ্যে একটা কাঁটাখোঁচ তুলতেই তুমি

ভালবাস। এটা খুব খারাপ। ওরা একটা ভালবাসার নীড় রচনা করবে, আমাদের ডাকলে একটা ছুটো খড়কুটো কুড়িয়ে দিয়ে সাহায্য করবার জন্যে। অমনি তুমি চাচ্ছ খোঁচাখুঁচি দিয়ে কি ক'রে ওই বাসাটা ভাঙা যায়।

অরুণ স্থিরভাবেই ব'সে ছিল, তার আলাপ-আলোচনাতে এতটুকু উত্তেজনা নেই, কথায় কোন উত্তাপ নেই, শান্ত চোখের শূন্য দৃষ্টির মতই তার কথায় নিস্পৃহতা। সে বললে, কথায় বলা সহজ যে, জীবনটাকে ধোঁয়ার মত হালকা ক'রে উড়িয়ে দিই। কিন্তু সে কাজটা অসম্ভব ব'লেই ইচ্ছেটাকে গলাবাজি ক'রে মরতে হয় সন্তোষ। আজকে দেখছ মঙ্গল সেন বিজয়কে সাহায্য করছে, বিজয়ের হয়ে বিয়েটা ক'রে দিচ্ছে মঙ্গল সেন, কিন্তু ছুদিন পরে যখন ভালবাসার মোড় ঘুরবে তখন একটা সর্বনাশা বাজপাখির ঠোঁটের ঘায়ে কবুতর যেমন টুকরো টুকরো হয়ে যায় তেমনি ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে বিজয়ের প্রেমের নীড়। রঞ্জনার মত অসহায়া তখন আর কে থাকবে, মঙ্গল যদি আর কিছু করতে না-ও পারে, তা হ'লে আগুন ধরিয়ে দেবে বিজয়ের সেই সুখের বাসায়। আর যদি মঙ্গল রঞ্জনাকে টেনে আনে নিজের কাছে, তা হ'লেও নিস্তার নেই—সহ্য করতে পারবে না।

সন্তোষের চোখে মুখে একটা আতঙ্কের ছায়া সুপরিস্ফুট হয়ে ওঠে, সে অধীরভাবে ব'লে উঠল, তা হ'লে? সত্যি যদি তাই হয়?

সেই জন্যেই তো বিজয়ের বিয়ের ওপরে জোর দিয়েছি।

তা হ'লে সেটাই যাতে ঘটে, তা-ই করা দরকার।

অরুণ বললে, ছেড়ে দাও। ছুনিয়ার সব বোঝা বইবার জন্যে তো তোমার বাঁচা নয়। নিজের কথা ভাব।

আমার আবার কি কথা! কথা তো তোমার আমার বিজয়ের মঙ্গলের—সকলের। না, না, আমি যাই, ভাল ক'রে বোঝাই ওদের।

অরুণ বললে, আমি যা বলেছি তাতে যদি ফল হয় হবে, না হ'লে আর কি করব?

সন্তোষ বললে, তুমি ব'স। আমি দেখি ওদের ধরতে পারি কি না!

এই সন্তোষ, যেয়ো না।

ব'স। আসছি।—ব'লে সন্তোষ ঝড়ের বেগে দুলতে দুলতে টেবিল-চেয়ারের গলিপথ দিয়ে দ্রুত চ'লে গেল।

কফি-হাউসের এই ইতস্তত-ব্যস্ত কোলাহলমুখরতা যে-কোনও কর্ম-বিমুখ অলস মনকেই মোহগ্রস্ত করবে। এই ব্যস্ততার সমারোহ যেন মনের জানলা খুলে দেয়। দ্রষ্টা মন কত না ছোটখাট বৈচিত্র্যের খোরাক সংগ্রহ করে আশপাশের টেবিলের আসাযাওয়া-করা মানুষ-গুলির টুকরো কথা তুচ্ছ আকার ইঙ্গিত থেকে, অনুমান আর কল্পনার ডানা ছড়িয়ে। ব'সে ব'সে আলুভাজা অথবা পকৌড়ি চর্বণের সঙ্গে রাজনৈতিক মতানৈক্যের তর্ক জ'মে ওঠে। সাহিত্যের বর্তমান দুরবস্থার বিলাপে কফির পাত্র মুখরোচক হয়ে ওঠে। জীবনের আরও কত গভীর সমস্যা আলোচনা-সমালোচনা আগন্তুকদের সময় সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নির্বিকার ক'রে রাখে। কোন বড় একটা কিছুর সম্ভাবনা নেই, সমাধানেরও বিশেষ প্রয়োজন দেখা যায় না। একের পর একটি ক'রে দিন এই নিয়মেই চ'লে আসছে, অনাগত দিনের আকাশেও নূতন তারকার কোন ইঙ্গিতের সূচনা নেই। এরই নাম কফি-হাউস। অলসমন্থর রোমন্থনে মন্দাক্রান্ত এর দৃষ্টিভঙ্গী। কিন্তু মানুষ যদি অলস হয় তবু তার ফুসফুসটা সদাই ব্যস্ত, ওয়েটার আর বেয়ারার ব'সে থাকলে চলে না। তারা কফি-হাউসের হৃদ্‌যন্ত্র, তারা ব্যস্ত।

প্রেম বুরলী অ্যাটাচি থেকে উলের গোলাটা আর স্ট্রাফনয়ডের কাঁটা দুটো বার ক'রে বুনতে শুরু করল। নিবিষ্টতায় ওর ঘাড়টা ঈষৎ হেলে রয়েছে বাঁ পাশে, চোখের চশমার কালো ফ্রেমের ঊর্ধ্বাংশে ভ্রূকুঞ্চনের রেখা। পরিমল কফিতে চুমুক দিয়ে বললেন, তোমার চশমাটা এবার বদলাও।

প্রেম বললে, হুঁ।

হুঁ-হুঁ ক'রে আর কতদিন চলবে?

না, এই সামনের মাসে কিছু বাড়তি টাকা হাতে পড়বে, তখন দেখব।

ছাই দেখবে। তুমি আর কাল থেকে এখানে এসো না।

অনুদ্বিগ্নভাবেই প্রেম জবাব দিলে, বেশ।

পরিমল বললেন, দেখ প্রেম, তোমার এই বেপরোয়া ইয়ে আমার ভাল লাগে না।

প্রেম এতক্ষণ মুখ না তুলে, কাঁটায় ঘর তুলতে তুলতেই হালকা ভাবে কথা বলছিল। এবারে বোনা থামিয়ে পরিমলের মুখের দিকে তাকিয়ে কি যেন বোঝবার চেষ্টা করল। তার পর গম্ভীর হয়ে গিয়ে অত্যন্ত আস্তে আস্তে বলতে শুরু করল, যেন কথাগুলো ও নিজের মনেই নিজেকে শোনাচ্ছে—ভাল লাগে না! ভাল লাগে না! আমারই কি লাগে! কিন্তু এর চেয়ে ঢের খারাপ লাগে যে অন্য কোথাও যেতে। বাড়িতে যাই নে, আমাকে দেখলে দাদার মনটা ভারী হয়ে ওঠে। খুকুকে দেখলে রাজার জন্যে মন আমার কাঁদে। বিকেল যখন ফুরিয়ে যায়, দিন যখন শেষ হয়, ঠিক সেই সময়ে খুকু যদি কাছে থাকে, তখন ওকে বুকে জড়িয়ে কেবলই কাঁদতে ইচ্ছে করে। যাব না, বাড়ি যাব না। বিকেলে আমি কিছুতেই যাব না বাড়ি।

পরিমল কিন্তু প্রেম মুরলীর এই আত্মগত আর্দ্র উক্তিতে এতটুকু বিচলিত হ'লেন না, বললেন, তোমার ভবিষ্যৎ এ ভাবে ক্ষুইয়ে দেওয়া চলবে না। মাইনে তো পাও দেড়শো। তাতে কি হয়! দাদার সংসারে আর কতদিন এভাবে চলবে? আমি বলি কি, এসব আজেবাজে খরচ বন্ধ কর। মেয়েটাকে মানুষ করতে হবে তো!

সে আমি ভাবতে পারি না। একা একা এই শূন্যের বোঝা আর বইতে পারি না। কিছু নেই আমার, কেউ আমার আপনার নয়—শুধু একটা অবলা শিশুর অবোধ হাসিকান্নায় সে পিপাসা মেটে কই? ও

আমাকে চায়, আমিও ওকে চাই—তবু আমাকে তো বুঝতে পারে না।

আহা, তা হ'লে যা হোক কিছু একটা কর। সেন তো তোমাকে বলেছে, তাকে বিয়ে করবে তো ক'রে ফেলো।

সেন? ওই কচি খোকা! আপনার কি মাথা খারাপ হয়েছে! জীবনের গভীরতা ওর নেই। ছেলেমানুষ, ও পারবে কেন আমার মত একটা ভারী মনকে সহ্য করতে? ওরা সবাই আমাকে হাসিখুশি দেখে, খানিকটা জানা আর অনেকখানি না-জানা কোনও কিছুর ওপর যেমন একটা টান হয়, সেনের আকর্ষণটাও আমার দিকে ঠিক তেমনি। ও আমার সবটুকু জেনে নিতে চায়। ওরা আমার মনের প্রদীপের আলোটুকু দেখছে, পিলসুজের নীচের কালো জমাট আঁধার দেখলে তখন পালাতে চাইবে।

পরিমল বললেন, তা হ'লে?

এতক্ষণ যে স্থৈর্য এবং ভাবস্থিতি পরিমলের কণ্ঠে ছিল সেটা হঠাৎ কেমন ট'লে গেছে, তিনি চোখ বুজে হাত দুটো টেবিলের ওপর অঞ্জলিবদ্ধ ক'রে বললেন, তুমি ঠিক কথা বল, মন খুলে দাও অসঙ্কোচে। আমি অন্ধকার দেখে কখনও পিছিয়ে যাই নে।

এত সাহস, তবে চোখ বুজে বসলেন কেন?

মনকে খুলে দিতে গেলে চোখ আপনিই চুপ ক'রে যায় যে!

প্রেম একটু হেসে কাঁটা দুটো কোলে তুলে নিয়ে বললে, চোখের দৃষ্টিটা যত ঝাপসা ক'রে দেওয়া যায়, ততই মনের জোর বাড়ে তো! তবে আর আপনি চশমা পাল্‌টাবার কথা বলছেন কেন?

পরিমল ক্ষুণ্ণ হলেন—দেখ প্রেম, আমার কাছে কিছুতেই এড়িয়ে যেতে পারবে না। হেঁয়ালী রেখে কথার জবাব দাও। তুমি কি আমাকেই বিশেষ কিছু বলতে চাও?

না, আমি কারুর করুণা চাই নে। যাকে আমি ভালবাসি তাকেই আমি ভালবাসব।

তা তো দেখতে পাচ্ছি।

শুধু আজ নয়, সারাটা জীবন এই ভাবে চলবে।

বাঃ, প্লাতোনিক প্রেম! মানুষের মত একবারও প্রতিশোধ নিতে সাধ যায় না?

আচ্ছা পরিমলদা, আপনিও কি সেনের মতই আমাকে জানতে চান? মেয়েদের মন কি লেখকের উপন্যাসের মত? নিজেই সব সময়ে নিজেকে বুঝতে পারি নে—

আমি কারুর মত কিছু করতে চাই নে। তোমার এই ভেসে বেড়ানোতে আমার সায় নেই, শুধু এইটুকুই জানাতে চাই।

বেশ তো, জানা রইল।

তাতে হবে না, অকর্মক ক্রিয়া হয়েই এতদিন কেটেছে, কিন্তু এবারে তোমার ক্ষেত্রে—

কর্তৃকারক হওয়ায় ইচ্ছে নাকি?

আমার নিজের কোনও কথা নেই, সে কথা কতবার বলেছি তো! তোমার কাছে, তোমার কাজে আসতে পারি তো তাতেও আপত্তি হবে না আমার। জীবনটাকে বড় একটা কোন কাজে লাগাবার লোভ বরাবরই র'য়ে গেছে, কিন্তু বার বার দেখেছি বড় কাজের যোগ্য আমি নই, অযোগ্যতার মাশুল দিতে দিতে আমি প্রায় ফুরিয়েই গেলাম। আজ আর নিজের কথা ভাবি না। কি হবে ভেবে? ইদানীং কিছুদিন তুমিই ভাবিয়ে তুলেছ।

সামনের গণনাহীন কণ্ঠের কোলাহল-সমুদ্রে ভাসতে ভাসতে প্রেমের শূন্য দৃষ্টি কফি-হাউসের কাঠের পার্টিশনের গায়ে ধাক্কা খেয়ে আবার যেন ফিরে এল। ও একবার খোলা দরজার দিকে তাকিয়ে আপন মনেই বললে, আপনার সেই ভাবনার দায় আজই ঘুচবে। আচ্ছা পরিমলদা, আপনি এত ভালমানুষ, তবু কেন কিছুই করতে পারলেন না?

পরিমল চুরুট ধরিয়ে ধোঁয়ার কুণ্ডলী ছাড়তে লাগলেন।

প্রেম বললে, সত্যি বলছি, আপনার কাছে আর গোপন কিছু রাখব না। মিথ্যে আর ভাবনার জাল বুনিয়ে আপনাকে বিড়ম্বনা দেব না। আমি আর এভাবে ঘুরে ঘুরে দিনটুকুতে চুমুক দিয়ে আখের ফুরোব না। একটা খুব শক্ত খুঁটির খবর পেয়েছি।

পরিমল হাসলেন উচ্ছ্বসিতভাবে।

প্রেম মুরলী বললে, না, হাসির কথা নয়। যে মন পোড় খায় নি, সে মন দিয়ে জীবন বওয়ানো যায় না পরিমলদা। আমি পেয়েছি অনেক খুঁজে খুঁজে তেমনি একটা নর্ম্যাল মানুষ। এই এতক্ষণ তার জন্যেই ব'সে আছি।

তুমি কার কথা বলছ প্রেম?

তাকে আপনি দেখেন নি। আমার মত তারও জীবন ব্যথার ইতিহাস। কি জানি, তার কষ্ট হয়তো আমার চেয়েও বেশি।

পরিমল একটু গুছিয়ে বলবার চেষ্টা করেন। একটু যেন অস্বাচ্ছন্দ্যের ঢেউ নিজের অলক্ষ্যেই তাঁর ওপর দিয়ে ব'য়ে গেল। তিনি বললেন, তুমি কি একটু কফি নেবে প্রেম?

এখন না, আর একটু পরে, সে আসুক—তখন তিনজনেই কফি খাব।

এই জন্যেই বলেছে—স্ত্রিয়াশ্চরিত্রম্। বল, বল কি ব্যাপার?

পরিমল চুরুটের ধোঁয়াটা এবারে গিলে নিলেন।

প্রেম বললে, বলবার মত কিছু নয়। এঁর প্রথম পক্ষের স্ত্রী হঠাৎ একদিন উধাও হয়ে গেছেন, একটি তরুণ কম্বলওয়ালার সঙ্গে। বছর চারেকের কথা। যখন এঁর স্ত্রী উধাও হয়ে যান, তখন থেকেই দেখছি। পাশাপাশিই বাড়ি। তিনটি ছেলেমেয়ে নিয়ে ভদ্রলোক হিমসিম খেয়ে যান। কিন্তু একদিনও তাঁর মুখে বিরক্তি দেখতে পায় নি কেউ। ছেলেমেয়েগুলি দিন দিন এত অসভ্য হয়ে উঠছে যে, বলবার নয়। সংসারে এদের দেখবার কেউ নেই। ভদ্রলোকের শান্ত সমাহিত ভাব একদিকে, আর একদিকে তিন-তিনটি অবাধ্য আদুরে ছেলেমেয়ের

অনাসৃষ্টির দৌরাত্ম্যে আমাদেরই এক-এক সময় ধৈর্য হারিয়ে যায়। দাদা তো বিরক্ত হয়ে অন্য বাড়িতে উঠে যাবার চেষ্টা করেছিলেন, এখনও করছেন। আমরা ভদ্রলোককে 'মহিষ' বলি।

পরিমল বললেন অহিষ্ণুভাবে, ধান ভানতে শিবের গীত। ওসব কথার সঙ্গে তোমার কি সম্পর্ক?

আছে ব'লেই তো বলছি। ওঁর ছেলেমেয়েগুলো চোখের সামনে ব'য়ে যাচ্ছে যে! বড় ছেলের বয়েস বছর দশেক হবে। এর মধ্যে সে দুবার পালিয়েছে বাসের কণ্ডাক্টরি করবার জন্যে। অথচ বাপের কী সাধ ছেলেকে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করবার! নিজের একটা কারবার আছে। ভদ্রলোক রোজগার মন্দ করেন না। কিন্তু এমন অগোছাল এলোমেলো সংসার যে বলা যায় না। দুটো ছেলের পিছনে বিস্তর খরচ করেন—মাস্টার আছে, বড় স্কুলে তাদের ভর্তি করা হয়েছে। কিন্তু দেখবার কেউ নেই তো! অবিশ্যি ভদ্রলোকের একটা ব্যাপার আমার পছন্দ হয় না—কোলের মেয়েটাকে যেন তিনি একদম সইতে পারেন না। আর মেয়েটাও তেমনই ছিচকাঁদুনে, কথায় কথায় গলা ফাটিয়ে কান্নার গঙ্গাযমুনা বইয়ে দেয়। ভদ্রলোক তাকে মারধোর করেন না, তবে আমল দেন না ব'লেই মন্নুর এত বায়নাক্কা!

পরিমল বললেন, নাম বুঝি মন্নু? কত বয়স?

মন্নুই হচ্ছে কোলের মেয়ে। ওকে দেড় বছরের রেখেই তো ওর মা চ'লে গেছে। আজ তাই ভাবি, যখন দিদার সিং ওই বাচ্ছা মেয়েকে কোলে ক'রে দুধ খাওয়াতে বসত তখন খুব হাসাহাসি করেছি। রাজাকে দেখিয়েছি জানলা দিয়ে। কত ঠাট্টা করেছে রাজা, রাজা বলত—অমনি ক'রে তুমি যখন পালিয়ে যাবে তখন তো আমাকেও বাচ্চা মানুষ করতে হবে! রাজা যখন-তখনই দিদারকে হেঁকে বলত 'আ জী, দুসরা জেনানা লে লেও।' দিদার সিং তার উত্তরে একটু হেসে শুধু আকাশের দিকে দেখিয়ে দিত। দিদারের বাড়িতে সবচেয়ে কম কথা বলে দিদার। ওর স্বভাবটা অদ্ভুত

পরিমল বললেন, তা নয় বুঝলাম। কিন্তু তুমি কি বলতে চাও এখনও বুঝতে পারছি না।

হঠাৎ একদিন সকালে দিদার আমাদের বাড়ি এসে হাজির। এতদিনের মধ্যে ওকে কখনও আমাদের বাড়িতে আসতে দেখি নি। তা বললাম, বসুন। ও যেন কুণ্ঠিতভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে পারলেই বেঁচে যায়, এমনই সঙ্কুচিত হয়ে চেয়ারের কোণে বসল, বললে, আপনি তো খুব লেখাপড়া শিখেছেন। শুনি যে কলকাতায় এমন লেখাপড়া জানা মেয়ে নেই। তা বলছিলাম কি, যদি আমার মন্নুকে একটু পড়িয়ে দেন! অবিশ্যি আপনার খুব কষ্ট হবে। তবে কিনা ও রোজ যখন আপনার সময় হবে এসে প'ড়ে যাবে। আমি পড়ালিখা তো তেমন জানি না, আর সময়ও নেই যে ওকে দেখি। বেটী বড় শয়তান, মাস্টারের কাছে কিছুতেই পড়তে বসবে না, কেবল কান্না, কেবল কান্না! পড়ার কথা বললেই শুধু কাঁদে আর বলে, আম্মাজীর কাছে লিখাপড়ি করব।

দিদারের কথা শেষ হবার আগেই মন্নু কোথা থেকে ছুটে এসে আমার কোলের ওপর ঝাঁপিয়ে প'ড়ে খিলখিল ক'রে হাসতে লাগল,— আম্মাজী, আমি পড়ব নতুন কিতাব, কিনে দাও। আমি বললাম, বেশ তো। আমি পড়াব।...মাসখানেক হ'ল পড়ানো। তখন বুঝি নি। কিন্তু পরশু সকালে আবার দিদার সিং এল, আমার হাতে চারখানা দশ টাকার নোট দিয়ে কুণ্ঠিতভাবে দাঁড়িয়ে রইল। কি যে হয়েছিল জানি না, আমি ওর মুখের ওপর কাগজগুলো ছুঁড়ে দিয়ে বললাম, আমি আপনার কি করেছি যে, এভাবে বাড়ি ব'য়ে এসে অপমান করবেন? তার পর ওর অসহায় প্রৌঢ় মুখের মধ্যে এমন একটা নির্বোধকে দেখলাম যে, নিজের ওপরই রাগ হ'ল। ও বেচারী চুপ ক'রে দাঁড়িয়েই রয়েছে। আমার আরও রাগ হয়ে গেল, বললাম, হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে কি দেখছেন? ও আস্তে আস্তে বললে, কি করতে হবে বলুন? মেঝেতে ছড়ানো নোটগুলো কুড়িয়ে তুলে দিদারের

হাতে দিয়ে বললাম, যান, বাড়ি যান, আর কখনও আমায় টাকা দিতে আসবেন না। দিদার সিংয়ের উজ্জ্বল দৃষ্টি ভিজে ছিল, কিন্তু আমার মনও কম ভারী নয়। বলেছিলাম, আপনি কেন এতদিন মন্নুকে আমার কাছে দেন নি। দেখতেই তো পান আমি বেকার। তার পর এই দুটো দিন সব সময় একটা-না-একটা কিছু ঘ'টেই চলেছে। এতদিনের বন্ধ আকাশ হঠাৎ কে যেন পর্দার বাধাটা সরিয়ে খুলে দিয়েছে আমার সামনে। ভরসা করতে পারি এমনই একটা শক্ত নিটোল মন দেখেছি দিদারের। ও জানে আমার রাজাকে। ওর স্ত্রীকে যে আজও ভুলতে পারে নি, আমিই কি তা না জানি! সেইজন্যেই হয়তো ওতে আমাতে সংসারটা চলবে।

পরিমল বললেন, এ কথাটা তুমি একেবারে গোপন ক'রে রেখেছিলে কেন?

কই, না তো! তা ছাড়া, এর মধ্যে বলবার মত কিছু আছে কি?

আচ্ছা প্রেম, তুমি দিদারকে ভালবাসতে পারবে?

ভালবাসার প্রশ্ন ওঠে না। এইটুকুই আমার সৌভাগ্য যে, আমাকে করুণা করতে পারবে না সে। নিজের ব্যথা দিয়ে আমাকে বুঝবে যে মন, তার ভরসায় জোর করতে পারি। আর বিনিময়ে আমি তার সংসারের মধ্যে নিজেকে ঢেলে দেব। সবটা মিলিয়ে ছেলেমেয়েগুলো মানুষ হবে তো। মন-বিনিময় হওয়ার চেয়ে এটা স্থূল, তাই বড়—এ তো জীবন-বিনিময়।

প্রেম, তোমার মত গুণী মেয়ের এই কি পরিণতি?

এর চেয়ে কি বড় হতে পারত?

অনেক কিছুই হতে পারত। এ আমি ভাবতে পারি না প্রেম।

প্রেম হঠাৎ সোজা হয়ে বসল,—ওই যে দিদার সিং এসে গেছে।

ইশারা ক'রে কাকে ডাকল প্রেম, পরিমল দেখতে পেলেন না। চুরুটটায় আর একবার টান দিয়ে তিনি বললেন, আচ্ছা, আমি তা হ'লে উঠি এবার।

প্রেম বললে, তা কি ক'রে হয়? বসুন, বসুন। প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বী তো আপনারা কেউ নন। আলাপ করিয়ে দিই।

তার কথা শেষ হবার আগেই একটি দীর্ঘাকৃতি পাঞ্জাবী এসে বিনা ভূমিকায় একটি চেয়ার দখল ক'রে বসল।

প্রেম বললে, দিদার সিং, ইনি আমাদের দাদা পরিমলবাবু। খুব জ্ঞানী ইনি।

দিদার হাতজোড় ক'রে বললে, নমস্কার বাবুজী।

রূপ সিং এসে দাঁড়াল। প্রেম তাকে বললে, তিনটে হট কফি।

পরিমল হাত নেড়ে ইশারা ক'রে রূপ সিংকে দেখিয়ে দিল, দুটো। তার পর প্রেমের দিকে তাকিয়ে বললে, আমার কাজ ফুরিয়েছে ভাই, এবার চলি।

প্রেম একটু অনুনয়মিশ্রিত কণ্ঠে বললে, যাবেনই?

হ্যাঁ, যাই। কাজ রয়েছে।

দিদার হাতজোড় ক'রে বললে, নমস্কার। একটা ইয়ে—

ব'লে একবার প্রেমের দিকে তাকাল দিদার।

প্রেম বললে, আপনাকে কিন্তু সামনের শুক্রবার আসতে হবে আমাদের বিয়েতে। আসবেন কিন্তু।

দিদার তার দাড়িতে ঢাকা ঠোঁটের মধ্যে থেকে কিছু যেন বলতে চাইল। তার ঘন ভ্রূর নীচে উজ্জ্বল দৃষ্টিতে সে ভাষা ফুটে উঠল,—আসা চাই।

পরিমল চ'লে গেলেন। চারিপাশের এই অবোধ্য কোলাহল তিনি আর কিছুতেই সহ্য করতে পারছেন না। একটু নির্জন, একেবারে একান্তে, অন্ধকারে নিজেকে ডুবিয়ে দিতে হবে, সেইজন্য যেন বেরিয়ে গেলেন পরিমল।

[ক্রমশ]

শ্রীগৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য

সমান্তরাল

"আমায় মাপ করবেন স্যার।
রেজিস্টার কালই আপ-টু-ডেট পাবেন···
আপনি আগেই রাখতে বলেছেন স্যার;
সরি স্যার···
সময় পাই নি···,
না, মিথ্যা বলব কেন—
ভুলে গেসলাম!"

শঙ্কিত কেরানী মাপ চাইলে,
গালাগাল দিলে ওর অন্তরের মানুষ:
অশ্রাব্য গালাগাল
ফেনিয়ে ফেনিয়ে উঠল
মনের আনাচে কানাচে।
গলা দিয়ে এক ফোঁটাও বার হ'ল না:
মাস কাবারি পঁয়ষট্টি টাকা—
টু টি চেপে আছে না!

অফিসের চেয়ার
জীবন্ত ডিসিপ্লিন!
তবু আছে সিগারেটের ধোঁয়া,···
রক্তিম চায়ে চুমুক;···
টেস্টম্যাচ থাকলে রেডিও এনেও শোনা হয়।
নিজের কাছে মাপ চাইতে হয় না—
তবু অন্যকে মাপ করতে মনে 'কিন্তু' আসে।
কাজ ফেলে
আমি লিখতে পারি অসংবদ্ধ মানসিক সুর—
আমার কবিতা

আর ত্রৈলোক্য ?—
তার প্রবাসী জীবন নিয়ে একটা চিঠি—
তাও লিখতে পারে না ;
তাকে যে কৈফিয়ৎ দিতে হয়।

সমস্ত প্রথা
বিরক্তি বিদ্রূপ আর জিঘাংসায়
আক্রমণ করে না কেন
নির্বীর্য রক্তে,
একবার শুধু আসে না কেন—
বিদ্রোহের সংকেত,
পারে না ভাসিয়ে দিতে তক্ত তাজের ইতিহাস ?
ত্রৈলোক্য,
তুমি চিঠি পেয়েছিলে কাল,—
তোমার প্রিয়তমার চিঠি
পূর্ব-পাকিস্তানী ন্যাশনাল গার্ড পার হয়ে যে এসেছে,
আশঙ্কায় সীমন্তে সিঁদুরের রেখা টেনে
যে লিখেছে—
সেই বধূর পত্র !
তাই রেজিস্টার সম্পূর্ণ হতে পারে নি।
আমি তাও কি জানি না ?
আমিই তো প্রথম ডাক দেখি,
আমারই হাত দিয়ে তো সে গেছে তোমার টেবিলে,
ভাঙা লেখা চিনতে আমি ভুল করি নি ত্রৈলোক্য।

অবশ্য ভুল আমি করেছি—
রেজিস্টার আপ-টু-ডেট না পাওয়ায়
কৈফিয়ৎ তলব ক'রে।

তুমি তো জান না ত্রৈলোক্য—
এই চেয়ার আমায় কত নীচে টেনে নামায়,
এই চেয়ারে বসার দুঃখ নিয়ে…
রাত্রে মশারি-আড়াল থেকে…
দীর্ঘক্ষণ আকাশে তাকিয়ে থাকি,
বিরক্ত মন ও আরক্ত দেহ—
দীর্ঘ রাত্রে কল খুলে মাথা পাতায় ;
ওপরওয়ালা হয়ে কত শাস্তি—
দেখেছ তুমি !
তুমি তো জান না—
এই পাহাড়ের কঠিন আবরণে
কত আগ্নেয়গিরি ধূমায়িত,
লাভা-স্রোতে ভেসে যাচ্ছে,
গন্ধকের তীব্র গন্ধে,
গলিত ধাতুর স্রাবে—
সারা পাহাড় কাঁপছে ;
তবু পাহাড়কে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়।
মানুষ সব কিছু ভুলতে পারে :
নিজের বাইরে যে জগৎ—
অতি সামান্য তা,
সেখানে উঠুক কোলাহল…
বাজুক সংযত সঙ্গীত…
নির্বিকার নিস্পন্দ থাকতে জানে মানুষ।
সে কেবল অসমর্থ নিজেকে নিয়ে :
প্রতিদিন
প্রতি ঘটনা
প্রতিটি হাসি আর গাম্ভীর্য সরাতে সে পারে না।

নিজেকে নিজের কাছে আড়াল করতে—
কোন প্রাচীরই মানুষ আজো সৃষ্টি করতে পারে নি।

এখনো আমি ভাবছি…
অদ্ভুত সে মুহূর্তগুলি নিয়ে;
তন্দ্রাতুর মন—
দোল খাচ্ছে স্মরণের দোলনায়,
চমকে উঠছে আমন্ত্রক ভবিষ্যৎ দেখে।
তোমার ভাঙা লেখায় ভরা চিঠি
আসবে যাবে ত্রৈলোক্য,
তুমি তাকে লিখতে ব'সে রেজিস্টার সম্পূর্ণ করতে পারবে না,
কৈফিয়ৎ দিতে এসে মাপ চাইবে;
লিখবে তোমার সীমন্তিনীকে—
এই কৈফিয়ৎ-তলবঘটিত ইতিহাস
সে পড়বে,
আরও নিবিড়ভাবে ভালবাসবে তোমায়।
তুমি কত সুখী…
আমি জানি তুমি কত ভাগ্যবান!

যে মানুষ অথচ কৈফিয়ৎ তলব করে—
সে কত ফাঁকি,—
কত তুচ্ছ!
তার আছে শুধু এই চেয়ারসর্বস্ব জীবন—
যা তার আপন নয়,
যাতে কেবল তাকে এনে বসানো হয়েছে।
ভাব তো ত্রৈলোক্য,
একবার শুধু এই অধিকারবিহীন মানুষের কথা,

দেখেছ ! আর তুমি পারছ না অভিসম্পাত দিতে,
গালাগাল ভুলে গেছ,
রাগ করতে অসমর্থ !
এমনি মানুষের জীবন ;
দূরে…
দেখা যাচ্ছে ডিস্ট্যাণ্ট সিগন্যাল,
দিনগুলো রেলগাড়ি—
কত কি ব'য়ে আনে,
চ'লে যায়।
আর আমি ?—
যেন সেই বুকিং ক্লার্ক
যে শুধু টিকিট দেয় যাত্রী দেখে :
বহুদেশী টিকিট…ছাড়পত্র…
অথচ যাবার নেই অধিকার…
যাত্রার নেই আনন্দ।
তিমির-তীর্থে একদিন তবু সাড়া জাগবে…
আসবে সে…
মৃত্যুর গোপন পদশব্দে
ভুলে যাব কুর্সির কৌলীন্য,
ভুলে যাব ডিসিপ্লিন,…
গুরুত্বপূর্ণ রেজিস্টার প্রতিপালন,
ভুলে যাব তোমার সৌভাগ্যকে হিংসা করতে ;

অথচ এই বুকিং ক্লার্ক সব পেয়েছে,
সাধারণ মানুষের ভিড়ে ও যে স্বতন্ত্র,
আর স্বাতন্ত্র্যেই সে হারিয়ে বসে।
টিকিট নিতে ঘণ্টা বাজছে ত্রৈলোক্য !

ঘণ্টা…
বুকিং ক্লার্ক…
স্বপ্ন দেখো না…
ডিস্ট্যাণ্ট সিগন্যালে আলো জ্ব'লে উঠেছে…
নীল!…

নাঃ,
ও তোমার ট্রেন নয়!
ত্রৈলোক্য—
শোন…
অপেক্ষা আমায় করতেই হবে;
আর জড়িত থাকবে—
একসূত্রে—
আমার কৈফিয়ৎ-দাবি ও ঈর্ষা।

শ্রীসমর সোম

উপন্যাসের উপকরণ

১৩

আপনারা হয়তো আশ্চর্য হয়েছেন, এতবড় একটা আন্দোলনে উকিল-পরিবারের তরফ থেকে কোনও সাড়াশব্দই পাওয়া যায় নি। আমি নিজে মোটেই আশ্চর্য হই নি, কারণ, কারণটা আমার জানা ছিল। বিষয়টি অতি তুচ্ছ, কিন্তু আমার ভবিষ্যৎ উপন্যাসের উপকরণ হিসাবে কাজে লাগতে পারে।

আমার ছোট বন্ধুরা আবার আমার সঙ্গে মেলামেশা বন্ধ করেছে। এদের মধ্যে উকিলবাবুর বড় নাতি অরুণকুমার বয়োজ্যেষ্ঠ। একদিন সে আমার বসবার ঘরের জানলা দিয়ে উঁকি মেরে, এদিক ওদিক চেয়ে সটান দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকল। তার মুখে চোখে গুপ্ত বিপ্লবীর

সন্ত্রস্ততা। চোখ দুটো বড় বড় ক'রে চুপি চুপি বললে, দাদু, একটা কথা আছে।

তার ভাবভঙ্গি দেখে মনে হ'ল, তাদের বোমা তৈরির কারখানাটা পুলিসে ঘেরাও করেছে। কিন্তু সে যা বললে তার সারমর্ম এই: তাদের মুহুরীদাদা উকিলবাবু ও উকিলগিন্নীকে বুঝিয়েছে যে, আমার সংসর্গ সৎ-সংসর্গ নয়। আমি কোন্ জাত—ক্রিস্তান, না, মুসলমান, জানা নেই। বাঙালী কি না, তারই বা ঠিক কি? তাঁর পরিচিত জনৈক ইংরেজ পাদ্রি ঠিক বাঙালীর মত বাংলা বলতে পারতেন মুহুরীবাবু স্বকর্ণে শুনেছেন। তাঁর মতে, এরূপ ক্ষেত্রে পারিবারিকভাবে এত বেশি মেলামেশা সঙ্গত নয়। অরুর কথাবার্তায় আরও জানতে পারি, তাঁর সৃষ্ট আন্দোলনটা আজ শুধু উকিল-পরিবারেই সীমাবদ্ধ নয়, পাড়াময় ছড়িয়ে পড়েছে। ফলে, আমার সঙ্গে মেলামেশার সম্বন্ধে সারা পল্লীর ছেলেমেয়েদের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। বলা বাহুল্য, গরিবদের 'ছোটলোক'পাড়ায় এই নিষেধাজ্ঞা বলবৎ নয়।

উপসংহারে বিপ্লবী বালক-নেতা অরুণকুমার উত্তেজিতভাবে বললে, দেখবেন দাদু, ঢেলা মেরে ওর আব ফাটিয়ে দেব। পরে লক্ষ্য করি, মুহুরীবাবুর মস্তকের পশ্চাদভাগে বয়স্ক এক স্থূলকায় অর্বুদ বিদ্যমান।

শঙ্কিতভাবে বলি, না না, ওসব কিছু ক'রো না তোমরা। আমি বরং ওকে পুলিসে ধরিয়ে দোব।

সোৎসাহে হাততালি দিয়ে অরু বললে, সেই ঠিক। আচ্ছা হবে! লালপাগড়ী এসে হাতকড়া পরিয়ে নিয়ে যাবে। কেমন জব্দ! উৎসাহের চোটে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎকারের গোপনতা বিষয়ে ইতিমধ্যে সে অনবহিত হয়ে পড়েছে। কি ভেবে সামলে নিয়ে ফিসফিস ক'রে বললে, সুবলডাঙার মাঠ পেরিয়ে কাঁদরের ধারে কেয়াবনের পাশে আসছে-রবিবার বৈকালে আমাদের মীটিং। তুমি যাবে দাদু?—এই ধরনের অন্তরঙ্গতার ক্ষেত্রেই 'আপনি' 'তুমি'তে পরিণত হয়।

আমার মাথায় দুষ্টবুদ্ধি চাপল। তাদের এই ষড়যন্ত্রে যোগ দিতে স্বীকৃত হই, উদ্দেশ্য—অবাঞ্ছিত একটা কিছু ক'রে না বসে।

গুপ্ত বিপ্লবী যে ভাবে তার সহকর্মীর নিরাপত্তার বিষয়ে সাবধান হয়, অনুরূপ সাবধানতায় তাকে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে সাহায্য করি।

মীটিং হয় নি। খুব সম্ভব লালপাগড়ীর আগমনের অপেক্ষায় ধ্বংসমূলক কার্যকলাপের পরিকল্পনা স্থগিত ছিল।

পূর্ব পরিচ্ছেদে বর্ণিত গুরুতর ঘটনার পরদিন সকালে এই ভেবে আশ্চর্য হই যে, এত সব জানা থাকা সত্ত্বেও ছেলেটাকে নিয়ে বিপন্ন হয়ে সাহায্যের আশায় সর্বপ্রথমে উকিল-গিন্নীর কথাই মনে পড়েছিল। 'পাড়াপড়শী মা-ষষ্ঠী'।

শরতের রৌদ্রোজ্জ্বল প্রভাত। আকাশ ও মন মেঘমুক্ত। উকিল-দম্পতির ছেলেমানুষিতে পুলক অনুভব করি। এবং পুলকিত মনে ডক্টর রায়ের বাড়ির উদ্দেশে পদব্রজে যাত্রা করি।

পথে যেতে যেতে এদের কথাই ভাবছিলাম। যত সহজে গ্রহণ করে, তত সহজেই বর্জন। গ্রাম সম্পর্ক বজায় রাখতে হ'লে, এই নিয়ে ঝগড়াঝাঁটি করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। যার ফলে আবার গ্রহণ। আবার ঝগড়া। আবার মিলন। এই ভাবটা পুরাতন হ'লে শেষ পর্যন্ত একটা কিম্ভূতকিমাকার সম্পর্ক গ'ড়ে ওঠে। মোটামুটি একেই ওরা পাড়াপড়শী ব'লে অভিহিত করে।

আর ওরা—যাদের বাড়ি আমি বেড়াতে যাচ্ছি? গ্রহণ করে ধীরে ধীরে, তিলে তিলে, ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে, এটিকেট রেখে। আর বর্জন? আজও আমার জানা নেই। সন্দেহ হয়, না-গ্রহণ-না-বর্জন-নীতিতে ওরা নিরাপদ নিরঙ্কুশ ভূমিতে সচ্ছন্দ-সুখবিলাসে বিচরণ করতে চায়। অনুসন্ধান শেষ পর্যায়ে উপনীত না হওয়া পর্যন্ত উপন্যাসের উপকরণ সম্বন্ধে পূর্ব-বিচার আমার পক্ষে ন্যায়সঙ্গত হবে না। তবে এটা ঠিক, বিনাসংঘর্ষে দুই দূরবর্তী বেগমান বস্তুর মিলন অসম্ভব। সমুদ্রমন্থন না হ'লে অমৃত উঠত কি?

…অতসীকে বুঝিয়ে বলতে হবে, এ তার অন্যায়। স্বাধীন ভাবে নিজের মত ব্যক্ত করবার অধিকার সকলেরই আছে। আমার লেখাটা ছাপা না হ'লেও 'নন্দিনী' প্রকাশে কৃতিত্বের অভাব ছিল না। প্রথমেই অতসীর কবিতা "পথের ধারের ঘর"।

ভাবতে ভাবতে এসে পড়েছি। পর্দা ঠেলে ভিতরে ঢুকতেই অপর এক বেগবান বস্তুর সঙ্গে আমার কলিশন হ'ল। উভয় পক্ষেই 'মে আই কাম্ ইন্' যেন ক্রমেই অনাবশ্যক হয়ে পড়ছে।

এই যে, আপনি এসেছেন! যাক, বাঁচা গেল! আপনার ওখানেই যাচ্ছিলাম। আপনার লাগে নি তো?

ঘনিষ্ঠ সংঘর্ষ হ'লে নিশ্চয়ই তা প্রাণ স্পর্শ করত—তার নয়, আমার। বললাম, না, লাগে নি। কিন্তু ব্যাপার কি?

অতসীর অসুখ। দশ দিন হ'ল আজও জ্বর ছাড়ে নি। ডাক্তার প্লুরাসি ব'লে সন্দেহ করছেন। বড়ই মুশকিলে পড়েছি। পাশের ঘরের পর্দা ঠেলে ভিতরে যেতে যেতে বললে, আজ সকাল থেকে বার বার আপনার কথাই বলছে।

অনুমতির অপেক্ষা না ক'রে তার পিছু পিছু পাশের ঘরে প্রবেশ করি। আমার সঙ্গে কথাবার্তায় প্রভাতরবি অতসীর অপর নাম রেখেছে 'আপনার মেয়ে'। এরূপ ক্ষেত্রে তার ঘরে ঢুকতে সংকোচ বোধ করি। আমাকে পৌঁছে দিয়েই প্রভাতরবি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

গিয়ে দেখি, অতসী চোখ বুজে শুয়ে আছে, শিয়রে চেয়ারে ব'সে পূর্ণিমা। তার মুখে ভোরবেলার অস্তমান চাঁদের ম্লানিমা দেখে চমকে উঠি। পরক্ষণেই এই ভাবটা সংযত করি। মনস্তাত্ত্বিক-উপন্যাস-লেখকের পক্ষে ভাবপ্রবণতা ভাল নয়। বহু বিনিদ্র রজনীর ধ্যানের বস্তু অন্তরের গূঢ় স্নেহে পরম যত্নে সৃষ্ট যে কোনও চরিত্রকে নিষ্ঠুর উপন্যাস-লেখক নিজ প্রয়োজনে যে কোনও পরিচ্ছেদে টুঁটি টিপে মারতে পারে। প্রকাশ্য দিবালোকে এই ধরনের হত্যালীলা ডিটেকটিভ উপন্যাসকেও হার মানিয়ে দেয়।

অতসী জেগে ছিল। আমাকে দেখে পূর্ণিমা চেয়ার ছেড়ে উঠল। খুট ক'রে শব্দ হ'ল। সেই শব্দে চোখ মেলে ঘাড় বেঁকিয়ে বললে, কাকাবাবু এসেছেন? বসুন। তার ম্লান মুখে ততোধিক ম্লান হাসি। শুধু কি দুর্বলতা? তার সঙ্গে হয়তো একটু অভিমানও মেশানো ছিল।

আমার শুষ্ক শীর্ণ হাতখানা ওর কপালে রাখি। ভেলভেটের মত মসৃণ! হাতের স্পর্শ পেতেই অতসীর চোখ বেয়ে শরতের শুভ্র শিশির অজস্র ধারায় ঝ'রে পড়ল।

পাশের ঘর থেকে নানাপ্রকারের মিশ্রিত শব্দ কানে আসছে। ল্যাবরেটারির কাজ চলছে। মুশকিলটা তার কোন্‌খানে তা স্পষ্ট বোঝা গেল। 'রিসার্চ' বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে। অনাবশ্যক স্ত্রীর অবিবেচক অসুখের জন্য।

এক দিকে নিষ্ঠুর বৈজ্ঞানিক, আর কেউ নয়, তার স্বামী। অন্য দিকে হৃদয়হীন মনস্তাত্ত্বিক-উপন্যাসলেখক—তার কেউ নয়, পিতৃস্থানীয়, পাতানো কাকা। এই উভয় সংঘর্ষে প'ড়ে মেয়েটার ধ্বংস অনিবার্য এবং অদূরবর্তী, এর জন্য দার্শনিকের সূক্ষ্ম দৃষ্টির প্রয়োজন হয় না। 'একটি শিশিরবিন্দু'। কি গুণ ছিল ঐ এক বিন্দু শিশিরের, কেমন ক'রে আমার হাতে ঠেকল—যার স্পর্শে আমার দেহমনের শিরা-উপশিরায় স্বভাবত অনতিচঞ্চল রক্তস্রোত প্রবলবেগে এবং ভিন্নপথে প্রবাহিত হ'ল! সেই একটি শিশিরবিন্দু আমার মনের ক্ষতে রক্তবিন্দু হয়ে দেখা দিল।

রিসার্চ ক'রে ও বিশ্ববিখ্যাত হোক, আমার তাতে আপত্তি নেই। কিন্তু আমার অদৃষ্টে উপন্যাস লেখা ঘ'টে উঠল না। উপন্যাসের চরিত্রের সঙ্গে যে ব্যক্তি এত ঘন ঘন এবং ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে পড়ে, সে উপন্যাস লিখবে কখন্‌ এবং কেমন ক'রে? প্রত্যেকটি মডেলকে যে ভালবেসে ফেলে ঢলাঢলি করে, তার পক্ষে ছবি আঁকা অসম্ভব।...উপন্যাস চুলোয় যাক, মেয়েটাকে বাঁচাতে হবে। আমার মনে দৃঢ়সঙ্কল্প উদিত হ'ল।

নীরবতা ভঙ্গ ক'রে অতসী বললে, আপনি এতদিন আসেন নি কেন ?

আমি তো জানতাম না মা, তোমার অসুখ। এখানে এসে একটু আগে জানতে পারি।

রোগীজনোচিত ভাবাবেগ কেটে যেতেই, ওকে অনেকটা সুস্থ দেখায়। শুধোয়, আপনি চা খেয়েছেন ? অমুদি বলছিল, আপনি খুব ঘন ঘন চা খান। এই ব'লে পায়ের দিকে চেয়ে ইঙ্গিত করতেই পূর্ণিমা উঠে চ'লে গেল।

চারিদিকে চেয়ে দেখলে। মনে হ'ল, ওর গল্প করতে ভাল লাগছে। কথাবার্তার পথ খুলে দিতে অতসীর প্রিয় বিষয় নিয়ে আরম্ভ করি, অমুর মুখে শুনলাম, 'নন্দিনী'র জন্যে তোমাকে খুব খাটতে হয়েছে। সামনের দুটো মাস আমিই চালিয়ে নোব। তার পর বাঁধাপথে চ'লে যাবে নিজের গতিতে···

'নন্দিনী' আর বেরুবে না। আপিস, প্রেস—সব তুলে দিয়েছি।

সন্দেহ হ'ল, আমার জন্যেই কি এই কাণ্ডটা ঘটেছে ? আমি নিজে অনুতপ্ত ও কুণ্ঠিত বোধ করলেও, আমার অন্তরের সেই চিরাভিমানী চিরন্তন শিশুটি খুশি হয়ে উঠল। কৌতূহল চেপে কণ্ঠস্বরে উদ্বেগ এনে জিজ্ঞাসা করলাম, তুলে দিয়েছ ? কেন, কি হয়েছিল ?

কর্মসচিব বিভূতিবাবুকে নিয়ে গোল বাধল। প্রথমত, আপনার প্রতি তার অপমানজনক ব্যবহার, সে বরং বরদাস্ত করেছিলাম। শেষটায় কিশোরের পিছনে লেগেছিল। বলে—হয় ও পুলিসের চর, না-হয় বিপ্লবপন্থী। আমি ঝঞ্ঝাট সইতে রাজী নই। তাই সব কিছু চুকিয়ে দিলাম।

কিশোর কোথায় ?

জানি না। শুনছি, এই শহরেই আছে। কোথায় থাকে, কেমন ক'রে তার দিন চলে, কিছুই জানি না।

আর বিভূতিবাবু ?

এইখানেই আছেন। 'নন্দিনী' আপিসেই দুটো ঘর নিয়ে থাকবার ব্যবস্থা হয়েছিল। নীচের তলায় কোয়ার্টার্স আছে। শুনছি, সেইখানেই আছেন এখনও। ও-বাড়িটা ভাড়াটে নয়, কেনা। আমি নিষেধ করেছিলাম, 'উনি' শোনেন নি। আমোদ ক'রে বলেছিলেন, ঈশ্বর করুন, 'নন্দিনী' যদি দীর্ঘজীবন না পায়, আমি ওখানে ল্যাবরেটারি বসাব।

কথাটার মোড় ফিরিয়ে নিতে চাই। দরজার পানে তাকাই। পূর্ণিমা আসে না। তৎপরিবর্তে পর্দার পাশ দিয়ে মাথা গলিয়ে ঘরে ঢুকল ডক্টর রায়। তার দু হাতে দু কাপ চা। মাথায় কিঞ্চিৎ কাপড় টেনে দিয়ে অতসী পাশ ফিরে শুল।

সসার সুদ্ধ ডান হাতের কাপটা আমার হাতে দিয়ে, সেই হাতে অনতিদূরবর্তী টি-পয়টা আমার কাছে টেনে দিলে। নিজে অতসীর বিছানায় বসল। বাঁ হাতের কাপটা ডান হাতে নিয়ে চুমুক দিলে। তার নিজের জন্য সসার ছিল না। দু-এক চুমুক দিয়ে ডাকলে, পূর্ণিমা!

আমার দিকে চেয়ে বললে, আমি একবার ডাক্তারের ওখানে যাব। আপনি ততক্ষণ ওর কাছে বসুন। আপনার হয়তো কষ্ট হবে, কিন্তু উপায় কি? দশটা বাজতে চলল, অনু-বউদি এলেন না এখনও।

বৈজ্ঞানিকের কোমল প্রাণ! জীবমাত্রেরই দুঃখ-কষ্টে বিচলিত হয়, শুধু আপন স্ত্রী ছাড়া। বুঝলাম, এই সময়টায় অনু এসে রোগীর কাছে বসে, ও যায় ডাক্তারের কাছে রিপোর্ট দিতে। পূর্ণিমা ছেলেমানুষ। অভিভাবকের শুষ্ক কর্তব্য হিসাবে এইটুকু যে না করলেই নয়।

পূর্ণিমা এল। তার কাছে টেম্পারেচারের চার্ট নিয়ে ডক্টর রায় বেরিয়ে গেল।

পার্শ্বপরিবর্তন ক'রে অতসী বললে, যাও তো পূর্ণিমা, তুমি গিয়ে অনুদিকে ডেকে নিয়ে এস।

এইটুকু উল্লেখযোগ্য। এর আগে এই দম্পতি জোড়ায় কোনও দিন আমার সম্মুখে হাজির হয় নি। এই শালীনতা উপভোগ্য, নিজেকে সম্মানিত বোধ করি। 'গলায় ঝোলে মাদুলি'। প্রভাতরবির প্রবেশে আমার সমক্ষে তার এই সঙ্কোচ-প্রকাশ বাঙালী মেয়ের পক্ষে এটিকেট মাত্র, কিন্তু তা গভীর অর্থপূর্ণ। স্ত্রীপুরুষ-নির্বিশেষে "হ্রী" (লজ্জা) ভূষণস্বরূপ—ভদ্রতার পরিচয়, কথাটা খুব সম্ভব গীতায় পড়েছি। অবশ্য বাড়াবাড়ি সব ক্ষেত্রেই বিকটমূর্তি ধারণ করে, দৃষ্টান্ত যথা—দাতাকর্ণের ছেলে কেটে অতিথি-সৎকার। মেয়েদের লজ্জাশীলতা এক সময় আমাদের দেশে বাড়াবাড়িতে পরিণত হয়েছিল, পল্লীগ্রামে আজও আছে। কোনও কোনও অভিজাত সমাজেও এটিকেটের খুঁটিনাটি বিরক্তিকর পর্যায়ে উপনীত হয়েছে। কিন্তু এসব কথা আমার কিছু কাজে লাগবে না, উপন্যাস সমাজতত্ত্ব নয়।

পূর্ণিমা চ'লে গেলে আমার দিকে পূর্ণদৃষ্টিতে চেয়ে অতসী বললে, কাকাবাবু।

কিছু বলবে ?

আমি যতদিন সেরে না উঠি, আপনি তো রোজ আসবেন ?

এ কথা জিজ্ঞেস করছ কেন ?

হ্যাঁ, আপনি রোজ আসবেন। একটু ইতস্তত ক'রে বললে, বলছিলাম কি, আমাকে দেখাশোনা করবার লোকের অভাব নেই, কোনও ত্রুটিই হচ্ছে না। কিন্তু একটা কথা কি জানেন কাকাবাবু, নিজের শরীরের দিকে মোটেই লক্ষ্য নেই কিনা। পাঁচ রাত্রি সমানে জাগছেন। দিনের বেলা এরা সব আমার কাছে থাকে, রাত্রে থাকেন নিজে। নিজের রিসার্চের কাজ, সে উনি একদিনও বাদ দিতে পারেন না। এমন ক'রে কদিন যুঝবেন ? মানুষের শরীর তো !

ডক্টর রায়ের কথা বলছে। কে যেন জোরে আমার মনের গায়ে চাবুক বসিয়ে দিলে। এতক্ষণ তার বিষয়ে কি সব আবোল-তাবোল

ভাবছিলাম আমি! এ কথাটা শুনেও কিন্তু খুব খুশি হতে পারলাম না। উপন্যাস লেখা কোনও দিনই আমার ঘ'টে ওঠে নি, উপকরণ সংগ্রহ করতেই জীবন কেটে গেল—তাই আজ আত্মসমালোচক আমি আশ্চর্য হয়ে ভাবি, নানান চরিত্রের বিশ্লেষণ নিয়ে যাঁদের কারবার, তাঁরা কোনও দিন ভেবে দেখেন নি যে, সবচেয়ে অদ্ভুত তাঁদের নিজের চরিত্র। একটু আগে যার জীবনাশঙ্কায় উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিলাম, তার জীবনে কোনও সমস্যা নেই, দাম্পত্যজীবনে সে সম্পূর্ণ সুখী—এই কথা জানতে পেরে কেমন যেন নিরুৎসাহ হয়ে পড়ি। সমস্যাহীন নিষ্কণ্টক শান্তিপূর্ণ পারিবারিক পরিবেশ নিয়ে কবিত্ব চলে, উপন্যাস একদম অচল। পরম শান্তি এবং চরম দুর্ঘটনার জের চলে না। উপন্যাস-লেখক এই দুটোর মধ্যবর্তী অবস্থা নিয়ে নাড়াচাড়া করেন—এই তাঁর খেলা, যদিও যে-কোনও একটা দিয়েই উপন্যাসের পরিসমাপ্তি ঘটে।

অবশ্য তখন এতটা তলিয়ে বুঝতে সময় পাই নি। আমাকে চমকিত ক'রে অতসী ডাকলে, আচ্ছা কাকাবাবু!

আমি বুঝতে পারছি, অতসী, কি যেন তোমার বলবার আছে। যদি আপত্তি না থাকে—

সেই কথাটাই ভাবছি। একটু ভেবে ও যেন সাহস সঞ্চয় ক'রে নিলে। চক্ষু নত ক'রে বললে, কারও মনে যদি কিছু গোপন কথা থাকে, তা কি আর কাউকে বলা উচিত?

এ সব কি বলছে অতসী! তার এই ক্ষুদ্র জীবনে এমন কি গুরুতর বিষয় থাকতে পারে, যা তার মনকে এই ভাবে পীড়িত করছে? আমার মনে সন্দেহের ছায়া পড়ল। উপন্যাসের পক্ষে অনুকূল হ'লেও, অসুস্থ অবস্থায় এই ধরনের দুশ্চিন্তা তো তার পক্ষে ভাল নয়।

বললাম, না, তা কখনও বলা যেতে পারে না। বললে খারাপ ফল হয়। কথাটা যদি অন্যায় হয়—মনের পাপের কি ইয়ত্তা আছে, মা? আমি যদি আমার মনের সব খবর সবাইকে বলি, তারা প্রচার ক'রে

বেড়াবে, আরও ঠেলে দেবে আমাকে অন্যায়ের পথে—একেবারে দাগী না ক'রে ছাড়বে না। সংসারে দরদী কজন আছে? অবশ্য, এমন লোকও দু-একজন থাকতে পারে, সে খুব কম, এত কম যে অনেকেরই ভাগ্যে জোটে না, যাকে সব কথা খুলে বললে মন হয়ে যায় হালকা, সব গ্লানি ধুয়ে মুছে যায়। কিন্তু তুমি বড় বেশি কথা কইছ, ক্লান্ত হয়ে পড়ছ। এতে তোমার অসুখ বেড়ে যাবে। একটু ঘুমোও দেখি।—এই ব'লে তার মাথায় ধীরে ধীরে হাত বুলোতে থাকি।

অতসী বললে, একটা কথা আপনাকে আমি বলব, কিন্তু আজ নয়। হ্যাঁ, যদি বাঁচি, আপনাকে বললে উপকার হতে পারে। না বাঁচলেও, আত্মার কল্যাণ হবে তাতে। আচ্ছা কাকাবাবু, আমি বাঁচব তো?

এমন সময় ডক্টর রায় এসে ঘরে ঢুকল। তার পিছু পিছু ডাক্তার, অমু, পূর্ণিমা। অনেকক্ষণ ধ'রে পরীক্ষা ক'রে ডাক্তার বললেন, আপনি ঠিক বলেছেন ডক্টর রায়, আপনার কথামত এসে ভালই করেছি। প্রেস্‌ক্রিপ্‌শনটা একটু পালটে দিতে হবে। অনেকটা ক'মে গেছে। আমি তো আগেই বলেছিলাম, এ আমার সন্দেহ, কিছু নাও হতে পারে। আমাদের আঁটঘাট বেঁধে কাজ করতে হয়। তবে এটাও ঠিক যে এখনও খুব সাবধানে থাকতে হবে। গুড্ বাই।—এই ব'লে টুপি তুলে নিয়ে চ'লে গেলেন।

অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়ে বাড়ি ফিরলাম। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আর এক চিন্তা এসে জুটল, অতসী আমাকে যে কথাটা বলতে চেয়েছিল, তা এমন কি হতে পারে? বাধা না পেলে নিশ্চয় সে বলত। ইহকালের উপকার, পরকালে আত্মার কল্যাণ—এই সব কথার অর্থ কি? একবার মনে হ'ল, এসব তার ছেলেমানুষি ছাড়া আর কিছু নয়। একটা সামান্য বিষয় ওর অসুস্থ দুর্বল মস্তিষ্ককে পেয়ে বসেছিল। তুচ্ছ একটা সমস্যা, নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর কিছু।

কে জানি কি!

[ক্রমশ]

শ্রীভোলা সেন

মাতালের মাতলামি

[ভাঁটিখানায় এক এদেশীয় (বিহারী) শিক্ষিত ভদ্রলোক সংসারের জ্বালা ভোলবার জন্যে এক বন্ধুর উপদেশে প্রায় ভাঁড় দু-তিন খাঁটি তাড়ি পান করে। তার পর বদ্ধ মাতাল অবস্থায় সে জড়িয়ে জড়িয়ে হিন্দীতে যা যা বলছিল, আমি ঠিক সেই কথাগুলোই পরিষ্কার বাংলায় লিখলাম। স্থানবিশেষে নিজেও কিছু কিছু যোগ করেছি।—লেখক।]

রসিয়ে রসিয়ে তোমরা আমাদের মারছ—
আমাদের মারবার জন্যেই কি তোমাদের ভারত স্বাধীন হ'ল?
তোমাদের ভারত না তো কি!
তোমরাই তো আজ সর্বেসর্বা।
গরম গরম, লম্বা লম্বা, একঘেয়ে বুলি কপচাচ্ছ,
আর নির্লজ্জতার গগনস্পর্শী স্পর্ধায়
তোমরা সবেরই চূড়ান্ত করছ।
আচ্ছা, সত্যি বল তো—তোমরা কি মানুষ?
না, ছদ্মবেশী শয়তান?
ভারতের অগণিত নর-নারীর,
চরমতম দুরবস্থা তোমরা কি দেখতে পাও না?
আহা! ন্যাকামি। দেখেও তোমরা কিছু দেখ না।

আমার অবসরমত আমি রোজ ভাবি তোমাদের কথা।
ভাবি, তোমরা কি?…কি?
পাথর? না, জ্ঞানপাপী?
অন্ধ? না, দেখেও চোখে ঠুলি দিয়ে ব'সে আছ?
কালা? না, কানে তুলো দিয়েছ?
আসলে তোমরা কি? ওগুলোর সমষ্টি, না, অন্য কিছু?
কিম্ভূতকিমাকার? হয়তো তাই।

মাইরি, আশ্চর্য হই তোমাদের রকম-সকম দেখে।
তোমাদের স্টকে খাবার রয়েছে প্রচুর, খেতে দেবে না।
স্রেফ ভণ্ডামির বুলি আওড়াবে
আর কথায় কথায় গুল্ ঝাড়বে,—
প্রাকৃতিক দুর্যোগ, তাই খাদ্যাভাব,
পাঁচ বছরের প্ল্যানে প্রচুর খাদ্য হবে, তখন খুব খেয়ো,
আর এখন ছরি-মটর খেয়ে মৌজ কর।

কি ভীষণ বেহায়া তোমরা, সত্যি!
গলা বাজিয়ে ব'লে বেড়াচ্ছ "বার্থ কণ্ট্রোল কর—
দেশের দুঃখ-দৈন্য অনেক কমবে।"
আহা, চালুনি আবার ছুঁচের বিচার করে!
নিজেদের আগণ্ডা আণ্ডা-বাচ্চা—
আর আমাদের জ্ঞানবাণী শোনানো হচ্ছে!
বেশ তো, বার্থ কণ্ট্রোল করতে বলছিস—
তো দেখা না, আগে নিজে ক'রে দেখা;
তা নয় যত সব ইয়ে···

ইস, কি নির্লজ্জ তোমরা, সত্যি!
তুমিই না একদিন গলা বাজিয়ে বলেছিলে—
বলেছিলে—"যদি কোনদিন রাজত্বের ভার আমি পাই,
তা হ'লে-ভারতে কাউকে অনাহারে মরতে দেব না।"
আজ,পৃথিবীর সপ্ত আশ্চর্যের মধ্যে তোমাদের কথাও পড়ে।
তোমাদের হাতে শাসনভার পড়বার পরই
শুরু হ'ল—
দুর্ভিক্ষ, দোকানে চাল রয়েছে,
অনাহারী লোকেরা লাইনের পর লাইন লাগাচ্ছে দোকানে—
চাল পাওয়া গেল না।

বস্ত্র সংকট—গুদামে ঠাসা কাপড়
নগ্ন অর্ধনগ্ন নর-নারীর আবার সেই রকম মিছিল ;
কুমারীরা, বিবাহিতারা গলায় দড়ি দিল
কাপড় পেল না ব'লে।
অফিসের বাবুরা তালির ওপর আবার তালি চড়াল—
আণ্ডারওয়ার পরল, হাফ প্যাণ্টও।
তবু তোমরা কাপড় ছাড়লে না—
চড়া দামে ব্ল্যাকে ঝাড়লে বাজারে।

রামরাজত্ব অবশ্যই তোমাদের
ফাইন রাইস আর নবাবী খানা,
সুপার ফাইন ধুতি-শাড়ি,
নিত্য নতুন ফার্নিচার আসছে
প্রতি বছর বিনা পয়সায় 'কার' বদলাচ্ছ।
আর ওদিকে ভুঁড়ি আর ব্যাঙ্ক
সমান তালে বাড়ছে।
বাড়ুক, খুব যত্ন করবে কিন্তু।

আমার মনে হয়, তোমাদের এই রাম-রাজ্য
এখন দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ হচ্ছে চোরা বা কালো-বাজারে।
আজ পর্যন্ত আমার বাপের জন্মেও আমরা
কোনদিন শুনি নি যে,
স্বাধীন কোন রাজ্যে পুলিসের সামনে
বা সরকারের নাকের ওপর খোলাখুলি কালো-বাজার।
অথচ তোমরাই নাকি একদিন বলেছিলে,
বলেছিলে, কালো-বাজারীদের খোলা রাস্তায় জনতার
সামনে ফাঁসিতে লটকানো হবে !
কিন্তু চাঁদ ! আজ পর্যন্ত ক জনকে চড়িয়েছ দাদু !
চড়াবে কি ক'রে ?

বেনামী হাতের হাজার হাজার টাকায় দিল ঘুস।
তোমাদের দিল ফুঁসে—কেমন ধুলো দিলে তোমাদের চোখে!
বাবা সত্‌নারায়ণ-কি কসম বলছি,
তোমাদের অদ্ভুত কর্মকুশলতা তৎপরতা দেখে,
আমি বিমুগ্ধ চিত্তে গদ্‌গদকণ্ঠে তোমাদের তারিফ
কিছুই করতে পারছি না।
বাপ কসম্ বলছি, ঝুটা একদম নয়!
তোমাদের এমন অকপট দেশপ্রেম দেখে.
এত অনাচার অত্যাচার কষ্ট-দুঃখের প্রতি
টনটনে জ্ঞান আর অপূর্ব কার্যদক্ষতা দেখে,
আমি উন্মাদপ্রায়, বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছি।
তোমাদের মহান ও অতুলনীয় গুণে
গুণমুগ্ধ আমি এমনই বিচলিত যে,
ইচ্ছে হয়. তোমাদের সঙ্গে তুলনা করি বোম্‌ভোলা
মহেশ্বরের, কিন্তু বললাম তো, ভাষা নেই।
তোমাদের গুণ বর্ণনা করতে আমি অক্ষম,
আমার ভাষা গেছে হারিয়ে,
কলম গেছে মূক হয়ে,
চিন্তাধারা গেছে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে,
আর, আর কাগজ গেছে উড়ে।

হে অন্নদাতা-বাপ-মাই,
তুম্‌হারা ঔরী পাঁচ সালকে বিচিত্তর লীলা
দেখেলা হামনি সব ইস্তজার কর রহলবান।
দিখাও তোহনি সবকে রামলীলা॥

শ্রীআনন্দগোপাল ভট্টাচার্য

"কবিতা পড়া বাড়াও"

সংবাদটা পড়ার পর থেকে হর্ষবাবুর মাথার মধ্যেটা যেন রাগে ঝি-ঝি করতে থাকে। আপিসে পা দিয়ে মহাদেববাবুকে সামনে দেখতে পেয়ে মনের জ্বালাটা যেন জুড়িয়ে বাঁচলেন। চেয়ারে ব'সে দেশলাইয়ের বাক্স থেকে একটা কাঠি বার ক'রে পানদোক্তা-খাওয়া কালো দাঁতের গোড়া খুঁচতে খুঁচতে ব'লে উঠলেন, দেখেছ মহাদেব, আজকের খবরটা ?

আজ্ঞে হ্যাঁ, দেখে থাকব বইকি। সকালে উঠে কাগজটা আগাগোড়া না প'ড়ে আমি চা পর্যন্ত মুখে দিই না। তার পর একটু থেমে বললেন, দুর্ভিক্ষ-প্রতিরোধ-অভিযানের কথা বলছেন তো ?

আরে রাম! তা হ'লে তো বাঁচতুম।

তবে স্যার, কাশ্মীর সমস্যা নিয়ে জাফরুল্লা খাঁর তড়পানির কথা বলছেন তো ? হর্ষবাবু মহাদেববাবুদের সেক্‌শনের বড়বাবু, তাই একটু সমীহ ক'রেই তিনি তাঁর সঙ্গে কথা কইতেন।

আরে, না না, সে সব তো ভাল খবর।

রামবাবু পাশের চেয়ার থেকে এতক্ষণ হাঁ ক'রে যেন তাঁদের কথাগুলো গিলছিলেন। তাঁর বিশ্বাস, সেক্‌শনের মধ্যে সবচেয়ে বেশি খেটে মরেন তিনি, অথচ বড়বাবু মহাদেববাবুকে পছন্দ করেন বেশি। এই সুযোগে রামবাবু তাই ওরই মধ্যে দু-চারটে ফোড়ন কেটে বড়বাবুকে দমাবার তাল খোঁজেন। তিনি খপ ক'রে ব'লে ওঠেন, আপনি, স্যার, আইন-আদালতের পৃষ্ঠায় যে খবরটা বেরিয়েছে তার কথা বলছেন তো ? আমি পড়েছি। ব'লে এক প্রকার লালাসিক্ত স্বরে ব'লে উঠলেন, একটা ছোঁড়ার সঙ্গে তিনটি স্কুলের মেয়ে পালাতে গিয়ে রানাঘাটে ধরা পড়েছে—

হর্ষবাবু এবার নাসিকা কুঞ্চিত করলেন।—আরে, তা হ'লে তো বুঝতুম একটা খবরের মত খবর। ব'লে দাঁত-খোঁটার কাঠিটা সামনে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললেন, আরে, ওই যে একদল ছোঁড়া ক্ষেপে উঠেছে, বলে—কবিতা পড়া বাড়াও, আরও কবিতা পড়। যত সব ভ্যাগাবণ্ডের

দল বাপের স্কন্ধে ব'সে অন্নধ্বংস করে, তাই সময় কাটাবার আর কিছু না পেয়ে শুরু করল—'আরও কবিতা পড়'-আন্দোলন। অ্যাঁ, দেখ, আন্দোলন করার মত বিষয় আর কিছু খুঁজে পেলে না ?

মহাদেববাবু সঙ্গে সঙ্গে পোঁ ধরলেন, খাদ্যসমস্যা, বস্ত্রসমস্যা, গৃহ-সমস্যা, উদ্বাস্তুসমস্যা, বেকারসমস্যা, পরিবহনসমস্যা, শিক্ষাসমস্যা—আজকের দিনে আবার সমস্যার অভাব ? সমস্যায় সমস্যায় মানুষের জীবন কণ্টকিত। এই পর্যন্ত ব'লে একটু থেমে তিনি আবার বললেন, শুনছি নাকি ওর মধ্যে এম. এ., বি. এ. পাস-করা ছোকরার দল বেশি।

আরে রেখে দাও তোমার শিক্ষিত। সত্যি শিক্ষিত হ'লে আজকে 'অধিক কবিতা পড়'-আন্দোলন না ক'রে 'অধিক খাদ্য ফলাও'-আন্দোলন করত। রাগে হর্ষবাবুর চোখ দুটো যেন জ্বালা ক'রে ওঠে।

রামবাবু বললেন, যত সব নামকাটা আধুনিক কবি গিয়ে নাকি জুটেছে ওখানে, যাদের কবিতার কেউ মানে বুঝতে পারে না ব'লে ছোঁয় না। কবি-সমাজের সেই সব ভাঙ্গীরা এই আন্দোলন নাকি চালাচ্ছে। তবু যদি এই ভাবে কিছু নাম করতে পারে।

হর্ষবাবু খেঁকী কুকুরের মত দাঁতের ওপর দাঁত ঘষতে ঘষতে চেঁচিয়ে উঠলেন, আর দেশের সংবাদপত্রগুলোও হয়েছে তেমনই, ছাপবার মত সংবাদ খুঁজে পেলে না, ওই পাগলামির খবরটা কিনা ছেপেছে প্রথম পৃষ্ঠায়।

হর্ষবাবুর স্টেনোগ্রাফার ছোকরা নোট নেবার জন্যে তাঁর টেবিলের পাশে এসে দাঁড়িয়ে ছিল। ব্যাপারটা সব সে শোনে নি ; শেষের দিকে এসে পড়েছিল ব'লে এতক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল। সে হঠাৎ ব'লে ফেললে, আজ্ঞে, সংবাদপত্রের কি অপরাধ ? সংবাদ মাত্রকেই তাঁরা সরবরাহ ক'রে থাকেন। বিশেষ ক'রে এই রকম একটা অদ্ভুত সংবাদ, এটা পরিবেশন করা তাঁদের কর্তব্য। তা ছাড়া একটু ভেবে দেখলে বুঝতে পারবেন যে, বাঙালী জাতির আজ মনের ঐশ্বর্য বলতে কিছু নেই, সব নষ্ট হয়ে গেছে। দেহের ক্ষুধার জন্যে যেমন খাদ্যের প্রয়োজন,

মনেরও তেমনই প্রয়োজন তো খাদ্যের। সে খাদ্যের সর্বোৎকৃষ্ট হ'ল ক'বিতা। আজ দেশ থেকে কবিতা উঠে যাচ্ছে ব'লেই তো এই অবস্থা। মানুষের মন মরুভূমির মত হয়ে উঠেছে। স্নেহ দয়া মায়া ভালবাসা প্রভৃতি কোমল বৃত্তি, যার জন্যে এই বাঙালী জাতি ছিল ভারতবর্ষের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত, আজ দেখুন তাদের কি পরিণতি হয়েছে। জাল জুয়াচুরি ফাঁকিবাজি প্রভৃতি নির্মম কাজে তাদের জুড়ি মেলা ভার।

হর্ষবাবু একটু উচ্চাঙ্গের হাসি হেসে বললেন, তুমি ছেলেমানুষ, তাই ছেলেমানুষের মতই কথা বলেছ। আসলে অন্নবস্ত্রের সমস্যা যেদিন দেশ থেকে চ'লে যাবে, সেই দিন আবার কবিতার হিল্লোল বইবে আপনা-আপনি। এর জন্যে আন্দোলন ক'রে রাস্তায় রাস্তায় শোভা-যাত্রা ক'রে বেড়ালে কোনও ফল হবে না।

স্টেনোগ্রাফার ছোকরা বড়বাবুর মুখের ওপর আর কথা কইতে সাহস পেল না, চ'লে গেল নিজের ঘরে।

তখন রামবাবু নীচু গলায় বললেন, উনি যে একজন আধুনিক কবি।

তাই নাকি?—ব'লে মহাদেববাবু ও হর্ষবাবু যেন একসঙ্গে চমকে উঠলেন।

রামবাবু বললেন, সেইজন্যেই এত বড় বড় আদর্শের বুলি আওড়াচ্ছিলেন, বুঝলেন না? কবিতা তো ওদের কেউ পড়ে না, তবু যদি এমনই একটা হুজুক তুলে কিছু করতে পারে।

হর্ষবাবু বললেন, ছাই হবে। এ দিয়ে যদি কিছু করতে পারে তো আমি কান কেটে ফেলব।

মহাদেববাবুর সঙ্গে রামবাবু ব'লে উঠলেন, যা বলেছেন স্যার।

কিন্তু যত বিরুদ্ধ সমালোচনা লোকে করুক না কেন, আন্দোলন থামে না। বরং দিন দিন বেড়েই চলে। আগে তবু ইউনিভার্সিটির সামনে, এসপ্লানেডের মোড়ে, বড় বড় চৌমাথায়, পার্কে তারা কবিতা আবৃত্তি ক'রে লোককে শোনাত। সম্প্রতি আরম্ভ করেছে ট্রামে বাসে রাস্তায় ঘাটে যেখানে সেখানে। যেমন হাত-কাটা তেল, দাদের মলম,

দাঁতের মাজন ক্যান্‌ভাসাররা বিক্রি করতে ওঠে চলন্ত ট্রেনে, তেমনিভাবে এরাও আন্দোলন নিয়ে উঠে-প'ড়ে লাগল।

হর্ষবাবুদের বাসটা সেদিন জগুবাবুর বাজারের সামনে এসে দাঁড়াতেই একটি ঝাঁকড়াচুলো ছোকরা দোতলায় উঠেই ওজস্বিনী ভাষায় শুরু ক'রে দিলে—

কোথা যাও ফিরে চাও সহস্র কিরণ।
বারেক ফিরিয়া চাও ওহে দিনমণি।
তুমি অস্তাচলে যবে করিলে গমন
আসিবে যবনভাগ্যে বিষাদরজনী।

কেউ হেসে উঠল, কেউ বা টিটকারি ক'রে বললে, যাব আর কোথায়? আপিসে। তোমার দিকে ফিরে চাইবার কারও এখন সময় নেই। এমনিই তো আপিসে পৌঁছতে দু-তিন মিনিট লেট হয়, তার ওপর আবার বাসটা আজ লেট পাঁচ মিনিট।

কেউবা অস্ফুটস্বরে অভিযানকারীদের সম্বন্ধে নানা কটুকাটব্য করে। আবার একজন পাশের বন্ধুটির কানে কানে বললে, এর চেয়ে কোন ছাত্রী কবি উঠলে পথটা কাটত মন্দ নয়। মিষ্টি গলার আওয়াজ তো শোনা যেত। তা ছাড়া চেহারাটা যদি ভাল হয় তো সোনায় সোহাগা।

হর্ষবাবু দোতলার একেবারে মুখের দিকে ব'সে ছিলেন। কবিতাটা কানে যেতেই তিনি পিছন ফিরে এমন ভাবে তার দিকে তাকালেন যেন এখুনি তাকে ভস্ম ক'রে ফেলবেন। কিন্তু কবিতা, বিশেষ ক'রে যে সব ক্লাসিক কবিতা, একদিন সমস্ত দেশকে মাতিয়ে তুলেছিল, তার মধ্যে একটা চিরন্তন আবেদন কোথায় যেন লুকনো থাকে। শিক্ষিত লোকের পক্ষে তার প্রভাব এড়ানো বড়ই কঠিন।

হর্ষবাবুর হঠাৎ মনে প'ড়ে গেল ছাত্রজীবনের কথা। কি উন্মাদনা এনেছিল একদিন এই কবিতাটা! তাঁর মনের মধ্যে তখন নবীন সেনের সমগ্র 'পলাশীর যুদ্ধ'টা মাতামাতি শুরু করে। তিনি মনে মনে আবৃত্তি করতে করতে চলেন—

পিতাস্ত কি দিনমণি ডুবিলেন এবার,
ডুবাইয়া বঙ্গ আদি শোকসিন্ধুজলে,
যাও তবে যাও দেব কি বলিব আর,
ফিরিও না পুনঃ বঙ্গ-উদয়-অচলে।

হর্ষবাবু যেন মুহ্যমান হয়ে পড়েছিলেন। সহসা জেনারেল পোস্ট অফিসের বড় ঘড়িটার ওপর চোখ পড়তে তিনি একেবারে সীট থেকে লাফিয়ে উঠলেন, এই রোকো—রোকো—একদম বাঁধকে—

কণ্ডাক্টার খরাগলায় ব'লে উঠল, এখানে বাঁধবে না। এতক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল, স্টপে তখন নামলেন না—ব'সে ছিলেন, আবার পরের স্টপ না এলে বাঁধব কেমন ক'রে?

সর্বনাশ, তাঁর আপিস যে এসপ্লানেডে, সেখানে যে তাঁর নামবার কথা। নিমেষে তাঁর কবিতার ঘোর যেন ছুটে যায়: মনে পড়ে, আজ ডিরেক্টরদের মীটিং ঠিক সাড়ে দশটায়। বোম্বের হেড আপিসের গ্রেহাম সাহেব আসবে। একেবারে রাইটার্স বিল্ডিঙের কোণায় গিয়ে বাসটা থামতেই লাফিয়ে পড়লেন হর্ষবাবু গাড়ি থেকে।

তারপর 'ট্যাক্সি ট্যাক্সি' ক'রে চেঁচাতে চেঁচাতে সামনে একটা গাড়ি দেখে ঝপ ক'রে উঠে ব'সে হুকুম দিলেন, এই, জলদি এসপ্লানেড: সেটা ছিল প্রাইভেট গাড়ি। ড্রাইভার সঙ্গে সঙ্গে চোখ পাকিয়ে ব'লে উঠল, এটা প্রাইভেট গাড়ি দেখতে পাচ্ছেন না? নেমে যান শিগগির।

ওঃ, ভেরি সরি, বড্ড ভুল হয়ে গিয়েছে, কসুর হোগিয়া ভাই। বলতে বলতে নেমে প'ড়ে একটা ট্যাক্সিতে গিয়ে চাপলেন।

আপিসে পৌঁছতে সতের মিনিট লেট হয়ে গেল হর্ষবাবুর। শুধু বড় সাহেব একলা নন, আরও পাঁচ জন বাঘা বাঘা সাহেব গম্ভীর মুখে গোল টেবিলের চারিপাশে ব'সে তাঁর অপেক্ষা করছিলেন। চাবি তাঁর কাছে, সমস্ত কাগজপত্তর তাঁর কাছে। তাদের মুখের দিকে তাকিয়ে হর্ষবাবুর তো, যাকে বলে 'আত্মারাম খাঁচা ছাড়া'। কোথায় তিনি

ভেবে রেখেছিলেন যে, তাঁর ইন্‌ক্রিমেণ্টের কথাটা এই সুযোগে গ্রেহাম সাহেবের কাছে পাড়বেন, তা নয়, একেবারে সব মাটি। মনে মনে যে কবিতা পাঠ করছিল তার চোদ্দপুরুষান্ত করতে করতে তিনি যখন ফাইল বগলে ক'রে ঘরে ঢুকলেন, তখন বড় সাহেব ভ্রূ কুঁচকে প্রশ্ন করলেন, হ্যালো রয়, হোয়াই সো লেট ?

বার কতক ঢোক গিলে কোঁৎ পাড়তে পাড়তে হর্ষবাবু বললেন, ইয়েস স্যার, মাই ওয়াইফ স্যার···কলেরা, অ্যাম সরি, অ্যাটাক্‌ট্‌ড্‌ উইথ কলেরা, সো আই হ্যাড টু গো টু ডক্টর—

ভয়ে ইংরেজীও যেন আর মুখে জোগায় না হর্ষবাবুর।

ও. কে.। টেক ইওর সীট।—ব'লে মোটা বর্মাচুরুটটা সরিয়ে নিলেন বড় সাহেব মুখ থেকে।

এতক্ষণে যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচলেন হর্ষবাবু।

আপিস থেকে ফেরবার পথে সস্তায় বাজার ক'রে নিয়ে বাড়ি ফেরা মহাদেববাবুর অভ্যাস, তখনও ট্রেনের আধ ঘণ্টা দেরি ছিল। মহাদেববাবু শিয়ালদার বাজারের কাছে ভিড় দেখে থমকে দাঁড়ালেন। ব্যাপার কি! মাইকের ভিতর থেকে সুললিত নারীকণ্ঠে তখন 'কচ ও দেবযানী' আবৃত্তি ভেসে আসছিল। জিনিসটা যে কি আর তাঁকে বলতে হ'ল না। তিনি কান পেতে শুনতে লাগলেন—

> "··· ···সুখ স্মৃতি
> কিছু নাহি মনে ? যদি আনন্দের গীতি
> কোনদিন বেজে থাকে অন্তরে বাহিরে,
> যদি কোন সন্ধ্যাবেলা বেণুমতী তীরে
> অধ্যয়ন অবসরে বসি পুষ্পবনে
> অপূর্ব পুলকরাশি জেগে থাকে মনে
> ফুলের সুবাস সম হৃদয় উচ্ছ্বাস—

সঙ্গে সঙ্গে মহাদেববাবুর সমস্ত মন যেন ডুবে যায় সেই কবিতার মধ্যে। তিনিও একদিন পড়তে গিয়ে শিক্ষক-কন্যার প্রেমে প'ড়ে তাকে

বিয়ে করেছিলেন। সে অবশ্য বহু দিনের কথা। বোধ হয় বিশ বছর হয়ে গিয়েছে। তখন বাসন্তী পূর্ণযৌবনা, গোপনে চিঠি লিখে তাঁকে প্রেম নিবেদন করত, সে তার মধ্যে এই 'কচ ও দেবযানী'র বহু লাইন উদ্ধৃত করত।

কবিতাটা শেষ পর্যন্ত শুনতে গিয়ে মহাদেববাবু সে গাড়ি ফেল করলেন। তার পর এক ঘণ্টা পরে গাড়ি। কিন্তু বাড়ির কথা তাঁর যেন মনেই ছিল না, তখনও সেই কবিতার অনুরণন চলতে থাকে তাঁর মনের মধ্যে। বাজারে ঢুকতে গিয়ে তিনি থমকে দাঁড়ালেন সামনে একটা ফুলের দোকান দেখে। এক ঝলক জুঁইফুলের গন্ধ তাঁর নাকে এসে যেন তাঁকে কেমন উন্মনা ক'রে দিলে, তিনি আর বাজারে না ঢুকে একগাছি জুঁইফুলের গোড়েমালা ও রজনীগন্ধার কয়েকটা গুচ্ছ কিনে বাড়ি ফিরলেন।

মহাদেববাবুর ফিরতে দেরি হওয়াতে বাসন্তী বার বার রাস্তার দিকে তাকাচ্ছিলেন। রাত হয়ে গিয়েছে, এখুনি ছেলেমেয়েগুলো ভাতের জন্য কান্নাকাটি শুরু করবে। ঘরে তরকারি বলতে কিছু নেই, মহাদেববাবু বাজার আনলে তবে রান্না হবে। মহাদেববাবুকে দেখে তাই তাঁর মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ল, কি বে-আক্কেলে লোক তুমি! এত রাত্তির ক'রে বাড়ি ফিরলে, জান তো বাজার আনলে তবে রান্না হবে।—ব'লে বাসন্তী তাড়াতাড়ি বাজারের থলিটা তাঁর হাত থেকে নিয়ে রান্না ঘরে চ'লে গেল।

একটু পরেই রুদ্রমূর্তিতে ছুটে এল বাসন্তী। তার পর সেই মালা আর রজনীগন্ধার গুচ্ছটা মহাদেববাবুর সামনে আছাড় মেরে ফেলে দিয়ে বললে, এ দিয়ে কি হবে, আমার শ্রাদ্ধ? বলি বাজার কোথায়?

সহসা যেন মহাদেববাবুর স্বপ্ন ভঙ্গ হয়, স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে ভয়ে তাঁর বুক কেঁপে ওঠে। কোথায় গেল 'কচ ও দেবযানী' আর কোথায় গেল তাঁর প্রথম যৌবনের সেই রঙিন স্মৃতি!

এ সব এনেছ কি জন্যে শুনি? বাসন্তীর কণ্ঠস্বর এবার তীক্ষ্ণ হয়ে

উঠল। মহাদেববাবু থতমত খেয়ে বললেন, মানে—আমি আনি নি, ব্রজেন কিনে দিয়েছে তার বাড়িতে পৌঁছে দেবার জন্যে।

তা না হয় হ'ল, কিন্তু বাজার কই? কি খেতে দেব আমি ছেলে-মেয়েদের? মহাদেববাবু বার কতক মাথা চুলকে বললেন, বাজার করব কি দিয়ে? মাছের বাজারে ঢুকে মাছ কিনে পকেটে হাত দিয়ে দেখি সব সাফ, পকেট মেরে দিয়েছে।

চোখ বড় বড় ক'রে বাসন্তী ব'লে উঠল, কত ছিল তোমার পকেটে?

মহাদেববাবু বললেন, বেশি নয়, এই সাড়ে তিন টাকা—ঠিক বাজার করার মত টাকা। তাই তো কিছুই আনতে পারলাম না।

গুম হয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে তার পর বাসন্তী বললে, এক পোয়া কাঁচা মুগের ডাল শিগগির এনে দাও দোকান থেকে, ছেলে-মেয়েগুলোকে কি দিয়ে এখুনি ভাত দেব?

এই যাচ্ছি।—ব'লে তাড়াতাড়ি যেন বাড়ির বাইরে এসে বাঁচলেন মহাদেববাবু। পিছন থেকে বাসন্তী ব'লে উঠল, এই ফুলগুলো আবার ফেলে যাচ্ছ কার জন্যে, একেবারে দিয়ে এস না ব্রজেনবাবুর বাড়ি।

ও, হ্যাঁ হ্যাঁ, দাও, বড্ড ভুল হয়ে গিয়েছে। মনটা আজ বড় অন্যমনস্ক কিনা। বাসন্তী সঙ্গে সঙ্গে কণ্ঠে সহানুভূতি এনে বললে, তা হবে না, এই বাজারে সাড়ে তিনটে টাকা কি কম? বলে, সাত হাত মাটি খুঁড়লে একটা পয়সা পাওয়া যায় না।

মহাদেববাবু রাস্তা পেরিয়ে গিয়ে বড় নর্দমাটার মধ্যে সেই ফুলগুলো টুকরা টুকরা ক'রে ছিঁড়ে ফেলে দিলেন। তখন আর একবার 'কচ ও দেবযানী'র সেই লাইনটা তাঁর মনে প'ড়ে গেল—

"সুখস্মৃতি কিছু নাহি মনে!"

শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ

মহারাজা নন্দকুমার

ভূমিকা

এই বিশিষ্ট ব্রাহ্মণটির কথা আমরা প্রায় ভুলিয়া গিয়াছি। স্কুলে ছাত্রেরা পড়ে, হেস্টিংস অন্যায় করিয়া নন্দকুমারের ফাঁসি দেওয়াইয়াছিলেন। বাস্, নন্দকুমার সম্বন্ধে জ্ঞান এই পর্যন্ত। যে বিচারের পরিণাম নন্দকুমারের ফাঁসি সেই বিচার যে কতদূর ব্যভিচার এবং নিষ্ঠুরতায় কলঙ্কিত, তাহা আমাদের অনেকেরই ধারণা নাই। কয়েকটি ইংরেজ ঐতিহাসিক পক্ষে ও বিপক্ষে নন্দকুমার সম্বন্ধে পুস্তকাদি লিখিয়াছিলেন বলিয়া আমরা তাঁহার সম্বন্ধে অনেক তথ্য পাইয়াছি। এই প্রবন্ধে তাহারই একটু পরিচয় দিব। নন্দকুমারকে অনেক ইংরেজ লেখক মসীলিপ্ত করিয়া আমাদের বুঝাইতে চাহিয়াছেন, নন্দকুমারের মত এমন দুষ্ট, ধূর্ত, চক্রান্তকারী মানুষ সে সময় আর কেহ ছিল না। আজ এই সকল অযথা কালিমা ধৌত করিয়া নন্দকুমারের যথার্থ চরিত্রকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা প্রত্যেক বাঙালীরই কর্তব্য। যেমন সিরাজ-চরিত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তেমনই এ ক্ষেত্রেও তাহা কর্তব্য।

কলিকাতার দক্ষিণাঞ্চলে একটি নগণ্য রাস্তা 'মহারাজ নন্দকুমার রোড' নামে রাখা হইয়াছে। আমার মনে হয় নন্দকুমারের হত্যাকারীর নামে যে রাস্তা আছে—হেস্টিংস স্ট্রীট, সে নাম বদলাইয়া ওই রাস্তার নাম 'মহারাজ নন্দকুমার রোড' রাখা উচিত। ওই রাস্তার কিছু দক্ষিণে বর্তমান ফোর্টের উত্তরে কুলি স্ট্রীট নামক এক রাস্তা ছিল, তাহারই নিকটে কোন এক স্থানে নন্দকুমারের ফাঁসি হইয়াছিল। এজন্যও 'হেস্টিংস স্ট্রীট' নাম বদলাইয়া 'নন্দকুমার রোড' রাখার সার্থকতা আছে। 'ক্লাইভ স্ট্রীট' নাম বদলাইয়া যেমন 'নেতাজী সুভাষচন্দ্র রোড' রাখা শোভন হইয়াছে, তেমনই ওই নাম বদলাইয়া মহারাজ নন্দকুমার রোড রাখা আরও সমীচীন হইবে।

নন্দকুমারের পরিচয়

নন্দকুমারের আদি জন্মস্থান ছিল বীরভূম জিলার ভদ্রপুর গ্রামে। ইনি যে বংশে জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহারা রাঢ়ী শ্রেণীয় কুলীন ব্রাহ্মণ। স্থানাভাববশত ইঁহাদের পরিপূর্ণ বংশ-তালিকা দেওয়া সম্ভব হইল না। কেবলমাত্র নন্দকুমারের শাখার বংশ-তালিকা দেওয়া হইল। বেভারিজ সাহেবের পুস্তক হইতে ইহা উদ্ধৃত হইল।—
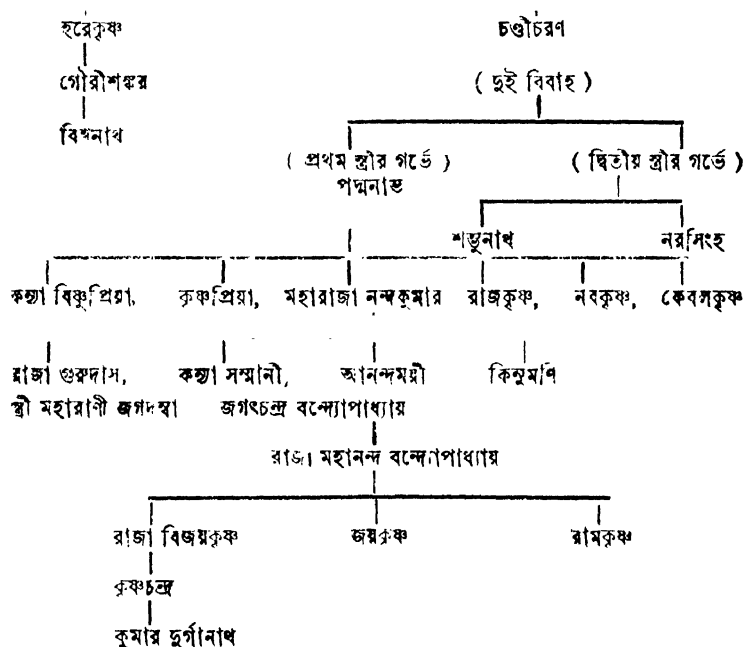
কথিত আছে, রামগোপাল রায়ের শ্বশুর মথুরানাথ মজুমদার মহাশয়ের "আচারভ্রষ্ট" বলিয়া একটু নিন্দা ছিল। এইজন্য

রামগোপাল রায়ের প্রপৌত্র নন্দকুমার ওই কলঙ্ক মোচনের অভিপ্রায়ে এক লক্ষ ব্রাহ্মণ-ভোজন করাইয়া ও-অঞ্চলে একটি যশ রাখিয়া গিয়াছেন। সকলেই নন্দকুমারকে ভাদুরা নন্দকুমার অথবা ভাদুপুরের নন্দকুমার বলিয়া জানিত।

কলিকাতায় বিডন স্কোয়ারে তাঁহার একটি বাড়ি ছিল, নিকটবর্তী একটি রাস্তার নাম নন্দকুমারের পুত্র রাজা গুরুদাসের নামে আজও রহিয়াছে।

নন্দকুমারের জন্ম-সন সঠিক জানা নাই। কোনও কোনও ঐতিহাসিক বলেন, অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে যে ১৭২২ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার জন্ম হয়। এই কথাটি বেভারিজ সাহেবের পুস্তকে আছে। কিন্তু তারিখটি বোধ হয় ভুল, কেননা যখন নন্দকুমারের ফাঁসি হয় (আগস্ট ১৭৭৫ খ্রীঃ অব্দে) তখন তিনি ৭০ বৎসরের বৃদ্ধ ছিলেন বলিয়া অনেকে বর্ণনা করিয়াছেন, জন্ম-তারিখ ১৭২২ হইলে মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স ছিল ৫৩ বৎসর মাত্র।

নন্দকুমারের বিদ্যাশিক্ষা কত দূর হইয়াছিল জানা যায় না, তবে তিনি সংস্কৃত ও ফার্সি ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, বিচক্ষণতা ও কর্মকুশলতা তৎকালীন সমাজে সুখ্যাতি অর্জন করিয়াছিল। নবাব সিরাজদ্দৌলার অধীনে প্রথমে তিনি হুগলীর শাসনকর্তা নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ১৭৬২ খৃঃ অব্দ পর্যন্ত এই দায়িত্বশীল পদে অধিষ্ঠিত থাকার পর মীরজাফরের দেওয়ান পদে নিযুক্ত হন। দিল্লীর মোগল-বাদশাহ সাহ আলাম নন্দকুমারের বিচক্ষণতায় ও কর্মকুশলতায় সন্তুষ্ট হইয়া ১৭৬৪ খ্রীঃ অব্দে তাঁহাকে "মহারাজা" উপাধি দ্বারা ভূষিত করিয়াছিলেন। Dr. Busteed-এর *Echoes from Old Calcutta* পুস্তকে নন্দকুমার সম্বন্ধে এই কথাগুলি আছে—

Though his life had not been free from some adverse vicissitudes, his talents and experience gained

him wealth and his services to the government of Murshidabad and to that of the company at Calcutta raised him to the position of a very influential and conspicuous personage in Bengal. In appearance he has been described as tall and majestic in person, robust, yet graceful. He was 70 when he was hanged.

ইহার মর্মকথা এই যে, নন্দকুমারের বৈষয়িক জীবন একেবারেই অবস্থা-বিপর্যয়শূন্য ছিল না। তাঁহার গুণাবলী এবং বহুদর্শিতা তাঁহাকে ধন উপার্জনে সাহায্য করিয়াছিল। মুর্শিদাবাদ সরকার এবং কলিকাতাস্থ কোম্পানির গবর্মেণ্টের অনেক উপকার তিনি করিয়াছিলেন, তাহার জন্য বাংলা দেশে তিনি বিশেষ প্রতিপত্তিশালী এবং উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি হিসাবে গণ্য হইয়াছিলেন। তাঁহার দেহ দীর্ঘ এবং চেহারা মর্যাদাপূর্ণ ছিল। তিনি ঈষৎ স্থূলকায় হইলেও তাঁহার আকৃতি সুশ্রী সুন্দর এবং লালিত্যপূর্ণ ছিল। মৃত্যুসময় তাঁহার বয়স ছিল সত্তর।

আর একখানি পুস্তকের (Rulers of India series-এর *Warren Hastings* by Captain L. J Trottor) ৬৪ পৃষ্ঠায় এই বর্ণনা আছে—

Though his (Nanda Kumar's) character was bad, his influence with his own countrymen and his power to help or harm the company's interest were supposed to be very great.

অর্থাৎ নন্দকুমারের চরিত্র খারাপ হইলেও নিজের দেশবাসীর নিকট তাঁহার প্রতিপত্তি ছিল প্রচুর এবং কোম্পানিকে সাহায্য করা কিংবা অনিষ্ট করার ক্ষমতা ছিল অত্যধিক। নন্দকুমারের এই তথা-কথিত অসচ্চরিত্রতার কোন প্রমাণ ঐতিহাসিকগণ উপস্থিত করেন নাই।

কোম্পানির কর্মচারীদের অসততা

দেশের এই সময়টি ছিল অরাজকতার সময়। মোগল-সাম্রাজ্য ধ্বংসোন্মুখ, সম্রাটের শক্তি ও প্রতিপত্তি ক্ষীয়মাণ; মুর্শিদাবাদে সরকার পলাশীর যুদ্ধের পর কোম্পানির কৃপার উপর নির্ভর করিয়া চলিতেছিল, বাংলা দেশে যথার্থই "বণিকের মানদণ্ড দেখা দিল পোহালে শর্বরী রাজদণ্ডরূপে"। এই রাজদণ্ড যাঁহারা চালনা করিতেন, তাঁহাদের অত্যাচার অনাচারের কাহিনী অনেক ঐতিহাসিক বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। সে সময় দেশীয় ধনীদের ধনরত্নাদি অধিকতর কৌশলী ও শক্তিশালী ইংরেজ বণিক এবং কোম্পানির অসৎ কর্মচারীদের হস্তগত হইতে লাগিল। ইহার কিছু পরিচয় পাওয়া যায় উপরোক্ত ট্রটারের পুস্তকে।

মিরকাসিম যখন নবাবি পাইলেন, তখন তাঁহার রাজকোষ লুণ্ঠিত হইতে লাগিল। তখন ভ্যান্‌সিটার্ট ছিলেন গভর্নর। তিনি পাইলেন বা লইলেন ৫০০০০ পাউণ্ড অর্থাৎ কমপক্ষে ৫।৬ লক্ষ টাকা। তাঁহার দুইজন সদস্য প্রত্যেকে পাইলেন ২৫০০০ পাউণ্ড। কর্নেল Cailland পাইলেন ২০০০০ পাউণ্ড আর দুইটি ইংরেজ ভদ্রলোক পাইলেন প্রত্যেকে ১৩০০০ পাউণ্ড করিয়া। ট্রটার মন্তব্য করেন যে, "And these are the men who had just been denouncing the folly which led Mirjafar to waste so much money on worthless or greedy favourites (page 22)। অর্থাৎ যাঁহারা এই টাকা পাইয়াছিলেন তাঁহারাই মীরজাফরকে অপব্যয়ী এবং লোভী অনুগৃহীত ব্যক্তিদের অর্থদান করিবার জন্য অপরাধী করিতেছিলেন। এই প্রকারে কত শ্বেতাঙ্গ দস্যু কতভাবে কত লোকের সর্বনাশ করিয়া অর্থ উপার্জন করিয়াছিলেন তাহার ইয়ত্তা নাই। বিলাতে ফিরিয়া গিয়া ইঁহারা নবাবি চালে থাকিতেন এবং ইঁহাদিগকে ইংলণ্ডের অধিবাসীরা 'ইণ্ডিয়ান নবাব্‌স্' বলিয়া বিদ্রূপ করিতেন।

হেস্টিংসও আড়াই বৎসর গভর্নরের কার্য করার মধ্যে ৪০ লক্ষ টাকা

অবৈধ উপায়ে অর্জন করিয়াছিলেন। এই কথ তাঁহার সদস্য-মন্ত্রীরা বিশ্বাস করিতেন (See p. 113, Trottor's *Hastings*) এই বিষয়ে এই মন্ত্রীগণের উক্তি উপভোগ্য—"There was no species of speculation from which the Hon'ble Governor General has thought it reasonable to abstain"—অর্থাৎ অর্থ উপার্জনের এমন কোন অবৈধ উপায় ছিল না যাহা হইতে গবর্নর জেনারেল নিবৃত্ত থাকা বিবেচনাসঙ্গত মনে করিতেন।

নন্দকুমারের নামে উৎকোচ গ্রহণ কি উৎকোচ প্রদানের কোন অপবাদ কোন ঐতিহাসিকই করেন নাই। এক সময়ে হেস্টিংস নন্দকুমারের বন্ধু ছিলেন। নন্দকুমার হেস্টিংসের বাটীতে যাওয়া-আসা করিতেন এবং সমাদরের সহিত অভ্যর্থিত হইতেন। ১৭৭২ খ্রীঃ হেস্টিংস ইংলণ্ডে যে রিপোর্ট দিয়াছিলেন তাহাতে নন্দকুমারের বিশ্বস্ততার প্রশংসা ছিল। বেভারিজ তাঁহার পুস্তকের ৩১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন :—

"It may be remembered that Hastings in his minute of July 1772 singled out the quality of fidelity as a characteristic of Nanda Kumar.

Hastings remarks on this occasion are a curious instance of candour struggling with officialism. If we may be allowed, he says, to speak favourately of any measures which opposed the views of our own Govt. and aimed at the support of an adverse interest, surely Nanda Kumar's conduct was not only not culpable but even praiseworthy."

এই উক্তির ৩০ বৎসর পরে অর্থাৎ ৫ই আগস্ট ১৭৭৫ খ্রীঃ অব্দে নন্দকুমারের ফাঁসি হয়। এই তিন বৎসরে কি ঘটিয়াছিল এখন তাহার পরিচয় দিবার চেষ্টা করিব।

হেস্টিংস নন্দকুমারের একমাত্র পুত্র রাজা গুরুদাসকে মীরজাফরের নাবালক পুত্রের অভিভাবক এবং মুর্শিদাবাদের নবাব-পরিবারের দেওয়ান নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এই নিয়োগে কোন কূটনৈতিক চাল ছিল কি না জানা যায় না। তবে এই ঘটনাটি নন্দকুমারের সততার পুরস্কারস্বরূপ গ্রহণ করা অন্যায় হইবে না।

এই সময়ে হেস্টিংস নানা উপায়ে বিশিষ্ট ধনী ব্যক্তিদের কায়দায় ফেলিয়া উৎকোচ গ্রহণ করিতেছিলেন, নন্দকুমার তাহা জানিতে পারিয়াছিলেন। এবং নন্দকুমার যে এই কুকীর্তির কথা জানেন তাহা হেস্টিংস বুঝিতে পারিয়া নন্দকুমারকে বেশ ভয় করিয়া চলিতেন। ঘটনা তখন এমন হইল যে, হেস্টিংস নন্দকুমারকে নিজের কুঠিতে যাতায়াত করা বন্ধ করিয়া দিলেন। হেস্টিংস তখন বলিতেন, নন্দকুমার তাঁহার ব্যক্তিগত শত্রু। (Beveridge's *Trial of Nanda Kumar*, pp. 101, 102, 103 দ্রষ্টব্য)। ব্যক্তিগত শত্রু (personal enemy) কথাটি তাৎপর্যমূলক।

মনে হয় এই সময় নন্দকুমার হেস্টিংসকে এই কুক্রিয়া হইতে নিরস্ত থাকিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। হেস্টিংস ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে তাঁহার কুঠিতে আসিতে নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন।

ঠিক এই সময় ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ডিরেক্টরগণ হেস্টিংসের মন্ত্রীসভায় নূতন সদস্য নির্বাচন করিয়া ভারতবর্ষে পাঠাইলেন। ইঁহাদের নাম General Clavering, Colonel Monson, Philip Francis —বিলাতে লর্ড নর্থের মন্ত্রীসভা ইঁহাদিগকে নিযুক্ত করেন। আর একজন সদস্য Richard Barwell পূর্ব হইতেই হেস্টিংসের মন্ত্রীসভার সদস্য ছিলেন। এই মন্ত্রীসভা গঠিত হওয়ায় হেস্টিংসের যথেচ্ছাচারিতা প্রশমিত হইবে বলিয়া বিলেতের রাষ্ট্রনীতিজ্ঞদের ধারণা ছিল।

নন্দকুমার ও হেষ্টিংসের দ্বন্দ্ব

যাহা হউক, নন্দকুমার যখন ব্যক্তিগতভাবে সৎ-পরামর্শ দিয়া হেস্টিংসকে সুপথে আনিতে পারিলেন না, তখন তিনি মন্ত্রীসভার

নিকট একটি অভিযোগ-পত্র দাখিল করিলেন। এই পত্রে হেস্টিংসের সমস্ত কুকর্মের fraud, corruption and oppression—জুয়াচুরি অসততা এবং অত্যাচারের বর্ণনা ছিল এবং নন্দকুমার জানাইয়াছিলেন যে, তিনি ঐ অভিযোগের প্রমাণ উপস্থিত করিতে প্রস্তুত আছেন। Philip Francis এই অভিযোগ-পত্র সকলকে শুনাইলেন। ক্রুদ্ধ হইয়া হেস্টিংস সদস্যকক্ষ-ত্যাগ করিয়া যান। Barwell তখন ব্যাপারটি সুপ্রিম কোর্টে দিবার প্রস্তাব করেন। বাকি তিনজন সদস্য সেই প্রস্তাব বাতিল করিয়া দেন, ফলে Barwellও সভাকক্ষ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান।

এই বর্ণনা ট্রটারের বইয়ের ১১১ পৃষ্ঠাতে লিপিবদ্ধ আছে। এই ঘটনা উপলক্ষ্য করিয়া প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক James Mill বলিয়াছেন—"Hastings' eagerness to stifle and his exertion to abstract inquiry, on all occasions where his conduct came under complaint, constituted in itself an article of proof, which added materially to the weight of whatever came against him from any other source—ভাবার্থ—হেস্টিংস যে তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগের অনুসন্ধানকার্যে বাধা সৃষ্টি করিতে ব্যগ্রতা দেখাইয়াছিলেন তাহাই তাঁহার বিরুদ্ধে প্রমাণস্বরূপ হইয়া উঠিল। যে কোন ব্যক্তি তাঁহার নামে নালিশ করিত তাহার গুরুত্ব বৃদ্ধি পাইত।

নন্দকুমার মন্ত্রীসভার নিকট অভিযোগ-পত্র দাখিল করেন ১১ই মার্চ ১৭৭৫ খ্রীঃ অব্দে। এই তারিখটি স্মরণীয়। মন্ত্রীসভা Clavering-এর সভাপতিত্বে নন্দকুমারকে উপস্থিত থাকিতে আদেশ দিলেন। নন্দকুমার উপস্থিত হইয়া প্রমাণাদি দাখিল করিলেন। মন্ত্রীসভা প্রমাণ পাইলেন যে হেস্টিংস মীরজাফরের স্ত্রী মুনি বেগমের নিকট হইতে ৩৫০০০ পাউণ্ড মূল্যের উপহার গ্রহণ করিয়াছেন, এবং হেস্টিংসকে অবিলম্বে ঐ টাকা কোম্পানির ট্রেজারিতে অর্থাৎ

কোষাগারে জমা দিবার জন্য আদেশ দিলেন। হেস্টিংস এই আদেশ অমান্য করিলেন।

মন্ত্রীসভার সঙ্গে এই তর্ক-বিতর্ক চলিতে লাগিল। এমন সময় অকস্মাৎ বিনামেঘে বজ্রপাতের মত কলিকাতাবাসী শুনিয়া স্তম্ভিত হইল যে, নন্দকুমার জাল করার অপরাধে ধৃত হইয়া কারাগারে আবদ্ধ হইয়াছেন। এই ঘটনার তারিখ ৬ই মে ১৭৭৫ অর্থাৎ মন্ত্রীসভার নিকট নন্দকুমারের অভিযোগপত্র দাখিল করিবার দুই মাসের মধ্যে।

হেস্টিংস যখন দেখিলেন যে, নন্দকুমার জীবিত থাকিলে তাঁহার মানসম্মান-গৌরব রক্ষা করা সম্ভব নহে এবং চরিত্রও সর্বপ্রকারে কলঙ্কিত ও ঘৃণিত হইবার বিশেষ আশঙ্কা আছে তখন তাঁহাকে ধরাধাম হইতে অপসারণ করিবার চেষ্টা চলিল। কোন কোন ঐতিহাসিক লিখিয়াছেন যে, হেস্টিংস সন্দেহ করিয়াছিলেন যে নন্দকুমার ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির শত্রু। দিল্লীর বাদশাহ এবং দক্ষিণ ভারতে ফরাসী কর্তৃপক্ষের সঙ্গে নন্দকুমার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছেন। কিন্তু ইহার প্রমাণ কোনদিন উপস্থিত করা হয় নাই এবং নন্দকুমারের বিরুদ্ধে এমন কোন ষড়যন্ত্রের মকদ্দমাও হয় নাই।

যাহা হউক, এইখানে মেকলের একটি উক্তি উদ্ধৃত করা প্রয়োজন বোধ করিতেছি। মেকলে হেস্টিংসের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের প্রসঙ্গে এই উক্তি করিয়া থাকিলেও নন্দকুমারের সর্বনাশের জন্য হেস্টিংসের ব্যগ্রতা সম্পর্কে এই উক্তি প্রযোজ্য।—

An Indian Government has only let it be understood that it wishes a particular man to be ruined; and in twentyfour hours it will be furnished with grave charges supported by depositions so full and circumstantial that any person unaccustomed to Asiatic mendacity would regard them as decisive. (See page 440, Macaulay's *Essays on Hastings*, Vol. III, Longman's Edition)

ইহার ভাবার্থ এই :—তৎকালীন ভারত সরকার যদি একবার বুঝিতে পারেন যে কোন ব্যক্তিবিশেষের সর্বনাশ করিতে হইবে তাহা হইলে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই তাহার বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ উপস্থিত করা হইবে এবং ঐ অভিযোগের সমর্থনে এমন সাক্ষ্য-প্রমাণ উপস্থিত করা হইবে "এশিয়ার মিথ্যাভাষণ" সম্বন্ধে যাঁহাদের জ্ঞান নাই তাঁহারা মনে করিবেন এই সাক্ষ্য-প্রমাণ চূড়ান্ত।

"Asian Mendacity"! 'এশিয়াবাসীর অসত্যপ্রিয়তা' কথাটি বলিয়া যে খোঁচাটি দিলেন, মেকলের পক্ষে ইহা নূতন নহে। কলমের জোরে, ভাষার তোড়ে তিনি সমগ্র বাঙালী জাতিকে অনর্থক মসীলিপ্ত করিয়াছিলেন এবং পরবর্তী কালে এই জন্য নিন্দনীয়ও হইয়াছিলেন। যাহা হউক, মেকলের এই উক্তিটি পূর্ণভাবে নন্দকুমারের বিচার-প্রহসনে প্রমাণিত হইয়াছে। নন্দকুমারকে সরানো দরকার, সুতরাং মিথ্যা অভিযোগ এবং তাহার সমর্থনে মিথ্যা সাক্ষ্য-প্রমাণও সংগৃহীত হইল। নন্দকুমারের ফাঁসি হইল। ইহার প্রামাণিক বর্ণনা পরে লিখিত হইতেছে।

নন্দকুমার অভিযুক্ত

নন্দকুমারের উপর অভিযোগ এই ছিল যে, তিনি একটি জাল কর্জপত্র প্রস্তুত করিয়া বোলাকীদাস নামক একটি ধনী মহাজনের উত্তরাধিকারীদের নিকট হইতে প্রতারণা করিয়া সত্তর হাজার টাকা লইয়াছেন। এই কর্জপত্রের যথার্থ ইতিহাস এই—

বোলাকীদাস মুর্শিদাবাদে মহাজনী ব্যবসায় করিতেন এবং ঢাকাতেও তাঁহার গদি ছিল। নবাব সরকার, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি এবং অন্যান্য ধনীদিগের নিকট টাকা কর্জ দিতেন এবং তাহাদের টাকা গচ্ছিত রাখিতেন।

নন্দকুমারের সঙ্গে বোলাকীর অত্যন্ত হৃদ্যতা ছিল। একবার নন্দকুমার কতকগুলি মূল্যবান অলঙ্কার বিক্রয় করিবার জন্য বোলাকীর কাছে গচ্ছিত রাখেন। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে মীরকাসিমের সঙ্গে কোম্পানির যুদ্ধ আরম্ভ হইল। মুর্শিদাবাদ আক্রান্ত হইলে বোলাকীর গদিও লুণ্ঠিত হয় এবং মীরকাসিমের সঙ্গে বোলাকী পলাইয়া প্রথমে বাড়. তারপর বক্সারে চলিয়া যান। যুদ্ধ থামিবার বহুকাল পরে বোলাকী কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। নন্দকুমারের গচ্ছিত অলঙ্কারের মূল্য দিবার অর্থ বোলাকীর ছিল না, সেইজন্য নন্দকুমারের নামে একটি কর্জপত্র লিখিয়া অঙ্গীকার করেন যে ঢাকা গদি হইতে যে দুই লক্ষাধিক টাকা কোম্পানিকে ধার দেওয়া হইয়াছিল তাহা উসুল হইবামাত্র নন্দকুমারের প্রাপ্য দেনা পরিশোধ করিব। এই দলিলে বোলাকীর সহি ছিল ও সীল-মোহরও অঙ্কিত ছিল। কলিকাতা বসিয়া বোলাকী ১৭৬৭ খ্রীষ্টাব্দে ২০এ আগস্ট এই দলিল সম্পাদন করেন।

১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে বোলাকীর মৃত্যু হয়। তাঁহার উইলের এক্‌সিকিউটারগণ কয়েক মাসের মধ্যেই বোলাকীর ঋণ পরিশোধ করেন। নন্দকুমার টাকা পাইয়া পৃথক রসিদ দিয়া প্রাপ্তি স্বীকার করেন এবং আসল কর্জপত্রটি প্রচলিত প্রথা অনুসারে উপরের দিক হইতে কিছু অংশ ছিঁড়িয়া তাঁহাদের হস্তে অর্পণ করেন। দলিলটি এই ছিন্ন অবস্থায় অন্যান্য কাগজের সঙ্গে Probate Courtএ দাখিল হয় এবং Mayor's Court-এর দপ্তরখানায় রক্ষিত হয়। এই দেনা পরিশোধের সময় বোলাকীদাসের আত্মীয়বর্গ এবং কর্মচারীগণ কিছুমাত্র ওজর-আপত্তি বা দ্বিধা করেন নাই। ন্যায্য প্রাপ্য টাকাই নন্দকুমারকে দেওয়া হইতেছে, এই বিষয়ে কাহারও সন্দেহ ছিল না। মনে হয় বোলাকীদাসের আত্মীয়বর্গ কর্মচারীগণ জানিতেন যে, এই কর্জপত্র বোলাকী স্বেচ্ছায় সম্পাদন করিয়াছিলেন এবং কর্জপত্রটি অকৃত্রিম। আজকালকার দিনে এই দেনা-পাওনা লইয়া আর কোনো প্রশ্নই উঠিতে পারে না, কিন্তু এক অদৃশ্য শক্তি Mayor's Court হইতে ওই দলিল

সংগ্রহ করিল এবং বোলাকীর মৃত্যুর ছয় বৎসর পরে জালের অপরাধে নন্দকুমারকে অভিযুক্ত করা হইল। অভিযোগকারীর নাম ছিল মোহনপ্রসাদ অ্যাটর্নি। ইনি বোধ হয় বোলাকীদাসের আমমোক্তার ছিলেন। মোহনপ্রসাদ প্রকাশ্যে এই মকদ্দমার অভিযোগকারী হইলেও কাহারও সন্দেহ ছিল না, কেন এবং কাহার ইঙ্গিতে এই অভিযোগ আনা হইল। অন্তরালে থাকিয়া কে এই অভিযোগ উপস্থিত করেন এবং মকদ্দমা চালান, সে সম্বন্ধে মেকলের উক্তি উল্লেখযোগ্য—

The ostensible prosecutor was a native. But it was then, and still is, the opinion of everybody, idiots and biographers expected that Hastings was the real mover in the business (Macaulay's *Essays on Warren Hastings*, p. 446.)

ইহার ভাবার্থ এই, যদিও প্রকাশ্যে একজন 'নেটিভ' অভিযোগকারী ছিলেন কিন্তু নিরেট মূর্খ এবং জীবনচরিত লেখকগণ ব্যতীত তখন এবং এখনও আর সকলের মত ও বিশ্বাস ছিল যে, হেষ্টিংসই এই ব্যাপারের আসল পরিচালক ছিলেন।

এখন নন্দকুমারের বিচারের প্রহসন সম্বন্ধে লিখিব। এই বিষয়ে আমি প্রধানত বেভারিজ সাহেবের *Trial of Nanda Kumar* পুস্তকখানির অনুসরণ করিব। ইতিহাস-লেখকদের মধ্যে বেভারিজ সাহেবকে একটি সম্মানের স্থান দেওয়া উচিত। এমন নিষ্ঠার সহিত না লিখিলে ইতিহাস মানুষের মনোযোগ ও কৌতূহল আকর্ষণ করিতে পারে না। নিজের অন্তরে একটা গভীর সহানুভূতি এবং ন্যায়বোধ না থাকিলে এমন সুন্দর লেখা সম্ভব হয় না। প্রথমেই উল্লেখযোগ্য পুস্তকখানির উৎসর্গ-পত্রটি। তাহা এরূপ—

I DEDICATE THIS BOOK

TO

MY WIFE

WHO HAS TAKEN SO MUCH INTEREST IN THE ATTEMPT TO VINDICATE THE REPUTATION OF A PERSECUTED BENGALEE.

অর্থ এই, যিনি একটি নির্যাতিত বাঙালীর সুখ্যাতিরক্ষা এবং অপরাধ-স্খালনের চেষ্টায় বিশেষ মনোযোগী ও উৎসাহী ছিলেন, আমার সেই সহধর্মিণীকে এই পুস্তকখানি উৎসর্গ করিলাম।

হেস্টিংস-নন্দকুমারের ঘটনা লইয়া যে বাদপ্রতিবাদ তর্কবিতর্ক এক সময় ভারতবর্ষে ও ইংলণ্ডে চলিতেছিল তাহার উত্তাপ শীতল হইবার অনেক পরে এই পুস্তকখানি রচিত হয়। বেভারিজ সাহেব এই পুস্তক-রচনায় হাইকোর্টে রক্ষিত নন্দকুমারের বিচারের নথিপত্রের উপর বেশি নির্ভর করিয়াছিলেন। পক্ষে ও বিপক্ষে যে সকল সাক্ষ্য প্রমাণ উপস্থিত হইয়াছিল তাহার অতি সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ এই পুস্তকখানিতে আছে। পড়িলে মনে হয়, কোন প্রথম শ্রেণীর ব্যবহারজীবী অথবা বিচারকের উক্তি পড়িতেছি। তাঁহার উক্তি হৃদয়গ্রাহী, যুক্তি অকাট্য। বেভারিজ সাহেব ভূমিকায় লিখিয়াছেন যে, সাধারণ লোকেদের নিকট হয়তো তাঁহার পুস্তকখানির সর্বাংশ সুখপাঠ্য না হইতে পারে, তথাপি তিনি আইনজ্ঞ এবং ইতিহাস-পাঠে অনুরক্ত ব্যক্তিদের বিচারবুদ্ধির উপর নির্ভর করিয়াই লিখিয়াছেন।

এই পুস্তক লিখিবার পূর্বে বেভারিজ সাহেব সার্ জে. স্টিফেনের লিখিত বইখানি পড়িয়া হতাশ হইয়াছিলেন। তিনি বিনয় ও সম্ভ্রমের সহিত বলিয়াছেন যে, স্টিফেন সাহেব অনেক ভুল করিয়াছেন। হাইকোর্টের নথিপত্র ভাল করিয়া দেখেন নাই এবং তাড়াতাড়ি করিয়া লিখিয়াছিলেন বলিয়া বহু ভ্রমপ্রমাদ ও যুক্তির ত্রুটি রহিয়া গিয়াছে। সকলেই অনুমান করেন যে, স্টিফেন সাহেবের পুস্তকখানি 'ফরমাইশে' লেখা। হেস্টিংসকে সমর্থন করা, ইম্পেকে নিষ্কলঙ্ক করা তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। বইখানি পড়িলে কিন্তু বুঝা যাইবে যে স্টিফেন সাহেব ইঁহাদের যে 'ধৌতভুলসীপত্র'টি বলিয়া প্রমাণ করিতে চাহিয়াছিলেন তাহাতে কৃতকার্য হন নাই।

এই প্রবন্ধের দ্বিতীয় খণ্ডে নন্দকুমারের বিচারের অভিনয় লইয়া অনেক তথ্য লিখিত হইবে। তৃতীয় খণ্ডে নন্দকুমারের জীবনের অন্তিম সময় ও ফাঁসির বর্ণনা থাকিবে, যাহা পড়িলে পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন—এই শ্রেষ্ঠ বাঙালী মরিয়া প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন যে, বাঙালী বীরের মত নির্ভয়ে মরিতে জানে।

[ক্রমশ]

শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন

সমাধি

আমার নিঃসহ জীবন আমার অভিশাপ। এত বড় বাড়িতে থাকি শুধু আমি আর আমার অনুগত ভৃত্য রামরতন। মাঝরাতে যখন কর্মক্লান্ত চোখ দুটো টাটিয়ে ওঠে, টেবিলে অসমাপ্ত লেখা আর পেনটা ফেলে রেখে উঠে পড়ি। ঘুরে মরি বাড়ির আনাচে-কানাচে, ঘরে-বাইরে প্রেতমূর্তির মত। বাড়িটার বড় বড় ফাঁকা ঘরগুলো যেন প্রকাণ্ড হাঁ মেলে তখন আমাকে গ্রাস করার জন্যে উন্মুখ হয়ে পড়ে; ভীতিবিহ্বল মন নিয়ে ঘরে ফিরে এসে টেবিল-ল্যাম্পটা নিবিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়ি।

ভোর হয়, আর তার সঙ্গে শুরু হয় আমার নিত্যনৈমিত্তিক একঘেয়ে জীবন। যতক্ষণ সাহিত্য-সৃষ্টি করি, নিজেকে সম্পূর্ণরূপে ভুলে থাকি কিন্তু সাহিত্যিক মন বিদায় নিলে শুরু হয় অসহ্যতা। সুতরাং এ একক জীবন থেকে আমাকে মুক্ত হতে হবে, তা নইলে অদূরভবিষ্যতে নিজের মানসিক বিকারের সম্ভাবনা প্রচুর। তাই ভাবি, কেমন ক'রে বাড়িটাকে আবার জমকালো ক'রে সাজিয়ে তোলা যায়!

অবশেষে অনেক ভেবে চিন্তে স্থির করলাম, অনায়াসে নীচের তলাটা ভাড়া দেওয়া চলতে পারে, এবং এর দ্বারা বাড়ির নিস্তব্ধতা যেমন কমবে আমার কিছু উপরি আয়ও হবে। সুতরাং বিলম্বে আর প্রয়োজন কি!

বাড়ির দরজায় বেশিদিন আমাকে 'টু লেট' ঝুলিয়ে রাখতে হ'ল না, দু-তিন দিনের মধ্যেই বিজয়ভূষণ হালদার নামক এক বিপত্নীক তিনটি ছেলেমেয়ে নিয়ে আমার ন্যায্য দাবি মেনে এবং চুকিয়ে দিয়ে আমার নিকটতম প্রতিবেশী হবার সৌভাগ্য অর্জন করলেন।

আমি নির্বিরোধী মানুষ, সুতরাং বিজয়ভূষণের সঙ্গে সাক্ষাৎ বড় একটা হয় না। শুধু মাসের গোড়ায় এক মুখ হাসি নিয়ে তাঁর দোর-গোড়ায় এসে কুশল-সংবাদ জিজ্ঞাসা করি, প্রত্যুত্তরে কাষ্ঠহাস্যের দ্বারা আপ্যায়ন ক'রে আমার হাতে কয়েকটা নোট তুলে দেন, ক্ষুদ্র একটি নমস্কার ক'রে উঠে আসি।

আমার অকৃত্রিম অনুগত রামরতন চণ্ডীপাঠ থেকে জুতো-সেলাই পর্যন্ত সব কিছুই করে, তার ওপর আমার অভিভাবকত্ব অর্পণ ক'রে নিশ্চিন্ত মনে সাহিত্য-সাধনা করি। কিন্তু তাও মাঝে মাঝে একঘেয়ে মনে হয়, তখন অন্য কোনও কাজে মনোনিবেশ করার চেষ্টা করি। ঠিক এমনই এক একঘেয়েমিকে কাটিয়ে ওঠবার জন্যে গ্রামোফোন ও রেকর্ড নিয়ে এক সন্ধ্যায় বসলাম। তখন রেকর্ডে সুমধুর কণ্ঠে শুরু হয়েছে—

"কেন রে এই দুয়ারটুকু পার হতে সংশয়।
জয় অজানার জয়॥
এ দিকে তোর ভরসা যত ওই দিকে তোর ভয়।
জয় অজানার জয়॥"

শুনছিলাম স্তব্ধ হয়ে। যখনই জীবনে বিতৃষ্ণা জাগে, গ্রামোফোন রেকর্ডটা চালিয়ে দিই, গান শুরু হয়, আমি মুগ্ধ হয়ে শুনি—

"জানা-শোনার বাসা বেঁধে কাটল তো দিন হেসে কেঁদে
এই কোণেতেই আনাগোনা নয় কিছুতেই নয়।
জয় অজানার জয়॥"

যতই শুনি, গানটার আকর্ষণ যেন আমার কাছে বেড়েই চলে। মনে হয়, সম্পূর্ণ একটা নতুন গান শুনছি।

গানটা যেন আমার অতীতের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্নার স্মৃতিগুলোকে চোখের সামনে মেলে ধরে। আর মনের মধ্যে এক করুণ বিচ্ছেদের সুর বেজে ওঠে; দৃষ্টি প্রসারিত ক'রে দিই দূরে, যেখানে আকাশের গায়ে তারাগুলো তাকিয়ে থাকে; যেখানে পূর্ণিমার রাতে তারা কোন্ অজানা অন্ধকারে আত্মগোপন করে।

গানটা শুনি দুঃখভাবাক্রান্ত মন নিয়ে। ভাল লাগে দুঃখ পেতে, তাই দুঃখের ঘায়ে অযথা খোঁচা মেরে বাড়িয়ে তুলি। আর আমার দুঃখের অংশ গ্রহণ করে আমার 'অতি পুরাতন ভৃত্য' রামরতন। পারতপক্ষে ও-গানটা থেকে সে নিজেকে বঞ্চিত করতে চায় না।

অশিক্ষিত গ্রাম্য ছোকরা এসেছিল ভৃত্যের পদে বাহাল হয়ে আমাদের সংসারে। রামরতন আসার বেশ কয়েক বছর পরে আমার জন্ম হয়, মানুষ হয়েছি ওর কোলে পিঠে চ'ড়ে। আত্মীয়-স্বজনদের কাছ থেকে সম্পর্ক ছিন্ন ক'রে যে দিন রাস্তায় নেবে এলাম, দেখি আমার পাশে সজল চোখে রামরতন দাঁড়িয়ে। সবিস্ময়ে বললাম, তুই যে আমার সঙ্গে?

অনুনয়ে ভেঙে প'ড়ে রামরতন বললে, আমাকে তোমার সঙ্গে নিয়ে চল দাদাবাবু, আমি তোমাকে ছাড়ব না।—ব'লে উচ্ছ্বসিত হয়ে কাঁদতে লাগল।

হাত ধ'রে গভীর কণ্ঠে বললাম, চল্, আমার সঙ্গে।

রামরতন সেদিন থেকে আমার গৃহে প্রতিষ্ঠিত হ'ল।

ভাবছিলাম অতীতের কথা।

অকস্মাৎ দরজার দিকে চোখ পড়তে দেখি, বিভোর হয়ে রামরতন গানটা শুনছে আর চোখ দিয়ে জল ঝরছে। বড় সেন্টিমেণ্টাল্ ও। হয়তো সে সব দিনের কথা ওর মনে পড়ছে, সেই রঙিন—লাল নীল হলদে সবুজ প্রভৃতি নানাবর্ণের সমাবেশ আজ গেল কোথায়? যে দিকেই তাকাই না কেন, শুধু সাদা—আর সাদা! ঘরের দরজা-জানলার পর্দাগুলো সাদা, বিছানার চাদর-বালিশ তুষারশুভ্র, আলনায় পরিপাটি

ক'রে সাজানো কাপড়গুলো সাদা, ঘরের ক্রীম রঙের পেণ্ট করা দেওয়ালগুলো পর্য্যন্ত সাদা চুনকামের অন্তরালে আত্মগোপন করেছে; বৃদ্ধ রামরতনের চোখে ছানি পড়েছে, তাই সমগ্র বিশ্বটাকে সাদা ধোঁয়াটে দেখছে।

রেকর্ড তখন বেজে চলেছে।

গান যখন শেষ কয়েক লাইনের মধ্যে সীমাবদ্ধ, অকস্মাৎ উদ্‌ভ্রান্তের মত ছুটে কক্ষে প্রবেশ ক'রে আমার হাত জড়িয়ে ধ'রে ব্যাকুল কণ্ঠে বিজয়ভূষণ বললেন, আপনি এ গান বন্ধ করুন শৈবালবাবু। আপনার ছুটি পায় পড়ি, গান থামান।

অতর্কিত আক্রমণে ক্ষণকালের জন্য বিমূঢ় হয়ে পড়েছিলাম, কয়েক মুহূর্ত পরে নিজেকে সামলে নিয়ে বললাম, আপনার কথা ঠিক বুঝতে পারছি না।

বিজয়ভূষণের চোখ দিয়ে শ্রাবণধারার মত জল পড়তে লাগল, বললেন, আপনি গান বন্ধ না করলে আমি কিছুই আপনাকে বোঝাতে পারব না।

ইতিমধ্যে গান আপনিই শেষ হয়ে থেমে গিয়েছিল, রেকর্ড থেকে সাউণ্ড-বক্সটা তুলে গ্রামোফোন বন্ধ ক'রে বিজয়ভূষণকে বললাম, বলুন।

বিজয়ভূষণ কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে থেকে নিজের উচ্ছ্বাসকে সংযত করার চেষ্টা ক'রে একটু পরে ধীরে ধীরে বললেন, দেখুন শৈবালবাবু, এ গানটা শুনলেই আমার ছেলেমেয়েরা কাঁদতে শুরু ক'রে দেয়। শুধু যে ওরা কাঁদে তা নয়, আমার পক্ষেও চোখের জল ধ'রে রাখা শক্ত হয়। তবু আমি নিজেকে কতকটা সামলাতে পারি, কিন্তু ওরা যে নিতান্তই শিশু।

সবিস্ময়ে বললাম, আপনার কথাগুলো রহস্যময় ব'লে মনে হচ্ছে বিজয়বাবু, রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয়ই এমন সরল ভাষায় গানটা লেখেন নি যাতে আপনার ওই দুগ্ধপোষ্য শিশুর দল ওর অন্তর্নিহিত ভাবটা উপলব্ধি করতে পারে।

ম্লান হাসি হেসে বিজয়ভূষণ বললেন, গানটার অন্তর্নিহিত ভাব আমি উপলব্ধি করতে পারি ব'লে আমার চোখে জল আসে, কিন্তু আমার ছেলেমেয়েরা ওই রেকর্ডের মধ্যে তাদের মরা মায়ের কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়ে মনে করে যে, তাদের মা বোধ হয় কোথাও লুকিয়ে আছে, আর তাই দেখা পাবার জন্যে তারা অধীর হয়ে পড়ে।

বললাম, তার মানে?

বিজয়ভূষণ বললেন, ও-গানটা আমার স্ত্রী গাইতেন, খুব ভালবাসতেন—

ঈষৎ গম্ভীর কণ্ঠে বললাম, আমাকে কি করতে বলেন?

কাতর স্বরে বিজয়ভূষণ বললেন, আপনার কাছে আমার সবিনয় নিবেদন এই যে, যত দিন আমরা আপনার আশ্রয়ে আছি, অনুগ্রহ ক'রে এ গান আর বাজাবেন না।

হঠাৎ এর কোনও উত্তর দিতে পারলাম না, স্তব্ধ হয়ে রেকর্ডটা নিয়ে নাড়া-চাড়া করতে লাগলাম। বিজয়ভূষণও আমার কাছে তাঁর সবিনয় নিবেদনটি পেশ ক'রে আমার সহানুভূতি-সূচক মন্তব্য শোনার অপেক্ষায় বাইরের দিকে তাকিয়ে রইলেন। কক্ষের আবহাওয়া আমাদের মৌনতায় অকস্মাৎ গুমট ভাব ধারণ করল।

আমার মধ্যে তখন শুরু হয়েছে দুটি বিরুদ্ধ মনোভাবের দ্বন্দ্ব। এক-একবার বিজয়ভূষণের প্রতি সহানুভূতিতে মন দ্রবীভূত হয়ে পড়ছিল, পর-মুহূর্তে বিদ্রোহে উত্তপ্ত হতে লাগল। এ কি অন্যায়! ওদের অসুবিধের জন্য আমি এমন একটা গান থেকে নিজেকে বঞ্চিত করব! জীবনের সব সুখ থেকেই তো বঞ্চিত হয়েছি, শুধু একটা গান নিয়ে ভুলে থাকি, তা থেকেও নিবৃত্ত হতে হবে! মনে মনে প্রবলভাবে মাথা নাড়া দিয়ে বললাম, এ গানটার সঙ্গে আমার অতীতের বহু সুখ-দুঃখের স্মৃতি জড়িয়ে আছে—আজ নয়, বহু দিন থেকে। যখন রেকর্ড হয় নি, তখনও গানটা শুনতাম একটি নারী-কণ্ঠে। সে কণ্ঠস্বরের অধিকারিণীকে হারিয়েছি, কিন্তু এই রেকর্ডটার মধ্য দিয়ে আমি সেই কণ্ঠস্বর আজও যেন শুনতে পাই।

বিজয়ভূষণ আর কিছু বললেন না, হাত তুলে একটি নমস্কার ক'রে নীচে চ'লে গেলেন।

এ ঘটনার পরেও প্রায়ই গানটা শোনার বাসনা মনে জাগত কিন্তু সঙ্কোচ এসে আমাকে নিবৃত্ত করত। মনে হ'ত, বিজয়ভূষণের অনুরোধটা এত শীঘ্র অমান্য করি কি ক'রে! অবশেষে একদিন সন্ধ্যায় আমার কক্ষে সুললিত কণ্ঠে বেজে উঠল,—

"কেন রে এই দুয়ারটুকু পার হতে সংশয়—"

বেশ কয়েকদিন পরে রামরতনকে আবার ভাবে বিভোর হয়ে ও-রকম ভাবে দরজার পাশে নীরবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম।

শিল্পী তখন গেয়ে চলেছে,—

"জানা-শোনার বাসা বেঁধে কাটল তো দিন হেসে কেঁদে
এই কোণেতেই আনাগোনা নয় কিছুতেই নয়।
জয় অজানার জয়॥"

অকস্মাৎ আমার শ্রবণে ব্যাঘাত ঘটল, নীচ থেকে ভেসে এল একাধিক শিশুকণ্ঠের ক্রন্দন, আর তার সঙ্গে অস্বাভাবিক শব্দ। ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম, তখনও নীচে সেই শব্দ সমানে চলেছে। বিলম্ব করা উচিত নয়, সুতরাং আমি ও রামরতন দ্রুতগতিতে নীচে নেমে এলাম। ঘরের কাছে একটু আড়ালে এসে দেখি, বিজয়ভূষণের শিশু সন্তানেরা সমবেত কণ্ঠে ক্রন্দনে উচ্ছ্বসিত হয়ে কি বলছে, আর উন্মত্তের মত ছোটাছুটি ক'রে ঘরের দরজা-জানলাগুলো সজোরে বন্ধ করতে করতে বিজয়ভূষণ তাদের থামাবার ব্যর্থ চেষ্টা করছেন। বুক ঠেলে দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল। বিলম্ব না ক'রে ওপরে উঠে এসে দেখি, গান থেমে গিয়ে রেকর্ডটার শেষ একটা লাইন অনবরত ঘুরে চলেছে, আর সাউণ্ড-বক্সটা যেন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে মৃদু মৃদু উঠছে নাবছে।

রেকর্ডটা সযত্নে হাতে তুলে নিলাম; মনে হ'ল যেন তখনও রেকর্ড থেকে ভেসে আসছে—

"দু দিক দিয়ে ঘেরা ঘরে তাইতে যদি এতই ধরে,
চিরদিনের আবাসখানা সেই কি শূন্যময়।
জয় অজানার জয়॥"

আর তার সঙ্গে যেন শুনতে পেলাম বিজয়ভূষণের ছেলে-মেয়েদের আর্ত্ত ক্রন্দনধ্বনি।

অসহ্য লাগল। কোথায়—কোথায় এ রেকর্ডকে লুকিয়ে রাখা যায়, যেখান থেকে এর গান বিজয়ভূষণের ছেলেমেয়েদের কানে আর ভেসে আসবে না? কোথায় সে স্থান?

অকস্মাৎ নজর পড়ল ঘরের এক কোণে অবস্থিত সুবৃহৎ তোরঙ্গটার দিকে। চাবি নিয়ে ক্ষিপ্র হস্তে তোরঙ্গের ডালাটা খুলে ফেললাম। কাপড়ের পর কাপড়—লাল, নীল, হলদে, সবুজ—কত রঙের, কত ডিজাইনের; কোনটা তাঁতের, কোনটা জর্জেটের, কোনটা সিল্কের, কোনটা বেনারসী। উঃ, কত শাড়ি! টাল হয়ে আমার সামনে জ'মে উঠল। চোখ ঝাপসা হয়ে এল। হঠাৎ অস্বাভাবিক শব্দে পিছু ফিরে দেখি, ব্যগ্র দৃষ্টি মেলে আমার রামরতন সেদিকে তাকিয়ে আছে; আমার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই হাউহাউ ক'রে কেঁদে ফেললে।

অবশেষে রেকর্ডটাকে সমাহিত করলাম কাপড়ের স্তূপের তলায়। তোরঙ্গের ডালা বন্ধ ক'রে চাবি লাগিয়ে কান পেতে খুব ভাল ক'রে শুনলাম। আর কিছু শোনা যাচ্ছে না, গান থেমে গেছে।

শ্রীকমলকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

ড্রাগনের মৃত্যু

সারারাত সে পাহাড়ের খাদে জেগে রইল। ঠাণ্ডা হাওয়ায় যখন নরম ঘাসের মাথা নুয়ে পড়েছিল, ঘুমের ছোঁয়ায় যখন উপত্যকার বাতাস ভারী হয়ে উঠেছিল, তখনও সে তার মুখের দুই চোখে আগুন জেলে ব'সে ছিল।

তার ঘুম নেই, সে শান্তি জানে না। কি যেন সে খুঁজছে, যার নাম

সে জানে না—জানে না, আবার জানেও; কি সে জিনিস সে ঠিক বলতে পারবে না; কিন্তু তার তৃপ্তি নেই,—একটা অভাব, একটা অস্থির শূন্যতার অসহ উপস্থিতি অনুভব করছে সে সর্বদা। একটা কিছু আছে নিশ্চয়ই, যা তার চাই, আছে একটা কিছু।

কেন? কি? তা সে জানে না। নিজের দিকে তাকিয়ে থেকে সে কিছুই বুঝতে পারে না—কিছুতেই পারে না। তার কি কিছুর অভাব আছে, সে কি অপূর্ণ? না, না, তার সমস্ত শিরা স্ফীত হয়ে ওঠে, দেহ হয়ে ওঠে পেশীকঠিন, অগ্নিশ্বাসে পীড়িত হয় নাসারন্ধ্র; অভাব অপূর্ণতা তার মধ্যে? না, ক্রোধও অকারণ, এ ধারণাটাই হাস্যকর, এ প্রশ্নটা জেগেছে তাই অস্বাভাবিক।

তার নিজের মধ্যে, কোন অভাবের কারণ সে খুঁজে পেল না। পেশল সবল তার দেহ, সুস্থ আর সুগঠিত। খাদ্যের অভাব কাকে বলে সে জানে না, কখনও জানতে পারে নি। সঙ্গ? অন্যের সঙ্গ? যতটা চেয়েছে, ততটাই পেয়েছে, দেহেও তাই। কামনা অপূর্ণ থাকে নি তার কখনও। কিন্তু, কিন্তু তবু যেন কোথায় বাদ পড়েছে, কি যেন সে পরিষ্কার ক'রে চাইতে পারে না, নাম তার জানা নয়, কিন্তু বোঝে আজও তার সে জিনিস পাওয়া হয় নি।

নখ দিয়ে সে মাটি চিরে চলল। নিজের কাছেই সে নিজে স্পষ্ট হতে পারছে না আর তাইতে তার রাগ আরও বেড়ে যাচ্ছে। রাগটা যে কার ওপর, কিসের ওপর তাও সে জানে না, বোধ হয় সব কিছুর ওপর, বোধ হয় এই পৃথিবী যা আমাদের ধ'রে রেখেছে, কিন্তু ধরা দিচ্ছে না, বোধ হয় এই জীবন যা আমাদের কাছে এত সত্য অথচ যাকে আমরা বুঝতে পারছি না, বোধ হয়—না, সে ঠিক জানে না, কার ওপর সে রাগ করতে পারে! কি ক'রে জানবে? সে যে জানেই না, সে কি চায়, আর সেই জন্যেই ক্রোধের নির্দিষ্ট পাত্র নেই ব'লেই তার রাগ আরও স্ফীত হয়ে উঠছে।

'তুমি আমায় বলবে না' সে নিজের মনে মনে ব'লে চলে, যেন কোন

অদৃশ্য শত্রু তার বুকের ভিতরে লুকিয়ে আছে, 'তুমি আমায় বলবে না, কিন্তু আমি তোমাকে চিনে নেব। যেদিন তোমার মুখোমুখি দাঁড়াব, সেদিন তুমি বুঝবে আমার শক্তি। শক্তি—আমার শক্তি।' তার মনে মনে যেন স্বতই ধ্বনিত হতে থাকে ঐ কথাটা। 'আমার শক্তি'। সঙ্গে সঙ্গে তার দেহ কঠিন হয়ে ওঠে, রূঢ় হয়ে ওঠে সমস্ত অবয়ব। মাটিতে জোরে জোরে পা ঠোকে সে।

বাস্তবিক যদি জানা যেত, যদি জানা যেত সেই জিনিসটা কি! এ পৃথিবীতে কিসেরই বা অভাব আছে আমার! অভাব! (শব্দটা মনে আসার সঙ্গে সঙ্গে সে আবার সন্দিগ্ধ হয়ে ওঠে, মাটিতে পা ঠুকতে থাকে জোরে জোরে।) 'এ পৃথিবীটাই তো আমার।' কথাটা ব'লে অনুভব করার চেষ্টা করে সে, তাকায় চার পাশে, নখ দিয়ে দিয়ে মাটি চেরে। 'এই যে মাটি, এর সমস্ত ফসলই তো আমি নিয়েছি, নিতে পারি, এর তলায় যাই লুকোনো থাক্, সমস্তই আমার হয়েছে, নয়তো হতে পারে।'—এই কথা ভাবতে ভাবতে সে জোরে জোরে এগুতে লাগল। এমন সময় একটি শিশু এসে পড়ল তার সামনে—একটি সাধারণ গ্রাম্য শিশু, আপনমনে হাঁটতে হাঁটতে এসে পড়ল তার সামনে, তার পর কি ভেবে চ'লে যাবার চেষ্টা করল, লুকোতে চেষ্টা করল বোধ হয়।

'ও আমায় দেখে ভয় পেয়েছে। সবাই আমাকে ভয় পায়। কেউ আমার ওপরে নয়, আশ্চর্য, কেউ নয়।' এই কথা ভেবে সে একবার খুশি হবার চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না 'কেউ আমার চেয়ে বড় নয়।'—এই কথাও সে ভাবল, কিন্তু গোটা জিনিসটাই যেন কি রকম কি রকম মনে হ'ল। মনে হ'ল যেন অবান্তর বেয়াড়া একটা কথা, যা মনে করাটাই হাস্যকর, যার কোন দরকারই ছিল না। ছেলেটার দিকে এগিয়ে গেল সে। কত তুচ্ছ, এগিয়ে যেতে যেতে সে ভাবল, 'আমি যা বলব, ও তাই করতে বাধ্য।' ছেলেটাকে ধরলে সে। কিন্তু কি বলবে ভেবে পেল না। ছেলেটার ভীত কৌতূহলী

চোখের দিকে তাকিয়ে কি করবে সে ভেবে পেল না। 'ওকে আমি কি বলব?' একবার তার মনে হ'ল, 'ওর কাছে আমার কি পাবার আছে?' সে কিছু ভেবে পেল না। 'ও আছে, ও আমার চেয়ে ছোট, অনেক তুচ্ছ আমার তুলনায়, অথচ ওকে নিয়ে আমি কি করতে পারি, তা আমি জানি না।' নিজেকে কেমন যেন দীন ব'লে মনে হ'ল। একটা কোন সম্বন্ধ পাচ্ছে না তো, একটা কোন যোগসূত্র! ছেলেটা যেন অনেক দূরে থেকে যাচ্ছে, ও তাকে ধরতে পারছে না—কিছুতেই না। এই যে ছেলেটাকে সজোরে ধ'রে আছে, মনে হচ্ছে যেন এটা সত্য নয়, মনে হচ্ছে যেন ও ভিক্ষা করছে অনেক দূর থেকে—কি ভিক্ষা করছে তা জানে না। অসহ্য, হঠাৎ সব অসহ্য ঠেকল। চোয়ালের কাছটা কঠিন হয়ে চেপে ধরল ওর—ও আর পারল না, হত্যা করল ছেলেটাকে, ফালা ফালা ক'রে ছিঁড়ে দিল তার কঠিন নখে।

তারপর তাকিয়ে দেখল ও। 'আমার তুলনায় কিছুই না' বলল একবার, কিন্তু বলবার পূর্বেই ওর মন থেমে গেল। হঠাৎ মনে হ'ল, যেন কিছুই প্রমাণিত হ'ল না, কিছুই না, ছেলেটা প'ড়ে আছে আর ও আছে দাঁড়িয়ে, এ ছাড়া আর কি হয়েছে, ওর উত্তেজনা ছাড়া যা হয়েছে ভুল হয়েছে। এটা ও চেয়েছিল কি? না, ভুল হয়েছে, কোনখানে যেন ভুল হয়েছে, সে যা চেয়েছিল সে তা করে নি, ভুল করেছে সে। হয়তো ওই ছেলেটাই জানত সে কি চেয়েছিল, বোধ হয় জানত। হঠাৎ ওর বড় ক্লান্ত ব'লে মনে হ'ল, নিজেকে বড় দুর্বল ব'লে মনে হ'ল। কেমন যেন একটা অসহায় ভাব জাগল তার মনে; ছেলেটার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে তার মনে হ'ল, সে পরাজিত হয়েছে, নিঃসংশয়ে পরাজিত হয়েছে, আবার বড় দুর্বল ব'লে মনে হ'ল তার নিজেকে।

ও পাহাড়ের গায়ে ব'সে পড়ল, চোখ বুজল তারপর। অন্ধকারের পিপাসা জাগল ওর মনে। চোখ বুজে পৃথিবীকে ভুলতে চাইল ও। তখন হাওয়া লাগল ওর গায়ে, নিঃশব্দে সে হাওয়া প্রবেশ করল ওর রুদ্ধ-

গর্ত হৃদয়ে। স্নিগ্ধ, সর্বাঙ্গ স্নিগ্ধ হয়ে গেল ওর। ও চোখ খুলল। পাহাড়ের গা থেকে তাকিয়ে দেখল, মাঠ আর মাটি, জল আর আকাশ। তাকিয়ে দেখল ও। একটা জিনিস ও বুঝতে পারল না, সে আকাশ। মাটিকে ও জানে ফসল দেয়, জলকেও বোঝা যায় না—না হ'লেও চলে না, কিন্তু আকাশ? এত বিস্তৃত কেন, কেন এত মসৃণ আর উজ্জ্বল? কি একটা আছে তার মধ্যে ও যাকে বাঁধতে পারে না, কি একটা অবাধ উপস্থিতি যার প্রয়োজন ও বুঝতে পারে না। ওর ভ্রূ কুঞ্চিত হ'ল, চোখের পলক পড়ল একবার, তারপর ও আবার তাকাল। আবার চোখ পড়ল চারপাশে, কেমন যেন মনে হ'ল ওর, সব যেন মাখামাখি হয়ে এক হয়ে আছে; ও দেখল আকাশটা নেমে এসে মাটি হয়েছে, মাটি ঘন হয়ে হয়েছে পাহাড়, নরম হয়ে হয়েছে নদী, ও দেখল মাটি থেকে আঙুলের ইশারার মত উঠছে গাছ, মমতার মত টলমল করছে শস্যক্ষেত্র; আকাশের নীল ঘন হয়ে হয়েছে মাটির সবুজ, সবুজ গাঢ় হয়ে হয়েছে জলের কালো, কালো লঘু হয়ে হয়েছে নীল। কেমন যেন একাকার অঙ্গাঙ্গী হয়ে রয়েছে সব, এই কথাই ওর মনে হ'ল। অঙ্গাঙ্গী—এই কথাটা স্বতই ধ্বনিত হ'ল ওর হৃদয়ে। ওরা সব মাখামাখি হয়ে এক হয়ে রয়েছে, ওরা সব এক হয়ে কি যেন ধ'রে রেখেছে নিজেদের মধ্যে; শুধু ধ'রে রাখে নি, পরিব্যাপ্ত ক'রে দিয়েছে। 'এ সব আমার'—এ কথা ব'লে কোন অনুভূতি জাগল না ওর হৃদয়ে, কোন অনুভূতি জাগল না। যাই করুক, পৃথিবী আর আকাশ যে ওর আয়ত্তাতীত এক সম্পদে সমৃদ্ধ—এ কথা ওর হৃদয়ে ধরা পড়ল আর নিঃশব্দে মুদ্রিত হ'ল। 'আমি ওদের মধ্যে নেই, আমি ওদের বাইরে'—এই বেদনার্ত বিস্ময় জেগে উঠল ওর মনে, ওর ঠোঁট থরথর ক'রে কেঁপে উঠল, কি যেন বলতে চাইল ও, তারপর আবার চোখ বুজল। জীবনে এই প্রথম একটা কাতরতা অনুভব করল ও।

অনেকক্ষণ চুপ ক'রে রইল ও, মনে হ'ল উঠবে না। ওর নিজেরই তাই মনে হ'ল। তারপর হঠাৎ পায়ের ওপর খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে

উঠল সে, মাথা নাড়ল জোরে জোরে, তারপর প্রশ্ন করল নিজেকে, 'আমি এখানে পাহাড়ে দাঁড়িয়ে রয়েছি কেন? কেন, আমি নিজেকে এমন অদ্ভুত যন্ত্রণা দিচ্ছি?' আশ্চর্য। দুরন্ত শিশুকে আদর ক'রে বোঝাবার মত ও বোঝাতে চাইল নিজের মনকে, 'পাগল, প্রাসাদে ক্রীতদাসরা তোমার অঙ্গুলিসঙ্কেতের জন্য অপেক্ষা করছে, তোমার সেই সুখসুন্দর প্রাসাদে। তোমারই প্রয়োজনের মূল্যে সেখানে মানুষ থেকে মাটি যা কিছু সব মূল্যবান। তোমাকে চাইতে হচ্ছে, আশ্চর্য! কি আশ্চর্য! তোমার আকাঙ্ক্ষা জাগানোর সাধনায় যে কত জনের সারা জীবন ব্যয়িত হয়েছে! সারা জীবন তোমার একটি আকাঙ্ক্ষার জন্যে।'

কিন্তু ও উৎসাহিত হ'ল না, বরং ধীরে কিন্তু স্থির নিশ্চিত ভাবে একটা অবোধ অন্ধ আশঙ্কার ছায়া মনে ঘনিয়ে উঠল আর সঙ্গে সঙ্গে আচ্ছন্ন ক'রে দিল। হঠাৎ তার প্রাসাদের ছায়াগর্ভ ঘরগুলো শবাধারের বিবর্ণ বিষাদ নিয়ে ওর মনে জেগে উঠল। মনে হ'ল, তারা ওকে বন্দী করবে, বন্দী ক'রে রাখবে চিরকাল তাদের অনড় অতি-নির্দিষ্ট আয়তনে। বন্দী করবে আর তারপর নিষ্করুণ প্রভুত্বে অত্যাচারে পিষে ফেলবে তাকে, এক-একটি ক্লান্তিকর প্রয়োজনের আঘাত দাঁতাল চাকার মত অনিবার্যভাবে ঘুরে ঘুরে গুঁড়ো গুঁড়ো ক'রে দেবে তাকে। তার সমগ্রতাকে অস্বীকার ক'রে এক-একটা তুচ্ছাতিতুচ্ছ প্রয়োজন তাকে পুতুলের মত নাড়াচাড়া ক'রে ফেলে দেবে, এই পরিণতিহীন তুচ্ছতার চিন্তায় বিরক্ত ভয়ার্ত হয়ে উঠল সে। তার মনে হ'ল কে যেন তার জীবনটাকে নিয়ে একটা নিষ্ঠুর বিদ্রূপ ক'রে চলেছে, কতক-গুলো রঙচঙে টুকরো টুকরো চাওয়ার ভিড়ে তার ক্ষুধার্ত জর্জর আত্মাকে শূন্য নিরুপায় ক'রে রেখে কে যেন ক্রমাগত বিদ্রূপ ক'রে যাচ্ছে তার দিশেহারা জীবন নিয়ে। কিছুতেই সে তাকে পেতে দেবে না, কিছুতেই না। নিজের অভাবের একটা অস্পষ্ট আভাস জেগে উঠল তার মনে, এই প্রথম জেগে উঠল।

তার অভাবের বেদনা সবচেয়ে পীড়াদায়ক হয়ে উঠল মানুষের কথা ভেবে। সবাই তার কাছে আসবে কিন্তু কেউ তার মনে আসবে না, সবাই তার সুখের জন্যে চেষ্টা করবে কিন্তু কেউ তাকে আনন্দের সন্ধান দেবে না। সে একটা ভীষণ দুশ্চিন্তার মত সকলের মনে মুদ্রিত হবে, কিন্তু পারবে না—কিছুতেই পারবে না, হাসির মত সহজবেগে সকলের হৃদয়ে তরঙ্গিত হতে। কি একটা অদৃশ্য দেয়াল গ'ড়ে উঠেছে তার ও পৃথিবীর মধ্যে, কি একটা দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান যার স্বরূপ সে জানে না, যার অস্তিত্ব পর্যন্ত তার অগোচরে ছিল, যার ওপর পারাপারের সেতু সে বাইরে খুঁজে পায় না। সে আর ভাবতে পারল না, কি সে, কি জিনিস, কি তাকে বিচ্ছিন্ন ব্যবহিত বিরুদ্ধ করেছে পৃথিবীর কাছ থেকে, কিসের জন্যে সে সুখ পেয়েও সন্তোষ পাচ্ছে না, সব পেয়েও নিজেকে হারাচ্ছে।

আকুল অব্যবস্থিত চিত্তে সে চারিদিকে তাকাল, চোখ বুজতেও ভয় হ'ল তার, বড় ভয় হ'ল। একটা অজানা অদৃশ্য শক্তির স্পর্শ অনুভব করল সে, অনুভব করল সে নিজের অতীত ও বর্তমানের ধারায় যা তাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে এ কূল থেকে অন্য কূলে—আরও আরও যেন কোথায়। নিজেকে এক ভাসমান বিন্দুর মত মনে হ'ল তার, ভাসমান—বড় অসহায়ভাবে নিজের অজ্ঞাতসারে ভাসমান। নিজের ভিতরে তাকিয়ে সে কোন আশা পেল না, বাইরের দিকে তাকিয়ে পেল না কোন আশ্রয়। নিজের মধ্যে অন্ধ শূন্যতা, বাইরে বিশাল বিক্ষুব্ধ বৈচিত্র্য। সবই অপরিচিত। নিজের একাকীত্বে, অসীমতার আভাসে আতঙ্কিত হ'ল সে।

তারপর বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল, কিন্তু কিছুই দেখতে পেল না। তার দৃষ্টির দরজায় নানা বিরুদ্ধ চরিত্রের রেখা বর্ণ এসে রূঢ় আঘাত করল, কিন্তু কোন নির্দিষ্ট রূপ জেগে উঠল না—কিছুতেই না। সূর্যের লাল, ঘাসের সবুজ, আকাশের নীল তার চোখে আপন আপন পার্থক্য নিয়ে প্রখর হয়ে উঠল, কিন্তু আপন আনন্দিত পূর্ণতায়

দূর্ব ঘাস আকাশ—কিছুই জেগে উঠল না, কিছুতেই না। তবুও তাকিয়ে রইল সে, চোখ বুজতে পারল না, কে যেন তাকে কিছুতেই চোখ বুজতে দিল না। সে স্পষ্ট অনুভব করল, সে পারবে না, চোখ বুজলেই নিরবয়ব অন্ধকারে, আপন অন্তরের নিঃসঙ্গ নিরালোক অন্ধকূপে সে প'ড়ে যাবে, আর উঠতে পারবে না, আর পৃথিবীর আলো দেখতে পাবে না। আপন মনের অজানা দুর্গম রহস্যে বড় আতঙ্কিত হ'ল ও।

কতক্ষণ সে এইভাবে ব'সে রইল। ক্রমশ সূর্যের স্বর্ণবাহু আপন আলিঙ্গন শিথিল করে পৃথিবীর বুকে, ক্রমশ ময়ূরবর্ণী কুয়াশায় দিগন্তের দৃষ্টি বাষ্পাবিল হয়ে উঠল। আরক্ত পাটল আলোয় পশ্চিমাচল হ'ল অসহ্যসুন্দর। ও তাকিয়ে রইল। হঠাৎ ও দেখল, কয়েকটি চঞ্চল চলিষ্ণু বিন্দু, তারা কাছে এগিয়ে আসছে; ওর দৃষ্টি স্থির হ'ল, ও দেখল মানুষ। ও আবার দেখল, ভালবাসার মত ধ্রুবনিবিড় কালো কোমল মাটির ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে মানুষ, মাটিরই চঞ্চল চারা যেন একই পৃথুল তবু পেলব দেহ, একই কালোকোমল রঙ। মাটি থেকে বেড়ে উঠেছে মাটির শ্যামলতা নিয়ে। চলেছে দলে দলে স্ত্রী-পুরুষ বাঁকের একদিকে সংসারের ভার নানা জিনিস, লোহার কাঠের কত কি। বাঁকের অন্য দিকে সংসারের সম্পদ-শিশু। দেখল আর ওর কানে ভেসে এল স্বর—পুরুষের পরিশ্রম-ঘন উষ্ণ সুখস্বর, নারীর লঘু স্বরতরঙ্গ হাসির ফেণায় উপচে ছড়িয়ে পড়ছে আর স্বরের মধ্যে জেগে উঠছে ভোরের মত ভীরু শিশুর কলধ্বনি। এক মুহূর্ত বহিরাকাশ থেকে অন্তরাকাশ সঙ্গীতমুখর হয়ে উঠল, কিন্তু শুধু এক মুহূর্ত। ও পরিষ্কার ক'রে কিছু বুঝতে পারল না, ভাবতে পারল না—শুধু একবার নিঃশব্দে চোখ বুজল, আর দেখল আকাশের নীল জীবন্ত হয়ে, হয়েছে মাটির সবুজ, সবুজ ঘন হয়ে হয়েছে কালো, কালো লঘু হয়ে হয়েছে নীল—একাকার অঙ্গাঙ্গী সব। ওর মনে হ'ল, ও এইবার ঘুমোতে পারবে।

তারপর সারারাত, সারারাত ও ঘুমিয়ে রইল। ঘুম—ঘুম—ঘন-ঘুমের কাজল-স্রোত নেমে এল ওর শিরায় শিরায়, আচ্ছন্ন অবশ ক'রে দিল মন, শান্ত শিথিল ক'রে দিল স্নায়ুপুঞ্জ। গাঢ় শীতল স্পর্শে নিঃশেষে মুছে নিল সারাদিনের রূঢ় রক্তগ্লানি, মুছে নিল আর প্রসারিত ক'রে দিল শান্তিতে। কিন্তু নদীর লীলায়িত গতিতরঙ্গের বহু বৈচিত্র্যের অন্তরালেও যেমন সমুদ্রের আহ্বান নিরন্তর ধ্বনিত হতে থাকে তেমনই সেই রাতে ঘুমের জোয়ারেও তার অবচেতনায় জেগে রইল মানুষ, অচেনা কোমল মানুষ আসছে—ওর কাছে এগিয়ে আসছে।

ভোরের হাওয়ায় ও জাগল। অন্ধকার লঘু হয়ে এসেছে, আলো প্রখর হয় নি। নিশ্বাস নিতে করুণা জাগে এত স্পর্শসুকুমার সেই ছায়ালোক। সারা আকাশ জুড়ে ছলছল করছে। ও উঠে বসল, হাঁটু মুড়ে দিল। কেন, ও তা ভাবতে পারল না, ওর মনে হ'ল এ ছাড়া আর কিছু করার নেই এই মুহূর্তে, এ ছাড়া তো আর কিছু করতে পারে না। তারপর ও তাকাল। তাকাল আর দেখল অসীম আকাশপ্রান্ত জুড়ে লাল সোনালী গোলাপী আলোর কলি আশ্চর্য আনন্দে ফুটে ফুটে উঠছে। অস্তিত্বের কি অগাধ আহ্লাদ, সে আলোর অণুতে অণুতে আবির্ভাবের সে কি আশ্চর্য বিস্ময়! প্রকাশবিহ্বল পূর্বাচলে ও একবার উন্মীলিত দৃষ্টিতে তাকাল, তারপর দু হাত জোড় করল—জোড় করল না, গ্রহণের পরিপূর্ণতায় স্বভই দুই হাত সংবদ্ধ হ'ল। তারপর শান্তস্বরে উচ্চারণ করল ও, 'আমাকে হৃদয় দাও।' আবার উচ্চারণ করল—আবার।

তারপর লঘু—লঘু, এক মুহূর্তে আশ্চর্য লঘু হয়ে উঠল ও। হৃদয়ের বন্দী হিমবাহ অপসারিত হ'ল অকস্মাৎ, আর ওর মনে হ'ল, অননুভূত প্রাণচাঞ্চল্যে ও সমুদ্রের মত উচ্ছিত উদ্দাম হয়ে উঠবে—ভেঙে খান খান হয়ে যাবে ফেণায় ফেণায়। কিন্তু হ'ল না, নিষ্প্রয়োজন মনে হল ওর। ভোরের হাওয়ায় সবুজ পাতার মত সহজ আনন্দে স্পন্দিত হ'ল শুধু—নিঃশব্দে স্পন্দিত হ'ল আকাশ মাটি আলো অন্ধকারের আনন্দ-অধীর

সঙ্গমে। অসীমতার আভাসে আর আতঙ্কিত হ'ল না ও, আনন্দিত হ'ল, ওর মনে হ'ল ওর আর কিছু চাইবার নেই—আর কিছু না।

২

সন্ধ্যে হয়ে আসছে ব'লে গ্রামের মানুষেরা তাড়া দিল, কিন্তু বুড়ী নড়ল না। না, না, দেখব না; কেমন ক'রে মরে রয়েছে ও। মৃত্যু ওর মুখের হাসিকে পরাজিত করতে পারে নি বটে, কিন্তু সূর্য তাকে দগ্ধ করেছিল। বুড়ী বলল না, দাঁড়াও। গ্রামের মানুষেরা দাঁড়াল না। তবু সে গেল না, হাতের লাঠি সরিয়ে রাখল এক পাশে, কাঁপা কাঁপা হাতে কুড়িয়ে আনল ডালপালা, সবুজ পাতায় ওর সারা দেহ ঢেকে দিল, আর নিজের খাবার জল থেকে ভিজিয়ে দিল ওর মুখ। তারপর হাতের লাঠি তুলে নিয়ে সন্ধ্যের কালো ছায়ায় আবার পাহাড়ী পথ বেয়ে চলতে শুরু করল। গ্রামের মানুষেরা তখন অনেক দূরে চ'লে গেছে।

অসিতকুমার

আমার সাহিত্য-জীবন

(৬)

আমাদের ও-অঞ্চলে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা বাধবার উপক্রম হ'ল একটি তালগাছ কাটার ঘটনা উপলক্ষ্য ক'রে। এক পক্ষে রহম শেখ, অন্য পক্ষে আমাদের গ্রামের প্রধান ধনী ষষ্ঠীকিঙ্করবাবু। এ ঘটনাটি 'পঞ্চগ্রামে'র মধ্যে জুড়ে দিয়েছি। তখন লীগ-আমলের প্রথম। লীগ-মন্ত্রীত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রথম বা দ্বিতীয় বৎসর। সামান্য ঘটনাটিকে উপলক্ষ্য ক'রে অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই যে ভয়ঙ্কর একটা বিপর্যয় ঘটবার উপক্রম হ'ল, সে স্মরণ করলে আজও শিউরে উঠি। আমিও এর মধ্যে প্রায় স্বেচ্ছায় জড়িয়ে পড়েছিলাম। জড়িয়ে

পড়েছিলাম হিন্দুদের পক্ষেই। ফলে যখন সদর থেকে রিজার্ভ ফোর্স এসে হাজির হ'ল এবং গ্রামের ভিতর দিয়ে রাস্তায় রাস্তায় মার্চ ক'রে বেড়ালে, তখন আমার বাড়ির সামনেই তাদের হল্ট হুকুম দিয়ে সেখানেই প্রায় আধ ঘণ্টা লেফট-রাইট কুচকাওয়াজ করিয়ে বেশ হুমকি দেখিয়ে গেল। যতদূর মনে পড়ছে, সে দিনটি ছিল কোজাগরী পূর্ণিমার পর তৃতীয়া কি চতুর্থী। আমার শরীর তখন খুব খারাপ, পুজোর পর ত্রয়োদশীতেই আমার পাটনা রওনা হওয়ার কথা; কিন্তু এই কারণেই আটকে গিয়েছি। সে দিন রিজার্ভ ফোর্স এসে পড়তেই আমি নিশ্চিন্ত হয়ে সেই রাত্রেই বেরিয়ে পড়ব স্থির করলাম। সন্ধ্যাবেলা একজন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট তলব পাঠালেন থানায় এবং আমাকে খুব শাসিয়ে দিলেন। অথচ যাঁদের নিয়ে বিবাদ, প্রকৃত পক্ষে যাঁরা দাঙ্গার এক পক্ষ, তাঁদেরই ঘরে আতিথ্য গ্রহণ ক'রে তাঁদেরও ধন্য করলেন, নিজেও ধন্য হলেন। ধন্য না হ'লেও আহারে পরিচর্যায় সুনিদ্রায় পরিতৃপ্ত হলেন।

আমি রাত্রেই রওনা হয়ে গেলাম।

ভাগলপুর পড়ে পথে। শ্রদ্ধাভাজন বন্ধু "বনফুলে"র সঙ্গে তখন নিয়মিত পত্রালাপ চলত। তিনি বার বার নিমন্ত্রণ জানিয়েছেন, ভরসা দিয়েছেন—এখানে এস, অসুখ ভাল হবে, শরীর সেরে যাবে। আমি দায়িত্ব নিচ্ছি।

বনফুলের লেখা গল্পগুলি কল্পনাপ্রসূত হতে পারে, অর্থাৎ গল্পগুলির ঘটনা সত্যি নাও হতে পারে, কিন্তু ডাক্তার বলাইচাঁদের দেওয়া ভরসা একেবারে খাঁটি বাস্তব। ভাগলপুরে থাকি বা না-থাকি একবার ওখানে নেমে বলাইকে দেখিয়ে ওষুধপত্রের একটা ব্যবস্থা ক'রে নেবার অভিপ্রায় ছিল, আর ছিল এই সবল এবং প্রাণখোলা মানুষটির সঙ্গে কয়েকটা দিন আনন্দের মধ্যে কাটিয়ে দেবার বাসনা। ভাগলপুর থেকে বৈদ্যনাথ-মুঙ্গের এ দুটি জায়গা যাবারও অভিপ্রায় ছিল। ভাগলপুরে নেমেছিলাম খানিকটা রাত্রি থাকতে। রাত্রিটুকু স্টেশনে কাটিয়ে দিয়ে

আলো ফুটতেই একটা এক্কা ক'রে বনফুলের বাসার দরজায় হাজির হলাম। মোটাসোটা মানুষটি কাছাকোঁচা গুঁজতে গুঁজতে দরজা খুলে আমাকে দেখেই হৈ-হৈ শুরু ক'রে দিলেন। এ দুটিই বনফুলের বৈশিষ্ট্য; বলাই যখন সেজে-গুজে সমাজে সভায় ঘোরাফেরা করেন, তখন কোমরে বেল্ট আঁটেন; বাড়িতে বেল্ট খুলে বসলেই মিনিটে মিনিটে কষি গুঁজতে হয় এবং ক্রমে ক্রমে গোড়ালির কাপড় হাঁটুর উপরে উঠে যায়। এরই মধ্যে অনর্গল গল্প---সে বৈঠকী এবং সাহিত্যিক দুইই। এর মধ্যে বাইরে থেকে ডাক পড়লে ওই অবস্থাতেই কষিতে আর একটা পাক মেরে কাছাটা টানতে টানতে গিয়ে হাজির হন সহাস্যমুখে। সবল মানুষ, হাস্য যত প্রাণময় ও সহজ, ক্রোধও তত তীব্র। ক্রুদ্ধ হ'লে সঙ্গে সঙ্গেই খোলাখুলি জানিয়ে দেবেন, তিনি রেগেছেন। অন্য দিকে ভোজনবিলাসী এবং পরিচ্ছন্ন মানুষ। স্বল্প-স্বল্প আসবাবে ঘরখানি সুন্দর---যতদূর মনে পড়ছে, বনফুলের ঘরের ফুলদানি কখনও খালি থাকে না, ভোরবেলাতেই ফুলের গুচ্ছ সংগ্রহ ক'রে সেগুলিকে পূর্ণ ক'রে দেন, তেমনি আলো ঘরগুলিতে। বাড়ির উঠানে জালের খাঁচায় ডজন খানেক বুনো হাঁস। পরে শুনেছি, বাড়িতে গাই এবং ভাল জাতের রামপক্ষী পুষেছেন। বলাইয়ের গৃহিণীও এদিক দিয়ে তাঁর সুযোগ্যা সহধর্মিণী। বনফুলের ক্রমবর্ধমান খ্যাতির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এই ভদ্রমহিলা ঘর-সংসারের কাজকর্মে এক চুল ক্রুটি না ঘটিয়েও প্রাইভেট পরীক্ষার্থী হিসেবে একে একে আই. এ. এবং বি. এ. পাস করেছেন, এম. এ. পাস করবার ইচ্ছেও রাখেন। ম্যাট্রিক পরীক্ষা পাস করাই ছিল। এবং একমাত্র এই পাশের যোগ্যতাটাই নাকি বনফুল বিবাহের সময় বিবেচনা করেছিলেন। তাঁর নাকি পণ ছিল ম্যাট্রিক-পাস-না-করা মেয়ে তিনি বিয়ে করবেন না। এ ছাড়া অন্য কোন কিছু তাঁর নিজের দাবি ছিল না। সেকালে ম্যাট্রিক-পাস মেয়ে সাধারণ বাঙালীর ঘরে খুব সুলভ ছিল না এখনকার মত। কাজেই বনফুলের পিতৃদেবকে কন্যা-

সন্ধানে একটু বেগ পেতে হয়েছিল। খোঁজ পেয়ে তিনি বনফুলকে জানিয়েছিলেন, 'ম্যাট্রিক পাস মেয়ে পাওয়া গিয়াছে। এখন তুমি নিজে দেখিয়া পছন্দ-অপছন্দের কথা জানাও।' বনফুল জানিয়েছিলেন, 'আমার দাবি ম্যাট্রিক পাস মেয়ে। সে যখন পাওয়া গিয়াছে, তখন পছন্দ-অপছন্দের প্রশ্নই উঠে না। ভদ্র ও সদ্বংশ—সুতরাং দেখিবার কোন প্রয়োজন নাই।' বিবাহ হয়ে গেল। তাতে বনফুলের জীবনে কোন ক্ষোভের কারণ হয় নি। পারিবারিক জীবনে তিনি সুখী; পত্নীটি সংস্কারের গুণবতী এবং প্রকৃতিগত ভাবে তাঁদের ঐক্য অসাধারণ। বনফুলের মাছ-মাংসে একটু বেশি রুচি, পত্নীরও তাই; এমন কি কতটা চিনি দিয়ে রান্না হবে—এ নিয়েও কোনদিন মতভেদ হয় না। রন্ধন-বিদ্যায় স্বামী স্ত্রী উভয়েরই সমান পারদর্শিতা। কলকাতায় সজনীকান্তের বাড়িতে বনফুলের রান্না করা মাংস অনেক সাহিত্যিকই খেয়ে তারিফ করেছেন। বনফুল-পত্নী অভ্যাস ও বেশি চর্চার ফলে উৎকৃষ্টতর রান্না করেন। এ কথা বনফুলের সঙ্গে বন্ধুত্ব-বিচ্ছেদের ভয়েও গোপন করব না এবং বন্ধুপত্নীর নিকট থেকে অধিকতর সমাদরের প্রত্যাশাতেও বাড়িয়ে বলছি না। কারণ তাঁদের ওখানে অচিরে আতিথ্য গ্রহণের কোন কল্পনাই নেই। এমন কি দূরভবিষ্যতে কবে যেতে পারি সেও গণনা ক'রে বলতে পারি না। তখন ছেলে-মেয়েতে তিনটি—কেয়া অসীম রঞ্জু। বনফুলের সংসার রৌদ্রালোকিত পুষ্পোদ্যানের মত সুন্দর ঠেকল। মন জুড়িয়ে গেল।

পৌঁছবার আধ ঘণ্টার মধ্যেই চা-পর্ব। ডিম-মাখানো ভাজা পাউরুটির কথা আজও মনে পড়ছে। কারণ ওই বস্তুটা বলাইয়ের ঘরেই প্রথম খেয়েছিলাম। আমাদের পাড়াগাঁয়ের বাড়িতে এসব অজানা। ছোট্ট একটি আধুনিক নাগরিক পরিবারের সঙ্গে পরিচয় সেই আমার প্রথম। আধুনিকও বটে, নাগরিকও বটে, কিন্তু উগ্রতাবর্জিত। সইয়ে নিতে, খাপিয়ে নিতে বেগ পেতে হয় না, সময় লাগে না।

চায়ের কাপে চা ঢালতে ঢালতেই বনফুল পত্নীর দিকে তাকিয়ে

বললেন, আজ গোটা চারেক হাঁস তৈরি করতে বল। আর মাছ—ভাল মাছ।

আমি শিউরে উঠে বললাম, দোহাই মশাই! ম'রে যাব আমি। আপনি জানেন না, আমি পেটের গোলমালে নিদারুণ কষ্ট পাচ্ছি।

তখন তাঁর সঙ্গে 'আপনি' 'আজ্ঞে' চলত।

বনফুল বাধা দিয়ে বললেন, ঠিক আছে। তা হ'লে তো মাংসই আপনার পথ্য। পথ্যই নয়, ওষুধও বটে। ভয় করছেন কেন? আমি তো ডাক্তার। দায়ী আমি। নিন আর এক পেয়ালা চা। ওগো, আর একখানা রুটি।

কথার মাঝখানেই বলাই-গৃহিণী ডিম-মাখানো পাঁউরুটি নিয়ে হাজির। আমি উপুড় হয়ে পড়লাম প্লেটের উপর।—দোহাই! ভরসায় অবিশ্বাস করছি না, কিন্তু ভয় যাচ্ছে না। বনফুল নিজের প্লেটে সেগুলি নিয়ে হেসে বললেন, তবে থাক্।

এর পর নিয়ে গেলেন নিজের ক্লিনিকে।

বনফুলের ক্লিনিক-প্র্যাকটিস। স্টেশন রোডের উপর ঘরখানিতে নানা যন্ত্রপাতি—বিচিত্র গন্ধ। রক্ত মল মূত্র পুঁজ থুথু পরীক্ষার বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা—টেস্ট টিউব, স্লাইড, মাইক্রস্কোপ, স্পিরিট ল্যাম্প, রিপোর্ট-ফর্ম, খাতা। তারই মধ্যে তাঁর সাহিত্যচর্চার খাতা-কলম। স্পিরিট-ল্যাম্পের উপর ওষুধপত্র মিশিয়ে পরীক্ষার সামগ্রী চাপিয়ে দিয়ে এসে খাতা-কলম টেনে নিয়ে লিখতে বসছেন। অক্লান্ত লেখনী, বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টি, আকাশচারী বিহঙ্গের মত কল্পনার পক্ষবিস্তার; লেখা চলে—গল্প কবিতা হাস্যরসাত্মক ব্যঙ্গরসাত্মক। বনফুল বললেন, এবার আপনার রাজ্যে প্রবেশ করছি। সিরিয়াস লেখা শুরু করেছি। বড় লেখা। দেখি, কেমন হয়! একটা লিখেছি, শোনাব আপনাকে।

তখনও পর্যন্ত বনফুল বড় লেখা এবং সিরিয়াস লেখা শুরু করেন নি। হাস্যরস ও ব্যঙ্গরস নিয়েই কারবার করতেন।

কথা বলতে বলতেই ঘড়ির দিকে তাকিয়ে উঠে পড়লেন। নির্দিষ্ট

সময় পার হচ্ছে, নামাতে হবে পরীক্ষার বস্তু। নামালেন। বৈজ্ঞানিক গবেষণায় রত হলেন। মনে হ'ল, ভুলেই গেছেন সাহিত্যের কথা। স্লাইড চড়ালেন মাইক্রস্‌কোপে। বিশ্লেষণ শেষ ক'রে ফর্ম টেনে ব'সে পূরণ ক'রে চললেন। সই করলেন। খামে পূরলেন। নাম ঠিকানা লিখে রেখে আবার একটা পরীক্ষা শুরু ক'রে দিয়ে এসে বসলেন লেখার টেবিলে। লিখে চললেন।

বিস্মিত হয়ে গেলাম শক্তি দেখে।

এরই মধ্যে লোক আসছে, ফিস দিয়ে রিপোর্ট নিয়ে যাচ্ছে। বেলা একটা পর্যন্ত এক নাগাড়ে চলল এই দুই সাধনা—বিজ্ঞানের এবং সাহিত্যের।

এর পর বাড়ি। স্নান আহার। পরিচ্ছন্ন এবং অভিনবত্বে ভরা আহারের উপকরণ। মাংসে হাত দিয়ে ভাবিত হলাম। বনফুল বললেন, খান মশায়। আমি ডাক্তার, আমি বলছি—খান।

কথায় আদেশের সুর। ভয়ে ভয়েই খেলাম।

খাওয়ার পর লেখা নিয়ে বসলেন বনফুল। একটার পর একটা প'ড়ে যেতে লাগলেন। গতরাত্রি জেগে কেটেছে থার্ড ক্লাসে। তার উপর দুপুরে ঘুম অভ্যেস। আমার চোখে ঘুম নামল। কিন্তু বনফুল প'ড়েই গেলেন, পড়েই গেলেন—একটার পর একটা, একটার পর একটা। আমার তন্দ্রাচ্ছন্নতা বোধ করি তাঁর চোখেই পড়ল না।

আজও মনে পড়ছে, সে দিন মনে মনেই বলেছিলাম, বনফুল সিংহ নন, ব্যাঘ্র। সিংহ শুনেছি মৃত বা অতিদুর্বল প্রাণী বধ করে না।

বেলা সাড়ে চারটের সময় আবার চা-খাবার।

এইবার বনফুল থামলেন। বললেন, চা খান। ঘুম ছাড়বে। দিনে ঘুমোলেন না, ভাল হ'ল, এতটুকু বদহজম হবে না। কি, অম্বল মনে হচ্ছে?

সন্ধ্যার সময় বনফুল আমাকে নিয়ে বের হলেন; বিখ্যাত Asude অর্থাৎ আশু দে, মাখন চৌধুরী—এঁদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন।

আরও কারও কারও সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। তবে একটি কৌতুকের কথা মনে আছে। হঠাৎ পথের মাঝখানে দাঁড়িয়ে পড়লেন. বললেন, দাঁড়ান।

একটি পাশের পথের দিকে আঙুল দেখিয়ে মৃদুস্বরে বললেন, এক ভদ্রলোক আসছেন, দেখছেন ?

দেখলাম, একজন খাঁটি বাঙালী প্রৌঢ় অর্থাৎ আমারই মত ডিসপেপসিয়া-গ্রস্ত প্রৌঢ় বাঙালী আসছেন। গলায় যেন একটা কম্ফার্টার জড়ানো ছিল মনে হচ্ছে। বনফুল বললেন, উনি হলেন শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্তে'র সেই মেজদা, যিনি নাকি গঁদের আটা দিয়ে নাক ঝাড়া, জল খাওয়া, বাইরে যাওয়ার সময়ের হিসেব করতে নিজে পড়বার সময় পেতেন না, বছর বছর ফেল করতেন, যিনি "ছিনাথ বউরূপী"র ব্যাঘ্রবেশ দেখে দাঁত-কপাটি লাগিয়ে তক্তপোশে প'ড়ে গোঁ-গোঁ করেছিলেন।

উনিই তিনি ?

উনিই তিনি। দেখুন না, মজা দেখুন।

ভদ্রলোক বড় রাস্তায় পড়তেই বনফুল তাঁকে নমস্কার ক'রে কুশলবার্তা প্রশ্ন করলেন এবং আমার পরিচয় দিয়ে বললেন, ভাগলপুর বেড়াতে এসেছেন। শরৎচন্দ্রের লেখায় ভাগলপুরের যে সব জায়গার কথা আছে, দেখছেন এবং দেখবেন। যে সব পাত্র পাত্রীর কথা আছে—

এর পর ভদ্রলোক আর দাঁড়ালেন না। হনহন ক'রে চ'লে গেলেন।

বনফুল হেসে বললেন, শরৎবাবুর ওপর ভয়ানক চটা উনি।

সন্ধ্যের পর আবার কিছুক্ষণের জন্য ক্লিনিক। তার পর বাড়ি ফিরে আবার চা এবং সাহিত্য। সে দিন সন্ধ্যায় শোনালেন তাঁর প্রথম সিরিয়স রচনা, বড় গল্প—টাইফয়েড।

শুনে চমকে গেলাম।

এর পরই এলেন বনফুলের মেজভাই ভোলানাথ। তিনিও ডাক্তার। ভাগলপুর থেকে কিছু দূরে ডাক্তারি করেন। চমৎকার চেহারা; খাপখোলা তলোয়ারের মত। ভোলানাথও লিখতে পারেন। কিছু কিছু লেখা প্রকাশিতও হয়েছে। কিন্তু পরে আর চর্চা রাখেন নি। চমৎকার মানুষ।

তিন দিন ছিলাম বনফুলের ওখানে। তিন দিনেই বুঝলাম, আমার রোগের উপশম হয়েছে। চতুর্থ দিনে রওনা হলাম। বনফুল ও তাঁর গৃহিণী অনেক অনুরোধ করলেন। কিন্তু আমার তাগিদ ছিল। এবং সসঙ্কোচেই সত্য বলছি যে, বনফুলের মত স্বাস্থ্যবান ব্যক্তির সঙ্গে আহারে সাহিত্যালাপে মজলিসে পাল্লা দিয়ে চলা আমার পক্ষে কঠিনও হয়ে উঠেছিল।

আমার জীবনে সাহিত্যিক সুহৃদের মধ্যে অন্তরঙ্গতমদের মধ্যে বনফুল অন্যতম। সজনীকান্তের পরেই তিনি স্থান জুড়ে বসেছেন। অনেক প্রীতিনিবেদন নিয়মিতভাবে চলেছে পত্রালাপের মধ্যে দীর্ঘদিন ধ'রে। দু-চারবার মতান্তরও ঘটেছে।

একবার জামসেদপুরে চলন্তিকা-সাহিত্য-সম্মেলনের আসরে আমরা প্রকাশ্যে কোমর বেঁধে লড়াই করেছিলাম। সে লড়াই কবির লড়াইয়ের মত উপভোগ্য হয়ে উঠেছিল শ্রোতৃমণ্ডলীর কাছে। লোকে ভেবেছিল, দুই বন্ধুর বুঝি বিচ্ছেদ ঘ'টে গেল জীবনে। কিন্তু সভার শেষে দুজনকে গলা ধ'রে বেড়াতে দেখে তাঁদের বিস্ময়ের সীমা ছিল না। ফেরবার পথে ট্রেনে চার পাঁচ ঘণ্টা ধ'রে বনফুল যে অলৌকিক কাহিনী শুনিয়েছিলেন, তার অনেকগুলি এখনও মনে আছে।

আর একবার ঘটেছিল, আমার 'কবি' উপন্যাস নিয়ে।

'কবি' উপন্যাসখানি বনফুলের কাছে ভাল্‌গার ব'লে মনে হয়েছিল; অবশ্য আমি কোন বাদ-প্রতিবাদ করি নি।

আরও দু-চারবার ঘটেছে হয়তো। সে সব তুচ্ছ ঘটনা। মোটের উপর বনফুল আমার জীবনে অনেক প্রেরণা যুগিয়েছেন। তাঁর

কাছে আমার অনেক ঋণ। অদ্ভুত মানুষটিকে দূর থেকে শ্রদ্ধা নিবেদন করি। কাছে যেতে সাহস করি না, ওই সবলদেহ মানুষটির সঙ্গে তাল রেখে চলতে পারব না—কি আহারে, কি আড্ডায়, কি ঘোরায়, কি সাহিত্যালাপে।

বনফুলের ওখান থেকে এলাম পাটনা।

পাটনায় আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ লাভ শচীন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের সঙ্গে পরিচয়। ছ ফুটের উপর লম্বা টকটকে কাঞ্চনবর্ণ তীক্ষ্ননাসা প্রশস্তললাট মানুষটি শুধু সুপুরুষই নন—মহিমময় মানুষ।

লক্ষ জনের মধ্যে এঁর মাথা উঁচু হয়ে থাকে, দেখলেই চেনা যায়। একবার দেখলে আর ভোলা যায় না। এঁর কাছ থেকে অনেক পেয়েছি। অনেক মূলধন।

[ক্রমশ]

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

পাঁচে-ফুলে-সাজি

পাঁচ বা পঞ্চ সংখ্যাটির প্রবল প্রভাব প্রাচীন কাল থেকে আজ পর্যন্ত, যুগে যুগে সর্বত্র লক্ষ্য করা যায়। একে একে তার প্রমাণ দিচ্ছি।

আমাদের দেশে চতুরানন ব্রহ্মা, ষড়ানন কার্তিক বা দশানন রাবণ ভক্তগণের পূজা পেয়ে থাকেন বটে, কিন্তু পঞ্চানন মহাদেবের স্থান এঁদের সবার ওপরে। সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা, পালনকর্তা বিষ্ণু আর সংহার-কর্তা মহাদেব—এই তিন দেবতার মধ্যে মহাদেবের খাতিরই সবচেয়ে বেশি। ওদিকে আবার কুমার কার্তিকেয়ের পূজনীয় পিতৃদেব হলেন মহাদেব স্বয়ং। লঙ্কার রাজা দশাননের যথেষ্ট প্রতিপত্তি সত্ত্বেও মহাদেবের কাছে তিনি পরাস্ত। তা হ'লেই দেখা যাচ্ছে, পঞ্চাননের কাছে সকলেই পরাজয় স্বীকার করেছেন, এবং তার প্রধান কারণ, পঞ্চানন পঞ্চের পক্ষপাতী।

পঞ্চানন তাঁর পঞ্চ আনন নিয়েই ক্ষান্ত হলেন না। পঞ্চের ওপর পক্ষপাতিত্ব তাঁর বেড়েই চলল। তিনি দেখলেন, পার্থিব মানবদেহ রচিত হয়েছে পঞ্চ মহাভূতের সমষ্টিতে। তিনিও তাঁর নিজের দেহ সুসজ্জিত করলেন ব্যঞ্জনবর্ণের পঞ্চম বর্গ প-বর্গের পঞ্চ বর্ণের সমষ্টি দিয়ে। পিনাক, ফণী, বালেন্দু, ভস্ম ও মন্দাকিনী—এই প-বর্গ বা প, ফ, ব, ভ, ম দিয়ে তাঁর শরীর-সজ্জা রচিত হ'ল। কিন্তু পঞ্চাননের মহিমা অপার। প-বর্গ দিয়ে তাঁর শরীর শোভিত হ'লেও তিনি ভক্তগণকে অ-পবর্গ বা মোক্ষদানে কৃপণতা করেন না।

পঞ্চানন যেমন পঞ্চের প্রশংসায় পঞ্চমুখ, তাঁর পরম শত্রু কন্দর্পদেবও তেমনই পঞ্চ-গত-প্রাণ। তাই তো তাঁর অপর নাম—পঞ্চ-শর। পঞ্চশরের পঞ্চ শর (১) চির-প্রসিদ্ধ। অরবিন্দ, অশোক, চূত, নবমল্লিকা ও রক্তোৎপল—পঞ্চশরের পঞ্চ শর এই পঞ্চ পুষ্প দিয়ে প্রস্তুত। অতনুর তনু মহাদেবের নয়নাগ্নিতে দগ্ধ হ'লেও মকরধ্বজের পুষ্পময় পঞ্চ বাণের প্রভাব আজিও খর্ব হয় নি। তাই তো কবি বলেছেন—

"পঞ্চশরে দগ্ধ করে করেছ এ কি সন্ন্যাসি—
বিশ্ব মাঝে দিয়েছ তারে ছড়ায়ে!"

দেবরাজ ইন্দ্রের পঞ্চ-প্রীতিও অপরিসীম। দেবেন্দ্রের সাধের নন্দন-কাননে অসংখ্য বনস্পতি থাকা সত্ত্বেও মাত্র পঞ্চ বৃক্ষই তাঁর কাছে সমধিক প্রিয়। তাই তো তাদের বলে—দেবতরু। পঞ্চদেবতরুর নাম—মন্দার, পারিজাত, সন্তান, কল্পতরু ও হরিচন্দন।

শুধু পঞ্চানন, পঞ্চশর বা দেবরাজ ইন্দ্র কেন, সকল দেবতাই বুঝি পঞ্চের ভক্ত। তাই তো দেখি, পঞ্চ-পাত্রের গঙ্গাজলে তাঁদের নিত্য স্নান। গন্ধ-পুষ্প-ধূপ-দীপ-নৈবেদ্য—এই পঞ্চোপচারে তাঁদের পূজা-অর্চনা, পঞ্চবিধ নীরাজনা-দ্রব্যে (২), পঞ্চ-প্রদীপের স্নিগ্ধ আলোকে তাঁদের সান্ধ্য আরতি।

(১) সম্মোহন, উন্মাদন, শোষণ, তাপন ও স্তম্ভন—এই পঞ্চ শর।
(২) প্রদীপ, পদ্ম, বস্ত্র, আম্র ও তাম্বুল-পত্র বা পান।

আমাদের নানাবিধ ধর্ম-কর্মে পঞ্চ-গব্য (৩), পঞ্চামৃত (৪), পঞ্চ শস্য (৫), পঞ্চ-পল্লব (৬), পঞ্চ-মুদ্রা (৭), পঞ্চ-রত্ন (৮), ও পঞ্চ-ধাতু (৯) পঞ্চের প্রাধান্যের কথা স্মরণ করাইয়া দেয় না কি?

মাঘ মাসের শ্রীপঞ্চমীতে বিপঞ্চী-বাদিনী বাগ্‌দেবীর অর্চনা ছাত্র ছাত্রীগণের শ্রেষ্ঠ পূজা। তাই বুঝি চাণক্য-পণ্ডিত 'লালয়েৎ পঞ্চ বর্ষাণি'র বিধান দিয়ে পঞ্চম বৎসর বয়সে শিক্ষার্থীর বিদ্যারম্ভ বা হাতে খড়ির বন্দোবস্ত ক'রে গেছেন।

বৈদিক যুগে আর্য সভ্যতার পদধ্বনি পঞ্চনদের তীরেই প্রথম শোনা গিয়েছিল। শতদ্রু (Sutlej), বিপাশা (Beas), ইরাবতী (Ravee), চন্দ্রভাগা (Chenab), ও বিতস্তা (Jhelum)—এই পঞ্চনদ-পরিবেষ্টিত পঞ্চনদ-প্রদেশে বা বর্তমান পাঞ্জাবে আর্যগণের প্রথম বসতি। দক্ষিণ-আহবনীয়-গার্হপত্য সভ্য-আবসথ্য, এই পঞ্চ অগ্নি তাঁদের উপাস্য দেবতা। পঞ্চাগ্নি (১০) দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে তাঁরা পঞ্চ-তপায় কৃচ্ছ্রসাধন করতেন। আজিও পঞ্চেন্দ্রিয় সংযত রেখে সাধকগণ পঞ্চক্রোশী বারাণসীর পঞ্চগঙ্গা-তীর্থে ব্রতের অনুষ্ঠান ক'রে থাকেন।

পঞ্চ মহাযজ্ঞ আমাদের প্রাচীন যুগের আদর্শ ছিল। ব্রহ্ম-যজ্ঞ, পিতৃ যজ্ঞ, দেব-যজ্ঞ, ভূত-যজ্ঞ ও নৃ-যজ্ঞ—এই পঞ্চ মহাযজ্ঞ প্রাচীন ভারতে গৃহস্থগণের অবশ্যকর্তব্য কর্ম ব'লে পরিগণিত হ'ত। ব্রহ্মযজ্ঞ বলতে

(৩) দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, গোময় ও গোমূত্র।
(৪) দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, মধু ও চিনি।
(৫) ধান্য, মুগ, মাষকলাই, যব ও তিল বা শ্বেত-সরষে।
(৬) আম্র, অশ্বত্থ, বট, পাকুড় ও যজ্ঞ-ডুমুর।
(৭) আবাহনী, স্থাপনী, সন্নিধাপনী, সম্বোধনী ও সম্মুখীকরণী
(৮) হীরক, মুক্তা, পদ্মরাগ, স্বর্ণ ও বিদ্রুম বা প্রবাল।
(৯) স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, রাঙ ও সীসা।
(১০) চারিদিকে চারি অগ্নি ও উর্ধ্বে সূর্য—এই পঞ্চাগ্নি।

অধ্যাপনা বা শিক্ষা-দান, পিতৃযজ্ঞ বলতে পূর্বপুরুষের উদ্দেশে তর্পণ, দেবযজ্ঞ বলতে অগ্নিতে আহুতি-প্রদান বা হোম করা, ভূতযজ্ঞ বলতে গৃহ-বলি-ভুক্‌ প্রাণীগণের উদ্দেশে আহার্য-দান এবং নৃযজ্ঞ বলতে অতিথি-সেবা বোঝায়। আজও এদের মূল্য এতটুকু কমে নি।

গৃহস্থের গৃহে প্রাণী-বধের পাঁচটি প্রধান বস্তু আছে। তাদের নাম পঞ্চসূনা। যথা—উনুন, শিলনোড়া, ঝাঁটা, ঢেঁকি বা হামান-দিস্তে ও জলের কলসী। গৃহস্থেরা প্রায়ই নিজেদের অজ্ঞাতসারে ওই পঞ্চ স্থানে পিপীলিকাদি কীটপতঙ্গ বধ ক'রে ও-পাপের ভাগী হয়। পঞ্চ মহাযজ্ঞ করলে এই পাপের অবসান হয়ে থাকে।

ত্রেতাযুগে শ্রীরামচন্দ্রের দণ্ডকারণ্যের পঞ্চবটী-বনে বিচরণ ও কলি-যুগে শ্রীরামকৃষ্ণের দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটীতলে সাধনা—পঞ্চের মহিমার কথা মনে করিয়ে দেয়; আরও মনে করিয়ে দেয় যে, পঞ্চবটী বলতে পাঁচটি বটগাছ বোঝায় না, বোঝায়—অশ্বত্থ, বিল্ব, বট, অশোক ও আমলকী, এই পঞ্চ বৃক্ষের সমষ্টিকে।

পঞ্চম বেদ-স্বরূপ মহাভারতে বর্ণিত পঞ্চ পাণ্ডব এত দেশ থাকতে পঞ্চাল-রাজকন্যা পাঞ্চালীর পাণিপীড়ন করলেন কেন—এর কোন সদুত্তর পত্নতাত্ত্বিকগণ দিতে পারেন কি না, তাঁরাই বিবেচনা করুন।

পঞ্চের আধিপত্য কোথায় নেই? বিনামা-সীবন থেকে শুরু ক'রে চণ্ডীপাঠ পর্যন্ত সর্বত্রই পঞ্চের পাঞ্চজন্য নিনাদিত।

দর্শনজগতে প্রবেশ করলে প্রথমেই আমরা দেখতে পাই, সাংখ্য-দর্শনে চতুর্বিংশতি তত্ত্বের রঙ্গমঞ্চে পঞ্চের খেলা। সেখানে পঞ্চতন্মাত্র (১১), পঞ্চমহাভূত (১২), পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় (১৩) ও পঞ্চ-কর্মেন্দ্রিয় (১৪)—পঞ্চের বিজয়-বৈজয়ন্তী বহন ক'রে আনছে।

(১১) রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ।
(১২) ক্ষিতি, অপ্‌, তেজস, মরুৎ, ব্যোম।
(১৩) চক্ষুঃ, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক।
(১৪) বাক্‌, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ।

বেদান্তদর্শনের পঞ্চীকরণ জীবের পঞ্চ কোষময় দেহ (১৫), দেহস্থিত পঞ্চ প্রাণ (১৬), দেহের মধ্যে প্রতিটি হস্তে পঞ্চ অঙ্গুলি (১৭), প্রপঞ্চময় পৃথিবীতে পাঞ্চভৌতিক মানব-দেহের পঞ্চত্ব প্রাপ্তি, তর্কশাস্ত্রের পঞ্চাবয়ব স্থায় বা Syllogism (১৮), তন্ত্রশাস্ত্রের পঞ্চমকার (১৯), রাজনীতিশাস্ত্রের পঞ্চাঙ্গ নীতি (২০), পুরাণের পঞ্চ লক্ষণ (২১), নাট্য-শাস্ত্রে নাটকের পঞ্চ অঙ্ক, পঞ্চ সন্ধি (২২), পঞ্চ প্রস্তাবনা (২৩) পঞ্চ অর্থ প্রকৃতি (২৪) ও পঞ্চ অবস্থা (২৫), চিকিৎসাশাস্ত্রে পঞ্চ কর্ম (২৬), পঞ্চ-লবণ (২৭), পঞ্চ কষায় (২৮), পঞ্চ তিক্ত (২৯) ও পঞ্চ সুগন্ধি (৩০) সর্বত্রই পঞ্চের জয়জয়কার।

আমাদের নীতিগ্রন্থের মধ্যে পঞ্চতন্ত্র, বেদান্তগ্রন্থের মধ্যে পঞ্চদশী। নাটকের মধ্যে পঞ্চ রাত্র, ছন্দঃশাস্ত্রের মধ্যে পঞ্চ চামর ছন্দ, জ্যামিতির মধ্যে পঞ্চ কোণ বা Pentagon, অঙ্কশাস্ত্রের মধ্যে পঞ্চরাশিক বা

(১৫) অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময়।
(১৬) প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান।
(১৭) বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ, তর্জনী, মধ্যমা, অনামিকা ও কনিষ্ঠা।
(১৮) প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপনয় ও নিগমন।
(১৯) মৎস্য, মাংস, মদ্য, মুদ্রা ও মৈথুন।
(২০) সহায়, সাধনোপায়, দেশকাল-বিভাগ, বিনিপাত-প্রতিকার ও সিদ্ধি।
(২১) সর্গ, প্রতিসর্গ, বংশ, মন্বন্তর ও বংশানুচরিত।
(২২) মুখ, প্রতিমুখ, গর্ভ, বিমর্ষ ও উপসংহৃতি বা নির্বহণ।
(২৩) উদ্‌ঘাত্যক, কথোদ্‌ঘাত, প্রয়োগাতিশয়, প্রবর্তক ও অবলগিত।
(২৪) বীজ, বিন্দু, পতাকা, প্রকরী ও কার্য।
(২৫) আরম্ভ, যত্ন, প্রাপ্ত্যাশা, নিয়তাপ্তি ও ফলাগম।
(২৬) বমন, রেচন, নস্য, অনুবাসন ও নিরূহ।
(২৭) কাচ, সৈন্ধব, সামুদ্র, বিট ও সৌবর্চল।
(২৮) জাম, শিমুল, বেড়েলা, বকুল ও কুল।
(২৯) নিম, গুলঞ্চ, বাসক, পটোল ও কণ্টকারী।
(৩০) কর্পূর, কঙ্কোল, লবঙ্গ, সুপারি ও জাতিফল।

Double Rule of Three, ধারাপাতের হিসাবে পাঁচ গণ্ডায় এক পয়সা ও পাঁচ তোলায় এক ছটাক, ব্যাকরণের মধ্যে পঞ্চ বর্গ (৩১) ও প্রতি বর্গে পঞ্চ বর্ণ বা অক্ষর, ইতিহাসের মধ্যে ইংলণ্ডের রাজা পঞ্চম জর্জ, ভূগোলের মধ্যে পঞ্চ গৌড়, গ্রামের মধ্যে পঞ্চায়েৎ, ছড়ার মধ্যে পাঁচালি—পঞ্চের মহিমা সর্বত্র পরিব্যাপ্ত।

আমাদের পিতা বা পিতৃস্থানীয় গুরুজন পাঁচজন (৩২), আমাদের প্রাতঃস্মরণীয়া কন্যার সংখ্যাও পাঁচ (৩৩)। এই পঞ্চ কন্যার অনুকরণে স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসু বর্ণিত গোরার সংখ্যাও পাঁচ। যথা—

হেয়ার কম্বিন পামরশ্চ কেরী মার্শ্‌মেনস্তথা।
পঞ্চ গোরাঃ স্মরেন্নিত্যং মহাপাতকনাশনম্‌॥

মনুষ্য জাতির মধ্যে মহাপাতকী আছে পঞ্চ প্রকার (৩৪)। পঞ্চ কন্যার এবং সম্ভবত পঞ্চ গোরারও নাম-স্মরণে তারা পাপমুক্ত হয়।

সঙ্গীতশাস্ত্রে পঞ্চম স্বরটিই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রুতিমধুর। কোকিলের কণ্ঠস্বর পঞ্চম স্বরের সঙ্গে মেলানো। তাই তো কোকিলের গান শুনে কবি বলেন—

পঞ্চমেতে পাখী ধরিয়াছে তান,
সে গান শুনিয়া জুড়াইল কান।

'কুহু ও কেকা'র কবি কোকিলের পঞ্চম স্বরকেই অগ্রে স্থান দিয়েছেন, যে হেতু কুহুর কুহকের কথা কেকা-ধ্বনির আগেই তাঁর মনে পড়েছিল। "কোকিলালাপ-বাচাল মলয়ানিল" প্রাচীন আলঙ্কারিক-কবি দণ্ডীকেও বিচলিত করতে পেরেছিল। কোকিলের কুহুস্বরে ইংরেজ কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের মনও বিমোহিত। কোকিলের কণ্ঠস্বর পঞ্চম স্থানে না থাকলে এমনটা হ'ত কিনা—কে বললে পারে?

শ্রীদেড়কড়ি শর্ম্মা।

---

(৩১) ক-বর্গ, চ-বর্গ, ট-বর্গ, ত-বর্গ ও প-বর্গ।

(৩২) অন্নদাতা, ভয়ত্রাতা, শিক্ষক (বা মতান্তরে শ্বশুর), জনক ও উপনেতা।

(৩৩) অহল্যা, দ্রৌপদী, কুন্তি, তারা ও মন্দোদরী।

(৩৪) মনুষ্যহত্যাকারী, তস্কর, পরস্ত্রীধর্ষণকারী, কটুবাদী ও মিথ্যাবাদী।

প্রশ্ন

যবনিকা-অন্তরালে দৃষ্টি তব পাবে কি দেখিতে—
এখনো অনেক বাকি শেষ হতে 'সেকালের কথা.'
পুরানো সংবাদ-পত্র আজো গুপ্ত রয়েছে নিভৃতে
সন্ধান মিলিলে তার ওপারে জাগিবে ব্যাকুলতা ?
পুরাতন পাঠাগারে লুক্কায়িত ধূলি ও জঞ্জালে
'সমাচার দর্পণে'র কীটদষ্ট অনেক ফাইল,
দেহেতে অশক্ত তবু এরে ওরে বসাইয়া হালে
এখনো দিবে কি পাড়ি জলপথে হাজার মাইল
"কবি"র সন্ধানে যথা পূর্বগামী খ্যাত গুপ্তকবি ?
মৃত্যুর সপ্তাহ আগে তুমি পেয়ে যাঁর 'প্রভাকর'
সম্পূর্ণ করিয়া দিলে 'সাময়িক-পত্রে'র যে ছবি
তারি "কপি" হাতে নিয়ে বেদনায় কাঁদিছে অন্তর।
যে "সাধক" গাঁথা আজো পড়ে নাই "চরিতমালা"য়
ও-পারে তাঁহারা যদি তোমারে জানান আবেদন,
মোদের প্রেরণা দিয়ে তোমারি এ স্মরণশালায়
তাঁহাদের স্থান দিতে তুমি কি করিবে আয়োজন ?
আমরা প্রস্তুত আছি—তুমি কবে পাঠাবে আদেশ,
একে একে ঘুচাইবে জীবন-মৃত্যুর অন্তরাল।
কিংবা কালো যবনিকা, এই সত্য, এই তব শেষ,
মহাকাল চিরমৌন জীর্ণ করি সেকাল-একাল ?

আগামী অগ্রহায়ণ সংখ্যা "ব্রজেন্দ্রনাথ-সংখ্যা"-রূপে প্রকাশিত হইবে।

সংবাদ-সাহিত্য

পূজার ছুটি অর্থাৎ বিজয়ার পরে আমাদের পাঠক ও সুহৃদ্মণ্ডলীকে শুভেচ্ছা জানাইতে গিয়া সর্বাগ্রে অকস্মাৎ-বজ্রাঘাততুল্য অতিশয় মর্মঘাতী ক্লেশকর দুঃসংবাদ জ্ঞাপন করিতে হইতেছে—আমাদের ত্রয়োত্রিংশ বৎসরের জীবনে পূর্ণ বাইশ বৎসরের অকৃত্রিম সহায় ও সুহৃৎ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অকালে আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। গত ১৭ই আশ্বিন শুক্রবার (৩রা অক্টোবর) কোজাগরী লক্ষ্মীপূজার পর ভাসানের দিন রাত্রি সাড়ে এগারোটায় নিদারুণ হৃদ্‌রোগে তাঁহার অক্লান্ত কর্মময় জীবনের অবসান ঘটিয়াছে। তাঁহার জীবনের সকল আরব্ধ কাজ সমাপ্ত হয় নাই, তথাপি তিনি একক বাংলার সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক সমাজকে যে সম্পদ সন্ধান আহরণ ও সংগ্রহ করিয়া দান করিয়া গিয়াছেন, পরিমাণ ও মূল্যের দিক দিয়া তাহা বিপুল; কোনও একজন বাঙালী আজ পর্যন্তও তাঁহাকে অতিক্রম করিতে পারেন নাই, কোনও কালে পারিবেন কি না সন্দেহ। তিনি নিঃস্ব দরিদ্রের গৃহে নিতান্ত সহায়সম্পদহীন অবস্থায় মানুষ হইলেও নিজের নিষ্ঠা ও আগ্রহের জোরে সমগ্র দেশে প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছেন এবং আচার্য যোগেশচন্দ্র রায়, আচার্য যদুনাথ সরকার, রাজশেখর বসু প্রমুখ সুধীগণের শ্রদ্ধা ও প্রীতি আকর্ষণ করিয়া তাঁহাদের স্থায়ী বন্ধুত্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। তাঁহার জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি "সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা"। এই মণিহারের অচ্ছেদ্য গ্রন্থিরূপে তিনি স্বয়ং চিরকাল বিরাজ করিবেন তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎকে তিনি ঘোর দুর্দিনে বুক দিয়া রক্ষা করিয়াছিলেন, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎও তাঁহার চিরজীবনের সাধনালব্ধ গ্রন্থরাজিকে রক্ষা করিয়া চলিবেন—এ বিশ্বাস আমাদের আছে। আত্মবিস্মৃত বাঙালীর পূর্ব-পুরুষগণের ঐতিহ্য স্মরণ করাইবার কাজে তিনি আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। শুধু সেই কৃতজ্ঞতায় বাঙালী জাতি চিরদিন তাঁহাকে স্মরণ করিবে। 'শনিবারের চিঠি'র একান্ত দুর্ভাগ্য অন্যতম সুহৃৎ মোহিত-

লালের চিরবিদায়-দুঃখ মর্মে বিঁধিয়া থাকিতে থাকিতেই ব্রজেন্দ্রনাথও বিদায় লইলেন। মাত্র তিন মাসের ব্যবধানে মৃত্যু-স্মরণ-সংখ্যার আয়োজন অতিশয় দুঃসহকর। এই দুঃখকর কার্য আমাদিগকে করিতে হইতেছে। অগ্রহায়ণ সংখ্যা "ব্রজেন্দ্র-স্মৃতিসংখ্যা"রূপে প্রকাশিত হইবে। বিভিন্ন মনীষী ও শিল্পীর চোখে তাঁহার বহুমুখী জীবন কি ভাবে প্রতিভাত হইয়াছে, তাহারই যৎসামান্য আভাস দিবার চেষ্টা এই সংখ্যায় থাকিবে। তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনী ও সম্পূর্ণ গ্রন্থপঞ্জী এবং সম্ভব হইলে রচনাপঞ্জী দেওয়া হইবে।

—

আজ হইতে ঠিক পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতার বাগবাজার পল্লীর এক সঙ্কীর্ণ গলিতে নিজের ক্ষুদ্র বাসগৃহে এদেশীয় নারীদের শিক্ষার জন্য ভগিনী নিবেদিতা একটি সামান্য বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি স্বয়ং বিদ্যালয়টিকে নয় বৎসর লালন করিয়াছিলেন। তাহার পর আরও একচল্লিশ বৎসর নানা প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তির সহায়তায় সেই ক্ষুদ্রায়তন শিক্ষালয়টি বিস্তৃতি ও প্রসিদ্ধি অর্জন করিয়া ৫নং নিবেদিতা লেনে নিজস্ব সুবৃহৎ ভবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। নিবেদিতা-বালিকা-বিদ্যালয়ের এই বৎসর সুবর্ণজয়ন্তী বৎসর। ভগিনী নিবেদিতার আদর্শ অনুযায়ী ইহাকে সম্পূর্ণাঙ্গ করিয়া গড়িয়া তুলিতে এখনও বহু অর্থ ও বহু পরিশ্রমের প্রয়োজন। স্বাধীন জাতীয় সরকার ও সহৃদয় দেশবাসীর দৃষ্টি সেই দিকে আকর্ষণ করিয়া আমরা এই সুযোগে সেই পুণ্যবতী বৈদেশিক মহিলাকে সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করিতেছি, যিনি ভারতবর্ষকে সম্পূর্ণ আত্মনিবেদন করিয়া "নিবেদিতা" হইয়াছিলেন।

মিস মার্গারেট ই. নোব্‌ল আইরিশ পিতামাতার সন্তান। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই অক্টোবর সোমবার (১২ই কার্তিক, ১২৭৪) ডুঙ্গান্নন, টাইরোনে (Dungannon, Co. Tyrone) তাঁহার জন্ম হয়। পিতা স্যামুয়েল রিচ্‌মণ্ড্‌ নোব্‌ল ইহারই অব্যবহিত পরে ল্যাংকাশায়ার

ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট কলেজে কংগ্রিগেশনাল মিনিস্ট্রির পাঠ সমাপ্ত হইবার পূর্বেই মাত্র চৌত্রিশ বৎসর বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হন। বিধবার তিনটি সন্তানের জ্যেষ্ঠ মার্গারেট দেশের শিশুদের শিক্ষা বিষয়ে বাল্যকাল হইতেই বিশেষ আগ্রহশীল ছিলেন, তিনি ওই বৃত্তিই শিক্ষা করিতে থাকেন। তখন লণ্ডনে শিশুশিক্ষাপদ্ধতির আমূল সংস্কার সাধন করিবার জন্য কয়েকজন মনস্বী সোৎসাহে চেষ্টা করিতেছিলেন। মার্গারেট উত্তর-ইংলণ্ডে শিক্ষকতার শিক্ষা লইতে লইতে ইঁহাদের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসেন। শিক্ষাশেষে নিজে কয়েকটি শিশু-বিদ্যালয়ে হাতে-কলমে নূতন পদ্ধতি অবলম্বনে শিক্ষাদান করিয়া মার্গারেট যশস্বী হন এবং একজন ডাচ মহিলার নজরে পড়েন। ইনি দক্ষিণ-লণ্ডনের শহরতলীতে তখন আধুনিক পদ্ধতির একটি বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। মার্গারেট সেখানে যোগদান করিয়া আরও দক্ষতা অর্জন করেন এবং ১৮৯২ সালে মাত্র পঁচিশ বৎসর বয়সে সম্পূর্ণ নিজের দায়িত্বে ও পরিচালনায় উইম্‌ব্‌ল্‌ডনে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। তিনি ফ্রবেলের (Frobel) আদর্শ ঘনিষ্ঠভাবে অনুসরণ করিতেন এবং পেস্টালৎসি(Pestalozzi)পন্থী অথচ মৌলিক গবেষণাকারী একজন ইংরেজ শিক্ষকের কাছে সে পদ্ধতিও শিক্ষা করিয়াছিলেন। উইম্‌ব্‌ল্‌ডনে মার্গারেটের চারিপাশে নূতন আদর্শে অনুপ্রাণিত তরুণ-তরুণীদের ভিড় জমিতে থাকে এবং এই অনুসন্ধিৎসুদের কেন্দ্রস্থলে তিনি নেতা ও পথপ্রদর্শকরূপে বিরাজ করিতে থাকেন। উইম্‌ব্‌ল্‌ডনে নিজের বিদ্যালয়ে তিনি বালিকাদের শিক্ষা এমন উদার এবং সুন্দর ভিত্তির উপর স্থাপন করিয়া পরিচালনা করিতে থাকেন যে, তাঁহার নামের সহিত যুক্ত হইয়া এই পদ্ধতি খ্যাতি ও বিস্তার লাভ করিতে থাকে। তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া যে আধুনিক দল প্রায়শই সম্মিলিত হইয়া সাহিত্য, শিক্ষা, সমাজ, নীতি-বিজ্ঞান (Ethics) প্রভৃতি বিষয়ে আত্মপ্রত্যয়সম্পন্ন নূতন মতবাদ আলোচনা ও প্রচার করিতেন, তাঁহারাই শেষে কর্মক্ষেত্রে অবতরণ করিয়া ইংলণ্ডের শিক্ষা বিষয়ে বহু

ওলট-পালট ঘটাইয়াছেন। এই সংস্কারস্পৃহার উদ্যোক্তা ছিলেন মার্গারেট নোব্‌ল এবং তাঁহার অপেক্ষা এই ব্যাপারে গোঁড়া ও বেদী কর্মী আর কেহ ছিলেন না। তাঁহার উৎসাহ উদ্দীপনা ও কর্মপ্রেরণার ফলে ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডনে "দি সিসেম ক্লাব" স্থাপিত হয়। সামাজিক সংস্কারসাধক ও নূতনত্ববিধায়ক প্রতিষ্ঠান লণ্ডনে ইহাই প্রথম এবং নানা শাখায় দ্রুত বিস্তৃতি লাভ করিয়া ইহা অদ্যাপি কার্যকরী আছে। বলা বাহুল্য নেত্রীস্থানীয়া মার্গারেটের নিজের শিক্ষাসংস্কারপ্রবণতার জন্য এই সমিতির কার্যকলাপ এখন পর্যন্ত শিক্ষা ব্যাপারেই মূলত নিবদ্ধ আছে।

মিস মার্গারেট নোব্‌লের প্রথম জীবনের কৃতিত্ব এত বিশদ করিয়া বলিবার কারণ এই যে, অনেকের ধারণা—স্বামী বিবেকানন্দ একজন সাধারণ শিক্ষিতা সরলা বালিকাকে কথার জোড়ে মুগ্ধ করিয়া ভারতবর্ষমুখী করিয়াছিলেন। প্রকৃত পক্ষে তাঁহার তুল্য উচ্চশিক্ষিত স্বাধীনচিন্তার মানুষ তৎকালীন ইংলণ্ডীয় পুরুষ-সমাজেও বিরল ছিল। তাঁহার বুদ্ধির মার্তণ্ড-তেজ ও প্রতিভার বিদ্যুৎ-চমকের কথা তো স্বতন্ত্র; সে তাঁহার একান্ত নিজস্ব ছিল—তাঁহার ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে দুইটি মাত্র সাক্ষ্য এখানে উপস্থিত করিতেছি, ইহা হইতেই সিস্টার নিবেদিতা মানুষটিকে সহজেই বোঝা যাইবে। দুঃখের বিষয়, সাক্ষ্য দুইটি এমন ইংরেজীতে লেখা যাহার অনুবাদ দিতে আমরা অক্ষম। সুতরাং মূলেই উদ্ধৃত করিতেছি। প্রথমটি প্রসিদ্ধ অধ্যাপক প্যাট্রিক গেড্‌ডেসের, দ্বিতীয়টি বিশ্ববিখ্যাত সাংবাদিক ও রাজনীতিক এইচ. ডব্লু. নেভিন্‌সনের। গেড্‌ডেস বলিতেছেন :

"The whole personality of Nivedita—her face, her voice, her changing moods and daily life, were ever expressing the alternating reaction of outward environment and inward spirit which goes on throughout the individual and social life. She was open at once to the concrete and the abstract, to the scientific and the philosophic, and her many moods were in perpetual interplay—sparkling with keen observation,

with humourous or poetic interpretation, or, opal-like, suffused with mystic light, aflame with moral fire. All came out in her talks, her occasional lectures—each a striking improvisation—now in gentlest persuasiveness leading her audience into sympathetic understanding, or even approval, of some aspect or feature of Indian life, unknown or perhaps repellent before; or again, bursting into indignant flash and veritable thunder upon our complacent and supercillious British philistinism......This union of sense and symbol, which we too easily let slip apart, was even with her. Thus of our many memory portraits, none comes back more vividly than of her in autumn twilight, now crooning, now chanting, the *Hymn to Agni* over the glowing, dying embers of a garden-fire. Strange though the words were, we still hear the refrain. It was the tongue, the music, of Orient in Occident, the expression of spirit in nature—a face, a voice, aglow with energy, at peace with night."

কর্নেল নেভিনসনের সাক্ষ্য :—

"It is as vain to describe Sister Nivedita in two pages as to reduce fire to a formula and call it knowledge. There was, indeed, something flame-like about her and not only her language but her whole vital personality often reminded me of fire. Like fire, and like Shiva, Kali, and other Indian powers of the spirit, she was at once destructive and creative, terrible and beneficent. There was no dull tolerance about her, and I suppose no one ever called her gentle."

এই কঠিন রুদ্র-প্রকৃতি, সুতীক্ষ্ণ তরবারির মত বিপদসঙ্কুল, অষ্টবিংশতিবর্ষীয়া আত্মপ্রত্যয়পূর্ণ, শ্রীমতী মিস মার্গারেট নোব্‌ল ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে এক শান্ত শীতল রবিবাসরীয় অপরাহ্নে লণ্ডনের অভিজাত-পল্লী ওয়েস্ট এণ্ডের এক ড্রইংরুমে মাত্র চোদ্দ-পনের জন ঘনিষ্ঠ বন্ধুর সঙ্গে সর্বপ্রথম স্বামী বিবেকানন্দের সংস্পর্শে আসেন। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের চিকাগো-ধর্মসভায় ঐতিহাসিক বক্তৃতা দিয়া স্বামীজী তখন লণ্ডনেও পরিচিত হইয়াছেন এবং ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে সবে লণ্ডনে পৌঁছিয়া এখানে-ওখানে বেদান্ত-বিষয়ক বক্তৃতা শুরু করিয়াছেন। প্রথম দর্শনেই যে ভবিষ্যতের নিবেদিতা আত্মনিবেদন

করেন নাই, সংশয় ও সন্দেহ যে রূঢ় ও কঠিন প্রশ্নবাণ ও উদ্ধত জবাবের কারণ হইয়াছিল, 'দি মাস্টার অ্যাজ আই স হিম' পুস্তকের পাঠক মাত্রেই তাহা অবগত আছেন। নিবেদিতা স্বয়ং বলিতেছেন, "স্মরণ ক'রে আমি আশ্চর্য হয়ে যাই এবং এ কথা না ভেবেও পারি না যে, নিশ্চয়ই আমার সৌভাগ্যগুণেই এমন ঘটেছিল যে ১৮৯৫ ও ১৮৯৬ দু বছরেরই ইংলণ্ড-অভিযানে আমার গুরুদেব স্বামী বিবেকানন্দের উপদেশ কয়েক বার শোনা সত্ত্বেও ব্যক্তিগতভাবে তাঁর সম্বন্ধে কিছুই জানতাম না; ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ায় যখন আমি ভারতে এলাম, তখনই তাঁকে জানলাম।" ইহা হইতেই প্রমাণ হয়, প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বশে নয়, সম্পূর্ণ নিজের অজ্ঞাতসারেই এই কঠোর-যুক্তিবাদী মনে ভাঙন ধরিয়াছিল এবং তিনি গুরুকে না জানিয়াই তাঁহার এবং তাঁহার প্রিয় বস্তুর সেবায় আত্মোৎসর্গ করিবার জন্য ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন। এ বিষয়ে প্রসিদ্ধ সাংবাদিক "নিবেদিতা-স্মরণে"র লেখক এস. কে. র‍্যাটক্লিফ লিখিয়াছেন: "তিনি (নিবেদিতা) যদিও সে সময়ে উপলব্ধি করিতে পারেন নাই—স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ঠিক লক্ষ্যভেদ করিয়াছিল। তাঁহার উক্তির তিনি প্রতিবাদ করিয়াছিলেন, আলোচনা-সভায় 'যুদ্ধং দেহি' বলিতে কুণ্ঠিত হন নাই, এবং লণ্ডনের মজলিসগুলিতে এমন কঠিনতম প্রতিবন্ধক আর কেহ সৃষ্টি করেন নাই। কিন্তু ইহা স্পষ্ট যে গোড়া হইতেই তাঁহার (স্বামীজীর) প্রভাব জয়ী হইতেছিল।"

ভারতবর্ষে পদার্পণ করিয়াই সিস্টার নিবেদিতা তাঁহার আশৈশব-প্রিয় পন্থাই গুরুসেবায় অনুসরণ করিতে মনস্থ করিলেন। ভারতীয় নারীদের শিক্ষাদানই তাঁহার একমাত্র লক্ষ্য হইল। এই বিষয়েও তাঁহার গুরুর ইঙ্গিত স্পষ্ট ছিল—

"He was resolved to initiate some definite agency for the education of Indian women. This last was the part of his programme which, from an early stage of their acquaintance, Swami Vivekananda seems to have marked out as the special work of Margaret Noble ; and

before he left England, at the end of 1896, she had come to recognise the call."—Ratcliffe.

বৎসরাধিক কাল পরেই (১৮৯৮ জানুয়ারি) মিস নোবল কলিকাতায় পদার্পণ করিয়া কিছুদিন কয়েকজন আমেরিকান বন্ধুর সঙ্গে বেলুড়ে অতিবাহিত করেন এবং অনতিবিলম্বে "নিবেদিতা" নামে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-মণ্ডলীভুক্ত হন। ওই বৎসর মে হইতে অক্টোবর স্বামীজীর সঙ্গে তিনি উত্তর-ভারতে কুমায়ুন ও কাশ্মীরে অমরনাথ পর্যন্ত তীর্থযাত্রা করিয়া আসেন। কলিকাতায় ফিরিয়া ওই বৎসরেরই কালীপূজার দিনে তিনি উত্তর-কলিকাতার এক পল্লীতে তাঁহার বাঞ্ছিত বিদ্যালয় স্থাপনে চেষ্টিত হন, কিন্তু নানা সামাজিক বাধায় কাজ অগ্রসর হয় না। মাস তিনেক কোনও ক্রমে চলিয়াই উহা বন্ধ হইয়া যায়। ১৮৯৯ সালের জুন মাসে নিবেদিতা ইউরোপ ও আমেরিকা পরিভ্রমণেও স্বামীজীর সহযাত্রিণী হন; ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের শেষের দিকে স্বামীজী স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন, নিবেদিতা ইংলণ্ডে ভারতবর্ষের মর্মবাণী উদ্‌ঘাটনে ও প্রচারে এবং শিক্ষাসম্পর্কে নূতন জ্ঞানলাভে নিযুক্ত থাকিয়া ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ায় কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। ৪ঠা জুলাই স্বামীজী বেলুড়-মঠে দেহরক্ষা করেন। অনতিকাল মধ্যে ভগিনী নিবেদিতা আমেরিকান গুরুভগ্নী ও সহকর্মী মিস ক্রাশ্চিন গ্রীণষ্টীডেলের সঙ্গে মিলিত হইয়া বাগবাজার বোসপাড়া লেনের বাড়িতে তাঁহার চিরজীবনের আকাঙ্ক্ষিত ও গুরুর অভিপ্রেত বালিকা-বিদ্যালয়টি স্থাপন করিয়া সোৎসাহে স্বীয় পদ্ধতিতে ভারতীয় নারীদের শিক্ষাদানকার্যে ব্যাপৃত হন। ১৯০৫-এর গোড়ায় কঠিন ব্যাধিতে তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হয় এবং ভগ্নস্বাস্থ্য লইয়াই ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে শরৎকালে পূর্ববঙ্গে দুর্ভিক্ষ ও বন্যা সম্বন্ধে অনুসন্ধান ও তাহা নিবারণের পন্থা আবিষ্কারে ব্যাপক ভ্রমণের ফলে তাঁহার সবল সুগঠিত দেহ একেবারেই ভাঙিয়া পড়ে। জীবনের শেষ তিন বৎসর তিনি ইংলণ্ড ও আমেরিকায় কাটাইয়া ১৯১১ সালের শরৎকালে কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন এবং পূজার ছুটি যাপনের জন্য

দার্জিলিং যান। সেখানেই আচার্য জগদীশচন্দ্রের গ্রীষ্মাবাসে ১৩ই অক্টোবর শুক্রবার (২৬ আশ্বিন ১৩১৮) তাঁহার মৃত্যু হয়। আর মাত্র পনের দিন বাঁচিয়া থাকিলে তাঁহার জীবনের চুয়াল্লিশ বৎসর পূর্ণ হইত।

১৯০২ হইতে ১৯০৮ মাত্র এই সাত বছর ভারতবর্ষে ভগিনী নিবেদিতার কর্মময় জীবন; মেয়েদের শিক্ষা-পরিচালনা ছাড়াও এই কয় বৎসরে বৈপ্লবিক স্বদেশী-আন্দোলন নিয়ন্ত্রণে, ভারতীয় চিত্রশিল্প ও ভাস্কর্যের পুনর্জাগরণে, স্বদেশী কারুশিল্পের প্রবর্তনে, ভারতীয় ইতিহাসের পুনরুদ্ধারে এবং আমাদের প্রাকৃতিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রিক দুর্গতি দূরীকরণের কাজে যে বিপুল কর্মোদ্যম ও উৎসাহ-উদ্দীপনা তিনি দেখাইয়াছিলেন, তাহার তুলনা কোথাও মিলিবে না; মানসিক চিন্তা—বক্তৃতায় কথাবার্তায় ও লেখায় তাহার প্রকাশ ছাড়াও নিছক কায়িক পরিশ্রম তাঁহাকে যাহা করিতে হইয়াছিল তাহাও বিপুল। বাংলার স্বদেশী-আন্দোলনের নেতা ও নায়ক যাঁহারাই হউন, তাঁহার মানসিক ভাবনায় যে ইহা পরিপুষ্ট ও রূপপরিগ্রহ করিয়াছিল ইহা আজ সর্বজনবিদিত। জাপানী ওকাকুরার নাম এই সঙ্গে স্মরণীয়। রবীন্দ্রনাথ, শ্রীঅরবিন্দ, আচার্য জগদীশচন্দ্র, অবনীন্দ্রনাথ, আচার্য যদুনাথ, নন্দলাল, দীনেশচন্দ্র সেন প্রত্যেকে স্ব স্ব কীর্তির ক্ষেত্রে তাঁহার নিকট যে কতখানি ঋণী, তাহার ইতিহাস কোনও দিন প্রকাশিত হইবে কি না জানি না। শুধু রবীন্দ্রনাথের সাক্ষ্য হইতে আমরা ইহার প্রকৃতি ও পরিমাণ অনুমান করিতে পারি। তিনি বলিতেছেন: "আজ এই কথা আমি অসঙ্কোচে প্রকাশ করিতেছি তাহার কারণ এই যে, একদিকে তিনি আমার চিত্তকে প্রতিহত করা সত্ত্বেও আর একদিকে তাঁহার কাছ হইতে যেমন উপকার পাইয়াছি এমন আর কাহারো কাছ হইতে পাইয়াছি বলিয়া মনে হয় না। তাঁহার সহিত পরিচয়ের পর হইতে এমন বারম্বার ঘটিয়াছে যখন তাঁহার চরিত স্মরণ করিয়া ও তাঁহার প্রতি গভীর ভক্তি অনুভব করিয়া আমি প্রচুর বল পাইয়াছি।"

নিবেদিতার আকস্মিক মৃত্যুর পর অধ্যাপক ডক্টর চেইন (Prof. Cheyne, D. D,, D. Lit., F. B. A) বলিয়াছেন, "তিনি ছিলেন নক্ষত্রের মত, যদি সূর্যের মত বলিতে কাহারও আপত্তি থাকে, এবং এই সূর্য অস্তাচলে সম্পূর্ণ বিলীন হইবে ইহা দুঃখের কথা।" এই দুঃখ হইতে আমরা নিজেদের রক্ষা করিতে পারি যদি তাঁহাকে স্মরণে রাখি। এই মহিমময়ী নারীর প্রত্যক্ষ জ্যোতির্ময় মূর্তি চিরতরে অন্তর্হিত হইয়াছে সত্য, তাঁহার আবেগকম্পিত বজ্রনির্ঘোষও আমরা আর শুনিতে পাইব না, কিন্তু তাঁহার ইতস্ততবিক্ষিপ্ত অসংখ্য রচনাবলীর কিয়দংশ পুস্তকাকারে রক্ষিত হইয়া এখনও আমাদের আয়ত্তাধীন আছে। হাইনেম্যান, লংম্যানস্ প্রভৃতি প্রকাশক এতদিন অনুগ্রহ করিয়া সেগুলি প্রকাশ করিতেছিলেন, সম্প্রতি তাঁহারা ক্ষান্ত হওয়াতে উদ্বোধন ও অদ্বৈত আশ্রম সেগুলির পুনঃপ্রকাশে ব্রতী হইয়াছেন। এই পুস্তকগুলি শ্রদ্ধার সহিত পাঠ করিলে আমরা নিঃসন্দেহে বুঝিতে পারিব, ভারতবর্ষে আজ পর্যন্ত বহু বৈদেশিক মনীষী আগমন করিয়াছেন ও ভারতের সেবায় আত্মদান করিয়াছেন, কিন্তু এখন পর্যন্ত তাঁহার মত শক্তিশালী ও প্রতিভাসম্পন্ন কোনও বিদেশী মানুষই ভারতবর্ষের সহিত এমন একাত্ম হইয়া যাইতে পারেন নাই। তিনি ভারতবর্ষকে ভালবাসিয়া ও সম্মান করিয়া ভারতবাসীকে আত্মমর্যাদা দান করিয়াছেন। তাঁহার কীর্তির প্রত্যক্ষ প্রমাণ আজ কিছুই অবশিষ্ট নাই, শুধু আছে নিম্নলিখিত বইগুলি :

১। *Kali the Mother*. 1900, Swan Sonnenschein & Co. পুনঃপ্রকাশ ১৯৫০, অদ্বৈত আশ্রম।

২। *The Web of Indian Life*. May 1904, W. Heinemann, পুনঃপ্রকাশ ১৯৫০, অদ্বৈত আশ্রম।

৩। *Cradle Tales of Hinduism*. 1907, Longmans Green & Co.

৪। *Glimpses of Famine and Flood in East Bengal*. 1907, Indian Press, Allahabad.

৫। *An Indian Study of Love and Death.* 1908, Longmans Green & Co.

৬। *The Master as I saw Him.* London 1910, Longmans Green & Co., Calcutta 1910, Udbodhan Office.

৭। *The Civic and National Ideals.* Calcutta 1911, Udbodhan Office পুনঃপ্রকাশ অদ্বৈত আশ্রম।

৮। *Select Essays of Sister Nivedita.* Madras, 1911, Ganesh & Co.

৯। *Studies from an Eastern Home.* 1913, Longmans Green & Co.

১০। *Footfalls of Indian History.* 1915, Longmans Green & Co.

১১। *Religion and Dharma.* 1915, Longmans Green & Co. ১৯৫২ পুনঃপ্রকাশ, অদ্বৈত আশ্রম।

১২। *Hints on National Education in India.* 1918, Udbodhan Office.

১৩। *Siva & Buddha.* 1919, Udbodhan Office.

১৪। *Notes of Some Wanderings with the Swami Vivekananda.* 1922, Udbodhan Office.

১৫। *Kedar Nath & Badri Narayan.* 1926, Udbodhan Office.

১৬। *Lambs Among Wolves.* 1928, Udbodhan Office.

১৭। *Aggressive Hinduism.* 1929, Udbodhan Office.

এতদ্ব্যতীত *Myths of the Indo-Aryan Race* (Stories from the Mahabharata), *Essays on Indian Education, Manual Education, Project for the Ramkrishna Girls' School* প্রভৃতি কয়েকটি পুস্তক-পুস্তিকার নাম পাইতেছি, কিন্তু বই দেখি নাই। *The Teacher* নামক একটি শিক্ষাবিষয়ক পুস্তকের

সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি এখনও অপ্রকাশিত আছে। নিবেদিতার মৃত্যুর পরে *Empire* সম্পাদক এ. জে. এফ. ব্লেয়ার লিখিয়াছিলেন, "Like all great souls, however, she towered above, and domininated all her works. She was far greater than they." তথাপি অপরিচয়ের অজ্ঞতা সত্ত্বেও আমরা বলিব, তাঁহাকে যখন ধরিয়া রাখিতে পারি নাই, তাঁহার কীর্তিগুলিকে রক্ষা করিয়াই আমরা তাঁহার সম্মান করিব—তাঁহার আজও-পর্যন্ত-পুস্তকাকারে-অপ্রকাশিত রচনাগুলি প্রকাশ করিব, অধুনালুপ্ত পুস্তকগুলির পুনঃপ্রচার করিব, এবং সর্বোপরি তাঁহার স্থাপিত বিদ্যালয়টির যথাসাধ্য উন্নতি বিধান করিব। নিবেদিতা-বালিকা-বিদ্যালয়ের স্বর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে সেই সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে।

ভগিনী নিবেদিতা এক মহতের আকর্ষণে ভারতবর্ষে আসিয়া ভারতবর্ষের মাটিকে 'মা' এবং মানুষকে 'ভাই' বলিয়া অন্তরে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার মনের মধ্যে কোনও ফাঁকি, কোনও সংশয় ছিল না। জন্মান্তরের কোনও সংস্কার ইহার অন্তরালে কাজ করিয়াছিল কি না জানি না, তিনি আসিয়া অবধি হীনতা-দীনতা-অশিক্ষা-কুসংস্কার-নোংরামির পঙ্কে নিমজ্জিত ভাই ও ভগিনীদের উদ্ধার করিবার কাজে আত্মনিয়োগ করিলেন,—দৈহিক সুখ গেল, আরাম গেল, পূর্বসংস্কার সকলই একে একে বিসর্জন করিলেন, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের জপমালা হাতে লইয়া তিনি ভারতের নবজাগরণের সাধনা করিলেন। অশিক্ষিত নারীদের শিক্ষা সেই সাধনার প্রথম ও প্রধান পদক্ষেপ, রচনার মধ্য দিয়া ভারতের মর্মবাণী প্রচার দ্বিতীয় পদক্ষেপ, বাংলার স্বদেশী, ভারতীয় চারুশিল্প, লোকসাহিত্য ইত্যাদির উন্নতি ও বিস্তার পরিকল্পনা আনুসঙ্গিক ভাবে আসিয়াছে। যাঁহারা তাঁহাকে দেখিয়াছেন তাঁহারা সকলেই বলিয়াছেন, তাঁহার মধ্যে পবিত্র আগুন ছিল, সেই আগুনের কতকটা স্পর্শ তাঁহার রচনাগুলির মধ্যে এখনও আমরা পাইয়া গ্লানিমুক্ত ও পবিত্র হইতে পারি।

তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিতে বসিয়া বাংলা দেশের আর এক মহিয়সী নারীর মুখে—লেডি অবলা বসুর মুখে তাঁহার শেষ বিদায়-ক্ষণটির যে শান্তসমাহিত বর্ণনা শুনিয়াছি (মডার্ন রিভিউ, ১৯১১ নবেম্বর) তাহা স্মরণ হইতেছে—১৩১৮ সালের সেই ২৬ আশ্বিনের সকাল :

"মেঘে ও কুয়াশায় সম্পূর্ণ সমাচ্ছন্ন দিনগুলি—শুধু ১৩ই অক্টোবরের প্রভাতে মেঘের আবরণ ঈষৎ যেন উন্মোচিত হইল। নিমজ্জমান জীর্ণ তরীখানির কথা উল্লেখ করিয়া সঙ্গে সঙ্গেই বলিলেন, তিনি সূর্যোদয়ের প্রতীক্ষায় আছেন। তুষাররাশির ঊর্ধ্বে সূর্য সবে উদিত হইতেছিলেন। তাঁহারই একগোছা রশ্মি যখন তীরের মত ছুটিয়া ঘরে প্রবেশ করিতেছিল ঠিক তখনই সেই মহান্ উন্মুখ আত্মা অন্য কোনও প্রত্যুষে জাগরণের আশায় যাত্রা করিলেন। তাঁহার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া থাকিতে থাকিতেই হৈমবতী উমার যে কাহিনী তিনি নিজে বলিয়াছিলেন তাহাই আমার সম্মুখে স্পষ্ট প্রতিভাত হইল। এই তো তাঁহার পিতৃগৃহে আগমনের কাল। আর ইনিও তো আর এক উমা, শ্বেতবরণী তুষারকন্যা, সুদীর্ঘ বিচ্ছেদের পর ভারতবর্ষে তাঁহার আপন গৃহে ফিরিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার আপন জনকে জানিবার জন্য এবং আপন জনের কাছে আসিবার জন্য তিনি কি এই জন্মান্তরের প্রতীক্ষায় ছিলেন ?"

রবীন্দ্রনাথও তাঁহাকে বলিয়াছেন সতী—"শিবের প্রতি সতীর সত্যকার প্রেম ছিল বলিয়াই তিনি অর্ধাশনে অনশনে অগ্নিতাপ সহ্য করিয়া আপনার অত্যন্ত সুকুমার দেহ ও চিত্তকে তপস্যায় সমর্পণ করিয়াছিলেন।" জন্মান্তরে কোথায় সতীর পুনরভ্যুদয় হইয়াছে জানি না, তাঁহার আরব্ধ কর্মকে, তাঁহার স্বাধীন জীবনের স্বপ্নকে এবং সমর্পিত জীবনের সাধনাকে সম্পূর্ণ ও সর্বাঙ্গসুন্দর করিয়া ভারতবাসী কি তাঁহার আত্মার তৃপ্তি বিধান করিবে না ?

প্রত্যেক মানুষের মধ্যে একটি বানর অথবা অনুরূপ কোনও ইতর প্রাণী বাস করে। যাঁহারা মহৎ এবং অসাধারণ, তাঁহারা সেটাকে সর্বদা শাসনে রাখেন—সাধারণ মানুষেও রাখেন, কিন্তু স্নানাগারে বা শৌচাগারে অথবা আয়নার সম্মুখে একক দাঁড়াইয়া নানা বিকৃত আওয়াজ ও বিচিত্র মুখভঙ্গির সাহায্যে বানরটাকে একটু প্রশ্রয় দিয়া শান্ত করেন। যে বাড়িতে ছোট ছোট ছেলেমেয়ে আছে, অথবা একটা দামাল শিশু আছে, সে বাড়ির মানুষেরা সহজেই চেঁচাইয়া হল্লা করিয়া শিশুকে বিবিধ অঙ্গভঙ্গি সহ খেলা দিয়া মর্কটবৃত্তি চরিতার্থ করিবার সুযোগ পান, পারিবারিক ও পাড়াপ্রতিবেশীর সহিত কলহ-বিবাদেও অনেকে অল্প আয়াসে এই আদিম রোগমুক্তির ব্যবস্থা করেন। যেমন ব্যক্তির মধ্যে তেমনই সমবেতভাবে সমাজের মধ্যেও বানর বাস করে। সমাজগত ভাবে যথেচ্ছ আত্মপ্রকাশের সুযোগ দিয়া মাঝে মাঝে ইহাদিগকে ঠাণ্ডা রাখিবার ব্যবস্থা প্রয়োজন। পূর্বে পল্লীতে পল্লীতে বারোয়ারী আসরে, বাজারে, চৌরাস্তার মোড়ে বা গ্রামসীমান্তে সঙ পাঁচালী চপ বাই খেমটা প্রভৃতির প্রচলন ছিল, সামাজিক বানরেরা সেখান হইতেই মানুষ হইয়া ঘরে ফিরিবার অবকাশ পাইত। কলিকাতার মত শহরেও যতদিন সমাজপতিদের শাসন ছিল, তাঁহারা বেশ্যাপল্লীতে সরস্বতী ও কার্তিক পূজার ব্যবস্থা দিয়া সমাজের বানর-অংশের যত্র-তত্র ও যখন-তখন আক্রমণ হইতে সমাজকে রক্ষা করিতেন। "বাবু" সম্প্রদায় নিতান্ত অপ্রয়োজনে এই সকল পূজার নামে মাতামাতি করিয়া শুদ্ধ শান্ত হইয়া আসিতেন, প্রয়োজনেও অবশ্য নিঃসন্তান ধনীরা ভদ্রপল্লীর মধ্যে ঘটা করিয়া কার্তিক পূজা করিতেন। বিংশ শতাব্দীর প্রথম মহাযুদ্ধের পরে বেশ্যাপল্লী যখন আর নির্দিষ্ট রহিল না, তখন যেখানে-সেখানে গলিতে গলিতে সরস্বতী সাজাইয়া পূজার নামে নাচ-গান-হল্লার মধ্য দিয়া বানর-শান্তির ব্যবস্থা স্বতই হইল, তরুণ সমাজ কর্তৃক ব্যাপক সরস্বতী পূজার ইহাই ইতিহাস। সেকালের বিদ্যাধরীরা জনসাধারণকে গ্রাম্য ছড়ায় নিম্নলিখিত মর্মে নিমন্ত্রণ

করিতেন, "পিতাকে যিনি পতি করিয়াছিলেন আমি তাঁহার পূজা করিব, আপনার নিমন্ত্রণ রহিল।" বাবুরা দলে দলে যাইতেন, সারারাত ভাল ভাল গান-বাজনার সঙ্গে বাঁদরামি বেলেল্লাগিরি যাহা খুশি করিয়া গঙ্গাস্নানান্তে ঘরে ফিরিতেন। সাপও মরিত, লাঠিও ভাঙিত না। তাহা ছাড়া দোললীলা একটা বড় সামাজিক সেফ্‌টি ভাল্‌ব ছিল, জামাইষষ্ঠীতে জামাই-ঠকানো রসিকতা এবং বিবাহ-বাসরে কিঞ্চিৎ আদিরসাশ্রিত ইয়ার্কিও ছিল। ইদানীং কার্তিক পূজা উঠিয়া যাওয়াতে দোলে ও সরস্বতী পূজায় কাজ হইতেছিল। হঠাৎ কিছুকাল হইতে দেখিতেছি সামাজিক মর্কট বাংলার জাতীয় পরম উৎসব দুর্গাপূজাকেও আক্রমণ করিয়াছে এবং এই বৎসর দেখিলাম মহাকালী পূজাও আক্রান্ত হইয়াছে। ইহাতে সামাজিক ও নৈতিক শাসনের অভাব সূচিত করে। সরস্বতীর হাতে নিরীহ বীণা ও হালকা পুস্তক। ভাসানের সময় তাঁহার মুখের উপর বিকৃত অঙ্গভঙ্গি সহ নাচিলে কুঁদিলে কুৎসিত গান গাহিলে তাঁহার দিক হইতে অন্তত কোনও ভয় নাই; তা ছাড়া তিনি জন্মকাল হইতেই বহুর মনোরঞ্জন-প্রয়াসী, রুচি একটু আধটু নামিলে দোষ হয় না। কিন্তু মা দুর্গা ও মা কালী? তাঁহাদের হাতে প্রাণঘাতী অস্ত্র, ছেলেরা তাঁহাদিগকেও সম্ভ্রম করিতেছে না, সামাজিক বানরকে বড্ড বেশি প্রশ্রয় দেওয়া হইয়াছে। মা-কালীর সামনে চলমান লরিতে সেদিন শিক্ষিত ছেলেরা যে কদর্য কুৎসিত অঙ্গভঙ্গি ও মুখখিস্তি করিল তাঁহার খড়্গের এতটুকু মাহাত্ম্য থাকিলে তাহা হইতে পারিত না। ময়লা-নিকাশের পয়ঃপ্রণালী পল্লীতে নির্দিষ্ট থাকিলেও রাস্তা ঘাট সব জায়গা দিয়াই যদি আবর্জনা গড়াইয়া যাইতে থাকে, তাহা হইলে ভদ্র ব্যক্তির যে মুশকিল হয় কলিকাতাবাসীর তাহা হইয়াছে। বানরটাকে কোন্ পথে সামলাইবেন, চিন্তাশীল ব্যক্তিদের এখন তাহাই চিন্তার বিষয়। আর এক কথা, আগে বাজীকরণে যে সামাজিক দুষ্প্রবৃত্তি প্রশমিত হইত, আজকাল বাজি পোড়াইয়া যুবকেরা তাহা করিতে চাহিলে চলিবে কেন? ফলে দক্ষিণেশ্বরের পবিত্র মন্দির-প্রাঙ্গণে

ছুঁচোবাজির ঠেলায় মেয়েদের প্রাণান্ত হইতেছে, বাঁদরামি থাকিয়াই যাইতেছে। পুলিস সাময়িক ও স্থানীয় ভাবে ইহা দমন করিতে পারে, কিন্তু ইহা পুরাপুরি দমন করিতে হইলে জাতীয় নেতাদের অবহিত হওয়া প্রয়োজন—কলিকাতায় সমাজ যখন নাই!

—

বানর-প্রসঙ্গে মনে পড়িল সম্প্রতি সংবাদপত্রে কলিকাতার রিজিওনাল ফিল্‌ম সেন্সর বোর্ডের বিরুদ্ধে প্রত্যহই কিছু না কিছু অভিযোগ প্রকাশিত হইতেছে। বোর্ডের ক্ষমতা অপপ্রয়োগের যে সকল নিদর্শন দেওয়া হইতেছে, তাহা সত্যসত্যই মারাত্মক এবং ফিল্‌ম ইণ্ডাস্ট্রির পক্ষে ক্ষতিকর। অথচ বোর্ড ইণ্ডাস্ট্রির টাকায় পুষ্ট। বোর্ডের স্থানীয় কর্তা নিজেকে ইণ্ডাস্ট্রির বন্ধু বলিয়া থাকেন, কিন্তু যাহা বলা হইতেছে তাহা যদি অংশতও সত্য হয় তাহা হইলে তিনি কি রকম বন্ধু? বাল্যকালে হিতোপদেশে গল্প পড়িয়াছিলাম, এক ভদ্রলোকের একটি বানর বন্ধু ছিল। তিনি যেখানে থাকিতেন সেখানে মাছির বড় উপদ্রব। বন্ধু বানরের হাতে মাছি তাড়াইবার ভার দিয়া ভদ্রলোক একদিন নিশ্চিন্ত নিদ্রার সুযোগ লইতে চাহিলেন। মাছিরা উড়িয়া উড়িয়া তাঁহার চোখে মুখে নাকে আসিয়া বসিতে লাগিল। বানর বন্ধু হাত দিয়া মাছি তাড়াইবার ব্যর্থ চেষ্টা করিয়া শেষ পর্যন্ত দেওয়ালে টাঙানো তরবারি প্রয়োগ করিল। বন্ধুর কৃপায় ভদ্রলোক অচিরাৎ ক্ষতবিক্ষত রক্তাক্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। যেরূপ ব্যাপার শুনিতেছি, সেন্সার বোর্ডের বন্ধুত্বে বাংলা দেশের ফিল্‌ম ইণ্ডাস্ট্রির শেষ পর্যন্ত সেই ভদ্রলোকের অবস্থা না হয়।

—

বাঁদরামি যেখানে অবাধ সেখানে বই কিনিয়া পড়িবে কে? অথচ দেখিতেছি, লেখকেরা লিখিয়া চলিয়াছেন এবং প্রকাশকেরা ছাপাইয়া প্রকাশ করিতেছেন। দুই-তিন মাসেই অসংখ্য বই জমিয়া গিয়াছে। স্থানাভাবে ও সময়াভাবে আমরা সেগুলির প্রতি যথাকর্তব্য পালন

করিতে পারিতেছি না, সম্পাদকীয় টেবিলে বইয়ের গাদা জমিয়া ধুলা ও আরশোলার দ্বারা লাঞ্ছিত হইতেছে। এই জন্য লেখক ও প্রকাশকদের কাছে আমাদের বিনীত নিবেদন, তাঁহারা সমালোচনার্থ আর বই পাঠাইবেন না। যে যে বইয়ের কথা আমরা পাঠকদের শোনানো দরকার মনে করিব, সেগুলি আমরা চাহিয়া চিন্তিয়া অথবা কিনিয়া লইব। যদি এতদ্‌সত্ত্বেও কেহ বই পাঠান, নিজের দায়িত্বে পাঠাইবেন। সময় পাইলে নিশ্চয়ই পড়িব কিন্তু আমাদের কাছে অন্য দাবিদাওয়া থাকিবে না। ইহাই আমাদের শেষ কথা, লেখক ও প্রকাশকেরা অনুগ্রহপূর্বক স্মরণ রাখিবেন। স্মরণ রাখিবেন, কোনও বিবেকবান পাঠক মাসে এক বা দুইয়ের বেশি ভাল বই পড়িতে পারেন না এবং পড়িয়া সমালোচনা করিতে পারেন না; যাঁহারা বলেন পারেন, তাঁহারা ফাঁকি দেন অর্থাৎ মলাট সমালোচনা করেন। আমরাও বাধ্য হইয়া তাহাই করি।

যে সকল বই জমিয়াছে তন্মধ্যে যেগুলি বাঙালীর ঘরে ঘরে রাখা উচিত, নীচে সেগুলির একটি তালিকা প্রকাশ করিয়া আমাদের কর্তব্য এবারের মত সমাধা করিতেছি। আগামী বারে গল্প উপন্যাসের খবর দিয়া কর্তব্যটি চিরতরে শেষ করিব।

যে সকল বই সকলেরই সংগ্রহ করা উচিত :—

১। বিশ্ব-ইতিহাস প্রসঙ্গ, জওহরলাল নেহেরু, আনন্দ-হিন্দুস্থান প্রকাশনী, বহু মানচিত্র সম্বলিত ৯৪৬ পৃষ্ঠার বই। ভাল অনুবাদ।

২। প্রবন্ধসংগ্রহ ১ম খণ্ড, প্রমথ চৌধুরী, বিশ্বভারতী, অতুলচন্দ্র গুপ্তের ভূমিকা।

৩। বাংলা প্রবাদ, ২য় সং, সুশীলকুমার দে, এ মুখার্জী এণ্ড কোং, সূচীসহ প্রায় দশ হাজার প্রবাদ, ছড়া ও চলতি কথার সংগ্রহ, ৯৮৭ পৃ. আজ পর্যন্ত বৃহত্তম তালিকা। মূল্যবান ভূমিকা।

৪। শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা, ১ম, স্বামী গম্ভীরানন্দ, উদ্বোধন, চিত্রসহ পরমহংসদেবের সাক্ষাৎ সন্ন্যাসী শিষ্যদের (বারোজন)

সংক্ষিপ্ত জীবনকথা, উচ্ছ্বাসবর্জিত ঐতিহাসিক উপাদান, সকল নির্ভরযোগ্য তথ্য আছে।

৫। ঐ ২য়, ঐ, ঐ, আরও ২৯ জন সন্ন্যাসী গৃহী শিষ্য ও ভক্ত শিষ্যাদের সচিত্র জীবন-কাহিনী, এখন পর্যন্ত অনুসন্ধানে যতদূর জানা গিয়াছে সব খবরই সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদ হইতে আজ পর্যন্ত বাংলা দেশের আধ্যাত্মিক সাধনার বিচিত্র ইতিহাস।

৬। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, তমোনাশচন্দ্র দাশগুপ্ত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, প্রাচীনতম চর্য্যাপদ হইতে উনবিংশ শতাব্দীর পাঁচালী কবিগান পর্যন্ত, সাহিত্যের ইতিহাসের পরিপূরকভাবে সামাজিক ইতিহাস বিস্তৃতভাবে দেওয়া হইয়াছে। প্রায় ৮০০ পৃষ্ঠার সুবৃহৎ গ্রন্থ।

৭। প্রাচীন কলিকাতা পরিচয় কথায় ও চিত্রে, হরিহর শেঠ, ওরিয়েণ্ট বুক কোং, ৫৫০ খানি দুষ্প্রাপ্য চিত্র সম্বলিত প্রাচীন কলিকাতার বিচিত্র কাহিনী, অতিশয় সুখপাঠ্য। আচার্য যদুনাথের ভূমিকা, প্রায় ৮০০ পৃষ্ঠা।

৮। হর্ষচরিত, প্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর, রঞ্জন পাবলিশিং হাউস, বাণভট্টের অনুবাদ, গদ্য অনুবাদে মৌলিক রসসৃষ্টি বাংলা সাহিত্যে একমাত্র প্রবোধেন্দুনাথের কীর্তি, কাদম্বরীর পরে এই হর্ষচরিত একখানি পরিপূর্ণ গদ্য কাব্য। হর্ষবর্ধনের আমলের ভারতবর্ষকে জানিতে হইলে এ বই পড়িতেই হইবে।

৯। বেদান্তদর্শন, মতিলাল রায়, প্রবর্তক, ব্রহ্মসূত্রের এমন বিশ্লেষণমূলক সহজ ব্যাখ্যা বাংলায় আর নাই। ইহা ঠিক অনুবাদ নহে, সদ্গুরুর ব্যাখ্যানমূলক উপদেশের ভঙ্গিতে নূতন সৃষ্টি। প্রায় ছয়শত পৃষ্ঠা।

১০। প্রেমানন্দ জীবনচরিত, ওঁকারেশ্বরানন্দ, শ্রীরামকৃষ্ণ সাধন-মন্দির, দেওঘর। পরমহংসশিষ্য বাবুরাম মহারাজের সম্পূর্ণ জীবন-কাহিনী, সুলিখিত।

১১। পূর্ণকুম্ভ, রাণী চন্দ, বিশ্বভারতী, অপরূপ তীর্থ-ভ্রমণ কাহিনী, যুগান্তকারী বই বলিতে যাহা বুঝায় তাহাই। ভারতীয় হিন্দুর অন্তরাত্মার খবর আছে।

১২।১৩।১৪। স্বরবিতান, ২২, ২৩, ২৪ খণ্ড, রবীন্দ্রনাথ, বিশ্বভারতী, গানের রাজা রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সুর ও স্বরপথে যাঁহারা সম্পর্ক রাখিতে চান তাঁহারা অবশ্যই সংগ্রহ করিবেন।

১৫। পঞ্চতন্ত্র, সৈয়দ মুজতবা আলী, বেঙ্গল পাবলিশাস, প্রথম সংস্করণের পরিচয় নিষ্প্রয়োজন, কারণ এক মাসের মধ্যে দ্বিতীয় সংস্করণ হইয়াছে।

১৬। ভারত-প্রতিভা, সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, বসুমতী, ২৭জন বঙ্গমনীষীর সচিত্র জীবনবৃত্তান্ত। দীর্ঘকাল দুষ্প্রাপ্য ছিল। সুরেশচন্দ্র সমাজপতির ভূমিকা।

১৭। পদাবলী-পরিচয়, হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, গুরুদাস, পদাবলী সাহিত্য সম্বন্ধে যাঁহারা ওয়াকিবহাল হইতে চান, বিবিধ খুঁটিনাটি সংশয়ের যাঁহারা সমাধান চান, মোটের উপর পদাবলী-সাহিত্য যাঁহারা বুঝিতে চান, তাঁহাদের অবশ্যপাঠ্য। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ভূমিকা।

১৮।১৯। স্মৃতি-কথা ৩য় ও ৪র্থ, উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, ডি. এম, উপেন্দ্রনাথ কলমের টানে নিজের যুগের যে ছবি আঁকিয়াছেন তাহা মনোরম। রবীন্দ্রনাথ চিত্তরঞ্জন ও শরৎচন্দ্রকে আমরা পুনরাবিষ্কার করিয়া আনন্দ পাইতেছি। কিন্তু কথা এখনও বাকি আছে।

২০। চলার পথে, জগদানন্দ বাজপেয়ী, প্রসাদী সাহিত্যসত্র। ইহাও স্মৃতিকথা কিন্তু ঔপন্যাসিকের নয়, কবি ও রাজনৈতিক কর্মীর, সুতরাং রাজনীতিও কাব্য হইয়া উঠিয়াছে।

২১। কবিকঙ্কণ চণ্ডী, বসুমতী প্রকাশিত সম্পূর্ণ সংস্করণ। ভূমিকা তথ্যবহুল।

২২।২৩। বর্তিকা, ২৪ এপ্রিল ও ১৫ আগস্ট ১৯৫২, শ্রীঅরবিন্দ

২৫শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, অগ্রহায়ণ ১৩৫৯

শেষ "কপি"

[সাহিত্য ও ইতিহাসের যে সকল অধ্যায় লইয়া ব্রজেন্দ্রনাথ গবেষণা করিয়াছেন, তাহার প্রত্যেকটিকে নিখুঁত সম্পূর্ণ ও সর্বাঙ্গসুন্দর করিবার জন্য তিনি প্রতিনিয়ত যত্ন ও পরিশ্রম করিতেন, গবেষণা ও অনুসন্ধানের কাজে তিনি কোনও দিনই সমাপ্তি-রেখা টানেন নাই। নিরলস অধ্যবসায়ের সহিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে নূতনতর তথ্য ও জ্ঞান লাভে তিনি সর্বদা ব্যাপৃত থাকিতেন, উহাই ছিল তাঁহার ধ্যান-জ্ঞান। নূতন উপকরণের সন্ধান পাইলেই তিনি তাঁহার ডাইরিতে অথবা "নোট-বুকে" তাহা টুকিয়া রাখিতেন এবং স্বয়ং গিয়া অথবা কাহাকেও প্রেরণ করিয়া সংবাদের সত্যাসত্য নির্ধারিত না করা পর্যন্ত তিনি নিশ্চিন্ত তো হইতেনই না, ভাল করিয়া ঘুমাইতেও পারিতেন না। সহজ যাতায়াতের বহির্ভূত স্থানে বারম্বার পত্রাঘাত করিতেন। এই বিষয়ে তাঁহার আগ্রহাতিশয্য তাঁহার বন্ধু ও পরিচিত মাত্রকেই অল্পবিস্তর বিপন্ন করিত। এই বিপদ সর্বাধিক সহ্য করিতে হইত তাঁহার প্রকাশকদের, প্রতি সংস্করণেই কিছু না কিছু পরিবর্তন থাকিত, এবং বহু ক্ষেত্রে খোল-নলচে দুইই বদলাইয়া যাইত। অনেক সময় নূতন সংস্করণ হওয়ার দুই-একদিনের মধ্যে নূতন কিছু ওই বিষয়ে আবিষ্কৃত হইলে সঙ্গে সঙ্গে ফর্মা-পাতা বদল করিতে হইত, অথবা "সংশোধন-সংযোজনে"র "স্লিপ" আঁটিতে হইত। এইরূপ প্রায় সকল ক্ষেত্রেই। যে কোনও গ্রন্থের পূর্বের সংস্করণের সঙ্গে পরের সংস্করণ মিলাইয়া দেখিলে তাঁহার চির-অনুসন্ধিৎসু মনের সাক্ষাৎ পাওয়া যাইবে। এই পরিবর্তনের কোপ সর্বাধিক পড়িয়াছে তাঁহার 'বাংলা সাময়িক-পত্রে'র ইতিহাসের উপর; বই অবিক্রীত থাকিতেই তাঁহাকে সুখনিদ্রার সুযোগ দিবার জন্য সংস্করণান্তরের ব্যবস্থা করিতে হইয়াছে; "সংশোধন-সংযোজন" যে কতবার যোগ করিতে হইয়াছে

তাহার ইয়ত্তা নাই। মৃত্যুর মাত্র তিন মাস পূর্বে 'বাংলা সাময়িক-পত্রে'র দ্বিতীয় খণ্ডের দ্বিতীয় সংস্করণে বহু পরিবর্তন সাধন করিয়া একরূপ নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন। মাস দেড়েক পরে হঠাৎ খবর পাইলেন 'সংবাদ প্রভাকরে'র কিছু অনাবিষ্কৃত সংখ্যা এক স্থানে বিক্রয় হইতেছে—প্রায় আড়াই বছরের বিপুলাকার দুই খণ্ড। তিনি তখন নিদারুণ ব্যাধিগ্রস্ত হইয়াছেন। শয্যাশায়ীর নির্বন্ধাতিশয্যে ও তাগাদায় অনেক ছুটাছুটি দরকষাকষি করিয়া শেষ পর্যন্ত সেগুলি সংগ্রহ করিতেই হইল। মৃত্যুর দশ দিন পূর্বে তাহা তাঁহার হস্তগত হইল। তিনি রোগশয্যায় শুইয়াই সেই দুই বিপুল 'সংবাদ প্রভাকরে'র ভল্যুম তন্ন তন্ন করিয়া সন্ধান করিলেন, সাময়িক-পত্র সম্বন্ধে নূতন সংবাদ যাহা পাইলেন তাহা সঙ্গে সঙ্গে স্বহস্তে নকল করিলেন এবং 'বাংলা সাময়িক-পত্রে'র প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডের "সংশোধন ও সংযোজন" হিসাবে কপি প্রস্তুত করিলেন,—এই কাজ শেষ হইল ১৬ই আশ্বিন কোজাগরী লক্ষ্মীপূর্ণিমার দ্বিপ্রহরে, ১৭ই আশ্বিন রাত্রি সাড়ে এগারোটায় তিনি চিরবিদায় গ্রহণ করিলেন। প্রেসের জন্য ইহাই তাঁহার শেষ "কপি"।—স. শ. চি.]

'সমাচার দর্পণ'

নব-পর্য্যায়ের 'সমাচার দর্পণ' দেড় বৎসর চলিয়া চিরতরে লুপ্ত হয়। ইহার শেষ সংখ্যার তারিখ—১৩ অগ্রহায়ণ ১২৫৯ (২৭ নবেম্বর ১৮৫২)। পরবর্ত্তী ১৬ই অগ্রহায়ণ তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশ :—

> "...দুখের দুলাল দর্পণ শিশু গত ১৩ অগ্রহায়ণ শনৈশ্চর বাসরে প্রদোষ সময়ে শ্রীপাঠ শ্রীরামপুর ধামে শ্রীশ্রী৺ভাগীরথী তীরে নীরে শরীর সমর্পণ করত সজ্ঞানে ঈশুলোকে যাত্রা করিয়াছেন,..."

'সমাচার চন্দ্রিকা'

রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় দেউলিয়া হইবার কিছু দিন পূর্বে তৎসম্পাদিত 'সমাচার চন্দ্রিকা'র স্বত্ব (good will) নীলমণি রায়

চৌধুরীকে বিক্রয় করিয়াছিলেন। রায় চৌধুরী বিনা-লাইসেন্সে এক বৎসর পত্রিকা সম্পাদনের জন্ত আদালতে অভিযুক্ত হন। এই প্রসঙ্গে 'সংবাদ প্রভাকর' ২৯ ডিসেম্বর ১৮৫২ তারিখে লেখেন:—

"চন্দ্রিকার পূর্ব্বসম্পাদক ৺বাবু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ঋণদায়ে যন্ত্রাদি সর্ব্বস্ব বিক্রয় করত নিস্ব হইয়া যখন সিঁতির বাগানে বাস করেন, তাহার কিছু দিন পূর্ব্বে চন্দ্রিকা পত্রের "Good will" অর্থাৎ স্বত্ব নীলমণি রায় চৌধুরী (যিনি এইক্ষণকার সম্পাদক) তাঁহাকেই বিক্রয় করেন। রায় চৌধুরী সিঁতিতে গিয়া কাশীপুরস্থ বৈকুণ্ঠনাথ সুরের ছাপাখানা ভাড়া করিয়া পত্র প্রকাশের পূর্ব্বদিন ২৪ পরগণার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট এরূপ আবেদন করেন যে 'আমি আগামি কল্য অবধি বৈকুণ্ঠনাথ সুরের কাশীপুরের যন্ত্রালয় হইতে চন্দ্রিকা পত্র প্রকাশ করিব।' মাজিষ্ট্রেট সেই দরখাস্তখানি শুনিয়া নথির শামিলে রাখিতে অনুমতি করিলেন। ব্রাহ্মণ বিবেচনা করিলেন ইহাতেই আমার 'লাইসেন্স করা হইল' কারণ সাহেব নিষেধ বিধি কিছুই করিলেন না। এই ভাবিয়া যথানিয়মে এক বৎসর কাল কাগজ প্রকাশ করিয়া আসিতেছেন, সংপ্রতি কোন ব্যক্তি শত্রুতা করত এ বিষয় সাহেবের কর্ণগোচর করাতে তিনি নীলমণিকে ধৃত করিয়া… তাঁহার ৫০০ টাকা দণ্ড প্রদান অথবা তিন মাসের জন্ত কারাবাসের অনুমতি করেন।…যন্ত্রাধ্যক্ষ বৈকুণ্ঠ সুরো উক্ত চৌধুরির সহিত একত্রে শ্রীঘরের যন্ত্রণা-ভোগ করিতেছেন। ইঁহারা উভয়েই সেশন জজের নিকট আপিল করিয়াছেন, অদ্য তাহার দরখাস্ত শুনানি হইবেক।"

'সংবাদ সৌদামিনী'

"শ্যামপুষ্করিণীর সুবিখ্যাত রাজগোষ্ঠীর সদ্বিদ্বান বাবু কৃষ্ণহরি বসু যিনি সংবাদ সৌদামিনী নাম্নী ইংরাজী ও বাঙ্গালা সমাচার পত্রের সম্পাদক ছিলেন" (দ্র° 'সংবাদ প্রভাকর,' ৫-৮-১৮৫২)। ইহার পরমায়ু তিন বৎসর।

'বিশ্ববিলোকন'

১২৫৯ সালের ১লা অগ্রহায়ণ (১৫-১১-১৮৫২) 'বিশ্ববিলোকন' নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশিত হয়। পরবর্ত্তী ৬ই অগ্রহায়ণ, শনিবার 'সংবাদ প্রভাকর' এই প্রসঙ্গে লেখেন :—

"'বিশ্ববিলোকন' নামক একখানি অভিনব সাপ্তাহিক পত্রের প্রথম সংখ্যা প্রাপ্ত হইলাম। কলিকাতার চাঁপাতলা নিবাসি শ্রীযুত রাইমোহন গোস্বামী এবং বাবু গৌরমোহন দাস, উভয়ে সংযুক্ত হইয়া এই পত্রের সম্পাদকীয় কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতেছেন। উক্ত পত্র প্রতি সোমবারে প্রকাশিত হইবে, ইহার মাসিক মূল্য চারি আনা মাত্র, এবং শরীর প্রভাকর পত্রের ন্যায়। সম্পাদকেরা বিজ্ঞাপনে প্রকাশ করিয়াছেন, রাজনীতি, সাংসারিক ধর্ম্ম, ধর্ম্মচিন্তা, শিল্পবিদ্যা, কাব্যরস, কৌতুকাবলী, অঙ্ক, ঔষধীয়, পদার্থবিদ্যা, জ্যোতিষ, দেশবিবরণ, নাগরিক বার্ত্তা, এবং জীবনচরিত্র ইত্যাদি বিষয় প্রতি সপ্তাহে প্রকটন করিবেন 'বিশ্ববিলোকন' বিশ্ববিলোকন করাইবার কল্পনা করিয়াছেন।"

[এই পর্যন্ত 'সংবাদ প্রভাকরে'র সংবাদ। পরবর্তী সংবাদগুলি অন্যত্র সংগৃহীত।—স. শ. চি,]

বিবিধ পুস্তক প্রকাশিকা সাহিত্য-সংগ্রহ (মাসিক)। বৈশাখ (?) ১৭৮৬ শক (ইং ১৮৬৪)।

পরবর্ত্তী আষাঢ় মাসের 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় ইহার "৩য় সংখ্যার" প্রাপ্তিস্বীকার আছে।

উষা (বৈদিক পত্রিকা) : শ্রাবণ ১৮১১ শক (ইং ১৮৮৯)।

সংস্কৃত-বাংলা মাসিক পত্রিকা। "মহার্হ বৈদিক পুস্তক ও প্রবন্ধাদিই ইহাতে প্রকাশিত হইবে।" সম্পাদক—সত্যব্রত সামশ্রমী। ইহা অনিয়মিত ভাবে প্রকাশিত হইত। ১৮১৭ শকে ইহার "৩য় খণ্ড, ১ম সংখ্যা" প্রকাশিত হইয়া 'উষা' লুপ্ত হয়।

জমীন্দারী পঞ্চায়ত পত্রিকা (মাসিক) : আষাঢ় ১২৯৮ ।

বঙ্গদেশের কতিপয় প্রধান রাজা, জমীন্দার ও দেশহিতৈষী মহোদয়গণের যত্নে জমীন্দারী পঞ্চায়ত সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার উদ্দেশ্য ছিল এই পাঁচ প্রকার :—(ক) বিবাদ মীমাংসা। (খ) সর্ব্বপ্রকার ভূম্যধিকারিশ্রেণীর মধ্যে ও অন্যান্য শ্রেণীর মধ্যে পরস্পর সদ্ভাব সংস্থাপন। (গ) জমীন্দারী কার্য্যপ্রণালীর উন্নতি। (ঘ) কৃষি সম্পত্তির এবং ভূম্যধিকারিবর্গের অবস্থার উন্নতি। (ঙ) ভূম্যধিকারিবর্গের সন্ততিগণের অবস্থোপযোগী শিক্ষার ব্যবস্থা।

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই সভার সহিত বিশেষ ভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন; "পত্রিকার ও বিজ্ঞাপনের মূল্য সংক্রান্ত টাকাকড়ি ও কাজকর্ম্ম সংক্রান্ত পত্রাদি জমীন্দারী পঞ্চায়ত সভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নামে উক্ত ঠিকানায় [কার্য্যালয় : ৯২ বহুবাজার ষ্ট্রীটে] পাঠাইতে হইবে।"

সভা-স্থাপনের প্রায় দুই বৎসর পরে সভার মুখপত্রস্বরূপ আলোচ্য পত্রিকাখানি প্রকাশিত হয়। পত্রিকা-সম্পাদক—যোগেন্দ্রনাথ বসু, এম. এ., বি. এল., জমীন্দারী পঞ্চায়ত সভার সহকারী সম্পাদক।

বিক্রমপুর (সাপ্তাহিক) : ১৬ অগ্রহায়ণ ১৩০০ ।

লৌহজঙ্গ হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক—রজনীকান্ত আমিন। চতুর্থ ভাগ, ৩য় সংখ্যা (৮ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৪) হইতে ইহা কলিকাতায় মুদ্রিত হইতে থাকে।

১৬ই আশ্বিন, ১৩৩৯ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

ব্রজেন্দ্রনাথ

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় জীবনের একষট্টি বৎসর পূর্ণ হইতে হইতেই চলিয়া গেল। রাখিয়া গিয়াছে বাঙ্গালীর জন্য দুইটি অমূল্য ধন; এ দুইটি হইল তাহার গ্রন্থগুলি এবং গবেষণার দৃষ্টান্ত। তাহার রচিত গ্রন্থগুলির কথা আজ বলিব না, কারণ এগুলির প্রত্যেকখানি নিজ নিজ ক্ষেত্রে সর্বশ্রেষ্ঠ উপাদান বলিয়া চিরস্থায়ী হইবে। ভাব ও রস-বর্জিত শাখার সাহিত্য হইলেও এই রচনাগুলি এত অল্পদিনে আদৃত ও এত দ্রুত বিক্রয় হইয়া নূতন নূতন সংস্করণের আবশ্যকতা সৃষ্টি করিয়াছে, ইহাই তো সর্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ যে জ্ঞানের ক্ষেত্রে ব্রজেন্দ্র-রচিত তথ্যগ্রন্থগুলি খাঁটি সোনা। ইহাদের বহুলপ্রচার শুধু নিজগুণে হইয়াছে, কোন কর্তার ভক্ত-পোষণের ফলে নহে। ঈশ্বরের জগতে খাঁটি কাজটি, সত্য খাঁটি কথাটি কখনও নষ্ট হয় না, তবে তাহাকে সকলের স্বীকার করিতে অনেক সময় দেরি হয়। ব্রজেনের কীর্তি যে এত শীঘ্র লোকে আদর করিয়াছে, তাহা বাঙ্গালী সমাজেরই গৌরবের কথা। ব্রজেন বাঙ্গালাকে যাহা দিয়া গিয়াছে, ভারতের আর কোন প্রদেশে তাহার অনুরূপ কিছু নাই,—তাহাদের পক্ষে নিজনিজ প্রাদেশিক আধুনিক সাহিত্য এবং গত দেড়শ বছরের নবজীবনের ক্রমবিকাশের খাঁটি ইতিহাস লেখা এখনও অসম্ভব।

বাঙ্গলার জন্য এই কাজটি করিয়াছে একজন সাধারণ কেরানী, একক, আজীবন অর্থবিমুখ অক্লান্ত চেষ্টার ফলে। ইহাই ব্রজেন্দ্র-স্মৃতিস্তম্ভের পাদলিপি-স্বরূপ রহিবে। অথচ আমাদের আগেকার দরিদ্র পুরুষকারের মহাদৃষ্টান্ত—যেমন বিদ্যাসাগর ও শিবনাথ শাস্ত্রী প্রভৃতির মত, কলেজে শিক্ষালাভ করিবার সুযোগ ব্রজেন্দ্রের হয় নাই। অতি নিম্ন বেতনে (মাসিক আট টাকায় হাফ টাইমার) চাকরি করিতে করিতে ব্রজেন্দ্রনাথ ঘরে পড়িয়া যে বিস্তৃত জ্ঞান, মার্জিত বিচার-শক্তি, গবেষণার ও রচনার আভ্যন্তরীণ মন্ত্র লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিল, তাহা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ তকমা-মণ্ডিত

াত্রদের মধ্যেও অতি অল্প দেখিয়াছি। এই ক্ষেত্রে ব্রজেন্দ্রের সফলতা ম্পূর্ণ স্বকৃত, তাহার সুপ্ত প্রতিভার এবং উচ্চমুখী দৃঢ় চরিত্রের ফল।

আজ বলিব যাহা অন্তরঙ্গভাবে আমার চক্ষে পড়িয়াছে, অর্থাৎ ব্রজেন্দ্রনাথের গবেষণা প্রণালীর কথা। সে প্রথম বয়সে ভাবপ্রবণ বাঙ্গালী-সুলভ গল্পের ধরনে বাঙ্গলার নবাব পরিবারের বেগমদের এক কাহিনী ১৯১৩ সালে ছাপায়। জলধরদাদার অনুরোধে আমি তাহা পড়িয়া বলি, 'এটা গল্পের শ্রেণীতে স্থান পেতে পারে, কিন্তু ইতিহাসে নয়।' সেই সঙ্গে বইখানির পাশে পাশে দোষ দেখাইয়া কঠোর টিপ্পনি লিখিয়া দিই। তাহাতে ব্রজেন্দ্রনাথ হতাশ হইল না; এখন হইতে তাহার ঝোঁক হইল কিসে প্রকৃত ইতিহাস রচনা করা যায় তাহা শিখিবে। এই ব্রত উদ্‌যাপন করিতে তাহাকে অনেক বৎসর ধরিয়া জ্ঞান-ব্রহ্মচারী হইয়া থাকিতে হয়; আমার নির্মম আদেশে অনেক কাঁচা পুতুল বার বার ভাঙ্গিয়া, আবার ভাল করিয়া গড়িয়া, তবে ছাপিতে দিতে হয়। সেই সঙ্গে নানা পুস্তক পড়িয়া, পত্রিকা ঘাঁটিয়া, বিভিন্ন বিভাগের উচ্চ জ্ঞানে নিজের মনকে পূর্ণ করিতে হয়। যদিও ব্রজেন সেকেণ্ড ক্লাস হইতে স্কুল-ছাড়া, তথাপি ঘরে অনেক বই পড়িয়া ইংরেজী ভাষা আশ্চর্য আয়ত্ত করিয়া ফেলে, এবং এই ইংরেজীর মাধ্যমে সর্বোচ্চ জ্ঞান ও তথ্য-সংগ্রহ কাজ তাহার পক্ষে অতি সহজ হইয়া দাঁড়ায়। প্রথমে টাইপিস্টের কাজে মাদ্রাজী কেরানীদের সমান দক্ষ হইবার জন্য ব্রজেন অনেক শ্রেষ্ঠ ইংরেজী গ্রন্থ মনোযোগ দিয়া পড়ে। পরে এই ভাষাদক্ষতা তাহার গবেষণার কাজে খুব সহায়ক হইয়াছিল। ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যকে Quit India বলিলেই যে বঙ্গভাষায় সাহিত্যসেবক হইবার পথটা নিজ হইতে সুগম হইয়া যাইবে—এ বিশ্বাস ব্রজেন্দ্রনাথের ছিল না।

এই তরুণ ব্রহ্মচারী ইতিহাস-সাধনায় প্রথম হইতেই অর্থের মোহ ত্যাগ করে। তখন বাঙ্গলা মাসিকপত্রগুলি চটকদার গল্পের ঢঙে লেখা ঐতিহাসিক প্রবন্ধ টাকা দিয়া কিনিত। ব্রজেন্দ্র প্রথমে দু-একবার

এই ব্যবসায়ে নিজের হাত দেখাইয়াছিল। কিন্তু সত্যসন্ধানী গবেষণাপূর্ণ মৌলিক ইতিহাস লিখিব—এই ব্রত লইবার পর সে ঐ অর্থকরী ব্যবসা বন্ধ করিল। বিবাহিত অল্পবেতনের কেরানীর পক্ষে এই সংযম কত কঠোর তাহা আমরা কয়জন বুঝি?

গবেষণার জন্য শুধু এই ত্যাগ নহে, উপরন্তু ঘরের টাকা নষ্ট করিতে হইল। বৃটিশ যুগের আদিকালে বাঙলা দেশে ছাপা অনেকগুলি প্রাচীন পুস্তক, হস্তলিপি ও সরকারী দলিল তখন আর ভারতবর্ষে পাওয়া যায় না, তাহা লণ্ডনের বৃটিশ মিউজিয়মে এবং ইণ্ডিয়া অফিসে আছে। আমি লণ্ডনের যে সাহেব ফোটোগ্রাফারকে দিয়া উহার ফোটো এবং ইণ্ডিয়া অফিস হইতে মিস্ এন্স্‌লি দ্বারা টাইপ করা কপি আনাইতাম, ব্রজেন্দ্রনাথও নিজব্যয়ে তাহার আবশ্যক দলিলগুলি আমার দ্বারা তাঁহাদের নিকট হইতে আনাইত—কোন বিদ্যালয়, কোন প্রতিষ্ঠান, কোন গভর্নমেণ্টই তাহাকে এক পয়সার সাহায্যও করে নাই।

এইরূপে ব্রজেন্দ্রনাথ গবেষণার প্রথম আবশ্যক কাজ অর্থাৎ সমস্ত তথ্য সংগ্রহ সম্পন্ন করিল। তারপর প্রকৃত সত্যব্রত তপস্বীর মত তাহা হইতে নিছক সত্যটি বাহির করিয়া ছাপিল। এবং সেই সত্য-অন্বেষণের অসীম প্রেরণার ফলে যখনই নিজের কোন ভুল পরে জানিতে পারিল, তখনই তাহা স্বীকার করিয়া কাগজে ছাপাইয়া দিল এবং নূতন নূতন সংস্করণে তাহা পুরিয়া দিল। ইহাতে তাহার অভিমান ছিল না।

তৃতীয়তঃ সে সর্বদা আদি উপকরণে পৌঁছিতে চেষ্টা করিত; অর্থাৎ ফার্সী ইতিহাসের ইংরেজী অনুবাদ লইয়া সন্তুষ্ট না থাকিয়া, আমাকে দিয়া সেই অনুবাদটি তাহার আদি গ্রন্থের সহিত মিলাইয়া সংশোধিত অনুবাদ করাইয়া তাহা ব্যবহার করিত।

আর তাহার 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' কাঁচি দিয়া ছাপার পাতা কাটিয়া আঠা দিয়া জোড়া সংকলন-বহি নহে, ইহা, একটি জীবন্ত

সাহিত্যগ্রন্থ, এক বিচক্ষণ শিল্পীর সৃষ্টি—এ কথা সাধারণে বুঝে না। বঙ্কিমের প্রথম নভেল *Raj Mohon's Wife*, রামমোহন রায়ের লিখিত দিল্লীর বাদশাহের পক্ষে আবেদন, রামমোহনের মুসলমান দাসীপুত্রের ইতিহাস—এ সব ব্রজেন্দ্রনাথের আবিষ্কার।

তাহার পদাঙ্ক কি আমাদের যুবকেরা অনুসরণ করিবে?

বাঙ্গলা সাহিত্য ও ইতিহাসে ব্রজেন্দ্রনাথের কৃত কার্য সকলেই জানেন এবং এগুলি ভবিষ্যৎ যুগেও বাঙ্গালীর চোখের সামনে থাকিবে। কিন্তু বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের মঙ্গলের জন্য ব্রজেন যে বহু বর্ষ ধরিয়া অবিশ্রান্ত নীরব সেবা করিয়া গিয়াছে, তাহা ওই প্রতিষ্ঠানের অন্তরঙ্গ কর্মীরাই জানেন, এবং আমি সকলের চেয়ে বেশি ঘনিষ্ঠ ভাবে জানি। আমি আট বৎসর পরিষদের সভাপতি এবং সাত বৎসর সহ-সভাপতি ছিলাম; এবং সহকারী সভাপতি পদে থাকিবার সময় ও সভাপতি মহাশয়দের দীর্ঘ অনুপস্থিতির জন্য আমি প্রতি সপ্তাহে ওখানে গিয়া কমিটী ও সভা চালাইতাম, আপিসের কাজ পর্যবেক্ষণ করিতাম; ইদানীং কয়েক বৎসর হইল দক্ষিণ-কলিকাতার প্রান্ত-বাসী হইয়াছি, এবং যানবাহনের কঠোরতার জন্য পরিষদে উপস্থিত হইতে অক্ষম। কিন্তু বিশ বৎসর ওই প্রতিষ্ঠানের ভিতর হইতে দেখিয়া পরিষৎ কে ব্রজেন্দ্রনাথের নিকট কত ঋণী তাহা যদি না বলি, তবে আমার কর্তব্য অসম্পূর্ণ থাকিবে।

পঁচিশ বৎসর আগে পরিষদের বার্ষিক আয়ে বার্ষিক খরচ কুলাইত না, প্রতি বৎসর স্থায়ী তহবিল ও রিজার্ভ ফণ্ড হইতে হাজার হাজার টাকা ধার করিয়া কর্মচারীদের বেতন, ছাপাখানার ও কাগজের বিল ইত্যাদি শোধ করিতে হইত। এই ঋণ বাড়িয়াই চলিত, কোন বৎসর শোধ হইত না। তাহার উপর গৃহ ভগ্ন, আপিস বিশৃঙ্খল, আসবাবপত্র ময়লা—যেন প'ড়ো বাড়ির মত দেখাইত। আর এখন পরিষদের বাহ্য আকার ও অর্থের অবস্থা কত সন্তোষজনক! সত্য বটে আমরা সরকার হইতে একটা বড় দান এবং রমেশভবন-সংস্কারের জন্য

লেডী মিত্রের চেষ্টায় অনেক চাঁদা পাইয়াছি; এবং ঝাড়গ্রাম তহবিল আমাদের চিরস্থায়ী সম্বল হইয়াছে। এই সৌভাগ্যগুলি আমাদের সফলতায় শীঘ্র পৌছাইতে সাহায্য করিয়াছে। কিন্তু ব্রজেন্দ্রনাথের হাত যেন আমরা ভুলিয়া না যাই। সে প্রথম প্রথম বহু বৎসর দুর্দিনে অর্থাভাবের সঙ্গে যুঝিয়াছিল। অক্লান্ত পরিশ্রমে, কাণাকড়িটি বাঁচাইয়া নানা ফন্দি খাটাইয়া, নানা লোককে ধরিয়া, পরিষদের বর্তমান উন্নতির ভিত্তি স্থাপন করে এবং শেষ পর্যন্ত এই চেষ্টাকে চূড়ান্ত সীমায় আনিয়া ছাড়িয়া দিয়াছে। আজ পরিষৎ-মন্দির সুন্দর দৃঢ়, গ্রন্থসংগ্রহ সুশৃঙ্খল সজ্জিত ও তালিকায় নিবদ্ধ, বিক্রয়ের বইগুলি নিরাপদ গুদামজাত, তাহার আমদানি ও বিক্রয়ের হিসাব কঠোর নিয়মে আবদ্ধ,— বিশৃঙ্খলা দুর হইয়াছে। কর্মচারীদের ভাতা (D. A.) ইত্যাদি দ্বারা বেতন বৃদ্ধি করিবার ও প্রভিডেণ্ড ফাণ্ড প্রতিষ্ঠার ফলে তাঁহারা সন্তুষ্ট ও কর্মে উৎসাহী। চিত্রগুলি পরিষ্কৃত ও সুসজ্জিত।

পরিষদের এই আশ্চর্য কায়-পরিবর্তনে অনেকেই কম-বিস্তর সহকর্মী ছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের সেবা ব্রজেন্দ্রনাথ একসূত্রে গাঁথিতে পারিয়াছিল, এবং সে সূত্র সে নিজে চব্বিশ বৎসর ধরিয়া হাতে রাখিয়াছিল। আমি জানি যে এই সমাজসেবার কাজে প্রথমে ব্রজেন্দ্রনাথকে অপ্রত্যাশিত বাধা ও অপবাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে হয়। নিজ কর্মস্থলে 'প্রবাসী' অফিসে ৬।৭ ঘণ্টা কঠিন পরিশ্রমের পর দিনের পর দিন বৎসরের পর বৎসর সে বৈকাল ও রাত্রিতে ২।৩ ঘণ্টা পর্যন্ত পরিষদে উপস্থিত থাকিয়া খাটিয়া তবে এই প্রতিষ্ঠানটিকে পঙ্ক হইতে উদ্ধার করিতে পারিয়াছে। সম্পাদক অর্থাৎ প্রধান সেক্রেটারিই অফিসের সকল কাজের নির্দেশ দেন এবং পর্যবেক্ষণ করেন; অথচ আমি পরিষদের সভাপতিরূপে দেখিয়াছি যে প্রথমে অনেক বৎসর এমন এমন সম্পাদক ছিলেন, যিনি শুধু মাসিক সভার ও কার্য-নির্বাহক-সমিতির অধিবেশনের দিন মাত্র পরিষদ-গৃহে আসিতেন, এবং তাহাও কোন কোন দিন ১৫।২০ মিনিট মাত্র থাকিয়া চলিয়া যাইতেন।

ব্রজেন্দ্রনাথ শেষ বয়সে মাত্র সম্পাদকের পদে নির্বাচিত হয়, কিন্তু প্রথম হইতেই প্রত্যহ পরিষৎ-গৃহে উপস্থিত থাকিয়া নিজ বিভাগের কাজ তো করিতই, তদুপরি নানাদিকের দৈনিক ছোট ছোট সমস্যা ও ঝঞ্ঝাট তৎক্ষণাৎ মিটাইয়া দিত।

আর, ঠিক আমাদের পুরাতনপন্থী গৃহিণীদের মত নানা উপায়ে পরিষদের আয় বৃদ্ধি, খরচ কমানো, পুস্তক ও চিত্র সংগ্রহ করিতে ব্যস্ত থাকিত। আজ যে পরিষদের পুস্তকাগার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরির পরই সর্বশ্রেষ্ঠ গবেষণা-সহায়ক কেন্দ্র হইয়াছে—শুধু বাঙ্গলা গ্রন্থে নহে, ইংরেজী ও অন্য কোন কোন ভাষার উৎকৃষ্ট গ্রন্থে—তাহা ব্রজেন্দ্রনাথের গৃহিণীপনার ফল। ভাল ইংরেজী বা বাঙ্গলা পুস্তক ছাপা হইলেই তাহার গ্রন্থকারকে ধরিয়া উহা পরিষদের জন্য বিনামূল্যে সংগ্রহ করিত, এবং 'মডার্ন রিভিউ' পত্রিকায় নানা দেশে প্রকাশিত যে সব শ্রেষ্ঠ মূল্যবান গ্রন্থ সমালোচনার জন্য আসিত তাহার নিজ-পরিচিত পণ্ডিতদের দ্বারা সমালোচনা লিখাইয়া গ্রন্থগুলি পরিষৎ-লাইব্রেরির জন্য আত্মসাৎ করিত। তাহার মত সেবক পরিষৎ আবার কবে পাইবে?

শ্রীযদুনাথ সরকার

এখন ব্রজেন্দ্রনাথ চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার প্রারব্ধ কার্য সম্পূর্ণ করিবার ভার তাঁহার উত্তরাধিকারীদের লইতে হইবে। বাংলা-সাহিত্যে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে আলোচনার যে বর্তিকা তাঁহার হাতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল তাহা যাহাতে অম্লান ঔজ্জ্বল্যে উনবিংশ শতাব্দীর ইতিহাসের ক্ষেত্র হইতে বিচ্ছুরিত হইয়া প্রাচীন ও আধুনিক সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রকেই তুল্যভাবে আলোকিত করিয়া তুলে এবং এই আলোচনার মূলকেন্দ্র ব্রজেন্দ্রনাথের সযত্নপোষিত বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্‌কে চিরভাস্বর করিয়া রাখিতে পারে সে বিষয়ে সমস্ত সাহিত্য-রসিককে অবহিত হইতে হইবে।

—শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী: 'প্রবাসী,' কার্তিক ১৩৫৯

ব্রজেন্দ্রনাথের সাধনা

যিনি কৃতকর্মা এবং যাঁর কাছ থেকে আরও অনেক কৃতি লোকে আশা করে, তিনি যদি কর্মে রত থেকেই সহসা মারা যান তবে লোকে বলে, ইন্দ্রপাত হল। ব্রজেন্দ্রনাথ খ্যাতনামা দেশনেতা শিল্পপতি বা আচার্য ছিলেন না, তাঁর বিদ্যাবত্তাসূচক উপাধিও ছিল না, দেশের অল্প লোকেই তাঁর কাজের খবর রাখত, তথাপি বললে অত্যুক্তি হবে না যে তাঁর মৃত্যুতে ইন্দ্রপাত হয়েছে।

ব্রজেন্দ্রনাথ জীবদ্দশাতেই প্রচুর প্রশংসা পেয়েছেন, কিন্তু তাঁর সাহিত্যকর্মের মান সর্বসম্মত ভাবে নির্ধারিত হয়েছে এমন বলা যায় না। সাহিত্য শব্দের প্রাচীন অর্থ আজকাল প্রসারিত হয়েছে, শুধু কাব্য আর কথাগ্রন্থ নয়, দর্শন বিজ্ঞান ইতিহাস রাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ক রচনাও সাহিত্য। কিন্তু অনেকে মনে করেন creative art ভিন্ন প্রকৃত সাহিত্য হয় না। কাব্য গল্প বা সুখপাঠ্য প্রবন্ধ সাহিত্যের শ্রেণীতে পড়ে, কিন্তু প্রাচীন রচনার উদ্ধার বা পুনঃপ্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে যা লেখা হয় তা সাহিত্য নয়, সংকলন-জাতীয় কর্ম। এঁদের মতে ব্রজেন্দ্রনাথ সাহিত্যস্রষ্টা নন, সাহিত্যের উদ্ধারক ও সংরক্ষক।

ব্রজেন্দ্রনাথ যা করেছেন তা সৃষ্টিকর্ম কি স্থিতিকর্ম, সাহিত্যিকগণের কোন্ শ্রেণীতে তাঁর স্থান, তাঁর মর্যাদা কবি বা কথাকারের চাইতে বেশী কি কম, ইত্যাদি আলোচনায় লাভ নেই। তিনি যদি শুধু সাহিত্যপরিষদের কর্ণধার ও উন্নতিসাধক হতেন, অথবা শুধু পত্রিকা-সম্পাদক বা পুস্তকপ্রকাশক হতেন তবে বলা চলত যে তিনি ঠিক সাহিত্যিক নন, সাহিত্যসহায়ক মাত্র। কিন্তু ব্রজেন্দ্রনাথ আজীবন গ্রন্থ আর প্রবন্ধ লিখেছেন। তাঁর এই কর্ম কি সাহিত্যরচনা নয়, শুধুই মোহিতলাল-কথিত খনিত্রকর্ম?

মানুষের স্বাভাবিক জ্ঞানস্পৃহা আছে, ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান সম্বন্ধে কৌতূহল আছে, সর্বপ্রকার সৌন্দর্য ও আনন্দ উপভোগের অর্থাৎ প্রেয় ও শ্রেয় লাভের আগ্রহ আছে। এই স্পৃহা কৌতূহল ও আগ্রহই

মনুষ্যত্বের বিশিষ্ট লক্ষণ, এবং ভাষা দ্বারা তা প্রকাশ বা চরিতার্থ করবার নামই সাহিত্য। তথ্যমূলক রচনা অপেক্ষা রস- বা কল্পনা-মূলক রচনা শ্রেষ্ঠ—এই ধারণা সংকীর্ণ বুদ্ধির লক্ষণ।

ব্রজেন্দ্রনাথ যে সাহিত্য রচনা করেছেন তার অবলম্বন ইতিহাস। প্রথম জীবনে তিনি মোগল যুগ সম্বন্ধে অনেক লিখেছেন, কিন্তু পরে তিনি তাঁর মাতৃভূমি বাংলা দেশেই ইতিহাসের প্রচুর উপকরণ খুঁজে পেয়েছেন। গত দেড় শ বৎসরে এদেশে যে সাহিত্যিক অভ্যুদয় হয়েছে এবং বাঙালী সমাজে যে পরিবর্তন এসেছে, ব্রজেন্দ্রনাথ তারই ঐতিহাসিক ভিত্তি রচনা করেছেন। 'বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস' 'বাংলা সাময়িক-পত্র' এবং আরও অনেক গ্রন্থ তিনি লিখেছেন। কিন্তু আমার মনে হয় তাঁর শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক কৃতি 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা'।

এই গ্রন্থ রচনায় তিনি যে পরিশ্রম করেছেন তাকে তপস্যা বলা চলে। ইংরেজ প্রভৃতি জাতি নরম্যান টিউডর ইত্যাদি আমলের জীর্ণ ঘর-বাড়ি সযত্নে রক্ষা করে। শুধু মন্দির মূর্তি ও চিত্র নয়, প্রাচীন গ্রন্থ, চিঠিপত্র, অস্ত্র, গৃহস্থালির আসবাব, তৈজস দ্রব্য, পরিধেয়, অলংকার ইত্যাদি অতীত যুগের বিবিধ নিদর্শন মহামূল্য জ্ঞানে সঞ্চয় করে। প্রাচীনের প্রতি আমাদের এই মমতা নেই। দেবমন্দির ও তৎসংক্রান্ত বস্তু রক্ষায় কতকটা আগ্রহ আছে বটে, রাজাদের তোশাখানাতেও অনেক সেকেলে জিনিস রাখা হয়, কিন্তু সাধারণ লোকের বাড়িতে দু-এক শ বছর আগেকার আসবাব অলংকার বাসন ইত্যাদি খুঁজে পাওয়া শক্ত।

ইংরেজী বিদ্যা শিখে আমাদের ধারণা হয়েছিল যে ইতিহাস মানে শুধু রাজা-রাজড়ার কীর্তি বা অকীর্তি, যুদ্ধ আর অসংখ্য সন-তারিখ। ব্রজেন্দ্রনাথ এই মোহ কাটিয়ে উঠে স্বজাতির সাহিত্যচেষ্টা ও সংস্কৃতির ইতিহাসে মন দিয়েছিলেন। তিনি লিখেছেন, 'পূর্বপুরুষের কার্যকলাপের নিদর্শনগুলি সযত্নে রক্ষা করিবার আগ্রহ আমাদের

নাই।...সরকারী দলিল-পত্রে ও গ্রন্থাগারগুলিতে ইংরেজ-শাসিত বাংলা দেশে বাঙালী কি ভাবে জীবন কাটাইতেছিল, কি চিন্তা করিতেছিল, তাহার বড় একটা প্রমাণ নাই।' এই উদাসীনতার প্রতিকার ব্রজেন্দ্রনাথ করেছেন। বলা যেতে পারে—'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' গ্রন্থে ভূমিকা ছাড়া তাঁর নিজের লেখা তো কিছুই নেই, শুধু খবরের কাগজ থেকে সংকলন। এর জন্যই তাঁকে ইতিহাসকার আর সাহিত্যকার বলতে হবে?

অবশ্যই বলতে হবে। ব্রজেন্দ্রনাথ যে উপাদান সংগ্রহ করেছিলেন তা থেকে একটা মৌলিক গ্রন্থ তিনি অনায়াসেই লিখতে পারতেন। তা হয়তো ধারাবাহিক ইতিহাস হত, কিন্তু নিশ্ছিদ্র হত না। সে রকম গ্রন্থ রচনার লোভ সংবরণ করে তিনি সকল ত্রুটি আর বিতর্কের ঊর্ধ্বে উঠেছেন। তাঁর গ্রন্থ স্বতঃপ্রমাণ ঐতিহাসিক প্রদর্শভাণ্ডার। সেকালের বাঙালী কি ভাবে জীবন যাপন করত, কি চিন্তা করত তা ব্রজেন্দ্রনাথ নিজে বলেন নি, তাঁর সংগ্রহই বলেছে। অতীতকে তিনি কথা কইয়েছেন। তাঁর উদ্যম ও পদ্ধতি অভিনব, কিন্তু তাঁর সাধিত কর্ম ইতিহাসও বটে সাহিত্যও বটে।

ব্রজেন্দ্রনাথ তাঁর ভূমিকায় বলেছেন, 'সংবাদপত্রের মধ্যেও সত্য মিথ্যা দুইই আছে। দেশ কাল পাত্র বিবেচনা করিয়া সত্য মিথ্যা যাচাই করিয়া লইবার দায়িত্ব ইতিহাস-লেখকের।' তিনি আরও বলেছেন, 'এ-যুগের সংবাদপত্র বিগত শতাব্দীর সংবাদপত্র অপেক্ষা অনেক বেশী মিথ্যাচারী।' তাঁর মুখে শুনেছিলাম, আরও উপাদান সংগ্রহ হলে একটি ধারাবাহিক ইতিহাস লেখবার ইচ্ছা তাঁর আছে।

আশা করি ব্রজেন্দ্রনাথের অনুবর্তিগণ আরও উপাদান সংগ্রহ করবেন এবং অচিরভবিষ্যতে কোনও যোগ্য লেখক সমস্ত উপকরণ যাচাই আর অবলম্বন করে সেকালের বাঙালী সমাজের একটি প্রামাণিক ইতিহাস লিখবেন।

৪. ১১. ৫২ রাজশেখর বসু

ব্রজেন্দ্রনাথ ও মোহিতলাল

অর্ধশত বর্ষ আগে সারস্বত তীর্থপথে
মোরা তিন জন
তিন বন্ধু, একই কালে অভিযাত্রা করেছিনু,
তা আজ স্বপন।
সে দুর্গম দীর্ঘপথে বিজয় করিনু মোরা
বাধাবিঘ্ন কত,
কতই দুর্যোগ ঝঞ্ঝা আঁধারিল চারিধার
হই নি ব্যাহত।
সর্বাঙ্গে মাখিয়া ধূলি ক্লান্ত পদে উপজিনু
তীর্থের মন্দিরে,
সার্থক পথের ক্লেশ, ডুবিয়া যাই নি মোরা
পূজারীর ভিড়ে।
একজন বহুশ্রমে করিল চন্দনতরু
পথে আবিষ্কার,
রহিল তাহারি দারু হ'ল তা সুরভিপঙ্ক
পূজা-উপচার।
আর জন ভরি সাজি সুগন্ধ কুসুমরাজি
করিল চয়ন,
বাগ্দেবীর অর্চনারে পূর্ণাঙ্গ করিল তাই
দুইয়ের মিলন।
দোঁহার মাঝারে রহি আমি শুধু মাঝে মাঝে
দিনু ঘণ্টা নাড়া।
আজি সাঙ্গ করি ব্রত লভি বর অভিমত
চ'লে গেল তারা।
সুদীর্ঘ পথের বন্ধু দুইজনে একই কালে
লইল বিদায়।

ক'য়ে গেল কানে কানে 'হয় না মায়ের পূজা
কেবল ঘণ্টায়।'
চারিদিকে চেয়ে দেখি পূজা-আয়োজন সবে
করে নানারূপ।
নৈবেদ্য সাজায় কেহ শঙ্খটি বাজায় কেহ
কেহ জ্বালে ধূপ।
স্তম্ভিত হইয়া শোকে আকুল উদাস চোখে
চারিধারে চাই,
তাহাদের দর্ভাসনে কে বসিবে এ মন্দিরে
খুঁজিয়া না পাই।
কঠোর কাঠের বুক মথিয়া সুরভিরস
কে আনিবে টানি?
বাণীর পূজার মন্ত্র কার কণ্ঠে উদীরিত
হবে নাহি জানি।
নিরাশার ম্লান ছায়া হেরি আজি যাত্রীদলে
সবার আননে।
কে না জানে কে না মানে বাগ্দেবীর শ্রেষ্ঠপূজা
কুসুম-চন্দনে।

শ্রীকালিদাস রায়

—

সত্যের প্রতি ছিল তার অবিচল অনুরাগ, বাংলা সাহিত্য ও তার নিজের কাজের প্রতি তার যা নিষ্ঠা দেখেছি তা দুর্লভ। এই নিষ্ঠা ও কর্তব্যপরায়ণতাই তাকে যশের মন্দিরে টেনে নিয়ে গিয়েছিল। সেদিন সে লঘুমনে বিনা ঋণে ইহসংসার থেকে বিদায় নিয়ে চ'লে গিয়েছে। জীবিতাবস্থায় আমি অনেক বার তাকে আমার হৃদয়ের শ্রদ্ধা জানিয়েছি, আজ তার মৃত্যুর পরও তাকে আমার শ্রদ্ধা নিবেদন করছি। তার আত্মা শান্তি লাভ করুক।—শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থী: 'মাসিক বসুমতী,' কার্তিক ১৩৫৯

ছেলেবেলার কথা

ব্রজেনের ছেলেবেলাকার কথা। তখন যে পাড়ার খেলুড়েদের মধ্যে কখনও ছাড়াছাড়ি হবে—এমন কল্পনাও কারও মাথায় আসত না।

হুগলী শহরে বালি মহল্লার পাঁচটি গলি ও একটি বড়রাস্তার সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যেই আমাদের খেলাধুলা, লেখাপড়া, ডাংপিটেগিরি সীমাবদ্ধ ছিল। 'ব্রজেন'কে কেউ চিনত না, কারণ তখন তার আদরের ডাকনাম 'মেনি' নামেই সে অভিহিত হ'ত। বিধবা দিদি বড় জোর 'মেনু' ও ভৎর্সনার সুরে 'মেনো' এই পর্যন্ত নাম পরিবর্তন করতে পারতেন; কিন্তু 'ব্রজেনে'র শুদ্ধ বা অপভ্রংশ কোন পাত্তাই পাওয়া যেত না, ওটা বড়ালদের পাঠশালায় কিংবা ব্যাণ্ডেলের শিশু শ্রেণীতেই আটক প'ড়ে থাকত। বড় ভাই ছিলেন হৃষিকেশ, মধ্যম দেবীচরণ, সর্বকনিষ্ঠ 'মেনি' তথা ব্রজেন। কাটঘরা গলিতে ছোট একতলা বাড়ি, চালা রান্নাঘর, কিন্তু বাড়ির ভিতরে ১২।১৪ কাঠা জমি ছিল। কবে যে ভাইয়ে ভাইয়ে আলাদা হয়ে সে বাড়ি বিক্রি হ'ল সে খবর আমি জানি না।

ছোট ছেলে মায়ের ও বিধবা দিদির সর্বস্নেহ দখল করেছিল। ব্রজেনের চেয়ে আমি বছরখানেকের বড় আর ব্রজেনের মেজ দাদা দেবীচরণ আমার চেয়ে দু-এক বছরের বড় ছিল, সেজন্য ছেলেবেলায় এই দুই ভাই-ই আমাদের খেলার সাথী হয়েছিল। ব্রজেনের পিতাকে আমরা কেউ দেখি নি। শুনতাম আমাদের জ্ঞান হবার পূর্বেই তিনি গত হয়েছিলেন। এদের ছিল অল্প আয়ের সংসার। বড় ভাই হৃষিকেশ একটা ছোটখাট কাজ করতেন, তবে তার সঙ্গে তিনি এবং পরে দেবীচরণ (অল্প বয়সে পৈতা হবার পর থেকেই) পুরোহিতের কার্য করতেন।

আমাদের দলে মার্বেল খেলায় ও ঘুড়ি ওড়ানোতে ব্রজেনের দক্ষতা ছিল। পাই-পার, বেগুন-বিচি ইত্যাদি মার্বেল খেলায় প্রত্যহই

ব্রজেনের টঁ্যাক ভর্তি হ'ত, কারণ তার টিপ আমাদের সকলের চেয়ে ছিল ভাল। ঘুড়ির মান্জা তার প্রাণপণ চেষ্টায় খুব তীক্ষ্ণ হ'ত এবং আমাদের ঘুড়ির সুতো কচাকচ কেটে যেত। কিন্তু যেখানে ডাংপিটেগিরির পাল্লা আসত সেখানে সে স'রে দাঁড়াত। পরের বাগানে এটা ওটা না-ব'লে নিয়ে আসার দক্ষতা সে কোনদিনই অর্জন করে নি; কিন্তু তার মেজ দাদা দেবীচরণ ছোট ভায়ের ঘাটতিটুকু একাই পূরণ ক'রে দিত। পরের বাগানের বাতাবীলেবুকে থেঁতলে নিয়ে ফুটবলের যে প্রাথমিক শিক্ষা-পর্যায় তাতে বরাবরই সে ধাক্কাধাক্কির বাইরে দাঁড়িয়ে থাকত এবং গুলিডাণ্ডার "ভি" লুফবার বেশি উৎসাহ তার হ'ত না। নারকেল-বালদোর ব্যাট, তিনখানা ইঁটের উইকেট এবং ন্যাকড়ার বলে ব্যাটম-বলের যে প্রথম পাঠ শুরু হ'ত, তাতে কিন্তু ব্রজেনের খুব ঝোঁক দেখা যেত। অর্থাৎ দস্যিপনার চেয়ে হালকা কাজে ব্রজেনকে বেশি পাওয়া যেত, বোধ হয় তার কারণ ছিল তার ক্ষীণ দেহ এবং মা ও দিদির অত্যধিক বাধানিষেধের আগল। মহল্লার খেলাধুলো থেকে প্রমোশন পেয়ে যখন গঙ্গার ধারের মাঠে খেলা আরম্ভ হ'ল, তখন সেখানে ব্রজেন আমাদের মত সর্বক্ষণ যেত না। ব্যাণ্ডেলের ইস্কুল থেকে বাড়ি না গিয়ে আমাদের মত ইস্কুল থেকেই সরাসরি গঙ্গার ধারে খেলতে যাওয়ার উৎসাহ তার তেমন দেখা যেত না।

ওই সময়েতে কে কি হব—এসব কথাও উঠত না, এবং কারও চরিত্রের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করবার মত দৃষ্টিও আমাদের কারও ছিল না। এখন অতীতের পঞ্চাশ বছর পার হয়ে সেদিনকার কথা বেশি ক'রে বলতে গেলে অতিরঞ্জনের দোষ আসতে পারে। পরজীবনে ব্রজেনের সঙ্গে আমার বহু বৎসর অন্তর দেখা-সাক্ষাৎ হ'ত, কিন্তু যখনই দেখা হ'ত বাল্যের বন্ধুত্ব ফিরে আসত। ব্রজেন নিজের অক্লান্ত চেষ্টায় দারিদ্র্যের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছিল। নিজের যে কর্মক্ষেত্র সে রচনা ক'রে নিয়েছিল তাতে তার দান

পণ্ডিতজনে স্বীকার করেন এবং আমরা বাল্যবন্ধুরা তার জন্য অহঙ্কার করি।

সাহিত্যের ইতিহাসে কোথাও সে এতটুকু কাহিনীকে প্রশ্রয় দেয় নি—খাঁটি তথ্য সংগ্রহই তার ধর্ম ছিল। আর, কারও কাছে সে নিজের মাথা নত ক'রে নিজের জন্য কোনদিন কিছু চায় নি।

একদিন আমাদের পল্লীতে সে জন্মগ্রহণ করেছিল ব'লে হুগলীবাসীর কাছে তার নাম চিরদিন গৌরবের হয়ে থাকবে।

শ্রীভূপতি মজুমদার*

সহযাত্রী ব্রজেন্দ্রনাথ

সাহিত্যের রাজপথে নবাগত আগন্তুক-রূপে
সহযাত্রী, তব সাথে দেখা হ'ল প্রথম যৌবনে।
সেই পরিচয় কবে বন্ধুত্বের সুদৃঢ় বন্ধনে
হ'ল প্রতিষ্ঠিত। জানি, সেদিনের সূর্য ছিল পুবে।
জ্ঞানের ডুবারী তুমি, অতীত-অতলে গেলে ডুবে
রত্নোদ্ধার-ব্রতে ব্রতী। সেকাল জীবন্ত হ'ল মনে
তোমারি এষণা-বলে। ঘুরে মরি কল্পনার বনে
রসের পিপাসু আমি। তুমি বন্ধু খুঁজে পেলে ধ্রুবে।

হে জ্ঞান-তাপস, কণ্ঠে জয়মাল্য করিলে ধারণ,
সুধীজন শ্রদ্ধাভরে উচ্চারণ করে তব নাম;
সাহিত্যের হে সাধক, নিষ্ঠা তব নহে সাধারণ,
অনেক বেদনা হেথা, জীবনের অনেক সংগ্রাম;
সত্যের সাক্ষাৎ লভি' সব দুঃখ হ'ল নিবারণ,
হে ব্রজেন্দ্র, খুঁজে পেলে অনন্ত শান্তির ব্রজধাম?

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

* পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মন্ত্রী শ্রীভূপতি মজুমদার ব্রজেন্দ্রনাথের একমাত্র বাল্যবন্ধু। চুঁচুড়ায় এক পল্লীতে উভয়ের বাস ছিল।

আমার সাহিত্য-জীবন

ব্রজেন্দ্রনাথ

আবার এবার ধারাবাহিকতা ক্ষুণ্ণ হ'ল।

তপস্বী সাধকের মত সাহিত্য-সেবক ঐতিহাসিক ব্রজেন্দ্রনাথ জীবনের পালা শেষ করলেন। সাহিত্য-জীবনের কথা লিখতে ব'সে আপনা থেকেই তাঁর কথা মনে হচ্ছে—এসে পড়ছে। গতবারে যেখানে ছেদ টেনেছি, যেখানে পাটনার বাঙালী সমাজ এবং সাহিত্য-রসিক ও পণ্ডিত সমাজের কথা আসার কথা, বিশেষ ক'রে শচীমামা—শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের কথা বলার কথা, সেখানে সাময়িক ছেদ টেনে ব্রজেন্দ্রনাথের কথাই বলব। তাঁর সঙ্গে জীবনের সম্পর্ক যেটুকু স্বাভাবিক ভাবে হবার কথা, ঘটনাচক্রে তার চেয়ে অনেক গাঢ়তর হয়েছিল জীবন-সম্পর্কে। অনেক কাল আগে তখন আমার প্রথম যৌবন, সেই সময় বিজ্ঞাপন দেখে তাঁর 'মোগল-বিদুষী' এবং 'বেগম সমরু' ভি.পি.তে কলকাতা থেকে আনিয়ে প'ড়েছিলাম। মধ্যে মাঝে মাসিক-পত্রে 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা'র দু-একটি প্রবন্ধও পড়েছিলাম। ভারি ভাল লেগেছিল একটি প্রবন্ধের কাহিনী। তাতে সেকালের এক চৌকিদারের মৃত্যুর পর তার সহায়হীন বিধবা স্ত্রী দুটি ছেলে নিয়ে বিব্রত হয়ে অবশেষে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কাছে দরখাস্ত করেছিল—স্বামীর পদের অর্থাৎ চৌকিদারির জন্য। জানিয়েছিল, যোগ্যতার সঙ্গেই সে এ দায়িত্ব বহন করতে সক্ষম। ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট তার দরখাস্ত মেয়েছেলের দরখাস্ত ব'লে ফেলে দেন নি, কৌতূহলী হয়ে তাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন তার যোগ্যতার কথা। মেয়েটি জানিয়েছিল, সে লাঠিয়ালের কন্যা, লাঠিয়ালের স্ত্রী, নিজেও লাঠি ধরতে পারে, চোর হোক ডাকাত হোক, তাদের বাধা দিতে সম্পূর্ণরূপে সমর্থ। সাহেব তাকে প্রশ্ন করলেন যে, সে পরীক্ষা দিতে সম্মত আছে কি না? আবক্ষ ঘোমটা টেনেই মেয়েটি কথা বলছিল। ঘোমটা-সুদ্ধ মাথা

নেড়েই সে সম্মতি জানালে। লোকে হাসলে। সাহেব কিন্তু হাসলেন না। তিনি হুকুম দিলেন, নির্দিষ্ট দিনে পরীক্ষা হবে এবং পুলিস সাহেবকে বললেন, তিনি যেন কন্‌স্টেবলদের মধ্য থেকে ভাল দু-তিন জন লাঠি-খেলোয়াড় বাছাই ক'রে রাখেন। নির্দিষ্ট দিনে কালেক্টরী বাড়ির সামনে লোকে লোকারণ্য হয়ে গেল। সেই লোকারণ্যের মধ্যে অবগুণ্ঠনবতী বিধবা এসে তার স্বামীর বাঁশের লাঠি সামনে রেখে সাহেবকে এবং জনতাকে প্রণাম ক'রে উঠে গাছকোমর বেঁধে কাছা এঁটে লাঠি হাতে নিয়ে দাঁড়াল। দেখা গেল লজ্জাশীলা বাংলার বাগ্‌দী-বধূটির চেহারা পালটে যাচ্ছে। দেখতে দেখতে সে হয়ে গেল আর এক মেয়ে, বলা চলে ভীমা ভয়ঙ্করী। লাঠিখেলা আরম্ভ হ'ল। সে খেলা—খেলা নয়, মারাত্মক যুদ্ধই। এক দিকে পশ্চিমদেশী সিপাহীদের মর্দানার ইজ্জৎ, অন্য দিকে এই মেয়েটির অন্নসংস্থানের দায়। জিতেছিল সেই মেয়েটিই এবং শুধু চাকরিই পায় নি, পুরস্কারও পেয়েছিল।

এই কাহিনীকে যিনি উদ্ধার করেছিলেন পুরাতন কাগজ ঘেঁটে, তাঁকে সে দিন দূর থেকেই নমস্কার জানিয়েছিলাম। অবশ্য তাঁর কাজের সম্পূর্ণ মূল্য তখন বুঝতে পারি নি, বুঝবার যোগ্যতা হয় নি। সত্য কথা বলতে কি, তাঁর কর্মের পূর্ণ মূল্য বুঝতে অনেক দেরি লেগেছে। বুঝতে যেন চাই নি ইচ্ছে ক'রে। তার একটু কারণও ছিল। মনে হ'ত আধুনিক কালের কবি এবং কথা-সাহিত্যিকদের তিনি যেন খানিকটা অবজ্ঞার চোখেই দেখতেন। কথাটা অসত্যও নয়; এই মনোভাবের মূলে 'অটোবায়োগ্রাফি অব অ্যান আননোন ইণ্ডিয়ানে'র লেখক শ্রীযুক্ত নীরদ চৌধুরীর প্রভাব ছিল। আরও কিছু ছিল। সে হ'ল আমাদের নিজেদেরই ব্যক্তিগত আচার-আচরণ। কবি এবং গল্পলেখকদের মনোভাব তাঁর প্রতি সেকালে প্রসন্ন দেখি নি। তাঁর নিজের আচার-আচরণ এমনই সুশৃঙ্খল, পরিচ্ছন্ন এবং মর্যাদাপূর্ণ ছিল যে, তাঁর পক্ষে আচার বা মর্যাদা-ভ্রষ্টতা সহ্য করা প্রায় অসম্ভব ছিল।

তাঁর সঙ্গে প্রথম পরিচয় আমার পত্রযোগে। আমার প্রথম গল্প "রসকলি" সর্বাগ্রে আমি 'প্রবাসী'তেই পাঠিয়েছিলাম, আট মাস প'ড়ে ছিল 'প্রবাসী'র দপ্তরে; এর মধ্যে অন্তত আট জোড়া রিপ্লাই কার্ড অবশ্যই আমি লিখেছিলাম এবং প্রত্যুত্তরে একই বাঁধা-গত "গল্পটি সম্পাদকের বিবেচনাধীন আছে" জবাব পেয়েছি। নীচে সই থাকত তাঁরই—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, একটু বাঁকা লাইন, অক্ষরগুলির গোড়ার দিকটা মোটা, তার পর ক্রমশ সরু এবং জড়ানো হয়ে যেত। তার পর একদা কলকাতায় এসে 'প্রবাসী' আপিসে গেলাম। দেখলাম, ছোট-ক'রে-চুল-ছাঁটা, সবল-দেহ, নির্ভীক-দৃষ্টি, একটি মানুষ দরজার দিকে মুখ ক'রে ব'সে আছেন। বাকি সকলে দক্ষিণমুখী, একজন তাঁর দিকে মুখ ক'রে ব'সে আছেন। গিয়ে বললাম, আমার লেখা ফেরত নিতে এসেছি।

গম্ভীর স্বরে প্রশ্ন করলেন, লেখার নাম? আপনার নাম?

উত্তর দিতেই বিনাবাক্যব্যয়ে ফাইল বের ক'রে কয়েক মিনিটের মধ্যেই লেখাটি দিয়ে দিলেন। তার পর আবার নিজের কাজে মন দিলেন।

তার পর 'বঙ্গশ্রী'র আপিসে তাঁকে দেখলাম। সজনীকান্তের আহ্বানে তিনি এলেন। সেই দিন তাঁর প্রতি 'বঙ্গশ্রী'র লেখক-গোষ্ঠীর যে সম্ভ্রম দেখলাম, তাতে একটু সচকিত হলাম। বন্ধু কিরণ রায় সেদিন প্রথম আমাকে বুঝিয়ে দিলেন ব্রজেন্দ্রনাথের সাধনার মহত্ত্ব এবং গুরুত্ব। এবং সেই দিনই শুনলাম, আচার্য যদুনাথ সরকারের তিনি একনিষ্ঠ এবং অতিপ্রিয় শিষ্য।

আচার্য যদুনাথ আমার কাছে আমার প্রায় শৈশব থেকেই আদর্শ পুরুষ এবং ঋষিতুল্য পণ্ডিত। আমার মা প্রায়ই তাঁর নাম আমার কাছে বলতেন সেই ছেলেবেলা থেকে। আচার্য যদুনাথ পাটনায় ছিলেন দীর্ঘকাল—আমার মাও পাটনার মেয়ে; বাঙালী সমাজে যদুনাথের ছাত্র-জীবনের খ্যাতি, তাঁর 'রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ'-বৃত্তিপ্রাপ্তি

বিপুল গৌরবের কথা ছিল। তার উপর ছিল তাঁর আদর্শ দৃঢ় চরিত্রের খ্যাতি। সেই কথা মা আমাকে প্রায়ই বলতেন। বলতেন, সে আমলে নন্দলাল ব'লে একজন যদুনাথের সহপাঠী এবং প্রতিযোগী ছিলেন—বুদ্ধিতে তিনি কম ছিলেন না, কিন্তু বুদ্ধি প্রতিভা চরিত্রের অভাবে তৈলহীন প্রদীপের মত। যদুনাথের সাধনা, তাঁর চরিত্রবল তাঁকে নিয়ে চলেছে সিদ্ধির পথে, চরিত্রবলহীন নন্দলাল বুদ্বুদের মত কোথায় মিলিয়ে গেছে। যদুনাথ নাকি অশুচি অশুদ্ধ কিছুকে সহ্য করেন না।

ঠিক এই কারণেই সেদিন কিরণের কথা অগ্রাহ্য করি নি।

তার পর সেবার পূজার সময় সজনীকান্ত বললেন, একটি গল্প 'প্রবাসী'তে দিয়ে আসুন।

আমি ইতস্তত ক'রে "রসকলি"র অভিজ্ঞতার কথা বললাম। তিনি বললেন, এখন আর তা হবে না। আগের ব্যাপারে চিঠিতে সই ক'রে ব্রজেনদা সব দায়টা ঘাড়ে করলেও দায়ী তিনি নন। কারণ গল্পনির্বাচন করেন অন্য লোকে। এখন সে ধারার খানিকটা বদল হয়েছে।

"ঘাসের ফুল" গল্পটি হাতে নিয়ে গেলাম 'প্রবাসী' আপিসে।

ব্রজেনদা গল্পটি খুলে আমার নাম দেখে বললেন, বসুন। আপনি তারাশঙ্কর বাঁড়ুজ্জে? পরশু, চা দাও।

তার পর কাজে মন দিলেন। চা খেয়ে সভয়ে বললাম, কবে খবর নেব?

খবর? একটু হাসি তাঁর মুখে যেন খেলে গেল।

মানে, পুজো-সংখ্যার জন্যে দিচ্ছি তো—

নেবেন। আবারও একটু হাসলেন, সঙ্গে সঙ্গে একটু দুললেন; এটি ছিল তাঁর স্বাভাবিক ভঙ্গি। লেখাটি সেই সংখ্যাতেই বেরিয়েছিল।

তার পর 'প্রবাসী'তে অনেক লেখা বের হ'ল। কত বার গেলাম—প্রুফ দেখতে, দক্ষিণা আনতে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ব'সে থাকতে হয়েছে, ব্রজেনদা চা খাইয়েছেন, মধ্যে মধ্যে গল্প করেছেন। পরিচয় গাঢ় হয়েছে। এর মধ্যে তাঁর লেখা গ্রন্থগুলি পড়েছি। শ্রদ্ধাও বেড়েছে।

হঠাৎ ঘটনাচক্রে এর পর এসে পড়লাম মানুষটির একেবারে অত্যন্ত সন্নিকটে। একেবারে এক বাড়িতে। উপরতলায় তিনি, নীচের তলায় আমি।

১৯৩৯ সালে "ভাগ্যকুল ম্যান্‌সন" থেকে তিনি এলেন মোহনবাগান রো-র একখানি বাড়িতে। আমি তখন দক্ষিণ-কলকাতার মনোহরপুকুর থেকে বউবাজার স্ট্রীট, সেখান থেকে হ্যারিসন রোড হয়ে কোথায় যাই সমস্যায় প'ড়ে সজনীকান্ত এবং তাঁর লক্ষ্মীর মত সহধর্মিণী সুধারাণীর আহ্বানে তাঁদের ওখানে এসে বাসা নিলাম—ব্রজেনদার বাড়ির নীচের তলার একখানা ঘরে। শরীর তখন খুব খারাপ। হোটেল-বোর্ডিঙের তেল-ঝাল সহ্য হচ্ছে না। খাওয়ার নিমন্ত্রণ দিলেন সজনীকান্তের গৃহিণী। মায়ের মত যত্ন করতে জানেন তিনি। এবং এইটিই তাঁর স্বভাব।

তাঁর কথা থাক্, ব্রজেনদার কথা বলি।

ঘরখানি ছিল সজনীকান্তের। তিনি বই রাখবেন ব'লে ঘরখানা ব্রজেনদার কাছে ভাড়া নিয়েছিলেন। প্রসন্ন হাস্যের সঙ্গে গম্ভীর ব্রজেনদা এসে বললেন, ভাল হ'ল ভায়া। খুব ভাল হ'ল। মধ্যে মধ্যে গল্পগুজব করা যাবে। তোমারও ভাল হ'ল, 'প্রবাসী'র লেখা দিতে যেতে হবে না তোমাকে। আমি নিয়ে যাব।

তখন "কালিন্দী" প্রকাশিত হচ্ছে 'প্রবাসী'তে।

ব্রজেনদার তখন হাঁটু পর্যন্ত খাটো ধুতি পরনে, খালি গা, গলায় পৈতে—খাঁটি এ দেশের মানুষ। হাতে কাগজের তাড়া নিয়ে চ'লে গেলেন 'শনিবারের চিঠি'র আপিসে। দশটা বাজতেই বেরিয়ে গেলেন আপিসে।

এই সময়ে দেখলাম ব্রজেনদার তপস্বী রূপ।

এমন তন্ময় তপস্যা, এমন বিরামহীন তপস্যা এ যুগে দেখি নি। ধূলিধূসর জরাজীর্ণ কাগজ—পুরাতন সংবাদপত্রের ফাইল নিয়ে ব'সে কাজ ক'রে চলেছেন। কাগজ কাটছেন, আঁটছেন, তার পর লিখছেন মন্তব্য

আবার পাতা ওল্‌টাচ্ছেন, হঠাৎ উঠে চটি পায়ে দিয়ে চলেছেন—সজনীবাবু! সজনীবাবু! সমস্যা উপস্থিত হয়েছে, পরামর্শ চাই। দিনের পর দিন। রাত্রির পর রাত্রি। কোথায় আছে পুরনো সংস্করণের বই, কোথায় আছে কাগজ, খোঁজ ক'রে কোন একজনকে সঙ্গে নিয়ে চলেছেন সেখানে। ঠিক তেমনি ভাবে—অ্যাডভেঞ্চারের বইয়ে স্বর্ণ-সন্ধানীরা যে ভাবে বনের মধ্যে পথ হেঁটে চলে, মাটি খোঁড়ে, সেই ভাবে। যাওয়া-আসার কাজে তিনি একটু অপটু ছিলেন, কোন একজনকে সঙ্গে না নিয়ে যেতে পারতেন না। তাঁর ধ্যানজ্ঞান এমন কি নিদ্রার মধ্যে স্বপ্নও ছিল এই গবেষণা। আমি অবাক হয়ে দেখেছি আর ভেবেছি, এতটা মানুষ পারে? আমার নিজের জীবনেও আমি নিত্য নিয়মিত শ্রম করি; নিত্য লিখি; এ শৃঙ্খলাকে কোনদিন ভাঙি না; সে নিয়ে অনেকে বিস্ময় প্রকাশ করেন। আমিও বিস্মিত হলাম। শিখলাম তাঁর কাছে। শুধু এইটুকুই নয়, আরও দেখলাম মানুষটির জীবনের আর একটি দিক, এই গম্ভীর বাহ্যত-কঠোর মানুষটির স্নেহতৃষ্ণা।

সন্তানসন্ততিহীন জীবন ও সংসার। স্বামী এবং স্ত্রী পরস্পরকে নিবিড় ভালবাসায় জড়িয়ে ধরেছেন, পরস্পরের জন্য কি ব্যাকুলতা, কি চিন্তা! তারই মধ্যে মাঝে মাঝে সজনীকান্তের শিশুকন্যা রমাকে নিয়ে কত সমাদর!

জীবনে ব্যয়বাহুল্য নেই—কার্পণ্যও নেই, কেউ একটি পয়সা তাঁর কাছে পেলে কাগজে মুড়ে সেটি পকেটে নিয়ে ফেরেন। ডাকে বিলেত থেকে আসে দুর্লভ বইয়ের পৃষ্ঠার ফোটোগ্রাফ। এই সময়ে ব্রজেনদা মধ্যে মধ্যে ব'সে কবি দেবেন সেনের কবিতা আবৃত্তি করতেন। বধূর পায়ের মল ঝমর ঝম বাজত তাঁর মুখে। বলতেন—ভায়া, নেহাত 'শুষ্কং কাষ্ঠং' মনে ক'রো না। রসতৃষ্ণা আছে।

পূজার সময় মাসখানেক নিয়মিত তিনি চেঞ্জে যেতেন বউদিদিকে নিয়ে। বলতেন—আমার তো কাজ আছে, গবেষণার অনুসন্ধানের কাজ আছে। ওর কি আছে?

এমন নিবিড় দাম্পত্য জীবন আমি দেখি নি।

ভোরবেলা আমি উঠি। ব্রজেনদাও ভোরবেলা উঠতেন। মধ্যে মধ্যে প্রায়ই শুনতাম, উঠে বাইরে এসে তিনি বলছেন—হ্যাঁ গা, গাড়ুতে আজ জল রাখ নি?

মুহূর্তে সচকিত কণ্ঠে বউদির কথা শুনতাম—ঐঃ যাঃ! ভুলে গিয়েছি।

ব্রজেনদার সহাস্য কথা শুনতাম—ঠিক আছে। আমি নিচ্ছি।

আকুল হয়ে উঠতেন স্ত্রী—না না, আমি যাই।

স্বামী উৎকণ্ঠিত হতেন এবার—না। উঠো না। সকালে উঠলে তোমার শরীর খারাপ হবে।

—না—না—না। আমি যাই। খবরদার তুমি জল নেবে না।

—আঃ! না। উঠো না তুমি। বারণ করছি আমি। আমি নিচ্ছি জল।

—না। আমার দিব্যি রইল। মাথা খাবে আমার।

অবাক হয়ে ব'সে শুনতাম। কখনও হাসি আসত এই প্রৌঢ় দম্পতির ছেলেমানুষি দেখে, কখনও চোখে জল আসত। বুঝতে পারতাম—মনে হ'ত, একটা শূন্য ঘরে অনন্ত শূন্যের বাতাস ভেসে এসে ঢুকছে দীর্ঘনিশ্বাসের মত।

এখান থেকে চ'লে গেলাম আমি বাগবাজার আনন্দ চ্যাটার্জি লেনে।

সেখান থেকে নিত্য দশটা সাড়ে দশটায় আসতাম 'শনিবারের চিঠি'র আপিসে। একদিন হঠাৎ ব্রজেনদার সঙ্গে ঝগড়া হয়ে গেল। তিনি তখন "সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা" সম্পাদনা আরম্ভ করেছেন। এরই মধ্যে মহিলা-সম্পাদিত মাসিকপত্র নিয়ে গবেষণামূলক একটি প্রবন্ধ রচনা শুরু করেছিলেন। সেই নিয়েই কথা চলছিল। তিনি বলছিলেন—নসীপুর থেকে 'ভুবনমোহিনী দেবী' একখানি মাসিকপত্র বের করেছিলেন বহুকাল পূর্বে, তারই কথা। এবং পত্রিকার প্রকাশক এবং ম্যানেজার ডাঃ নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

শুনে আমি বললাম, দাদা, তা হ'লে হয়েছে। ভুবনমোহিনী দেবী নামে মহিলা হ'লেও আসলে মহিলা নন। ওটি নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ডাক্তারের ছদ্মনাম।

ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে তিনি বললেন, তার অর্থ ?

আমি 'ভুবনমোহিনী প্রতিভা' কাব্যগ্রন্থের কথা স্মরণ করিয়ে দিলাম। যে কাব্যগ্রন্থের কবি মহিলা ভেবে সমালোচকেরা প্রশংসা করেছিলেন—বোধ হয় বঙ্কিমচন্দ্রও করেছিলেন—এবং পরে কবির সঠিক পরিচয় পেয়ে এই প্রতারণার জন্য তাঁরা তিরস্কার করেছিলেন। ব্রজেন্দ্রনাথ বললেন, তা হ'লেও সম্পাদনার বেলা ও-কথা খাটবে না। ভুবনমোহিনীকে সামনে রেখে কাজ যেই করুক, সম্পাদনা ভুবন-মোহিনীর ব'লেই গ্রহণ করব আমরা।

বললাম, আসলে যে ভুবনমোহিনী ব'লে কারও অস্তিত্বই ছিল না। আমি খুব ভাল ক'রেই জানি—কারণ 'ভুবনমোহিনী প্রতিভা'র কবি ডাঃ নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় পরে গিয়ে লাভপুরের ছ মাইল দূরে কীর্ণাহারে বাস করেছেন। তাঁর দুই স্ত্রী। তাঁর সন্তান-সন্ততিরা এখনও রয়েছেন।

ব্রজেন্দ্রনাথ কিছুতেই মানলেন না, এবং আমাকে কটু কথাই বললেন—বললেন, এ বানিয়ে গল্প লেখা নয়। ইত্যাদি ইত্যাদি।

আমিও কটু উত্তর দিয়ে উঠে এলাম। বললাম, আপনিই বা কি ঐতিহাসিক? একটি তথ্যের সংবাদ আমি দিচ্ছি, আপনি সন্ধান না ক'রেই তাকে উড়িয়ে দিচ্ছেন?

উঠে চ'লে এলাম।

ঠিক দিন চারেক পরেই একখানি পত্র পেলাম। ব্রজেনদা লিখছেন, "ভায়া, তোমার কথাই ঠিক বলিয়া প্রমাণিত হইল। পরে কাগজ ঘাঁটিয়া বাহির করিলাম—ভুবনমোহিনী নবীনচন্দ্র নিজেই। কিছু মনে করিও না। ইতি ব্রজেন্দ্রনাথ।"

শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে পড়ল। পরের দিন প্রণাম ক'রে এলাম।

এর পর তাঁর "সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা" একে একে প'ড়ে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে এলাম একদিন। "সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা"-তহবিলে কিছু সাহায্যও দিয়েছিলাম। তাঁর সে কি আনন্দ! আশীর্বাদ জানিয়েছিলেন। বলেছিলেন, ভায়া, দুটি গুণ তোমার আছে। সে দুটিতে যেন খাদ না মেশে। বুঝেছ? অন্যের কীর্তিকে কর্মকে স্বীকার করা, আর নিজের কর্মে ফাঁকি না-দেওয়া। বাস্, ওতেই জীবনযুদ্ধে জয় হয়ে যাবে।

অল্প একটু হেসে ডান হাতখানি বুকের উপর রেখে একটু দুলতেন।

তার পর বললেন, আমার 'বেগম সমরু' আবার ছাপা হচ্ছে। তোমাকে দিয়ে একটা কাজ করিয়ে নেব। আমাকে ভূমিকা লিখতে হবে কথাটা শুনে আমি বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গিয়েছিলাম। এ কি মানুষ!

কীর্তির চেয়ে কীর্তিমান আমার কাছে বড়।

'তোমার কীর্তির চেয়ে তুমি যে মহৎ'—এ তত্ত্ব যার জীবনে সত্য না-হয়ে ওঠে তার তিরোধানে সংসারে ক্ষতি তো বড় নয়; কারণ কীর্তিমানের চেয়ে কীর্তি বড় হ'লে এবং সেই কীর্তি সংসারে থেকে গেলে হিসেবের অঙ্কেই ওই কথা বলবে।

ব্রজেন্দ্রনাথের তপস্যার নিষ্ঠা এবং মানুষ হিসেবে খাঁটিত্বই তাঁকে মহত্তর করেছিল। এবং তাঁর সাহচর্যে এসে এর শিক্ষা তাঁর কাছে আমি নিয়েছি।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

শুধু একটি কথা বলিতে চাই—ব্রজেন্দ্রনাথের সঙ্গে ভগীরথের তুলনা করা চলে পুরাণে আছে, ষাট হাজার সগরসন্তানের ভস্ম রসাতলে অবজ্ঞাত হয়ে পড়ে ছিল, ভগীর গঙ্গাজলে প্লাবিত করে সেই পূর্বপুরুষদের উদ্ধার করেছিলেন। ব্রজেন্দ্রনাথও পূর্বগা বাঙালী সাহিত্য-সাধকগণকে বিস্মৃতি থেকে উদ্ধার করে তাঁদের যোগ্য মর্যাদায় প্রতিষ্ঠি করেছেন। দেশের সমস্ত শিক্ষিত জনের যে কর্তব্য ছিল, ব্রজেন্দ্রনাথ পরম শ্রদ্ধায় নিষ্ঠায় সেই পিতৃযজ্ঞ সম্পন্ন করেছেন।—রাজশেখর বসু : বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে অনুষ্ঠি ব্রজেন্দ্র-স্মৃতিসভায় প্রদত্ত লিখিত বক্তৃতার অংশ।

শ্রদ্ধেয় ঐতিহাসিক ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের তিরোধানে

জীবনের হাসি ইতি হয় যেথা সেথা শুরু ইতিহাস,
সেই হাসি-হীন গহন আঁধারে ফেলে সন্ধানী আলো,
খুঁজেছিলে তুমি হারানো মানিক, ঝরা-কুসুমের বাস,
মরণের মুঠা হইতে ছিনায়ে এনেছ যা কিছু ভাল।

তিল তিল করি রূপ আহরিয়া রচেছ তিলোত্তমা,
কনক-কণিকা বহিয়া এনেছ তুমি সুবর্ণ-রেখা,
তব চেষ্টায়, হে শুভঙ্কর, পাওনায় হ'ল জমা
যে সব হিসাব ছিল এতকাল এলোমেলো হয়ে লেখা।

সগর-বংশ ধ্বংস হয় যে, কাল সে কপিল মুনি,
ভস্ম হইয়া প'ড়ে থাকে তাহা অজানা সাগর-কূলে
তুমি ভগীরথ, তপস্যা-বলে এনে দিলে সুরধুনী
শুষ্ক তরুরে সাজাইয়া দিলে মনোরম ফলে ফুলে।

যে সব কীর্তি ভেসে চ'লে যায় কীর্তিনাশার স্রোতে
তাই আহরিয়া নূতন কীর্তি স্থাপিলে বারম্বার
নূতন সাগরে যাত্রা করিয়া সত্য-নিষ্ঠা-পোতে
বহিয়া আনিলে নূতন বার্তা, নূতন আবিষ্কার।

মরণের বুকে জীবনের গান শুনেছিলে কান পেতে,
তোমার বিলাস ছিল শ্মশানেতে মৃতের ভস্ম যেথা,
রসিক মৃত্যু চিনিল তোমারে শাশ্বত আলোকেতে—
আজ শুনিতেছি যম বলিতেছে, নম নম নচিকেতা,
নম নম নম সত্যনিষ্ঠ, তপস্বী ব্রাহ্মণ,
সত্যের বাণী শুনাই তোমারে হও একাগ্রমন।

"বনফুল"

স্মৃতি-তর্পণ

১৯২৮ সন। কলিকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশন আসন্ন। সেখানে মাঝে মাঝে যাই। কিন্তু মন যে অন্য ধরনের কাজ চায়। সীতানাথ আচার্যের সঙ্গে একদিন 'প্রবাসী' কার্যালয়ে গেলাম। শ্রীযুত সজনীকান্ত দাসের সহিত পরিচয় হইল। 'শনিবারের চিঠি'র অন্যতম কর্ণধার ও 'প্রবাসী'র লেখকরূপে তাঁহার নামের সঙ্গে ইতিপূর্বেই আমার পরিচয় ঘটিয়াছিল। সাক্ষাৎ দর্শন ও পরিচয় লাভ এই প্রথম হইল। তাঁহার নির্দেশে সম্পাদকীয় বিভাগের প্রাথমিক সোপান-স্বরূপ প্রবাসী প্রেসে প্রুফ দেখা শিখিতে শুরু করি। কংগ্রেস-সপ্তাহে প্রবাসী প্রেস ছাড়িলাম। কয়েক দিন গেল। পরে আবার 'প্রবাসী'-আপিসে গেলাম। সজনীবাবু ও অশোকবাবু পরামর্শ করিয়া আমাকে 'প্রবাসী' 'মডার্ন রিভিউ'য়ের সম্পাদকীয় বিভাগে স্থান করিয়া দিলেন। এ তারিখটি ছিল ১৯২৯ সনের ১৪ই জানুয়ারি। ইহারই কয়দিন পূর্বে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'প্রবাসী' ও 'মডার্ন রিভিউ'য়ের প্রধান সহকারী সম্পাদক পদে নিযুক্ত হইয়া আসেন। ব্রজেনবাবুর রচনা ইতিপূর্বেই কিছু কিছু পাঠ করিয়াছি। তাঁহার 'বেগম সমরু'র সমালোচনা সেই কৈশোরে 'প্রবাসী'র পৃষ্ঠায় দেখিয়াছি। 'প্রবাসী'তে কর্ম লইয়া যখন তিনি আসেন, তখনই তিনি মোগল-যুগের কোন কোন দিকের উপর আলোকপাত করিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন। এ হেন ব্রজেনবাবুকে সাক্ষাৎ দেখিলাম। আমাদের উভয়েরই পূর্বে শ্রীযুত নীরদ চৌধুরী সহকারী সম্পাদকরূপে যোগ দিয়াছিলেন। আমি তখন শিক্ষানবিস।

'প্রবাসী' ও 'মডার্ন রিভিউ'য়ের সম্পাদকীয় বিভাগে আমার শিক্ষানবিসি চলিতে লাগিল। এক বৎসরের মধ্যেই বাড়ি বদল করিয়া বর্তমান বাড়িতে আমরা চলিয়া আসি। ব্রজেন্দ্রনাথের কর্মতৎপরতা ও ঐকান্তিক নিষ্ঠা ইতিমধ্যেই আমাকে বিমোহিত করিয়াছে। সম্পাদকীয় বিভাগে তাঁহার সঙ্গে কাজ করিতে করিতে গভীর অধ্যয়নে মন দিলাম।

আমি যুবক, ভবিষ্যৎ সম্মুখে পড়িয়া আছে। ব্রজেনবাবুর উপদেশে আমি একখানি পিটম্যানের শর্টহ্যাণ্ড বই কিনিলাম, টাইপের ক্লাসে ভর্তি হইলাম। ব্রজেনবাবু আমাকে শর্টহাণ্ডে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। তবে শর্টহাণ্ড শেখাও বেশিদূর অগ্রসর হইল না। ইহা সত্ত্বেও ব্রজেন্দ্রনাথ আমার উপর বেশ একটা আস্থা পোষণ করিতেন। আমার মত বিশ্ববিদ্যালয়ের 'র' গ্রাজুয়েটও যে কোন কাজে আসিতে পারে— এ বিশ্বাস তাঁহার মধ্যে তখনই লক্ষ্য করিয়াছি।

'প্রবাসী'-আপিস হইতে ব্রজেনবাবুর সঙ্গে প্রায়ই পার্শিবাগানের আড্ডায় যাই। সেখানে তখন দিনের কাজের পর সুধীবৃন্দ সমবেত হইতেন। মধুর তিক্ত কষায় নানা রকমের আলোচনা হইত। ইঁহাদের সঙ্গে ক্রমে ব্রজেনবাবু পরিচয় করাইয়া দিলেন। তখন রবি-বাসর ব্রজেনবাবু ও তাঁহার বন্ধুবর্গের উদ্যোগে পুনর্গঠিত হইয়াছে। পার্শিবাগানের আড্ডার প্রায় সকলেই ইহাতে যোগ দিলেন। 'ভারতবর্ষ'-সম্পাদক জলধর সেন সর্ব্বাধ্যক্ষ, ব্রজেন্দ্রনাথ সম্পাদক। ব্রজেন্দ্রবাবুর নির্দ্দেশে আমি একটি মোটা খাতায় কার্যবিবরণী লিখিতাম। আচার্য যদুনাথ সরকার এখানে একবার মোগল-যুগের বিচার-প্রণালী সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা দেন। আর একদিনের কথা মনে আছে। সেই দিন করাচিতে কংগ্রেস। ক্যালকাটা হোটেলের দক্ষিণ কোণের ঘরে শরৎ-সাহিত্য সম্বন্ধে একটি সিম্পোসিয়াম বা আলোচনা-বৈঠক বসে। প্রমথ চৌধুরী প্রধান বক্তা বা সভাপতি। আচার্য যদুনাথ, ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, সভাপতি মহাশয় ও আরও অনেকে আলোচনায় যোগ দিয়াছিলেন। সভায় শরৎ-সাহিত্য সম্বন্ধে কাহারও কাহারও অভিমত এখনও আমার স্মরণ আছে। কিন্তু এখানে বলা নিষ্প্রয়োজন।

'প্রবাসী'-আপিসেই একদিন ব্রজেন্দ্রনাথ বলিলেন, একটি বড় জিনিস পাওয়া গিয়াছে। জানিতে বড়ই কৌতূহল হইল। ব্রজেনবাবুর সঙ্গে নীরদবাবুর বাসায় গেলাম। দেখিলাম, শতাধিক বৎসরের পুরাতন

'সমাচার দর্পণে'র ফাইল। ব্রজেনবাবুর কথায় আমিও ইহার পাতা উলটাইলাম। তাহার পর তাঁহার সঙ্গে একদিন শোভাবাজার রাজবাটিতে রাজা রাধাকান্ত দেবের পারিবারিক গ্রন্থাগারটি দেখিতে যাই। কত পুরাতন পুস্তক, পুরাতন ইংরেজী-বাংলা সংবাদপত্রের ফাইল, আবার একটা ঘরে বহু পুরাতন অথচ সুদৃশ্য ছবি। ইহার পরে বহু বার একত্রে এবং অনেক সময় একা গিয়াছি। কিন্তু প্রথম দর্শনের আনন্দ আজও যেন হৃদয় ছুঁইয়া আছে। ব্রজেনবাবু 'সমাচার দর্পণ' হইতে সংবাদ ও মন্তব্যগুলি সংকলন করিয়া 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় পাঠাইতে লাগিলেন। জলধরদাদাও সাগ্রহে তাহা ধারাবাহিকরূপে ছাপাইতে থাকেন। সুধী মহলে কেমন একটা সাড়া পড়িয়া গেল। এই 'সমাচার দর্পণ' আবিষ্কারই ব্রজেন্দ্র-নাথকে বাংলা সাহিত্যের গবেষণায় একান্তভাবে নিয়োজিত হইতে প্রেরণা যোগায়। তাঁহার 'সমাচার দর্পণে'র সংকলন আমাকে যেন অজ্ঞাতসারেই ধীরে ধীরে গবেষণার দিকে টানিতে লাগিল।

ব্রজেন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে গত যুগের বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন অর্গল ক্রমশই খুলিয়া যাইতে থাকে। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্-মন্দিরেও যাওয়া দরকার বোধ করিলেন। প্রথম অবধি ব্রজেন্দ্রনাথের শরীর অপটু দেখিয়াছিলাম। আপিসের ছুটির পর কোথাও যাইতে হইলে প্রায়ই তিনি আমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতেন। আজ স্পষ্ট মনে পড়িতেছে, ব্রজেন্দ্রনাথ আমাকে লইয়া সাহিত্য-পরিষদে গেলেন। আপিস হইতে একসঙ্গে যাইতাম। কিছুকালের মধ্যেই তিনি 'রবি-বাসর' ছাড়িয়া সাহিত্য-পরিষদের সভ্য হইলেন। তাঁহার সভ্য হইবার দিন তারিখ পরিষৎ-দপ্তরে নিশ্চয়ই মিলিবে। যতদূর মনে হয় ব্রজেন্দ্রবাবু ১৯২২ সনে ইহার সভ্য হন। আমিও তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিলাম। সাহিত্য-পরিষদের সভ্য হইলাম। ইহার অল্পকাল পরে ব্রজেন্দ্রনাথ পরিষদের কার্য-নির্বাহক-সমিতির সদস্য হইলেন। পরিষৎ হইতে 'সমাচার দর্পণ' ও অন্যান্য পত্রিকা হইতে সংবাদ ও

তথ্য আহরণ করিয়া সংকলন-গ্রন্থখানি প্রথম তিন খণ্ডে পর পর প্রকাশিত হইল।

পরিষদের কথা বলিতে গিয়া একটু পরবর্তী বিষয়ে আসিয়া পড়িয়াছি। বস্তুত 'সমাচার দর্পণে'র ফাইল আবিষ্কারের পর হইতেই পুরাতন-সংবাদপত্র-অনুসন্ধান-কার্য যেন ব্রজেন্দ্রনাথকে একেবারে পাইয়া বসিল। আরও পুরাতন সংবাদপত্রের ফাইল মেলা সম্ভব পুরাতন গ্রন্থাগারগুলিতে। তাই পুরাতন গ্রন্থাগার কোথায় আছে জোর খোঁজ পড়িল। যতদূর মনে হয়, প্রথম আমরা—ব্রজেন্দ্রনাথ, নীরদবাবু ও আমি উত্তরপাড়ায় যাই। কবি কিরণধন চট্টোপাধ্যায় আমাদের জন্য স্টেশনে অপেক্ষা করিতেছিলেন, তিনি আমাদিগকে উত্তরপাড়ার জমিদার রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়ের ভবনে লইয়া গেলেন। রাসবিহারীবাবু ফরাসীসাহিত্য-রসিক। তাঁহার সুসজ্জিত গ্রন্থাগারটি ফরাসী পুস্তকে পরিপূর্ণ। নীরদবাবুও ফরাসীনবিস। আর যায় কোথায়! দুই জনে খুবই আলাপ জমিল। ব্রজেন্দ্রনাথ কিন্তু আসল উদ্দেশ্য ভুলেন নাই। কিছুক্ষণ পরে আমরা গঙ্গাতীরে জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত উত্তরপাড়া পাবলিক লাইব্রেরি গৃহে উপনীত হইলাম। দীর্ঘশ্মশ্রু বর্ষীয়ান গ্রন্থাগারিক বসিয়া ছিলেন। আমরা ঘুরিয়া ঘুরিয়া গ্রন্থাগারটি দেখিতে লাগিলাম। দক্ষিণ পার্শ্বের বারান্দায় গিয়া দেখি, পুরাতন সংবাদপত্রের বাঁধানো ফাইল স্তূপীকৃত। দুই-এক খানির পাতা উল্টাইয়া দেখিলাম, 'বেঙ্গল ক্রনিকল' ১৮৩২ সনের। পরে এই ফাইলগুলির খোঁজ করিয়াছি, কিন্তু আর দেখিতে পাই নাই। কোথায় ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছে কেহ বলিতে পারে না। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের পক্ষে অপরিহার্য দেখিলাম বোধ হয় এক বৎসরের বাঁধানো—'সংবাদ রসরাজে'র ফাইল। ব্রজেন্দ্রনাথ তো খুবই খুশি। পরে গিয়া কাজ করা যাইবে বিবেচনায় রাখিয়া দেওয়া গেল। কিন্তু হায়, কিছু দিন পরে গিয়া সেগুলিও মিলিল না। ছেঁড়া 'হিন্দু পেটি্রয়টে'র কয়েক সংখ্যা ছাড়া পরবর্তী সময়ে আর কিছুই পাই নাই।

ইহার পর ব্রজেন্দ্রনাথের সঙ্গে পুরাতন পত্র-পত্রিকার অনুসন্ধানে যাই বহরমপুরে। আচার্য যদুনাথের অনুজ অধ্যাপক বীরেন্দ্রনাথ সরকারের গৃহে ব্রজেন্দ্রনাথ ও আমি অতিথি হইলাম। পরদিন সকালে কাশিমবাজার হইতে কবি শৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য আসিলেন। আমরা ডাঃ রামদাস সেনের গ্রন্থাগার দেখিবার জন্যই বহরমপুর গিয়াছি। ভোরে সেখানে গেলাম। কিন্তু তখন গ্রন্থাগারটির অংশবিশেষের অবস্থা দেখিয়া যে দুঃখ পাইয়াছিলাম তাহা এখনও যেন মনে গাঁথিয়া আছে! আলমারির তাকে তাকে উই ইঁদুর বাসা করিয়াছে। বহু মূল্যবান পুস্তক ও পত্র-পত্রিকা তাহাদের ভোগে লাগিয়াছে। বুভুক্ষু ব্রজেন্দ্র-নাথের জন্য বড় একটা বাকি রাখে নাই। তথাপি কিছু কাজের জিনিস সেখানে পাওয়া গেল। আমরা সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিলাম বলিয়া মনে হইতেছে না। পরে হয়তো শৌরীন্দ্রনাথ পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। সম্প্রতি এই অমূল্য গ্রন্থাগারটি ডাঃ সেনের বংশধরগণ ন্যাশনাল লাইব্রেরিকে দান করিয়াছেন। ঐ সময়ে জানা গেল, কাশিমবাজার মহারাজের গ্রন্থাগারেও কিছু পুরাতন কাগজ-পত্র পাওয়া যাইতে পারে। শৌরীনদাদার উপর সে ভার দিয়া আমরা কলিকাতায় ফিরিলাম। ইহার অল্প দিন পরে আমি একা কাশিমবাজার গিয়া 'সংবাদ প্রভাকরে'র বাঁধানো ফাইল লইয়া আসি।

এই প্রসঙ্গে দুইটি কথা বলিতে চাই। একটি এখন বেশ কৌতুককর ঠেকে। কিন্তু ব্রজেন্দ্রনাথ হইলেন সাবধানী পুরুষ। আমরা বর্ষাশেষে বহরমপুরে যাইতেছি। সেখানে ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব। আমরা বহরমপুর যাত্রার পূর্বে প্রত্যেকে দশ গ্রেন করিয়া কুইনাইন খাইয়া-ছিলাম। ব্রজেনবাবুর বোধ হয় ম্যালেরিয়ার ধাত, অহেতুক কুইনাইন সেবনে কোনও বৈলক্ষণ্য হয় নাই। কিন্তু বহরমপুর হইতে ফিরিয়া আসার পরও চার-পাঁচ দিন আমার মাথা ঘুরিয়াছিল। দ্বিতীয় কথাটি কিন্তু ভিন্ন এবং গুরুতর। আমরা যখনই যেখানে যাইতাম, ব্রজেন্দ্রবাবু সব খরচ নিজে বহন করিতেন। গবেষণা-কাজে যে কিছু

র্থব্যয়ও আবশ্যক, এ কথা আজিকার দিনেও যেন অনেকের স্বীকার করিতে বাধে।

এই পুরাতন-সংবাদপত্র-অনুসন্ধান-অভিযান সমানে চলিল। কলিকাতায় ও কলিকাতার বাহিরে আরও বহু জায়গায় আমরা যাই। কলিকাতায় একজন ছাত্রের হেপাজতে পুরাতন সংবাদপত্রের ফাইল আছে জানিয়া আপিসের ছুটির পর তাঁহার হস্টেলে রওনা হইলাম। সাড়ে পাঁচটা হইতে রাত্রি সাড়ে নয়টা পর্যন্ত অপেক্ষা করিবার পর তাঁহার দর্শন মিলিল। তিনি কয়েকখানা মাত্র ফাইল দেখাইলেন, মনে হইতেছে গুড়্‌গুড়ে ভট্টাচার্যের 'সম্বাদ ভাস্করে'র। তাহাতেই আমাদের কি আনন্দ! শুনিলাম ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরিতে (বর্তমানে ন্যাশনাল লাইব্রেরি) পুরাতন বাংলা সংবাদপত্রের ফাইল আছে। ছুটিলাম সেখানে। বাস্তবিকই কিছু কিছু পাওয়া গেল। ব্রজেন্দ্রনাথের সাক্‌রেদী করিতে করিতে আমারও দৃষ্টি এতদিনে খুলিয়া গেল। তখন 'সংবাদ-পত্রে সেকালের কথা' পুস্তক আকারে ছাপা হইবে স্থির হইয়াছে। 'সমাচার দর্পণে'র সমসময়ের অন্যান্য প্রাপ্তব্য সংবাদপত্র হইতেও তথ্যাদি ইহার "পরিশিষ্ট" অংশে দেওয়া হইবে। ইহার ব্যবস্থাও অচিরে করিতে হইবে।

ব্রজেন্দ্রনাথের সঙ্গে পুরাতন পত্র-পত্রিকার ফাইল খুঁজিতে ও ঘাঁটিতে আরও বহু স্থানে গিয়াছি। এখানে সব উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। আমরা চাংড়িপোতা বিদ্যাভূষণ-লাইব্রেরিতে পর্যন্ত পরে গিয়াছি। সে কথা একটু পরে বলিব। সংবাদপত্র সংকলন ও সম্পাদন হইতে ব্রজেন্দ্রনাথের আর এক দিকে দৃষ্টি পড়িল। নাট্যশালার প্রতি তাঁহার স্বাভাবিক ঝোঁক ছিল। তিনি যে এক সময়ে খুব অভিনয় দেখিতেন তাহাও গল্পচ্ছলে আমাদের বহুবার বলিয়াছেন। সংবাদ-পত্রের পৃষ্ঠায় নানা বিষয়ের অবতারণা হইত, এখনও হয়,—নাট্যশালা সম্পর্কেও নানা কথা আবিষ্কৃত হইতে লাগিল। তিনি ইহারও তথ্যমূলক ইতিহাস রচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। এইবার 'অমৃত বাজার পত্রিকা'র

প্রথম যুগের ফাইল ঘাঁটিবার পালা। ১৮৭০ সন হইতে ১৮৭৬ সন পর্যন্ত ইহার ফাইল দেখা হইল। পত্রিকা-আপিসেও আমরা একত্রে গিয়াছি। তখন বর্তমান বিরাট ভবন হয় নাই। সম্মুখের পুরানো বাড়ির নিম্নতলে বসিয়া ফাইল দেখিতাম। ব্রজেন্দ্রনাথ প্রথম প্রথম গিয়াছেন, পরে আমিই যাইতাম। এই সময় রবীন্দ্র-জয়ন্তীর তোড়জোড় আরম্ভ হইয়াছে। তাঁহার নির্দেশে ফাইল ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে রবীন্দ্রনাথের হিন্দু মেলায় (১৮৭৪) পঠিত একটি কবিতা মুদ্রিতাকারে পাইলাম। এটির নাম "হিন্দু মেলার উপহার"। ব্রজেন্দ্রনাথকে আসিয়া বলিলাম। তিনি ইহার সদ্ব্যবহার করিলেন। অনুসন্ধেয় তথ্যাদি ব্যতিরেকে এই সময় আরও অনেক কিছু পাওয়া যাইতে লাগিল।

এখানে 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' সম্পাদনার বিষয় কিছু বলি। আমরা যত জায়গায় গিয়া পুরাতন সংবাদপত্রের ফাইল পাইয়াছি বা সঙ্গে করিয়া আনিয়াছি, তাহা সমুদয়ই আমরা তন্ন তন্ন করিয়া দেখিয়াছি। তখন ব্রজেন্দ্রবাবুর অপটু শরীরেও বিপুল শ্রমশক্তি ও অধ্যবসায় দেখিয়া আমিও সবিশেষ অনুপ্রাণিত হইয়াছি। প্রয়োজনীয় অংশ ব্রজেন্দ্রবাবু সর্বদা 'নোট' করিয়া লইতেন। 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' প্রথম তিন খণ্ডে, ও পরে দুই খণ্ডে বিরাট আকারে বাহির হইয়াছে। ইহার সম্পাদকীয় অংশের পাতায় পাতায় সংবাদপত্র-সমুদ্র-মন্থনের পরিচয় মিলে। প্রতি সংস্করণে সংশোধন-সংযোজন সমানে চলিয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের শিক্ষা, সংস্কৃতি, সাহিত্য, সমাজ, রাষ্ট্রনীতি প্রভৃতির উপর কতখানি আলোকপাত করিয়াছেন, ঐ সময়ের বাঙালী-জীবন সম্বন্ধে যতই আলোচনা চলিবে ততই বুঝা যাইবে। নাট্যশালার ইতিহাস ও সাময়িকপত্রের ইতিহাসে ঐকান্তিক অনুসন্ধিৎসা ও অপরিমেয় অধ্যবসায়ের ছাপ রহিয়াছে। সংবাদপত্রের ফাইল প্রথম দেখিবার কালে বহু জিনিসের প্রতি ব্রজেন্দ্রনাথের দৃষ্টি সম্যক্‌ভাবে খুলে নাই। শেষোক্ত দুইখানির তথ্যসংগ্রহে কাগজগুলির অনেকাংশই আবার নূতন করিয়া তাঁহাকে ঘাঁটিতে হইয়াছে। চাংড়ি-

পোতাস্থ বিদ্যাভূষণ-লাইব্রেরিতে 'সোমপ্রকাশে'র বহু বর্ষের ফাইল সংরক্ষিত আছে। আমরা সেখানে যাই এবং যতদূর মনে পড়ে, প্রথম দিন প্রায় পাঁচ ঘণ্টা একাদিক্রমে দেখিয়া কয়েক বৎসরের ফাইল দেখা শেষ করা হয়। সঙ্গে সঙ্গে তিনি তথ্যাদি 'নোট' করিয়া লন।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে ক্রমে ক্রমে 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' এবং 'বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস' (পরে নাম দেওয়া হইয়াছে —'বাংলার নাট্যশালা') প্রকাশিত হইল। রঞ্জন পাবলিশিং হাউস হইতে 'দেশীয় সাময়িক-পত্রের ইতিহাস' প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এই পুস্তকখানি প্রকাশের ভার পরে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ লন। এখন ইহার নাম দেওয়া হইয়াছে 'বাংলার সাময়িকপত্র'। "দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা" (রঞ্জন পাবলিশিং হাউস) ও "সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা"র (বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ) সূত্রও পুরাতন সংবাদপত্রের ফাইল ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে ব্রজেন্দ্রনাথের মনে উদিত হইয়াছিল নিঃসন্দেহ।

ব্রজেন্দ্রনাথের সংস্পর্শে আসিয়া আমার ভিতরের সহজ ইতিহাস-অনুশীলন প্রবৃত্তি একটি সুস্পষ্ট পথ পাইয়াছে। ইতিহাসের গবেষণা যে কত বিপুল শ্রমসাধ্য এবং অধ্যবসায়-সাপেক্ষ তাহা বিশেষ করিয়া বুঝিতে পারিয়াছি। বস্তুত গত ও গতপূর্ব শতকে বাঙালী-জীবন সম্বন্ধে অনুসন্ধান ও গবেষণার প্রেরণাও তাঁহারই সাহচর্যের ফল। তাঁহার সাক্ষাৎ সংস্পর্শ হইতে—তাঁহার অধ্যবসায়, শ্রমশীলতা ও নিষ্ঠা দেখিয়া আমি প্রেরণা পাইয়াছি, আবার নানা বাধা-বিপত্তির মধ্যেও তাঁহার উৎসাহ-বাণীতেও অনুপ্রাণিত হইয়াছি। তাঁহার সঙ্গে প্রথম সাত বৎসর কাল এমন একাত্ম হইয়া কাজ করিয়াছি যে, অনেকে আজও তাহা উল্লেখ করিয়া থাকেন। আমার প্রতি ব্রজেন্দ্রনাথের অকপট প্রীতি ও প্রত্যয়ের এখানে একটি মাত্র দৃষ্টান্ত দিব।

তখন পরিষৎ দুইটা হইতে আটটা পর্যন্ত খোলা থাকিত। সংবাদ-পত্রের ফাইল ঘাঁটিতে গিয়া উপলব্ধি করিয়াছি, কলিকাতা-প্রবাসী পার্শী বণিক রুস্তমজী কাওয়াসজী এক বিরাট পুরুষ। তাঁহার সম্বন্ধে

গবেষণা করিব স্থির করিয়া প্রত্যহ আপিসের ছুটির পর ব্রজেনবাবুর সঙ্গে পরিষদে যাই ও পুরাতন সংবাদপত্রের ফাইল দেখি। 'ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া'র দশ বৎসরের ফাইল একে একে দেখিয়া ফেলি। কাওয়াসজী সম্বন্ধে যেখানে যাহা প্রকাশিত হইয়াছিল, তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া বাহির করিলাম ও পড়িয়া ফেলিলাম। এই সময় রাধাকান্ত দেবের গ্রন্থাগার ও ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরিতে পুস্তকাদিও ঘাঁটিলাম। প্রায় ছয় মাস অধ্যয়ন ও অনুসন্ধানের পর "রুস্তমজী কাওয়াসজী" প্রবন্ধ লিখি। ব্রজেন্দ্রনাথ পাঠ করিয়া এতই খুশি হইলেন যে, আমাকে লইয়া জলধরদাদার বাড়িতে গেলেন। অত্যল্প সময়ের মধ্যে 'ভারতবর্ষে'র দুই সংখ্যায় এটি প্রকাশিত হয়, স্বনামে লেখা প্রবন্ধ আমার এই প্রথম।

এই অল্পকালের মধ্যেই ব্রজেন্দ্রনাথের চরিত্রে অপূর্ব দৃঢ়তা লক্ষ্য করিলাম। রাজা রামমোহন রায় সম্বন্ধে সত্যকার গবেষণা ব্রজেন্দ্র-বাবুই মনে হয় প্রথম আরম্ভ করেন। কত কাগজপত্র ইণ্ডিয়া আপিস হইতে আনাইয়াছেন এবং কত প্রবন্ধ রামমোহনের উপর লিখিয়াছেন! এগুলির অধিকাংশই 'মডার্ন রিভিউ'য়ে বাহির হইয়াছিল। এই সময় রামমোহন সংক্রান্ত এমন কতকগুলি দলিলপত্র তাঁহার হস্তগত হয়, যাহার মর্ম প্রকাশিত হইলে যেমন রামমোহনের বহুমুখী প্রতিভার উপরে আলোকপাত করিবার সম্ভাবনা, তেমনই বিষম বিতর্ক সৃষ্টি হইতে পারে। কিন্তু সত্যসন্ধ ব্রজেন্দ্রনাথ একবার যাহা ঠিক বলিয়া ধরিয়াছেন তাহা প্রকাশ করিতে, দ্বিধা করিতেন না। রামমোহন সম্বন্ধে কতক নূতন তথ্য সম্পাদক শ্রদ্ধেয় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের অনুমোদনে প্রকাশিত হইল। অন্য প্রবন্ধগুলি অন্যত্র প্রকাশিত হয়। যাহা আঁচ করা গিয়াছিল তাহাই হইল। ভীষণ বিতর্কের সৃষ্টি হইল। কিন্তু ব্রজেন্দ্রনাথ অচল অটল, নিজের ভ্রম না বুঝা পর্যন্ত তিনি মাথা নোয়াইবার পাত্র নন। শেষ পর্যন্ত তাঁহার চরিত্রের এই বিশিষ্টতা লক্ষ্য করিয়াছি। আজ তাঁহার সম্বন্ধে কত কথাই না মনে হইতেছে!

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

৺ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় স্মৃতি

আমি ব্রজেন্দ্রবাবুকে মাত্র বার দুই দেখিয়াছিলাম, কিন্তু তাঁহার সহিত আলাপ করিবার সুযোগ হয় নাই। ইতিহাসক্ষেত্রে তাঁহার কৃতকর্মের পরিচয় পাইয়া আমি তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট ও শ্রদ্ধান্বিত হইয়াছিলাম।

অনেক বৎসর পূর্বে 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' পড়িয়াছিলাম। পড়িতে পড়িতে অনেকবার মনে হইয়াছিল সংবাদপত্র সমসাময়িক সমাচারের আকর; কিন্তু, কি আশ্চর্য, এই আকরের দিকে এ পর্যন্ত কাহারও দৃষ্টি পতিত হয় নাই। এইরূপই হয়। স্থানে স্থানে মাণিক্য আছে, গুণী অন্বেষণ করেন, অন্যে করে না। মণিকার মাণিক্যের পরিকর্ম করিয়া তাহাকে মহামূল্য করিয়া তোলেন। দুই কর্মই কঠিন। ব্রজেন্দ্রবাবু সে দুই কর্ম করিয়া আমাদের নিকট মহামূল্য সমাচার শোনাইয়াছেন। তিনি পরিকর্মে অসামান্য বিচারণা প্রদর্শন করিয়াছেন।

ইহার কয়েক বৎসর পরে একদিন আমি "সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা"র প্রায় চল্লিশ খণ্ড পুস্তক পাই। সাহিত্য-সাধকদিগের নাম পড়িয়া আমি আবার ভাবিয়াছিলাম, কি আশ্চর্য, এই কর্ম পূর্বে কাহারও মনে উদিত হয় নাই।

ইহার বিশেষ কারণ ছিল। 'বিষাদসিন্ধু' পুস্তকের কে লেখক এবং কি বিষয় জানিবার আমার প্রয়োজন হইয়াছিল। কিন্তু সে বই কোথায় পাইব, কে বলিয়া দিবে? আমার জিজ্ঞাসা অপূর্ণ রহিয়া গেল। দেখি, আমি এতদিন যাহা খুঁজিতেছিলাম, তাহা ব্রজেন্দ্রবাবুর "চরিতমালা"য় আছে। আমি 'প্রবাসী'তে "চরিতমালা" সম্বন্ধে কিছু লিখিয়াছিলাম। আর, ব্রজেন্দ্রবাবুর আকর অন্বেষণের ও পরিকর্মের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিলাম। আমি খান কয়েক বই পড়িয়াছিলাম। মাইকেলের 'মেঘনাদবধ কাব্য' সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছিলাম।

আমি যখন কলেজে পড়ি তখন আমাদের বাংলা ভাষা কিংবা সাহিত্যের সহিত সম্পর্ক ছিল না। কিন্তু আমরা বাংলা বই পাইলে পড়িতাম। 'মেঘনাদবধ কাব্য' আমাদের অত্যন্ত প্রিয় গ্রন্থ ছিল। ইহার ভাষার ওজস্বিতা, উপমার নূতনত্ব এবং কল্পনার বৈচিত্র্য আমাদিগকে মুগ্ধ করিত। আমরা ইহার নিন্দা সহিতে পারিতাম না। কিন্তু তৎকালের সাহিত্যিকদিগের কান ঠুংরী, কদাচিৎ কাওয়ালী শুনিতে অভ্যস্ত ছিল। তাঁহারা মাইকেলের ধ্রুপদ সহিতে পারিবেন কেন? তদুপরি মাইকেলের নূতন নূতন নামধাতুর প্রয়োগ দেখিয়া তাঁহারা হা হতোস্মি রবে চীৎকার করিতে লাগিলেন। সেই সময়ে 'ছুছুন্দরীবধ কাব্য' নামে একখানা চটী বই আমাদের হাতে আসে। কে একজন 'মেঘনাদবধে'র ব্যঙ্গ করিয়াছেন! মনে পড়ে আমরা সেই বইখানা এক নর্দমায় দগ্ধ করিয়াছিলাম। চাঁচর দিনে গ্রামের লোকে মেণ্টাসুর দগ্ধ করিয়া হর্ষ কোলাহল করে, আমরাও তেমনি 'ছুছুন্দরী'-দাহের সময় হর্ষধ্বনি করিয়াছিলাম। এই বইখানার কবির নাম আমার মনে ছিল না। মনে থাকিবার কথাও নহে। আমরা সে নাম উচ্চারণ করিতাম না। আমার আলোচনায় একজনের নাম লিখিয়াছিলাম। ব্রজেন্দ্রবাবু 'প্রবাসী' আপিসে কাজ করিতেন, তিনি আমায় লিখিয়াছিলেন কবির নাম জগদ্বন্ধু ভদ্র। আমি যে নাম লিখিয়াছি সেটা ভুল। আমি তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে লিখি, আমার ভুল সংশোধন করিয়া ছাপিতে দিবেন।

ইহার কয়েক বৎসর পরে আমি আর এক ভুল করিয়াছিলাম। এই ভুল অমার্জনীয়। দশ-বারো বৎসর পূর্বে বাঁকুড়াতে এক তরুণী-সঙ্ঘ 'জাগরণী' নামে এক পত্রিকা প্রকাশ করেন। আমি পত্রিকাকে আশীর্বাদও করি। এই পত্রিকার সম্পাদিকা পরিচালিকা সকলকেই চিনিতাম। এই তরুণী-সঙ্ঘ সম্বন্ধে 'প্রবাসী'তে এক প্রবন্ধে কিছু লিখিয়াছিলাম। সে প্রবন্ধ ছাপা হইবার পর ব্রজেন্দ্রবাবু আমার ভুল দেখাইয়া দেন। আমি লিখিয়াছিলাম, পত্রিকাখানি মাসিক এবং অল্প-

কালেই অদৃশ্য হইয়াছিল। ব্রজেন্দ্রবাবু লিখিলেন, পত্রিকাখানি ত্রৈমাসিক এবং কিছুকাল ধরিয়া বাহির হইত। একদিন তরুণী-সঙ্ঘের এক মুখ্যার সহিত দেখা হইলে তাহার নিকট আমি জানিলাম, পত্রিকাখানি ত্রৈমাসিক বটে এবং দেড় বৎসর চলিয়াছিল। এইরূপ, এখানকার আর এক পত্রিকা সম্বন্ধে ভুল করিয়াছিলাম। ব্রজেন্দ্রবাবু ধরিয়াছিলেন। তাই ভাবি, আমার এই রকম ভুল আর কে সংশোধন করিয়া দিবেন?

তাঁহাকে আমি জীবন্ত গেজেট মনে করিতাম। একবার বিদ্যাসাগর মহাশয় বর্ধমানের আদালতে কি এক মোকদ্দমায় সাক্ষী হইয়া আসেন। আমি তখন বর্ধমানের মহারাজার ইস্কুলে পড়িতাম। সেই বিদ্যাসাগর মহাশয় আসিয়াছেন যাঁহার ব্যাকরণ, উপক্রমণিকা ও ঋজুপাঠ পড়ি? ইস্কুল হইতে আমরা তাঁহাকে দেখিতে আদালতে ছুটিয়াছিলাম। সেখানে তাঁহার ভীম মূর্তি দেখিয়াছিলাম। কিন্তু কোন্ সালে, আমি ভুলিয়া গিয়াছিলাম। বৎসর দুই পূর্বে সাল, জানিবার আমার প্রয়োজন হয়। ব্রজেন্দ্রবাবুকে লিখিতেই তিনি সাল কি বিষয়ের মোকদ্দমা আর কোন্ বইয়ের কোন্ পৃষ্ঠায় বিস্তৃত বিবরণ আছে আমাকে দুই দিন পরে জানাইয়াছিলেন। এখন ভাবি, কার কাছে আমার জিজ্ঞাসার উত্তর পাইব?

দেখিতেছি, "সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা"য় শতাধিক সাধকের চরিত সংগৃহীত হইয়াছে। আর কত সাধকের হইত কে বলিবে? আমি যে কয়খানা দেখিয়াছি তাহা হইতে বলিতে পারি, তিনি তাঁহার নির্দিষ্ট কর্মের সম্যক যোগ্য ছিলেন। ভাষা প্রাঞ্জল, চরিতের কুত্রাপি বাগ্‌বাহুল্য নাই। ভাব-উচ্ছ্বাস নাই। হর্ষ-বিষাদ নাই। তিনি নির্বিকার চিত্তে সাধককে নিরীক্ষণ করিয়াছেন।

ব্রজেন্দ্রবাবু সাহিত্য-সাধকের চরিত বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার 'বাংলা সাময়িক-পত্রে' কত যশস্বী লেখকের নাম আছে, আমরা সে সব নাম হঠাৎ কোথাও পাইতাম না। মহিলা-সম্পাদিত সাময়িক-পত্রে

মহিলাদের নাম আছে। 'বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাসে' বিখ্যাত নাট্যকারের পরিচয় পাই। তাঁহার জাল বিস্তীর্ণ হইলেও স্থানে স্থানে ফাঁক রহিয়া গিয়াছে। যেমন মহোপাধ্যায় চরিত, প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ, কালীবর বেদান্তবাগীশ, পঞ্চানন তর্করত্ন, যাদবেশ্বর তর্করত্ন প্রভৃতির চরিত জানিতে চাই। ইঁহারা সংস্কৃত ভাষায় মহোপাধ্যায় ছিলেন। কিন্তু তাহাতে কিছু আসে যায় না। ব্রজেন্দ্রবাবু 'সংস্কৃত কলেজের ইতিহাসে' কয়েকজনের নাম করিয়াছেন। কিন্তু শুধু নাম শুনিতে চাই না, চরিত জানিতে চাই। বাংলা দেশে যে কত প্রসিদ্ধ গায়ক ও বাদক ছিলেন, আমরা তাঁহাদিগকেও চিনিতে চাই।

বিষ্ণুপুরের মার্গসঙ্গীত, দাশু রায়ের পাঁচালী, কবির লড়াইয়ের কবিগান, যাত্রাগান প্রভৃতির এক বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র পড়িয়া আছে। রাজনীতি ক্ষেত্রে কৃষ্ণদাস পাল, বিপিন পাল, মতিলাল ঘোষ, চিত্তরঞ্জন দাস, নেতাজী সুভাষচন্দ্র প্রভৃতিব চরিতের ছোট ছোট বইয়ের অভাব আছে। বাণিজ্যক্ষেত্রেও যশস্বী বাঙ্গালী ছিলেন। আমরা বড় বড় পুস্তক চাই না, দেড় শত পৃষ্ঠার মধ্যে এই সব চরিত সম্পূর্ণ হইলেই বাঙ্গালী বাঙ্গালীকে চিনিতে পারিবে। প্রত্যেক বিভাগের নিমিত্ত এক দুই তিন যোগ্য অভিজ্ঞ লেখক নিযুক্ত করিতে হইবে। এক কিংবা দুই যুগ্ম সম্পাদকের নির্দেশ অনুসারে লেখকেরা লিখিবেন। আমার মনে হয় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ এই কর্মে উদ্‌যোক্তা হইলে পশ্চিমবঙ্গরাজ অর্থদান করিতে পারেন।

লেখক নির্বাচনে বিশেষ সতর্ক হইতে হইবে। লেখক পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিবেন না, বাগ্‌বাহুল্য বর্জন করিবেন এবং অর্থ না দিয়া শব্দবিশেষ ব্যবহার করিবেন না। আজকাল 'প্রগতিবাদী' 'প্রগতিশীল' শব্দ কাগজে পড়ি। কিন্তু 'প্রগতি' শব্দের দ্বারা কি বুঝিতে হইবে, তাহা আমি অদ্যাপি জানিতে পারি নাই। এইরূপ কত লোকে 'সংস্কৃতি', 'সাংস্কৃতিক' শব্দ প্রয়োগ করিতেছেন, কিন্তু সংস্কৃতির দ্বারা কি বুঝিব তাহা কেহ বলেন নাই।

১৮৫৭ সালে স্বাধীনতা-সংগ্রাম আরম্ভ হইয়াছিল। ইংরেজেরা ইহাকে সিপাহী-বিদ্রোহ বলিতেন। আর ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা লাভ হইয়াছে। এই নব্বই বৎসর বিদেশীর শাসনে নিষ্পিষ্ট হইয়াও বাঙ্গালীর চিত্ত কত দিকে চালিত হইয়াছে, এই সকল চরিতমালার দ্বারা আমরা জানিতে পারিব। কিন্তু উপযুক্ত লেখক চাই। ভাষার আস্ফালন দ্বারা যোগ্যতা বিচার চলিবে না। কিন্তু ইতিহাসের নামে তথ্যের কিংবা নামের বৃহৎ তালিকা চাই না। ভাষার প্রসাদ ও মাধুর্যগুণ না থাকিলে কেহ পড়িবে না। বাংলা ভাষায় তথ্যপূর্ণ বড় বড় ইতিহাস আছে। সে সব কেবল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রেরা পড়ে। না পড়িলে পরীক্ষা পার হইতে পারে না। জিজ্ঞাস্য এই, অন্যেরা পড়ে না কেন?

যাহার ঐতিহাসিক প্রবৃত্তি নাই, তাহার রচিত ইতিহাস প্রশংসার যোগ্য নয়।

কথাটা একটু বিস্তৃত করিয়া লিখিতেছি। মানবশিশু নানাবিধ প্রবৃত্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করে। কেহ কলহপ্রিয়, কেহ শান্ত, কেহ কপট, কেহ অকপট, কেহ ক্রূর, কেহ দয়ালু ইত্যাদি। এ সকল সহজাত প্রবৃত্তি চিরজীবন মানুষের চরিত্রে প্রভাব বিস্তার করিতে থাকে। শিক্ষা ও সংসর্গের দ্বারা অবাঞ্ছনীয় প্রবৃত্তি পরিবর্তিত হইতে পারে, কিন্তু সে পরিবর্তন প্রায়ই বাহ্য। সহজাত প্রবৃত্তি সুযোগ পাইলেই ব্যক্ত হয়। হিতোপদেশে আছে, বেদাধ্যয়নই কর আর শাস্ত্রপাঠই কর স্বভাব মস্তকে বিদ্যমান থাকে। নানা পর্যবেক্ষণের ফলে আমরা বলি, "অঙ্গার শতধৌতেন মলিনত্বং ন মুঞ্চতি" অথবা আমরা চলিত কথায় বলি, স্বভাব যায় না ম'লে।

সহজাত প্রবৃত্তি অনেক। কেহ কেহ বাচাল হয়, তাহারা জল্পনা করিতে ভালবাসে। যাহাদের জল্পন-প্রবৃত্তি, তাহারা জল্পক। সেইরূপ কেহ কেহ তথ্য অন্বেষণে আনন্দ পায়, তাহাদের এষণ-প্রবৃত্তি, তাহারা এষক। এই দুই প্রবৃত্তি প্রায় বিপরীত। ইহাদের অবান্তর, অর্থাৎ মধ্যবর্তী, উভয়ের অন্তর্গত নানা প্রবৃত্তি আছে। জল্পকেরা জল্পনা কল্পনা

করিতে ভালবাসে। এক কথা বার বার বলে, একই ভাব প্রকাশ করিতে বাগ্‌বাহুল্য করে। জ্ঞানের বিষয় অনুভূতির বিষয় নহে, বাগ্‌-বাহুল্যের কি প্রয়োজন থাকিতে পারে? যখন আমরা ভাষায় মনের ভাব প্রকাশ করিতে পারি না তখন উপমার আশ্রয় লই। কেহ কেহ একটা উপমায় তুষ্ট হন না, অনেক উপমা দিতে থাকেন। কেহ কেহ তাহাতেও তুষ্ট হন না, উপমারও উপমা চড়াইয়া মূল ভাব আরও অস্পষ্ট করিয়া তোলেন। ইহার প্রধান কারণ তাঁহারা যাহা বলিতে চাহেন, সে সম্বন্ধে তাঁহাদের স্পষ্ট জ্ঞান বা ধারণা নাই।

কিন্তু এষকদিগের মনের প্রবৃত্তি অন্য প্রকার। তাঁহারা যেটুকু জানেন, যে তথ্য জানিতে পারিয়াছেন সেইটুকু বলিয়া তৃপ্ত হন। তাঁহারা জানেন, বাগ্‌বাহুল্যে প্রকৃত তথ্য প্রচ্ছন্ন ও অস্পষ্ট হইয়া পড়ে। বর্তমান মুদ্রাবাহুল্যে টাকার ক্রয়মূল্য কমিয়া তিন চার আনায় দাঁড়াইয়াছে। ভাষার শব্দের বাহুল্যে শব্দের অর্থগৌরব হ্রাস পায়। এষণ-প্রবৃত্তি বৈজ্ঞানিক প্রবৃত্তি। যাহাকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি বলি, সেটা আর কিছু নহে, সেটা তর্ক-বিদ্যার অনুমোদিত পদ্ধতি। তর্ক-বিদ্যার অনুমান-খণ্ড আয়ত্ত করিতে না পারিলে বৈজ্ঞানিক প্রবৃত্তি জল্পক প্রবৃত্তির তুল্য হইয়া পড়ে। কখন কখন দেখি ইতিহাস-লেখক অনুমান-খণ্ড বিস্মৃত হইয়া কেবল অন্বয় দ্বারা অনুমান সিদ্ধ করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। উদাহরণও অধিক নয়, দুই একটা মাত্র। দুই একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি।

কেহ লিখিয়াছেন, "পূর্বকালে বঙ্গদেশে অনার্যদিগের বাস ছিল। আমরা তাহাদের নিকট হইতে অনেক দেবদেবী পাইয়াছি।" কথাটা শুনিতে বেশ। কিন্তু একটু তলাইয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবেন, তিনি তাঁহার প্রতিজ্ঞার পুনরুক্তি করিয়াছেন, নূতন কিছু বলেন নাই। উদাহরণ সংগ্রহে ভুল হইতে পারে, কিন্তু এক তথ্যের সহিত অন্য তথ্য মিশ্রিত হইলে বুঝি, লেখকের জল্পন-প্রবৃত্তি ব্যক্ত হইয়াছে। কেহ লিখিয়াছেন, "মধ্যযুগে বঙ্গদেশে পট্টবস্ত্রের ব্যবহার ছিল। পট্টবস্ত্র

হিন্দুর পবিত্র। বহুকাল পূর্বে বঙ্গদেশে নালিতা পাট ছিল কিন্তু ইদানীং পাটের চাষ বাড়িয়া উঠিয়াছে।" এখানে লেখক পট্টবস্ত্রের পট্ট ও নালিতা পাট এক মনে করিয়াছেন। ধর্মঠাকুরের প্রতিমা কচ্ছপ, কোন কোন অসভ্য জাতি কচ্ছপকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করে। কচ্ছপ তাহাদের 'স্তম'। কেহ লিখিয়াছেন, ধর্মঠাকুর অসভ্য জাতির নিকট হইতে আসিয়াছে। তিনি ভাবেন নাই, কাশ্যপ অসংখ্য ব্রাহ্মণের গোত্র। এই সকল ব্রাহ্মণ নিশ্চয় প্রাচীন অসভ্য জাতির বংশধর নহেন।

বলা বাহুল্য জল্পন-প্রবৃত্তির মানুষই অধিক। গল্পের বক্তাই ইহার প্রমাণ। এষণ-প্রবৃত্তির মানুষ অল্প। কিন্তু তাঁহারাই প্রকৃত ঐতিহাসিক হইতে পারেন। যদি জল্পন-প্রবৃত্তির মানুষ কোন বিষয়ের ইতিহাস লেখেন তাঁহার ইতিহাসে, আর এষণ-প্রবৃত্তির লেখকের ইতিহাসে বস্তুনির্দেশে প্রভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। আমি ব্রজেন্দ্রবাবুকে এষণ-প্রবৃত্তির মানুষ মনে করি। বৈজ্ঞানিক প্রবৃত্তি তাঁহার আয়ত্ত ছিল। তিনি কখনও গল্প লিখিয়াছিলেন কি না জানি না। আমার মনে হয় তাঁহার গল্পরচনার প্রবৃত্তিই ছিল না। তিনি যাহা করিয়া গিয়াছেন, বাঙ্গালী তাহা চিরদিন স্মরণ করিবে। আর বলিতে থাকিবে, কবে ব্রজেন্দ্রনাথের স্থান পূর্ণ হইবে?

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়

"পথিকবিরল পন্থে পান্থ তুমি হে বৃদ্ধ-নবীন।
স্বয়ংপায়গৃহীত এ তপে মগ্ন তাপস মহান্
হয়ত জান না তুমি তোমার কীর্তির পরিমাণ
কস্তুরীমৃগের মত : সাধিয়াছ দেশের কি হিত
দিয়া পথ-সন্ধান ও অজানারে জানার ইঙ্গিত।
শতাব্দীর ধূলিচাপা অবলুপ্ত বহু মহাজনে
জীয়াইলে তুমি যাঁর জীয়ন-কাঠির পরশনে
বাংলা ও বাঙালীর নষ্টপৃষ্ঠ মহাইতিহাস
বহুলবর্ণাম্বু মথি উদ্ধারিয়া করিলে প্রকাশ।"

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় : 'প্রবাসী,' কার্তিক ১৩৫২

'ব্রজেনদা'

সরল,. সত্যনিষ্ঠ, বলিষ্ঠ ব্রজেনদার প্রাণের হোমাগ্নি আচমকা নিবে গেল!

মৃত্যুর ছত্রিশ ঘণ্টা আগে পর্যন্ত দেখে এসেছি তাঁর বলিষ্ঠতার নমুনা। দরাজ গলায় সাড়া দিয়েছেন, দরজা খুলেছেন; চরণে প্রণত কনিষ্ঠকে বলিষ্ঠ দুখানি হাত দিয়ে টেনে বুকে তুলে কোলাকুলি করেছেন। ধীরে সুস্থে ঈজি-চেয়ারে ব'সে কথাবার্তা বলেছেন।

কথাবার্তা মানেই অবশ্য কাজের কথা। নিছক বিশ্রম্ভালাপ তাঁর ধাতে ছিল না কোনকালে। কুশল-প্রশ্নাদির পর্ব মাত্রে দু-চার কথায় সেরে নিয়েই তিনি চিরকাল পাড়তেন কাজের কথা—সাহিত্য-পরিষদের কথা। হয়, কার্য-নির্বাহক-সমিতির আগামী অধিবেশনের কর্মসূচী, নয়-তো ভবিষ্যতের কার্যক্রম; কি ভাবে পরিষৎকে উন্নত করা যায়—এই সব। সেদিন প্রাথমিক স্বল্প-পরিসর কুশল-প্রশ্ন বিনিময়ের সময় বলেছিলেন, "এই পরশু, মানে মঙ্গলবার রাত্রেই তো প্রায় বিদেয় নিয়েছিলুম হে ব্রাদার! অত রাত্রে সে কি কাণ্ড! না, এখন আবার দিব্যি আছি; ডাক্তারের কথামত শুধু খই-দুধ খাচ্ছি। ওঠা-হাঁটা বারণ; এই শুয়ে ব'সেই যেটুকু পড়াশুনো কাজকর্ম করা চলে। এর মধ্যেও বার দুয়েক সজনীর বৈঠকখানা (পাশের বাড়ি) পর্যন্ত গেছি।"

মারা যাবার কয়েকদিন আগে ব্রজেনদার জন্মদিন উপলক্ষে সজনীদা তাঁর বাড়িতে নেহাত অন্তরঙ্গদের নিয়ে একটু 'আমোদ-আহ্লাদে'র ব্যবস্থা করেছিলেন। সেদিন কপালে চন্দনের ফোঁটা পরা, ফুলের মালা গলায়, হাসিমুখ ব্রজেনদাকে বেশ নতুন রকম দেখতে লাগছিল। সেই তাঁর শেষ জন্মদিনের উৎসব। সেদিন বন্ধুজনের দেওয়া নানা উপহারের মধ্যে এসেছিল জনৈক বন্ধুর উপহার—একখানি উৎকৃষ্ট তাঁতের কাপড়। পোশাক সম্বন্ধে নেহাত সাদাসিধে ব্রজেনদাকে ওই দামী কাপড় আদৌ পরানো যাবে কি না অথবা

কাপড়খানি প'রে ঘুরে বেড়ালে তাঁকে কেমন দেখাবে, তা আর আমাদের দেখা হ'ল না। সেদিন কে জানত, প্রদীপের ঠিক নিচেই কালোছায়ার মত তাঁর জন্মদিনের অত কাছাকাছি তাঁর অমোঘ মৃত্যুর দিনটিও ঘাপটি মেরে লুকিয়ে আছে!

অন্তিমযাত্রায় কাপড়খানি তাঁর সঙ্গে দিয়ে দেওয়া হয়েছে।

টাকা-পয়সা বা সাংসারিক উপকরণাদি সম্পর্কে তাঁর প্রয়োজনবোধ ছিল কম। অথচ তিনি বেহিসেবী ছিলেন না। পরিষদের একটা পয়সার সম্পর্কে পর্যন্ত তিনি ছিলেন অত্যন্ত সচেতন। এতই সচেতন যে, তাঁকে প্রায় কৃপণ বলা চলতে পারত।

কিন্তু কৃপণ যে তিনি ছিলেন না, তার একটা উদাহরণ দি। সেদিন তাঁর 'রবীন্দ্র রচনাবলী'র একটি খণ্ড টেনে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে গিয়ে নজরে পড়ল, পোকায় দামী মলাট ফুটো করেছে কয়েক জায়গায়। তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করতেই তিনি বললেন, "হ্যাঁ-দেখেছি; ও-মলাট ফেলে দিয়ে আবার নতুন ক'রে মলাট বাঁধিয়ে না নিলে বইগুলোকে বাঁচানো যাবে না। দোব এবার বাঁধাতে।"

তাঁর মত আর্থিক অবস্থাসম্পন্ন অন্য কেউ এ কথা ভাবত কি না সন্দেহ। অতগুলো খণ্ডের প্রত্যেকখানির জন্যে অন্তত টাকা তিনেক ক'রে মোট অতটা টাকা খরচ করার সঙ্কল্প করতে তাঁর একটুও ইতস্তত দেখলুম না। এমন মানুষকে কৃপণ বলি কি ক'রে? তিনিই তো ঐতিহাসিক তথ্যের প্রমাণ-সংগ্রহের প্রয়োজনে বিলেতের বিভিন্ন জাদুঘরে রক্ষিত দুষ্প্রাপ্য বইয়ের পৃষ্ঠার ফোটো তুলিয়ে আনতেন নিজের খরচে। অথচ তাঁর আয় ছিল কত কম!

কিন্তু আয় কম হ'লে কি হবে? সাহিত্য-পরিষদের গ্রন্থ-প্রকাশ সম্পর্কে কঠিন পরিশ্রমে এক-একটি কার্য সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের পর পারিশ্রমিক হিসাবে একেবারেই নগণ্য যৎসামান্য আর্থিক মর্যাদা তাঁকে সর্বসম্মতিক্রমে যখনই দেওয়া হয়েছে, তখনই সে টাকা কোন না কোনও ছলে তিনি সাহিত্য-পরিষৎকেই আবার দান করেছেন।

এমনই নির্লোভ ছিলেন তিনি, এবং এমনই প্রগাঢ় প্রীতি ছিল তাঁর সাহিত্য-পরিষদের প্রতি।

সাহিত্যিক গবেষণা ও পরিষৎ সম্পর্কে তাঁর নিষ্ঠার দৃঢ়তাকে সুকঠোর ছাড়া আর কিছু বলা না গেলেও বিনয়গুণে তিনি ছিলেন নিতান্ত 'মাটির মানুষ'। তাঁর রবীন্দ্র-পুরস্কার-প্রাপ্তিতে তাঁকে যাঁরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে অভিনন্দনপত্র পাঠিয়েছিলেন, তার মধ্যে তাঁর অজানা অনুরক্তের সংখ্যাও নিতান্ত অল্প ছিল না। তিনি তাঁদের প্রত্যেককে স্বহস্তে সবিনয় ধন্যবাদ জানিয়ে পত্র দিয়েছিলেন। কি আন্তরিক সে বিনয়!

নীরস গবেষণায় ব্যাপৃত থাকলেও অন্তরটি ছিল তাঁর সুরসিক। গবেষণাকালে চিত্রশিল্প-সংক্রান্ত যে সব তথ্য তাঁর হাতে আসত, গবেষণার বিষয়বস্তুর বহির্ভূত হ'লেও সেগুলিকেও তিনি অবহেলা করতেন না। বাংলার চিত্রশিল্পের সম্পর্কে একখানি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনা করবার মত সম্পূর্ণ মালমশলা যে-কেউ ইচ্ছে করলেই তাঁর কাছ থেকে পেয়ে যেতে পারত।

তাঁর নাট্যকার বন্ধু-বান্ধবরা তাঁকে নিজেদের লেখা নাট্যের অভিনয় দেখবার জন্যে কখনও কখনও সিনেমা-থিয়েটারে টেনে নিয়ে গেছেন। তিনিও পরম আগ্রহে সেগুলি দেখে উপভোগ ক'রে মূল্যবান মতামত ব্যক্ত করেছেন। এই প্রসঙ্গে এ কথাও বলা দরকার যে, হাস্যরসের প্রতি আবার তাঁর বিশেষ একটি অনুরাগ ছিল।

সাহিত্য-পরিষৎ আছে, অথচ ব্রজেনদা নেই—এমন অপরিহার্য অবস্থাও যে একদা আসবে তা কোনও দিন কল্পনা ক'রে রাখি নি ব'লেই আঘাতটা নিতান্ত আচমকা লাগছে। কিন্তু যা ঘটবার তাকে রোধ করে কে?

এখন তাঁর প্রিয় পরিষদের শ্রীবৃদ্ধি হ'লেই তাঁর আত্মার শান্তি হবে।

শ্রীমনোমোহন ঘোষ (চিত্রগুপ্ত)

গবেষক ব্রজেন্দ্রনাথ

একটা সময় আসে যখন শিল্পী-সাহিত্যিকের আর কিছু দেবার থাকে না। তখন তিনি অসহায়ভাবে নিজেরই পুনরুক্তি করতে থাকেন, আত্ম-অনুকরণের একটা সকরুণ ব্যর্থতা তাঁর প্রায় প্রত্যেকটি রচনার মধ্যে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। কায়িকভাবে না হ'লেও সেইখানেই স্রষ্টার মৃত্যু। রবীন্দ্রনাথের মত দু-একটি আশ্চর্য প্রতিভা ছাড়া পৃথিবার সর্বদেশেই এই বেদনাভরা মানসমৃত্যু আমরা দেখেছি।

সেই জন্যেই, নির্মম হ'লেও এ সত্য অস্বীকার করা যায় না যে, নির্বাপিত শিল্পীর দৈহিক মৃত্যুর মধ্যে শোক আছে কিন্তু ক্ষোভ নেই। তাঁর যা দেবার তিনি দিয়েছেন; সেই দানের যথার্থ মূল্য যদি থাকে, তা হ'লে ভাবীকালের কাছেও তার অকুণ্ঠ স্বীকৃতি রইল। শিল্পী সেখানে অমর।

কিন্তু ব্রজেন্দ্রনাথের মৃত্যু শুধু ক্ষত নয়, তা এমন একটা ক্ষতি যে সুদূরভবিষ্যতেও তা পূরণ হওয়ার কোনও সম্ভাবনাই দেখা যাচ্ছে না। বাঙালীর গড়পড়তা পরমায়ুর হিসাবে তাঁর মৃত্যুকে অকাল-ঘটিত বলব কি না জানি না। কিন্তু বাংলা ভাষা এবং সাহিত্যের দিক থেকে তাঁর শুধু শতায়ু নয়—তার চেয়ে অনেক বেশি দীর্ঘায়ু হওয়ার প্রয়োজন ছিল।

সংবাদপত্র, সাময়িকপত্র, নাট্যশালা থেকে শুরু ক'রে আধুনিক বাংলা রস-সাহিত্যের উৎপত্তি এবং প্রগতির ইতিহাস রচনার প্রচেষ্টা অনেকেই করেছেন। দেশ তাঁদের সকলের কাছেই কৃতজ্ঞ। কিন্তু এদিক থেকে ব্রজেন্দ্রনাথ যা করেছেন, তার তুলনা হয় না। একটি মানুষ তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনের গণ্ডীর মধ্যেও নিষ্ঠা এবং অধ্যবসায়ের সাহায্যে যে কি অসাধারণ কীর্তি রেখে যেতে পারেন—সর্বকালের বাঙালীর কাছে ব্রজেন্দ্রনাথ তার উদাহরণ হয়ে থাকবেন। ইংরেজোত্তর বাংলা-সাহিত্যের প্রায় সর্ববিভাগকে তিনি যে শৃঙ্খলা ও ঐতিহাসিক পরম্পরার মধ্যে সাজিয়ে দিয়েছেন, তার মূল্য যে কতখানি তা হয়তো

সাধারণ বাঙালী বুঝতে পারবেন না; কিন্তু এ সমস্ত জিনিস নিয়ে যাঁদের দৈনন্দিন কারবার তাঁরা জানেন, ব্রজেন্দ্রনাথ দিগ্‌দর্শকরূপে উপস্থিত না থাকলে কি সীমাহীন অন্ধকারে তাঁদের হাতড়ে বেড়াতে হ'ত। অজস্র ভুলে ভরা লং সাহেবের ক্যাটালগের দাসত্ব থেকে আমাদের মুক্তি দিয়েছেন প্রধানত ব্রজেন্দ্রনাথ। অপরিসীম অধ্যবসায় এবং অক্লান্ত গবেষণার মধ্য দিয়ে পূর্বগামী সাহিত্যসাধক এবং সাহিত্যের যে পরিচিতি তিনি রচনা ক'রে গেছেন, তা হয়তো বহুতর সংশোধন ও সংযোজনের দাবি রাখে; কিন্তু এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, ব্রজেন্দ্রনাথের কীর্তিকে ভিত্তি ক'রেই ভবিষ্যতের সমস্ত গবেষণা গঠিত হয়ে উঠবে।

'সংবাদপত্রে সেকালের কথা,' 'বাংলা সাময়িক-পত্র' বা "সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা"য় তাঁর রচিত গ্রন্থাবলী শুধু সংকলনমাত্রই নয়। সবচেয়ে বড় কথা এই যে, অনেকের মত ব্রজেন্দ্রনাথ শুধু ক্যাটালগই রচনা করেন নি। এই বইগুলিতে তাঁর নির্বাচন এবং নির্ধারণ বিশেষভাবে লক্ষ্য করবার মত। ধারাবাহিক পঞ্জী নয়—সন-তারিখ দলিল-চিঠিপত্রের বিবৃতি নয়—এগুলির মধ্য থেকে তিনি এমনভাবে উপকরণ নির্বাচন করেছেন যে তাদের ভেতর দিয়ে বাংলা দেশের পরিপূর্ণ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক স্বরূপ মূর্ত হয়ে উঠেছে। আমার তো মনে হয়, এক 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' পড়লেই বিগত শতাব্দীর বাংলা ও বাঙালীর সম্পর্কে যে জ্ঞানলাভ করা যায়, একটি সমগ্র লাইব্রেরি থেকেও সে জ্ঞান দুর্লভ্য।

ব্রজেন্দ্রনাথ বার বার সবিনয়ে জানিয়েছেন, তিনি সাহিত্যিক নন। হয়তো নন। কিন্তু তাঁর যে কোনও গ্রন্থের সংকলন এবং বিন্যাসের মধ্যে যে রুচি ও পরিচ্ছন্নতার পরিচয় মেলে তা শিল্পীসুলভ। এই নির্বাচনের মধ্য দিয়েই ধরা পড়ে, ব্রজেন্দ্রনাথ শুধু গবেষক নন, তিনি আর্টিস্টও বটেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও শিল্পী ব্রজেন্দ্রনাথ হয়তো কোনদিনই রসিক মহলে স্বীকৃতি পাবেন না। কারণ যে কাজ তিনি

বেছে নিয়েছিলেন, তাতে খ্যাতির সম্ভাবনা নেই, জনপ্রিয়তার অবকাশ নেই, মুগ্ধ ভক্তের উচ্ছ্বসিত প্রীতি-নিবেদন নেই, অর্থাগমেরও সুযোগ নেই। এ কাজ শুধুমাত্র সাধকেরই—ফলাকাঙ্ক্ষাহীন কর্মই যার শেষ কথা।

অথচ, এর চেয়ে অনেক অল্প পরিশ্রম ক'রেই ব্রজেন্দ্রনাথ জনপ্রিয় হতে পারতেন। নামমাত্র মূলধন সংগ্রহ ক'রে, বাগাড়ম্বরের ঘন ঘটায় গবেষক এবং স্রষ্টার জয়মাল্য নিয়েছেন বাংলা দেশে এমন ব্যক্তির অভাব নেই। কিন্তু হাততালির মোহ ছিল না ব'লেই ব্রজেন্দ্রনাথ নিজেকে বা দেশকে ফাঁকি দেওয়ার কথা কল্পনাও করেন নি। তাঁর সত্যনিষ্ঠ মন প্রতিটি জিনিসকে নির্ভুলভাবে বুঝতে এবং বোঝাতে চেষ্টা করেছে। তাঁর উদ্যম এবং ঔৎসুক্যের মধ্যে কোথাও ক্লান্তি ছিল না। প্রতিটি তথ্যকে তিনি বারে বারে যাচাই ক'রে নিয়েছেন, যতক্ষণ নিঃসন্দেহ না হয়েছেন ততক্ষণ তাকে তিনি গ্রহণ করেন নি। তাই রচনাকে সুপেয় পানীয় না ক'রে তাকে তিনি পুষ্টিকর খাদ্য ক'রে তুলেছেন; আর এ জাতীয় খাদ্যের প্রতি অরুচি আছে ব'লেই বাঙালীর মানসিক স্বাস্থ্যের দিকটা আজ এমনভাবে পঙ্গু হয়ে আসছে।

ব্রজেন্দ্রনাথের গবেষণার একটি দিক বিশেষভাবে স্মরণীয়। ইংরেজীতে যাকে "open mind" বলে, তাঁর মধ্যে সেই ঔদার্য চমৎকারভাবে প্রকটিত হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়, আমাদের যে কোনও আলোচনা এবং গবেষণার মধ্য দিয়ে আমরা নিজেদেরই আরোপ করতে চাই, অর্থাৎ যোগফল আগে ক'ষে নিয়ে প্রয়োজনমত সংখ্যা-সন্নিবেশ করি। সাহিত্য-বিচারে এ রীতি কখনও কখনও গ্রহণীয় হতে পারে, কিন্তু গবেষণার ক্ষেত্রে এ মনোভাব মারাত্মক। পূর্বকল্পিত একটি সিদ্ধান্তকে যেমন ক'রে হোক প্রমাণ করতে হবে, এ মনোভঙ্গী গবেষকের দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন ক'রে ফেলে। তখন অনেকগুলি সত্যকে পাশ কাটিয়ে যেতে হয়, পৌর্বাপোর্যহীন বিচ্ছিন্ন অংশকে পূর্ণাঙ্গ ব'লে চালাতে হয়, অর্ধসত্যকে সত্য ব'লে দাবি করতে হয় এবং নিঃসংশয়

ভ্রান্তিকেও অন্ধ গোঁড়ামির সাহায্যে আঁকড়ে রাখতে হয়। শুধু অহমিকা এবং আত্মতুষ্টির খাতিরে এ জাতীয় আত্মপ্রবঞ্চনা বাংলা দেশে বহুবারই আমরা দেখেছি। কিন্তু ব্রজেন্দ্রনাথ এ রকম কোনও পূর্বনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত নিয়ে তাঁর কাজে এগিয়ে আসেন নি। তাঁর মন সংস্কারবিহীন, তাঁর বিচার অপক্ষপাত। প্রিয় হোক আর অপ্রিয় হোক, সত্যজিজ্ঞাসাই তাঁর কাম্য, তিনি সত্যব্রত। নিজেকে সংশোধন করার সুযোগ তিনি সব সময়ে গ্রহণ করেছেন, অপরের ঋণ সানন্দে স্বীকার ক'রে গেছেন।

কিন্তু মজার কথা এই, তাঁর ঋণ অনেকেই স্বীকার করেন নি। ব্রজেন্দ্রনাথের গবেষণা থেকে বহু জনেই বহুভাবে উপকরণ গ্রহণ করেছেন, অথচ তাঁদের মধ্যে একটা বৃহদংশ ব্রজেন্দ্রনাথের নামোল্লেখ পর্যন্ত করতে কুণ্ঠিত হয়েছেন।

হয়তো তার একটা কারণ আছে। সাহিত্যে ব্যাকরণের নিয়ম মানতে গিয়ে আমরা যেমন বৈয়াকরণের উল্লেখ করি না, অথবা বানানের ভ্রান্তির জন্যে অভিধানের দ্বারস্থ হয়েও আভিধানিককে কৃতজ্ঞতা জানাই না, বাংলা-সাহিত্যমূলক গবেষণায় ব্রজেন্দ্রনাথের ভূমিকাও তাই। তিনি এমনি অপরিহার্য, এমনি স্বতঃসিদ্ধ যে, তাঁকে শিরোধার্য ক'রেই আমরা যাত্রা আরম্ভ করি। আমি নিজে শিক্ষাব্রতী। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, সাহিত্যের ইতিহাস পঠন-পাঠন প্রসঙ্গে ব্রজেন্দ্রনাথ অনেক ক্ষেত্রেই আমাদের আভিধানিক অথরিটি; স্বীকৃতি কথাটি তুচ্ছ—তাঁকে আমরা আত্মসাৎ ক'রে নিয়েছি।

এই জন্যেই ব্রজেন্দ্রনাথের আরও বহুকাল বেঁচে থাকবার প্রয়োজন ছিল। শাস্ত্রমতে, অন্তত বাংলা দেশে, পঞ্চাশোর্ধ্বে সাহিত্য-প্রতিভায় ভাঁটার টান পড়ে। কিন্তু গবেষকের ক্ষেত্রে তার বিপরীত। তাঁর বয়স যত বাড়ে, অভিজ্ঞতা তত বেশি পরিমাণে সঞ্চিত হয়—তাঁর বিচারবোধ তত পরিচ্ছন্ন এবং উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। সেই উজ্জ্বলতাতেই ব্রজেন্দ্রনাথ পরিপূর্ণ হয়ে উঠছিলেন। কিন্তু অত্যন্ত আকস্মিক এবং অপ্রত্যাশিত ভাবে তাতে ছেদ পড়ল। অনেকগুলি আরব্ধ কাজ তিনি

শেষ ক'রে যেতে পারলেন না, তাঁর সাধনার অনেকখানিই অসম্পূর্ণ র'য়ে গেল। দুর্ভাগ্য এই, বাংলা দেশে তাঁর উত্তরসাধকের পদধ্বনি এখনও শুনতে পাওয়া যাচ্ছে না।

ব্রজেন্দ্রনাথ সম্পর্কে আর একটা কথা বার বার আমার মনে পড়ছে। সাহিত্যিক বলতে যা বোঝায় হয়তো তা তিনি ছিলেন না। কিন্তু আমাদের ছেলেবেলায়—সম্ভবত অধুনালুপ্ত 'খোকাখুকু' মাসিকপত্রের পাতায় তিনি ছোটদের জন্যে যে সব ঐতিহাসিক কাহিনী রচনা করতেন, আমরা তা মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে পড়তাম। তাঁর কেল্লা-ফতে' বা 'রণডঙ্কা' আমাদের শিশুচিত্ত জয় ক'রে নিয়েছিল। সরল সুন্দর ভাষায় সেদিন ইতিহাসের যে সব কাহিনী তিনি আমাদের শুনিয়েছিলেন, তাদের আকর্ষণ যে তখনকার দিনের রূপকথা-উপকথার চাইতে কিছুমাত্র কম ছিল না—সে কথা আজও আমি ভুলি নি।

যত দূর জানি, পাকা সাহিত্যিকের কলম হাতে না থাকলে শিশু-চিত্ত হরণ করা যায় না। অতএব সাহিত্যের পথে পদক্ষেপ ব্রজেন্দ্রনাথের পক্ষে অনধিকারীর হ'ত না। তবু সে পথ ছেড়ে দিয়ে কেন তিনি গবেষণার কণ্টকারণ্যে প্রবেশ করেছিলেন, তার উত্তর খুঁজলেই ব্রজেন্দ্রনাথের ত্যাগ ও তপস্যার খানিকটা পরিমাপ আমরা করতে পারব।

শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

মৃত্যুহীন ব্রজেন্দ্রনাথ

বাংলা দেশের আজ বড় দুর্দিন। একজন অনলস সাহিত্যসেবী আমাদের ছেড়ে চ'লে গেলেন। স্বর্গীয় ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্য ও সংবাদপত্রের গবেষণাক্ষেত্রে একজন দিক্‌পাল ছিলেন এবং তাঁর বিরাট দানের ছবি বাংলা-সাহিত্যের ইতিহাসে চিরোজ্জ্বল হয়ে জেগে থাকবে। সাহিত্যসাধনায় তাঁর আজীবন

তপস্যার ফল পেয়েছে এই বাঙালী জাতি। সাহিত্য-গবেষণাই ছিল তাঁর যোগধর্ম আর বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ ছিল তাঁর যোগাশ্রম। তাই, যদিও জৈব জগতে তাঁকে আমরা আর পাব না, কিন্তু তাঁর অবদানের মধ্য দিয়েই তিনি আমাদের মধ্যে বেঁচে আছেন এবং চিরদিন বেঁচে থাকবেন। তাঁর কাছে আমাদের অপরিসীম ঋণ সমগ্র বাঙালী জাতি অকুণ্ঠচিত্তে স্বীকার করবে।

ব্রজেন্দ্রনাথের সঙ্গে আমার বহু দিনের পরিচয়। তাঁর মধ্যে লক্ষ্য করেছি একটা অদ্ভুত প্রাণচঞ্চল সাহিত্য-ব্যাকুলতা, আর তাঁর কর্মময় জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত সেই নিষ্ঠাই অব্যাহত ছিল। তাই বঙ্গ-সাহিত্যের গবেষণায় তাঁর অনাড়ম্বর সাবলীল সত্যনিষ্ঠার প্রকাশভঙ্গীতে আমি বিস্মিত ও মুগ্ধ হয়েছি। সাহিত্য-পরিষদে তাঁর সঙ্গে প্রায়ই দেখা হ'ত। ঠিক দুপুরে, যখন তিনি কাগজ-কলমের মধ্যে ডুবে থাকতেন, লোকজনের কোনও ঝামেলা থাকত না, আমি তাঁর কাছে যেতাম। সাহিত্যের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনার ফাঁকে ফাঁকে তিনি প্রায়ই বলতেন, 'আমার তো বিদ্যে ফোর্থ ক্লাস, থার্ড ক্লাস।' আমিও সহাস্যে উত্তর দিতাম, 'রবীন্দ্রনাথের কোনও ছাপ ছিল না, কিন্তু সাহিত্যক্ষেত্রে যে সর্বতোমুখী প্রতিভার ছাপ তিনি দিয়ে গিয়েছেন, তা জাতির জীবনে অমর হয়ে আছে। ঐতিহাসিক গবেষণার সাহায্যে আপনিও যে ছাপ দিয়েছেন, তার প্রভাবও চিরন্তন হয়েই থাকবে। সেখানে আপনি যে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট।'

কত দুর্গম উৎস হতে যে তিনি তাঁর গবেষণার তথ্য সংগ্রহ করেছেন, কত দুরূহ পাঠের উদ্ধার যে তাঁকে করতে হয়েছিল, তাই তাঁর রচনাবলী সম্বন্ধে এখানে কিছু বলা সম্ভব না হ'লেও এর পেছনে যে বিপুল পরিশ্রম লুকিয়ে রয়েছে, সে কথা ভাবতে গেলে স্তম্ভিত হতে হয়। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে ব্রজেন্দ্রনাথের সেবা অবিস্মরণীয়। প্রকৃতপক্ষে এই পরিষদের গত বিশ বছরের ইতিহাস ব্রজেন্দ্রনাথ ও সজনীকান্তের অধ্যবসায় ও অক্লান্ত পরিশ্রমের কাছে ঋণী।

অদ্ভুত ছিল তাঁর জ্ঞানপিপাসা। আমাদের লালগোলা লাইব্রেরিতে বহু দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের সংগ্রহ আছে—এ সংবাদও তিনি রাখতেন আর মাঝে মাঝেই এইরূপ গ্রন্থের উল্লেখ ক'রে আমার কাছে সন্ধান চাইতেন।

বঙ্গ-সাহিত্যের গবেষণায় ব্রজেন্দ্রনাথ যে পথ কেটে রাস্তা তৈরি ক'রে গিয়েছেন, আগামী কালের সাহিত্যসেবীও সন্ধানীর পতাকা নিয়ে সেই পথেই জয়যুক্ত হবে।

স্মৃতির মন্দিরে ব্রজেন্দ্রনাথের মৃত্যুহীন প্রাণ জাতির জীবনে অচঞ্চল দীপশিখার মত জেগে রইল।

শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়

মানুষ ব্রজেন্দ্রনাথ

"গুল্মবৃক্ষের জঙ্গলে যদি দেখি একটা প্রকাণ্ড মহীরুহ অভ্রভেদ ক'রে উঠেছে, তা হ'লে যেমন অবাক বিস্ময়ে তার পানে তাকাই, তেমনই সাহিত্য-ক্ষেত্রেও মুষ্টিমেয় যে কজন দিক্‌পাল পুরুষ আর সবাইকে ছাড়িয়ে খ্যাতির তুঙ্গ শিখরে স্বকীয় মহিমায় বিরাজ করছেন, কেবল মাত্র তাঁদেরই জীবন ও কৃতির কথা আমার মনকে বিস্ময়ে অভিভূত করে। সাহিত্য-সাধনায় তাঁদের আদর্শই আমাকে বরাবর এগিয়ে চলবার প্রেরণা দিয়েছে—বড় আদর্শ সামনে ছিল ব'লেই অল্পে আমি কখনও তৃপ্ত হই নি।"—ঠিক এমনই ধরনের কথা আমাকে বলেছিলেন ব্রজেন্দ্রনাথ মৃত্যুর সপ্তাহখানেক পূর্বে। এই পূজোর সময় সপ্তমীর দিন অপরাহ্নকালে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাই। ঘণ্টার পর ঘণ্টা গল্প-গুজব, নানা প্রসঙ্গ নিয়ে আলাপ-আলোচনা চলে। কেন জানি না, সেদিন তাঁর হৃদয়ের কপাট অর্গলমুক্ত হয়ে গিয়েছিল। নিজের ব্যক্তিগত জীবনের অনেক কথাই তিনি আমাকে বলেছিলেন। ব্রজেন্দ্রনাথ আজ নেই, কিন্তু তাঁর এই কথাগুলো যেন এখনও আমার কানে বাজছে। তাঁর সাহিত্যিক জীবনের মূল সুরটিই যে এই

কথাগুলির মধ্যে অনুরণিত। সাহিত্য-সাধনায় ব্রজেন্দ্রনাথের আদর্শ ছিল "ভূমৈব সুখং নাল্পে সুখমস্তি।" এরণ্ড-সমাকীর্ণ আধুনিক বাংলা-সাহিত্যক্ষেত্রে তিনিও ছিলেন মহাদ্রুম। তাঁর বিরাট সাহিত্য-কীর্তির পানে তাকিয়ে আমাদেরও বিস্ময়ের পরিসীমা নেই।

বাংলা-সাহিত্যে ব্রজেন্দ্রনাথের 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা,' 'বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস' প্রভৃতি পুস্তক এবং "সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা"র স্থান কোথায়, তাঁর গবেষণার দ্বারা উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা দেশের কোন্ কোন্ বিস্মৃত অধ্যায়ের উপর আলোকপাত হয়েছে, কোন্ কোন্ "অজ্ঞাত বিষয়ে তিনি প্রথম সন্ধানী," তৎসম্পর্কে আলোচনা করবার যোগ্যতা আমার নেই। বাংলার শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী গুণী ও মনীষীরা সে কাজ ইতিপূর্বে করেছেন এবং ভবিষ্যতেও আরও অনেকে করবেন। আমার পক্ষে সে বিষয়ে আলোচনা করতে যাওয়া কতকটা অনধিকার চর্চার সামিল।

কিন্তু প্রায় আট-ন বছর ব্রজেন্দ্রনাথের সহকর্মীরূপে কাজ ক'রে 'মানুষ' ব্রজেন্দ্রনাথের এমন কতকগুল চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আমি লক্ষ্য করেছি যা আজকের দিনে বিরল। তিনি 'বড়' হয়েছিলেন, কিন্তু এই বড় হওয়ার জন্যে কি পরিমাণ মূল্য যে তাঁকে দিতে হয়েছে, জীবনের আরাম আয়েস বিসর্জন দিয়ে কি কঠোর সাধনা করতে হয়েছে, তার কিছুটা তাঁর নিজের মুখে শুনেছি, কিছুটা বা চোখে দেখেছি। শ্রদ্ধায় মন ভ'রে উঠেছে—তাঁর সবল মনুষ্যত্ব, একাগ্র সাহিত্য সাধনা, চারিত্রিক দৃঢ়তা, সত্যনিষ্ঠা, স্পষ্টবাদিতা ইত্যাদি সদ্গুণাবলীর প্রত্যক্ষ পরিচয় পেয়ে। চালাকির দ্বারা সস্তায় কিস্তিমাৎ করতে চান নি তিনি, 'বড়' হওয়ার বহু উপকরণ তাঁর প্রকৃতিতেই নিহিত ছিল।

সর্বোপরি তিনি ছিলেন পৌরুষের প্রতীক। কথা-প্রসঙ্গে আমাকে তিনি বলেছিলেন, "জীবনে কারও কাছে মাথা নোয়াই নি। কোনও প্রতিকূল অবস্থা আমাকে দমাতে পারে নি। বাধা যতই প্রবল হয়েছে, ততই তাকে অতিক্রম করবার জন্যে নিজের ভেতরে একটা

অদম্য শক্তি ও প্রেরণা অনুভব করেছি এবং অভীষ্ট সিদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত ক্ষান্ত হই নি।"

ব্রজেন্দ্রনাথের বাইরের আকৃতি যেমন ছিল রুক্ষ, প্রকৃতিতেও তেমনই ছিল পরুষভাবের আধিক্য। কিন্তু এ কথা খুব কম লোকেই জানে যে, এই বাহ্যিক-কঠোর আবরণের অন্তরালে ছিল এক অত্যন্ত স্নেহপ্রবণ কিন্তু অশ্রুপাতপ্রবণ নয়—দরদী কোমল হৃদয়, বা পরের দুঃখে, অপরের অভাব-অনটনের কাহিনীতে বিচলিত হয়ে উঠত। ব্রজেন্দ্রনাথ ছিলেন তাঁর স্নেহভাজনদের একান্ত হিতৈষী, সতত-কল্যাণকামী। কিন্তু তাঁর স্নেহ ছিল অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত—বাইরে তার প্রকাশ ছিল না, তাঁর স্নেহ সুপ্রকাশিত হ'ত আচরণে, বাক্যে নয়। ব্রজেন্দ্রনাথের শুধু স্নেহভাজন নয়, একান্ত অন্তরঙ্গ হওয়ার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল ব'লেই তাঁর চরিত্রের এই দিকটার ঘনিষ্ঠ পরিচয় লাভ করবার সুযোগ আমি পেয়েছি, এবং কঠোরতা ও কোমলতায় মিশ্রিত তাঁর ব্যক্তিত্বের স্বরূপটি আমার নিকট উদ্‌ঘাটিত হয়েছে।

শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র

শ্রদ্ধার্ঘ

পরলোকগত সাহিত্যসাধক ব্রজেন্দ্রনাথের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করতে গিয়ে আজ বার বার একটা কথাই আমার মনে পড়ছে। সেটা হ'ল মানুষকে বিচার করতে প্রতিনিয়ত আমরা যে ভুল করি, সেই কথা। একটি মানুষের সঙ্গে সামান্য কিছু আলাপ-পরিচয় হ'লেই আমরা তাকে জানি ব'লে গর্ব করতেও কসুর করি না। কিন্তু এ জানা যে কত ভুল হতে পারে, তা বোধ হয় আমরা ভেবেও দেখি না। মানুষের সঙ্গে মানুষের সহজ আন্তরিকতার সম্পর্ক স্থাপিত না হওয়া পর্যন্ত তার মনের ছদ্মাবরণ যেমন খুলে পড়ে না, তেমনই তার আসল রূপটি জানাও সম্ভব হয় না। এমন ঘটনা ঘটাও অস্বাভাবিক

নয় যে, একটি মানুষের সঙ্গে দিনের পর দিন মেলামেশা ক'রি, আড্ডা দিই, অথচ তার প্রকৃত রূপ জা'ন না। তার একমাত্র কারণ বোধ হয়, মানুষ বহুরূপী। বহিরাবরণে আমাদের প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের বিস্ময়কর সাদৃশ্য আছে, কিন্তু মনের মিল কতটুকু সে বিষয়ে গভীর সন্দেহের অবকাশ আছে। বিশেষ ক'রে যাঁরা শিল্পী, যাঁরা স্রষ্টা, যাঁরা বুদ্ধিবাদী, মানুষের ধ্যান ও ধারণার যাঁরা নিয়ামক, যাঁদের স্বকীয় ব্যক্তিত্ব অত্যন্ত স্পষ্ট, তাঁদের ক্ষেত্রে এ কথাটা খুব ভালভাবেই খাটে। তাই সময়বিশেষে এ সব মানুষকে খেয়ালী, রূঢ়ভাষী এবং উদাসীন প্রকৃতির হতেও দেখা যায়। কিন্তু এটাই তাঁদের চরিত্রের সামা'জক রূপ নয়।

এই ধরনের বিশেষ একটি মানুষের জীবনের বিশেষ কতকগুলি মুহূর্তের সঙ্গে যদি আ'ম পরিচিত হই, তবে তাঁর সম্বন্ধে ভাল হোক মন্দ হোক একটা বিশেষ ধরনের ধারণাই হয়তো আমার মনে বদ্ধমূল হয়ে থাকবে এবং সেই আক'স্মক ধ্যান-ধারণা দিয়েই হয়তো আমি তাঁর সমস্ত চরিত্রের বিচার করব। কিন্তু আমার বিচারে ত্রুটি থেকে যাবে অনেকখানি। তার কারণ, নির্ভেজাল ভাল মানুষ এবং নির্ভেজাল খারাপ মানুষ দু'নিয়াতে বড় একটা দেখা যায় না। সংস্কার ও চর্চার দ্বারা কেউ হয়তো নিজের সদ্‌গুণগুলিকে বহুলপরিমাণে বাড়িয়ে তোলে, আবার কেউ হয়তো বা চর্চা ও সংস্কারের পথে বদ্‌গুণগু'লকেই বড় ক'রে তোলে জীবনে। দুজনের মধ্যে ব্যবধান অনেকখানি থাকলেও মনুষ্যোচিত সাদৃশ্যও বড় কম নেই। সময় এবং সুযোগমত খারাপ মানুষের চরিত্রের এক-একটা ভাল দিকও যেমন ধরা পড়ে তেমনই ভাল মানুষের চরিত্রের খারাপ দিকগুলিও মাঝে মাঝে দৃষ্টিপথবর্তী হয়।

পরলোকগত ব্রজেন্দ্রনাথের স্মৃ'তর উদ্দেশে ব্য'ক্তগত শ্রদ্ধা নিবেদন করতে গিয়ে এত কথার অবতারণা করলাম এই জন্য যে, তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় খুব ঘনিষ্ঠ পর্যায়ের না হ'লেও তাঁর চরিত্রের একাধিক

বিপরীত গুণ আমার চোখে পড়েছিল। সাধারণত মৃতের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের ব্যাপারে আমরা ইংরেজী প্রবাদবাক্য—'Man wars not with the dead' এই নীতিবাক্যটির অনুশাসন মেনে নিয়ে কেবল তাঁর গুণের প্রসঙ্গই বলি, তাঁর চরিত্রের দোষত্রুটিগুলি বেমালুম চেপে যাই। আমার মতে এ পদ্ধতি খুব সমীচীন নয়। কারণ এতে মানুষের প্রকৃত এবং সমগ্র রূপটি ধরা পড়ে না। মানুষকে শ্রদ্ধা-নিবেদনের নামে দেবতার মত পূজা করা বোধ হয় ঠিক নয়। দোষে-গুণে-মিশ্রিত যে মানুষ, তাকেই আমরা ভালবাসি এবং শ্রদ্ধা করি। তাই ব্রজেন্দ্রনাথের সঙ্গে আমার যে পরিচয় ছিল তার বর্ণনা-প্রসঙ্গে তাঁর চরিত্রের কোন কোন ত্রুটিবিচ্যুতির উল্লেখ যদি করি, আশা করি আমার পাঠক-পাঠিকারা তা ক্ষমার চোখে দেখবেন। আমার এই প্রয়াসের পিছনে তাঁর মহান ব্যক্তিত্বকে ছোট করার কোন অভিপ্রায় নেই। আমি যা বলছি তা নিছক সত্যের খাতিরেই বলছি এবং তাতে মানুষ ব্রজেন্দ্রনাথকে আরও ভাল ক'রে বোঝার সুযোগই হবে ব'লে আমার বিশ্বাস।

কয়েক বৎসর আগেকার কথা। আমি তখন শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দত্ত কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ও সম্পাদিত মাসিক 'মাতৃভূমি'র সহযোগী সম্পাদক। এই পত্রিকাখানি মুদ্রিত হ'ত 'প্রবাসী'-ছাপাখানায়। এই প্রসঙ্গে আমাকে মাঝে মাঝেই 'প্রবাসী'-কার্যালয়ে যেতে হ'ত। তখনই সর্বপ্রথম ব্রজেন্দ্রনাথের সংস্পর্শে আসি। তাঁর গবেষণামূলক রচনা ও বিপুল খ্যাতির সঙ্গে পরিচয় ছিল অনেক আগেই। মানুষটিকে দেখে কিন্তু সে পরিমাণ মুগ্ধ হই নি। তাঁর চেহারাটাও যেমন কাঠ-খোট্টা ধরনের ছিল, তেমনই তাঁর কথাবার্তায়ও অনেকটা কাটা-কাটা ভাব ছিল। প্রয়োজনবোধে তিনি নিতান্ত পরিচিত এবং বন্ধু-স্থানীয় ব্যক্তিকেও মুখের উপর অপ্রিয় সত্য কথা বলতে কুণ্ঠিত হতেন না। অপ্রিয় সত্যভাষণ অনেকের কাছে দোষের পর্যায়ভুক্ত হ'লেও যাঁরা নিজেরা নিষ্ঠাবান, কৃত্রিমতা-বিরোধী এবং প্রয়োজনবোধে

অপ্রিয় সত্যভাষী, তাঁরা একে গুণের পর্যায়ভুক্ত ব'লেই মনে করেন।

গবেষণার ক্ষেত্রে সাহিত্যিক বা ঐতিহাসিক তথ্যের ভুল হ'লে তিনি মুখের ওপর কটুভাষা প্রয়োগ করতেন—এতটুকু দয়ামায়া দেখাতেন না। আমি নিজে একজন ভুক্তভোগী। তাঁর কাছ থেকে সামান্য ব্যাপারে আঘাত পেয়ে আমার মনও বিরূপ হয়েছিল।

সুস্থ মুহূর্তে পরে যখন সব বিচার ক'রে দেখে'ছলাম, তখন তাঁর ওপর রাগ গিয়ে'ছিল কেটে। বুঝে'ছলাম যে, তাঁর যে কটুভাষিতার পরিচয় পেয়েছিলাম সেটা তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক। এই বৈশ্য-যুগে জ্ঞান-বিজ্ঞান নিয়ে যেখানে প্রতিনিয়ত ব্যবসায় চলেছে, সেখানে তিনি ছিলেন অনেকটা নিষ্কাম সাধক।

তিনি যখন যে বিষয় নিয়ে গবেষণা করেছেন, তখন সে সম্বন্ধে সম্ভাব্য সকল তথ্য ও সত্যই উদ্‌ঘাটিত করার প্রয়াস পেয়েছেন। ভুল তথ্যপূর্ণ সস্তা চটকদার বস্তু দিয়ে মানুষের মনোরঞ্জনের প্রয়াস তিনি পান নি। এ মানুষের পক্ষে কোন বইয়ে তথ্যের ভুল চোখে পড়লে ক্ষমা করা সহজসাধ্য নয়। এই সত্য যখন বুঝলাম তখন নিঃশব্দে মেনে নিলাম যে, তাঁর কটুভাষিতা আমার সাহিত্য-জীবনে উপকার ছাড়া অপকার করবে না। সেই মুহূর্তে তাঁর বিরুদ্ধে মনের সমস্ত রাগ মুছে গিয়ে অবিমিশ্র শ্রদ্ধার উদ্রেক হ'ল।

কয়েক মাস পরে এবং তাঁর মৃত্যুর মাস কয়েক পূর্বে তাঁর সঙ্গে আমার শেষ সাক্ষাৎ হয় 'শনিবারের চিঠি'র কার্যালয়ে। সেটা বোধ হয় কোন এক রবিবার হবে। বহুদিন পরে 'শনিবারের চিঠি'র শ্রদ্ধেয় সম্পাদক শ্রীসজনীকান্ত দাসের সঙ্গে সেদিন দেখ করতে গিয়েছিলাম। গিয়ে দেখি, সেদিনের প্রাভাতিক আসরে শ্রদ্ধেয় ব্রজেন্দ্রনাথও উপস্থিত। কয়েক মাস পূর্বে আমার সম্পাদিত একটি পুস্তকের ভুল-প্রদর্শন বিষয়ক সাক্ষাৎ বিবরণী মনে প'ড়ে যাওয়ায় ভাবলাম হয়তো ব্রজেন্দ্রনাথ আমার সঙ্গে ভাল ক'রে কথাই বলবেন না। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখলাম বিপরীত

মৃত্যু। তিনি আমাকে খুবই ভালভাবে গ্রহণ করলেন এবং তিন জনে মিলে একাদিক্রমে অনেক রাজনীতি আলোচনা করা হ'ল। একাধিক ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে আমার মতান্তরও ঘটল, অথচ তাঁর তরফে কোন রকম অহেতুক উষ্মার পরিচয়ই পেলাম না। ব্রজেন্দ্রনাথের গৃহ সজনীবাবুর গৃহের সংলগ্ন। আলোচনা-শেষে ওঠার সময় আমি প্রস্তাব করলাম যে, তাঁর বাড়িটি আমি দেখে যাব। তিনি সানন্দে সম্মতি জানিয়ে সাদর আহ্বান ক'রে আমাকে নিয়ে গেলেন তাঁর গৃহে।

সেদিন ব্রজেন্দ্রনাথের চরিত্রের আর একটি দিকের পরিচয় পেলাম, যেদিকটা আমার কাছে একেবারেই অজ্ঞাত ছিল। সেটি হ'ল তাঁর চরিত্রের কোমল ভাবপ্রবণ দিকটি। আপাতদৃষ্টিতে দৃঢ়তা ও কোমলতার মধ্যে পরস্পর-বিরোধ থাকলেও মানুষের জীবনে এ দুটিই সত্য। ছোট বাড়িটির সব কিছু গৃহস্বামী সেদিন আমাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখালেন এবং কথা-প্রসঙ্গে বলতে লাগলেন তাঁর জীবনের চরম ট্রাজেডির কথা। জানতাম তিনি নিঃসন্তান। তাঁর স্ত্রীও যে কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসালয়ে আছেন, সেদিন তাঁর মুখ থেকেই সে কথা শুনলাম। তাঁর প্রতিটি কথায় আমি পেলাম কারুণ্যের স্পর্শ। বুঝলাম, সব থেকেও তাঁর কিছু নেই, এই বয়সে তিনি একেবারে নিঃসঙ্গ একাকী। শিশুর মত অসহায় মানুষটির জন্য সেদিন আমি তীব্র বেদনাবোধ করেছিলাম।

এর পরে ব্রজেন্দ্রনাথের সঙ্গে আমার আর দেখা হয় নি। দৈনিক সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় যেদিন তাঁর মৃত্যু-সংবাদ পেলাম, সেদিন একটা বিরাট বেদনায় মন আন্দোলিত হয়ে উঠল। খ্যাতির উচ্চতম শিখরে তিনি আরোহণ করেছিলেন, ধনের অভাবও তাঁর ছিল না। অথচ যে নিঃসঙ্গ একাকিত্বের বেদনা নিয়ে তিনি মৃত্যুর পথে এগিয়ে গেছেন, তার খবর আমরা কতজন রাখি? একনিষ্ঠ সাহিত্য-সাধনার দ্বারা তিনি আমাদের যা-কিছু দিয়ে গেছেন, তার প্রকৃত মূল্য-বিচারের অনেক সুযোগ আমরা পাব। কিন্তু দোষে-গুণে মেশানো এই যে মানুষটি

মনের উপর গভীর রেখাপাত ক'রে গেছেন, তাঁর দেখা কি আমরা আর পাব? আজ শ্রদ্ধাবনত চিত্তে সেই মানুষটির কথাই স্মরণ করি এবং তাঁর স্মৃতির উদ্দেশে আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন ক'রে তাঁর পারলৌকিক কল্যাণ কামনা করি।

শ্রীগোপাল ভৌমিক

পুরুষসিংহ ব্রজেন্দ্রনাথ

[সঙ্কলন 'তরুণের স্বপ্ন' কার্তিক ১৩৫১ হইতে]

এক দৃষ্টিতে মানুষ তার নিজের মনের উপন্যাসকেই বস্তুজগতে প্রতিফলিত দেখে, আর এক দৃষ্টিতে বহির্জগতে সত্যের ইতিহাস প্রত্যক্ষীভূত হয়। ব্যক্তিমানসের স্বপ্নকল্পনার স্পর্শনিরপেক্ষ স্বয়ম্প্রকাশ সত্যকে তার আপন স্বরূপে দেখতে পারা যে কত কঠিন, তা সত্যসন্ধানী মাত্রেই উপলব্ধি করেন। তা ছাড়া, অসামান্যের স্বাক্ষর যেখানে পড়েছে সেখানেই মানুষের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়, যেমন-তেমন অখ্যাত ব্যাপারের ধারায় দিনে দিনে যে সত্য গাঁথা হয়ে ওঠে অকিঞ্চিৎকর ব'লেই তা উপেক্ষিত হয়ে থাকে। কিন্তু প্রাত্যহিক দিনের অতি তুচ্ছ উপকরণের ভিত্তিতেই চিরন্তন ইতিহাসের ইমারৎ রচিত হচ্ছে। ব্রজেন্দ্রনাথ জীবনসত্য সম্বন্ধে এই দৃষ্টিরই সাধনা করেছিলেন।

উত্তরাধিকার এবং বাল্যশিক্ষা ব্রজেন্দ্রনাথের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য রচনায় বিশেষভাবেই ক্রিয়াশীল হয়েছিল ব'লে মনে করি। পিতার তান্ত্রিক মেজাজ পুত্রকে সর্বদুঃখজয়ী শক্তি এবং ভাবাবেগমুক্ত দৃষ্টি দিয়েছিল, আর মিশনরিদের ইস্কুল দিয়েছিল পরিচ্ছন্ন নিয়মশৃঙ্খলা-বোধ ও ইংরেজী ভাষাকে আয়ত্ত করার প্রাথমিক কুশলতা।

সংসার-জীবনে ব্রজেন্দ্রনাথ শুধু নিঃসঙ্গই ছিলেন না, ভাগ্যবিড়ম্বিতও ছিলেন। কণ্ঠে পিতৃসম্বোধন ফোটবার আগেই বাবাকে হারিয়ে-ছিলেন, মাকেও হারালেন অবোধ শৈশবে। চুয়াল্লিশ বৎসর ঐকান্তিক নিষ্ঠায় যে প্রেমে জীবনের সর্বপ্রেম-তৃষা ভোলবার সাধনা করলেন,

সেখানেও পেলেন না কোন সান্ত্বনা। দাম্পত্য-তপস্যায় ত্রুটি কোথাও রাখেন নি, কিন্তু একদিনের জন্যও একটি সন্তানকে কোলে নেওয়ার সৌভাগ্য হ'ল না। আশৈশব যে দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম ক'রে এলেন, আজীবন চেষ্টায় তাকে পরাজিত ক'রে যখন সংসারযাত্রাকে সচ্ছল ক'রে তুললেন তখন স্বাস্থ্যনিবাস হ'ল গৃহিণীর আশ্রয়, ব্যাঙ্কে সঞ্চিত অর্থ হ'ল ভাগ্যের পুঞ্জীভূত পরিহাস।

কুপিত দৈব যেন এই কৃতীপুরুষের বিরুদ্ধে পৈশাচিক উল্লাসে প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে উঠেছিল। কিন্তু যেখানে পুরুষকারের দ্বারা দৈবকে পরাজিত করা যায়, সেখানে ব্রজেন্দ্রনাথ চিরজয়ী। সাধন-জীবনে ব্রজেন্দ্রনাথকে বলব, দৈববিজয়ী পুরুষসিংহ। ভাগ্যের প্রতিকূলতাকে অস্বীকার ক'রে, প্রতিভার বিন্দুমাত্র অধিকারী না হয়েও তিনি যে কীর্তি রক্ষা ক'রে গেলেন তার কথা স্মরণ ক'রে এই পুরুষসিংহের কাছে মস্তক নত না ক'রে উপায় নেই।

তিনি স্বমহিমায় উদ্ভাসিত হলেন ভারতের নবজাগরণের উষার আলো হাতে নিয়ে। *Rajah Rammohan Roy's Mission to England* এবং *Dawn of New India*তেই ব্রজেন্দ্রনাথ মৌলিক গবেষণার পূর্ণকৃতিত্ব লাভ করলেন। ব্রজেন্দ্রনাথের পূর্বে রামমোহন সম্বন্ধে যে সব জীবনী-গ্রন্থ রচিত হয়েছে, সেগুলি ছিল গালগল্প ও কিংবদন্তীর মিশ্রণে 'উপন্যাস' মাত্র, ইতিহাস নয়। ব্রজেন্দ্রনাথই প্রথম রামমোহনের মহাজীবনের কাহিনী-উপাদানকে ইতিহাসের গ্রানিটস্তরে সংন্যস্ত করলেন। "রামমোহনকে কিম্বদন্তির হাত থেকে উদ্ধার ক'রে ইতিহাসের এলাকার মধ্যে আনবার" এ চেষ্টা প্রমথ চৌধুরীর মত বিদগ্ধ পুরুষেরও সপ্রশংস স্বীকৃতি পেয়েছে।

ব্রজেন্দ্রনাথের শেষ-জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি হচ্ছে "সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা"। প্রায় পঞ্চ সহস্রাধিক পৃষ্ঠায় আধুনিক বাংলা-সাহিত্যের অষ্টোত্তর শতনাম বিস্মৃতির অতল গহ্বর থেকে মুক্তি পেয়ে ঐ মহাগ্রন্থে মহাকালের সহযাত্রী হ'ল। খ্যাত-অখ্যাত সাহিত্য-স্রষ্টাদের সংক্ষিপ্ত

তথ্যাশ্রয়ী জীবনী, সন-তারিখ-যুক্ত তাঁদের রচনাবলীর ধারানুক্রমিক পূর্ণ তালিকা এবং বাংলা-সাহিত্যে তাঁদের দান সম্পর্কে স্বল্পভাষী বিচার—এই গ্রন্থমালার বৈশিষ্ট্য। বাংলা-সাহিত্যের ইতিহাসে তো নয়ই, পৃথিবীর অন্য কোনও দেশের ইতিহাসেও একা কোনও ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে এ জাতীয় বিপুল কীর্তিরক্ষা সম্ভব হয়েছে ব'লে আমাদের জানা নেই। ব্রজেন্দ্রনাথের মৃত্যু-বৎসরে তাঁকে রবীন্দ্র-পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করা হয়েছে; তা না করলে ইতিহাসের কাছে ক্ষমা ছিল না।

নিঃসন্তান ব্রজেন্দ্রনাথ বিনা উইলে তাঁর স্বোপার্জিত ধনের শর্তহীন উত্তরাধিকার বাঙালী-সন্তান মাত্রকেই দান ক'রে গেছেন। বাংলা-সাহিত্যের অধ্যাপক হিসেবে এ কথা অকুণ্ঠভাবেই স্বীকার করব যে, আমাদের সাহিত্যের পঠন পাঠন ও আলোচনায় ব্রজেন্দ্রনাথ ইতিহাস-চেতনা সঞ্চার করেছেন। জ্ঞানচর্চায় বিজ্ঞানসম্মত বিচারের ক্ষেত্রেও বাঙালী ভাববিহ্বলতার হাত থেকে সহজে মুক্ত হতে পারে না। নবজাগরণের যাঁরা স্রষ্টা, তাঁদের উত্তরপুরুষদের এই অধোগতি অনুশোচনীয়। ব্রজেন্দ্রনাথ এদিক দিয়ে সারস্বত সমাজে উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম। সমাজ ও সাহিত্য-ইতিহাসের ক্ষেত্রে তাঁকে বলব—বিজ্ঞানী। তথ্যের গবেষণাগারে পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের দ্বারাই তিনি যথার্থ সত্যের সন্ধান করেছেন। প্রামাণিকতার ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ প্রমাণ ছাড়া তিনি কথা বলেন নি। সেইজন্যেই 'হয়তো' 'সম্ভবত' প্রভৃতি কথা তাঁর রচনায় দুষ্প্রাপ্য। তাই উনবিংশ বিংশ শতাব্দীর বাংলার জাতীয়-জীবন ও সাহিত্য সংস্কৃতি সম্পর্কে 'ব্রজেন্দ্রনাথ' নামের অর্থ হ'ল 'অভ্রান্ত প্রামাণিকতা'। সন তারিখ বা প্রমাণপঞ্জীর ক্ষেত্রে সর্ববিধ সংশয় ও সংকটে ব্রজেন্দ্রনাথ সত্যমীমাংসার সুপ্রীম আদালত।

শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য

আগামী সংখ্যায় "সাহিত্যসাধক ব্রজেন্দ্রনাথ ও তাঁহার রচনাপঞ্জী" প্রকাশিত হইবে।

সাহিত্য-ঐতিহাসিক ব্রজেন্দ্রনাথ

তখন আমি ব্যস্ত মোঘল গুষ্টির বাদশাদের নিয়ে। কে কবে মরলেন, তার পরে কে বাদশা হলেন, কোন্ বাদশা তার বাপকে বন্দী করলেন, কে কবে কোথায় কার সঙ্গে যুদ্ধ করলেন, আবার কোন্ বাদশা হিন্দু-মুসলমানকে সমান চোখে দেখতেন, আর কে করতেন একচোখোমি ইত্যাদি মাথার মধ্যে গুলিয়ে গিয়ে একাকার! মাথা নেড়ে সাল মুখস্থ করি, তবু সে সব মাথার ভেতরে রাখা দুষ্কর। দিল্লীর বাদশাদের জন্যে অতদিন পরেও মাথা খারাপ হবার যোগাড়। অবশ্য দিল্লীর জ্বালায় এখনও আমরা অস্থির।

মোঘল বাদশারা দরবারে এসে বসতেন ব'লেই তাঁদের সঙ্গে জানাশুনো ছিল, তবে তাঁদের হারেমে যাবে কে, কোন্ সাহসে? হামিদা বানু, নুরজাঁহা বা মমতাজের কথা কানে এসেছে বটে, কিন্তু একদিন সোজা মোঘল-হারেমে গিয়ে ঢুকলাম স্বর্গত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধ'রে; দেখলাম মোঘল বিদুষীদের। প্রথমে বিশ্বাস হয় নি, ভেবেছিলাম—বইখানি মনগড়া উপন্যাস। মনের কথা জানতে পেরে আমার এক বন্ধু ধমকে দিয়েছিল, জান না তো ভদ্রলোককে, উপন্যাসের ভেজাল পাবে না ওঁর কাছে। যা পাবে একেবারে খাঁটি মাল। ফ্যাক্‌ট্‌স্—ফ্যাক্‌ট্‌স্। বড় কড়া লোক।

অনেক দিনের পরের কথা।

একদিন 'শনিবারের চিঠি'র আপিস-ঘরে ঢোকবার সময় নাকে এল কড়া চুরুটের গন্ধ। ঢুকে দেখি, সজনীদার সামনে ব'সে আছেন এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক, মোটাসোটা, কালো, ভুঁড়ি আছে, চুল কাঁচায়-পাকায়, গায়ে গেঞ্জি, হাতে একগাদা প্রুফ গোল ক'রে জড়ানো, মুখে চুরুট। চুরুট টানছেন আর গল্প করছেন। সজনীদা পরিচয় করিয়ে দিতেই তাঁর পাশের চেয়ারটা নিজের কাছে টেনে এনে হেসে বললেন, বসুন।

বসলাম। তাঁর কড়া চুরুটের ধোঁয়া নাকে আসতে লাগল। কিন্তু কথাবার্তায় বেশ বোঝা গেল, ভদ্রলোক কড়া নন।

চাক্ষুষ দেখা হ'ল ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে। তার আগেই পড়া হয়ে গেছে তাঁর 'বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস,' পড়েছি 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা,' বাপ-ঠাকুরদার আমলের হালচালের খবর জানা হয়ে গেছে ওঁরই অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে। রাজা-রাজড়ার ইতিহাস না লিখে তিনি জনসাধারণের ইতিহাস লিখতে গিয়ে যে অসাধারণ অধ্যবসায় দেখিয়েছেন, তা আজকাল অনেকেরই মনে শুধু বিস্ময় নয়, বিভীষিকা জাগাবার পক্ষেও যথেষ্ট।

শ্রদ্ধেয় ব্রজেন্দ্রনাথ তা ব'লে জনসাধারণের মাঝে হারিয়ে যান নি। কিছু হারাবার পাত্র তিনি ছিলেন না। তাঁর জীবনের উদ্দেশ্যই ছিল হারানো রত্নকে যত্ন ক'রে উদ্ধার করা। বরং বলা যেতে পারে, এই লুপ্তোদ্ধার-কার্যে তিনি নিজের অস্তিত্বকেও হারিয়ে ফেলতেন। বেশভূষার দিকে নজর ছিল না, বিলাসিতা তাঁর কাছে ঘেঁষতে পারত না। বিশ্রামকে তিনি আমল দিতেন না। সর্বদা ডুবে থাকতেন কাজে।

ডুবুরির মত ডুবে ডুবে তিনি বঙ্গ-সাহিত্য-সাগর থেকে বহু লুপ্ত এবং গুপ্ত রত্ন তুলে এনে ডাঙায় মেলে ধরেছেন আমাদের সামনে আমাদেরই জন্যে। নিজে কোন কাব্য বা উপন্যাস লিখলেন না, অথচ কে কবে কি কি কাব্য বা উপন্যাস রচনা ক'রে গেছেন তার চমকপ্রদ হিসাব দাখিল ক'রে গেছেন সারাটা জীবন। শুধু রত্ন উদ্ধার ক'রেই ক্ষান্ত ছিলেন না তিনি—সে সব ঝেড়ে ঝুড়ে, তাতে টীকা-টিপ্পনী জুড়ে, সাহিত্য-বিমুখ জনসাধারণের মনোমত ক'রে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মারফৎ প্রচার ক'রে বঙ্গীয় সাহিত্যকে এবং পরিষৎকে করেছেন পুষ্ট, জনসাধারণকে করেছেন তুষ্ট। এ দিক দিয়ে ব্রজেন্দ্রনাথ শুধু সাহিত্য-ঐতিহাসিকই নন—সাহিত্য-প্রচারকও। অবশ্য এই প্রচেষ্টার সঙ্গে শ্রদ্ধেয় সজনীকান্ত দাসের নাম জড়িয়ে না দিলে, এ অধ্যায় অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

বিগত সাহিত্যিকরা লিখেই খালাস হয়েছেন। নিজেরাও জানতেন না হয়তো কবে কোন্ লেখা লিখেছেন! ব্রজেন্দ্রনাথ সে সব সাল-তারিখ মিলিয়ে গুছিয়ে রেখে গেছেন। বাড়ির কর্তা তো টেবিলে খাতাপত্র ছড়িয়ে রেখে উঠে গেলেন, গৃহিণীই পরে সে সব গুছিয়ে পরিপাটি ক'রে সাজিয়ে রেখে দেন। এজন্যে দরকার হৃদয়ের টান। ব্রজেন্দ্রনাথের সে হৃদয় ছিল—ভালবাসার হৃদয়। সাহিত্যকে তিনি ভালবাসতেন, কাজেই সেখানে অগোছালো কিছু সহ্য করতে পারতেন না তিনি। যে যুগে নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকাই নিয়ম, পরের দিকে চাইবার বা পরের জন্যে ভাববার সময় নেই, সে যুগে পরের সাহিত্য নিয়ে মাথা ঘামাবার মত সময়, ইচ্ছা, উৎসাহ ব্রজেন্দ্রনাথের মধ্যে দেখা দিয়েছিল ব'লেই বিগত সাহিত্যিক ও তাঁদের রচনার সঙ্গে হ'ল আবার আমাদের নতুন ক'রে পরিচয়; আর পাওয়া গেল অমূল্য সাহিত্য-সম্পদ বা পুঁজি যা ভবিষ্যতে ভাঙিয়ে খাওয়া চলবে, অথচ ফুরোবে না কোনদিন।

ব্রজেন্দ্রনাথের কাছ থেকে আমরা তো নিয়েছি অনেক, নেবও অনেক; কিন্তু দিলাম কি? শুধু অন্তরের কৃতজ্ঞতা। সে দেওয়া কত বেশির বদলে কতটুকু! তবে পশ্চিমবঙ্গ-সরকার সময়মত রবীন্দ্র-পুরস্কার দিয়ে তাঁকে যে পুরস্কৃত করতে পেরেছিলেন তাতে আমরা বেঁচেছি লজ্জার দায় থেকে। আগামী দিনের খাতায় কর্তব্যে হেলা করার লজ্জা ইতিমধ্যেই অনেক জ'মে গেছে।

অজাতশত্রু ব্রজেন্দ্রনাথের আত্মার মঙ্গলকামনা সকলেরই মনে। মঙ্গলময় আমাদের কামনা পূর্ণ করুন। ব্রজেন্দ্রনাথের শোকাচ্ছন্ন পরিবারকে আমাদের সমবেদনা জানানো ছাড়া সান্ত্বনা দেবার কিছুই নেই। সাহিত্য-অগ্রজের বিয়োগে আমরাও বিরহ-কাতর, বঙ্গীয়-সাহিত্য এবং 'পরিষৎ' ক্ষতিগ্রস্ত। সান্ত্বনা আমাদেরও প্রয়োজন।

শ্রীকুমারেশ ঘোষ

মহাস্থবির জাতক

(তৃতীয় পর্ব)

এক

কবি বলছেন, সুখ-দুখ দুটি ভাই। কি রকম ভাই? মায়ের পেটের ভাই, কি চোরে চোরে মাসতুতো ভাই—সে বিষয়ে তিনি নীরব।

তাই সুখ ও দুঃখ সম্বন্ধে এইখানে তেড়ে একটি ভাষণ ঝাড়বার প্রলোভন হচ্ছে। কিন্তু ভয় নেই, সংযত হচ্ছি। আপনারা শুধু একবার মনশ্চক্ষু উন্মীলন ক'রে দেখুন, স্থবির শর্মা চটিজুতো পায়ে দিয়ে চ্যাটাং চ্যাটাং করতে করতে চলেছে কর্নওয়ালিস স্ট্রীটের ফুটপাথ দিয়ে ইস্কুলের দিকে। বগলে তার খানকয়েক বই, তাতে অনেক জ্ঞানগর্ভ কথা আছে; কিন্তু যে অভিজ্ঞান তার মাথায় বোঝাই করা রয়েছে তার তুলনায় সে সব জ্ঞান অতি তুচ্ছ। কিন্তু সংসার তা স্বীকার করলে না, তাই আবার এই কৃচ্ছ্রসাধনের অভিনয়—

বাড়িতে ফিরে আসবার পর বাবা কোনও কথা বললেন না—না বকুনি, না প্রহার। শুধু বললেন—কাল থেকে আবার ইস্কুলে যেতে আরম্ভ কর।

আমি আশঙ্কা করেছিলুম, বাড়ি ফিরলে বাবা মেরে একেবারে পাট বিছিয়ে দেবেন। কিন্তু পাছে আবার পলায়ন করি, এ জন্য তিনি কিছু বললেন না। প্রহারের হাত থেকে অব্যাহতি পেয়ে আমিও ভালমানুষের মত ইস্কুলে যেতে আরম্ভ ক'রে দিলুম। আমি মনে করলুম, বাবা কি ভালমানুষ; আর বাবা মনে করলেন, আমার ছেলে কি বাধ্য! কিন্তু আমরা দুজনেই ভুল করলুম, কারণ বাড়ি থেকে পালানো আমার বন্ধ হ'ল না। বাবাকেও দীর্ঘকাল ধ'রে আপশোস করতে শুনেছি যে, প্রথমবারের পলায়নের পর বেশ উত্তম-মধ্যম পেলে আমি আর কখনও পালাতে সাহস করতুম না। আর আমার দিক দিয়ে আমিও বহুকাল আপশোস করেছি এই ভেবে যে, প্রথমবারেই যদি স্কুলে যেতে অস্বীকার করতুম, তা হ'লে যা হবার তখুনি একটা

এস্‌পার-ওস্‌পার হয়ে যেত, কারণ প্রতিবারেই গৃহপ্রত্যাগমনের পর আবার আমায় ইস্কুলে যেতে হয়েছে।

যা হোক, ইস্কুলে যেতে হ'লেও পড়াশুনোর বালাই আর রইল না। স্বদেশীর বন্যায় সারা বাংলা দেশ তখন টলমল করছে। ইস্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন নামকরণ হয়েছে—গোলামখানা। এই স্বদেশীর কল্যাণে অনেক ছেলে ইস্কুল-কলেজের কবল থেকে রক্ষা পেয়ে গেল, অনেক ধনী-অভিভাবক ব্যাপার সুবিধা নয় বুঝে ছেলেদের বিলেতে পাঠিয়ে দিলেন। বোম্বাইয়ের খলিফারা এই সুযোগে গরিব বাঙালীর পয়সায় বড়লোক হতে লাগল। বাঙালীরা বিলিতি মিলের ধুতি বর্জন ক'রে ডবল দাম দিয়ে বোম্বাই মিলের চট কিনতে লাগল। আর তার পরিবর্তে বোম্বাইয়ের মিলওয়ালারা বাংলা ও বিহারের কয়লা বর্জন ক'রে দক্ষিণ-আফ্রিকা থেকে কয়লা আমদানি ক'রে বাংলার ঋণ পরিশোধ করতে লাগল।

বাঙালীর জাতীয় জীবনে পূজা, দোল, দুর্গোৎসব, পরনিন্দা, ঘোঁট, কীর্তন প্রভৃতি উৎসবে উৎসাহ ছিল প্রচুর, কিন্তু এই স্বদেশী আন্দোলন তাদের জীবনে উৎসাহের সঙ্গে নিয়ে এল উত্তেজনা।

স্বদেশী আন্দোলনের ঘটনাপ্রবাহ আজ চলচ্চিত্রের মতন মনের পর্দায় একে একে ভেসে উঠছে। ভেসে উঠছে বাঙালীর সেই উন্মাদনার চিত্র, সেই ভাবের জোয়ার—যাতে একদিন তারা হাত পা ছেড়ে আপনাকে ভাসিয়ে দিয়েছিল। অদ্ভুত এই বাঙালী-চরিত্র! তারা পূজা করে শক্তির, কিন্তু চর্চা করে মাধুর্য রসের—তাই কাটলেট ও মালপোয়ায় তাদের সমান রুচি। এই স্বদেশীর দিনে তারা কীর্তনের সুরে যুদ্ধের গান গেয়ে সকলকে দেশাত্মবোধে অনুপ্রাণিত ক'রে বেড়াতে লাগল।

সিপাহী-বিদ্রোহের পর ইংরেজরা কিছুকাল মুসলমান-দমননীতি চালিয়ে ও সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুদের পিঠে হাত বুলিয়ে কিছুতেই এই মূর্তিপূজকদের বাগে আনতে না পেরে হিন্দু-দমন ও মুসলমান-তোষণ

নীতি অবলম্বন করলে—যার ফলে হ'ল বঙ্গ-বিভাগ। ইংরেজরা পূর্ববঙ্গকে একটা ছোটখাট পাকিস্তানে পরিণত ক'রে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে. ভেদ বাড়িয়ে তোলবার চেষ্টা করতেই বাঙালী নেতারা হিন্দু-মুসলমানে মিলনের চেষ্টা করতে লাগলেন। কয়েকজন মহাপ্রাণ মুসলমানও হিন্দুদের দলে যোগ দিলেন বটে কিন্তু অধিকাংশ মুসলমানই এই মিলনের শুধু বিপক্ষতা নয়, বিরোধিতা করেছিল। মুসলমানদের গ্রন্থাদি যাই বলুক না কেন, তাঁরা কখনও কোনও সময়েই অন্য ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে স্বচ্ছন্দে একত্রে বাস করেছেন—এমন নজির ইতিহাসে পাওয়া যায় না। তাই ইংরেজদের এই চালকে তাঁরা আগ্রহের সঙ্গে বরণ করেছিলেন। ইংরেজদের এই অপচেষ্টা ব্যর্থ করবার জন্য সে সময় বাংলার নেতারা সমস্ত ভারতবর্ষের হিন্দু-মুসলমানকে মিলিত করবার চেষ্টা করেছিলেন।

সে সময় উপযুক্ত স্থানের অভাবে সভা করবার খুবই অসুবিধা ছিল। হয় খোলা মাঠ কিংবা টাউন হল ছাড়া সভা করবার বড় জায়গা শহরে ছিল না। কিন্তু গড়ের মাঠ ও টাউন হল দুই-ই ছিল সরকারী আমলাদের কবজায়, কাজেই সরকারের বিরোধী কোনও সভা হওয়া সেখানে এক রকম অসম্ভবই ছিল। তাই স্বদেশীযুগের আরম্ভেই নেতারা স্থির করলেন যে, হিন্দু-মুসলমানের মিলন-মন্দির নাম দিয়েই একটা বড় সভা-গৃহ নির্মাণ করতে হবে। অবিশ্যি তাঁরা ঠিক করেছিলেন এই সভাগৃহের নাম হবে—দি ফেডারেশন হল। মাতৃভাষায় কিছু কল্পনা করা তাঁদের পক্ষে দুরূহ ছিল কিনা!

আচার্য জগদীশচন্দ্রের বাড়ির সম্মুখে, ব্রাহ্ম-বালিকা-শিক্ষালয়ের ডান দিকে একটা বড় এবড়ো-খেবড়ো খালি জমি প'ড়ে ছিল। ঠিক হ'ল এই জমির ওপর প্রস্তাবিত মিলন-মন্দির তৈরি করা হবে। তিরিশে আশ্বিন রাখিবন্ধনের দিন এইখানে বিরাট সভা হ'ল। সভায় বোধ হয় কুড়ি-পঁচিশ হাজার লোকের সমাগম হয়েছিল। আজকাল একটা ফুটবল ম্যাচ দেখতে যেমন ছুট বলতে পঞ্চাশ হাজার লোক জমা হয়,

তখন তা ছিল না। কোন সভায় বিশ-পঁচিশ হাজার লোক একত্র হওয়া অদ্ভুত ব্যাপার ব'লে বিবেচিত হ'ত।

সেদিন বেলা তিনটে বাজতে না বাজতে সেই পতিত জমিতে লোক এসে জমা হতে লাগল। নানান পাড়া, সংঘ, সমিতির শোভাযাত্রা আসতে লাগল স্বদেশ-সঙ্গীত গাইতে গাইতে। 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনিতে আকাশ কেঁপে উঠতে লাগল। তখনকার দিনে সারকুলার রোডের ওই অঞ্চলটা ছিল বেশ নির্জন, বাড়ি-ঘরও বেশি ছিল না। যা-দু-চারখানা নতুন বাড়ি সে সময় তৈরি হয়েছিল, তারই ছাতে ছাতে লাগল মেয়েদের ভিড়—কলকাতায় সে দৃশ্য নতুন, এক নতুন ভাবের জোয়ারে নগরবাসী গা ঢেলে দিয়েছে, সে এক নতুন উত্তেজনা!

সভায় সেই কাল্পনিক মিলন-মন্দিরের ভিত্তি স্থাপন করা হ'ল। কার জমি, কে টাকা দেবে, কোথা থেকে টাকা আসবে সে সব তুচ্ছ ব্যাপার কেউ গ্রাহ্যের মধ্যেও আনলে না। স্বর্গীয় ব্যারিস্টার আনন্দমোহন বসু মশায় ভিত্তি স্থাপন করলেন। তিনি তখন অত্যন্ত অসুস্থ ছিলেন—এই ব্যাপারের কিছুদিন পরেই তিনি দেহরক্ষা করেন।

আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের বাড়ি থেকে তাঁকে তোলা-চেয়ারে বহন ক'রে সভা-ক্ষেত্রে নিয়ে আসা হ'ল। সেই বিরাট জন-কল্লোল মুহূর্তের জন্য স্তব্ধ হয়ে গেল। তার মধ্যে একতারার মত ক্ষীণ কণ্ঠে বেজে উঠল বসু মশায়ের প্রার্থনা—একখানি করুণ সঙ্গীতের মত। মুমূর্ষু দেশনায়কের সেই কাতর মর্মবাণী আজ অতীতের গর্ভ থেকে উঠে নতুন সুরে আমার কানে এসে বাজছে—And Thou, Oh God of this ancient land, the Protector and Saviour of Aryavarta and the merciful Father of us all, by whatever name we call upon Thee, be with us on this day, and as a father gathereth his children under his arms, do Thou gather us under Thy protecting and sanctifying care.

কিন্তু এই যে Thou, যিনি পুরুষের ভাগ্য এবং নারীর চরিত্র সৃষ্টি করেছেন, তিনি যে সবচেয়ে বেশি দুর্জ্ঞেয়—সে কথাটা মানুষ যে জানে না তা নয়, কিন্তু দুর্দিনে প'ড়ে মানুষ তাঁর কাছে সোনার পাথর বাটি চেয়ে বসে। হাত পাতলেই যদি তাঁর কাছ থেকে জিনিস পাওয়া যেত, তা হ'লে ঘরে ঘরেই বিরোধের অন্ত থাকত না। এ কথা ভুললে কিছুতেই চলবে না যে, আমাদের মঙ্গল সম্বন্ধে এই Thou আমাদের চেয়ে ঢের বেশি সচেতন, এবং বোধ হয় সেই জন্যেই হিন্দু-মুসলমানে আজও মিলন হয় নি—মিলন-মন্দির তো দূরের কথা।

সেই কল্পিত মিলন-মন্দিরের মাঠে এখন কতকগুলো বাড়ি তৈরি হয়েছে। এই বাড়িগুলোর পাশ দিয়ে একটা রাস্তা তৈরি হয়েছে, তার নাম ফেডারেশন স্ট্রীট। যেখানে একদিন উচ্চচূড় মিলন-মন্দিরের সম্ভাবনা হয়েছিল সেখানে আজ সদর রাস্তা হয়েছে—অর্থাৎ মিলনের আশা ধূলিসাৎ হয়েছে।

বহিঃপ্রকৃতির সঙ্গে সমান তালে আমার অন্তরেও তখন বিক্ষোভ, অশান্তি ও উত্তেজনার ঝড় বইতে শুরু করেছিল। স্বদেশীর বন্যায় গা ঢেলে দিয়ে মাঠে মাঠে মীটিঙে যাওয়া, দলবদ্ধ হয়ে গান গাইতে গাইতে শহরের রাস্তা পরিক্রমণ করা, কনস্টেবলের তাড়া খেয়ে লম্বা দেওয়া, তার ওপরে ফুটবল খেলা ও গড়ের মাঠে ম্যাচ দেখতে যাওয়া—সবই চলছিল বটে; কিন্তু আমার মধ্যে যে একজন চৌকিদার আছে সে কিছুতেই নিশ্চিন্ত হতে দিচ্ছিল না। আমার খালি মনে হতে লাগল, এর পরে কি হবে! এই উত্তেজনার ঝড় শান্ত হয়ে গেলে—একদিন শান্ত হবেই—তখন আমার কি হবে? কি আমার ভবিষ্যৎ? আমি কি করব? লেখাপড়া শিখে নিজেকে ভবিষ্যতের জন্যে তৈরি ক'রে নিতে হ'লে যে বুদ্ধি, অধ্যবসায় ও পারিপার্শ্বিক অনুকূল অবস্থার প্রয়োজন হয়, আমার তা ছিল না। তা ছাড়া কানুনমাফিক নিয়মানুবর্তিতায় পড়াশুনো করবার আগ্রহ বহুদিন আগেই ছুটে গিয়েছিল। তার ওপরে কেন জানি না, সে সময় স্বদেশী নেতারা—

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাল ভাল মার্কা যাঁরা অঙ্গে ধারণ করতেন তাঁরা পর্যন্ত—বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি একটা আক্রোশ পোষণ করতেন এবং বক্তৃতায় ও লেখায় তা প্রকাশ করতেন। আশুতোষ বিল্ডিং বা দারভাঙ্গা বিল্ডিং তখনও তৈরি হয় নি। সেনেট হলকে লোকে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাড়ি ব'লে জানত। সেনেট হলের মোটা থামে শিগ্‌গিরই 'To Let' অথবা 'বাড়ি ভাড়া' লেখা ঝুলতে থাকবে—এ কথাও অনেক নেতাই বলতেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম দেওয়া হয়েছিল—গোলামখানা। তাঁরা বলতেন, এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ইস্কুল ও কলেজগুলিতে এক গোলামি করতে শেখানো ছাড়া আর কিছুই শেখানো হয় না। ছাত্ররা যাতে সত্যিকারের শিক্ষা পেতে পারে সেজন্য স্বদেশী বিশ্ববিদ্যালয় খোলা হ'ল। অবিশ্যি এই স্বদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গতিপন্ন কর্তারা নিজেদের ছেলেদের শিক্ষার জন্য বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের শরণাপন্ন হয়েছিলেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় ফেল-করা অনেক ছেলে 'আসল শিক্ষা' লাভ করবার জন্যে স্বদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকতে লাগল। ছেলেরা যাতে হাতে-কলমে ব্যাবহারিক কোন শিক্ষা পায় সেজন্য স্বদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইন্সটিটিউট খোলা হ'ল। সারকুলার রোডে আজ যেখানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সায়ান্স কলেজের বিরাট বাড়ি দেখা যাচ্ছে, সেখানে ছিল সার্ তারকনাথ পালিত মহাশয়ের বাগানবাড়ি। সেই বাড়িতেই বসেছিল বেঙ্গল টেক্‌নিক্যাল ইন্সটিটিউট। এখানেও দলে দলে ছেলে ভর্তি হ'তে লাগল। এই বেঙ্গল টেক্‌নিক্যালই পরে যাদবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পরিণত হয়েছে।

সে সময় তাঁত শিল্পকে বাঁচিয়ে তোলবার খুব একটা হিড়িক পড়েছিল। ভদ্রলোকের ছেলেদের তাঁত চালাতে শেখাবার জন্য অনেকগুলি প্রতিষ্ঠান গ'ড়ে উঠেছিল। এই সব জায়গাতেও দলে

দলে ছেলে এসে ভর্তি হ'তে লাগল। মোট কথা, ইস্কুল ও কলেজী শিক্ষা এ দেশে প্রবর্তিত হবার পর থেকে সেদিন পর্যন্ত এক ধারায় নিরুপদ্রবে চ'লে আসছিল যে প্রবাহ, তারই ধারাবাহিকতায় লাগল প্রচণ্ড আঘাত। তার ফলে কত ছেলের জীবনতরী যে বানচাল হয়ে গেল, তার ঠিক-ঠিকানা নেই।

এই উত্তেজনার মধ্যে বাস ক'রেও আমার মনে হতে লাগল, আমার জীবনের ক্ষেত্র এ নয়। আমাকে যদি জীবনে উন্নতি করতে হয়, তবে আমাকে সব ছেড়ে বেরিয়ে পড়তে হবে। বাইরে থেকে একটা প্রবল আকর্ষণ আমাকে দিনরাত্রি টানতে লাগল। সেখানকার বৈচিত্র্য, সেখানকার সুখদুঃখ, অপরিচিতের সঙ্গে আত্মীয়তা, নিতান্ত নিশ্চিন্তে জীবন একটানায় চলতে চলতে অপ্রত্যাশিত ভাবে বিপদ ও অনিশ্চয়তার আবর্তে প'ড়ে হাবুডুবু খাওয়া—এই জীবনের মধ্যে যে নেশা আছে, সেই নেশা আমাকে পেয়ে বসেছিল। গতবারে আমার জীবনে যে অভিজ্ঞতা হয়েছিল, লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করলে অথবা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সমস্ত পরীক্ষা কৃতিত্বের সঙ্গে পাস করলেও তার সঙ্গে তুলনা হয় না। আমি স্থির করলুম, আমি সেই জীবনেই ফিরে যাব। পরীক্ষা পাস ক'রে চাকরি নিয়ে নিশ্চিন্ত জীবন যাপন করা আমার দ্বারা হবে না।

বাইরে চ'লে যাব অর্থাৎ এক কথায় যার নাম আবার বাড়ি থেকে পালাব। কিন্তু পালাব বললেই পালানো যায় না। এই পলায়ন ব্যাপারে গেলবারে যে কতকগুলো অভিজ্ঞতা হয়েছিল, তার প্রথমটা হচ্ছে—অর্থ কিঞ্চিৎ বেশি চাই। সেবারে প্রথম থেকে অনেকে অযাচিতভাবে আমাকে সাহায্য করেছিলেন। ভাগ্য সুপ্রসন্ন থাকলে আমার জীবননদী অন্য খাতে প্রবাহিত হ'ত। কিন্তু যদি কেউ সাহায্য না করে! সেজন্য অন্তত কিছুদিনের জন্যও তৈরি থাকা বুদ্ধিমানের কাজ। এই অর্থ যোগাড় করা আমার দ্বারা সম্ভব নয়; কাজেই এমন লোক সঙ্গী চাই যে, সেই প্রয়োজনীয় অর্থের যোগাড় সে

করতে পারবে। পরিতোষকে সঙ্গে নেবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু সে দেখলুম ইস্কুল-টিস্কুল ছেড়ে দিয়ে তাঁতের ইস্কুলে ঢুকে মনের আনন্দে মাকু চালাচ্ছে এবং স্থির ক'রে ফেলেছে যে, ঐ তাঁতের মাধ্যমেই সে জীবনে উন্নতি করবে। যা হোক, সে দিক থেকে কোন সাড়া না পেয়ে আমি তক্কে-তক্কে ফিরতে লাগলুম—দেখি, কোথা দিয়ে কি হয়!

আমরা যেখানে পড়তুম, সেটা ছিল বোর্ডিং স্কুল। নতুন ইস্কুল ব'লে ছাত্রসংখ্যা ছিল খুবই কম এবং সে জন্য আমরা প্রায় সকলেই সকলকে চিনতুম। বোর্ডিঙের বেশির ভাগ ছেলেই মফস্বলের, ও তাদের অধিকাংশেরই বাড়ির অবস্থা বেশ ভাল। একদিন বিকেলে খেলার পর মাঠে ব'সে গল্প হচ্ছে—গল্পের বিষয়বস্তু আমার পলায়নের অভিজ্ঞতা—এমন সময় সুকান্ত বললে, তোমার সঙ্গে আমাদের জনার্দনের দেখছি অনেক মিল আছে।

সুকান্ত ও জনার্দন দুজনেই বোর্ডিঙে থাকত এবং আমার চাইতে নিচের ক্লাসে পড়ত। কিন্তু তা হ'লেও সুকান্ত ভাল খেলতে পারত ব'লে আমার সঙ্গে তার খুব ভাব জ'মে গিয়েছিল। সে বললে, জনার্দন দু-দুবার বাড়ি থেকে লম্বা দিয়েছিল।

—বল কি! তা হ'লে তো ভাব করতে হয় তার সঙ্গে।

জনার্দনের সঙ্গে আমার মৌখিক আলাপ ছিল মাত্র, এবার ভাল ক'রে ভাব জমল। মাস দুয়েক আগে সে ইস্কুলে ভর্তি হয়েছে। এর আগে পূর্ববঙ্গের কোন এক শহরের ইস্কুলে পড়ত। তাকে বাইরে থেকে একটু গম্ভীর প্রকৃতির ছেলে ব'লে মনে হ'ত। কিন্তু মিশে দেখলুম, সে দিব্যি হাসিখুশি দিলখোলা ছেলে। বাড়ি থেকে সে পালায় কেন তার কারণ জিজ্ঞাসা করায় সে বললে, দূর, এ সব কিছু ভাল লাগে না, তাই মাঝে মাঝে চ'লে যাই।

জিজ্ঞাসা করলুম, কি সব ভাল লাগে না?

—এই সব ইস্কুল, পড়াশুনো, বাড়িঘর, আত্মীয়, পরিজন—

মোট কথা, জনার্দন কেন যে বাড়ি থেকে পালায় তার কারণ তার

নিজের কাছেই পরিষ্কার নয়। বর্তমান জীবন-যাত্রার মধ্যে কোথায় কি একটা খুঁত আছে, যা স্পষ্ট না হ'লেও তাকে খোঁচা দিয়ে বাড়ি থেকে বের ক'রে নিয়ে যায়। আমিও বাড়ি থেকে পালিয়েছিলুম শুনে সে বললে, বেশ হয়েছে। তোমার সঙ্গে আমার মিলবে ভাল।

শুনলুম, জনার্দন দু-দুবার পালিয়ে তিব্বতের দিকে রওনা হয়েছিল। একবার সিকিমের ভেতর দিয়ে খানিকটা অগ্রসর হয়েছিল আর একবার নৈনিতাল না কোথা দিয়ে ভারতের সীমান্ত অবধি পৌছেছিল—সেখান থেকে মানস সরোবর আর দিন দুয়েকের রাস্তা মাত্র। কিন্তু দুবারেই তাকে পুলিসে ধ'রে নিয়ে এসেছে।

জনার্দনকে জিজ্ঞাসা করলুম, এত জায়গা থাকতে তিব্বতের দিকে গেলে কেন?

সে বললে, কেন! তিব্বত তো ভাল জায়গা—রাজা রামমোহন রায় গিয়েছিলেন সেখানে—

বললুম, রামমোহন রায় গিয়েছিলেন তার কারণ আছে। সেখানে ধর্ম সম্বন্ধে অনেক বই-টই আছে, সেই সব বই পড়তে গিয়েছিলেন। তার পর সেখানকার লোকেরা তাঁকে মেরে ফেলতে গিয়েছিল, তিনি কোন রকমে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে এসেছিলেন।

জনার্দন জিজ্ঞাসা করলে, কেন, তিব্বত কি তোমার ভাল লাগে না?

বললুম, না ভাই, আমার দুরাশা অত উচ্চ নয়। শেষকালে কি বেঘোরে প্রাণটা দেব?

জনার্দন বেশ মুরুব্বির চালে বললে, নাঃ, আজকাল আর তিব্বতে গেলে ওরা কিছু বলে না। তার ওপর সেখানে সব লামারা আছে, তারা খুব ভাল লোক। আমার তো তিব্বত খুবই ভাল লাগে। পয়সা-কড়ির সুবিধা করতে পারলে আবার আমি সেখানে চ'লে যাব।

কোন কোন লোকের বিশেষ কোন রঙের প্রতি কিংবা খাবারের প্রতি বা বিশেষ কোন স্থানের প্রতি একটা অহেতুক

আকর্ষণ থাকে। দেখলুম, আমাদের জনার্দনেরও তাই। দুনিয়ায় এত সমতল ক্ষেত্র থাকতে হিমালয়ের উচ্চতার প্রতি তার এই আকর্ষণ আমার কাছে অদ্ভুত ব'লে মনে হ'ল।

একদিন কথায় কথায় জনার্দন আমাকে বললে, দেখ, যদি টাকার যোগাড় করতে পারি তো আমার সঙ্গে তিব্বত যাবে?

—পাগল হয়েছ! খামকা তিব্বত কেন যাব বল?

—কেন, সেখানে সব লামা আছে।

—লামা আছে তো আছে, তাতে আমার কি? প্রথমে তিব্বতের পথ অত্যন্ত বিপদসঙ্কুল, সেখানকার লোকেরা বাইরের লোককে তাদের দেশে ঢুকতে দেয় না, অনেক সময় মেরেই ফেলে। তার পরে ভয়ানক শীত সেখানে—সবার ওপরে সেখানে গিয়ে কি করব বল? বরঞ্চ আমি চ'লে যাব দিল্লী কি বোম্বাই কিংবা অন্য কোন শহরে। সেখানে গিয়ে ব্যবসা করব। পয়সা যদি বেশি পাই তো চ'লে যাব ইউরোপ কিংবা আমেরিকায়—কোথাও কিছু নেই, তিব্বতে যেতে যাব কেন?

অহো! দিল্লী নামের কি মহিমা! শুধু ভারতবর্ষেই নয়, সুদূর অতীতেও দূর-দূরান্তরের দুর্ধর্ষদের উত্তেজিত করেছে এই নামের মোহ, এই নামের রহস্য। কেউ এসেছে একলা, কেউ বা এসেছে সদলবলে। কেউ জিতেছে, আবার কেউ বা পস্তিয়েছে দিল্লীর লাড্ডু আস্বাদন ক'রে। জনার্দন তো ক্ষীণজীবী বাঙালী বালকমাত্র। নাম শুনেই সে তিব্বত থেকে গড়াতে গড়াতে একেবারে সমতল ভূমিতে এসে পড়ল।

জনার্দন বললে, আচ্ছা, কুছ পরোয়া নেই, দিল্লীই যাওয়া যাবে। টাকার জন্য ভাবনা নেই, টাকার যোগাড় হয়েই যাবে। যে দিন টাকা পাওয়া যাবে, সেই দিনই যেতে পারবে তো?

—নিশ্চয় পারব।

আমাদের ছেলেবেলায় কলকাতা শহরে গুজব-সম্রাটের আধিপত্য ছিল খুবই বিস্তৃত। ফুটবল, হকি, ক্রিকেট প্রভৃতি খেলা সে সময়

এখনকার মত জনপ্রিয় ছিল না। সিনেমা, রাজনৈতিক সভা ও নানা মতের প্রতিষ্ঠান, রেডিও প্রভৃতি আমোদের উপাদানগুলি তখনও আবিষ্কৃত হয় নি। এই গুজব-সম্রাটেরাই তখন ছিল এক রকম সাধারণ প্রমোদ-পরিবেশক। এরা অদ্ভুত অদ্ভুত সব গুজব আবিষ্কার ক'রে বাজার সরগরম রাখত। ওদিকে বটতলার প্রকাশকেরা মাঝে মাঝে এক ফরমা পাতলা কাগজে মুদ্রিত গুজব-পুস্তিকা বাজারে ছাড়ত। হকারেরা চীৎকার ক'রে হাঁকতে হাঁকতে গলি দিয়ে চলত, ১৮৯৯ সালে—কি জানি কি আছে কপালে—একটি পয়সা খরচ ক'রে ইত্যাদি।

হু-হু ক'রে সেই সব বই বিক্রি হ'ত।

মনে আছে, একবার গুজব রটল—পৃথিবী ধ্বংস হবে। অবিশ্যি পৃথিবী ধ্বংস হবার গুজবটা প্রায়ই রটত, কিন্তু সেগুলো ছিল অত্যন্ত ক্ষীণ। এবারকার গুজবটা রটল খুব জোর। অমুক দিনে রাত্রি একটার সময় এবার পৃথিবী নিশ্চয় ধ্বংস হবে। বাড়িতে বাড়িতে ইস্কুলে আপিসে ওই একই আলোচনা চলল দিনরাত্রি ধ'রে। কি ভাবে ধ্বংস হতে পারে, তা নিয়ে হরেক রকমের গবেষণা হয়। বন্যা, ভূমিকম্প, পৃথিবী খুঁড়ে অগ্ন্যুৎক্ষেপণ—এর কোনও একটা কিংবা সব কটাই একসঙ্গে হতে পারে। মোট কথা, কলির শেষ হয়েছে, এবার পৃথিবী ধ্বংস হয়ে আবার সত্যযুগ আরম্ভ হবে।

মনে পড়ে, নির্দিষ্ট রাত্রির সন্ধ্যাবেলা অভিভাবকেরা পড়তে বসবার তাগাদা দিলেন না। খাওয়া-দাওয়া শেষ হবার পর আমাদের বিছানায় যাবার হুকুম হ'ল। মা বললেন, বারোটা নাগাদ সব ঘুম থেকে তুলে দেওয়া হবে।

সত্যিই রাত্রি বারোটার সময় আমাদের ঘুম থেকে তুলে দেওয়া হ'ল। উঠে দেখি, চারিদিকে হৈ-হৈ ব্যাপার চলেছে। বাড়িতে বাড়িতে ছোটরা কেউ ঘুমোয় নি, সব চেঁচামেচি করছে, কোন দল বা লুকোচুরি খেলছে। পৃথিবী ধ্বংস হবার উপলক্ষ্যে ছেলেদের উৎসাহ

ও ফুর্তি বেড়ে গিয়েছে। নির্দিষ্ট সময়ের কিছু আগে বাড়ির পুরুষেরা বাইরের রকে এসে বসলেন, মেয়েরা সদর-দরজার ঠিক পেছনেই পান-দোক্তা মুখে ঠেসে কলরব করতে লাগলেন, অর্থাৎ বিপদের সূচনা হ'লেই 'অ্যাকশন' শুরু হয়ে যাবে। ভূমিকম্প যদি হয় তবে তাঁরা রাস্তায় বেরিয়ে পড়বেন, আর যদি জলপ্লাবন হয় তবে পুরুষেরা বাড়ির মধ্যে ঢুকে ছাতে চড়বেন। কিন্তু ক্রমে ঘড়ির কাঁটা ঘুরতে ঘুরতে একটা দেড়টা ছটোর ঘর পেরিয়ে গেল—কিছুই হ'ল না। যে যার বিছানায় সকলেই ফিরে গেল—পৃথিবী ধ্বংসও হ'ল না, কলিরও অবসান হ'ল না, অপ্রতিহত প্রভাবে তিনি আজও রাজত্ব ক'রে চলেছেন।

আধুনিকেরা প্রশ্ন করতে পারেন, এই সব গাঁজাখুরি গুজবের মধ্যে কোনও সত্য নেই—এ কথা কি শহরবাসীরা বুঝত না? তার উত্তর হচ্ছে, খুবই বুঝত। বড়দের কথা ছেড়েই দেওয়া যাক, আমরা বালকেরাও তা বুঝতে পারতুম। কিন্তু ব্রহ্ম যেমন নিজের সৃষ্ট মায়ার মধ্যে লীলা করেন, শহরবাসীরাও তেমনই নিজেদেরই কল্পিত বিপদ নিয়ে দিন কয়েক লীলানন্দ উপভোগ করতেন। তাঁদের সঙ্গে তাল রাখতে গিয়ে লীলাসঙ্গিনীদের যে অবস্থা হ'ত, সে কথা উল্লেখ ক'রে আর কাজ নেই।

সেবার আমাদের পুজোর ছুটি আরম্ভ হবার কিছু আগেই ছেলে-ধরার গুজব উঠল বড় জোর। মারপিটের চোটে শহর সরগরম হয়ে উঠল। শোনা গেল, সারাতে রেল-কোম্পানি যে নতুন পুল করছে সেখানে ঠিকেদারেরা নাকি একশো ছেলেকে বলি দেবে ব'লে ঠিক করেছে। প্রমত্তা পদ্মা মানুষের রক্ত চায়, তা না হ'লে সে বন্ধনে ধরা দেবে না ব'লে স্বপ্ন পাওয়া গেছে। ঠিক সেই তালে দু-চারটি খলিফা ছেলে বাড়ি থেকে লম্বা দেওয়ায় অগ্নিতে ঘৃতাহুতি পড়ল। খবরের কাগজওয়ালারা এই নিয়ে আন্দোলন শুরু ক'রে দিলে। তখন সবেমাত্র স্বদেশী যুগ আরম্ভ হয়েছে, একটা কিছু পেলেই গভর্মেণ্টকে জুড়ে গালাগালি দেওয়া হ'ত। কাগজে পুলিস-বিভাগের

অযোগ্যতা সম্বন্ধে খুব লেখালেখি চলতে লাগল। রোজই সত্য মিথ্যা ছেলেধরার গুজব উড়তে লাগল শহরময়। কোনও ব্যক্তির ওপরে কোনও কারণে রাগ থাকলে একবার তাকে রাস্তায় ধ'রে এই ব্যক্তি 'ছেলেধরা' ব'লে চেঁচালেই হ'ল। কোথায় ছেলে, কার ছেলে, সে সম্বন্ধে খোঁজের কোনও প্রয়োজন নেই—আগে তাকে প্রহার দাও।

শহরের হালচাল তো এই দাঁড়িয়ে গেল। তখন মোটর গাড়ির বিশেষ প্রচলন হয় নি। ধনীর ছেলেরা বাড়ির ঘোড়ার গাড়িতেই ইস্কুলে যাতায়াত করত। এরই মধ্যে একদিন একজনদের বাড়ির ছেলেরা ইস্কুল থেকে গাড়ি ক'রে কর্নওয়ালিস স্ট্রীট দিয়ে বাড়ি ফিরছে, এমন সময় কালীতলার কাছাকাছি ঘোড়াটা কি কারণে ভড়কে গিয়ে মারলে দৌড়। গাড়োয়ান গাড়ি সামলাতে পারে না, ভেতরে ছোট ছোট ছেলে, তারা কাঁদছে, গাড়ি থেকে লাফিয়ে পড়বার চেষ্টা করছে, এমন সময় কে রব তুলে দিলে—ছেলেধরারা গাড়ি ক'রে ছেলে তুলে নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে। যাঁহাতক এই কথা শোনা, অমনই রাস্তার লোক হৈ-হৈ ক'রে উঠল। নিজের জান-প্রাণ তুচ্ছ ক'রে সেই উড়ন্ত ঘোড়াকে ধ'রে ফেলা হ'ল। কোথায় গেল কোচোয়ান আর কোথায় গেল তার সহিস! ছেলেরা বাইরে লাফিয়ে পড়ল। কেউ তাদের জিজ্ঞাসাও করলে না—কি হয়েছে? ঘোড়াটা ছাড়া পেয়ে উর্ধ্বশ্বাসে আবার দৌড় মারলে। শেষকালে লোকেরা লাঠি, শাবল, হাতুড়ি এনে দড়াদ্দম মারতে মারতে গাড়িখানাকে ভেঙে একেবারে চুরমার ক'রে ফেললে। এখন কর্নওয়ালিস স্ট্রীটে যেখানে শ্রীমানী বাজার আছে আগে সেখানে সব খোলার চালের বস্তি ছিল। এই বস্তিতে পালদের মস্ত বড় এক মুদির দোকান ছিল। উন্মত্ত জনসংঘ গাড়িখানাকে চুরচুর ক'রে ভেঙেও নিশ্চিন্ত হ'তে পারলে না, যদি গাড়ির সেই ভগ্নস্তূপের মধ্যে কোথাও ছেলেধরার বীজ লুকিয়ে থাকে, এই ভয়ে তারা সামনের সেই মুদির দোকানে ঢুকে কেরোসিন

তলের ক্যানেস্তারা টেনে বার ক'রে সেই চূর্ণ গাড়ির ওপরে ছড়িয়ে দিয়ে দিলে তাতে আগুন ধরিয়ে। আধ ঘণ্টার মধ্যে হাজার টাকার গাড়িখানা চার আনার কাঠকয়লায় পরিণত হয়ে রাস্তায় প'ড়ে রইল।

বেশ মনে পড়ে, সেদিন আনন্দমোহন বসুর মৃত্যুদিন। সকাল-বেলা তাঁর দেহ শোভাযাত্রা ক'রে নিমতলার শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হ'ল। সেখান থেকে বেলা বারোটা নাগাদ বাড়িতে ফিরে আহারাদি ক'রে বেরুচ্ছি, এমন সময় দরজার সামনেই দেখি, জনার্দন ও আমার অন্যতম বন্ধু সুকান্ত দাঁড়িয়ে। দেখলুম, জনার্দনের মাথা ন্যাড়া। সে বললে, ছুটির মধ্যে হঠাৎ তার বাবা মারা গিয়েছেন, দিনকতক আগে শ্রাদ্ধশান্তি চুকিয়ে আজ সকালে সে কলকাতায় ফিরেছে।

কথা বলতে বলতে আমরা অগ্রসর হতে লাগলুম। সুকান্ত বললে, জনার্দন কাজের ছেলে। বাড়ি থেকে শুধু হাতে ফেরে নি, কিছু মালও নিয়ে এসেছে।

—তার মানে?

সুকান্ত বললে, চল না, বোর্ডিঙে গেলেই বুঝতে পারবে।

বোর্ডিঙে গিয়ে দেখা গেল, জনার্দন তিনটি লম্বা 'জেম' বিস্কুটের টিন ভর্তি টাকা নিয়ে এসেছে দেশ থেকে। টাকা বললে ভুল হবে, তিনটি টিন স্রেফ সিকি দুয়ানি ও আধুলিতে ভর্তি—বিশ্বাসঘাতকতা করব না, দু-চারটে টাকাও তাতে ছিল।

ইস্কুল খুলতে তখনও একদিন কি দুদিন দেরি ছিল। জনার্দন বললে, টাকা নিয়ে বাড়িতে থাকলে যদি ধরা প'ড়ে যাই, তাই ইস্কুল খোলবার আগেই চ'লে এসেছি।

তার বুদ্ধির তারিফ ক'রে বললুম, বেশ করেছ বাবা জনার্দন! ভবিষ্যতে এমন বিবেচনাশীল হবে বুঝতে পেরেই বাপে তোমার নাম রেখেছিল—জনার্দন।

তাড়াতাড়ি বোর্ডিঙের একটা ঘরে গিয়ে রেজকিগুলো গুণে ফেলা গেল। সবসুদ্ধ তিন শো টাকার কিছু বেশি হবে—তার মধ্যে আবার

টাকা পঁচিশেকের সিকি দুয়ানি ছিল অচল ও কোঁড়ামারা। তার মধ্যে টাকা দশেক একেবারেই অচল আর বাকিগুলো 'চেষ্টা ক'রে দেখা যেতে পারে'-গোছের।

এত সিকি দোয়ানি জুটল কি ক'রে জিজ্ঞাসা করায় জনার্দন আকাশের দিকে মুখ তুলে যুক্ত কর বুকে ঠেকিয়ে পরলোকগত পিতার উদ্দেশে নমস্কার ক'রে বললে, বাবা যাবার সময় দিয়ে গিয়েছেন।

—তোর বাবার সিকি দোয়ানি জমাবার শখ ছিল বুঝি?

জনার্দন হাঁ কিংবা না কিছুই বললে না। শেষকালে জেরা করতে করতে বেরিয়ে পড়ল যে, বাপের শ্রাদ্ধের সময় তাদের এক এক ভাইয়ের হাতে এক-একটা কাজের ভার পড়েছিল। তার ওপর পড়েছিল ব্রাহ্মণ বিদায়ের ভার। তা থেকে সে নিজের ভাগে এই টাকাটি ফেলেছে। যা হোক, কি ক'রে অর্থ এসেছে সে বিষয়ে গবেষণা বন্ধ রেখে এখন কোথায় যাওয়া হবে তাই স্থির করতে মনোনিবেশ করা গেল। বলা বাহুল্য যে, সুকান্তও আমাদের সঙ্গে ভিড়ে গেল। আমরা স্থির করলুম যে, আমরা আগ্রায় যাব, তার পর সেখানে কিছু সুবিধা হ'লে সেখানেই স্থিতি, নয়তো অন্য কোথাও যাওয়া যাবে। তখনকার দিনে আগ্রা যাবার রেল ভাড়া ছিল প্রায় আট টাকা, কিছু কম-বেশি হ'তে পারে। কিন্তু ওই সিকি দোয়ানি নিয়ে তো আর টিকিট কিনতে যাওয়া চলে না। এন্টালির এক পোদ্দারের দোকান থেকে একশো টাকার সিকি দোয়ানি দিয়ে নব্বই টা টাকা পাওয়া গেল। তার পর একটা হোটেলে দমভোর খেয়ে রাত্রি প্রায় আটটার সময় দিল্লীযাত্রী একটা এক্সপ্রেস গাড়িতে চ'ড়ে আমরা আগ্রার দিকে রওনা হলুম।

[ক্রমশ]

"মহাস্থবির"

অ্যালবার্ট হল

(পূর্বানুবৃত্তি)

অরুণ একলা ব'সে দেখছিল দেওয়ালে আঁকা একটা পাখি। নিজের কাছে তার অনেক প্রশ্ন। অনেক জিজ্ঞাসাই তার নিরুত্তর থেকে যায়, তার জন্যও কোন ক্ষোভ নেই। এ জিজ্ঞাসা যেন প্রশ্নের সমাপ্তিতেই অবসিত। পৃথিবীর পথে পথে কত শিল্পীর ব্যর্থ চেষ্টা অচিহ্নিত হয়ে শেষ হ'ল, কেন? মানুষ হয়ে জন্মলাভ ক'রেও দু মুঠো পেট ভ'রে খেতে যারা পায় না, তাদেরই সংখ্যা বেশি হয় কেন? পাখিটাকে সে এইসব প্রশ্নই করে। ফিকে সবুজ আর গাঢ় নীল, দুধের মত সাদা আর কর্ণিকারের মত হলুদের ছিটেফোঁটা দিয়ে আঁকা লেজটি নাচিয়ে পাখিটা কি বলতে চাচ্ছে, অরুণ তা বুঝতে পারে না

এমনই কত জিজ্ঞাসার অন্ত নেই তার মনে

পাখিটা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই নাচে, অরুণের মনটুকুও এইখানে ব'সেই যেন দেশ-কালের দেওয়াল পেরিয়ে দেখতে পায় সব কিছু।

ও-পাশের টেবিলে এক দল যুবক এসে বসেছে। তাদের গলাবাজিতে কান ঝালাপালা হয়ে ওঠার কথা। অন্য টেবিলের কেউ কেউ ভ্রূকুটিতে অগ্নিসংযোগ ক'রে তাদের আচরণকে তিরস্কার করছে। অপেক্ষাকৃত সহিষ্ণুরা লক্ষ্য ক'রেও নজর দিচ্ছে না।

অরুণ ওদের দলের প্রত্যেককেই চেনে। এককালে ওরা তালতলা স্ট্রীটের আপিস গরম ক'রে রাখত। অরুণও ছিল সে দলে। অরুণের খড়্গনাসা আর গভীর চোখের দৃষ্টিতে যে তীক্ষ্ণ বুদ্ধির স্ফুরণ ছিল সেটা অনেকেই সুনজরে দেখে নি। তার এক-একদিনের এক-একটি প্রশ্নে সমবায়ের পাণ্ডারা বিপন্ন হয়ে উঠতেন। কেবলমাত্র উৎসাহিতভাবে জবাব দিতে দেখা যেত বীরেনবাবুকে। তিনি অধ্যাপক এবং পণ্ডিত অধ্যাপক। অপেক্ষাকৃত মাঝারি দরের সভ্যেরা অরুণকে বলত, দেখ, জিজ্ঞাসা ভাল, কিন্তু কাজও করা দরকার। যারা এ কথা বলত তারা হয়তো লেকাফার উপর ডাক-টিকিট আঁটছে। অরুণও সে কাজ

করত। তবে গোঁড়া সভ্যের মত সে হেঁকে বলত না—We are doing a great Revolutionary Job. তার ঠিক উল্টো কথাই মনে হ'ত। এই খামের পায়ে লেই লাগাবার কাজের জন্যই আমার দেশহিতব্রত। ওরা সবাই তখন পার্টির জার্নাল বিক্রি করত। অরুণের বেশ মনে আছে, একদিন একখানা জার্নাল বিক্রির জন্য এক ভদ্রলোকের সঙ্গে তর্ক করতে করতে কালীঘাটের মোড় থেকে এল্গিন রোড পর্যন্ত সে চ'লে এসেছিল। অবশেষে সে লোকটি যখন নাচার হয়ে চার আনা পয়সা বার ক'রে দিলেন, তখন সে বলেছিল, তা হ'লে আপ'নি আস্থা-পোষণ করেন পার্টির নীতিতে? সে লোকটি একটু হেসে জবাব দিলেন, না। আমি আপনার ধৈর্যের প্রশংসা করি আর আপনার হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে চাই, সেইজন্যে। অরুণ নিজের হাতটা গুটিয়ে নিয়ে বললে, ধন্যবাদ। আপনার ভদ্রতা আছে, কিন্তু মনুষ্যত্ব নেই। এতক্ষণ ধ'রে তর্ক করলেন, হেরে গেলেন, তবু মত বদলাতে পারেন না? ভদ্রলোক আবার হাসলেন, বললেন, আমার মত তো তোমাদের মত বই প'ড়ে প'ড়ে তৈরি হয় নি, আমার পঁয়তাল্লিশটি বছরের কঠিন তিক্ত অভিজ্ঞতা আমার মতের পিছনে দাঁড়িয়ে রয়েছে যে। তোমরা বলছ—জনযুদ্ধ, তোমরা বলছ—শ্রেণীহীন সমাজ, তোমরা বলছ সবই, কিন্তু তোমরা এতটা পরমত-অসহিষ্ণু, সেটা কেন দেখতে পাও না?…অরুণ ওই দেওয়ালে আঁকা পাখির দিকে তাকিয়েই যেন আজ সেই পুরানো জিজ্ঞাসাটা টেনে আনল।…ওরা তখন কফি-হাউসে আসা তো দূরের কথা, পার্টির লোক ছাড়া অপরের সঙ্গে কথা বলাটাই সময়ের অপব্যয় এবং নীতিভ্রষ্টতা ব'লে চিহ্নিত করত। প্রভাত সেনের কথা মনে পড়ল। প্রভাত সেন এখানে সেখানে ঘুরে বেড়াত এবং কি একটা বেয়াড়া প্রশ্ন নিয়ে তর্ক করার অপরাধে তাকে পার্টি থেকে বরখাস্ত করা হ'ল। প্রভাত অনেকদিনের বন্ধু অরুণের। পার্টি থেকে তাকে এভাবে তাড়ানোটা অরুণের ভাল লাগে নি। কিন্তু সে নিয়ে

আর কারও সঙ্গে কোনই আলোচনা করত না অরুণ। কাজ করার চেয়ে দর্শকের ভূমিকাই সে বেশিটা গ্রহণ করেছিল। আধা-ইঙ্গ সমাজের অনেক মেয়ে এসে হাজির হ'ল—তাদের ঠোঁটের রঙ, আর গালের রুজ-পাউডার, মাথার জমকালো ঝুম্‌কো ফুলের মত কার্ল-করা চুলের গুচ্ছ দুলিয়ে মিহি সুরের কথায় পার্টি-অফিসের ঘরের হাওয়া বদলেই গেল। তারা মোটর হাঁকিয়ে আসে, কিন্তু দেওয়ালে যখন পোস্টার আঁটা হয় তখন তারা মোটর গাড়ি থামিয়ে শাড়ি সামলাতে সামলাতে এগিয়ে এসে মই ধরে, বলে—Let me help you, I must do something to co-operate.

অরুণের মনে হ'ত, এ কি কাজ হচ্ছে? না, কাজ দেখানো হচ্ছে! তালতলার কর্মীরা কাজ করে, তার চেয়ে বেশি করতে থাকে অপরের কাজের নিন্দা। সত্যি যারা পার্টির নীতিমাফিক দেশময় কাজ ক'রে বেড়ায়, তাদের তালতলায় খুব ভিড় নেই। অরুণ নিজের কাছেই একটা জিজ্ঞাসা হয়ে দাঁড়াল। আমার কি কাজ?…একদিন তাকে দু-চারটি সভ্য ধমক দিলে, তুমি প্রভাত সেনের সঙ্গে মেলামেশা করছ এটা আমরা অনুমোদন করি না। ওটা বন্ধ কর। অরুণ বললে, সে আমার বন্ধু, আমি মিশব তার সঙ্গে। একজন বললে, বন্ধু? কোনও রেনিগেড তোমার বন্ধু হতে পারে না। অরুণ বললে, প্রভাত সেনের কোনও দোষ ছিল না, তাকে অন্যায়ভাবে তাড়ানো হয়েছে। তার আদর্শবাদ এখনও ঠিকই রয়েছে। আমি ভাল ক'রেই জানি। কম্‌রেডরা, পার্টির ছেলেরা তীব্রভাষায় অরুণের নিন্দা করলে, তুমি পার্টির বিরুদ্ধে চলছ—এর ফল ভোগ করতে হবে।·· আজকে ওই টেবিলে ব'সে যারা এত কোলাহল করছে তারাই তো সেদিন অরুণের বিরুদ্ধে উঠে-প'ড়ে লেগেছিল। অরুণের বাড়িতে তারা টেবিল আঁকিয়ে ব'সে খাচ্ছিল। খুব হৈ-চৈ হচ্ছিল। হঠাৎ অরুণকে দেখে তারা সবাই থেমে গেল। অরুণ জিজ্ঞাসা করল, তোমরা কখন এলে? তার জবাব দিলে না কেউ। অরুণ আরও দু-একটা কথা কইবার চেষ্টা করলে,

কিন্তু তারা একটা কথাও কইল না। রাগে অরুণের কান-মাথা ঝাঁ-ঝাঁ করতে লাগল। সে হঠাৎ এগিয়ে এসে খাবার টেবিলে একটা ঘুষি মেরে. বললে, আমি জানতে চাই—এই শূয়ারের দল এখানে কেন এসেছে? এরা কারা? আমি বলছি—। তার কথা শেষ হবার আগেই নাকের ওপর একটা ঘুষি খেয়ে সে ছিটকে পড়েছিল। কিন্তু দমে নি সে। তখনই উঠে দাঁড়িয়ে আস্ফালন করতে লাগল, মানবতার দোহাই দিয়ে বলতে পারি—এই ঘুষি আমার নাকে লাগে নি, এটা মারা হয়েছে লেনিনের আদর্শবাদকে। তোমরা যারা আমাকে বাড়ি ব'য়ে এসে মারতে পার, যারা প্রভাত সেনের সমালোচনার ভয়ে তাকে তাড়িয়ে দিতে পার, তারা জেনে রাখো যে, জনসাধারণকেই এমনই ভাবে ঘুষি মেরে দূরে হটিয়ে দিচ্ছ। তোমাদের মাথার ঠিক নেই। তোমাদের এই নীতি মার্কসিজম্ নয়। তার নাকের সামনে আর একটি ঘুষি এগিয়ে এসে দাঁড়াল, সে ঘুষিটা বললে, একটি কথা নয়। চুপ। এক ঘুষিতে দাঁত ভেঙে দেব।···তার পর অরুণ পার্টি ছেড়ে দিয়েছে। তার মন তিক্ত হয়ে গিয়েছে। রাজনীতির কোন কিছুতেই সে আর থাকতে চায় না। তবে আদর্শবাদকে সে অবশ্যই শ্রদ্ধা করে। যীশুর ধর্ম আর খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী মানুষে যে অনেক তফাত সেটা আমেরিকানদের দেখে, ইংরেজদের দেখে, ম্যালানকে দেখে অরুণ বুঝে নিয়েছে। যারা সেদিন তার দাঁত ভেঙে দিতে উদ্যত হয়েছিল. তারা—তারাই বা কি করেছে? কেউ বা এখনও দলে আছে। কেউ মোটা মাইনের চাকরি করছে ইংরেজ পুঁজিপতির খবরের কাগজে, কেউ হারিয়ে গেছে ভিড়ের মধ্যে। অরুণ প্রশ্ন করে পাখিটাকে—তাদের কি হ'ল? পাখিটা আগের মতই নিরুত্তর।

হঠাৎ একটা প্রশ্নে অরুণ চমকে উঠল—এই যে, একা একা ব'সে কি করছেন অরুণবাবু?

না, ঠিক একা নই, সন্তোষ ছিল, এখুনি আসছে ফিরে। তার পর আপনার কি খবর?

আচ্ছা মশাই, ওই হ্যালা-পাগলটাকে কি ক'রে সহ্য করেন আপনি? চিবিয়ে চিবিয়ে শান্তিনিকেতনী ঢঙে কথা বলে, আর— অবিশ্যি মানুষ হিসেবে খারাপ নয়। যাকগে সে কথা। আমি একটা পাঁচালী ফর্মের গাথা কবিতা নিয়ে কিছুদিন হিমসিম খাচ্ছি; যদি একটু দেখে-শুনে দেন।

আচ্ছা, বেশ তো, একদিন যাওয়া যাবে আপনার বাড়ি।

আহা, আবার অত কষ্ট করতে যাবেন কেন? বলেন তো এখনই শুনিয়ে দিতে পারি—পকেটেই আছে।

অরুণ অসহায় ভাবে প্রশ্ন করে, কত বড়?

তা বুঝে দেখুন না। মডার্ন সভ্যতাকে নিয়ে লেখা। অবিশ্যি লেখাটা খুব প্রোগ্রেসিভ ভাব নিয়েই। তবে বুঝছেন তো—

একটু গলা ঝেড়ে নিয়ে অরুণ বললে, এই গোলমালের মধ্যে কি তেমন সুবিচার হবে?

অবিশ্যি সেটা ভাববার কথা। তবে কি জানেন, এ তো গোলমালেরই কবিতা। মডার্ন মেঘদূত হচ্ছে এরোপ্লেন, সেই এরোপ্লেন দেশ-দেশান্তরে কি কি দেখছে, তার নিজের গর্জন আর জনগণের অসন্তোষের আওয়াজ—এই হচ্ছে থীম্‌। বুঝলেন না।

অবিশ্যি বুঝেছি।

পিছন থেকে সন্তোষ এসে দাঁড়াল। তার পর ব'সে প'ড়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, এল না। বুঝলে, কিছুতেই বুঝিয়ে উঠতে পারলাম না।

অরুণ বললে, সে আমি জানতাম। ও সব ইন্‌সেক্টদের কথা বাদ দাও। আচ্ছা, এঁর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই, ইনি ডাক্তার মৃগেন সিংহ রায়, সম্প্রতি বিলেত থেকে ফিরেছেন—আর ইনি আমার বন্ধু সন্তোষ গঙ্গোপাধ্যায়।

সন্তোষ বললে, হ্যাঁ, খুব চিনি। তবে ডাক্তার নয়—কবিয়াল ব'লে।

ডাক্তার সিংহ রায় বিগলিতভাবে বললে, না না, কি যে বলেন! আমি আর কতটুকু জানি!

অরুণ যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচল, এক টিপ নস্যি নিয়ে রুমালে হাত মুছতে মুছতে বললে, তা হ'লে শুরু হোক ডাক্তারবাবুর মেঘদূত।

ডাক্তার বিমর্ষভাবে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললেন, আজ বড্ড দেরি হয়ে গেছে। আর একদিন শোনাব। আচ্ছা, নমস্কার।

ডাক্তার পিছন ফিরতেই সন্তোষ বললে, আচ্ছা এই সব ডাহা পাগলের সঙ্গে তোমার দোস্তি! কি ক'রে সহ্য কর বল তো! ওটা না-ডাক্তার না-কবি—বাপের পয়সায় বিলেত থেকে মানুষ খুন করবার লাইসেন্স নিয়ে এসেছে। তাতেও শান্তি নেই, সুস্থ মানুষকে ওর পাঁচালীর চাপে পিষে মারবে। নিউরোটিক্ পারভারস্।

অরুণ বললে, আস্তে বল, শুনতে পাবে যে!

শুনুক। আমি শোনাতে চাই। জান, একটা পদ্য লিখেছে সাড়ে তিনখানা বাঁধানো এক্সারসাইজ বুক এ-পিঠ ও-পিঠ ঠেসে। কি? না, মেঘদূত। তুমি ওই হ্যালা-পাগলটাকে স্ট্যাণ্ড কর কেন?

স্রেফ দেখে যাও।

না, আর দেখাশোনা নয়, কাজ করতে হবে। নিজেরই হোক বা পরেরই হোক, কাজ করা দরকার। এই শূন্যবাদ আর ভাল লাগে না। বিজয়ের মত উৎকট প্রেমের ফাঁস গলায় লাগানো, তাও ভাল; না হয় মঙ্গলের মত মানুষের উপকার ক'রে বেড়ানো, তাও মন্দ নয়।

ও-সব পারবে না, যদি পার তো ওই ডাক্তার-কবির মত পাঁচালীর বস্তা মাথায় নিয়ে ফেরি করার চেষ্টা দেখ।

সন্তোষ উত্তেজিতভাবে জবাব দিলে, ঠাট্টা-ইয়ার্কির কথা নয়। আমি লিখব খাঁটি লেখা, তোমাদের এখনকার সাহিত্যিকদের মত বস্তাপচা সস্তা কথা নয়। আমাদের মত শিরদাঁড়া-ভাঙা পাত্রপাত্রী নয়। বিরাট একটা চরিত্র।

তোমার অ্যালবার্ট হল তা হ'লে লেখা হবে না?

কেন হবে না? আমার উপন্যাসের সবচেয়ে বড় নায়ক হচ্ছে স্বয়ং অ্যালবার্ট হল। আজকের দিনে তুমি একটা এমন মানুষ পাবে

না, যাকে দেশের সামনে নায়ক-চরিত্র হিসেবে দাঁড় করতে পার। তার জন্যে দোষ দেবে কাকে! প্রত্যেক মানুষ চলছে কন্‌সার্টের গত বাজিয়ে। তার মন যা-ই বলুক, তার বাসনা যতই বিচিত্র হোক না কেন—তাকে ছকের ভেতরে পাক খেতে হবে। আমরা হচ্ছি বিরাট সমাজ-যন্ত্রের নাট-বোল্ট। বাস্‌, জীবনটা ফুরিয়ে গেল। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীতে মানুষ এসেছে, মানুষ তখন নিজের অধিকার নিয়ে লড়াই করেছে। তারা সংস্কার করবার জন্য পাগলের মত ছুটোছুটি করছে প্রাণের তাগিদে।

আজই যে ছুটোছুটি করে না, তার প্রমাণ কি?

তুমি-আমিই তার প্রমাণ। আমরা লেখাপড়া শিখে কি করছি? নিজের ব্যর্থতা নিয়ে বিক্ষোভ করি—এমনও মানসিক গঠন নেই। যেটুকু পারি, তাও করব না—

অরুণ বললে, চরম ব্যর্থতার পরিণাম হচ্ছে লেখক হওয়া। কারুর সামনে মুখ ফুটে কিছু বলবার যার সাহস নেই, যে ভীরু সংসারের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে লড়তে পারে না, যে মেরুদণ্ডহীন, যে সরীসৃপ, যে সোজা হয়ে দু কদম হাঁটবার মত পায়ে জোর পায় না, যে আর কিছুই পারে না—আমাদের দেশে সেই পঙ্গুরাই তো লেখক। তুমি খোঁজ ক'রে দেখ, বাংলা দেশে যত লেখকসংখ্যা ভারতবর্ষের বাকি ভূখণ্ডে তার সিকিও নেই। তার কারণ কি? এরা আর কিছু করবার যোগ্য নয়।

সন্তোষ বললে, দীর্ঘকাল পরাধীনতার জন্যই আজ আমাদের এ অবস্থা।

ভারতবর্ষের বাকি অংশ কি পরাধীন ছিল না?

তাদের মধ্যে সে বোধটুকু ছিল না যে! আমি বলছি না যে, তারা আমাদের চেয়ে বুদ্ধিতে মনুষ্যত্বে কোনও অংশে কম। তবে এটা ঠিক বাংলা দেশ তার ভাগ্যবলে কয়েকজন বড় বড় চিন্তাশীল ব্যক্তির জন্যে চেতনার দিক দিয়ে অনেক এগিয়ে এসেছে। এখন যদি তেমনি শক্তিমান

কোনও নতুন মানুষ এসে হাল ধরতে পারত, চালিয়ে নিয়ে যেতে পারত সমাজকে, তা হ'লে ব্যর্থতা আর দলাদলির ভাঙনের মুখে প'ড়ে তচ-নচ হয়ে যেত না আমাদের এই অগ্রসারিত চৈতন্য। বার বার বাংলা দেশেই ভারতবর্ষের রাজনীতির চরম পরীক্ষা হয়েছে—এ কথা তো তুমি অস্বীকার করতে পার না।

অরুণ বললে, সে সবই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের দৌলতে। জমিদারি, ব্যষ্টি-কেন্দ্রিক সমাজ-ব্যবস্থা, এসব তো আর নেই। আর চলবেও না।

কি চলবে আর কি চলবে না—তা তুমি জোর ক'রে বলতে পার না। তবে একটা কথা স্বীকার করতেই হবে—সমাজের চেহারা যাই হোক না কেন, বুদ্ধিমান বিরাট ব্যক্তির প্রয়োজন সব সময়েই থাকবে। আজকে আমাদের এই কফি-হাউসে ব'সে ব'সে সময় বুদ্ধি আয়ু আর অর্থের যে পরিমাণ অপব্যয় হচ্ছে—এটাই ব্যর্থতার চরম রূপ। এটা থেকে বড় কিছুর দিকে চলবার উপায় চাই। দেখতে পাচ্ছ কি, সবাই আসছে এক-একটা সভাশোভন কোট গায়ে চড়িয়ে। কারুর গায়েই কোটটা ঠিক মাপমাফিক হয় নি। কোটগুলো সব এক মাপের তৈরি, কিন্তু মানুষগুলোর গা আলাদা আলাদা মাপের। তারা কি করছে? তারা ওই কোটের মাপের মত নিজেকে তৈরি করবার চেষ্টা করছে। কিন্তু তা যে হয় না। মানাবে কেন? কোটের মাপে তো আর শরীর তৈরি হয় নি! তবু আমরা নিজেদের ভুলটা ধরতে পারি নে

অরুণ অসহিষ্ণুভাবে উঠে দাঁড়িয়ে বললে, আমি চললাম, তুমি একা-একা ব'সে পাগলামি কর।

সহসা বাক্যস্রোতে বাধা পেয়ে সন্তোষ দ'মে গিয়ে বললে, দেখ অরুণ, তুমি অন্তত বোঝবার চেষ্টা কর। অরিজিন্যালভাবে চিন্তা করার মূল্য সবাই দেয় না, কিন্তু সেই জন্যেই কি আমাকে অন্যের মনোমতভাবে চিন্তা করতে হবে? শোন, ব'স।

অরুণ বললে, আমার মাথাটা দপদপ করছে। তুমি একটু ব'স, আমি ওই চ্যাংড়াদের সঙ্গে একটু খিস্তি ক'রে আসি।

ধাঃ, ওরা তোমার সম্বন্ধে যা-তা বলে। ওদের গায়ে গা ঘষতে যাও কেন?

ওরা কাজ করে না, তাই তো নিন্দে করবার সময় পায়। আসল যারা কাজের ছেলে, তারা ঠিক বেঘোরে ঘুরে মরছে। সত্যি তাদের জন্যে আমি, আমার এই ফসিল মনটা কেঁদে ওঠে সন্তোষ। ভাবো দেখি সুকান্ত প্রভাসের কথা, আরও অমনি কত ট্যালেণ্ট্‌ সাফার ক'রে মরছে, মরবে। তবু কি আমরা বুঝতে শিখব না?

দেখ অরুণ, আমি এটা পছন্দ করি না। ওরা তবু একটা কিছু নিয়ে মাথা ঘামায়। এফ. এস. ইউ. করছে আর স্বয়ং সংঘই গড়ছে— তাদের মধ্যে একটা বেদনাবোধ আছে, এটাই প্রমাণ হচ্ছে। এদের এই বিভিন্ন জীবনবোধকে যে পরিচালিত করতে পারবে, সেই বিরাট শক্তি অনাগত অথচ অবশ্যম্ভাবী—এই আমি বুঝি।

অরুণ ব্যস্তভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছিল কফি-হাউসের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত। অনেক অর্ধপরিচিত আর স্বল্পপরিচিতের মুখ দেখতে পেল সে। কিন্তু কোথাও বসতে ইচ্ছে করল না, কারুর সঙ্গে একটি কথাও সে কইল না। হঠাৎ এক-একটা মুহূর্তে সে কেমন সত্তাশূন্য মৌন হয়ে যায়, সে নিজেই বুঝতে পারে না। এইসব মুহূর্তে সে যেন কোনও অদৃশ্য শক্তির হাতের পুতুল হয়ে পড়ে, নিজে টের পায় না, সে কি করছে বা পরক্ষণে তাকে দিয়ে কোন্‌ কাজটা সাধিত হবে!···সে এক সময় রাস্তার দিকের জানলায় এসে দাঁড়াল। আকাশে দিনের আলো নেই, সন্ধ্যার ধূম্রাবৃত কলকাতা শহর ঠিক এখানে দাঁড়িয়ে উপলব্ধি করা যায় না। নীচের রাস্তাটা বেশ চওড়া। ও-পাশের দক্ষিণের ফুটপাথে সারি সারি ছিট আর কাপড়ের অস্থায়ী স্টলে গ্যাসের আলো দপদপ ক'রে জ্বলছে। ওই কাপড়ের দোকানগুলো খুব হালফিল হয়েছে। ওখানে ছিল পুরনো বইয়ের দোকান। ফুটপাথে পুরনো বইয়ের মধ্যে হীরামানিকের মত মহামূল্য বইও অনেক সময়ে পাওয়া যেত। এখন

সে দোকানগুলো বসে না। মুসলমানদের হাতেই ওই দোকানের মালিকানা ছিল। তারাই এতদিন বাংলা দেশের সংস্কৃতিকে বাঁধিয়ে বাঁধিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছিল। অরুণ অনেক বই কিনেছে ফুটপাথ থেকে। মধ্যবিত্ত পাঠতৃষিত মনের কাছে পুরনো বইয়ের দোকানও যা, ধন-দৌলতপিপাসিতের কাছে সোনার খনিও তাই। অরুণ সেই সব পুরনো বইওয়ালাদের উদ্দেশে আপনার অজ্ঞাতেই দু হাত তুলে নমস্কার করল। আর একটা নমস্কার করল সে ওই একান্তবর্তী বকুলগাছটাকে। এখানে এই বকুলগাছটা রয়েছে, এর ফুলের সৌরভ পথচারী কেউ কি পায়? অরুণ দেখলে, আরও দক্ষিণের দিগন্তকে রোধ ক'রে দণ্ডায়মান সংস্কৃত কলেজের উঁচু বাড়িখানা। ও-পাশের পাইনগাছটিকে ভাল ক'রে দেখা যাচ্ছে না। আবছা আবছা অনুমান করা যায় ওর অসহায় সমাজগোত্রহীন একক অবস্থিতি। দিনের বেলাতে অনেকবার ওই পাইনগাছটার কাছে গিয়ে অরুণের দৃষ্টি থমকে দাঁড়িয়েছে। গোলদীঘির আশপাশের গাছগুলোর সঙ্গে ওর কোন মিল নেই। ওর দীর্ঘ ঋজুতা ওর একহারা ডালপালার ছন্দ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। বর্ষার দিনে ওই দিকে চেয়ে চেয়ে কতবার অরুণ অনুভব করেছে দূরের কোন পাহাড়ী আবহাওয়াকেই। পকেটে পয়সা নেই। পাহাড়ী দেশে গিয়ে নিরবচ্ছিন্ন বর্ষা দেখবার স্বপ্ন তার এই একটি পাইনগাছে ব'সে থাকা গোটাকয়েক ভিজে কাকের দিকে চেয়ে চেয়েই চরিতার্থ হবার প্রয়াস পেয়েছে। ওই পাইনগাছে আঁকা হয়ে যায় হিমালয়বিহারী মনের বার্চ আর রডোডেনড্রনের বীথিকা, ওকে কেন্দ্র ক'রে ভেসে যায় পাগলা-ঝোরার মত অবাধ্য একটা মনের দুর্বাধ পিপাসা, ওর মাথার ওপর দিয়ে কে যেন দেখিয়ে দেয় কাঞ্চনজঙ্ঘার রজততুষারশুভ্র চূড়ার আলোক-বিচ্ছুরণ। ভিজে কাকগুলি খুশিতে খেয়ালের ডানা মেলে দিয়ে উড়ে চ'লে যায়, কিন্তু পাইন-গাছটা দাঁড়িয়ে থাকে আর থাকে, দিশেহারা মনটা। আজও এরা দুজনে যেন এই ধূসর গোধূলিতে দেখা-না-দেখার অদৃশ্য গ্রন্থীতে একসূত্রে বাঁধা পড়ল।

মনটা প্রসারিত হয়ে চ'লে যায় ওই আলো-আঁধারের রহস্যপুঞ্জের অতল গভীরে। সেখানে একটি স্বপ্নদর্শী মন, একা-একা কি যে দেখছে কেউ তা জানে না। কেরানী-জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে তিরস্কার করছে, অস্বীকার করছে নিজের দিনানুদৈনিক ব্যর্থতাকে। সে আঁকছে আপন মনে একটি অখণ্ড ছবি। সেখানে পৌঁছয় না বিধবা জননীর অভাব-অভিযোগ, বাড়িওয়ালার ঘন ঘন উকিলের চিঠির শাসানি তার কাছে হাস্যকর, অনূঢ়া বিবাহযোগ্যা বোনের জন্য সেখানে কোন দুর্ভাবনা নিষেধ। সে খুঁজছে কোন আপিসী কন্যার চশমার ভেতর দিয়ে তাকানো দুটি তৃষিত চোখকে। অরুণ আর কিছু ভাবতে চায় না, তার বেঁচে থাকার আর কোন দ্বিতীয় সার্থকতা নেই। ওর মন গুন্‌গুনিয়ে ওঠে—ওগো রঞ্জনা, তোমার চোখের তারায় নাচে খঞ্জনা। আসবে, তুমি আমার মনের মধ্যে থেকে বেরিয়ে! আসবে কি আমার ঘরে!…নীচের রাস্তা দিয়ে একখানা লরি ঝন্‌ঝন্ শব্দ ক'রে হর্ন বাজাতে বাজাতে চ'লে গেল। অরুণ চমকে উঠল সেই শব্দে। রঞ্জনা ওর মানসকল্পনার নায়িকা—তার নাগাল এমনিতে অরুণ পাবে না, রঞ্জনার আশেপাশে উজ্জ্বলতর নায়কেরা লুব্ধ নেত্রে মন দিয়ে প্রতীক্ষা করছে—এ কথা অরুণ জানে, ভাল ক'রেই জানে, সেই জন্যেই স্বপ্নছবি আঁকে আপন মনে মনে। ঘরের ভেতরের দিকে দৃষ্টি ফেরাতেই নজর পড়ল, একটি প্রৌঢ় পাঞ্জাবী ভদ্রলোক আর একটি বাঙালী মেয়ে এক কোণে ব'সে রয়েছে। আস্তে আস্তে চিনতে পারল, বাঙালী মেয়ে নয়, ওটি প্রেম বুবুলী।

আরে মশাই, এখানে একা একা দাঁড়িয়ে, কি হচ্ছে?

ওদিকে তাকিয়ে দেখল অরুণ, দিগম্বরবাবু উকিল ব'সে রয়েছেন।

আপনি কতক্ষণ দিগম্বরবাবু?

আমি অনেকক্ষণ এসেছি। ওই ওদিকে ব'সে ছিলেন তাও দেখেছি। এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি দেখছিলেন? হ্যাঁ, আপনার সঙ্গে দরকারী কথা ছিল। আসুন, এখানে বসুন না।

দিগম্বরবাবুর সঙ্গে অরুণের পরিচয় অনেক দিনের। আলিপুর কোর্টে ভদ্রলোক ওকালতি করছেন আজ ছাব্বিশ বছর ধ'রে। অরুণের বাবার সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা ছিল। বর্তমানে বাড়িওয়ালার সঙ্গে অরুণের যে মামলা হচ্ছে, তার ষোল আনা ইনিই চালাচ্ছেন। অরুণ অনুমান করল, দরকারী কথাটা মামলা-সংক্রান্তই হবে। একটু বিরক্ত হয়ে গম্ভীর মুখে সে এসে বসতেই দিগম্বরবাবু একেবারে কাজের কথা পেড়ে বসলেন, দেখুন, এইবারে আপনারা অন্য বাড়ি দেখতে পারেন। দেড় বছর হ'ল, আর মামলা চলবে না। বাকি ভাড়ার ওপর মামলার খরচসুদ্ধ যদি ওরা ডিগ্রী পায় তা হ'লে প্রায় দু হাজার টাকার ফেরে প'ড়ে যাবেন। আমি বড় জোর আর গোটা দুয়েক 'দিন' নিতে পারি। তা করতে করতে মাস দু-একের মধ্যে আপনারা উঠে গেলে বাঁচা যায়।

অরুণ পরম নিশ্চিন্তভাবে জবাব দিলে, বাড়ি দেখে কালই উঠে যাব।

দিগম্বরবাবু একটু বিস্মিত হয়ে বললেন, বলেন কি? বাড়ি ঠিক হয়ে গেছে?

না, তা হয় নি।

উচ্চাঙ্গের হাসি হেসে দিগম্বর বললেন, দেখুন, পারেন ভালই। নইলে একটা কাজ করতে বলি। মা-বোনদের দেশে পাঠিয়ে দিন। অমন সুন্দর বাড়ি ঘর পুকুর প'ড়ে প'ড়ে নষ্ট হচ্ছে তো। না হয় তাঁরা গিয়ে দু-চার মাস দেশেই রইলেন, আপনারা দু ভাই মেসে থেকে আপিস করুন আর বাড়ি খুঁজে ফেলুন।

বেশ, তাই হবে।

অরুণ সাংসারিক সব কথাতেই সওয়াল-জবাব খুব তাড়াতাড়ি চুকিয়ে দেয়। এদিক দিয়ে সে মনের মধ্যে আলাদিনের আশ্চর্য-প্রদীপ পুষে রেখে দিয়েছে। দিগম্বরবাবু তাকে অনেকদিন ধ'রেই দেখছেন এবং বেশ ভাল ক'রেই চেনেন, কাজেই একটু হেসে দিগম্বর বললেন, এখনও ছেলেমানুষই র'য়ে গেলেন!

কফিখানার আসরে আসে অনেক মানুষ, হরেক রকম তাদের হালচাল, কিন্তু দরজা দিয়ে ভেতরে আসবার সময় তাদের চেহারা এক ধরনের হয়ে যায়। তবু যদি লক্ষ্য করা যায় তা হ'লে দেখা যাবে, একের সঙ্গে অপরের মিল নেই। এক ধরনের বসবার আসন, সামনে সাজানো পানপাত্রগুলিও সব টেবিলে একই ছাঁদের, একই হাওয়াতে এরা নিশ্বাস ফেলছে, তবু স্বতন্ত্র—বসবার ভঙ্গি কারও গোছালো, কেউ বা এলোমেলো ভাবে নিজেকে বিস্তৃত করতে চায় যেন। কোন টেবিলের জলের গ্লাসে খানিকটা তরল কফি ঢেলে জলকে এমন রঙিন করা হয়েছে হঠাৎ দেখলে মদ ব'লে ভুল হবে।

খাকী-পোশাক-পরা একটি যুবক প্রবেশ করল, সঙ্গে তার একটি ঘোমটা-দেওয়া বধূ। বধূটি সসঙ্কোচে যুবকের পিছু পিছু আস্তে আস্তে চলছে। যুবকের পোশাকে এবং ভঙ্গিতে যেন সাহসের আতিশয্য। আশপাশে কারা রয়েছে, কি ঘটছে—এসব কিছুই সে গ্রাহ্য করে না।

হলের মাঝখানটিতে একটা খালি টেবিল দেখে যুবকটি ব'সে পড়ল। বধূটি তখনও দাঁড়িয়ে আছে দেখে সে বললে, অমন হাঁ ক'রে কি দেখছ? ব'স।

পাশেই যে চেয়ারখানা ছিল, তার মধ্যে নিজেকে গুঁজে দিয়ে বধূটি আস্তে আস্তে বললে, এখানে বড্ড বেটাছেলের ভিড় গো।

বেটাছেলের ভিড় তাতে কি? ওরা কি তোমাকে গিলে খাবে? অমন একহাত ঘোমটা চলবে না এখানে, ভদ্র হয়ে ব'স।

বেশ উষ্ণ কণ্ঠেই যুবকটি হুকুম করল। ঘোমটা একটু উঠিয়ে দিল মেয়েটি। দেখতে মন্দ নয়, চোখ দুটি বেশ ডাগর, মুখশ্রীও আছে, রঙ ফরসা নয়, তবে একেবারে কালো বলা চলে না। কিন্তু ওকে যেন এখানে একেবারে বেমানান। কি একটা পীড়ন যেন চলছে ওর নিজের মধ্যে, মুখটা শুকিয়ে এতটুকু দেখাচ্ছে।

ওয়েটার এসে পেতলের থালাটা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করলে, ফরমাইয়ে।

মেয়েটি বিস্মিতদৃষ্টিতে ওয়েটারের বাহারী পাগড়িটার দিকে তাকিয়ে রইল।

যুবকটির প্রশ্নে মেয়েটি একটু অপ্রতিভভাবে বললে, অ্যাঁ!

বলছি, কি খাবে বল!

আমি কি জানি? যা হয় বল।

আরে, আমি তো হরদম আসি, মাস গেলে কম ক'রে ছবার কফি-হাউসে আসা একেবারে বাঁধা। তোমার কি ইচ্ছে করছে খেতে বল!

জানি না, যাও।

তা হবে না, তোমাকে বলতেই হবে। চপ-কাটলেট-আম্‌লেট যা ইচ্ছে বল।

আম্‌লেট আবার কি?

যাকে তোমরা মাম্‌লেট বল।

মাম্‌লেটকে আবার এখানে আম্‌লেট ব'লে!

আহা, যা হয় বল, লোকটা দাঁড়িয়ে আছে।

মেয়েটি সসঙ্কোচে বললে, আম্‌লেট।

না না, কাটলেট খেয়ে দেখ।

আচ্ছা, বেশ।

ওয়েটার চ'লে যাবার পর মেয়েটি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে যেন বাঁচল। স্বামীকে সে বললে, মস্ত বড় ঘরখানা তো! আচ্ছা, আমাদের বক্সী-পুকুরের চেয়ে বড় হবে, না?

যুবকটি বললে, কেমন দেখছ?

খুব ভাল। আচ্ছা, এত লোক, এরা সবাই এখানে খেতে এসেছে?

হ্যাঁ, খায়, গল্প করে। বড় বড় লোক সব এখানে আসে।

আমার কিন্তু খুব লজ্জা করছে।

লজ্জা কি জন্যে? আমাদের কফি-হাউস দেখবার জন্যে তো তোমার ঘুম হচ্ছিল না। দেখছ তো!

হ্যাঁ, মনে হচ্ছে ঠিক যেন বিয়ে-বাড়ি। হ্যাঁগো, দিদির বিয়েতে এত লোক হয়েছিল, না গো?

যুবকটি বললে, আর তোমার বিয়েতে বুঝি হয় নি? মেয়েটি সলজ্জ কোপন দৃষ্টি দিয়ে স্বামীকে তিরস্কার করলে—যাও।

ওয়েটার এসে খাবার দিয়ে গেল। ছুরি এবং কাঁটার দিকে ভীত দৃষ্টিতে তাকিয়ে মেয়েটি এপাশ-ওপাশ দেখতে লাগল। তার স্বামীটি প্রথম চোটে খানিকটা কাটলেট কেটে কাঁটায় বিদ্ধ ক'রে অনায়াসে মুখস্থ ক'রে একটু চোখ বুজল। কিছুক্ষণ একমনে খেয়ে নিয়ে একটু সুস্থ হয়ে পার্শ্ববর্তিনীর দিকে তাকাবার অবসর পেল।—আরে, এখনও চুপ ক'রে হাত গুটিয়ে ব'সে রয়েছ যে? শুরু ক'রে দাও।

মেয়েটি তবুও হাত গুটিয়েই ব'সে রইল।

যুবকটি অধীরভাবে প্রশ্ন করে, কি হ'ল?

হ্যাঁ গো, তোমার মত কাঁটা-ছুরি দিয়ে খাব কি ক'রে?

বাঃ! তবে তুমি আমার সঙ্গে বিদেশে গিয়ে থাকবে কি ক'রে? একটু একটু ক'রে অভ্যেস কর। এই যে তোমার খুব বড় বড় কথা—লক্ষ্ণৌ, মীরাট, দেরাদুন সব জায়গায় থেকে এসেছ, তা কাঁটা ধরতেও শেখ নি! এমন জানলে কি বিয়ে করতাম!

মেয়েটি যেন গুরুতর অপরাধ ক'রে ফেলেছে। বললে, চারদিকে এত লোক ব'সে রয়েছে যে! তবু মরিয়া হয়ে কাঁটা এবং ছুরি হাতে তুলে নিয়ে ঘাড় হেঁট করল।

যুবকটি কোন রকমে হাসি সামলাতে সামলাতে বললে, আচ্ছা, আজ ছেড়ে দিলাম। হাত দিয়েই খাও আজকের মত।

মেয়েটির মুখে হাসির আভা জাগল, বললে, হাত দিয়ে খাচ্ছি দেখে সবাই হাসবে না?

যুবকটি নিবিষ্ট মনে কাটলেট কাটতে লাগল।

কিছুক্ষণ মন্দ কাটল না। কিন্তু পুনরায় সমস্যার উদ্ভব হ'ল কফি নিয়ে।

কফির পেয়ালা মুখে তুলেই মেয়েটি নাক-মুখ কুঁচকে পেয়ালাটা সশব্দে নামিয়ে রাখল।

যুবকটি ধমক দিলে, আস্তে।

ওগো, আমার গা বমি-বমি করছে। বিদ্‌ঘুটে চোঁয়া-চোঁয়া গন্ধ!

কোনও কথা না ব'লে যুবকটি নিজের দুধের পাত্রের অবশিষ্ট দুধটুকু স্ত্রীর পেয়ালাতে ঢেলে দিল।

মেয়েটি প্রশ্ন করলে, খেতেই হবে?

হ্যাঁ।

বড্ড তেতো যে!

দাঁড়াও, বয়কে দিয়ে চিনি আনাচ্ছি।

মেয়েটি বাধা দিয়ে বললে, না না, থাক্, আমি এমনিই খেতে পারব। অত বড় একটা লোককে তোমরা হরদম হুকুম চালাও, দেখে আমার বড্ড বাধ-বাধ লাগে।

যুবকটি বললে, তোমাকে নিয়ে এখানে আসাই ভুল হয়েছে।

মেয়েটি বিমর্ষভাবে বলে, রাগ করলে? আচ্ছা, আমি খেয়েচ্ছি। সত্যিই তো, এত লোকের মধ্যে আমার জন্যে তোমার মাথা হয়ে যাচ্ছে।

যুবকটি নিজের প্লেট নিঃশেষ ক'রে একবার চারিদিকে তাকিয়ে অবশেষে স্ত্রীর ভুক্তাবশিষ্ট সম্বলিত প্লেটখানা কৌশলে টেনে নিতে নিতে বললে, পয়সা দিয়ে জিনিস কিনে নষ্ট করতে গায়ে লাগে। আচ্ছা, এই টোম্যাটো সশ, পেঁয়াজ—সব নষ্ট করেছ তুমি!

মেয়েটি বললে, কাঁচা কাঁচা ঘাসগুলো আবার কেউ খায় নাকি! আহা, তাই ব'লে আমার এঁটো পাত কুড়িয়ে খাচ্ছ কেন! ছি ছি, না, তুমি—

থাম। আম্বালাতে সব কাল্‌চার্‌ড্‌ লেডীরা থাকেন। ইস্! তোমায় নিয়ে কি ক'রে যে সে সোসাইটিতে মুভ্‌ করব জানি নে।— ব'লে স্বামী ধমক দিল চাপা গলায়।

বিলের পয়সা মিটিয়ে দেবার পর ওয়েটারকে যখন যুবকটি দু আনা পয়সা বকশিশ দিল এবং ওই পাগড়ি-আঁটা অতবড় লোকটা সেলাম ক'রে চ'লে, তখন মেয়েটি আরও বিস্মিত হ'ল। স্বামীকে জিজ্ঞাসা করলে, আচ্ছা, ওকে দু আনা পয়সা দিতে লজ্জা করল না তোমার?

আচ্ছা সব আজগুবী কথা তোমার। বকশিশ না দেওয়াটাই তো অভদ্রতা।

আমার কিন্তু ভারি অস্বস্তি হচ্ছিল। আমি যদি ওই লোকটা হতাম, তা হ'লে কিছুতেই নিতে পারতাম না ও পয়সা দু আনা। অপমান—

মান-অপমানের চেয়েও বড় বস্তু আছে গো, পয়সা হচ্ছে তাই। এই যে লোকটা চাকরি করছে, কেন? পেটের দায়েই তো। আমরা চাকরি করি না? আমি বোনাস পেলে খুশি হই না, তুমি খুশি হও না? দুটোই এক, শুধু মুখোশটুকু আলাদা। দুটোই উপরি-পাওনা।

অত বুঝি নে বাপু। আমার যা মনে হ'ল বললাম। এবার বাড়ি যাবে তো?

যাব বইকি। কফি-হাউস দেখতে এলে, একটু ব'সে দেখ।

খুব দেখা হয়েছে। পয়সার ছাদ্দ, হ্যারাহেরি দুটো টাকা গুনোগার দিলে তো! এই দু টাকায় বাড়িতে যদি ফুলকপির সিঙাড়া করতাম তা হ'লে ভরপেট সংসারের খাওয়া হয়ে যেত। এতে তোমরা কি যে সুখ পাও বুঝি নে। জাঁকজমক আর ঠাট-ঠমক দেখিয়ে গালে চড় মেরে পয়সা আদায় করে। খুব দেখেছি, চল। গা কচ্‌কচ্‌ করছে, ডামাডোলের বাজারে দু-দুটো টাকা—

[ক্রমশ]

শ্রীগৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য

উপন্যাসের উপকরণ

১৪

কিন্তু আমার সম্মুখে কঠিন সমস্যা। মানুষ হয়ে জন্মেছি, মানুষই থাকব, না, উপন্যাস-লেখক হব? বেশ বুঝতে পারছি, কতকটা 'অমানুষিক' না হ'লে তার দ্বারা উপন্যাস লেখা অসম্ভব। আমার পক্ষে দুটো পথ খোলা আছে—

প্রথম, ওদের মনের অমিল মনেই থাক্। 'গোপন-কথা' নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি ক'রে কি লাভ হবে? মতের মিল নিয়ে ভদ্রভাবে ঘরসংসার করছে, এই যথেষ্ট। এই ভাবে কোনও এক শুভ মুহূর্তে মনের মিলও ঘ'টে যেতে পারে। ঘটক ঠাকুরদের শুভাগমন হ'লে তো কথাই নেই।

ছেলেমেয়েদের আমি 'ঘটক ঠাকুর' ব'লে থাকি। দাম্পত্য-জীবনে এরাই আদি না হোক—অকৃত্রিম ঘটক। শুধু দাম্পত্যজীবনে কেন, দুই অপরিচিত প্রতিবেশী পরিবারে ওরাই প্রথম যোগসূত্র স্থাপন করে। লক্ষ্য ক'রে থাকবেন, ছেলেমেয়েদের মধ্যস্থতাতেই এই শহরের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়।

অতসীর কোলে ছেলে! ভাবতে মনে পুলক জাগে। উত্তরচরিতে পড়েছিলাম, বশিষ্ঠ আসন্নপ্রসবা সীতার বিষয়ে ব'লে পাঠিয়েছেন, "কদা পুত্রোৎসঙ্গাং বধূং পশ্যামি"—ছেলে-কোলে বউমাকে কবে দেখব? সেই থেকে ছেলে-কোলে-করা ছোট ছোট বউ-ঝি দেখলে আমি হাঁ ক'রে চেয়ে চেয়ে দেখি। চোখে চোখ পড়লে তারা লজ্জিত হয়। তারা তো জানে না যে, আমি ভবভূতির সৌন্দর্যবোধের তারিফ করছি।

এই গেল মোটামুটি ভদ্র এবং সাংসারিক দিক। অমানুষিক দিকটা এই—

আস্তে আস্তে গোপন কথাটি উদ্‌ঘাটিত ক'রে ওদের মনের তলার যত কিছু পাঁক ঘেঁটে ঘেঁটে চোখের সামনে তুলে ধরা। উদ্দেশ্য পঙ্কোদ্ধার নয়—তা হ'লে উপন্যাস হয়ে যাবে নীতি-বাগীশ। সেই

পাঁকে ওদের একজনকে, প্রয়োজন হ'লে দুজনকেই, ডুবিয়ে মারতে হবে। ঔপন্যাসিক প্রেম-পদ্ম এই পাঁকেই জন্মগ্রহণ করে।

বিবাহোত্তর ঘটক ঠাকুররাও অনেক সময় এঁটে উঠতে পারেন না। দেখা গেছে, পুরো দমে দাম্পত্য-দ্বন্দ্ব চলছে, হঠাৎ আঁতুড়-ঘরে প্যাঁ ক'রে ছেলে কেঁদে উঠল। তাতে দ্বন্দ্ব মিটল না, দ্বন্দ্ব হ'ল অন্তর্দ্বন্দ্বে পরিণত, উপন্যাস জটিল আকার ধারণ করল। শেষ পর্যন্ত খোকাকে ফেলে—

ছেলে ফেলে যারা ছাড়াছাড়ি হয়, তাদের মনস্তত্ত্ব আমার জানা নেই। তবে এই নিয়ে যাঁরা মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস লেখেন, তাঁদের আমি ভয় ও শ্রদ্ধা দুই-ই করি। তাঁরা আচার্য জগদীশচন্দ্রের সমকক্ষ লোক। গাছেরও জীবন আছে। পশুরও মনস্তত্ত্ব আছে।

আমার পক্ষে আর একটা পথ খোলা আছে—কোনও পথেই না হাঁটা, মানে—চুপ ক'রে ব'সে থাকা। বেশ আরামপ্রদ। কিন্তু আপাতত তারও উপায় নেই।

সেদিন যার সামান্য অসুখের কথা ভেবে জীবনমরণ-সংশয়ে অধীর হয়ে পড়েছিলাম, মনের দিকে চেয়ে আশ্চর্য হই, এখন তার সম্বন্ধে ভদ্রতা ও কর্তব্যবোধ ভিন্ন আর কিছুই অবশিষ্ট নেই।

সকাল-সন্ধ্যে নিয়মিত যাই আসি, জ্ঞানত তদ্বির-তদারকের ত্রুটিও কিছু করি নি, কিন্তু আমার প্রাণের সে ব্যাকুলতা কোথায়? এ যেন কেউ জোর ক'রে আমাকে দিয়ে কবিতা লিখিয়ে নিচ্ছে।

না, তার মনের গোপন কথা আমার জেনে কাজ নেই। সন্দেহ সন্দেহ হয়েই থাক্। আমার ভয় হ'ল, উলঙ্গ সত্য বিকটমূর্তিতে যদি কখনও সামনে এসে দাঁড়ায়, হায়, আমি তা সইতে পারব না। রোজ সেখানে গেছি, কিন্তু নিরিবিলি কথাবার্তার সুযোগকে পাশ কাটিয়ে চলেছি বরাবর।

এই কয়দিন কিশোরকে ওখানে দেখতে পাই। সে তা হ'লে এই শহরেই ছিল। মা-মরা ছেলের মত পথে পথে ঘুরছিল বোধ হয় এবং সম্ভবত অতসীর অসুখের সংবাদ পেয়ে এসে জুটেছিল। আমার

বিশ্বাস, অতসী আরও কিছুদিন বিছানায় প'ড়ে থাকত, শুধু কিশোর-পূর্ণিমার শুশ্রূষার গুণে এত শীগ্‌গির উঠে বসতে পেরেছে। অবশ্য এখনও সম্পূর্ণ সুস্থ হয় নি, কোনও কোনও দিন একটু আধটু জ্বর আসে। অমু বিশেষ কিছু করতে পারে নি, আহা, ওকে পেটের জন্যে খাটতে হয়।

একটা জিনিস লক্ষ্য ক'রে আশ্চর্য বোধ করলাম। চঞ্চলতার প্রতিমূর্তি পূর্ণিমাকে আর দেখতে পাই নি। এ যেন স্থির ধীর সেবাপরায়ণা নারী! ভাবলাম, অতসীকে ও ভালবাসে, অতসীর অসুখই এর কারণ হবে। কিন্তু—

সেদিন আমি আর ডক্টর রায় ব'সে ছিলাম ল্যাবরেটারি-ঘরে। অতসীর ঘর থেকে ধীরে ধীরে বেরিয়ে এসে আমার পাশে চুপ ক'রে ব'সে রইল পূর্ণিমা।

একটু পরে পূর্ণিমার দিকে চেয়ে ডক্টর রায় বললেন, চার্টটা নিয়ে এস। ডাক্তারের কাছে যেতে হবে।

পূর্ণিমা বললে, আমি পারব না, আপনারা কেউ যান।

বিরক্ত হয়ে প্রভাত বললে, দিন দিন তুমি ভারি অবাধ্য হয়ে উঠছ পূর্ণিমা। কিন্তু নিজের কথাতে নিজেই বিশেষ জোর পেলে না যেন, কারণ সত্যের অপলাপ ছিল তাতে। সব সময়েই দেখছে এবং ভাল ক'রেই জানছে যে, অবাধ্য সে মোটেই হয় নি, বরং কর্তব্যকেও ছাপিয়ে উঠেছে অনেক দূর।

পূর্ণিমা শুধু বললে, কাকীমা ঘুমুচ্ছেন যে! কাকীমা মানে—অতসী। এক ঝলক রক্ত তার মুখের চামড়া ফেটে বেরিয়ে আসতে চায়।

প্রভাত কি বুঝলে জানি না, কিন্তু আমার বুঝতে বাকি রইল না। পাছে এই নিয়ে তর্ক ওঠে, আমি উঠে গিয়ে চার্টটা নিয়ে আসি। অতসী সত্যিই ঘুমুচ্ছিল, কিশোর তার মাথার কাছের চেয়ারটায় দেওয়াল ঘেঁষে ব'সে ছিল। তার ডান হাতে পাখা, বাঁ হাতে বই, দুটো কাজ একসঙ্গেই চলছিল।

এই সব বিষয়ে বৈজ্ঞানিক ডক্টর রায়ের বুদ্ধিটা বেজায় ভোঁতা। অতসী ঘুমুচ্ছে, কিশোর আছে তার ঘরে, পূর্ণিমা একা যায় কেমন ক'রে? লজ্জা করে না বুঝি?

কুসুমে কীট ঢুকেছে। সেই রঙ-বেরঙের জনপ্রিয় কীট, যা পাখা মেলে গায়ে বসলে আনন্দ হয়।

...কিন্তু ওদের কথা থাক্। আগেই বলেছি, এমন অনেক গল্প, অনেক উপন্যাস, অনেক কবিতা লিখতে শুরু করেছি, কিন্তু কিছুই শেষ করতে পারি নি। সে সমস্ত লেখা "অসম্পূর্ণ" নাম দিয়ে পৃথক একটা ফাইল ক'রে রেখে দিয়েছি। মাঝে মাঝে নিয়ে বসি, যদি তাদের কোনও একটাকে ধ'রে শেষ করতে পারি, কিন্তু আজ এতদিন পরে প্রত্যেকটিই যেন খাপছাড়া ব'লে মনে হয়। অতসী, পূর্ণিমা, কিশোর, প্রভাত, অণু এবং 'নন্দিনী'—এরা থেকে যাক আমার মনের আলমারিতে অসমাপ্ত একটা গল্প হয়ে।

বিপদ কখনও একা আসে না। সরিরও অসুখ। আজ কদিন ধ'রে রক্তামাশয়ে ভুগছে। 'ব্যাকফুল' তাকে নিয়ে ব্যস্ত। আমার নিজের কাজ সব নিজেকেই ক'রে নিতে হচ্ছে। অবশ্য রান্নাঘরে ঢুকি নি, বসবার ঘরে স্টোভটাতেই সব কাজ চ'লে যায়।

কাব্যসাধনায় দৃঢ়সঙ্কল্প হয়ে "শুষ্কং কাষ্ঠং" খুলে বসি। লেখার কাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছিল। দুঃখের বিষয়, উক্ত মহাকাব্যের এই অংশটুকু আপনাদের আমি উপহার দিতে পারছি না—স্বর্গে চ'লে গেছে। তার কারণ পরে বুঝতে পারবেন। এই অংশের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল, "শুষ্কং কাষ্ঠং তিষ্ঠত্যগ্রে" অর্থাৎ মানব-সভ্যতার ইতিহাসে শুকনো কাঠের স্থান সর্বাগ্রে।

একমনে লিখছি, ঘড়িটা টং টং ক'রে বেজে উঠল। চেয়ে দেখি দশটা। কাজেই উঠতে হ'ল। স্নান সেরে, দেশলাই ও স্পিরিটের বোতল নিয়ে ঘরের মেঝের এক কোণে নামানো স্টোভটার সামনে উবু হয়ে বসি। টেবিলের ওপর খাতাটা খোলাই রইল, ভাত চড়িয়ে

দিয়ে লিখতে বসব। ভাত ফুটবে টগবগ টগবগ, তালে তালে চলবে কবিতার ছন্দ। হঠাৎ পদশব্দ শুনে পিছন ফিরে দেখি—

আমার জীবনমরণ-সমস্যার স্পাই—নগেন্দ্রবালা! তার কোলে সেই ছেলেটা, যার কৃপায় আমি বিশ্বরূপদর্শনে ধন্য হয়েছিলাম।

বিশ্বরূপকে ধপ ক'রে আমার লেখাটারই ওপর বসিয়ে দিয়ে আমার দিকে এগিয়ে এসে বললে, খুব হয়েছে দাদা, ওঠ দিকি এইবার। বলি, এই সব কাজ কি বেটাছেলের? মরি মরি, বুড়ো বয়সে হাত পুড়িয়ে খাওয়া! কেন, আমরা কি ম'রে গিছি, না, হাতে হয়েছে মহাব্যাধি! আচ্ছা সব পাড়ার লোক যা হোক! আমরা না হয় সাতখানা বাড়ির পর—পাড়ায় কি আর বামুন নেই? এই তো সামনের বাড়ির মুকুজ্জেরা—

স্টোভে স্পিরিট ঢালতে গিয়ে আমার হাত থেকে বোতলটা গেল প'ড়ে।

কেন করতে গেলে? বোতলটা ফেললে তো? উঠবে? না—? এই ব'লে আমার হাত ধ'রে হিড়হিড় ক'রে টেনে নিয়ে বসিয়ে দিলে আমার কাব্যসাধনার যোগাসনে।

বললে, তার চেয়ে বরং খোকাকে কোলে ক'রে ব'সে ব'সে দেখো, আধ ঘণ্টায় কি কুরুক্ষেত্তর কাণ্ড ক'রে ফেলি!

করুণদৃষ্টিতে চেয়ে দেখি, বিশ্বরূপ আমার খাতাখানায় ব'সে তার একটা কোণ ছিঁড়ে নিয়ে মুখে পুরেছে। সভয়ে অবলোকন করি, আমার কবিতার ঠিক সেই অংশটা ওর বদনবিবরে প্রবেশ করেছে—

> উজাড় হবে লোহার খনি, ধ্বংস হবে এ সভ্যতা,
> অমর হয়ে থাকবে বেঁচে—গাছের শুঁড়ি, পাতা, লতা।

অতএব প্রমাণ হয়ে গেল যে, আমাদের এই যন্ত্র-সভ্যতা একদিন বিশ্বরূপের মুখগহ্বরে বিলীন হবে।

নিরুপায় হয়ে বিশ্বরূপকে দু হাতে ক'রে তুলে ধরি। প্রভুর ঘর্মসিক্ত অঙ্গবিশেষে প্রায় সমগ্র পাতাটি সুমুদ্রিত। প্রথমে লক্ষ্য

করি নি, চোখে পড়ল তখন, যখন দেখি, ওকে কোলে করতেই আমার ধবধবে সাদা লংক্লথের জামাটায় তার দ্বিতীয় মুদ্রণ।

আমার যতদূর জানা আছে, এতটা খাতির পৃথিবীর অন্ত কোনও কবির ভাগ্যে জোটে নি। আমার কবিতার এক মিনিটে দ্বিতীয় মুদ্রণ দেখে পুলকিত হতে যাচ্ছি, কিন্তু পাণ্ডুলিপির অবস্থা দেখে অশ্রুসংবরণ করা কঠিন হ'ল। একটি অক্ষরও তার পড়া যায় না।

স্টোভ জ্বালতে জ্বালতে নগেন্দ্রবালা ব'কে চলল, আজ কদিন ধ'রে খুঁজে মরছি—একবার আসি আমি, একবার আসে ছোটদা, তা আমার ভবঘুরে পাগলা দাদাটির দেখাই নেই!—বলতে বলতে আমার দিকে স্নেহপূর্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে টেবিলের কাছে এসে দাঁড়ায় এবং চক্ষের পলকে আমার বাঁধানো খাতা থেকে কবিতা-লেখা পাতাটা ছিঁড়ে ফেলে। আমার বাধা দেওয়ার কিছু কারণ ছিল না, বিশ্বরূপ তার যে অবস্থা করেছিল, তার থেকে পাঠোদ্ধার করা একেবারেই অসম্ভব ছিল।

কাগজখানি নিয়ে পাট ক'রে স্টোভের কাছে পাতলে। আঁচলের খুঁটে কি বাঁধা ছিল, তা খুলে সেই কাগজটার উপর রাখলে। মুগের ডাল। তার সঙ্গে গুটি কয়েক আলুপটল। কাপড়ের অন্য খুঁট খুলে বের করলে গোলগাল মাঝারি সাইজের ভয়লেট-রঙের বেগুন একটা। তার পর পিছনে কোমরের দিকে হাত চালালে। অবাক হয়ে দেখি, সেখানে গোঁজা ছিল মেয়েদের খেলাঘরের ব্যবহার্য ছোট্ট একটি বঁটি।

বুঝলাম সমস্তই পূর্ব-প্রকল্পিত এবং স্পাইগিরিও সত্যি।

সৌভাগ্যের বিষয়, এইসবে মনোযোগ করতে গিয়ে নগীর বক্তৃতা-স্রোত আপাতত বন্ধ ছিল।

বিশ্বরূপ কিন্তু এতক্ষণ ধ'রে চুপ ক'রে ব'সে ছিল না। এবারও কিন্তু সেই বাঁশীটা আমাকে সাহায্য করলে। তার মুখের দিকটা ওর মুখের ধ'রে ফু দিতে শিখিয়ে দিলাম। অল্প চেষ্টাতেই আংশিক কৃতকার্য হই। অক্ষম আওয়াজ বের করতে পেরে, মহা খুশি হয়ে টেবিলের ওপর

ব'সে একমনে খেলা করতে থাকে। বাঁশীতে ফুঁ দেয় আর মাঝে মাঝে আমার দিকে চেয়ে হাসতে হাসতে বলে, তাদ্দাঃ!

কড়াইয়ের গরম তেলে আলু পটল ছেড়ে দিতে দিতে সপরিহাসে নগেন্দ্রবালা বললে, বাব্বাঃ! অর্থাৎ, খুব ভাব দেখছি যে!

আঃ, বাঁশীটা! কোথায় যেন কিনেছিলাম! জাপানের এক ছোট শহরের পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বাজার আমার স্মৃতির পর্দায় চিত্রিত হয়ে উঠল।

অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়ে ব'সে আছি। কিন্তু বিপদ কখনও একটা আসে না। আমাকে চমকিয়ে দিয়ে ঘরে ঢুকলেন, আমার টেকো বন্ধু—নগীর দাদা। চিনতে ভুল হয় নি—হ্যাঁ, তিনিই তো, সে রূপ কি ভোলবার!

কিছুমাত্র অভিবাদন বা ভূমিকা না ক'রে একগাল হেসে বললেন, কোথায় ছিলেন এ কটা দিন? আমরা এদিকে খুঁজে খুঁজে হয়রান—যাকে বলে, গরু খোঁজা। নিজের রসিকতায় নিজেই উচ্চহাস্য ক'রে উঠলেন। হাসি থামলে বললেন, খাওয়া-দাওয়া হয় নি তো? চলুন, আমাদের ওখানেই মধ্যাহ্ন-ভোজনটা সারবেন আজকে দয়া ক'রে।

ছেলেবেলায় যাত্রা-পালায় দেখেছিলাম, নর্তক-নর্তকীবেশে বিপদ ও ঝঞ্ঝার প্রবেশ। একবার নয়, গোটা পালাটা জুড়ে, প্রতি অঙ্কে অন্তত পক্ষে একবার। 'এ মায়া-প্রপঞ্চময় ভবরঙ্গমঞ্চ-মাঝে' বহু—বহুবার ভিন্ন ভিন্ন রূপে উপমার সাহায্যে তাদের সাক্ষাৎ পেয়েছি। সেইজন্যে, পুনরুক্তি হ'লেও, একাধিক ক্ষেত্রে তাদের উল্লেখ আমার পক্ষে অনিবার্য হয়ে পড়ে। আজও তাদের দেখা পেলাম। আশ্চর্য কোনও সময়েই, কি উক্ত অভিনয়ে, কি সংসার-ক্ষেত্রে ওরা কেউ একা আসে নি। কখনও একসঙ্গে, কখনও একটু আগে-পরে।

বিপদ বললে, আজ ছোট বউ (তার স্ত্রী) নিজে রেঁধেছে। খেয়েই দেখবেন, রান্না তো নয়, যেন অমৃত। উঠুন, বেলা হ'ল আর দেরি নয়। স্নান সেরেছেন তো? না হয় ওখানেই সারবেন।

ঘরের কোণে ঝঞ্ঝা এতক্ষণ মৃদু মৃদু হাসছিল। উৎসাহের আতিশয্যে বিপদ তাকে দেখতে পায় নি। বেচারা ভাবতেও সময় পায় নি, আমার টেবিলে খোকা কেমন ক'রে এল। খোকা একমনে খেলছিল, বোধ হয় লক্ষ্যই করে নি এতক্ষণ। স্টোভের শব্দও তার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে নি।

ঝঞ্ঝা যখন কড়াইয়ের ফুটন্ত তেলে বেগুন ছেড়ে দিলে, সেই শব্দে আকৃষ্ট হয়ে বিপদ তাকে দেখতে পেলে। সর্পদর্শনকারী পথিকের উপমাটি স্মরণ করুন।

এদিকে বিপদের মুখে তার স্ত্রীর রান্নার প্রশংসা শুনে ঝঞ্ঝা উঠল তেলে-বেগুনে জ্ব'লে। ঝঞ্ঝার বেগে উঠে এসে সে মারমূর্তি হয়ে দাঁড়ায় তার ছোটদার সম্মুখে। ফুটন্ত তেলে বেগুনগুলো কলকল শব্দে নাচতে থাকে।

বললে, কি বলছিলে ছোটদা, আরে একবার বল দিকি শুনি? ছোটবউদির রান্নার কথা হচ্ছিল বুঝি? বলব তবে কুলের কথা খুলে?—গুলি চালাবার নোটিশ দিয়ে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে গুলি ছুঁড়ে দিলে। কুলের কথাটা এই—বিপদ-পত্নী চিররুগ্না, মাসের মধ্যে পঁচিশ দিন তার সংসারের রান্না নগেন্দ্রবালাই রাঁধে। আজও রান্না সেরে এখানে এসেছে।

বিপদে প'ড়ে বিপদ নিজের উপস্থিতবুদ্ধির আশ্রয় গ্রহণ করে। গদগদ ভাবে বললে, তোর ওই স্বভাব নগী। সব কথাতেই ভুল বুঝিস। আমি কি ছোটগিন্নীর কথা বলেছি? আমি বলছিলাম ছোট বউমার কথা।

বেগুনভাজা নাড়াচাড়া ক'রে পুনরায় যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়ে কোমরে দুই হাত রেখে বললে, আচ্ছা দাদা, বউদি কি তোমাকে তুকতাক কিছু করেছে না কি? একেবারে ভেড়া ব'নে গেলে? বলি, হ্যাঁগা ছোটদা, ছোট বউমা যে আজ ভোরের ট্রেনে বাপের বাড়ি চ'লে গেল!

ভীতভাবে চিন্তা করছি, এইবার বুঝি ঝম্‌ঝমাঝম্‌ নৃত্য শুরু হয়।

টেকো মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে আমতা আমতা করে বিপদ।—তা বটে, তা বটে, আমার যেন হুঁশই থাকে না কোনও কিছুতে। আসলে কি জানিস নগী, ভদ্রলোককে একটা কথা বলার তাই বলছিলাম। স্টোভের দিকে চেয়ে, ও তাই বল্‌! তুই বুঝি রাঁধছিস? এখানে ভদ্রলোকের জন্যে? তবে আর কি! এক রকমে হ'লেই হ'ল। যেন তেন প্রকারেণ ভজ কৃষ্ণ-পদাম্বুজম্‌।

অসামান্য প্রতিভাবলে ঝঞ্ঝা আমার ছোট আলমারিটা খুলে অন্যান্য প্রয়োজনীয় উপকরণ বের ক'রে নিয়েছিল। তার ডালা দুটোর সূক্ষ্ম তারের জাল ছাড়া আর কোনও স্থূল নির্দেশ ছিল না। এটা সে আলমারি নয়, যার বুকের ভিতর পূর্ণিমার কণ্ঠসঙ্গীত প্রতিধ্বনিত হয়েছিল—মে আই কাম্‌ ইন্‌! সেটা ছিল এ কোণের বই রাখবার বড় আলমারিটা।

বাঁশীটা নামিয়ে রেখে, বিশ্বরূপ অপর একখানা বাঁধানো খাতা ছিঁড়ে ছিঁড়ে টেবিলের ওপর স্তূপীকৃত করছিল। সেই কীর্তি পূর্ণাঙ্গ স্থাপিত হয়েছে দেখে পুনশ্চ বাঁশীটা তুলে নিয়ে নিয়ে বেশ জোরে একটা ফুঁ দিলে। কিছুক্ষণ চর্চার ফলে তার কসরৎ-শক্তি বৃদ্ধি পেয়েছিল। আওয়াজটা বেশ স্পষ্টই হ'ল এবার।

এই ধরনের বংশীধ্বনি যাত্রার দলে দৃশ্যান্তর সূচিত করে।

ঝঞ্ঝার নির্দেশক্রমে বিশ্বরূপকে কোলে নিয়ে বিপদের দ্রুত প্রস্থান। ঝঞ্ঝার তাড়া খেয়ে আমার আহারে উপবেশন। ঝঞ্ঝার পরিবেশন, ফলে অনিচ্ছাকৃত গুরুভোজন।

স্নেহমিশ্রিত অন্নব্যঞ্জন! বহুদিন ও-রসে বঞ্চিত। 'ব্যালফুলে'র শিশুক্রীড়া মনে পড়ল। মনে পড়ল, অম্বুর হাতের তৈরি এক পেয়ালা চা।

যাবার সময় বিপদ তার জের রেখে গেল, কালকে কিন্তু ছাড়ছি না দাদা। আমাকে খাইয়ে ঝঞ্ঝা তার বেগ রেখে গেল—এ আর

ততক্ষণের কাজ দাদা! নতুন দাদার সংসার তো আমার জানাশোনা ছিল না! আমি রোজ এসে করতে পারি। তুমি ঘড়ি ধ'রে ব'সে থাক, দেখ, আমি পনের মিনিটে—ওই যে কি ব'লে—ভীষ্মপর্ব, দ্রোণ-পর্ব সব শেষ ক'রে যাব!

এইবার শান্তিপর্ব। স্টোভের কাছ হতে কবিতার ছেঁড়া পাতাটা কুড়িয়ে এনে "অসম্পূর্ণ" ফাইলে গেঁথে রাখি। যদি কখনও পাঠোদ্ধার হয়!

ইতি 'শুষ্কং কাষ্ঠং'। যন্ত্রসভ্যতা যখন বিশ্বরূপে বিলীনই হবে, ও নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ?

ইতি কাব্যসাধনা। মানুষের প্রতি ভালবাসা যাঁর কর্মজীবনের মূলমন্ত্র ব'লে আপনারা জানেন, দেখা করতে গিয়ে দ্বারপ্রান্তে জবাব পাবেন—সময় নেই, কবিতা লিখছেন। মিথ্যার চূড়ান্ত! আমি ঠিক জানি, এসব আমাদের শখ, এসব আমাদের হবি, এ সব আমাদের ম্যানিয়া। অনেক ছোট ছোট হৃদয়কে দলিত ক'রে চলে রাজকবির জয়যাত্রার রথ। এই রকম অবস্থায় আমি যদি কবি হতে না চাই, আপনারা তো আমাকে বাধ্য করতে পারেন না? আমার মনে হয়, এই অসম্পূর্ণ অসমাপ্ত, অর্ধপরিচিত মানবজীবনে, আপনাদের উচিত, আমার অসম্পূর্ণ কবিতাগুলোই বেশি ক'রে পড়া।

আমি তো প্রথম দিনেই অতসীকে বলতে পারতাম—এখন আমার সময় নেই কবিতা শোনবার, তুমি বরং খাতাখানা রেখে যাও, সময়মত প'ড়ে দেখব, তারপর না প'ড়ে ফেরত দিয়ে যদি বলতাম—বেশ লাগল, তোমার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল, ছাপাও না কেন—ইত্যাদি, কি ক্ষতি হ'ত তাতে? ঠিক একই কৌশলে বিপদ এবং ঝঞ্ঝাকে দূরে ঠেলে রাখা যেত—স্বপাক খাই কিংবা আর কিছু ব'লে।

ওদের ধারণা, ওদের খোকাকে আমি বাঁচিয়েছি। এর জন্য কৃতজ্ঞতা কিংবা এই ব্যাপারে আমার যে দুর্ভোগ এবং অপমান—তার জন্য দুঃখ, লজ্জা অথবা অনুতাপ প্রকাশের প্রয়োজন বোধ করে না। অথচ আমার একাকীত্বের অসহায়তা স্থায়ী ভাবে দূর করতে চায়।

নগীর কথা আমি অবিশ্বাস করি নি। রোজ এসে বেঁধে দেওয়া তার পক্ষে অসম্ভব এবং আমার চক্ষে বিচিত্র কিছু নয়। ছেলেবেলায় পাড়ার এক মাসীকে বলেছিলাম—মাসি, তুই যা চচ্চড়ি রাঁধিস! সেই দিন থেকে তাঁর মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব পর্যন্ত প্রতিদিন খাবার সময় তাঁর রাঁধা চচ্চড়ি এসে আমাদের বাড়িতে হাজির হ'ত।

এটিকেটের ধার ধারে না, কিন্তু ওদের আন্তরিকতা আমার প্রাণস্পর্শ করে। আসলে খোকাকে বাঁচানো একটা সূত্রমাত্র, মানুষকেই ওরা ভালবাসে কিংবা পরকে আপন করা ওদের একটা শখ, হবি, ম্যানিয়া।

সবচেয়ে বড় কথা, এদের মধ্যে কোনও গোপন কথা নেই।

[ক্রমশ]

শ্রীভোলা সেন

পুস্তক-পরিচয়

গত বারের "সংবাদ-সাহিত্যে" পুস্তক-পরিচয় সম্পর্কে সমাপ্তি-রেখা টানার মনস্থ করিয়াছিলাম, সিদ্ধান্ত স্থিরই আছে। পূর্বের জের মিটাইবার জন্য এই বারে নিম্নলিখিত বইগুলির উল্লেখ করিতেছি। তন্মধ্যে 'রবীন্দ্র-জীবনী, ৩য় খণ্ড'—প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, বিশেষ উল্লেখের দাবি করে। বহু পরিশ্রম ও গবেষণা করিয়া প্রভাতকুমার তাঁহার জীবনীর দ্বিতীয় সংস্করণে এটিকে সম্পূর্ণাঙ্গ করিবার পথে লইয়া চলিয়াছেন। পূর্বের দুই খণ্ড ইতিমধ্যেই বিরাট তিন খণ্ডে পরিণত হইয়া চতুর্থ খণ্ডে সমাপ্তির অপেক্ষা করিতেছে। এই জীবনী প্রভাতকুমারের স্মরণীয় কীর্তি হইয়া থাকিবে। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় ইহার প্রকাশক। ৺চারুচন্দ্র দত্তের প্রসিদ্ধ 'পুরানো কথা'র 'উপসংহার' এতদ্দিনে বাহির করিয়া তাঁহার সহধর্মিণী লীলাবতী দত্ত ও প্রকাশক সংস্কৃতি বৈঠক আমাদের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। এই 'উপসংহারে' বিপ্লবী ও ধর্মজিজ্ঞাসু চারুচন্দ্রকে আমরা আরও ঘনিষ্ঠভাবে জানিতে পারি। ডক্টর অরবিন্দ পোদ্দারের 'মানবধর্ম ও বাংলাকাব্যে মধ্যযুগ'

ইণ্ডিয়ানা লিঃ) বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কে তাঁহার অক্লান্ত বেষণার তৃতীয় দান—মূল্যবান অবদান। তারাপদ ঘোষের 'শমনদূত' াব্য সুখপাঠ্য। অতঃপর বাংলা-কথাসাহিত্যের নূতন উল্লেখযোগ্য ংযোজনের তালিকা নিম্নে দিয়া আমরা ইতি করি।—

১। বিচিত্রলোক (গল্প-সংগ্রহ) মহাস্থবির, বেঙ্গল পাবলিশার্স

২। প্রেমেন্দ্র মিত্রের শ্রেষ্ঠগল্প, নাভানা

৩। হাস্যবাস্য, প্রবোধকুমার সান্যাল, বেঙ্গল পাবলিশার্স

৪। বুদ্ধদেব বসুর শ্রেষ্ঠগল্প, বেঙ্গল পাবলিশার্স

৫। নরেন্দ্র মিত্রের শ্রেষ্ঠগল্প, মিত্র ও ঘোষ

৬। প্র. না. বি র নিকৃষ্টতর গল্প, মিত্র ও ঘোষ

৭। জলজঙ্গল (উপন্যাস) মনোজ বসু, বেঙ্গল পাবলিশার্স

৮। ধনেপাতা (গল্প-সংগ্রহ) প্রমথনাথ বিশী, মিত্রালয়

৯। কল্যাণ-সঙ্ঘ (উপন্যাস), অমলা দেবী, রঞ্জন পাবলিশিং

১০। সংক্ষিপ্ত পথের দাবি (উপন্যাস), শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম. এল. দে এণ্ড কোং

১১। অন্য নগর (উপন্যাস), সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়, দিগন্ত পাবলিশার্স

১২। চক্রবৎ (উপন্যাস) বিষ্ণুপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, রিডার্স কর্নার

১৩। শ্রীমতী (উপন্যাস), লীলা মজুমদার, সিগনেট প্রেস

১৪। মনের অগোচরে (গল্প-সংগ্রহ), জ্যোতির্ময়ী দেবী, গুরুদাস

১৫। মনোবৈজ্ঞানিক (নাটক), সত্যেন সিংহ, দাশগুপ্ত এণ্ড কোং

১৬। ভিনজাতের মেয়ে (গল্প-সংগ্রহ), আবদুর রউফ, প্রবর্তক পাবলিশিং

১৭। ভারত-মঙ্গল (ছেলেদের নাটক, গানের স্বরলিপি সহ) উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, রঞ্জন পাবলিশিং হাউস

১৮। তালপাতার সেপাই (ছেলেদের কবিতা ও গল্প), সুধীন্দ্র-রঞ্জন খাস্তগীর লিখিত ও চিত্রিত, দিগন্ত পাবলিশার্স

১৯। আলোর কুঁড়ি (ছেলেদের সচিত্র কবিতা), অমৃতলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, দাশগুপ্ত এণ্ড কোং

২০। প্রিয়া ও পরকীয়া (উপন্যাস), অবিনাশচন্দ্র সাহা, ভারতী লাইব্রেরি

২১। রাম রহিম (গল্প-সংগ্রহ), শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, বেঙ্গল পাবলিশার্স

২২। পরিণাম (উপন্যাস), বিধুভূষণ বসু, ৩।১বি গরচা ফার্স্ট লেন

২৩। পৌত্রান্ত (উপন্যাস) ঐ ঐ

২৪। স্বয়ংবর (গল্প-সংগ্রহ), বাসুদেব মাইতি, ইউনিভার্স্যাল পাবলিশার্স

২৫। পাথেয় (উপন্যাস), শান্তিময় ঘোষাল, কেতাব ভবন

২৬। অভিষেক (উপন্যাস), শান্তিময় ঘোষাল, কমলা বুক ডিপো

২৭। অন্ত ইতিহাস, ১ম খণ্ড (উপন্যাস), সিদ্ধার্থ রায়, ইণ্ডিয়ানা লিঃ

২৮। পঞ্চপ্রদীপ (গল্প-সংগ্রহ), যতীন্দ্রনাথ বিশ্বাস, বিজলী পাবলিশিং হাউস

২৯। জীবন-সংগ্রাম (উপন্যাস), যতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত, কমলা বুক ডিপো

৩০। উচ্চাকাঙ্ক্ষা (গল্প-সংগ্রহ), সুধাংশুশেখর ভট্টাচার্য, কাত্যায়নী বুক স্টল

৩১। সূর্যমুখী (উপন্যাস), জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, ইণ্ডিয়ানা লিঃ

৩২। অচুম্বিতা (উপন্যাস), বিকাশ রায়, ডি. এম. লাইব্রেরি

৩৩। জিওফ্রে চশারের ক্যাণ্টারবেরি টেলস, অনুবাদক দেবদেব ভট্টাচার্য, রিডার্স এসোসিয়েট

৩৪। পরিক্রমা (গল্প-সংগ্রহ), নন্দদুলাল চক্রবর্তী, বুক হাউস।

শনিরঞ্জন প্রেস, ৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, বেলগাছিয়া, কলিকাতা-৩৭ হইতে
শ্রীসজনীকান্ত দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ফোন : বড়বাজার ৬৫২০

শনিবারের চিঠি
২৫শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, পৌষ ১৩৫৯

প্রণাম-অষ্টক

১। শ্রীচৈতন্য (১৪৮৬—১৫৩৩)

ব্রহ্মণ্য-বিকার-মেঘে ঢেকে ছিল বঙ্গের আকাশ—
মানুষে অস্পৃশ্য করি,' সুদুর্লঙ্ঘ্য ভেদের প্রাচীর
চৌদিকে গড়িয়া তুলি' কৌলাচ্ছের বীভৎস প্রকাশ ;
জাতিবংশগত দম্ভ 'এপথাত রচে বাঙালীর।
প্রেমের দেবতা, তব আবির্ভাব এ সঙ্কট-কালে,
তমসা হইল দূর, উচ্চ নীচ লভে হরিনাম ;
হে গোরা, তোমার প্রেমে বহ্নিস্পর্শ লাগিল জঞ্জালে,
চণ্ডাল যবন দ্বিজ এক প্রেমে এক পরিণাম।
পুষ্প হ'তে রমণীয়, প্রয়োজনে হে বজ্রকঠোর,
কাঁদিছেন শচীমাতা, বিষ্ণুপ্রিয়া লুটান ভূতলে—
নিখিলে বিলালে প্রেম ছিন্ন করি' গৃহস্নেহ-ডোর,
যুগান্তের মোহাঞ্জন ধুয়ে গেল নয়নের জলে।

তোমারে প্রণাম করি শ্রীচৈতন্য—হে বঙ্গগৌরব,
স্থাপিতে প্রেমের ধর্ম পুন তুমি হবে কি সম্ভব ?

২। রামমোহন (১৭৭৪—১৮৩৩)

অজ্ঞানের অন্ধকার আবার ঢাকিল চারিদিক—
পুরাতন মৃত, তবু নূতনে বাঙালী করে ভয় ;
যুগান্তের যবনিকা যে তুলিবে তারে দিবে ধিক্‌,
এ হেন সংশয়কালে হে বীরেন্দ্র, তব অভ্যুদয়।
দৃঢ়চিত্তে তুমি একা সেই দিন বরিলে নূতনে,
ত্যজিলে না পুরাতন, দিলে তারে নব প্রাণদান—

পরাধীন হীন দেশে হে স্বাধীন, ভয়হীন মনে
সাহিত্যে সমাজে রাষ্ট্রে গাহিলে মুক্তির জয়গান।
মহান্ আদর্শ তব পথভ্রান্ত ক্লান্ত বাঙালীরে
সেদিন দেখাল পথ, নবীনের যাত্রা হ'ল শুরু,
বেদান্তের বাণীমন্ত্রে ডুব দিয়ে গহন-গভীরে
পাশ্চাত্য বিজ্ঞান-জ্ঞানে:তুমি হ'লে ভারতের গুরু।

তোমারে প্রণাম করি বাঙালীর হে রামমোহন,
নূতনে গড়িলে তুমি পুরাতনে করিয়া দোহন।

৩। বিদ্যাসাগর (১৮২০—১৮৯১)

অজ্ঞাত পল্লীর কোলে জন্মেছিলে দরিদ্রের ছেলে,
গোঁড়া ব্রাহ্মণের ঘরে হে উদার, তোমার উদ্ভব ;
সমাজ-সংস্কার-বাধা উপেক্ষা করিয়া অবহেলে
আত্মশক্তি-মহিমায় উদ্‌ঘাটিলে মহৎ বৈভব।
বিদ্যার সাগর তবু দয়ার সাগর তব নাম,
মাতার সুপুত্র তুমি—অর্ধমৃত জননী-সমাজে
প্রাণের স্পন্দন একা তুলিতে চেয়েছ অবিরাম—
জাগে আত্মগরিমায় যারা ছিল সঙ্গোপনে লাজে।
শিশু বাঙালীর শিক্ষা তোমার করুণা-আঁখিপাতে
বর্ণপরিচয় হ'তে ধীরে ধীরে হ'ল বোধোদয়,
দূর হ'ল অন্ধকার, অকস্মাৎ-আলোক-বন্যাতে—
আকাশে বঙ্কিমচন্দ্র, দীপ্ত রবি হ'ল শোভাময়।

তোমারে প্রণাম করি বাঙালার হে বিদ্যাসাগর,
নব-অভ্যুদয়ে ভাঙো সমাজের জড়ত্ব-নিগড়।

৪। মধুসূদন (১৮২৪—১৮৭৩)

অমৃত সমান কথা পয়ারের পয়োনালী-মাঝে
পঙ্কল সৃজন করি' বিকারের শাঘলে-শৈবালে

পঙ্কবিভীষিকা রচি পুণ্যবান বাঙালী-সমাজে
বাণীকণ্ঠ করে রোধ। হে বিদ্রোহী, তুমি হেন কালে
প্রবেশিলে দৃপ্ততেজে অবিচিত্র উটজ-প্রাঙ্গণে,
বিক্ষুব্ধ ঝটিকা তুলি ছিঁড়ি অবসাদ-শান্তিজাল
অতলান্ত বারিশীর্ষে প্রতিষ্ঠিলে বাণীর আসনে—
নিমেষে উজ্জ্বল হ'ল লজ্জাকালো জননীর ভাল।
অগ্নিভাষে ডাক দিলে শব্দব্রহ্ম অমিত্র-অক্ষর,
মিলের বন্ধন ত্যজি পক্ষ মেলি উড়িল আকাশে,
অবাধে উড়িছে আজো সন্তরিয়া নীলের সাগর—
মহাব্যোম কম্পমান ভবিষ্যের বিপুল প্রত্যাশে।

তোমারে প্রণাম করি বাংলার শ্রীমধুসূদন,
কান পাতি শুনি শব্দ-বলাকার পক্ষ-বিধূনন।

৫। বঙ্কিমচন্দ্র (১৮৩৮, জুন—১৮৯৪)

স্বল্পপরিসর পথে তুমি এলে রাজসমারোহে,
দৃপ্ত প্রতিভায় তব শীর্ণগলি হ'ল রাজপথ—
যুগান্তের তন্দ্রাহত বঙ্গবাণী দেখিল আগ্রহে
বঙ্গের অঙ্গনে ধেয়ে এল বিশ্বভারতীর রথ।
শাণিত কুঠারে তব ছিন্নভিন্ন হ'ল মায়াপাশ
কল্পনার পূর্ণচন্দ্র দেখা দিল গগন-কুট্টিমে
রজত-বন্যায় তব উদ্ভাসিল বঙ্গের আকাশ—
"বন্দেমাতরম্"-মন্ত্র কোটি কণ্ঠে উঠিল অসীমে।
আত্মবিস্মৃতের ভ্রান্তি দূর হ'ল—নব জাগরণ,
কমলাকান্তের ধাত্রী জাগিলেন কালস্রোতোজলে,
তোমার ইঙ্গিতে শুরু, শুরু হ'ল মৃত্যুর সাধন—
সপ্তকোটি সন্তানের নিনাদ-করাল কলকলে।

তোমারে প্রণমি পুন হে বঙ্কিম, হও কর্ণধার,
ফেনিল তরঙ্গ হের তটভূমে হানিছে প্রহার।

৬। কেশবচন্দ্র (১৮৩৮, নবেম্বর—১৮৮৪)

পাশ্চাত্যবিজ্ঞান-বহ্নি-স্পর্শে দগ্ধ মানুষের মন,
ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের দম্ভ রচে বাধা পর্বত-প্রমাণ—
ভায়ে ভায়ে মিলনের ব্যর্থ হ'ল সব আয়োজন
আচার-বিচারে নবসংস্কারক সেও যে পাষাণ।
ভক্তি-প্রেম-মন্ত্র ল'য়ে হে কেশব, তুমি হেনকালে
নব গোরা অবতার মজাইলে সারা বঙ্গদেশ,
কলকণ্ঠে ডাক দিয়ে আরবার ঘুমন্তে জাগালে
নববৃন্দাবনে জাগে পুরাতন প্রেমের আবেশ।
সুলভ-প্রচারে করি ভারতীর শৃঙ্খলমোচন,
ক্ষুদ্র ও বৃহতে এক করি নববিধান-বন্যায়
বিতরিলে সমন্বয়-ভক্তিতত্ত্ব নামসঙ্কীর্তন,
পূর্ব-পশ্চিমের বাধা প্রেমধর্মে বুঝি ডুবে যায়।

তোমারে প্রণাম করি ব্রহ্মবিদ্ হে সৌম্য কেশব,
শোন নাকি প্রতিদিন বাড়িতেছে ভেদ-কলরব।

৭। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় (১৮৬১—১৯০৭)

ভবানীচরণ ছাড়ি তুমি হ'লে শ্রীব্রহ্মবান্ধব,
যীশুযজ্ঞে প্রাণাহুতি দিলে পূর্ণ বৈদান্তিক মতে
ভয়াবহ অন্ধকারে বিঘোষিয়া 'সন্ধ্যা'শঙ্খ রব
আবার তুলিলে সাড়া মূঢ় স্তব্ধ মৃতের জগতে।
অশান্ত সন্ন্যাসী, তুমি হেরিলে না 'ভারত-উদ্ধার'
হেরিবে না যদি ফেরে পুরাতন সে 'পাল-পার্বণ'

তবু তো তপস্যা তব ভেঙেছে ফিরিঙ্গী-কারাগার,
বিদেশের মোহ হ'তে ফিরায়েছে আমাদের মন।
নগ্নগাত্রে উপবীত, কণ্ঠে তব বজ্রের নির্ঘোষ,
অন্যায়ের অত্যাচার-প্রতিরোধী সমুন্নত ভাল,
সর্বদুর্বলতাধ্বংসী বহ্নিবর্ষী তব রুদ্র রোষ
মরণ-নিশীথ ভেদি আনিয়াছে জীবন-সকাল।

তোমারে প্রণাম করি বাংলার হে ব্রহ্মবান্ধব,
তুমি ফিরে না আসিলে কে করিবে নবান্ন-উৎসব।

৮। শ্রীঅরবিন্দ (১৮৭২—১৯৫০)

স্বদেশীযুগের তুমি অরবিন্দ রবীন্দ্র-বন্দিত,
সাধনার সরোবরে ফুটিলে শ্রীঅরবিন্দ-রূপে,
ঘোষিয়া আশার বাণী বিশ্বচিত্ত করিলে স্পন্দিত—
"দেবত্ব লভিবে নর, রহিবে না পশুত্বের কূপে।
সবার আয়ত্তাধীন যোগবলে সে দিব্য জীবন,
শিখা নিত্য উর্ধ্বমুখী কখনও হয় না অধোগামী"—
যোগীর আশ্বাস পেয়ে দোলে ভোগী মানুষের মন,
স্বর্গ হ'তে দিব্যজ্যোতি হেরে নিত্য আসিতেছে নামি।
জনারণ্যে ছিল তব নেতৃত্বের সিংহাসন পাতা
হেলায় ত্যজিলে তাহা মানব-কল্যাণ-সাধনায়,
দেশমুক্তিদাতা হ'লে নিখিলের মৃত্যুভয়ত্রাতা
পার্থিব জীবন ধন্য দিব্যজীবনের মহিমায়।

তোমারে প্রণাম করি ঋষি অরবিন্দ বাংলার,
যাঁহার সৌরভে হ'ল সুরভিত এ বিশ্বসংসার।

* শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস (১৮৩৬-৮৬), রবীন্দ্রনাথ (১৮৬১-১৯৪১), স্বামী বিবেকানন্দ (১৮৬২-১৯০২) ও ভগিনী নিবেদিতা (১৮৬৭-১৯১১) অন্যত্র প্রকাশিত হইয়াছে।

আমার সাহিত্য-জীবন

আট

গত সংখ্যায় স্মৃতিকথার ধারাবাহিকতার পথ ছেড়ে একক সাহিত্য-সাধক ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা বলেছি। ব্রজেনদা চলে গেলেন, তাঁর কথাতেই মন ভরপুর হয়ে ছিল, স্বাভাবিক ভাবে তাঁর কথাই এসে গেল। এলোমেলো একটু হয়ে গেল, তা হোক। গুছিয়ে নিলেই আবার সাজানো যাবে। স্মৃতির মধ্যে নিজেই অবশ্য সব। নিজের সুখ নিজের দুঃখ নিয়েই হ'ল স্মৃতি; জীবনে পথ চলতে কি সুখ পেয়েছি, কবে পেয়েছি, কি ভাবে পেয়েছি, কার কাছে পেয়েছি আর দুঃখই বা কত পেয়েছি, কবে কখন কে কি কারণে দিয়েছে—এইটেই মনের মধ্যে গাঁথা হয়ে থাকে, বাদ বাকি প্রায়ই মুছে যায়, ডুবে যায় অন্ধকারের অতলে। কিন্তু সুখই হোক আর দুঃখই হোক, সংসারের পথে সংসারীর জীবনে দেবার মালিক তো মানুষ। দেনা-পাওনা ঘাত-প্রতিঘাত মান-অপমান স্নেহ-উপেক্ষা এ মানুষের সঙ্গে কারবারে মানুষের বিনিময়। এমন কি, সংসারে যা অনিবার্য—মৃত্যু, তার যে ভয় এবং তার যে শোক তাও মানুষকে নিয়ে। নিজের মৃত্যুভয় যেটা, সেটা শুধু নিজের অস্তিত্ব-বিলুপ্তির ভয়—মৃত্যু অজানার ভয়—এই কি সব? তার সঙ্গে সংসারের মমতা, যা শুধু প্রিয়জনকে জড়িয়ে সহস্রজাল লতার মত বিস্তৃত হয়ে রয়েছে, সেই জাল ছিঁড়ে যাওয়ার ব্যথাও কি তার মধ্যে নেই? সেখানেও মানুষ। প্রথম পুরুষের সঙ্গে তৃতীয় পুরুষ সম্পর্কহীন হ'লেও হতে পারে, কিন্তু দ্বিতীয় পুরুষের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ—সে নইলে জীবন অপূর্ণ, অপূর্ণ মানেই শূন্য, অন্ধকার এলেই শূন্য স্থান বিলুপ্তির মধ্যে ডুবে যায়। মহাশূন্যে যে তারাটিকে দীপ্যমান দেখি একদিন, সে-ই মনের আকাশে জেগে থাকে, তার আলোতেই দেখতে পাই অতীতের অন্ধকারে হারানো জীবনকে।

সেবার, "বনফুলে"র ওখান থেকে অর্থাৎ ভাগলপুর থেকে গেলাম পাটনা। পাটনাতে এসে দেখলাম একজন বড় মানুষকে। কিন্তু তার পূর্বে "বনফুলে"র কথা আছে, এবং একজন অতি সাধারণ মানুষের কথা

গেছে। পূর্বেই বলেছি—শরীর ছিল খুব খারাপ, হজমশক্তি প্রায় যেন শেষসীমায় এসে পৌঁছেছে। এর উপর "বনফুলে"র মত খাদ্যরসিক বন্ধুর আহার্যের সমারোহ দেখে ভীত হয়েছিলাম। বললেও "বনফুল" শোনেন নি ; বলেছিলেন, আমি ডাক্তার—সে কথাটা মনে রাখবেন। ভাগলপুর ছাড়বার সময় দেখলাম, "বনফুল" মিথ্যে অহংকার করেন নি। কয়েক দিনের মধ্যেই হজমের গোলমাল যেন কম প'ড়ে গেল। "বনফুল" ব'লে দিলেন, মাংস খাবেন। কার্বোহাইড্রেট কম খাবেন। দরকার হ'লে ভাত ছেড়ে দেবেন।

পাটনা যাবার পথে একটি নগণ্য মানুষ মনে ঠাঁই ক'রে নিয়ে ব'সে রয়েছে। মাত্র কয়েক ঘণ্টার জন্য পরিচয়। পরিচয়ই বা কি! কয়েকটা কথাবার্তা, সামান্য কিছু অর্থ ও কর্ম বিনিময়। এতেই সে সেদিন এমন আনন্দ দিয়েছিল যার স্বাদ অমৃতের মত, না হ'লে সে স্বাদের স্মৃতি আজও ভুললাম না কেন?

কিউল জংশনের ধর্মশালার পরিচারক। ওই দেশের দেহাতি মানুষ ; সবল সুস্থদেহ শান্ত মিষ্টভাষী মানুষ। রাত্রি একটার সময় শীতে হি-হি ক'রে কাঁপতে কাঁপতে এলাম ধর্মশালায়। নদীর ধারে ফাঁকা স্টেশনে আমাকে জামা-জোড়া প'রেও কাঁপতে দেখে কুলি এখানে এনে তুলে দিলে। মধ্যে উঠন, চারিদিকে খিলেনের বারান্দাওয়ালা সারি সারি ঘর ; নদীর বাতাস নেই ; উঠনে ঢুকতেই আরাম পেলাম। সঙ্গে সঙ্গে সেই রাত্রিকালে লোকটি এসে দাঁড়াল।

পরণাম বাবুজী!

জিজ্ঞাসা করলাম, কে তুমি? উত্তর পেলাম, আপনাদের সেবক আমি। এই ধরমশালার নোকর। হাত জোড় ক'রে বললে।

এ সংসারে কত মানুষ দেখলাম, বড়-ছোট নিঃস্বার্থ-স্বার্থপর ভদ্র-ইতর ; কিন্তু এমন একটি মানুষ দেখলাম না ব'লেই আজ মনে হচ্ছে। অন্তত এই ধরনের এমন মানুষ।

আপনার কর্তব্যগুলি নিখুঁতভাবে ক'রে গেল, এক বিন্দু বিরক্তি

দেখলাম না, যে কাজগুলি করলে এতটুকু ত্রুটি তার মধ্যে চোখে পড়ল না।

এরই মধ্যে সে কিছু বাণিজ্য করলেও আমার সঙ্গে।

বললে, আঁধিয়ারা বাবুজী, তোমার বাতি না হ'লে তো অসুবিধে হবে। বাতি নেবে তুমি ?

অন্ধকারে আলো কেউ ধরে না, এইটেই চিরন্তন দুঃখ এবং সত্য। ধরতে চাইলে নেব না ? বললাম, নিশ্চয় চাই। এনে দাও। মনে মনে ধর্মশালার প্রতিষ্ঠাতাকে ধন্যবাদ দিলাম সুবিবেচনার জন্য। বললাম, তোমার যাবার পথে তুমি দেওয়ালীর সমারোহ জ্বালবার ব্যবস্থা করেছ যে বিশ্বাসে, সে বিশ্বাস সত্য হোক—সত্য হোক—সত্য হোক। লোকটি তিন ইঞ্চি লম্বা আঙুলের মত সরু বাতির বাণ্ডিল এনে নামিয়ে দিয়ে বললে, নাও, কটা নেবে !

ভাবছিলাম স্বার্থপরের মত, বেশি নেওয়াটা কি উচিত হবে ?

লোকটি সবিনয়ে বললে, দাম কিন্তু বাজার থেকে একটু চড়া। কত বলেছিল মনে নেই। আজকের দিনের অর্থাৎ যুদ্ধের আগুনে পুড়ে খাক হয়ে যাওয়া বাজারের মধ্যে ব'সে সে বাজারের দর-দাম মনে করা অসম্ভব।

চমকে উঠে বললাম, দাম লাগবে নাকি ?

সবিনয়ে সে হাতজোড় ক'রে বললে, গরিব আদমী আমি বাবুজী—ধরমশালার নোকর, আপনাদের সেবক, এখানকার অতিথ আগন্তুকদের অন্ধকারে কষ্ট হয় দেখে বাতি এনে রেখেছি। বাজারে দাম অবশ্য কম। এত দাম। এখানে আমি এনে রাখি, তোমাকে কষ্ট ক'রে যেতে হয় না, তার জন্য কিছু বেশি নিই। এই মাত্র। তা তুমি একটাই নাও ; নিবিয়ে রেখে দাও, দরকার হ'লে ম্যাচিস ধরিয়ে জ্বালিয়ে নেবে। ভয় নেই, অন্ধকারে থাকলে কোন জিনিস তোমার চুরি যাবে না। আমি পাহারা আছি।

সঙ্গে আমার লোটা বা কোন জলাধার ছিল না ; উঠনে একটি

কুয়োতে শিকলে বাঁধা একটি বালতি আছে—সাধারণের জন্য। জল তুলে হাতে খেতে হয়। লোকটি লোটা ভাড়া দেয়, বালতি ভাড়া দেয়। মাটির ভাঁড় রাখে, বিক্রি করে। দাম বেশি। সে কথা সে অকপটে বলে; কিন্তু সব থেকে আশ্চর্যের কথা, লোকটিকে কালো-বাজারী ব'লে মনে হয় না। চড়াদামে কিনেও তাকে উপকারী বন্ধু ব'লে মনে হয়। এর মধ্যেও তার লোভ দেখতে পাই নি। তার সঙ্গে আলাপের মধ্যেই সে মুঠো ভর্তি ভাঙা বাতি এনে দেখিয়ে বলেছিল, এরই জন্যে বাবুজী, এই লোকসান হয় ব'লেই দাম কিছু বেশি নিই। আর মাটির ভাঁড় কত ভাঙে, সে আর কি বলব? এই এত।

অবিশ্বাস করি নি। তাকে অবিশ্বাস কেউ করতে পারেন কি না জানি না, যিনি করেন তিনি মহাপাষণ্ড তাতে সন্দেহ নেই। সকাল-বেলা কুলি ডেকে দিলে, বিদায় নেবার সময় একটি আধুলি তার হাতে দিয়েছিলাম। সে পূর্বদিকে সদ্য-ওঠা সূর্যের দিকে তাকিয়ে হাত জোড় ক'রে বলেছিল, হে সুরুযনারায়ণ, বাবুজীর মঙ্গল ক'রো।

কুলি বললে, ওই ওর আশীর্বাদের এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা।

কথায় কতটা তাকে প্রকাশ করতে পারলাম জানি না, এই বিবরণ প'ড়ে তার সম্পর্কে কার কি ধারণা হবে বলতে পারি না, কিন্তু সে আমার অতীত কালের অন্ধকার চিত্তাকাশে দ্যুতিমান একটি নক্ষত্রের মত জেগে রয়েছে। ভাগলপুর থেকে পাটনা যাওয়ার পথে আর সবই অন্ধকারে হারিয়ে গেছে, কিন্তু কিউল স্টেশনের ধর্মশালা দেখতে পাচ্ছি।

পাটনায় এসে "বনফুল"কে লিখলাম এই কথা। "বনফুল" উত্তরে যা লিখলেন তার মর্মার্থ—ওর কথা সাহিত্যের মধ্যে ধ'রে রেখে দিন। স্বধর্ম পালন করুন। নিজের তন্ত্রে ওই নরদেবতাটির অর্চনা করুন।

আমি তার আগেই অর্থাৎ "বনফুল"কে পত্র লিখে তাঁর পত্র আসতে আসতে "ভ্রমণ-কাহিনী" নাম দিয়ে একটি গল্প লিখে পাঠিয়ে দিলাম 'দেশ' পত্রিকায়। 'যাদুকরী' নামে গল্পসংগ্রহে গল্পটি আছে।

পাটনায় এলাম দীর্ঘকাল পর। বোধ হয় বছর আষ্টেক পর। শেষ এসেছিলাম উনিশ শো তিরিশ সালের মে মাসে কি জুন মাসের প্রথমে। জেলে যেতে হবে, আদালতে হাজির হয়ে আত্মসমর্পণের দিন পড়েছে, তার আগেই এখানে এসেছিলাম আমার মাকে নিয়ে যেতে। দেশের ম্যালেরিয়ায় মায়ের শরীর খারাপ হয়েছিল। মা এসেছিলেন শরীর সারতে। তার পর এই। এই সময় আমার বড় ছেলে ওখানে থেকে কলেজে পড়ছিল। সেও ছিল পাটনায়।

পাটনায় এই প্রথম এলাম সাহিত্যিক পরিচয় নিয়ে। আমার বড়মামা ছিলেন ব্যাধিগ্রস্ত মানুষ। পাটনার ওই পাড়ায় সকল কর্মের অগ্রণী, লাইব্রেরি ক্লাব থিয়েটার সেবাধর্ম সংকার-সমিতি সর্বত্র ছিল তাঁর স্থান। ওইটিই ছিল তাঁর কর্ম এবং ধর্ম। সরল মানুষ, প্রেমিক মানুষ, পড়াশুনাও প্রচুর, কিন্তু তার সঙ্গে দুরন্ত ছিল তাঁর ক্রোধ। প্রথম দিন সন্ধ্যাতেই তিনি আমাকে নিয়ে গেলেন একটি আড্ডায়।

একটি মানুষ দেখলাম সেখানে।

কিউলে দেখে এসেছিলাম একটি মানুষ, আর এই এক মানুষ। ভাস্বর মহিমময় দিব্যকান্তি প্রসন্ন সহাস্য। ছ ফুটের উপর লম্বা, যাকে বলে—শালপ্রাংশু মহাভুজ রক্তাভ গৌরবর্ণ, তীক্ষ্ণ সুগঠিত দীর্ঘনাসা, কৌতুকোজ্জ্বল ঝকঝকে চোখ, মজলিসের সকল মানুষের উপরে মাথা তু'লে ব'সে আছেন। ইচ্ছে করে নয়, স্বাভাবিকভাবে।

লম্বা হাতখানা বাড়িয়ে সাদর সম্ভাষণ জানিয়ে বললেন, এস, ভাগ্নে এস।

একটি শব্দ উচ্চারণ ক'রে একটু থেমে আবার একটি শব্দ উচ্চারণ ক'রে কথা বলেন। বর্ণনা শুনে চাল মনে হতে পারে—হয়তো এমন ধরনে কথা বলা তাঁর প্রথম যৌবনের কোন ফ্যাশন অনুযায়ী অভ্যাসও বটে, কিন্তু এই বাহ্য প্রসন্নতার মাধুর্যে কণ্ঠস্বর ও বাক্‌ভঙ্গি এমনি অভিষিক্ত যে পুষ্পিত একটি গোলাপের ডালের মত কাঁটার কথা ভুলিয়ে দিয়ে ফুলের শোভায় চিত্তলোককে রঙে রসে গন্ধে রাঙিয়ে

তোলে, রসসিক্ত ক'রে দেয়, গন্ধে তৃপ্ত করে। গোলাপের ডালের উপমাটা ইচ্ছে ক'রেই দিলাম, তার কারণ শচীমামার কথা বলতে গিয়ে গোলাগবাগের কথাই মনে পড়ছে তাঁর ছবির পটভূমি হিসেবে। গোলাপের শখ শচীমামার বোধ করি এ জীবনের সব থেকে বড় শখ।

শচীমামা—শচীন্দ্রনাথ বসু, ব্যারিস্টার। শচীমামাকে না দেখলে পাটনা দেখা সম্পূর্ণ হয় না ব'লেই আমি মনে করি। হাজার মানুষের মধ্যে প্রথম চোখে পড়বার মত মানুষ। বাংলা দেশে এ কালে এমন সদৃশ রূপের একটি মানুষ মাত্র আমার চোখে পড়েছে। তিনি অবশ্য যে-সে নন, ঠাকুর-বংশের সন্তান শ্রীসৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। দীপ্তিতে শচীমামার কান্তি সৌম্যেনবাবু অপেক্ষা আরও উজ্জ্বল। যেমন বাইরের কান্তি, তেমনই কান্তি অন্তরের। শুধু কান্তিই নয়, অন্তরের ঐশ্বর্যও অফুরন্ত এবং সে ভাণ্ডার উদারতায় অকৃপণ, মাধুর্যে সুপ্রসন্ন প্রশান্ত। ভরাট কণ্ঠস্বর, তেমনি প্রাণ-খোলা হা-হা-হা-হা হাসি।

পাণ্ডিত্য অগাধ, বেদোজ্জ্বলা বুদ্ধি, কিন্তু তার স্পর্শ প্রখর কণ্টকতীক্ষ্ণ নয়। রস-রসিকতায় প্রদীপ্ত, কিন্তু উত্তাপ নেই। মানুষটির সমস্ত জীবনকে বেষ্টন ক'রে বৈরাগ্যের একটি গৈরিক উত্তরীয় জড়ানো। জীবনে এ মানুষের যা বা যতখানি পাওয়া উচিত ছিল তার কিছুই পান নি, তাঁর কামনা বাসনা যেন এক অপরূপ প্রসন্নতার স্পর্শে প্রশান্ত হয়ে নির্লিপ্ততায় পরিণতি লাভ করেছে।

প্রথম যৌবনে হেডমাস্টার ছিলেন দেওঘর ইস্কুলে। তারপর উকিল হয়েছিলেন। ওকালতির কালে অসহযোগ আন্দোলনে বর্তমান ভারতের রাষ্ট্রপতি পণ্ডিত রাজেন্দ্রপ্রসাদের সহকর্মী ছিলেন। তারপর কিছুকাল উদাসীর মত দেশে দেশে বেড়িয়েছেন। এখন ব্যারিস্টার, কিন্তু সে দিকে তাঁর আদৌ রুচি নেই, অনুরাগ নেই। প্রথম বয়সে সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে স্বর্গীয় মতিলাল ঘোষ মশায়ের সঙ্গে পরিচয়ের সূত্রে 'অমৃতবাজারে' লিখতেন।

সন্ধ্যায় তাঁর বাড়িতে একটি মনোরম আড্ডা বসে। সেখানে

পাটনার বাঙালী সমাজের বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি আসেন। শ্রীযুক্ত যোগীন ঘোষ—পাটনার বাঙালী সমাজের মুখোজ্জ্বল করা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, পাটনার ট্রেনিং কলেজের অধ্যক্ষ বা সহকারী অধ্যক্ষ; সাহিত্যে যত অনুরাগ তত পড়াশোনা, ঈষৎ বক্র তীক্ষ্ণ রসিকতায় অনুরাগী সহৃদয় মানুষ; সত্যকারের বুদ্ধিবাদী ব্যক্তি। তার সঙ্গে তাঁর শখ বাগানের। যোগীনবাবু মিতব্যয়ী ব্যক্তি, জীবনে কোনখানে এক বিন্দু আতিশয্য অমিতাচার নেই, কিন্তু ফুলের শখে যোগীনবাবু প্রচুর খরচ করেন—শুধু অর্থই নয়, তার সঙ্গে নিজের শ্রম এবং সময়। আর ছিল তাঁর ছেলেকে সত্যকারের মানুষ ক'রে তোলার কামনা এবং তার জন্মে অধ্যবসায়। যোগীনবাবুর ছেলে পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র; হীরে-মানিকের মত উজ্জ্বল; তার সঙ্গে যোগীনবাবু মানুষের জীবন-গঠনে যা কিছু প্রয়োজন তা অর্জনে সাহায্য করেছেন, উৎসাহিত করেছেন। নিজে ছেলেকে নিয়ে গঙ্গা-স্নানে যেতেন, ছেলেকে সাঁতার শেখাতেন। ছেলে গঙ্গাপারাপার করত, বাপ নৌকো নিয়ে পাশে পাশে চলতেন।

আর একজন আসতেন শ্রীশম্ভু চৌধুরী—পাটনা মেডিকেল কলেজের বায়োলজির অধ্যাপক; লক্ষ্ণৌর লোক, লক্ষ্ণৌর বিখ্যাত দ্বিজু সান্যাল ও পাহাড়ী সান্যালদের আত্মীয়; পাটনাতেই বাড়ি কিনে পাকা বাসিন্দে হয়েছেন; লক্ষ্ণৌর ভদ্রতা-ভব্যতা সবই আছে তাঁর মধ্যে এবং অন্য দিকে শ্রীযোগীনবাবুর সঙ্গে এক টোলের ছাত্রের মতই সাহিত্য ও কুসুম বিলাসী। ফুলের বাগানে শম্ভুবাবুরও খরচ অনেক।

এঁদের দুজনের বাড়িতে যে যেত এবং সম্ভবত এখনও যে যায়, তাকে কিছুক্ষণ মুগ্ধভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। বিশেষ ক'রে শীত কালে, মরশুমী ফুলের সমারোহের সময়। দেশ-দেশান্তর থেকে বীজ আনিয়ে চারা তৈরি ক'রে যে ফুল তাঁরা ফোটান, তার শোভা দেখে যে কোন মানুষকে মুগ্ধ হতেই হবে—সে যত বড় রূঢ়প্রকৃতি বাস্তববাদী হোক না কেন। বাগানের এক প্রান্তে কোন পাত্রে

গোবর পচছে, কোনটায় চায়ের পাতা পচছে, কোনটায় কিছু, এবং সে সবই তাঁরা নাড়েন ঘাঁটেন। শচীমামা এঁদের নাম দিয়েছিলেন, বাগানিয়া। এই বাগানিয়াদের বাগান থেকে মরশুমী ফুলের কিছু চারা আসত শচীমামার বাড়ি। শচীমামার শখ ছিল শুধু গোলাপে। মশিডির বিখ্যাত গোলাপ-বাগানের মালিক তাঁর ছাত্র। শচীমামা প্রথম দিন ফুলদানি থেকে একটি গোলাপ ফুল তুলে আমায় দিয়েছিলেন।

আর একজন এই আসরের নিয়মিত সভ্য ছিলেন। তিনি আসতেন সকলের শেষে, তাই শেষেই তাঁর নাম করছি—নইলে তিনি বৈশিষ্ট্যে খ্যাতিতে সংস্কৃতিবানতায় কারও চেয়েই কম নন, বরং সাহিত্যক্ষেত্রে খ্যাতনামা একজন বড় অধিকারী। আমাদের রঙীনদা অর্থাৎ শ্রীরঙীন হালদার; বি. এন. কলেজের বাংলার অধ্যাপক। পাটনায় বাংলা-সাহিত্য সম্পর্কে সর্বশ্রেষ্ঠ কষ্টিপাথর। আজীবন কুমার রঙীনদা সাজে পোশাকে চালে চলনে যেমন পরিচ্ছন্ন তেমনই পরিপাটী। সে আমলে থাকতেন বি. এন. কলেজের হস্টেলে; হস্টেলের অধ্যক্ষ হিসেবে; সে ঘরে গিয়ে চোখ জুড়িয়ে যেত। রঙীনদা সন্ধ্যার পর হস্টেলের দেখাশুনা তত্ত্বাবধান সেরে আয়নার মত পালিশ করা গ্লেজকিডের অ্যালবার্ট পায়ে, খদ্দরের ধুতি দামী চমৎকার ফ্ল্যানেলের পাঞ্জাবি ও সরুপাড় সাদা শালখানি গায়ে দিয়ে এসে হাজির হতেন—কোনদিন সাড়ে আট, কোনদিন নয়, কোনদিন সাড়ে নটায়। শচীমামার গেটের বাইরে রাস্তায় একখানি ফিটন এসে থামত। শচীমামা বসতেন হাঁটু ভেঙে, হাঁটুর ভাঁজের মধ্যে হাতের মুঠোটি রেখে বলতেন, ওঃই!

তারপর থেমে থেমে বলতেন, সে—এসেছে।

প্রথম দিন রঙীনদা আসতেই শচীমামা আমার দিকে তাকিয়ে হেসে বলেছিলেন, ভাগ্নে, এইবার তোমার যাচাই হবে। এইবার বোঝা যাবে, তোমার কত দর! কষ্টিপাথর এল। শঙ্কিত অবশ্যই হয়েছিলাম। এই পণ্ডিত-মণ্ডলীর মধ্যে এসে অবধিই নিজেকে অসহায় এবং সত্যই নগণ্য ব'লে বোধ করছিলাম। শুধু সস্নেহ পরিমণ্ডল অনুভব

ক'রে ভরসা পেয়ে পিপাসু চিত্তে তাঁদের মিলন-তীর্থের গোমুখী থেকে ঝরা জলধারা পানের প্রত্যাশায় ব'সে ছিলাম।

পরীক্ষা দেবার জন্য প্রস্তুতও নই, যোগ্যতাও নেই। ভয় না পেয়ে উপায় কি? রঙীনদা কিন্তু আদৌ আমাকে যাচাই করেন নি। তিনি আমাকে স্নেহের বশেই খাঁটি ব'লে গ্রহণ করেছিলেন।

রঙীনদা এলেই উঠত তর্ক। সাহিত্যিক তর্ক। এক দিকে শম্ভুবাবু ও যোগীনবাবু, অন্য দিকে একা রঙীনদা। ভরাট মোটাগলা রঙীনদার কণ্ঠ উচ্চ থেকে উচ্চতর গ্রামে উঠত। শচীমামা ব'সে ব'সে হাসতেন, উপভোগ করতেন। সর্বশেষে মুখ খুলতেন তিনি। তাঁর মতামত মেনে নিতেন সবাই, না মেনেও উপায় থাকত না। তাঁর বিচার ছিল নির্ভুল, অনুভূতি ছিল সূক্ষ্মতম; তাই বিচারের উক্তিগুলি হ'ত অলঙ্ঘ্যনীয়—সে যেন প্রাণের তারে ঝঙ্কার তুলে দিত, সঙ্গে সঙ্গে মনে হ'ত, তাই তো, এই তো ঠিক—এই তো সত্য।

পাটনায় আরও অনেক সুধী ছিলেন। তাঁদের মধ্যে অধ্যাপক শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার অন্যতম। ঐতিহাসিক, বৈষ্ণব-সাহিত্যে সুপণ্ডিত এবং বোধ করি কোন প্রাচীন বৈষ্ণবাচার্য ঘরের সন্তান। তাঁর অন্তরে বংশগত বৈষ্ণব-সংস্কৃতির বীজ ছিল। কিন্তু তখনও তা উপ্ত হয় নি ব'লেই আমার মনে হয়েছিল তখন। এখনকার কথা জানি না। হওয়ারই কথা। একালের পাণ্ডিত্যের আধিক্যে, বৈষম্যের ফলে যদি সে জীবকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট ক'রে থাকে, তবে বলতে পারি নে।

বিমানবাবু এলে রঙীনদা সেদিন জেঁকে বসতেন, ভাবটা—যুদ্ধং দেহি! তুমুল এবং প্রবল তর্ক। রাত্রি দশটা সাড়ে দশটায় আসর ভাঙত।

বড় মামার সঙ্গে বাড়ি ফিরতাম স্তব্ধ হয়ে। মন পরিপূর্ণ হয়ে থাকত। কত শুনলাম, কত শিখলাম! শীতের রাত্রি দশটা সাড়ে দশটাতেই পথ হয়ে যেত জনবিরল—অন্তত এই অঞ্চলটা। মধ্যে মধ্যে পিছনে অন্ধকারের মধ্যে বেজে উঠত ঘোড়ার ক্ষুরের এবং গলার ঘণ্টার ধ্বনি। মনে হ'ত, কোন যেন মধ্যযুগ।

একাওয়ালা হেঁকে উঠত, হট যাইয়ে, বচ যাইয়ে—বচ যাইয়ে।

রাস্তার ধার ঘেঁষে আমরা চলতাম, আমাদের জুতোর শব্দ উঠত। কিন্তু সে সব কিছুই আমার আচ্ছন্ন চৈতন্যের ধ্যান ভাঙাতে পারত না। স্বপ্নাচ্ছন্নের মতই চলতাম। কোন কোন দিন কোন বাড়ির বাগানের গাছের ছায়ার অন্ধকারের মধ্য থেকে রসিক পাগলের কণ্ঠস্বর বেজে উঠত—গাছ থেকে ফল পড়ল, সেই দেখে তুমি আবিষ্কার করলে মাধ্যাকর্ষণ, বেশ কথা, বড় আবিষ্কার করেছ—এ গ্রেট্ ম্যান তুমি। কিন্তু বলতে পার—কোন্ আকর্ষণে, কার আকর্ষণে মানুষের জীবনটা চ'লে যায়, দেহটা প'ড়ে থাকে? বলতে পার?

একদিনের কথা মনে পড়ছে। ওই কথাই আপন মনে বকছিল পাগল রসিক। বাঙালীর ছেলে, শিক্ষিত ছেলে ছিলেন, শচীমামাদের থেকেও বয়সে বড়; পাগল হয়ে গিয়েছিলেন।

জিজ্ঞাসা করেছিলাম, কি বলছেন? কার সঙ্গে কথা বলছেন রসিকবাবু?

দাড়িতে হাত বুলিয়ে চিন্তাকুল নেত্রে রসিকবাবু বলেছিলেন, কথা বলছি নিউটনের সঙ্গে।

নিউটনের সঙ্গে?

হ্যাঁ। এই যে ইটের থামটা দেখছ, এইটে—এইটেই কখনও নিউটন হয়, কখন শেক্স্পীয়র হয়, কখনও গ্যালেলিও হয়, কখনও মাইকেল হয়। মাইকেল মধুসূদন গো! তারা এসে থামের মধ্যে মিশে থাকে, কথা বলে। আবার চ'লে যায়।

কি জিজ্ঞাসা করছিলেন না?

হ্যাঁ।

যে প্রশ্ন করেছিলেন তারই পুনরাবৃত্তি করলেন—দেহটা প'ড়ে থাকে আর জীবন কার আকর্ষণে কোথায় যায়? বলতে পার? তা পারলে না! পারলে না! জানে না।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

জেলের চিঠি

[বিপ্লবী সাম্যবাদী দলের (R. C. P. I.) নেতা শ্রীপান্নালাল দাশগুপ্ত সম্প্রতি জেলে আছেন। সেখানে অধ্যাপক শ্রীনির্মলকুমার বসুর সহিত তিনি সাক্ষাৎ প্রার্থনা করিলে তাহা মঞ্জুর হয় এবং উভয়ের মধ্যে দীর্ঘকাল বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা চলে। পরে তিনি জেল হইতে লিখিত পত্রে আরও কয়েকটি প্রশ্ন উত্থাপন করেন ও পত্রটি প্রকাশ করিবার অনুমতি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিকট প্রার্থনা করেন। সেই অনুমতি অনুযায়ী এই পত্র ও তৎসহ নির্মলবাবুর জবাব আমরা মুদ্রিত করিলাম।—স. শ. চি.]

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আজকের দিনে যারা সত্যকার গান্ধীপন্থায় চিন্তানায়ক তাঁদের লেখার ও কর্মের সঙ্গে আমার পরিচয় দরকার; তাঁদের ব্যক্তিগত জীবন ও কর্মজীবনের নিরপেক্ষ পরিচয় পাওয়া দরকার। কেননা, গান্ধীদর্শনে ব্যক্তির বক্তব্যটাই একমাত্র বিচার্য বিষয় নয়, প্রচারকের জীবনযাত্রাও বিশেষভাবে বিচার্য। যার জন্য গান্ধীজীর মত লোকের পক্ষে এ কথা বলা সাজে যে, তাঁর জীবনই তাঁর বাণী। বস্তুত গান্ধীজীর জীবন বাদ দিলে আর গান্ধীবাদের বিশেষ কোনও আকর্ষণ থাকে না। এবং যার জন্য আজও বামপন্থী কর্মীরা গান্ধীজীর কাছে লজ্জিত ও নতমস্তকে দণ্ডায়মান থাকেন, তার একমাত্র কারণ, তাঁদের ব্যক্তিগত জীবনের সঙ্গে তাঁদের আদর্শবাদের ব্যবধান; কথার সঙ্গে কাজের ব্যবধান। কমিউনিস্ট সমাজ প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত ব্যক্তিগত জীবনে বা চরিত্রে সাম্যবাদের প্রত্যক্ষ রূপ দেখতে পাওয়া যাবে না, এমন কি, যারা কমিউনিস্ট বা সোশ্যালিস্ট তাদের জীবনেও না, এ কথা আমি মানি না। সবটা না হোক, অন্তত অনেকখানি দেখতে পাওয়া সম্ভব ও দরকার; নইলে এ রকম মতবাদ লেজুড়বাদে (Tailism) মাত্র পর্যবসিত হবে। অগ্রগামী সমাজ-বিপ্লবীদের ব্যক্তিগত চরিত্রে তাদের বলিষ্ঠ আদর্শের নির্মল প্রকাশ আবশ্যক। সমষ্টিগতভাবে

মস্ত সমাজের চরিত্র বদলানোর ব্যাপারটা সমগ্রভাবে সামাজিক বিপ্লবের উপরে নির্ভর করলেও অগ্রগামীদের বেলায় এ কথা বা এ যুক্তি খাটে না; নইলে তাদের অগ্রগমনের কোন মানেই হয় না। কমিউনিস্ট সোশ্যালিস্ট হওয়া এবং কমিউনিজম্ সোসিয়ালিজমে বিশ্বাস করা এক বস্তু নয়। মাতালেও মদে বিশ্বাস করে না।

আচার্য বিনোভা ভাবে, ডক্টর কুমারাপ্পা, অগরওয়াল, ধীরেন মজুমদার, পণ্ডিত সুন্দরলাল প্রভৃতি যাঁদের নাম শুনতে পাই, তাঁদের কর্মজীবনের ইতিহাসও আমাকে একটু একটু পাঠাবেন এবং এ বিষয়ে আপনার নিরপেক্ষ, নির্ভীক মতামতও দেবেন। গান্ধীবাদীরা আজ নানা পথে ছড়িয়ে পড়েছেন। তাঁদের সকলের প্রতি শ্রদ্ধা অবিচল রাখা সম্ভব হচ্ছে না। কারণ, ব্যক্তিগত জীবনে অনেকেরই গান্ধীজীর শিক্ষার সঙ্গে সম্পর্ক হারিয়ে গেছে। গান্ধীজীর কাছে প্রতিদিনের পথ চলাই বিশেষভাবে সাধনার বস্তু ছিল, দূরের স্বপ্ন নয়। সেইজন্য ফাঁকি দেবার অবকাশও ছিল বড্ড কম।

সেদিনকার আলোচনায় আপনার কাছ থেকে যে একটা কথা শুনেছিলাম, সে সম্বন্ধে বিচারের প্রয়োজন আছে। এমন কেউ কেউ গান্ধীপন্থী আজও আছেন, যাঁরা দেশের কোন না কোন অখ্যাত অজ্ঞাত পল্লীতে গান্ধীপন্থী কাজ নিয়ে নিবিষ্টমনে লিপ্ত আছেন। তাঁরা সংখ্যায় খুব কম এবং কতকটা একা একাই চলেছেন। আপনার ধারণা, তাঁদের প্রতি সরকারী কর্মচারীদের দৃষ্টি পড়েছে এবং তাঁদের একনিষ্ঠ সাধন ও সার্থক প্রয়াস চললে হয়তো একদিন সরকার এই ধরনের কাজকে ব্যাপকভাবে চালু করার চেষ্টাও করবেন। তা যদি হয় তবে তো ভালই। কিন্তু একটা ভয় এবং নৈরাশ্যের কথা এ সঙ্গে মনে আসছে; সেই কথাই বলি।

আমি যে সকল গঠনমূলক কর্মী দেখেছি, তারা গান্ধীজীর জীবদ্দশায় তাঁর কাছ থেকে অফুরন্ত নৈতিক সাহস, উৎসাহ এবং সহায়তা পেতেন। তা সত্ত্বেও অনেকে নিজের কাজকে একটা নিরেট

শুষ্ক fatigue workএ পরিণত ক'রে ফেলতেন, এবং দিনের পর দিন প্রাণহীন রুটিনের মধ্যে ডুবে থাকতেন। এমন কি, শেষ পর্যন্ত জনসাধারণের কৃপার পাত্রে পরিণত হতেন। চোখের সামনে এমন কয়েকজনের ছবি ভেসে উঠছে, এবং আপনারও নিশ্চয়ই এ ধরনের অনেক কর্মীর বিষয়ে অভিজ্ঞতা আছে। গঠনমূলক কাজ বলতে আমি যা বুঝি তার সার্থকতা এইরকম একক সাধনাতে নাই। একলা চলার দৃষ্টান্ত যদি শেষ পর্যন্ত না ব্যাপকভাবে জনচিত্তে একটা প্রবল প্রবাহ বা movementএর সৃষ্টি করতে পারে, তবে তা হবে সন্ন্যাসীপনা। হয়তো কেউ কেউ পরম নিষ্ঠার সঙ্গে জীবনভরই এমন কাজ চালিয়ে যেতে পারেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁদের কাজ উদ্যমহীন এবং মেক্যানিক্যাল হয়ে দাঁড়ায়। জনসাধারণ অথবা প্রতিষ্ঠানের উপরে তাঁরা একটা বোঝা হয়ে দাঁড়ান।

মৃতপ্রায় জাতির জীবনজাগৃতির আদর্শ কখনও মুষ্টিমেয় সাধকের নিরালম্ব কঠিন সন্ন্যাসসাধনা হতে পারে না। জনজাগরণের বাস্তব আদর্শ এমন হওয়া উচিত যা জনসাধারণের কাছে প্রকাশিত হবে মুক্তির সহজ এবং স্বাভাবিক রূপ নিয়ে, বিপুল উৎসাহের সৃজন ক'রে। জনকয়েক বৃদ্ধ অথবা আমার মত নগণ্য হৃতসর্বস্ব ব্যক্তির দিনগত পাপক্ষয়ের চেষ্টায় পর্যবসিত হওয়া তার পক্ষে যেমন হাস্যকর, নিরালম্ব মুষ্টিমেয় সন্ন্যাসধর্মীর কঠোরী সাধনায় পরিণত হওয়াও তেমনই সার্থকতাহীন হয়ে দাঁড়ায়। মানুষের ধর্ম মানুষের কাছে সহজ এবং স্বাভাবিকভাবে যাঁরা ধরতে পেরেছেন, তাঁরাই জনজাগরণের প্লাবন সৃষ্টি করেছেন।

অতএব আমি ভাবি, কি ক'রে এই গঠনমূলক কাজ জাতির যুবশক্তিকেও মাতিয়ে তুলতে পারে। ব্যক্তিগত সাধনা এবং দৃষ্টান্তই যে এর চরম উপায় নয়, এ কথা মনে হচ্ছে; যদিও তেমন সাধনার যথেষ্ট দরকার আছে। কিন্তু তার সার্থকতা নির্ভর করছে, সেই সাধনা একটা আন্দোলন বা জাগরণ অথবা বিপুল উৎসাহের সঞ্চার করতে

পারছে কি না তার উপরে। এই প্রবাহই মানুষকে ক্ষুদ্রতার গণ্ডী থেকে মুক্তি দিতে পারে এবং অকর্মণ্যতার গ্লানি থেকে রক্ষা করতে পারে। এই ধরনের প্রবাহ বা movement ভিন্ন জাতিগঠন সম্ভব নয়। যদি গঠনকর্মপদ্ধতি আন্দোলনের পর আন্দোলন, ঢেউয়ের পরে ঢেউ সৃষ্টি ক'রে আমাদিগকে জাগিয়ে তুলতে না পারে, সৃষ্টির কাজে, গঠনের ক্ষেত্রে মাতিয়ে তুলতে না পারে, তবে সে শুধু ব্যক্তিগত কান্না অথবা fatigue workএ পর্যবসিত হবে।

আন্দোলন শব্দটা অবশ্য আমি কোনও রহস্যজনক অর্থে ব্যবহার করছি না; অথবা কঠিন পরিশ্রম ও পথের দুর্গমতাকে অতিক্রম করার চেষ্টাকে ফাঁকি দেবার উপলক্ষ্য হিসাবেও ব্যবহার করছি না। আপনি নিজেই জানেন যে, গান্ধীজী আন্দোলনের ঢেউ দিয়েই দেশকে জাগাতেন। আজ সেই ঢেউয়ের রূপ হবে আলাদা। কিন্তু প্রবাহ চাই, ঢেউ যে চাই, এ কথা কি অস্বীকার করা চলে?

আমার প্রশ্ন হ'ল, সরকার কি সেই ঢেউ সৃজন করতে পারেন? অথবা অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলি? পারছে না ব'লেই তো এত অন্ধ অসন্তোষ এবং গ্লানি; আশা করি আপনি আমার বর্তমান আশঙ্কার কথা বুঝতে পেরেছেন এবং আপনার মতামত জানিয়ে আমার চিন্তাকে সহায়তা দেবেন।

আরও একটি বিতর্কমূলক কথা এই পত্রেই উপস্থিত করছি। গঠনমূলক কাজ বলতে আমি কোন বিশেষ কুটীরশিল্প বা বিশেষ বিশেষ কাজের ফর্দকে বুঝতে চাই না; কোন্ শিল্পের বিজ্ঞান এবং অর্থনীতি সম্মত সার্থকতা আছে, এটা নেহাত বিচারের বস্তু। কিন্তু জাতির জাগরণ বলতে যা বোঝায়, সে হ'ল তার সামগ্রিক প্রকাশ, এবং তার মূল একটি বস্তুতে নিবদ্ধ হয়ে আছে। সেটি হ'ল সহযোগিতা, সামাজিকতা এবং জন-ঐক্যের বোধ। মানুষে মানুষে স্বার্থচ্ছিন্ন অবস্থায় যে কুৎসিত প্রতিযোগিতা চলেছে, সেই ছেদ ও বন্ধনহীন একাকীত্ব দূর ক'রে আবার সহযোগিতার ধারা, সামাজিক প্রেরণা

এবং ঐক্যের চেতনা প্লাবনের মত সৃষ্টি করাই সত্যিকারের গঠনকর্মের ভিত্তি হওয়া উচিত। নিপীড়িত মানুষের মনে যে ধরনের কাজের দ্বারা এই ঐক্য সৃষ্টি হয়, সেই হ'ল আজকের দিনে সবচেয়ে দরকারী গঠনমূলক কাজ। সেই নব সমাজবন্ধন যন্ত্রের অপেক্ষায় ব'সে থাকবে না; ট্র্যাক্টর (tractor) না আসা পর্যন্ত সমবেত কাজের উদ্যম বা পরিকল্পনা বন্ধ থাকবে, এ ধরনের চিন্তাকে ক্ষতিকর এবং মেক্যানিক্যাল ব'লে আমার মনে হয়। উপরন্তু এ জাতীয় কাজ কোনও বিশেষ কুটীরশিল্পের বৈজ্ঞানিক নবজন্মের উপরেও বিশেষ নির্ভর করে না ব'লে আমার বিশ্বাস। এ বিষয়ে আপনার সুচিন্তিত মতামত চাই। ইতি

পান্নালাল দাশগুপ্ত

প্রিয়বরেষু,

আপনার সঙ্গে তিনটি বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ একমত; অতএব সে বিষয়ে আলোচনা নিষ্প্রয়োজন :—

(ক) গান্ধীবাদী যদি নিজের জীবনে স্বীয় বিপ্লবী মতবাদের যথাসম্ভব প্রকাশ দেখাতে না পারেন, তাঁর আদর্শবাদ যদি বুদ্ধির ক্ষেত্রে শিকেয় তোলা থাকে, তবে তার দ্বারা আদর্শ সম্প্রসারণের কাজ বিশেষ কিছু হয় না। এ কথা কমিউনিজ্‌ম্‌ বা সোশ্যালিজ্‌ম্‌ সম্পর্কেও খাটে।

(খ) গান্ধীবাদকে যদি আমরা ব্যক্তিগত জীবনে পালনীয় আদর্শমাত্রে পর্যবসিত করি, অর্থাৎ ঢেউয়ের মত যদি আদর্শ সমাজদেহে প্রসারিত না হয়, বিকীরণের পরিবর্তে সঙ্কোচন ঘটে, তবে সে আদর্শের সিঞ্চনে মানুষের নতুন জীবন ফুলে ফলে সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে না।

(গ) গঠনকর্মের ক্ষেত্রেও আমার ধারণা, গান্ধীজীর বিকেন্দ্রীকরণের নীতি এবং সামাজিক সহযোগিতার নূতন ক্ষেত্ররচনাই প্রধান বস্তু। চরকা বা অন্য যে কোনও শিল্পকেই আশ্রয় করা যাক না কেন, যদি এই দুই ব্যাপারে আমরা

সফল না হই, তা হ'লে সুতা কেটে গ্রামের চাষীকে আমরা শুধু অতিরিক্ত দু-চার আনা আয়ের পথই দেখাতে পারব, কিন্তু নূতন জীবনের রচনায় আমাদের চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যাবে।

গড়ার কাজও যে চরকাকে আশ্রয় ক'রেই হবে, অন্য উপায় নাই, তাও আমি মনে করি না। দেশ, কাল এবং পাত্র অনুসারে উপলক্ষ্যের ভেদ তো হবেই।

নিপীড়ত মানুষের মধ্যে পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতা সংগ্রামের ক্ষেত্রে সহজে আসে। শত্রুর বিরুদ্ধে অভিযানের সময়ে সৈনিকে সৈনিকে আত্মীয়তার বোধ বৃদ্ধি পায়। কিন্তু গড়ার কাজে যে আত্মীয়তার প্রয়োজন, সেটি স্বতন্ত্র বস্তু এবং তার জন্য চেষ্টাও গঠনকর্মের ক্ষেত্রেই করতে হবে।

এইখানে আপনার মতের সঙ্গে আমার মত মিলবে কি না জানি না।

এইবার অপর আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাক। আপনার আসল প্রশ্ন হ'ল, বর্তমান ভারতে গান্ধীবাদের ভবিষ্যৎ কি রকম? গভর্মেণ্ট গঠনকর্ম সম্পর্কে উৎসাহ সঞ্চার করতে পারবেন কি না? গান্ধীবাদীদের সম্পর্কেও আপনার জিজ্ঞাস্য, তাঁরা দেশে আন্দোলনের সৃষ্টি করতে শেষ পর্যন্ত সমর্থ হবেন কি না? অথবা ধর্মপালনের মত গান্ধীবাদকে গ্রহণ ক'রে আত্মতৃপ্তির উপায়ে তাকে পরিণত করবেন কি না?

এই সকল প্রশ্নের উত্তর আমার পক্ষে কিঞ্চিৎ সংশয়যুক্ত এবং অস্পষ্ট থেকে যাবে। আপনি সহজেই তার কারণ বুঝতে পারবেন।

ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি, গভর্মেণ্টের পরিচালকবর্গ যদি কয়েকটি মূল নীতিকে আশ্রয় না করেন এবং অবস্থাবিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে সেই মূলনীতি অনুযায়ী নূতন নূতন কর্মধারা উদ্ভাবনের বুদ্ধি ও কৌশল আয়ত্ত করতে না পারেন তবে, গান্ধীবাদ কেন, তাঁরা কোন মতবাদই প্রতিষ্ঠিত করতে পারবেন না। ঝড়ের সামনে শুকনো পাতার মত তাঁদের ইতস্তত উড়ে বেড়াতে হবে; পথের স্থিরতা

থাকবে না। ব্যক্তিগতভাবে আমি রাষ্ট্রশক্তিতে বিশ্বাসী, এবং গান্ধীবাদকে প্রতিষ্ঠিত করতে হ'লেও যে শেষ পর্যন্ত রাজধর্মের আশ্রয় নিতে হবে, এ কথাও মনে করি। গান্ধীজীও তাই মনে করতেন, এবং সেইজন্যই জাতিগঠনের কর্মকে সফল করার জন্য ব্যক্তিকেন্দ্রিক প্রচেষ্টামাত্র অবলম্বন না ক'রে রাষ্ট্রীয় সংগ্রামের দ্বারা রাজশক্তি আয়ত্ত করার পথে দেশকে চালিত করেছিলেন।

আজকের ভারতবর্ষে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণের মধ্যে গান্ধীবাদের মূলনীতি, অর্থাৎ বিকেন্দ্রীকরণ এবং জনসাধারণের উদ্বুদ্ধ শক্তির দ্বারা নবজীবন রচনার প্রয়াস, এ দুটির প্রতিই আস্থা কম। অথবা তাঁরা এই নীতি অনুযায়ী কাজ করার কৌশল এখনও আয়ত্ত করতে পারেন নি। কেননা, এতদিন তাঁরা গান্ধীজীর আওতায় থেকে সংগ্রাম করেছিলেন, তাঁদের স্বাধীন কর্মশক্তি সম্যক্ প্রস্ফুরিত হয় নি। নেতাদের মধ্যে শাসনের দায়িত্ব এবং সাময়িক সমস্যা এমন প্রবল আকার ধারণ করেছে যে দূরের লক্ষ্য তাঁদের কাছে অস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে, এমন কি সে লক্ষ্য মাঝে মাঝে অপ্রয়োজনীয় ব'লে মনে হচ্ছে।

তার ফলে পথ হারাবার সম্ভাবনাই বেশি হয়ে দাঁড়ায়।

মুক্তির উপায় সম্পর্কে এইটুকুমাত্র বলব যে, নাবিক যেমন ধ্রুবতারার প্রতি লক্ষ্য রেখে সমুদ্রে নৌকার গতি নিয়ন্ত্রণ করে, আমাদেরও তেমনই গান্ধীবাদের মৌলিক নীতিগুলির প্রতি দৃষ্টি অবিচল রেখে নৌকার হালকে পরিচালনা করতে হবে। ধ্রুবতারা বহুদূরের আকাশে রয়েছে ব'লে নাবিকের কাছে তুচ্ছ হয়ে যায় না; তার গতি ঐ—ঐ দূর নক্ষত্রের সঙ্গে সম্পর্কচ্যুত হ'লে নৌকা পথভ্রষ্ট হয়।

আপনার অপর প্রশ্ন হ'ল, ভারতে এমন কাকেও দেখা যাচ্ছে কি না যাদের সম্পর্কে আমরা আশা পোষণ করতে পারি? বিনোভা কুমারাপ্পা, অগরওয়াল, ধীরেন মজুমদার প্রভৃতির বিষয়ে আপনি জানতে চেয়েছেন। এঁদের কর্মপ্রচেষ্টার সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণের

প্রয়োজন নাই। যদি প্রয়োজন আদৌ অনুভব করেন, তা হ'লে ভবিষ্যতে সংক্ষেপে জানাব।

তবে এঁদের সম্পর্কে সমগ্রভাবে আমার দু-একটি কথা বলবার আছে। কুমারাপ্পা বা ধীরেনবাবুর সঙ্গে আলাপ বা আলোচনা আমার হয়েছে, অপর দুজনের সম্বন্ধে সে কথা বলতে পারি না। প্রথম দুজনের সম্পর্কে আমার মোটামুটি ধারণা যে, ওঁরা রাষ্ট্রশক্তি ব্যবহারের বিষয়ে, অথবা সমাজে রাজশক্তির স্থান অথবা গুরুত্ব সম্বন্ধে যেন অপেক্ষাকৃত উদাসীন। একেবারে উদাসীন নন; কিন্তু রাজশক্তিকে শেষ পর্যন্ত আশ্রয় ক'রেই যে গান্ধীজীর অর্থনীতিকে সফলতা লাভ করতে হবে, এটা যেন ঠিক দেখতে চাইছেন না। গান্ধীজী গঠনকর্ম করতেন, মনপ্রাণ সমর্পণ ক'রে। কিন্তু যে মুহূর্তে বর্তমান সমাজ রাষ্ট্র-শক্তি প্রয়োগের দ্বারা তাঁর গড়ার কাজকে পঙ্গু করার চেষ্টা করত, সেই মুহূর্তে তিনি সকল শক্তি প্রয়োগ ক'রে রাষ্ট্রক্ষেত্রে সংগ্রামে অবতীর্ণ হতেন। রাষ্ট্রশক্তি আয়ত্ত করার জন্য সুযোগ সন্ধান করতেন। এঁরা গান্ধীজীর এই দিকটিকে সম্যক গুরুত্ব দেন নি ব'লেই আমার বিশ্বাস।

আচার্য কৃপালানি কিন্তু এ বিষয়ে স্বতন্ত্র এবং গান্ধীবাদের সত্যকে আরও আয়ত্ত করেছেন ব'লে আমার বিশ্বাস। কিন্তু এঁদের মধ্যে কার কাজ গান্ধীবাদের প্রতিষ্ঠায় কতখানি সহায়ক হবে, সে বিষয়ে ব্যক্তিগত মতামত প্রকাশ করব না।

আমার নিজের কিন্তু মনে হয়, গান্ধীবাদের যে পরীক্ষা বিনোভা, কুমারাপ্পা অথবা ধীরেন মজুমদার মহাশয় স্ব-স্ব কর্মক্ষেত্রে করছেন, তার যেমন প্রয়োজনীয়তা আছে, তেমনই আজ ভারতে আর একটি বস্তুর আবশ্যকতা যেন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে।

গান্ধীবাদকে স্থায়ী করতে হ'লে, তাকে বুদ্ধির ক্ষেত্রে বর্তমানে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে হবে। সেখানকার ভিত্তি যদি কাঁচা থাকে, তবে সমগ্র অট্টালিকাই দুর্বল হয়ে থাকবে। ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি, বর্তমান জগতে, সব দিককার অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক

পরিস্থিতি বিবেচনা করলে গান্ধীজীর সত্যাগ্রহের যে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ আছে—এই রকম ধারণা জন্মায়। আমি তর্ক এবং যুক্তির পথে গান্ধীবাদকে আশ্রয় করেছি, ব্যক্তিগত জীবনে কঠোরতার অভ্যাসের দ্বারা সার্থকতার সন্ধানে নয়।

ভারতে যদি বুদ্ধির ক্ষেত্রে আমরা গান্ধীবাদকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারি, তা হ'লে শুধু যে বিনোভা বা কুমারাপ্পা প্রভৃতির কাজের পরিপূরণ করা হবে তা নয়, হয়তো গভর্মেণ্টের সহায়তায় নূতন আগ্রহের বন্যাও সৃজন করা সম্ভব হতে পারে। গভর্মেণ্ট যদি সে পথে চলতে প্রস্তুত না হন, এবং তার কারণ যদি কোনও পিছনের দিকের টান হয়, তখন ভবিষ্যতের ভাবনা ভবিষ্যতে ভাবা যাবে। বর্তমান সময়ে, যে সকল প্রবল সমস্যা দেশের সামনে উপস্থিত হয়েছে, সে সম্পর্কে গান্ধীনীতি অনুযায়ী জনসাধারণের কর্তব্যই বা কি এবং গভর্মেণ্টের পক্ষে করণীয়ই বা কি, সে সম্বন্ধে সুচিন্তিত নির্দেশের বড় অভাব। চিন্তা স্পষ্টতর হওয়া প্রয়োজন, কর্মকৌশল উদ্ভাবনের যোগ্যতাও আমাদের অর্জন করতে হবে। গান্ধীবাদ সম্পর্কে 'কর্মী'র অভাব নাই, যথার্থ 'জ্ঞানী'র সংখ্যাল্পতা ঘটেছে।

আজ এই পর্যন্ত। আশা করি শারীরিক কুশলে আছেন। নমস্কার নিবেদন। ইতি—

ভবদীয় নির্মলকুমার বসু

—

নীড়ের পাখি

নীড়ের স্নেহ মাখা
ঝিমিয়ে আছে পাখা
উড়তে হবে আকাশপথে
আসছে ভেসে ডাক।
আকাশচারী পাখি,
দু কান বন্ধ ক'রে থাক্‌।

লেকিন্

জনশ্রুতি আছে, ভারতবর্ষের কোনও প্রসিদ্ধ নেতা নাকি বেশির ভাগ কথাতেই শেষ পর্যন্ত ব'লে বসেন, "লেকিন্"; আর তা হ'লেই আপনি গিয়েছেন। একটা কথা আপনি তাঁকে অনেক ক'রে বোঝালেন, তিনি তাতে সায়ও দিলেন, বললেন, "ইয়ে তো ওয়াজিব বাত্, হোনা হী চাহিয়ে,—লেকিন্—"আর সেই লেকিন্-এর পর পর এমন কতগুলি বাধা বেরিয়ে এল যে আপনার যুক্তিতর্ক আশাভরসা সব গেল উড়ে, ওয়াজিব বাত্ কোথায় রইল প'ড়ে, শেষ পর্যন্ত জয়ী হ'ল ঐ ছোট্ট কথাটি, "লেকিন্"।

এই জনশ্রুতি যদি সত্য হয় তা হ'লে বুঝতে হবে ঐ জননেতা সত্যিসত্যিই আজকের ভারতবর্ষের নেতা। কারণ, এই বিরাট্ অজগর দেশে যখন সকলেরই মনে হচ্ছে যে কোনও জিনিসই চলছে না, তখন ভেবে দেখলে দেখা যাবে একমাত্র যা চলছে সে হ'ল ঐ "লেকিন্"। আমরা যুক্তিতর্ক বুদ্ধিবিবেচনা দিয়ে একটা জিনিস ঠিক করলাম, সব ঠিকঠাক, কিন্তু হঠাৎ ঈশানকোণে মেঘের মত একটি ছোট্ট "লেকিন্" কোথা থেকে উদয় হয়ে সব উড়িয়ে নিয়ে গেল। যেমন, ভারতবিভাগ তো আমরা চাই নি, শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত মনে করেছি—ভারতবিভাগ পাপ, লেকিন্ ওরা যখন অত ক'রে দাবি করল তখন পাকিস্তানে রাজী হতেই হ'ল। পাকিস্তান-হিন্দুস্থানে লোক-বদলাবদলি পাপ, তাতে আমরা কিছুতেই রাজী নই,—লেকিন্ দুই পঞ্জাবে যখন মারের চোটে বদলাবদলি হয়েই গেল তখন সেই কথা প্রকারান্তরে মেনে নিতেই হ'ল, সেইমত ব্যবস্থাও করতে হ'ল,—লেকিন্ তবু আমরা লোক-বদলাবদলি অর্থাৎ exchange of population করছি—এ কথা কিছুতেই স্বীকার করি নি। আমরা স্বাধীন হয়েছি, সাম্রাজ্যের মধ্যে নিশ্চয়ই থাকব না, লেকিন্ ইংলণ্ডের রাজাকে নামমাত্র মেনে নিতে দোষ কি? কাশ্মীর তো ভারতবর্ষের পুরোপুরি অংশ নিশ্চয়ই, তা না হ'লে আমাদের কাউন্সিল অফ স্টেটে তাদের প্রতিনিধি বসে কি ক'রে—লেকিন্

আমরা এদিকে গণভোটে কাশ্মীরের লোকদের ইচ্ছে ইত্যাদির কথা জগৎরঙ্গমঞ্চে এতবার বলেছি যে এখন তাদের আলাদা সর্দার-ই-রিয়াসৎ, আলাদা পতাকা আর মাত্র তিনটে বিষয়ে ভারতভুক্তিতে রাজী হওয়া ছাড়া উপায় কি? এখন অন্তত আর কারও মনে সংশয় নেই যে, পূর্ববঙ্গে সংখ্যালঘুদের সাহস ও সম্মানের সঙ্গে বাস করবার উপায় নেই. লেকিন্ ব্যস্তসমস্ত হয়ে রাগারাগি করাটা কিছু নয়, প্রেমের পথ ধ'রে চলাই ভাল। ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশগঠনের নীতি আমরা আলবৎ মানি, লেকিন্ এখন ওসব কথা তুলো না, তুললেই ধমক খাবে। আমরা ১৯৫১ সনের মার্চ মাসে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হব—এ কথাটা অনেক ভেবেচিন্তেই বলা হয়েছিল, লেকিন্ তখন এমন কতকগুলি জিনিস চোখে পড়ে নি যার ফলে শেষ পর্যন্ত ও-কথাটা আর খাটল না। বিনিয়ন্ত্রণই আমাদের নীতি, জাতির জনকও তাই বলেছিলেন, লেকিন্ আমরা যখন পাঁচ-শালা বন্দোবস্তে খাদ্য থেকে অন্য সব রকম নিয়ন্ত্রণেরই কিছু কিছু ব্যবস্থা রেখেছি তখন এখন নিয়ন্ত্রণ থাকবে বইকি। রফি সাহেব বোম্বায়ে অবশ্য বলেছিলেন যে, খাদ্যবিনিয়ন্ত্রণ করা হবে এবং সে কথায় মন্ত্রীসভার মত আছে, লেকিন্ রফি সাহেব তখন একটা কথা বলতে ভুলে গিয়েছিলেন যে, সে খাদ্যটা ভাল খাদ্য নয়, জোয়ার বাজ্‌রা এবং অন্যান্য মোটা খাদ্য, অর্থাৎ যাকে অর্বাচীন লোকেরা না বুঝে ব'লে থাকে—অখাদ্য। এইভাবে যখন সাধারণ লোকে মনে করে যে, আজকের অচল আবহাওয়ায় কিছুই চলছে না তখন দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন লোকেরা দেখতে পাবেন সত্যি ক'রে যা চলছে তা হ'ল ঐ "লেকিন্"।

যাঁদের সব বিষয়েই চট্ ক'রে মাথা ঘামাবার অভ্যাস আছে তাঁরা এই কথা শুনে নিশ্চয়ই ভাবতে ব'সে যাবেন। লেকিন্ আমি তাঁদের বলি চিন্তয়া অলম্। তাঁরা আমমোক্তারনামা না দেওয়া সত্ত্বেও আমি এ বিষয়টায় এতকাল ভেবে খুব পাকাপাকি রকম কিছু ঠাওর করতে পারলাম না, আর তাঁরা হঠাৎ ভাবতে শুরু ক'রে এর কী-ই বা কূলকিনারা করবেন—বলা বাহুল্য, এমন কথা ঘুণাক্ষরেও মনে আনছি

না। কারণ, চেষ্টা করলে বোধ হয় সবাই সব বিষয়েই যা হোক একটা সিদ্ধান্ত খাড়া করতে পারে—অন্তত আগে আই-সি-এস এবং এখন রাজনৈতিক নেতাদের কথাবার্তা শুনে সেইরকমই মনে হয়—আর, তা ছাড়া খুব পাকাপাকি না হোক, মোটামুটি একটা সিদ্ধান্ত আমি করেছি, যা সর্বসমক্ষে পেশ করবার জন্যেই এ প্রসঙ্গের অবতারণা। আমার নিষেধের আসল কারণ হচ্ছে, মিছিমিছি সব সময়েই বেশি ভাবলে শেষকালে ঐ লেকিন্-এর পাল্লায় প'ড়ে যেতে হয়। যে কোনও কাজই করতে যাই না কেন, মনে হবে—লেকিন্ এ কথাটার অন্য একটা দিকও আছে। এইভাবে আমরা কেবল লেকিন্-এর গোলকধাঁধায় ঘুরপাক খেতে থাকব, কাজের সিধে পথে অগ্রসর হতে পারব না। এমনিতেই তো বাঙালী কেবলই কর্মহীন চিন্তা আর বাক্যে তর্ক করে, যে তার্কিকতাকে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—নিষ্কর্মা বুদ্ধির নিষ্ফল শৌখিনতামাত্র। ওরই মধ্যে তবু যে দু-চারজন কাজ করে তাদের চিন্তাবিহীন কাজও যেমন করতে বলছি না তেমনি তারা যদি আবার পুরোপুরি কাজবিহীন চিন্তার জালেই আটকে যায় তা হ'লে আমাদের অবস্থা আরও সঙ্গীন হবে।

এইবার এ বিষয়ে আমার সিদ্ধান্তটা পেশ করি। ভূগোলশাস্ত্রীরা ব'লে থাকেন, প্রস্তরযুগ তাম্রযুগ লৌহযুগ এইরকম পর পর যুগ আছে। মানবশাস্ত্রীরা ব'লে থাকেন, মর্কটত্ব থেকে ক্রমে জাভা, পিকিং, ক্রোম্যাগনন, পিল্টডাউন, নিয়াণ্ডারথাল প্রভৃতি বিভিন্ন মানুষের যুগ পার হয়ে আমরা এইরকম মানবত্ব প্রাপ্ত হয়েছি। সমাজশাস্ত্রীরা বলেন, সমাজবিবর্তনেরও যুগ আছে; কেউ বা বলেন থীসিস-অ্যান্টিথীসিস-সিন্থিসিসের তেতালায় প্যাস্টোরাল-ফিউডল-বুর্জোয়া-সমাজতান্ত্রিক পথে সমাজ চলছে। সাহিত্যশাস্ত্রীরা ক্লাসিসিজ্‌ম্ আর রোমান্টিসিজ্‌মের দ্বন্দ্ব ইত্যাদি কতরকম দ্বন্দ্ব নিয়ে তর্কবিতর্ক করতে থাকেন। আমি ভেবে ভেবে দেখেছি যে, ওসব আসলে কিছুই নয়, তার চেয়ে ঢের গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হ'ল লেকিন্ এবং অ-লেকিনের দ্বন্দ্ব।

সমাজ ও মনোজগতের বিবর্তনে একটা যুগ হ'ল লেকিন্-এর যুগ, আর একটা যুগ হ'ল অ-লেকিনের যুগ। এই লেকিন্-অলেকিনের দ্বন্দ্বতালেই সামাজিক মনোজগৎ বিবর্তিত হচ্ছে।

কথাটা আরও একটু খুলে বলি। ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, এক-একটা যুগ এমন আসে যে সময় মানুষ এক দৌড়ে কাজ ক'রে যায়, ভাল-মন্দ দ্বিধা-দ্বন্দ্ব নিয়ে বেশি মাথা ঘামায় না। যেমন ইংলণ্ডের ইতিহাসে এলিজাবেথীয় বা তার কাছাকাছি যুগ। সে সময় নৌ-সেনাধ্যক্ষেরা স্বচ্ছন্দে বোম্বেটেগিরি করতেন, লুটপাট করতেন, এ সবে তাঁদের কোন দ্বিধাসংকোচ ছিল না। যে সময় ইংরেজের সাম্রাজ্য গ'ড়ে উঠেছিল, সে সময় বেশ অনায়াসে পর পর অপর দেশ দখল করতে কোনও সংকোচ কারও মনে জাগে নি। প্রত্যেক দেশেই এক এক সময় একটা কেজো যুগ আসে, যে সময় লোকে একবগ্‌গা ভাবে কাজ ক'রে যায়, সে ভাল কাজই হোক বা মন্দ কাজই হোক। আমাদের দেশের কথাই ধরুন না কেন। গান্ধীজী আমাদের দেশময় একটা ভয়ানক রকম উলটপালট লাগিয়ে দিতে পেরেছিলেন, তার কারণ হচ্ছে দুটি। প্রথমত, কোন্ পথে দৌড় মারলে দেশ উথাল হয়ে উঠবে তা বুঝতে তাঁর চেয়ে বেশি দক্ষ কেউ ছিল না। দ্বিতীয়ত, তিনি অনেক ভেবে-চিন্তে লেকিন্-এর পাল্লা কাটিয়ে একবার যখন একটা পথ স্থির ক'রে ফেলতেন, তখন সেই পথে নিতান্ত একবগ্‌গা ভাবে একরোখা দৌড় মারতেন, দৌড়তে দৌড়তে আর দশ রকম লেকিন্-এর কথা ভাবতেন না। তা না হ'লে এই বিংশ শতাব্দীতে চরকা নিয়ে দাঁড়াতে সাহস করে কেউ? টটেনহ্যামের পুস্তিকা যদি বিশ্বাসযোগ্য হয়, তা হ'লে বুঝতে হবে যে কুইট-ইণ্ডিয়া প্রস্তাব গ্রহণের সময় পণ্ডিত নেহরু নানারকম দ্বিধায় খণ্ডিত ছিলেন—ভাবছিলেন যে, ওই রকম প্রস্তাবের ফলে ফ্যাসিবাদের সহায়তা করা হবে কি না। কিন্তু গান্ধীজীর এত সব লেকিন্ ছিল না। ইংরেজ চ'লে যাওয়া দরকার—যেই এ সিদ্ধান্ত গান্ধীজী করলেন, অমনই তিনি

ইট-ইণ্ডিয়া প্রস্তাবের সোজা পথে চোঁ-চাঁ দৌড় মারলেন, যে পথে
জোর রকম লেকিন্ বার বার হেয়ারপিন বাঁক সৃষ্টি করে নি।

কিন্তু তেমনি আরও এক এক সময় দেখা যায় যে, এই রকম কাজের
বৃত্তি ও উৎসাহের বদলে কেবল দ্বিধাদ্বন্দ্ব চিন্তাভাবনাই কাজের চেয়ে
ড় হয়ে ওঠে, লেকিন্-এর প্রাদুর্ভাবের পরাকাষ্ঠা। যেমন এখন
ারতবর্ষের অধিকাংশ ক্ষেত্রে ঘটছে। দু-চার ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম
াছে, সে কথা পরে বলব, কিন্তু আজ ভারতবর্ষের ব্যাপকক্ষেত্রে যা
িত্যি সত্যি চলছে তা হ'ল ঐ লেকিন্। মনোজগৎ থেকে বাস্তবজগৎ
এই লেকিন্ এ দারুণ রকম ছেয়ে গেছে। যে কোনও চিন্তাশীল লোক
একটু ভাবলেই এ কথাটা বুঝতে পারবেন। আমি শুধু দুটি উদাহরণ
পেশ করছি, একটি কল্পনাজগৎ থেকে, একটি বাস্তব জগৎ থেকে।
কল্পনাজগতে অর্থাৎ সাহিত্যজগতে এইরকম লেকিন্-এর একটি চরম
উদাহরণ হ'ল 'ঘরে-বাইরে'র নিখিলেশ। সন্দীপ লোকটা বেশ
জোরালো, লেকিন্-এর পাল্লায় বেশি পড়ে না, যেটুকু বা পড়ে
সেটুকুকে সে নিজের দুর্বলতা ব'লেই মনে করে—যেমন, বিমলাকে
আরও তাড়াতাড়ি জোর ক'রে দখল করবার চেষ্টা না করা। সে
তুলনায় নিখিলেশ লোকটা ভাল,—খুবই ভাল, কিন্তু এতই ভাল
যে একেবারে কাজের বাইরে। সব কথাতেই তার একটা লেকিন্
আছে—সেই লেকিন্-এর প্যাঁচে-প্যাঁচেই বেচারা একেবারে নিঃশেষ
হয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত এমনই ঘটল যে, সে নিজের স্ত্রীকেই স্বেচ্ছায়
ব'লে এল "আমি তোমায় ছুটি দিলাম"; অথচ সেই সঙ্গে মনে মনে
ভাবলও যে, এটা তার ঔদার্যও নয়, ঔদাসীন্যও নয়, ছাড়তে না পারলে
সে ছাড়া পাবে না। সে কেবলই লেকিনের প্যাঁচে-প্যাঁচে খণ্ডিত,
এমনই খণ্ডিত যে তার স্ত্রী সক্ষোভে ভাবত, তার স্বামীর যদি আর
একটু মন্দ হবার তেজ থাকত!

আজকের বাস্তব জগতে এই রকম লেকিন্-এর একটা চরম উদাহরণ
স্বয়ং পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু। কথাটা শুনে হয়তো অনেকেই চ'টে

যাবেন এবং মনে মনে ভাববেন, এ কথাটার প্রমাণ কি? প্রমাণ নিশ্চয়ই আছে এবং সে প্রমাণ অনুমানসাপেক্ষও নয়, যুক্তিতর্ক দিয়ে বোঝাতেও হবে না, সে প্রমাণ একেবারে তাঁর নিজস্ব কবলুতি। পণ্ডিতজীর দারুণ শত্রুও স্বীকার করবেন যে, বিদ্যায়-বুদ্ধিতে, বলতে-কইতে-লিখতে, দেশপ্রেমে ত্যাগে মহত্ত্বে ঔদার্যে মানসিক সুকুমারতায় এমন উজ্জ্বল চরিত্র এখনকার ভারতবর্ষে আর চোখে পড়ে না। কিন্তু এত অসাধারণরকম ভাল হবার ফলে ভদ্রলোকের কি রকম বিপদ হয়—সে কথা তিনি নিজেই বার বার তাঁর আত্মজীবনীতে এবং অন্যান্য রচনায় স্পষ্টভাষায় কবুল করেছেন। যখনই কোনও বড় প্রশ্ন এসেছে তখনই তিনি মনে মনে তাঁর সহকর্মীদের সঙ্গে সায় দিতে পারেন নি, এমন কি গান্ধীজীর সঙ্গেও নয়, হাজার রকম দ্বিধাদ্বন্দ্ব তাঁর মনকে আকুল করেছে। লেকিন্, এত সব ভেবে-টেবে শেষ পর্যন্ত তিনি চুপ মেরে গিয়েছেন প্রত্যেকবারই, মেনে নিয়েছেন নিরীহ ভালমানুষের মত অন্যদের কথা। সহকর্মীদের কথায় তাঁর মন যেমন সত্যি সত্যি সায় দেয় নি, সহস্র লেকিন্ তাঁর মনে জেগেছে, তেমনি অপর দিকে সংহতি আনুগত্য ও হাজার রকম লেকিন্-এর পারস্পরিক সংঘাতের ফলে তিনি শেষ পর্যন্ত আর নতুন কিছুই করলেন না। ১৯৩৩ সনের মে মাসে হরিজনদের অধিকার নিয়ে গান্ধীজী উপবাস আরম্ভ করলেন, নেহরু জেলে ব'সে তাই শুনে ক্ষোভে দুঃখে ভাবতে লাগলেন—এ হ'ল sheer revivalism, এমন ক'রে কি ক'রে দেশ চলবে?[১] গান্ধীজীকে দরকারমত সমালোচনা করা খুব উচিত—এ কথা তিনি মনে মনে

১। Nehru: Autobiography, p. 373 দ্রষ্টব্য। তিনি লিখছেন—"Again I watched the emotional upheaval of the country during the fast, and I wondered more and more if this was the right method in politics. It seemed to be sheer revivalism, and clear thinking had not a ghost of a chance against it.—Gandhiji did not encourage others to think,...I felt that I was drifting further and further away from him mentally, in spite of my strong emotional attachment to him."

ভাবতেন[২] কিন্তু কাজের বেলায় তা করতে পারতেন না। শেষ পর্যন্ত দ্বিধা এতই প্রবল হয়ে দাঁড়াল যে তিনি ভাবতে লাগলেন, তাঁর পক্ষে ওয়ার্কিং কমিটিতে থাকা আর সম্ভব কি না। ভাগ্যে তাঁকে ঠিক সেই সময় আবার জেলে যেতে হ'ল, তাই এই সমস্যা সমাধানের দায় থেকে তিনি বেঁচে গেলেন।[৩] আবার কিছুকাল পরে নেহরু যখন আলিপুর জেলে তখন তিনি শুনলেন যে, গান্ধীজী অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার করেছেন। শুনেই তাঁর এমন মন খারাপ হয়ে গেল যে, তিনি ভাবলেন গান্ধীজীর সঙ্গে এর পর আর একেবারেই চলবে না, এবার থেকে একলা চলো রে।[৪] লেকিন্ কাজের বেলায় শেষ পর্যন্ত এসব কিছুই

২। ঐ, ৪০৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। নেহেরু লিখছেন, "I think it is right that we should encourage honest criticism, and have as much public discussion of our problems as possible. It is unfortunate that Gandhiji's dominating position has to some extent prevented this discussion. There was always a tendency to rely on him and to leave the decision to him. This is obviously wrong, and the nation can only advance by reasoned acceptance of objectives and methods, and a co-operation and discipline based on them and not on blind obedience. No one, however great he may be, should be above criticism."

৩। ঐ, ৪৭৮ পৃ.। তিনি লিখছেন, "How very different was his [Gandhiji's] outlook from mine, I thought again, and I wondered how far I could co-operate with him in future. Must I continue to remain in the Working Commitee? There was no way out just then, and a few weeks later the question became irrelevant because of my return to prison."

৪। ঐ, ৫০৬-৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। "With a stab of pain I felt that the chords of allegiance that had bound me to him [Gandhiji] for many years had snapped. For long a mental tussle was going on within me. I had not understood or appreciated much that Gandhiji had done.... Gandhiji had stated that there were temperamental differences between us. They were perhaps more than temperamental, and I realised that I held clear and definite views about many matters which were opposed to his. And yet in the past I had tried to subordinate them, as far as I could, to what I conceived to be the larger loyalty....Somehow I managed to compromise. Perhaps I did wrong, for it can never be right for any one to let go of that anchor [of spiritual faith]. But in the conflict of ideals I clung to my loyalty to my colleagues."

হয় নি। বস্তুত, নেহরু স্পষ্টতই বলছেন যে, তাঁর সহকর্মীদের সঙ্গে তাঁর মানসিক মিল নেই. লেকিন্ কি করা যায়! এইরকম লেকিন্-এর পাকে পাকে হোঁচট খেতে খেতে তাঁর মানসিক যাত্রা চলেছে—এ কথা তাঁর আত্মজীবনীর ছত্রে ছত্রে স্পষ্ট হয়ে আছে, পরেকার রচনাতেও যথেষ্ট আছে, তাঁর বক্তৃতায় ও কর্মধারার মধ্যেও তা পরিস্ফুট। তাঁর বহু বক্তৃতা পাওয়া যাবে যার মধ্যে প্রবল বিশ্বাস থেকে উদ্ভূত কোনও একটি বাণী তিনি জনসাধারণকে দেন নি, বরং তাঁর মনে যে সব লেকিন্-এর প্যাঁচ চলেছে সেগুলিরই সর্বসমক্ষে আলোচনা করেছেন মাত্র।

এই যে নিখিলেশ থেকে নেহরু পর্যন্ত লেকিন্-এর জয়যাত্রা, এ কি আকস্মিক? ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য অনুসারে মানসিক গঠনের তারতম্য তো হয়ই, কিন্তু যখন কোনও সময় এইরকম চরিত্রেরই প্রাদুর্ভাব দেখি তখন ব্যক্তিক বিশেষত্বের পিছনেও একটা বৃহত্তর কারণ খুঁজতে হয়। আর বাস্তবিক সেরকম কারণ আছেও। যখন একটা যুগের ঢেউ ভাটার টানে নিঃশেষ হয়ে যায়, অথচ নতুন জোয়ার আসে না তখনই জল ঘুলিয়ে ঘুলিয়ে ওঠে। আমাদের সমাজের কাঠামোটা কেবলই ফেটে চৌচির হচ্ছে, অথচ নতুন কাঠামো গ'ড়ে উঠছে না, সে অবস্থায় কেবলই সন্দেহ দ্বিধা দ্বন্দ্ব ছাড়া কি থাকবে? যারা খারাপ লোক অথবা যারা বেশি চিন্তা করবার বালাই রাখে না, তারা এই সময় হয়তো যে কোনও একটা কথাকে অন্ধবিশ্বাসে আঁকড়ে তার জন্যে খুন-খারাপিও করতে পারে। কিন্তু যারা ভাবে, নানা নীতির দ্বন্দ্ব যাদের মনে আছে, তাদের মনে সেই দ্বন্দ্বগুলিই কেবল প্রবল হতে থাকে। কারণ শুধু যে সমাজের ঘাতপ্রতিঘাতের জোর বেড়ে যাওয়ায় এই সব দ্বিধাদ্বন্দ্বে শান পড়ে তাই নয়, অন্য সময় সমাজের প্রচলিত আদর্শের আশ্রয়ে থাকলেই মোটামুটি যে নিশ্চিন্তি এবং দ্বিধাদ্বন্দ্বের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যেত তা আর এখন পাওয়া যায় না, কেননা সেই সব আদর্শের সার্থকতা নিয়েই তো তর্ক।

এইরকম যুগের সম্বন্ধেই কবি ইয়েট্স্ লিখেছিলেন :—

> Things fall apart ; the centre connot hold ;
> Mere anarchy is loosed upon the world,
> The blood-dimmed tide is loosed, and everywhere
> The ceremony of Innocence is drowned ;
> The best lack all conviction while the worst
> Are full of passionate intensity.
>
> —W. B. Yeats : The Second Coming

এখন একটা সেইরকম যুগ এসে পড়েছে। এই রকম সময়ে শুধু যে innocence নামক বস্তুটিরই massacre হয়, অথবা সকল ভদ্রলোকই চাপাচাকা মেরে খারাপ লোকদের তারস্বরে চীৎকার চুপ ক'রে শুনতে থাকেন তাই নয়, তার চেয়ে আরও কতকগুলি মারাত্মক জিনিসও ঘটে। তার মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক জিনিস হ'ল, ঐ নিরীহ গোবেচারা ভদ্রলোকেরা নিজেদের অবস্থার প্রকৃত রূপটা বুঝতে না পেরে সেইটেকেই একটা গালভরা দার্শনিক নাম দিয়ে বেশ মনের আনন্দে কালযাপন করেন। যদি তাঁরা বুঝতে পারতেন যে, খারাপ লোকদের চীৎকারের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার তাঁদের শক্তি নেই, তা হ'লে বরং আশ্বাসের কথা হ'ত। তাঁদের সমাজ ফেটে চৌচির হয়ে গিয়েছে এবং তার আর কোনও শক্তি নেই, অথচ নতুন সমাজ গড়বার ক্ষমতাও তাঁদের নেই, কোনও প্রবল বাণী তাঁদের মনে জোয়ার আনে নি, অতএব ফাটা সমাজকে অতিক্রম ক'রে নতুন সমাজ গড়বার ক্ষমতা ও সাহস তাঁদের নেই, এ কথাটাও যদি তাঁরা স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করতেন তা হ'লেও চলত। তাঁরা কিছু করতে পারুন আর নাই পারুন, অন্তত ইতিহাসের স্বরূপটা উপলব্ধি করবার মত স্পষ্ট দৃষ্টি তাঁদের থাকলেও কতকটা আশার কথা হ'ত। কিন্তু মুশকিলের কথা হ'ল, সেটুকু স্পষ্টদৃষ্টিও তাঁদের যায় উড়ে, ফলে তাঁরা যা করছেন অথবা করছেন না সেইটেকেই বেশ একটা দার্শনিকতার আবরণ দিয়ে মনের আনন্দে নিশ্চিন্তে ব'সে থাকতে কোনও অসুবিধা হয় না। সেইজন্য

এরকম একটা মানসিক অবস্থাতেই আমরা, বীরবলের ভাষায়, জড়তাকে বলি সাত্ত্বিকতা, আলস্যকে বলি ঔদাস্য, শ্মশানবৈরাগ্যকে বলি ভূমানন্দ, উপবাসকে বলি উৎসব, নিষ্কর্মাকে বলি নিষ্ক্রিয়। সেই সময়ই আমরা কাপুরুষতাকে বলি নন্‌-ভায়োলেন্স, ভয় পেয়ে চুপ ক'রে যাওয়াকে বলি প্রীতি ও প্রেম, অন্যায়ের প্রতিকারে অক্ষমতাকে বলি ক্ষমা, দুর্বলতাকে বলি ঔদার্য, যোগক্ষেমের অসামর্থ্যকে বলি ত্যাগ। এইরকম সময়েই কেবলই দোহাই পাড়া হয় সেই মহাপুরুষদের, যাঁদের সত্যিকারের সবল দর্শনকে একটু মোচড় দিলেই বেশ মিঠে মিঠে বুলি পাওয়া যায় এবং ঐরকম সাত্ত্বিকতা ঔদাস্য নিষ্ক্রিয়তা ক্ষমা ঔদার্য ও ত্যাগের যেন বেশ একটা সমর্থন মেলে। এর প্রকৃষ্টতম উদাহরণ হচ্ছে এ যুগে বুদ্ধ ও শ্রীচৈতন্যের নামে লোক আগের চেয়ে বেশি উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে এবং গান্ধীর নামে এত বেশি দোহাই পাড়ে, যদিচ আসল কাজের বেলায় তাঁর মোটেই অনুসরণ করে না। আজকাল এত যে বুদ্ধ-পূর্ণিমা বুদ্ধ-উৎসব ইত্যাদির প্রসার হচ্ছে, কীর্তনের ছড়াছড়ি যাচ্ছে সমাজের উপরস্তরেও, এর অন্তর্নিহিত গূঢ় কারণ খুঁজতে হ'লে লেকিন্‌-এর তত্ত্বে পৌঁছতে হয়। অতএব আমার মোদ্দা কথাটা হ'ল, আমরা যখন লেকিন্‌-এর পাল্লায় পড়েছি, তখন প্রথমেই ঐ সব সাত্ত্বিকতা ক্ষমা ত্যাগ ঔদার্য প্রভৃতি কথাগুলোর ঠিক ঠিক মানে বুঝবার চেষ্টা করা আমাদের কর্তব্য।

আর দ্বিতীয়ত, ভেবেচিন্তে এই লেকিন্‌-এর প্যাঁচ থেকে উদ্ধার পেয়ে কাজের সিধে সড়কে নেমে পড়া উচিত—যে সিধে সড়ক এখনকার গোলকধাঁধা থেকে মুক্তি পেয়ে নতুন কর্মদীপ্ত সুস্থ সমাজে পৌঁছে দেবে। তা না হ'লে আজকের ভারতবর্ষে মুক্তির আশা নেই। লেকিন্‌ সেদিকে চেষ্টা কি আমরা সত্যিই করব? অর্থাৎ এখনকার বেশ কাজবিহীন চিন্তার রঙিন জালবোনা ছেড়ে আমরা কি সত্যই সুচিন্তিত কাজে নামতে পারব?

শ্রীভীষ্মদেব খোশনবিস

মহাস্থবির জাতক

দুই

পরের দিন দুপুর নাগাদ এলাহাবাদে গিয়ে পৌঁছনো গেল। স্টেশন থেকেই টাঙ্গা ক'রে ছুটলুম সঙ্গম দর্শন করতে। সেখানে গিয়ে নৌকা ক'রে সঙ্গমে গিয়ে মাথায় জল দিয়ে ফিরে কেল্লার মধ্যে অক্ষয়বট ইত্যাদি দেখে বাজারে যাওয়া গেল। আমরা তিনজনেই একবস্ত্রে বেরিয়েছিলুম। জনার্দন বাড়ি থেকে আসবার সময় খানিকটা গাওয়া ঘি এনেছিল। কি জানি কি মনে ক'রে সেই বোতলটা সে সঙ্গে নিয়েছিল। আর কিছুই আমাদের সঙ্গে ছিল না। বাজার থেকে তিনজনের জন্য তিনখানা ধুতি ও একখানা লাল কম্বল কেনা গেল।

কাপড়ের দোকানে নানা রকমের কাপড় ও কম্বল দেখতে দেখতে প্রায় সন্ধ্যে হয়ে এসেছে, এমন সময় বাজারের মধ্যে একটা সোরগোল প'ড়ে গেল—মারো, মারো, পালাও ইত্যাদি। দেখলুম, লোকজন সব ঠিকরে ঠিকরে পালাচ্ছে! কি ব্যাপার! দোকান থেকে বেরিয়ে দেখা গেল, তিনজন গোরা সৈনিকের সঙ্গে মেওয়াওয়ালাদের মারপিট বেধেছে। এক পক্ষে তারা তিনজন, আর অন্য পক্ষে বাজারের দোকানদারেরা এবং যারা বাজার করতে এসেছে তাদের মধ্যে অতি সাহসী যারা, তারা। দোকানদারেরা গোরাদের লক্ষ্য ক'রে ইট-বাটখারা প্রভৃতি ছুঁড়ছে, আর তারা এক-একদিকে তাড়া ক'রে যাচ্ছে, আর হৈ-হৈ ক'রে দিগ্বিদিকে লোক ছুটছে। আমরা যে দোকানে জিনিসপত্র কিনছিলুম, সেখানেও হুড়মুড় ক'রে লোক ঢুকতে লাগল। দোকানী ছিল ভয়তরাসে লোক, সে ব্যাপার সুবিধের নয় দেখে বাইরের লোকদের তাড়িয়ে দিয়ে একটা দরজা বন্ধ ক'রে দিলে। এদিকে গোরারা ছুটতে ছুটতে সেই দোকানের সামনে এসে দাঁড়াল। তাদের মাথার টুপি উড়ে গেছে, পেন্টুলান জামা ছিঁড়ে ফর্দাফাঁই। মুখ, মাথা ও দেহের অনেক জায়গা দিয়ে রক্ত ছুটছে—সে এক ভয়াবহ দৃশ্য।

আমরা ভয় পেয়ে দোকানের মধ্যে ঢুকতে যাচ্ছি, এমন সময় দোকানদার আমাদের ঠেলে বার ক'রে দিয়ে দরজায় তালা লাগাতে আরম্ভ ক'রে দিলে।। সুকান্তর বগলে সওদা, আমার কাছে ছিল টাকা। পাঁচ টাকা না সাড়ে পাঁচ টাকা জিনিসের দর হয়েছিল। সিকি দুয়ানি গুনছি—এর সঙ্গে দুটো কোঁড়ামারা সিকি ভিড়িয়ে দেব কি না ভাবছি, এমন সময় গোরারা একটা চলতি টাঙ্গা থামিয়ে তাতে উঠে পড়ল। টাঙ্গাওয়ালার সঙ্গে তাদের কথাবার্তা চলছে, এমন সময় একটা রোগাপানা লোক পাশের সরু গলি থেকে বেরিয়ে এসে টাঙ্গার পেছনে যে দুজন গোরা ব'সে ছিল তাদের একজনের পেটে ধাঁ ক'রে ছোরা বসিয়ে দিয়েই কোথায় পালিয়ে গেল—রক্ত একেবারে ফিন্‌কি দিয়ে বেরুতে লাগল। ব্যস্‌! টাঙ্গাওয়ালাকে আর নির্দেশ দিতে হ'ল না যে, কোথায় যেতে হবে। সে উর্ধ্বশ্বাসে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলে, খুব সম্ভব হাসপাতালের দিকে।

ব্যাপারটা এতই অভাবনীয় যে, প্রথমটা আমরা হকচকিয়ে গিয়েছিলুম; কিন্তু তখুনি সম্বিৎ ফিরে আসতেই মনে হ'ল এখানে দাঁড়ানো আর কর্তব্য নয়। চারিদিকে একবার চেয়ে দেখলুম, মুহূর্তকাল পূর্বে যেখানে বাজার ছিল তা এখন মরুভূমির মতন নির্জন। সমস্ত দোকানপাট বন্ধ। আমাদের কাপড়ওয়ালারও কোনও উদ্দেশ নেই। তার অনুসন্ধানে আর বৃথা কালবিলম্ব না ক'রে জিনিসগুলি সঙ্গমস্নানের পুণ্যে লাভ হয়েছে মনে ক'রে তৎক্ষণাৎ সেখান থেকে স'রে পড়লুম।

স্টেশনের যাত্রীশালায় লাল কম্বল পেতে তারই ওপরে রাত্রি যাপন করা গেল। পরদিন সকালবেলা খসরুবাগ দেখলুম। আমি এর পরেও অনেকবার খসরুবাগে গিয়েছি, কিন্তু সেবারে সেখানে যে ফুলের বাহার দেখেছিলুম তা আর কখনও দেখি নি। সেখানকার সমস্ত জমিতে অসংখ্য রঙের মৌশুমী ফুল ফুটে বাগানটাকে একেবারে আলো ক'রে ছিল। এর পরে এলাহাবাদ গেলেই ফুলের লোভে

লোভে খসরুবাগ দেখতে গিয়েছি, কিন্তু সে রকমটি আর দেখি নি। সেই ফুলের রঙ অল্পবয়সে আমার মনে এমন রঙ ধরিয়ে দিয়েছে যে, আজও ট্রেনে ক'রে কোথাও যেতে যদি পথে এলাহাবাদ স্টেশন পড়ে তো ধাঁ ক'রে তার সঙ্গে সেই প্রথম পরিচয়ের কথা মনে প'ড়ে যায়।

যা হোক, সেদিনটা সারা দিনই খসরুবাগে কাটিয়ে দিলুম। কখনও বা বাগানে শুয়ে, কখনও বা খসরুর সমাধিতে। সমস্তক্ষণটাই যে ভয়ে ভয়ে কাটল তা বলাই বাহুল্য। পরোক্ষে ডবল অপরাধী হয়ে আছি—প্রথম, গোরাকে ছুরি মারা দেখা—রাজার জাতকে মারতে দেখাও সে সময়ে অপরাধ ছিল কিনা। দ্বিতীয়ত, দোকানদার দাম না নিয়ে পালিয়েছে, সেও দেখতে পেলে হাঙ্গামা বাধাতে পারে। কিন্তু সঙ্গমস্নান ও অক্ষয়বটবৃক্ষ দর্শনের পুণ্যে সে সব কিছুই হ'ল না। আমরা নিরাপদে রাত্রি দশটা নাগাদ একখানা দিল্লীযাত্রী ট্রেনে সওয়ার হলুম।

আমার জীবনদেবতা মাঝে মাঝে অসময়ে যবনিকাপাতের ঘণ্টা বাজিয়ে যে রসিকতা ক'রে থাকেন, তার ইঙ্গিত ইতিপূর্বে দিয়েছি। এবারেও কোথাও কিছু না, অতর্কিতে সেই ঘণ্টা বাজিয়ে তিনি একটু মজা ক'রে নিলেন। আমাদের কাছে আগ্রা ফোর্টের টিকিট ছিল। বেলা সাড়ে নটা কি দশটার সময় টুণ্ডলা জংশনে গাড়ি পৌঁছবার কথা। সেখানে নেমে অন্য গাড়ি চ'ড়ে আগ্রায় যেতে হবে। কিন্তু আর একটু হ'লে তার অনেক আগেই আমাকে আগ্রার চাইতে অনেক দূরে যে পাড়ি জমাতে হ'ত, সেই ঘটনাটা মনের পর্দায় উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠছে।

রাত্রিবেলা এলাহাবাদ স্টেশনে যখন ট্রেনে চড়ি, তখন সে কামরায় ভিড় মোটেই ছিল না। বড় কামরা, দু-তিনজন লোক এখানে সেখানে প'ড়ে আছে দেখেছিলুম। আমি জানলার ধারে একটা লম্বা বেঞ্চিতে শুয়ে পড়েছিলুম। ভোর হয়ে যাবার কিছু পরে, ঘুম ভেঙে গেলেও শুয়ে শুয়ে আলস্য কাটাচ্ছি, হঠাৎ এক হাত লম্বা ও আধ হাত চওড়া একজোড়া শ্রীচরণ আমার বুকের ওপর এসে পড়ল। জোরে পা

দুখানা বুক থেকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে ধড়মড় ক'রে উঠে বসলুম। দেখি, একটা লোক খুব লম্বা ও চওড়া হাড়ে-মাসে গঠিত দেহ, দেখলেই মনে হয় খুব শক্তিশালী—সামনের বেঞ্চিতে ব'সে ট্যারা চোখে রাগান্বিত ভাবে আমার দিকে চেয়ে রয়েছে। কে এই ব্যক্তি। আমার প্রতি তার এই উষ্মার কারণই বা কি? এ সব ভাবতে বোধ হয় মিনিট খানেক সময় লেগেছিল। ইতিমধ্যে সুকান্ত অন্য জায়গা থেকে উঠে এসে তাকে বলতে লাগল, তুমি তো আচ্ছা লোক! মানুষ শুয়ে আছে তার বুকে পা তুলে দাও!

কামরার মধ্যে তখন অনেক লোক, তাদের মধ্যে অনেকেই সেই লোকটাকে যাচ্ছেতাই ক'রে গালাগালি দিতে লাগল। কিন্তু সে কারুর কথার প্রতিবাদ করলে না, এমন কি কারুর দিকে ফিরে চাইলেও না। শুধু কটমট ক'রে সেই ট্যারা চোখে আমার দিকে চেয়ে রইল। কিছুক্ষণ সেই ভাবেই কাটাবার পর সে আবার সেই ডোঙার মত পা দুখানা আমার বেঞ্চির ওপর তুলে দিলে, এবারেও তার একখানা পা আমার গায়ে বেশ ভাবে ঠেকে রইল। গাড়িশুদ্ধ লোক হাঁ ক'রে মজা দেখছে, কেউ কেউ রকম-বেরকমের মন্তব্যও করছে, এদিকে বেশ বোঝা যেতে লাগল লোকটা একখানা পা ক্রমেই আমার গায়ের সঙ্গে চেপে লাগিয়ে দিচ্ছে। আমি নিজেকে অত্যন্ত অপমানিত বোধ করতে লাগলুম। কিছুক্ষণ এইরকম সহ্য ক'রে আমার দুই পা সোজা একেবারে তার বুকের ওপর চড়িয়ে দিলুম। গাড়িশুদ্ধ নরনারী হো-হো ক'রে হেসে উঠল। আমাদের সামনেই স্টেশনের দিকে বেঞ্চে একটি লোক সারা বেঞ্চি জুড়ে বিছানা ক'রে শুয়ে ছিল। লোকটিকে বেশ ভদ্র ব'লেই মনে হ'ল। সে আমার ঐ কাণ্ড দেখে উঠে বলতে লাগল, সাবাস বেটা সাবাস। তারপর অন্যান্য যাত্রীদের দিকে চেয়ে বললে, আমি তখন থেকে এই লোকটার বেহুদাপনা দেখছি। এতবড় বেহুদা যে ঘুমন্ত লোকের বুকে পা তুলে দেয়! তারপর আমার দিকে চেয়ে বললে, ওটার মুখে মারো তিন লাথি।

নিজের প্রশংসা শুনে মনে মনে বেশ গর্বিত তো বোধ করলুমই, উপরন্তু লোকটার মুখে টেনে একটি লাথি ঝাড়ব কি না ভাবছি, এমন সময় সে অদ্ভুত ক্ষিপ্রকারিতার সঙ্গে আমার পায়ের নড়া দুটো চেপে ধ'রে আর এক হাতের সাহায্যে খোলা জানলা দিয়ে আমাকে চলন্ত গাড়ি থেকে বাইরে ফেলে দেবার চেষ্টা করতে লাগল। কামরার সকলে চীৎকার করতে লাগল, আমার বন্ধুদ্বয় তাকে বাধা দেবার চেষ্টা করতে লাগল; কিন্তু তাদের সাধ্য কি তাকে ঠেকায়! সে অবলীলাক্রমে আমাকে ঠেলে কোমর অবধি বাইরে বার ক'রে ফেললে। আমার দেহের কোমর অবধি আধখানা বাইরে ঝুলতে লাগল, মাথাটা নীচু দিকে আর আধখানা নিয়ে গাড়ির মধ্যে লড়াই চলতে লাগল। বোধ হয় আধ কি পৌনে এক মিনিট এই অবস্থায় ছিলুম। ঝুলতে ঝুলতে একবার মনে হয়েছিল, সঙ্গমস্নানের পুণ্যফল পেয়ে গেলুম বুঝি! যা হোক কামরার মধ্যে আমাকে টেনে নেবার পর দেখলুম, আট-দশ জন লোক মিলে লোকটাকে নির্দয় পিটছে; কিন্তু সে নির্বিকার; হাত-পাও চলাচ্ছে না বা একটা টুঁ শব্দও করছে না। লোকেরাই পিটতে পিটতে ক্লান্ত হয়ে যে যার জায়গায় চ'লে গেল। বলা বাহুল্য, আমিও আগেকার জায়গা ছেড়ে অন্যত্র গিয়ে বসলুম এবং দুর্জনের সঙ্গে একত্রে যাত্রা করা আর উচিত নয় এই স্থির ক'রে কোন্ স্টেশনে নেমে পড়া যাবে তাই নিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে গভীরভাবে আলোচনা করতে লাগলুম। একটা স্টেশনে এসে গাড়ি থামতেই আমরা নামবার বন্দোবস্ত করছি, এমন সময় আমাদের একজন সহযাত্রী সেই লোকটাকে ডেকে বললে, তুমি এখান থেকে নেমে যাও, নইলে পুলিস ডেকে ধরিয়ে দেওয়া হবে।

বলামাত্র লোকটা টপ্ ক'রে গাড়ি থেকে নেমে গেল। সে চ'লে গেলে সকলে বলতে লাগল, লোকটা নিশ্চয়ই পাগল। তার হালচাল দেখেও তাই মনে হ'ল।

তিনি কখন যে কি ভাবে কি সেজে আসেন কিছুই বলা যায় না।

টুণ্ডালায় নেমে ট্রেন বদলে আগ্রা ফোর্ট স্টেশনে যখন পৌছলুম, তখন

বেলা প্রায় বারোটা। স্টেশনেই দলে দলে হোটেলের দালাল ঘুরছে, তাদের মধ্যে একজন আমাদের ধরলে। কাছেই হোটেল, সব রকম সুবিধা আছে সেখানে, ছাতের ওপর চারিদিক-খোলা চমৎকার ঘর, তার ওপর যেখানে যে দ্রব্যটি মানায় তাই দিয়ে সাজানো। খাট, টেবিল, চেয়ার, মেঝেয় সতরঞ্চি পাতা—আর কি চাই? ভাড়া দৈনিক দু আনা, চার আনা, আট আনা,—খাবারের বন্দোবস্ত তোমাদের নিজেদের করতে হবে।

আমরা এই লোকটার হোটেলেই থাকব ঠিক ক'রে তার সঙ্গে স্টেশন থেকে বেরুনো মাত্র কয়েকজন লোক চুঙ্গী চুঙ্গী ক'রে হাঁক ছাড়তে ছাড়তে এসে জনার্দনকে পাকড়াও করলে। আমরা তো ভ্যাবাচ্যাকা মেরে গেলুম। চুঙ্গী কি রে বাবা! শেষকালে হোটেলের সেই দালাল আমাদের বুঝিয়ে দিলে যে, ব্যবসার জন্য কোন মাল নিয়ে এলে এখানে অক্‌ট্রয় ট্যাক্স দিতে হয়। আমরা মনে করলুম, এলাহাবাদ থেকে যে নতুন ধুতি ও কম্বল এনেছি তার জন্য বোধ হয় ট্যাক্স দিতে হবে। কিন্তু প্রশ্ন ক'রে জানা গেল, জনার্দনের হাতে যে ঘিয়ের বোতলটা আছে তার জন্য ট্যাক্স লাগবে। অগত্যা যাওয়া গেল অক্‌ট্রয় অফিসে।

স্টেশন থেকে বেরিয়েই কেল্লার সামনে যে জমি আছে সেখানে চারটে বাঁশের খুঁটির ওপর শন না কি দিয়ে কোন রকমে একটু ছাউনি করা হয়েছে, এই হচ্ছে অক্‌ট্রয় অফিস। অফিসের চেহারার সঙ্গে মিলিয়ে অফিসারেরও তেমনই মেকদারের চেহারা। আমাদের সেই ঘিয়ের বোতলটা নেড়ে-চেড়ে বললে, নাঃ, এর আর ট্যাক্স লাগবে না।

অক্‌ট্রয় অফিস থেকে রেহাই পেয়ে হোটেলে এলুম। স্টেশনের কাছেই বাড়ি। একতলার ঘরগুলো অন্ধকার খুপ্‌রি গোছের, ভয়ানক ময়লা। একটা ক'রে দড়ির খাটিয়া আছে, ভাড়া দিন-প্রতি দু আনা। দোতলায় বড় ছাত—ছাতের চার কোণে চারখানি প্রশস্ত ঘর। চারদিক খোলা। ঘরের মেঝেতে একটা দরি পাতা। দেওয়ালের

সঙ্গে একটি টেবিল ও তারই সামনে একখানি চেয়ার। আর এক পাশে একখানা নেয়ারের খাট প'ড়ে আছে, তাতে বিছানাপত্র কিছুই নেই। এই ঘরের ভাড়া দৈনিক চার আনা। তেতলার ওপরে দুখানা ঘর, তার আসবাবপত্র ঐ রকমই, তবে খাট ও চেয়ার দুখানা ক'রে আছে, ভাড়া দৈনিক আট আনা।

আমরা দোতলায় দৈনিক চার-আনাওয়ালা একখানা ঘর নিলুম। খাটের যে অবস্থা দেখা গেল তাতে কেউ শুতে পারবে না—ঠিক হ'ল মেঝেতেই দরির ওপরে শোয়া যাবে। টেবিল-চেয়ারে হাত দেওয়া মাত্র তাঁরা টলে পড়লেন। কি অদ্ভুত উপায়ে যে সেগুলোকে খাড়া রাখা হয়েছিল তা হোটেলওয়ালারাই জানে, কারণ আমরা তিনজনে মিলে দিন আষ্টেক চেষ্টা ক'রেও তাদের খাড়া করতে পারলুম না।

ঠিক করা গেল, বাজার থেকে খাবার না কিনে তখনকার মত আলুভাতে ভাত চড়িয়ে দেওয়া যাক, তারপরে ও-বেলা দেখা যাবে 'খন।

সুকান্ত ও জনার্দন বাজার করতে চ'লে গেল, আমি ঘর আগ্‌লাবার জন্য রইলুম। ওরা চ'লে যাবার পর আমি একটু এদিক-ওদিক দেখতে লাগলুম—একতলায় যাত্রী আসা-যাওয়ার ও দরদস্তুরের চীৎকার হচ্ছে; আমাদেরই দোতলায় কোণের দিকের ঘরের একজন যাত্রী ছাতে জল তুলিয়ে স্নান করছে—ভদ্রলোককে দেখে মনে হ'ল, বোম্বাই অঞ্চলে তাঁর বাড়ি। এই রকম এদিক-ওদিক দেখতে দেখতে হঠাৎ চোখ পড়ল আমাদের ঘরের একেবারে সামনের ঘরে, মাঝখানে লম্বা ছাত। সেই ঘরের জানলায় দাঁড়িয়ে একটি যুবতী আমায় দেখছে। যুবতীর বয়স পঁচিশ থেকে ত্রিশের মধ্যে, নিটোল স্বাস্থ্য, রঙ ফরসা—দেখতে বেশ সুন্দরী। জানলা দিয়ে তার কোমর অবধি দেখা যাচ্ছিল, আমার চোখে চোখ পড়বার পরও কয়েক সেকেণ্ড দাঁড়িয়ে থেকে সে জানলা থেকে স'রে গেল। একটু পরেই আবার চোখ পড়ল, যুবতী তাদের ঘরের দরজার পাল্লা দুটো খুলে দাঁড়িয়েছে। আমাদের ঘ-

থেকে এবারে তার সম্পূর্ণ চেহারা দেখা যেতে লাগল। বেশ লম্বা চেহারা, কাপড় পড়বার ধরন দেখে হিন্দুস্থানী ব'লেই মনে হ'ল। এবার সে অনেকক্ষণ আমাদের ঘরের দিকে চেয়ে রইল। একবার চোখে চোখ পড়তেই সে যেন একটু হাসলে।

ভাবতে লাগলুম—কি রকম হ'ল! চেনাশোনা নয় তো! কিন্তু কে হতে পারে? ইত্যাদি প্রশ্ন নিয়ে মনের মধ্যে আলোচনা করছি, তখনও সে ঠায় সেই ভাবে দাঁড়িয়ে। ইতিমধ্যে বন্ধুরা বাজার থেকে ফিরতেই তাদের সাড়া পেয়ে দরজাটা ভেজিয়ে দিলে।

বন্ধুরা বাজার থেকে হাঁড়ি, উনুন, চাল, কাঠ, আলু, নুন ও আরও কি কি সব এনেছিল, তারা সে সব রেখে বললে, চল, যমুনা থেকে আগে স্নান ক'রে আসি, তার পরে রান্না চড়ানো যাবে।

আমি তখন সেই অপরিচিতার নয়ন-ফাঁদে আবদ্ধ হয়ে ছট্‌ফট্‌ করছি, স্থান ত্যাগ করবার ক্ষমতা কোথায়? তাদের বললুম, তোরা যা, আমি রান্নার ব্যবস্থা করি, পরে এখানেই স্নান ক'রে নেব।

ওরা স্নান করতে চ'লে গেল। ছাতের একধারে একটু ছায়া পড়েছিল, সেইখানেই রান্না চড়িয়ে দিলুম। রান্না হতে লাগল, কিন্তু আমার চোখ রইল সেই খোলা জানলার দিকে। একটু যেতে না যেতে সুন্দরী আবার জানলার পশ্চাতে উদিত হলেন। এবার তার মুখে স্পষ্ট হাসি দেখতে পেলুম, আমি হাসতে সেও আর একটু হেসে স'রে গেল বটে, কিন্তু তখুনি আবার সেখানে এসে দাঁড়াল।

বন্ধুরা বাজার থেকে করকচ নুন এনেছিল, কিন্তু সে তো পাতে খাওয়া চলবে না। আমার মনে হ'ল, নুন গুঁড়ো করবার কিছু আছে কি না—এই ছুতোয় তার সঙ্গে কথা বলা যাক। যাঁহাতক মনে হওয়া অমনই নুনের মোড়কটা হাতে ক'রে জানলার কাছে গিয়ে তাকে ব'লে ফেললুম, দেখুন, এই নুন গুঁড়ো করবার কিছু—

এই অবধি শুনেই সুন্দরী ধাঁ ক'রে জানলা থেকে স'রে গেল। ব্যাপার দেখে আমার ভয় হ'ল, ভাবতে লাগলুম, স'রে পড়ব নাকি!

ইতিমধ্যে সে দরজাটা খুলে একটা ছোট পেতলের হামানদিস্তে এগিয়ে দিয়ে বললে, কাজ হয়ে গেলে দিয়ে যেও।

—নিশ্চয়, সে কথা আর বলতে!

অতি সুমধুর হাসিতে মুখখানা উজ্জ্বল হয়ে উঠল, কিন্তু সে আর কিছুই বললে না।

হামানদিস্তে নিয়ে নুন গুঁড়ো করতে করতে ভাবতে লাগলুম,—আরও কিছু কথা বললুম না কেন! মনের মধ্যে নানা রকম প্ল্যান গজিয়ে উঠতে লাগল—এই কথা বলা যেতে পারত, এই ক'রে ভাব আরও বাড়ানো যেতে পারত। মাহেন্দ্র সুযোগ যদি বা এল, হেলায় হারালুম, ইত্যাদি।

নুন গুঁড়ো হয়ে গেল। ভাবতে লাগলুম, হামানদিস্তেটা ফেরত দেবার সময় হয়েছে কি না! একটু পরেই দেখলুম, সুন্দরী আবার এসে জানলায় দাঁড়িয়েছে। হামানদিস্তেটা ফেরত নিয়ে গিয়ে দরজার সামনে দাঁড়াতেই যুবতী দরজা খুলে হাত বাড়িয়ে সেটা নিয়ে নিলে। এবার সে হেসে উর্দুতে জিজ্ঞাসা করলে, রান্না হচ্ছে বুঝি?

—হ্যাঁ, রান্না করছি। কই, আপনারা রান্না করছেন না?

যুবতী আঁচলের খোঁট মুখে চাপা দিয়ে খানিকটা হেসে নিলে। তার পরে বললে, নাঃ, পরদেশে এসে ওসব হাঙ্গামা আর লাগাই নি। আমরা বাজার থেকে খাবার এনে খাচ্ছি, ঘরওয়ালা খাবার কিনতে গেছে।

আর কি কথা বলব ভাবছি, হঠাৎ যুবতী মুখ তুলে চেয়ে কার দিকে যেন চোখ পড়তেই ঘরের মধ্যে আড়ালে স'রে গেল। আমি পেছন ফিরে দেখলুম, বোম্বাইয়ের সেই লোকটি তার ঘরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আমাদের চোখ দিয়ে গিলছে। আর সেখানে না দাঁড়িয়ে ফিরে এসে ভাতে কাঠি দিতে লাগলুম—যুবতীও দেখলুম দরজা-জানলা সব বন্ধ ক'রে দিলে।

একটু পরেই বন্ধুরা যমুনা-স্নান সেরে ফিরে এল। আমি

হোটেলেই স্নান সেরে নিলুম। কাঁচা শালপাতায় ভাত ঢেলে জনার্দনের আনা সেই গব্যঘৃত ও আলুভাতে দিয়ে আকণ্ঠ ভোজন ক'রে মেঝের দরিতেই প'ড়ে রইলুম। ঠিক হ'ল, রোদ পড়লে তাজে যাওয়া হবে। দুপুরবেলা আমার যখন ঘুম ভাঙল তখনও বন্ধুরা ওঠে নি, পাশ ফিরছে মাত্র। একবার দেখা পাওয়া যায় কি না দেখবার জন্যে ঘরের বাইরে উঁকি দেওয়া মাত্র দেখলুম, সুন্দরী জানলার ধার থেকে সট ক'রে স'রে গেল। পাশের দিকে চেয়ে দেখি, ওদিকের ঘরে সেই বোম্বাইয়ের লোকটি দাঁড়িয়ে—আমাকে দেখে সে ধীরে সুস্থে স'রে গেল।

ভিজে ধুতিগুলো ঘরের মধ্যে টাঙিয়ে দেওয়া হয়েছিল, সেগুলো তুলে ভাঁজ করতে লাগলুম আর ওদিকে সুন্দরী আবার এসে জানলায় দাঁড়ায় কি না সেদিকেও নজর রাখলুম। কিন্তু সে আর তো এলই না, উলটে ভেতরে অদৃশ্য থেকে আমাদের দিকের জানলাটা বন্ধ ক'রে দিলে। আর বাড়িতে ব'সে সময় নষ্ট ক'রে কি হবে ভেবে বন্ধুদের ডেকে তুললুম। হোটেলওয়ালারাই একটা অদ্ভুতদর্শন তালা দিলে, সেই তালা দরজায় লাগিয়ে তাজ দেখতে যাওয়া হ'ল। বেশ মনে পড়ে, স্টেশনের কাছ থেকে তাজ অবধি একাওয়ালা ভাড়া নিয়েছিল মাত্র দু আনা। তাতেও সেদিন সে আমাদের ঠকিয়েছিল, কারণ পরে প্রত্যহই ছ পয়সা খরচ ক'রে সেখানে গিয়েছি, এবং এসেছি পদব্রজে।

তাজমহল দেখলুম যখন, তখন তার আধখানায় ছায়া পড়েছে আর আধখানা রোদে ঝকমক করছে। তাজমহল অপূর্ব, অভাবনীয়। অভিধান ঘেঁটে অনেক বিশেষণ তার প্রতি প্রয়োগ করা যেতে পারে। কিন্তু আমি তা করব না। আমার দেশের রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, সত্যেন্দ্রনাথ ও আরও অনেক কবি তাজমহলের প্রশস্তি গেয়েছেন। তাঁরা ছাড়া দেশবিদেশের আরও অনেক কবি ও মনীষী তাজের রূপস্তুতি করেছেন—'সেথা আমি কি গাহিব গান'।

অতি শৈশব থেকে তাজমহলের কথা আমি বাবা-মার মুখে শুনেছি। ছোটদের পাঠ্যপুস্তকে তাজের কথা পড়েছি ও তার ছবি দেখেছি, বড় হয়েও ইতিহাসে পড়েছি তাজের কথা। তাজের জন্মের পিছনে পটভূমিস্বরূপ যে প্রেমের করুণ ইতিহাস তার সঙ্গে গাঁথা হয়ে আছে, তাও শুনেছি বহুবার বহুরকম। এই সব শুনে প'ড়ে ও দেখে আমার মনের মধ্যেও এতদিন ধ'রে আস্তে আস্তে তাজের একটা রূপ তৈরি হয়ে উঠেছিল। কেউ যদি জিজ্ঞাসা করেন, কি রকম দেখতে সে রূপ, আমি তার স্পষ্ট জবাব দিতে পারব না। তার খানিকটা বাস্তব, খানিকটা কল্পনা, কতকটা আলো, বেশির ভাগই অন্ধকার। সত্যিকার তাজের সঙ্গে তার কিছু সাদৃশ্য আছে, কিছু নেই। প্রথমে তাজ দেখে মনে হয়েছিল, এর সঙ্গে তো আমার মনের সেই তাজের মিল নেই!—সত্যি বলতে কি, মনে আঘাতই পেয়েছিলুম, নিরাশই হয়েছিলুম। হয়তো আমারই মতন সম্রাট সাজাহান প্রথম যেদিন তাজ দেখেছিলেন সেদিন নিরাশই হয়েছিলেন। হয়তো তাঁর একবার মনে হয়েছিল, যে-প্রেমের স্বপ্নকে রূপ দেবার জন্য এত আয়াস স্বীকার করা হ'ল তা ব্যর্থ ই হয়েছে। তাঁর স্বপ্নও ঠিক রূপ ধরে নি—কে বলতে পারে! হায়! মানুষের মনের মধ্যে যে রূপ ফুটে ওঠে, অক্ষরের কিংবা প্রস্তরের ইমারত তৈরি ক'রে তাকে হুবহু ফুটিয়ে তোলা যায় না। সে অনির্বচনীয়, অসংবেদনীয়।

তবু তাজ কি সুন্দর নয়? নিশ্চয় সুন্দর। তাজের সৌন্দর্য কি রকমের সেই কথাটা বলবার চেষ্টা করছি।

আগ্রা শহরে এই আমার প্রথম আগমন, পরে আরও অনেকবার আগ্রায় আসতে হয়েছে এবং এখানে থাকতে হয়েছে কখনও অল্পদিন, কখনও বেশিদিন; কখনও বেকার অবস্থায়, কখনও বা চাকরি নিয়ে; কখনও বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে, কখনও বা একা। কিন্তু তাজকে আমি ভুলি নি। যখন যে অবস্থায় এসেছি—তা সে দু ঘণ্টার জন্যই হোক কিংবা দু মাসের জন্যই হোক, ছুটে গিয়েছি তাজমহলে—কখনও

কখনও তাজ আমাকে নেশার মতন পেয়ে বসেছে। এমনও হয়েছে যে, গ্রীষ্মকালে দিনের পর দিন শহর থেকে আগ্রার সেই রোদ মাথায় ক'রে সেখানে গিয়েছি, একলা ঘুরে বেড়িয়েছি তার কত অনধ্যাসিত গোপন কন্দরে। তাজের প্রবেশ-তোরণের অন্ধকারময় অলিন্দে যে সব ঘুলঘুলি আছে, তারই ফোকর দিয়ে রোদে জ্বলন্ত তাজের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে নিদ্রাভিভূত হয়ে তারই স্বপ্ন দেখেছি। পূর্ণিমা প্রতিপদ দ্বিতীয়া, ওদিকে দ্বাদশী ত্রয়োদশী অর্থাৎ চন্দ্রালোকেও দেখেছি তাকে। নীলাকাশ তার পটভূমিকা হ'লেও স্তিমিত চন্দ্রালোকে তাজকে মনে হয়, যেন নীল সমুদ্রে শ্বেত শতদল ফুটে উঠেছে। চন্দ্রালোকিত রাত্রে চলন্ত মেঘের মাঝে তাজের আর এক রূপ ফুটে ওঠে। এই রকম দেখতে দেখতে হঠাৎ তার আসল রূপ দর্শকের চক্ষে প্রতিভাত হয়। আগেই বলেছি, প্রথম দর্শনে তাজমহলের আসল রূপ চোখে পড়ে না, সে ধীরে ধীরে আপনাকে প্রকাশ করে। তার কায়িক রূপের পেছনে লুকিয়ে আছে সেই রূপ—প্রথম দর্শনের দিনে আমার কাছে তা সংবৃতই ছিল। দুষ্কর কৃচ্ছ্রসাধনের পর আমি তার অবগুণ্ঠন মোচন ক'রে দেখেছি, সে রূপসী।

যাই হোক, রাত্রে তাজ খোলা থাকে কি না জিজ্ঞাসা করায় খাদিমরা বললে যে, সেই রাত্রে প্রথম দিকে চাঁদ উঠবে ব'লে রাত্রি দশটা অবধি তাজ খোলা থাকবে। শুনলুম যে, পূর্ণিমা-রাতে বারোটা অবধি তাজ খোলা থাকে।

রাত আটটা সাড়ে আটটা অবধি সেখানে কাটিয়ে হেঁটে শহরে ফেরা গেল। শহরে একটু ঘোরাফেরা ক'রে একটা ময়রার দোকানে ঢুকে বেশ ক'রে কচুরি, জিলপি ও রাবড়ি আহার করা গেল। কলকাতার হিসাবে সে খাবার দামে সস্তা তো বটেই, খেতেও ভাল। রাবড়ির সের সে সময় কলকাতায় আট থেকে বারো আনা ছিল, সেখানে তার চেয়ে ঢের ভাল জিনিস পাওয়া গেল ছ আনায়।

আহারাদি শেষ ক'রে পরম পরিতৃপ্ত হয়ে হোটেলে ফিরে এসে

নীচে যেখানে ম্যানেজার বসে সেখানে ঘড়িতে দেখা গেল, দশটা বেজে গেয়েছে। হোটেলওয়ালা আমাদের ডেকে বললে, আজকে রাত্তে আপনারা দয়া ক'রে কোথাও বেরুবেন না। সরকার থেকে লোক আসবে রেজিস্টারি করতে।

সরকার, রেজিস্টারি প্রভৃতি কথা শুনে তো ভড়কে গেলুম। সে আবার কি রে বাবা!

হোটেলওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করায় জানতে পারা গেল যে, সেখানে ও প্রত্যেক হোটেলেই যত যাত্রী আসে পুলিস তাদের নাম, ঠিকানা, কোথা থেকে আসা হচ্ছে, কোথায় যাওয়া হবে ইত্যাদি লিখে নিয়ে যায়—এই নিয়ম আবহমানকাল থেকে চ'লে আসছে।

আর বেশি কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করলে যদি হোটেলওয়ালার মনে সন্দেহ জাগে, তাই মনের ভয় মনেই চেপে দোতলায় ওঠা গেল। সেখানে উঠে দেখি, ভীষণ ব্যাপার! অনেক লোকজনের জটলা লেগেছে আমাদের ঘরের সামনের ঘরে—যেখানে দ্বিপ্রহরে সেই রহস্যময়ী সুন্দরীকে দেখেছিলুম।

দেখলুম, দুজন গুণ্ডামতন লোক আমাদের ঘরের সামনে ছাতে ব'সে আছে, তাদের একজনের হাতে একটা পাকা বাঁশের বড় লাঠি। ঘরের মধ্যে খুব ধমকধামক চলছে দেখে উঁকি দিয়ে দেখি যে, একটা কম্বলের ওপরে দিনের বেলায় ওদিককার ঘরের বোম্বাইয়ের যে লোকটিকে উঁকিঝুঁকি দিতে দেখেছিলুম, সে ব'সে রয়েছে। তার মাথার চুল উস্কোখুস্কো, একটা খুব ষণ্ডা-গোছের লোক সেই লোকটার কোঁচা বেশ বাগিয়ে ধ'রে সামনে ব'সে আছে। আর একটা ষণ্ডা লোক ঘরের মধ্যেই দাঁড়িয়ে আছে। স্ত্রীলোকটাকে দেখলুম, কম্বলের এক কোণে সেই দেওয়াল ঘেঁষে ব'সে আছে—তার মুখের ঘোমটা একেবারে হাঁটু অবধি ঝুলে পড়েছে—লজ্জায় কি চক্ষুলজ্জায় তা বোঝা মুশকিল। যে লোকটা আমাদের স্টেশন থেকে হোটেলে নিয়ে এসেছিল, দেখলুম ঘরের মধ্যে সেও দাঁড়িয়ে রয়েছে। যে লোকটা

বোম্বাইওয়ালার কোঁচা ধ'রে ছিল সে বিরাট একটা হুঙ্কার ছাড়লে। তার যতটুকু বুঝতে পারলুম তাতে মনে হ'ল, সে অন্ত ব্যক্তি হত্যা ক'রে ফাঁসি যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করছে।

কৌতূহল বেড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে আমরা তিন জনেই ভিড় ক'রে জানলার আরও কাছে গিয়ে দাঁড়ালুম। ইতিমধ্যে হোটেলের দালালটার সঙ্গে চোখাচোখি হওয়ায় সে বেরিয়ে এসে আমাদের বললে, বাবু, তোমরা জানলার কাছে দাঁড়িও না, নিজের ঘরে চ'লে যাও। এ সব ঝামেলার মধ্যে শরীফ লোকদের কি থাকতে আছে!

আমরা তাকে আমাদের ঘরে ডেকে এনে জিজ্ঞাসা করলুম, কি হয়েছে বল তো?

লোকটা চেষ্টা ক'রে খুব গভীর রকম গম্ভীর হয়ে বললে, কি আর বলব বল! বুরা কাম্‌কা ইয়েহি নতিজা হোতা হয়।

বললুম, বাপু, হেঁয়ালি ছাড় দিকিন। কোন্ বুরা কামের কি নতিজা হয় তা আমরা ভাল রকম জানি। এখন বল তো কি হয়েছে?

লোকটা বললে, ঐ ঘরে একজনেরা এসেছে কাল বিকেলে। আজ সকালবেলা সে তার স্ত্রীকে রেখে কি কাজে বেরিয়েছিল। রাত্রিবেলা ফিরে এসে দেখে যে, ঐ ওদিককার ঘরের যাত্রী তার ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ ক'রে তার স্ত্রীর সঙ্গে প্রেম করছে। ব্যস্, আর কি! সে তার লোকজন ডেকে এনে এখন ধরেছে তাকে। হয় ঐ লোকটা কিছু টাকা দিয়ে ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলুক, আর না হয় জাহান্নামে যাক।

লোকটাকে জিজ্ঞাসা করলুম, আসামী এখন কি বলছে?

বলবে আবার কি! টাকা ওকে দিতেই হবে, নইলে বিদেশে এসে কি জান দেবে! যাক্‌গে, খারাপ কাজের এই রকম ফলই হয়ে থাকে—কিন্তু তোমরা ও-সবের মধ্যে যেও না। ওদিকে যাবার দরকারই বা কি?

আমাদের ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার সময় সে নিজেই দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে গেল। সমস্ত ব্যাপারটাই যে যোগ-সাজসে হয়েছে সে কথা বলাই বাহুল্য। আমাদের বয়েস নেহাত কম, তার ওপর বাড়ি থেকে পলায়নের অপরাধ কাঁধের ওপরে রয়েছে, নইলে তখুনি পুলিসে খবর দিতুম। আমি সমস্ত দিন ধ'রে অনেকবার লক্ষ্য করেছি, ঐ ঘরের স্ত্রীলোকটি বোম্বাইয়ের সেই লোকটিকে নানাভাবে প্রলুব্ধ করবার চেষ্টা করছে। এমন হওয়াও অসম্ভব নয় যে, সন্ধ্যার সময় দোতলাটা নির্জন দেখে ঐ স্ত্রীলোকটি সেই লোকটিকে ডেকে নিজের ঘরের মধ্যে ঢুকিয়েছে। তার লোকগুলো তক্কে তক্কে ফিরছিল, শিকার জালে পড়তেই তারা টপ ক'রে এসে ধরেছে।

একটা ময়লা চিমনি-ভাঙা কেরোসিনের লণ্ঠন মেঝের ওপরে জ্বলছিল, সেটাকে নিবিয়ে দিয়ে মেঝেতেই শুয়ে আমরা লোকটার অবস্থার কথা আলোচনা করতে লাগলুম। পরস্ত্রীর সঙ্গে প্রেম করার খেশারৎস্বরূপ তাকে কত টাকা দিতে হবে তারই একটা আন্দাজ করবার চেষ্টা করছিলুম, এমন সময় জনার্দন বললে, বাবা, প্রেম করেছ কি খেশারৎ দিতে হয়েছে। দেখলে না, নিজের স্ত্রীর সঙ্গে প্রেম ক'রে সম্রাট শাজাহানকে ন কোটি সতেরো লক্ষ টাকা দিতে হয়েছিল, ও-লোকটা সে তুলনায় আর কতই বা দেবে? যাই দিক, সস্তাতেই সেরেছে বলতে হবে।

রাত্রি বারোটার সময় হোটেলের একজন লোক এসে আমাদের নীচে ডেকে নিয়ে গেল, পুলিসের লোক এসেছে ব'লে। তাদের খাতায় নাম ধাম প্রভৃতি লিখিয়ে ওপরে উঠে একবার উঁকি দিয়ে সেই ঘরখানা দেখলুম—ভোঁ-ভাঁ, কেউ কোথাও নেই। একটু এগিয়ে দেখলুম, ও-ঘরখানাও ফাঁকা—

ভবিষ্যতে আবার কোন্ নাটক সেখানে অভিনীত হবে কে জানে!

[ক্রমশ]

"মহাস্থবির"

দ্বৈত

হে পৃথিবী কথা কও
ডাকে সিন্ধু ডাকে,
রেখো না তাহাকে
অনিশ্চিত বেদনার নাগর-দোলায়,
সাগর-দোলায়
দোলে যে পূর্ণিমা-চাঁদ, সেও জানে তার
কোথা অস্তাচলতটে গৃহ আপনার।

হে পৃথিবী কেন রও
মৌন উদাসীন,
দেখো নাকি শেষ হয়ে আসিতেছে দিন,
পশ্চিম দিগন্তে হেরো পালঙ্কে সোনার
রচে সিন্ধু শয্যা যে তোমার
তপ্ত বাসনার।

হে পৃথিবী কথা কও
ছাড়ো যোগাসন
ফুটুক বচন,
লুটুক বসন,
শরীরের খাঁজে খাঁজে
বসনের ভাঁজে ভাঁজে
উঠুক ধ্বনিয়া
রনিয়া রনিয়া
ভাস্করের কল্পনা-নূপুর।
বাজুক মধুর

লাজুক বধূর
বেদনায় ঘনতর কামনা-কিঙ্কিণী
মৃদু রিনিরিনি,
গতিভঙ্গে মূর্ত হোক সারা দেহে যে সঙ্গীত বও,
হে পৃথিবী কথা কও, কও।

কৌতূহলী হেরিতেছি ব'সে
পড়ন্ত প্রদোষে
সমুদ্রের পৃথিবীর
সুনিবিড়
অনন্ত প্রণয়
গৈরিক প্রবালস্বর্ণ কত বর্ণময়,
পান্নায় নীলায়
হেরিতেছি অনাস্থ লীলায়,
কখনো মিলায়
আকাশের শেষপ্রান্তে ক্ষুব্ধ অভিমানে,
কখনো বিলায়
শুক্তিমুষ্টি অন্তহীন দানে,
কভু সিন্ধু উচ্ছ্বসিত গানে
ফেনার বিদ্যুৎছটা দেয় বিস্তারিয়া
নীলিমা ব্যাপিয়া।
শ্রান্তিহীন ক্ষান্তিহীন এই ব্যর্থ বাসর রচন
দুয়ারের দুই প্রান্তে দুজনার
নিত্য জাগরণ,
হে পৃথিবী
গূঢ়নীবী

ভালো কি গো লাগে অনিবার ?
তরঙ্গের যাওয়া-আসা
ফিরে ফিরে একই ভাষা
লক্ষ্যহীন ভালবাসা
লবণাম্বু সার,
ভালো কি গো লাগিছে তোমার !
তার চেয়ে আপনারে
ছেড়ে দাও একেবারে
অতলে অকূলে,
তৃপ্তিহীন প্রেম হায়
ক্ষিপ্ত নীলকণ্ঠপ্রায়
ওই হেরো বীচিভঙ্গে উঠিতেছে ফুলে।

হে ধরণী
নারী চিরন্তনী
করায়ত্ত প্রেম ল'য়ে এ কি মুগ্ধ-খেলা
সূক্ষ্ম অতৃপ্তির ডোরে
বাঁধিয়া রেখেছ ওরে
কাছে টেনে দূরে দাও ঠেলা,
হৃৎপদ্মবিলীন অলি নিতান্ত একেলা !
ফেনার রজতে মোড়া
তরল পান্নায় গড়া
মঞ্জুষাটি ভরি
রত্নাকর দেয় তব পদপ্রান্তে ধরি ;
তুমি তো চাহ না কিছু
ব'সে থাকো মুখ নীচু
দিবস শর্বরী।

হয়তো বা এই ভালো
নাই দাহ আছে আলো
আছে শিখা নাহিকো ইন্ধন,
আছে প্রেম নিরমল
যেমন সাগর-জল
আছে তীর নাহি তবু তীরের বন্ধন।

অতৃপ্ত প্রেমের তাপ
মনে আঁকে ইন্দ্রচাপ
মুখে আছে সুর,
বিরহের পায়ে বাজে
মিলনের মাঝে মাঝে
সোনার নূপুর।

তরঙ্গের হাহারব
কভু না হোক নীরব
তোমারে করুক সিন্ধু নব পুরূরবা।
হৃদয়ের দুই তটে
বেদনায় যেন ফোটে
অস্তোদয়-জবা।
হে পৃথিবী
বাঁধো নীবী
পর্যাপ্ত যৌবন তব চিরকাল থাক্,
নিটোল স্তনের মতো
থাকো দোঁহে অবিরত
গায়ে গায়ে, তবু মাঝে একটুকু ফাঁক॥

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

মহারাজা নন্দকুমার

নন্দকুমারের বিচার-কাহিনী

(১) বিচারকগণের পরিচয়

মোহনপ্রসাদের নালিশ প্রথমে ৬ই মে ১৭৭৫ তারিখে কলিকাতার সিটি ম্যাজিস্ট্রেটের এজলাসে উপস্থিত করা হয়। সিটি ম্যাজিস্ট্রেট লেমেইস্টার এবং হাইড নন্দকুমারকে ধৃত করাইয়া সাধারণ কারাগারে বন্দী করিয়া রাখিবার আদেশ দেন এবং মোকদ্দমাটি বিচারার্থ সুপ্রিম কোর্টে সমর্পণ করেন। নন্দকুমারকে জামিনে খালাস করিবার সর্ব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। ম্যাজিস্ট্রেট এবং সুপ্রিম কোর্টের জজগণ জামিনের আবেদন অগ্রাহ্য করেন। নন্দকুমার জেলে বিচারাধীন বন্দী অবস্থায় থাকার সময় জলস্পর্শও করেন নাই। যে বাড়িতে অহিন্দু বন্দী বাস করে, সেখানে থাকিয়া অন্নজল গ্রহণে তাঁহার আপত্তি ছিল। অবশেষে নন্দকুমারের হিতৈষী বন্ধুগণের চেষ্টায় জেলের প্রাঙ্গণে একটি তাঁবু খাটাইয়া নন্দকুমারকে রাখা হইল। সেখানেও নন্দকুমার যতদিন বাঁচিয়া ছিলেন, কেবল মাত্র মিষ্টি খাইয়া প্রাণ ধারণ করিয়াছিলেন।

৮ই জুন সুপ্রিম কোর্টে বিচার আরম্ভ হয়।

বিচারক ছিলেন :—সার্ ইলাইজা ইম্পে (Sir Elieza Impey, Chief Justice) মিস্টার চেম্বার্স (Mr. Justice Chambers), মিস্টার লেমেইস্টার (Mr. Justice Lemaistre), মিস্টার হাইড (Mr. Justice Hyde)।

এইখানে সর্বপ্রথম লক্ষ্য করিতে হইবে শেষোক্ত বিচারক দুইটি লেমেইস্টার ও হাইড সিটি ম্যাজিস্ট্রেট স্বরূপে নন্দকুমারকে সুপ্রিম কোর্টের দায়রায় সমর্পণ করেন। তাঁহারা নন্দকুমারকে অপরাধী বলিয়া বিশ্বাস করিয়াই দায়রায় সমর্পণ করিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহারা সুপ্রিম কোর্টেও বিচারক হইতে পারেন না। ইহা সর্বদেশের আইনের বিধানের বিরোধী।

লেমেইস্টারের চরিত্রও কলুষিত ছিল। সমস্ত রাত্রি তিনি কুসংসর্গে এবং জুয়াখেলায় কাটাইতেন। ইম্পেও তাহা জানিতেন। তাঁহার মেজাজ রূঢ় ছিল, বিচারকালে নিষ্ঠুর হইবার তাঁহার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি কিছুতেই নিবৃত্ত হইত না। হাইড একেবারেই ইম্পের অনুগত, তাঁহার ব্যক্তিত্ব কিছু ছিল না। ইম্পে বাল্যকাল হইতে হেস্টিংসের বন্ধু, এক পাঠশালায় পড়িতেন। আজীবন তাঁহাদের বন্ধুত্ব অক্ষুণ্ণ ছিল। মনে হয়, এই তিনটি বিচারকের হৃদয়ে একটি মাত্র সুর ধ্বনিত হইতেছিল—নন্দকুমারকে হত্যা করিয়া হেস্টিংসকে বাঁচাইতে হইবে।

বাকি রহিলেন চেম্বার্স। ইনি প্রকৃতই ন্যায়পরায়ণ ছিলেন। বিচারের প্রারম্ভেই তিনি আপত্তি তুলিলেন, যে আইনের বিধানে ইংলণ্ডে জাল করার অপরাধে মৃত্যুদণ্ডের ব্যবস্থা আছে, তাহা বাংলা দেশে প্রযোজ্য নয়। এই জন্য তিনি প্রস্তাব করেন, নন্দকুমারকে মুক্তি দেওয়া হউক। কিন্তু বাকি তিনটি জজ চেম্বার্সের এই আপত্তি অগ্রাহ্য করিয়া বিচার শুরু করিবার আদেশ দিলেন।

(২) আইনের মূলনীতি পদদলিত

বিচার আরম্ভ হইল। ইম্পে নন্দকুমারকে প্রশ্ন করিলেন, তিনি কাহাদের দ্বারা তাঁহার বিচার হইবে ইচ্ছা করেন? নন্দকুমার উত্তর দিলেন, By God and his Peers—ভগবান স্বয়ং এবং আমার সমশ্রেণীর দেশীয় লোক আমার বিচার করুক, ইহাই আমি চাই।

মিঃ ফারার বলিয়া একটি নূতন ব্যারিস্টার নন্দকুমারের পক্ষ সমর্থনের জন্য নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি যখন দেখিলেন, সব ইংরেজ জুরি ডাকিয়া আনা হইয়াছে তাহাতে আপত্তি করিলেন। ইম্পে বলেন, ইঁহারা সকলেই কলিকাতার অধিবাসী এবং নন্দকুমারও কলিকাতার অধিবাসী, সুতরাং ইঁহারা নন্দকুমারের স্বদেশবাসী, অতএব জুরি হইতে বাধা নাই।

তখন আর একটি প্রশ্ন উঠিল, নন্দকুমার মুর্শিদাবাদের অধিবাসী, সুতরাং তাঁহার বিচার কলিকাতা আদালতে ইংরেজ জুরি দ্বারা হইতে পারে না। ইম্পে এই আপত্তিও অগ্রাহ্য করিয়া বারো জন ইংরেজকে জুরির আসন গ্রহণ করিতে বলিলেন। ইঁহারা প্রায় সকলেই বণিক-সম্প্রদায়ভুক্ত। জুরিপ্রধান (Foreman) হইলেন জন রবিন্‌সন নামক ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির একটি কর্মচারী।

ডারহাম নামক একটি ব্যারিস্টার সরকার-পক্ষের ব্যারিস্টার আর ফারারের সঙ্গে ব্রিক্‌স্‌ নন্দকুমারের কৌঁসিলি ছিলেন।

(৩) রবাহুত দোভাষী

ইহার পর তর্ক উঠিল দোভাষী মনোনয়ন সম্বন্ধে। ফার্সি ও হিন্দুস্থানী জানা না থাকায় জজ কিংবা জুরিগণ সাক্ষীর কথা বুঝিবেন না বলিয়া ইণ্টারপ্রিটার বা দোভাষীর প্রয়োজন। সরকারী দোভাষী অনুপস্থিত ছিলেন। সহকারী দোভাষী সম্বন্ধে প্রধান বিচারপতি নিজ হইতেই বলিলেন, সে লোকটি অনুপযুক্ত। এমন সময় দেখা গেল, ইলিয়ট নামের একটি লোক স্বেচ্ছায় বিচারকক্ষে প্রবেশ করিলেন। ইম্পে বলিলেন, ইনিই দোভাষীর কাজ করুন। জুরিরাও 'জি হুজুর' বলিলেন। নন্দকুমারের পক্ষে আপত্তি হইল যে, ইলিয়ট তাঁহার শত্রুদের বন্ধু। প্রকৃত পক্ষে ইলিয়ট হেস্টিংস ও ইম্পের বন্ধু ছিলেন। ইলিয়ট ইম্পের বাড়িতে বাস করিতেন, ইম্পে ইঁহাকে নিজের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বা পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন। এই ইলিয়টের সহসা মৃত্যু হইলে উভয় বন্ধুই ব্যথিত হন। তাঁহার বিচারকক্ষে আগমন ইম্পে এবং হেস্টিংসের ব্যবস্থাতে হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। এইখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে, যখন তেরো বৎসর পরে ইম্পের Impeachment (অভিযোগ) হয়, তখন এই ইলিয়টের ভ্রাতা সার্‌ গিল্‌বার্ট ইলিয়ট—যিনি পরে লর্ড মিণ্টো হইয়াছিলেন—ইম্পের তীব্র নিন্দা করিয়া বক্তৃতা করিয়াছিলেন। ট্রটার (P. 144)

বলেন, কনিষ্ঠ ইলিয়ট জীবিত থাকিলে হয়তো জ্যেষ্ঠ ইলিয়ট ইম্পের বিরুদ্ধাচরণ করিতেন না।

(৪) বিচার আইনের বিধান বিরোধী : জেম্‌স্ মিলের মন্তব্য

ফারার ছিলেন একেবারে নূতন ব্যারিস্টার, আইনের মর্মকথা তাঁহার জানা ছিল না। কেহ কেহ বলেন, ইনি ব্যারিস্টারি পরীক্ষায় পাস নহেন, তবুও ভারতে কৌঁসিলি হইবার অনুমতি লাভ করিয়াছিলেন। বিচারপতি চেম্বার্সেরও বোধ হয় এই কথা মনে হয় নাই যে, নন্দকুমার সত্যসত্যই জাল করিয়া থাকিলে সে অপরাধ করা হইয়াছিল ছয় বৎসর পূর্বে। সুতরাং যে নূতন বিধানে ইংলণ্ডের আইন কলিকাতায় প্রবর্তিত হইয়াছিল ১৭৭৩ খ্রীঃ অব্দে, সে আইনে retrospective effect দেওয়া হয় নাই, অর্থাৎ যাহাকে বলে expost facto law—সুতরাং আইন প্রবর্তনের পূর্বকৃত অপরাধের জন্য কাহাকেও অপরাধী করা যায় না। উপরে বর্ণিত এই সকল আইন-ঘটিত আপত্তি সম্বন্ধে বিখ্যাত জন স্টুয়ার্ট মিলের পিতা জেম্‌স্ মিলের উক্তি উল্লেখযোগ্য। তাঁহার লিখিত *History of British India* পুস্তকের শেষ কয়টি পৃষ্ঠা সকলেরই পাঠ করা উচিত। ৬৪১ পৃষ্ঠাই এই কয়টি কথা আছে—

"The severest censure was generally passed upon the trial and execution, and it was afterwards exhibited as matter of impeachment against both Mr. Hastings and the Judge, who presided in the tribunal (Impey). The crime for which Nun Coomar was made to suffer was not a capital offence, by the laws of Hindustan either Muslim or Hindu and it was represented as a procedure full of cruelty and injustice to render a people amenable to the most grievous severity of a law with which they were unacquinted and from

which by their habits and association their minds were totally estranged. It was affirmed—That this atrocious condemnation and execution were upon an expost facto law, as the statute which created the Supreme Court and its powers was not published till 1774 and the date of the supposed forgery was in 1770—That the law which rendered forgery capital did not extend to India as no English statute included the colonies unless where it was express-stated in the law—That Nun Coomar as a native Indian, for a crime committed against another Indian, not an English man or even a European was amenable to the native and not the English tribunal."

এই উক্তিটির মর্মকথা এই, নন্দকুমারের এই বিচার এবং ফাঁসির জন্য সাধারণত কঠোরতম নিন্দা প্রচারিত হইয়াছিল এবং এই ঘটনার পর যখন পার্লামেণ্টে হেস্টিংসের এবং ইম্পের Impeachment হয় তখন এই বিষয়টি অভিযোগের অন্তর্ভুক্ত ছিল। যে অপরাধের জন্য নন্দকুমারের ফাঁসি হইল—কি হিন্দু কি মুসলিম হিন্দুস্থানে এমন অপরাধের জন্য এমন কঠোর দণ্ডের ব্যবস্থা কোন কালেই ছিল না। এই গুরুতর এবং নৃশংস বিধান ভারতবাসীর পক্ষে সম্পূর্ণ অপরিচিত এবং তাহাদের প্রথা, অভ্যাস এবং সমাজ-এর প্রতিকূল। এই মতও দৃঢ়তার সহিত ব্যক্ত হইয়াছে যে, নন্দকুমারের ফাঁসি হইল আইন-প্রবর্তনের পূর্বকৃত অপরাধের জন্য। যে বিধান দ্বারা সুপ্রিম কোর্ট এবং ইহার ক্ষমতা গঠিত হয় তাহার প্রবর্তন হয় ১৭৭৪ খৃঃ অব্দে আর নন্দকুমারের তথাকথিত অপরাধের তারিখ ১৭৭০ খৃঃ অব্দে। ইংলণ্ডে যে-আইন দ্বারা জাল অপরাধের জন্য মৃত্যুদণ্ডের ব্যবস্থা আছে, তাহা ইংলণ্ডের উপনিবেশে প্রবর্তিত করা হয় নাই। নন্দকুমার ভারতবাসী, অপরাধ করা হইয়াছিল অপর একটি ভারতবাসীর উপর—ইংরেজ বা

কোনও ইউরোপীয়ানের উপর নহে। দেশীয় বিচারকের দ্বারা তাঁহার বিচার হওয়া উচিত ছিল।

যাহা হউক ইম্পে আইনের মূলনীতি এবং প্রচলিত সর্বদেশকাল-গ্রাহ্য বিধান পদদলিত করিয়া বিচার আরম্ভ করিলেন।

(৫) সরকার পক্ষের সাক্ষী হেস্টিংসের করায়ত্ত ব্যক্তি

তখন জুন মাস। কলিকাতায় অসহ্য গরম। বর্ণিত হইয়াছে যে, বিচারপতিগণ বার বার উঠিয়া গিয়া তাঁহাদের ঘর্মাক্ত অধোবাস পরিবর্তন করিয়া আসিতেন। কিন্তু ইঁহাদের উৎসাহ ছিল অদম্য। যত শীঘ্র সম্ভব আসামীকে হত্যা করিতেই হইবে—এই ছিল লক্ষ্য।

সরকার-পক্ষে যে সকল ব্যক্তি সাক্ষ্য দেন, তাহার মধ্যে মাত্র দুইটি সাক্ষীর কথাই লিখিব। আর সব সাক্ষী উল্লেখযোগ্য নহে। এই দুইটির মধ্যে একটি কমলউদ্দিন, অপরটি নবকৃষ্ণ। যে কর্জপত্রটি জাল বলা হইয়াছে, তাহাতে সাক্ষী ছিলেন কমল মহম্মদ নামধারী এক ব্যক্তি। কমলউদ্দিন বলিল যে, আগে তাহার নাম ছিল কমল মহম্মদ, এখন সে কমলউদ্দিন নামে পরিচিত। এই কমলউদ্দিন ছিল হেস্টিংসের মহাজন (Banyan) কান্তবাবুর গোমস্তা এবং বহু ব্যাপারে বেনামদার। আর কান্তবাবু (যাঁহাকে সকলেই কান্ত মুদী বলিয়া জানেন) হেস্টিংসের দক্ষিণহস্তস্বরূপ ছিলেন। কান্তবাবুর পুরা নাম ছিল কৃষ্ণকান্ত নন্দী। কাশিমবাজারের সুপ্রসিদ্ধা দানশীলা মহারাণী স্বর্ণময়ী কান্তবাবুর প্রপৌত্রের বিধবা পত্নী।

সকলেই জানেন, কান্তবাবু পলাতক হেস্টিংসকে নিজের বাসভবনে আশ্রয় দিয়া রক্ষা করিয়াছিলেন, সেই অবধি হেস্টিংস ও কান্তবাবুর মধ্যে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব। সুতরাং হেস্টিংসের পক্ষে কান্তবাবুর একটি গোমস্তাকে সাক্ষীরূপে সংগ্রহ করা কঠিন ছিল না। হেস্টিংসের সমর্থক জে. স্টিফেনও স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন যে, Kamaluddin was a poor creature—অর্থাৎ নেহাৎ অকিঞ্চিৎকর তুচ্ছ ব্যক্তি।

দ্বিতীয় সাক্ষীটি নবকৃষ্ণ। ইনি হেস্টিংসকে ফার্শি শিক্ষা দিতেন এবং তাঁহার মুন্সী ছিলেন। ১৭৫০ খৃঃ অব্দ হইতে হেস্টিংসের সঙ্গে ইঁহার ঘনিষ্ঠতা ছিল। ভবিষ্যৎকালে নবকৃষ্ণের সৌভাগ্য-সম্পদের এই ছিল সূত্রপাত। কার্যকারণ সম্পর্ক পাঠকগণ বিবেচনা করিবেন। হেস্টিংস নবকৃষ্ণকে ১৭৭৮ খৃঃ অব্দে কলিকাতা নগরের একটি তালুকদার করিয়া পুরস্কৃত করিলেন এবং পরে বর্ধমানের রাজার ও সম্পত্তির রক্ষক হিসাবে নিযুক্ত করেন।

এইখানে বলিয়া রাখা ভাল, চতুর হেস্টিংস নবকৃষ্ণের নিকট হইতে (উপরোক্ত প্রত্যুপকারের জন্য) তিন লক্ষ টাকা ধার করেন। পরবর্তী কালে নবকৃষ্ণ টাকার জন্য মোকদ্দমা করিলে উহা ডিস্‌মিস্‌ হইয়া যায়। সে টাকাটা আর নবকৃষ্ণের ঘরে ফিরিয়া আসিল না।

এক দিকে নবকৃষ্ণ হেস্টিংসের বন্ধু, অপর দিকে তাঁহার সঙ্গে নন্দকুমারের শত্রুতা ছিল। একটি ব্রাহ্মণ-কুলবধূর ধর্ম নাশ করার অপরাধে নবকৃষ্ণ অভিযুক্ত হইয়াছিলেন। নন্দকুমার এই অভিযোগের পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন।

নবকৃষ্ণ যে সাক্ষ্য দেন, তাহার কোনও মূল্যই ছিল না। তিনি বলিয়াছিলেন, কর্জপত্রে যে বোলাকীদাসের সই আছে, তাহা বোলাকীর হস্তাক্ষরের মত মনে হয় না—ঈশ্বর জানেন এ হস্তাক্ষর বোলাকীর কি না।—God knows if it is his signature.

অন্যান্য সাক্ষীর কথা নিষ্প্রয়োজন বোধে বলা হইল না। সরকার-পক্ষের সাক্ষীর উপর ভিত্তি করিয়া একটি কুকুরকেও ফাঁসি দেওয়া যায় না। বর্তমান যুগে একজন প্রসিদ্ধ বিচারকের এইরূপ উক্তি শুনিয়াছি, You can not hung a dog on this evidence। এই প্রসঙ্গে জে. স্টিফেনের একটি মন্তব্য উদ্ধৃত করিতেছি—

"I may however say that if no evidence at all had been called for the prisoner and the case rested solely on the evidence for the prosecution, I should not

have convicted Nun Coomar." Quoted by Dr. Busteed, *Echoes from Old Calcutta*, pp. 394-95.

অর্থাৎ আসামী-পক্ষে কোনও সাক্ষী যদি না আসিত এবং মোকদ্দমাটি যদি কেবলমাত্র সরকার-পক্ষের সাক্ষীর উপর বিচার্য হইত, তাহা হইলে আমি নন্দকুমারকে দণ্ডার্হ করিতাম না। ইহাতেই বুঝা যাইবে যে, নন্দকুমারের বিরুদ্ধে অপরাধ প্রমাণিত হয় নাই। তথাপি কেন যে নন্দকুমারের মৃত্যুদণ্ড হইল, কেনই যে স্টিফেন সাহেব ইম্পের বিচারকে সমর্থন করিলেন তাহা বিস্ময়কর।

আসামীর পক্ষে অনেক সাক্ষী আসিল, কিন্তু তাহাদের জেরা করিবার ক্ষমতা সরকারী কৌঁসিলীর ছিল না—বিচারকগণ, বিশেষ করিয়া লেমেইস্টার এই ভার লইলেন। সাক্ষীগণকে ধমকাইয়া ধোঁকা দিয়া যে সব কথা বাহির হইল, তাহাও আবার ইলিয়টের তর্জমায় কি রূপ ধারণ করিয়াছিল বলা যায় না।

(৬) আসামীর কৌঁসিলির কণ্ঠরোধ : ইম্পের বক্তৃতা

ইংলণ্ডে এই নিন্দনীয় আইনের নাকি এই বিধান ছিল যে, মৃত্যুদণ্ড-যোগ্য অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তির উকিল বা ব্যারিস্টারের জুরিকে সম্বোধন করিয়া বক্তৃতা দিবার অধিকার নাই। সভ্যদেশ বলিয়া খ্যাত ইংলণ্ডে এই যে বর্বরযুগের বিধান, ইহাতে বিস্ময় লাগে।

প্রধান বিচারপতি ইম্পে তখন জুরিদের নিকট বক্তৃতা করিলেন (charge to the Jury)। ইহার অধিকাংশই ন্যাকামির মত শুনায়। কেবল একটি উক্তি এইখানে উল্লেখ করিব। ডক্টর বাস্টিডের *Echoes from Old Calcutta* পুস্তকের ৮৮ পৃষ্ঠাতে এই কথা কয়টি আছে—

"The nature of the defence is such that if it is not believed it must prove fatal to the party for if you do not belive it you determine that it is supported by perjury, and that of an aggravated kind, as it attempts to fix perjury subornation of perjury on the prosecution and his witnesses."

অর্থাৎ আসামী-পক্ষের সাক্ষীর কথা বিশ্বাসযোগ্য না হইলে আসামীর পক্ষে ইহা মারাত্মক। কেন না, আসামী মিথ্যাভাষণের আশ্রয় লইয়া প্রমাণ করিতে চাহেন যে, সরকার-পক্ষই মিথ্যা সাক্ষ্য দিবার দোষে দোষী।

এমন অদ্ভুত যুক্তি বিচারকের মুখে আজ পর্যন্ত কোনও দেশে কেহ শোনে নাই। ইম্পে পদে পদে যথার্থ বিচারনীতিকে পদদলিত করিয়া বিচারকে ঘৃণিত করিয়া তুলিয়াছিলেন।

তারপর জুরিগণ একবাক্যে নন্দকুমারকে দোষী সাব্যস্ত করিলেন; এবং বিচারকগণ তাঁহার উপর মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দিয়া এই প্রহসনের অবসান ঘটাইলেন।

(৭) বেভারিজ সাহেবের সিদ্ধান্ত

বেভারিজ সাহেব নথিপত্র তন্ন তন্ন করিয়া পড়িয়া তাহার বিশ্লেষণ করিয়া এই কয়টি সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। তাঁহার 'মহারাজ নন্দকুমারের বিচার' পুস্তকখানির ৩০২ হইতে ৩৩৮ পৃষ্ঠা পর্যন্ত দ্রষ্টব্য।

১। যে কর্জপত্রটিকে জাল বলা হইয়াছে, তাহা জাল নহে। সেটি প্রকৃতই বোলাকীদাসের সম্পাদিত অকৃত্রিম দলিল।

২। ১৭৭৫ খৃঃ অব্দের মে মাসের পূর্বে নন্দকুমারকে অভিযুক্ত করিবার কোনও চেষ্টাই হয় নাই।

৩। ঘটনা ও অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে প্রমাণিত হয় যে, হেস্টিংস স্বয়ং নন্দকুমারের অভিযোক্তা। ইংরেজী কথা—Strong circumstantial evidence-এর বাংলা ঠিকমত করিতে পারিলাম না।

৪। সরকার-পক্ষের প্রধান সাক্ষী কমলউদ্দিন খাঁর সঙ্গে কান্তবাবুর ঘনিষ্ঠ সংস্রব ছিল এবং কান্তবাবু হেস্টিংসের বেনিয়ান বা মহাজন ছিলেন। কমলউদ্দিনের কথা কখনও বিশ্বাসযোগ্য নহে এবং ক্লেভারিং এবং ফাউক সাহেব উভয়েই বলিতেন—He is an in-

famous creature, the scum of the earth, অর্থাৎ অতি ঘৃণিত জীব এবং পৃথিবীর আবর্জনাস্বরূপ।

৫। বিচার অন্যায়ভাবে পরিচালিত হইয়াছিল এবং প্রধান বিচারপতির ব্যবহার পূর্বাপর নিন্দনীয় ছিল।

৬। জুরিগণ অযোগ্য এবং পূর্ব হইতেই নন্দকুমারের প্রতি বিরুদ্ধভাবাপন্ন ছিল।

৭। ফাঁসির দণ্ড অত্যন্ত গর্হিত হইয়াছে, কেবলমাত্র হেস্টিংসের বিরুদ্ধে অভিযোগের অনুসন্ধান বন্ধ করিয়া দিবার জন্যই এই মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। বেভারিজ সাহেবের সিদ্ধান্ত আরও সংক্ষেপ করিলে এইরূপ দাঁড়ায়—

(ক) জাল প্রমাণিত হয় নাই।

(খ) হেস্টিংস এই মিথ্যা অভিযোগ আনাইয়াছিলেন।

(গ) ইম্পে অসদুদ্দেশ্য-প্রণোদিত হইয়া নন্দকুমারকে ফাঁসি দিয়াছিলেন। ইংরেজী কথাটি আছে Corrupt motive। এই সম্পর্কে বেভারিজ বলিয়াছেন—

"The corrupt motives which he maintains were rightly attributed to Impey, thus, "there are many kinds of corruption and in this case I do not suspect Impey of killing Nun Coomar for a money reward. But if he strained the law in order to convict him and if he sitting as a judge put a man unjustly to death in order to serve a political purpose he, acted corruptly." Quoted by Dr. Busteed, "*Echoes from Old Calcutta.*" p. 398.

ভাবার্থ এই, ইম্পে যে ঘুষ খাইয়া নন্দকুমারের উপর মৃত্যুদণ্ড দিয়াছিলেন তাহা বলিতেছি না, কিন্তু বিচারাসনে বসিয়া আইনের বিধান লঙ্ঘন করিয়া যদি তিনি রাষ্ট্রনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দিয়া থাকেন, তবে তিনি অসদুদ্দেশ্য-প্রণোদিত হইয়া কার্য করিয়াছিলেন।

ইহাকেই বলা যায় Judicial murder অর্থাৎ বিচারের ভান করিয়া অবাঞ্ছিত ব্যক্তিকে হত্যা করা। সকলেই জানেন, উমিচাঁদকে বহু টাকা দিবার (২০০,০০০ পাউণ্ড) প্রলোভন দেখাইয়া একটি সন্ধিপত্র সম্পাদন করিয়াছিলেন ক্লাইভ! তিনি সেই সন্ধিপত্রে ওয়াট্সনের নাম জাল করিয়াছিলেন। উমিচাঁদকে দিয়া কার্য উদ্ধার করাইয়া অন্য একটি সন্ধিপত্র দেখানো হইল, তাহাতে কোনও টাকা দিবার কথাই নাই। বেচারী উমিচাঁদ ক্লাইভের এই ব্যবহারে মর্মাহত হইয়া কিছুদিনের মধ্যেই মৃত্যুমুখে পতিত হন। এই সম্বন্ধে মেকলে বলিয়াছেন, We almost blush to write it : Clive forged Admiral Watson's name (*Macculay's Essays*, p. 231-32) অর্থাৎ মেকলে বলিতেছেন, "আমাদের বলিতে লজ্জা হয়, ক্লাইভ ওয়াটসনের নাম জাল কারয়াছিলেন।"

ক্লাইভ জাল করিয়া বহু লোককে প্রতারণা করিয়া লর্ড হইয়া গেলেন, আর নন্দকুমার জাল না করিয়া ফাঁসি গেলেন।

ফাঁসির আদেশ হইবার পর কৌঁসিলি ফারার এবং অপর বন্ধুগণ নানাপ্রকার আবেদন-নিবেদন করিয়াছিলেন, যাহাতে ফাঁসি না হয়। হেস্টিংস এই কার্যেও বাধা জন্মাইয়াছিলেন। তাহার বিবরণ দিয়া প্রবন্ধটি ভারাক্রান্ত করিব না। কেবল একটিমাত্র দৃষ্টান্ত দিতেছি। বেলি নামধারী একজন বিশিষ্ট ইংরেজ কর্মচারী নন্দকুমারের মৃত্যুদণ্ডের আদেশ কার্যে পরিণত না করিয়া পরিবর্তে অন্য কোন শাস্তি দিবার জন্য চেষ্টা করিতেছিলেন। হেস্টিংস তাঁহাকে ডাকিয়া তীব্র ভর্ৎসনা করিয়া ঐ কার্য হইতে নিরস্ত থাকিতে বলেন। হেস্টিংসের এই কার্য হিংস্রতামূলক বলিব না। নন্দকুমারের মৃত্যু তাঁহার পক্ষে প্রয়োজনীয় ছিল, নন্দকুমার জীবিত থাকিলে হেস্টিংসের মান-মর্যাদা পদগৌরব সমস্তই নষ্ট হইয়া যাইত। সুতরাং নন্দকুমারকে মরিতেই হইল।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন

অ্যালবার্ট হল

(পূর্বানুবৃত্তি)

অতিখর্বাকৃতি একজন ব্যক্তির প্রবেশ। সাধারণ নিয়মে লোকটিকে লক্ষ্য করার কথা নয়, কিন্তু তার ওইটুকু দেহের তুলনায় রীতিমত প্রশস্ত বিলম্বিত দাড়ি স্বভাবতই দৃষ্টি আকৃষ্ট করে। পরনের বেশবাস বিচিত্র। গায়ে একটি রেশমী হাফশার্ট একেবারে ধোপদুরস্ত, আর মালকোঁচা ক'রে পরা ধুতিটা বিপরীতভাবে ময়লা। শার্টের একটি বোতামও লাগানো নেই, তার ফলে বুকের রোমশ অংশটা বিলম্বিত দাড়ির সঙ্গে ছন্দ রক্ষা করছে। ভদ্রলোক ভিতরে ঢোকবার আগে দরজার সামনে মিনিট খানেক দাঁড়িয়ে অভ্যন্তরের চতুর্দিক বেশ ভাল ক'রে দেখে নিলেন। পরিশেষে তাঁর নজর পড়ল দরজার ঠিক সামনাসামনি ছোট একটি পার্টিশনের গায়ে লটকানো পালিশ করা কাঠের ফলকে ইংরেজীতে সাদা হরফে লেখা ইস্তাহারের ওপর—'রাইট ওফ অ্যাড্‌মিশন রিজার্ভ্‌ড্‌'। ভদ্রলোক আপন মনেই তাচ্ছিল্যভরে বললেন, হুঁঃ!

আরে, এই যে নীলুদা—

নীলুবাবু এদিকে আসুন—

ও দাদা, শুনছেন—

চারিদিক থেকে আহ্বান আসছে। কোন্‌খান থেকে কে যে ডাকছে এই নবাগত খর্বাকৃতি ভদ্রলোক ঠাহর করতে পারেন না অবশেষে ভেতরে ঢুকে প'ড়ে প্রথম নজর পড়ল সন্তোষের দিকে। সন্তোষ হেসে ডাকলে, নীলুদা যে, কোত্থেকে ?

নীলুদা কাছে এসে টেবিলের উপর ঝুঁকে প'ড়ে বললেন, সন্তোষবাবু, একটু বসবেন ভাই। খুব দরকারী কথা আছে। ব'লেই তিনি অন্যত্র চ'লে গেলেন, যেখানে সবচেয়ে বেশি ভিড়—অর্থাৎ একটি টেবিলকে কেন্দ্র ক'রে প্রায় আট-দশখানি চেয়ার পড়েছে সেইখানে গিয়ে ভদ্রলোক আটকে পড়লেন। কেউ বললে,

মিস্টার দস্তিদার, একটু বসুন; আপনার সঙ্গে বিশেষ কাজের কথা আছে। কেউ বা অন্যের দৃষ্টি বাঁচিয়ে চোখের ইশারায় বোঝাবার চেষ্টা করল, তাঁর সঙ্গে খুব গোপন কিছু পরামর্শ হবে। অতি অল্পক্ষণের মধ্যেই রাজনৈতিক আলোচনার ধারাটা পরিবর্তিত হয়ে গেল। নীলাম্বর দস্তিদারকে নিয়েই সবাই ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

নীলাম্বর দস্তিদার সম্বন্ধে অনেক গুজব শোনা যায়। ইনি নাকি বিড়লার সেক্রেটারিদের সঙ্গে সরাসরি দোস্তি করেন, কেউ বা বলে অ্যাণ্ডারসন হাউসে এঁর অখণ্ড প্রতাপ—যখন-তখন অমন দশ-বিশটা সরকারী ঠিকাদারি মঞ্জুর করিয়ে ফেলতে পারেন এই নীলাম্বর দস্তিদার। অথচ বাইরে থেকে দেখে বোঝবার উপায় নেই এসব কিছুই।

নীলাম্বর ঝট্ ক'রে পকেট থেকে গোল্ডফ্লেকের একটা টিন বার ক'রে টে'বলে রাখলেন। অমনি কাড়াকাড়ি প'ড়ে গেল। এবং মিনিট খানেক হাতাহাতির পর টিনটা যখন টেবিলে ফিরে এসে বসল, তখন তার ভেতরটা ফাঁকা। নীলুদা স্মিতহাস্যে বললেন, তোমরা দেখছি সাগ্নিক যজ্ঞ শুরু ক'রে দিলে। দেখ দেখ, ধোঁয়া উঠছে যেন রেলের ইঞ্জিনে কয়লা দেওয়া হয়েছে! বাঃ—

নীলুদা, আপনি তো সিগারেট খেতেন না, আপনার পকেটে—

বুঝলে না, এসব হচ্ছে ইন্‌স্পেক্টরদের জন্যে। কথা বলতে গেলে সিগারেট না অফার করলে কানই খোলে না যে!

বলেন কি, স্রেফ সিগারেট দিয়ে কাজ হাসিল?

দূর, তা কেন হবে? এটা হচ্ছে মুখপাত। সিগারেট দিলে কান দিয়ে কথা শোনেন, তার পর তো মুখ খোলেন চোখের দিকে চেয়ে চেয়ে, আর কলমের খোঁচা মারতে গেলে বাবা সলিড ইয়ে—মানে, হাতে হাতে চাই—যে বিয়ের যা মন্তর। যাকগে, তোমাদের কাছে এসেছি খুব জরুরী কাজে।

সকলেই উন্মুখ হয়ে উঠল—বলুন, বলুন।

আমার হাতে একটা নতুন স্কিম্‌ এসেছে। মানে, আমরা অনায়াসে একটা বড় ইন্‌ডাস্ট্রি গ'ড়ে তুলতে পারি। ব'লে তিনি সকলের মুখের দিকে তাকিয়ে নিলেন—এমন কিছু শক্ত ব্যাপার নয়। যদি আমি একা করতে চাই বা দু-তিনজনে চেষ্টা করি, তা হ'লে অবশ্য কঠিন, কিন্তু সবাই মিলে আমরা অনায়াসে একটা ইঁটের ভাটা জ্বালাতে পারি। এখানে আমরা কজন আছি? এক, দুই, তিন···এগারো জন মোট। আচ্ছা, বেশি নয়, প্রত্যেকে যদি এক হাজার ক'রে লাগিয়ে দিই, এগারো হাজার টাকা। তার মানে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে তোমার—। ব'লে তিনি পকেট থেকে চট্‌ ক'রে একখানা নোটবই বার ক'রে হিসেব কষতে বসলেন। কেউ কেউ ঝুঁকে প'ড়ে দেখতে লাগল, কেউ বা মুখ টিপে হাসতে হাসতে স'রে পড়ল।

মিনিট দশেকের মধ্যে নীলাম্বর দস্তিদার আর ঘাড় তুললেন না, সারি সারি অঙ্কের ভিড়ে ছোট নোটবইখানার সাতটি পাতা ভর্তি হয়ে গেল। তার পর হাসিমুখে তিনি খাতাখানা টেবিলের ওপর ফেলে দিয়ে বললেন, এই দেখ, তোমাদের চোখের সামনে টু দি পাই-ফার্দিং হিসেব প'ড়ে আছে। ছ মাস—মাত্র ছ মাসের মধ্যে এগারো হাজার টাকার ওপর নেট মুনোফা হচ্ছে আট হাজার সাত শ তিয়াত্তর টাকা পাঁচ আনা সাড়ে সাত পাই। এর একচুল এদিক ওদিক হবার উপায় নেই। এ ছাড়া আরও আয়ের পথ দেখিয়ে দিচ্ছি, আমরা মাসে প্রায় তিন শ গ্যালন পেট্রোলের পারমিট পাব, অথচ আমাদের খরচ হবে এক শ গ্যালন। বাকি দু শ গ্যালন মাসে অর্থাৎ ছ মাসে বারো শ গ্যালন ব্ল্যাকে কুপন ছেড়ে দিলে খুব কম ক'রে আড়াই হাজার টাকা। তা ছাড়া আমাদের যদি দশ লাখ ইঁট হয়, তার ওপর কিছু টাকা খাওয়াতে পারলেই অন্তত পনেরো লাখের বিল পাস করিয়ে নেওয়া যায়। সে সব বাদও যদি দেওয়া যায়, আমাদের হক্কের—। হঠাৎ তাঁর কথা থেমে গেল। খেয়াল হ'ল, তাঁর সামনে মাত্র তিনজন ছাড়া আর সবাই উধাও হয়েছে। নীলাম্বর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে

বললেন, এই জন্তেই আমাদের জাতের কিছু হ'ল না। আরে মশাই, আমি কি এখুনি টাকা চেয়েছি? এরা সবাই ভয়ে পালিয়েছে? তা হ'লে তোমরা বুঝে দেখ ভাই, যার জন্তে চুরি করি সেই বলে চোর।

অবশিষ্ট তিনজনের মধ্যে একজন বললে, বাদ দিন ওদের কথা।

যা বলেছ! আগেভাগে কেটে পড়েছে সেটা একদিক দিয়ে মঙ্গল। যতসব বাজে এলিমেণ্ট! তা তোমরা তা হ'লে এই স্কিমে থাকছ তো? আমি চাই অনেস্ট ইয়ংমেন। আরে ভাই, এক হাজার টাকা যেমন ঢালছি, তেমনি আমরা তো আবার ওই কোম্পানির কাজে কেউ কেউ এক-একটা দিকের চার্জ নিতে পারি। যেমন ধর, ইঁট পোড়াবার জন্তে কয়লা চাই, এখন তুমি কলিয়ারিতে গিয়ে কয়লার কণ্ট্রাক্টরকে বললে যে, তাকেই এই কণ্ট্রাক্ট পাইয়ে দেবে, অতএব একটা লাভের শেয়ার তার কাছে তুমি আদায় করলে। এমনি ধরনের বিস্তর পথ খোলা রয়েছে।

দেখুন, আপনার গলা শুকিয়ে গেছে। কফি—। বললে একজন।

দ্বিতীয় ব্যক্তি বললে, ক্ষিদেও পেয়েছে মনে হচ্ছে যেন।

নীলাম্বর হাঁক দিলেন, বয়, এই বয়!

বয় এসে দাঁড়াতেই তিনি বললেন, চারটে কফি। আর, আর কি পাওয়া যায়?

পার্শ্বস্থ তিনজন তার জবাব দিলে, মাটন স্যাণ্ডউইচ, ফাউল কাটলেট।

আচ্ছা, আচ্ছা, আপনাদের জন্তে তা হ'লে ফাউল কাটলেট আর মাটন স্যাণ্ডউইচ। আমাকে আলুভাজা, কাজুবাদাম। যাও, জলদি লাও।

আপনার মত এ রকম বিজনেস আইডিয়া যদি থাকত দশজন বাঙালীর, তা হ'লে আজ ওই মারোয়াড়ীদের হাতে বাংলার ভাগ্যকে বিড়ম্বিত হতে হ'ত না। ব'লে এরা তিনজনে পরস্পরের মুখচাওয়াচাওয়ি করতে লাগল

নীলাম্বর উত্তেজিত ভাবে বললেন, সেই কথা ভেবেই এ ব্রত নিয়েছি। নইলে নিজেরটুকু গুছিয়ে চলতে চেষ্টা করলে আজ আমার পয়সা খায় কে! এই যে আজ আপনারা আসছেন ইন্‌ডাস্ট্রির দিকে এগিয়ে—এই আমার লাভ। সারা জীবন ধ'রে যদি এক শ লোককেও এই দিকে আনতে পারি তা হ'লেই আমি খুশি। যারা আজ পালালে তারা ভুল করলে, অবিশ্যি যখন দেখবে আপনারা সাক্‌সেস্‌ফুল হয়েছেন তখন তারা ছটফট করবে, ছুটে আসবে পস্তাতে। ব'লে নীলাম্বর আত্মপ্রসাদের হাসিতে স্নিগ্ধ কণ্ঠে বললে, আপনাদের নাম ঠিকানা আমার এই নোটবুকে লিখে দিন। ব'লে নোটবুকটা এগিয়ে দিলেন তিনি।

লেখা হয়ে গেল। ওয়েটার এসে খাদ্যসম্ভারে টেবিলটা বোঝাই ক'রে দিয়ে চ'লে যাচ্ছিল, নীলাম্বর তাকে ডেকে বললেন, এখুনি বিল আনো ফওরান্।

ওয়েটার চ'লে যেতেই নীলাম্বর আপন মনে বিড়বিড় ক'রে কি যেন বলতে লাগলেন। টেবিলের বাকি তিনজন ব্যক্তি নিবিষ্টমনে আহার্যের প্রতি সুবিচারে ব্যস্ত। এরা নীলাম্বরকে অনেক দিন থেকেই দেখছে এবং ভাল ক'রে চেনে ব'লেই অন্য সকলের মত ভয়ে পালায় নি।

হঠাৎ একসময়ে নীলাম্বর ব'লে উঠলেন, আরে, আরে মাত্র বিশটে কাজুবাদামের জন্যে এরা চার আনা দাম নিচ্ছে? দেখুন মশাই, একবার কারবারটা দেখুন! কলকাতা শহরে তো পয়সা উড়ে বেড়াচ্ছে, ধরতে জানলেই ধরা যায়। এই এক কাজুবাদামের ওপরে বছরে লাখখানেক টাকা লাভ।

ব'লে তিনি নোটবই খানা খুলে বসলেন, এবারে হিসেব বেশ জোরে জোরে চলল, এখান থেকে চ'লে যান ভাইজাগে। সেখানে এখন আড়াই থেকে তিন টাকা সের কাজুবাদাম। এখানকার ক্যাশুনাট্‌স্ কাজুবাদামের দেহাতী নাম লঙ্কাআম্ব। আচ্ছা, এখানে বাজারদর পাঁচ টাকা। আর আপনি যদি দেড় শ টাকা মণেও ছাড়েন, তা হ'লে মণ-করা পঞ্চাশ টাকা, মানে খুচরো আর পাইকিরির দর তো এক নয়!

মাসে ছ শ মণ অনায়াসে চালান দিন, দেখুন, লাখ টাকা বছরে হাসতে খেলতে। এ ব্যবসাটাও মন্দ নয়।

ইতিমধ্যে ওয়েটার বিল আনতেই একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে ভদ্রলোক বুকপকেট থেকে একগোছা নোট বার করলেন, সকলেই সবিস্ময়ে দেখল, প্রায় সবই এক শ টাকার নোট। তার মধ্যে থেকে একখানা দশ টাকার নোট টেনে নিয়ে নোটের তাড়াটা পকেটে রাখতে রাখতে দ'স্তদার বললেন, আমার ভাই একদম সময় নেই ; এখন অনেক কাজ। তোমরা খাওয়াদাওয়া কর। পরে বা'ড়তে দেখা করব। আরও জনকয়েক যোগাড় ক'রে নিই, তারপর লিমিটেড্ কোম্পানি ফ্লোট করা যাবে।

আশ্চর্য এই যে. সামান্য কয়েক মিনিটের মধ্যে নীলাম্বর আলুভাজা, কাজুবাদাম এবং আগুনের মত গরম কফি সব নিঃশেষ ক'রে ফেলেছেন।

আরও দু-তিন জায়গায় থমকে দু-চার কথা ক'য়ে তিনি সন্তোষদের টেবিলের পাশ দিয়ে চ'লে যাচ্ছিলেন বেশ হন-হন ক'রে। অরুণ তাঁকে হাঁক দিল. এই, এই মশাই!

নীলাম্বর বিস্মিত হয়ে তাকালেন, আরে শ্রীঅরুণানন্দ মহারাজ যে! তুমি এখানে যে?

অরুণ বললে, বাঃ, বেশ! তার পর কেমন আছ, কি করছ? ভাই, তোমার সেই খাঁটি গাওয়া ঘি যে চাই।

ঘিয়ের ব্যবসা তো ছেড়ে দিয়েছি অনেক দিন। আমাদের দেশে ঘি খাবার মত পয়সা কজনের আছে? অনেক ভেবে দেখলাম, বাংলা দেশের লোক ভাত না খেয়েও বাঁচতে পারে, কিন্তু সরষের তেল নইলে একতিলও চলে না। তাই সরষের তেল নিয়ে পড়েছি।

বাঃ, এই তো বাবা এবারে গোল্ডেন মাইন—মানে সোনার খনি খুঁড়ছ! তা কোথায় ঘানি ব সয়েছ? আমাদের স্রেফ ফাঁকি দিতে চাও? মাইরি, সেই যে ঘি খেয়েছি, আজও ভুলতে পারি নি।

আর হ্যাঁ ছাখো, সেই ঘিয়ের দরুন তুমি কিছু টাকা পাবে। মা বলছিলেন, একদিন গিয়ে নিয়ে এসো।

আরে, যদি যাই তো টাকার জন্যে কি আর মার কাছে যাব? তাঁর হাতের পরোটা আর আলুর দম অনেক দিন খাই নি। ব'লে নীলাম্বর হো-হো ক'রে হেসে উঠলেন।

সন্তোষ হাঁক দিলে—আরে মশাই, বসুন আসুন। কি যে দরকারী কথা ছিল ব'লে গেলেন?

নীলাম্বর ব্যস্তভাবে এসে চেয়ার দখল করলেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ, আপনার সেই বইখানা কদ্দূর এগুলো?

যাক, তবু আপনি জানতে চাইলেন। আহা, আপনার সঙ্গে যদি রোজ দেখা হ'ত, আর একবার ক'রে এইভাবে জিজ্ঞেস করতেন, তা হ'লে বইটা কবে শেষ হয়ে যেত। আপনি বোধ হয় ছ মাস পরে এলেন, না?—সন্তোষ জিজ্ঞাসা করল।

না। আসি-যাই হরদম, তবে এদিকে আসার সময় পাই নে, লক্ষ্ণৌ-কানপুর অঞ্চলেই বেশির ভাগ থাকতে হয় কিনা!

সেখানে কি ব্যাপার?—প্রশ্ন করলে অরুণ।

ও-ধারে বাজারটা খুব ওঠাপড়া চলছে কিনা। ফসল ধর আজ, আর ছাড়ো কাল—দু আনা মণ-পিছু লাভ হবেই। সে সব অনেক ব্যাপার!—নীলাম্বর বললেন।

দু আনার জন্যে এতখানি ছুটোছুটি?—অরুণ হাসল।

ওহে মশাই, মণ-পিছু দু আনা, তুমি আট শ মণ ধর না। একদিনে হয়ে গেল এক শ টাকা লাভ। কেবল মহাজনকে গুদোমভাড়াটা দিয়ে দাও।—নীলাম্বর বিজ্ঞভাবে হাসলেন।—করবে? সরষের ব্যবসা? তার থেকে একদিন আমরা তেলকলও খুলতে পারব।

সন্তোষ এবং অরুণ দুজনেই প্রলুব্ধ দৃষ্টিতে নীলাম্বরের দিকে তাকিয়ে রইল।

তিনতলার ব্যাল্‌কনি থেকে সতীশ দেখতে পেয়েছিল নীলাম্বরকে।

এতক্ষণ ধ'রে সে তার অংশীদারকে নিয়ে হিসাবনিকাশ করছিল। তারা উভয়েই একটি বড় স্টিবেডর কোম্পানিতে চাকরি করে এবং ব্যবসায় করে খুব গোপনে। তাদের আলাদা কোন আপিস-দপ্তর নেই, দুজনেই এখানে মিলিত হয় এবং আপিস ভাড়ার আধা খরচে কফিখানাতে খাওয়াদাওয়া, কারবারের লেখাপড়ার কাজ সব কিছুই সেরে নেয়।

নীলাম্বরকে দেখতে পেয়ে সতীশ তার অংশীদারকে বললে, তুমি ভাই একটু ব'স। আমি একবার নীচে যাচ্ছি।

কি হ'ল আবার?

সেই যে দাড়িয়ালা দস্তিদার, যাকে আজ ছ মাস ধ'রে খুঁজছি, সে শালা ওই নীচে ব'সে আছে। আমি যাচ্ছি।

সতীশকে দেখে নীলাম্বর চিৎকার ক'রে উঠলেন, আরে আরে, মেঘ না চাইতে জল! তোমাকে খুঁজে-খুঁজে হদ্দো। সতীশ মহারাজ, তারপর কি খবর বল? ব'লে নীলাম্বর সাগ্রহে সতীশের ডান হাতখানা ধ'রে খুব জোরে রগড়ে দিল।

সতীশ গম্ভীরভাবে বললে, কতকগুলো কাজের কথা ছিল।

নীলাম্বর হেসে জবাব দিলেন, তুমি অনায়াসে এঁদের সামনে বলতে পার। এঁরা দুজনেই আমাদের অয়েল মিলের ডিরেক্টর।

সতীশ তবুও আশ্বস্ত হ'ল না, কত দূর কি করলেন বলুন তো?

এত ব্যস্ত হবার কাজ কি এসব? ছোট মূলধন নিয়ে বড় কারবার করতে গেলে তো টাকাকে বাড়িয়ে নিতে হবে। তাই করছি। আমাদের মিলের চাক ঘুরবে আজ থেকে সাত মাস পরে।

সতীশ বললে, ওসব ঘোরাফেরার কথা বাদ দিন। আপনি যে কোথায় থাকেন, কি করেন—কিছু জানবার উপায় নেই।

গর্জন ক'রে উঠলেন নীলাম্বর, আমাকে অবিশ্বাস করতে চাও তো বল, তোমাদের টাকা ফেরত দিয়ে দিচ্ছি। আফটার অল আমি একজন স্বাধীন ব্যবসায়ী। সব সময় কোথায় থাকি, কি করি এ

হিসেব দিতে গেলে আর ব্যবসা করা যায় না। এই তো কাল যাব রেওয়া স্টেটে, সেখান থেকে ওয়াগন ক'রে সরষে চালান দেব—বয়েল মিলেরই হিসেবে সে টাকা জমা পড়বে।

সন্তোষ এবং অরুণ পরস্পরের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখছে ঘন ঘন।

সতীশ বললে, আমার নিজের কথা বলছি না। আমি তো এ সব প্রশ্ন তুলি নি. যারা আমার কথার ওপর বিশ্বাস ক'রে তাদের সামান্য দু-এক শ টাকা পুঁজি আপনার হাতে তুলে দিয়ে ব'সে আছে, তাদের কাছে আমি বড্ড ছোট হয়ে গেছি। তারা মুখের ওপর আপনার নামে যা-তা বলে!

আচ্ছা, আমি শীগগির ডিভিডেণ্ড ডিক্লেয়ার ক'রে দিচ্ছি।—ব'লে নীলাম্বর সান্ত্বনা দিলেন সতীশকে।

সতীশ বললে, আজ দু বছর ধ'রে তাদের এই এক কথাই শোনাচ্ছেন, কিন্তু—

আঃ! দীজ্ ইম্পার্‌টিনেণ্ট ফুল্স্! এরা কি বোঝে ব্যবসার?

সতীশের মুখ রাঙা হয়ে উঠল, কেউ কিছু বোঝে না, যা কিছু সবই কি আপনি বোঝেন? যদি এতই বোঝেন তো—

নীলাম্বর টেবিলের ওপর এক ঘুষি মেরে বললেন হ্যাঁ, আমি বুঝি। বুঝি ব'লেই আজও মাথার ওপর দশটা বিজ্‌নেস প্ল্যান্ খেলিয়ে বেড়াতে পারি।

চারিপাশের খরিদ্দারেরা কৌতূহলী হয়ে উঠেছে।

নীলাম্বর হেঁকে বললে, এই দেখ, এই ছেঁড়া পকেটে পাঁচ হাজার টাকা নিয়ে ঘুরে বেড়াতে পারি।

সতীশ উত্তেজিত ভাবে জবাব দিলে, পরের টাকা অমন সবাই দেখিয়ে বেড়াতে পারে। আপনাকে জানতে আমার বাকি নেই। আপনার কারবারের দৌলতে আপনার মায়ের সব অলঙ্কার ঘুচেছে, বাপের জমিজমা সব আপনার ওই বিজ্‌নেস বুঝতেই বিক্রি হয়ে

গেল। বাজারে আপনাকে যারা চেনে, তারা ফেরারী জোচ্চোর ব'লেই আপনাকে চিনে রেখেছে। আর—আর বলব ?

এক লাফে নীলাম্বর সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বললে, আর একটি কথা বলেছ তো আমি এই জানলা দিয়ে লাফিয়ে পড়ব। আমি আত্মহত্যা করব। তোমার জন্যে আমাকে মরতে হবে যা দেখছি। মানুষ এতটুকু শান্তিতে থাকে এটা তোমাদের সহ্য হয় না! না ?

সন্তোষ ব্যস্ত হয়ে বললে, নীলুদা, আপনি শান্ত হয়ে বসুন।

অরুণ বিরক্তিভরে সতীশের দিকে তাকিয়ে বললে, কাকে কি বলতে হয় না-হয় এটুকু জানেন না মশাই! এখান থেকে কেটে পড়ুন দেখি। আমরা জানি এ রকম উদার আদর্শের মানুষ বর্তমান যুগে হয় না।

সতীশ কপালের ঘাম মুছতে মুছতে বললে, ওসব টল্ টক্স্ রাখুন। পরের পয়সা নিয়ে যারা ছিনিমিনি খেলে তাদের খাতির করব ?

আঃ, মশাই! বেশি বাজে বকবেন না। চ'লে যান।—ব'লে অরুণ অঙ্গুলিসঙ্কেতে খোলা দরজাটা দেখিয়ে দিল। আরও দু-একজন লোক আশেপাশে এসে দাঁড়িয়ে ছিল, তারাও অরুণকে সমর্থন করলে। সতীশের চেহারার মধ্যে একটা উত্তুঙ্গ দাম্ভিকতাই বোধ করি তাকে অপরের দৃষ্টিতে অপরাধী প্রমাণ করেছে। সে আত্মপক্ষ সমর্থনের দ্বিতীয় ব্যক্তি না পেয়ে আস্তে আস্তে চ'লে গেল।

নীলাম্বর কিছুক্ষণ টেবিলের ওপর মাথা রেখে চুপ ক'রে ছিল। এক সময়ে সন্তোষ প্রশ্ন করলে, আপনার কি শরীর খারাপ করছে নীলুদা ? বলুন, তা হ'লে আপনাকে বাড়ি পৌঁছে দিই।

ধীরে ধীরে ক্ষীণকণ্ঠে নীলাম্বর বললেন, আমি এখন কোথায় ?

অরুণ বললে, কফি-হাউস এটা।

ও, কফি-হাউস। আমাকে যে একবার মেরিন ড্রাইভে যেতে হবে।

মেরিন ড্রাইভ ? সে কোথায় ?—অরুণ প্রশ্ন করল।

সন্তোষ হেসে উঠল, বম্বেতে। একবার দেখ কল্পনার দৌড়। এক কথায় কলকাতা থেকে বম্বে।

ও, এটা বুঝি কলকাতা? নীলাম্বর ঘাড় তুলে একবার চারদিকে তাকিয়ে বললেন, কি যেন একটা গোলমাল হচ্ছিল এখানে?— কতকটা শূন্য দৃষ্টিতে নিজের হাতের মুঠোটা পাকাতে লাগলেন।

সন্তোষ বললে, আপনি কোথায় যাবেন এখন, পৌঁছে দিয়ে আসব। আপনাকে অসুস্থ মনে হচ্ছে

আমি! আমি চ'লে যাব হিমালয়ের গিরি-গহ্বরে, এই লেনা-দেনা, বেচা-কেনা আর ভাল লাগে না। না, না, না। মাটি সোনা, সোনা মাটি, মাটি সোনা। ঘন ঘন দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে নীলাম্বর চঞ্চল হয়ে উঠলেন।

অরুণ বললে, আমরা তা হ'লে খাঁটি তেল পাব না যে!

তোমাদের জন্যে দুঃখ হয়, আর এই দুঃখবোধই আমাকে আজও পঙ্গু ক'রে রেখেছে ভাই। নইলে— যাকগে। আমি চোখের সামনে দেখতে পাই, বাঙালী যদি টুকরো টুকরো কারবার না ক'রে আজ এক হয়ে বড় একটা কিছু করত, তা হ'লে আমার স্বপ্ন সত্য হয়ে উঠত। শুধু অন্নের দুঃখে আমাদের সংস্কৃতি শিক্ষা জীবন—সব কিছুই বিপন্ন। সেটুকু ঘোচাতে পারলেই আমি হিমালয়ে চ'লে যাব। পর-মুহূর্তে নীলাম্বর ওয়েটারকে ডেকে ফরমাশ করলেন, এই, কফি আন, বাবুদের জন্যে মাটন কাট্‌লেট।

সন্তোষ ঘাড় নেড়ে বললে, আরে আরে, মাটন কাট্‌লেট আমি খাব না। আমার যে মিউকাস কোলাইটিস।

নীলাম্বর ধমক দিয়ে উঠলেন, ও তো সকলেরই থাকে, যতদিন বাঁচবে ততদিন অসুখও থাকবে, খেয়ে নাও।

ঠিক হ্যায়—ব'লে অরুণ এক টিপ নস্যি নিল।

কয়েক মিনিট পরে নীলাম্বর যখন বিদায় নিলেন তখন অরুণ বললে, আবার কবে দেখা হচ্ছে দাদা?

নীলাম্বর বললেন, শিগগির চিঠি পাবে। অয়েল মিলের ডিরেক্টর্স্ মিটিঙে যেতে হবে কিন্তু।

সন্তোষ এবং অরুণ আকাশ থেকে পড়ল যেন, বললে, সে কি!

আবার কি! আমি তো ব'লেই দিয়েছি, তোমরা অয়েল মিলের ।ডরেক্টর।

টাকা পাব কোথায়?

পরে দিও, আপাতত আমি ধার দিয়ে তোমাদের নামে হাজার টাকার শেয়ার বিক্রি ক'রে দিচ্ছি। খাতায় কলমে তো।

অরুণ বললে ও-সব গোলমেলে ব্যাপারে আমি নেই বাবা। মাকে না শুধিয়ে কিচ্ছুটি করতে পারব না।

সন্তোষ হাসল, আচ্ছা, সে তখন দেখা যাবে।

নীলাম্বর খাতা খুলে খচ-খচ ক'রে কলমের তিন খোঁচাতে ওদের দুজনকে তেলকলের অংশীদার ক'রে নিয়ে ব্যস্ত ভাবে বেরিয়ে গেলেন।

নীলাম্বর চ'লে যাওয়ার পর কয়েক মিনিট ওরা কেন যে চুপ ক'রে ছিল, কি ভাবছিল, তা কিছুতেই বলতে পারল না পরস্পরকে। এটা ওদের নিজের কাছে খুবই বিস্ময়কর মনে হ'ল। অরুণ বললে, এ রকম বন্ধ্যা মুহূর্ত আমার খুব ভাল লাগে।

সন্তোষ বিষণ্ণ। সে বললে, এর নাম মৃত্যু। এই যে সময়টা কিছুই ভাবলাম না, সেইটুকুই মৃত্যু হ'ল। আবার নতুন ক'রে ভাবনার দাড়ি গজিয়ে তুলে তবে এগুনো যাবে

আহ্:, তুমি কি যে বল বোঝা দায়!

বুঝবে না। এই যে মানুষটা ছুটে ছুটে বেড়াচ্ছে বিজ্‌নেস নিয়ে, তাকে বুঝতে পার?

ওর মধ্যে একবোঝা দাড়ি, আর তা ছাড়া কিছু নেই।

ছাই বুঝেছ। ও হচ্ছে মর্ডান এজের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ। সাধ আছে সাধ্য নেই, পিপাসা আছে বড় কিছু গ'ড়ে তোলবার কিন্তু শক্তি নেই,

আছে ওর চোখে স্বপ্নের প্রসারতা কিন্তু দোসর পাচ্ছে না, তাই ছুটে ছুটে বেড়াচ্ছে তোমার আমার কাছে।

সিলি। যত সব ঝুট ঝামেলা হটাও। ও-সব জানি নে, আমি রঞ্জনার সেক্‌শনে বদ্‌লি হ'চ্ছি। রঞ্জনা, রঞ্জনা—

রঞ্জনা তোমাকে বিয়ে করবে?

আজই কি আর করবে? তবে একদিন তাকে আসতেই হবে আমার কাছে।

কেন আসবে? তোমার মত মানুষকে পছন্দ করতে তার ব'য়েই গেছে।

আলবাৎ করবে, আমি রূপে তোমায় ভোলাব না, ভালবাসায় ভোলাব। জান্‌ লুটিয়ে দেব সালা।

আর অমনি সে পাগল হয়ে যাবে?

হবে, হবে। কিন্তু ওর বাড়ি থেকেই ফ্যাঁকড়া তুলবে, এই হচ্ছে মুশ্‌কিল। এতদিন তোমায় ব'লি নি, জান, ও আমাকে ভালবাসে। আমার সঙ্গে আপিসের ফেরত বাড়ি যেতে পারলে কি খুশিই যে হয়! শুধু তোমার জন্য আমি যেতে পারি না ওর সঙ্গে।

গেলেই পার।

শেষে মনটা বড় দক্‌চে যায়। ট্রাম থেকে নেমে ও তো বাড়ি চ'লে যায়, তারপর আমি বোকার মত কি করি ভেবে পাই নে। তা ছাড়া ওই জড়িয়ে যাবার ভয়েই তো এড়িয়ে বেড়াই। বাইরে থেকে খুব পুলকের পায়রা মনে হয় রঞ্জনাকে, কিন্তু বিয়ে করা খুব শক্ত ওর পক্ষে। সংসারের অর্ধেক খরচই ওকে চালাতে হয়।

সন্তোষ বললে, আমাদের আপিসেও সব মেয়েরই ও-রকম হালচাল। চাকুরে মেয়ে বিয়ে করতে যেও না অরুণ।

তবে দূর থেকে ভালবেসে যাব?

তাই কর। সত্যি ও-বেচারী যদি চাকরি ছেড়ে দেয় তা হ'লে বাড়িতে ওর—

সন্তোষের কথা শেষ হবার আগেই অরুণ বললে, ওর ভাইয়ের ইস্কুলের পড়া বন্ধ হয়ে যাবে, আরও কি যে হবে ভাবা যায় না। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে অরুণ বললে, চল সন্তোষ, গড়ের মাঠে গিয়ে রঞ্জনার জন্যে দশ মিনিট মন খুলে কেঁদে নিই। খোলা আকাশের নীচে, যেখানে কোথাও দেওয়াল নেই, কোনও বন্ধন নেই, জানবে না কেউ, সেখানে ব'সে ওর মঙ্গল কামনা করব আর প্রাণ খুলে ভালবাসার বদ্ধ গ্যাসটুকু বাতাসে ছড়িয়ে দেব। দেখ, দেখ, বুকটা আমার কি ভীষণ ভারী হয়ে উঠেছে!

সন্তোষের কণ্ঠস্বর আর্দ্র হয়ে ওঠে—দূর থেকে ওকে তুমি ভালবেসে যাও।

তাই বেশ ভাল। মনে মনে ওকে কত চিঠি লিখি আমি, কিন্তু ডাকে ফেলি না। চল, যাই গড়ের মাঠে।

সন্তোষ স্মিতদৃষ্টিতে বন্ধুর মুখের দিকে তাকিয়ে মৃদু জড়িত কণ্ঠে প্রায় মেয়েলী আবৃত্তির ভঙ্গিতে বললে, দেখ অরুণ, তুমি অত্তই বা ভাবছ কেন? ভালবাসো প্রচণ্ড ভাবে, জয় ক'রে নাও স্বার্থপরের মত। আর কোন দিক না তাকিয়ে, আর কারও কথা না ভেবে ডুবে যাও সেই পাগলা নেশায়। কেড়ে আন ওকে সেই স্বার্থপর সংসারের সর্বগ্রাসী কবল থেকে, ওরা কেন রঞ্জনাকে এমনি ভাবে চুষে চুষে ওর সবটুকু রস নিংড়ে নেবে? রঞ্জনার জীবন, ওর যৌবন, ওর যা কিছু সর্বোত্তম, তা কি শুধু ওদের সংসার-যন্ত্রের চাকার চাপে পিষে মরবার জন্যে?

কিন্তু তাতে আগুন জ্বলবে যে! ওদের সংসারের সেই আগুনের হল্‌কা এসে যে আমাদের সংসারকেও ছারখার করবে! তার কি উপায়?

উপায়? উপায় আবার কি? এই ভাবে তিলে তিলে শুকিয়ে শুকিয়ে টিকে থাকার চেয়ে তীব্রভাবে বাঁচা ঢের ভাল। জ্বলুক, আগুন জ্বলুক, ধুলো উড়ুক, ঝড় উঠুক। একটা প্রলয় হয়ে যাক। কিছু না

হওয়ার এই যে দৈন্য, তার চেয়ে দাউ দাউ ক'রে জ্ব'লে পুড়ে মরার মধ্যেও জীবনের একটা রূপ ফুটে ওঠে। বাঁচ, বাঁচ। লিভ্ ডেঞ্জারাস্‌লি অ্যাণ্ড ডেস্‌পারেটলি আপ টু ডেথ। কথা বলতে বলতে উত্তেজিত ভাবে সন্তোষ উঠে দাঁড়াল—অরুণ, তুমি নিজের মনের ধোঁয়াতে ধুঁইয়ে ধুঁইয়ে মরছ কেন? একবার মানুষের মত ভুল ক'রে ফেল, তার পর—

আরে, ক্ষেপে গেল যে হঠাৎ!—অরুণ বললে।

না না, ক্ষেপি নি। আমার ঝুটো মুখোশটা খুলে গেছে। আমার মনে যে পিপাসা সব সময়ে ঠুকরে বেড়ায়, কিন্তু এই রক্ত-মাংস-হীন ঘুনধরা কাঠের মত চেহারার জন্যে কোথাও ভিড়তে পারল না—তারই তাড়না তোমার মধ্যেও রয়েছে দেখতে পেয়েছি। আমাকে আজও কেউ তো ডাকল না, কিন্তু তোমাকে ডেকেছে,—তুমি ছেড়ো না, দিয়ে যাও নিজেকে হৈ-হৈ ক'রে। তার পর—

আলোগুলো নিবে গেল হঠাৎ। নিমেষের মধ্যে চারপাশের মানুষগুলো কোথায় অন্ধকারের অতলে ডুবে যাচ্ছে, শুধু কোলাহল আর কলরবের মুখরতায় ঘরের অন্ধকার গমগম করছে। অরুণের মনে হ'ল, মৃত্যু এসেছে, মৃত্যু ঘিরে ফেলেছে সব কটি মানুষকে।

কি হ'ল! কি হ'ল!

ফিউজ হয়ে গেছে। আলো ফিউজ।

অসংখ্য কণ্ঠের কলরব। কারও কোন কথা স্পষ্ট বোঝা যায় না। গোলমাল ক্রমশ বেড়েই চলেছে। অন্ধকারে অসংখ্য কণ্ঠ থেকে সহায়-সম্বলহীনতার অজস্র খেদোক্তি দিক্‌দিগন্তকে আচ্ছন্ন ক'রে ফেলেছে।

অরুণ বললে, সন্তোষ, তুমি কি করছ?

আমি দেখ'ছ।

কি বললে? কিচ্ছু শুনতে পাচ্ছি না।

সন্তোষ মুখটা এগিয়ে এনে বললে, চুপ ক'রে শোন, মনকে গুটিয়ে নাও। দেখতে পাবে।

চল, বেরিয়ে যাই এখান থেকে। সাংঘাতিক অন্ধকার, বুকটা গুমরে উঠছে, পালাই চল।

কোথায় যাব? অন্ধকারের মধ্যে এতগুলো মানুষ ব'সে রয়েছে, কিছু করতে পারছে না, এটাই তো ভাবতে ভাল লাগে। দিস্ ইজ আওয়ার এজ—এইখানে আপনাকে খুঁজে খুজে আবিষ্কার করতে হবে।

সিঁড়িতে হুড়দাড় শব্দ হচ্ছে। অনেকে পালাচ্ছে। কিন্তু শব্দটা তো মিলিয়ে গেল না, আরও কাছে আসছে। অরুণ চেয়ে দেখলে, অন্ধকারে অসংখ্য জোনাকী পোকার মত মিটমিট্ ক'রে এপাশ-ওপাশে অগণিত সিগারেট জ্বলছে।

ভারী গলায় কে যেন ঘোষণা করলে, সব আলো ফিউজ হয়ে গেছে। রাস্তাঘাট অন্ধকার, ট্রাম বন্ধ, বাসে ওঠা যাচ্ছে না।

অরুণ বললে, নিশ্চয় সাবোটাজ। আজ ইলেক্‌ট্রিক গেল, কাল জল বন্ধ হবে। সন্তোষ, চল, পালাই।

অন্ধকারে কতকগুলি চেয়ার নড়াচড়ার শব্দ হ'ল। কারা যেন বাইরে অন্ধকার দেখে ফিরে এসে বসল নিরুপায় হয়ে।

অরুণ বললে, সন্তোষ!

সন্তোষ কোন সাড়া দিচ্ছে না।

অরুণ আবার অসহায় কণ্ঠে বললে, এই—এই সন্তোষ! শালা গার্‌গাণ্টুয়া দি সিলি, মাইরি, চল, এখান থেকে পালাই। কি সাংঘাতিক অবস্থা—আঁধার, আঁধার আর ধোঁয়া, বিশ্রী চোঁয়াটে ধোঁয়া, তার ওপরে এই প্রচণ্ড হট্টগোল। মাথা খারাপ ক'রে দেবে। চল, চল।

অরুণ, আচ্ছা, আমাদের জীবনের ভবিষ্যৎ কি এর চেয়ে বেশি অন্ধকার নয়? তোমার ভাগ্যের হাত থেকে তুমি কি পালাতে পারবে? যদি রঞ্জনাকে পাশে ডেকে নাও, তা হ'লে তোমার দুঃখ-দুর্ভাগ্যের একটি সহৃদয় সাক্ষী পাবে, আর তার চেয়ে বেশি কিছুই

নেই। কিন্তু এখান থেকে পালিয়ে যাবে কোথায়? এর মধ্যে ব'স, ব'সে মন খুলে দেখবার চেষ্টা কর। অন্ধকারে মনের দরজা খুলে যায়। সেই মন দিয়ে শোন, চ'লে যাও বিংশ শতাব্দী ছাড়িয়ে উনবিংশ শতাব্দীতে।

তোমার ওই পিছু-হটু পিছু-হটু লেক্‌চার ভাল লাগে না। সামনে তাকিয়ে দেখ। নিজের দিকে চেয়ে দেখতে পার না?

আহা, আমাকে তো দেখছিই, সারা জীবন ধ'রেই তো দেখব। দেখব তুমি-আমি রাম-শ্যাম কেউ ষোল আনা একটা গোটা মানুষ নই। আমাদের মধ্যে খণ্ড খণ্ড কত যে বিচ্ছিন্ন ব্যক্তির টুকরো বিকাশ হচ্ছে, লয় ক'রে দিচ্ছে মুহূর্তের বিস্মৃতিতে পারিপার্শ্বিকের রূপপরিবর্তনে, যে, নিজেকে আমরা পুরোপুরি চিনতে পারি নে। আমাদের নিয়ন্ত্রণের জন্য কত যে কার্যকারণ—

আঃ, তোমার ওই সূক্ষ্ম ব্যক্তিপরিচয়ের জটিল ধম্‌কানি বন্ধ কর, নইলে ঘুষি মেরে জলের গ্লাসগুলো চুরমার ক'রে দিয়ে চ'লে যাব।

অরুণ, তুমি রাগ করছ? রাগ ক'রো না। অন্ধকার, অন্ধকার। এইটেই তো সত্য। যে আলো দিয়ে আড়াল ক'রে রেখেছ নিজের জীবনকে, সেটা কি?

সন্তোষের কণ্ঠে সেই নারীসুলভ মৃদুস্নেহের আবেগ গাঢ় হয়ে উঠেছে। সে আস্তে আস্তে ব'লে চলল, শোন কান পেতে। কি শুনছ? আমার উপন্যাসের নায়ক কথা বলছে। দেখছ, কি বিরাট তার চেহারা? দিনরাত্রির অগণিত মুহূর্ত দিয়ে রচিত ওর রোমকূপের রন্ধ্রে রন্ধ্রে জমা হয়ে আছে যুগযুগান্ত পারের খণ্ড খণ্ড ইতিহাস।

অরুণের গুরুগম্ভীর স্বরে অবিশ্বাসের সন্দেহ ফুটে ওঠে,—কে এই বিরাট পুরুষ, কে তোমার রচনার নায়ক?

যাকে তুমি দেখছ রূপান্তরিত পানশালায়, যে তোমার প্রথম যৌবনে দেশপ্রেমের বন্যার বেগ ধারণ করেছে—যেখানে রবীন্দ্রনাথ, সুভাষচন্দ্র, গান্ধীজী, চিত্তরঞ্জন, ব্রজেন শীল, সুরেন বাঁড়ুজ্জে তাঁদের

বলিষ্ঠ অগ্নিময় ভাষায় বক্তৃতা করেছেন, যার প্রাঙ্গণে গোঁসাইজী, ফৈয়াজ খাঁ, হরেন শীল তাঁদের প্রতিভার ঝলমলে দীপ্তি উজাড় ক'রে দিয়েছেন, সে-ই আমার নায়ক।

অরুণ বললে, তোমার এই উদ্ভট উপন্যাস কে শুনছে? মানুষ নিয়ে লেখো, মানুষের সুখ-দুঃখ-আশা-হতাশায় ভিজে রোমান্টিক কাহিনী লেখ, এই একটা ইটকাঠ আর চুনবালির ঘরকে নিয়ে কি ক'রে বই হবে! যার প্রাণ নেই—

সন্তোষ গর্জন ক'রে উঠল, প্রাণ নেই? নিশ্চয় আছে। ইতিহাস তার প্রমাণ দেবে। শোন অরুণ, আমাকে তোমাকে নিয়ে যে উপন্যাস লেখা হতে পারে, তাতে তো কোন আশার হালকা রঙিন মেঘের খেলা ফোটানো যাবে না ভাই। তোমার মনে কারুকার্যের অবকাশ নেই, ব্যর্থতা আর পিপাসায় শুকিয়ে শুকিয়ে চলেছি আমরা এই যুগের মিছিলে এক-একটি পদাতিক। তোমার রঞ্জনা তো তোমার মনের মধ্যেও মুক্তির আনন্দ পায় না। সেখানে তার স্মরণের সঙ্গে সঙ্গেই জেগে ওঠে বাস্তবের উত্তুঙ্গ বাধার প্রাচীর। রঞ্জনার টলটলে যৌবন কি ভোলাতে পারে যে, ওকে আপিসে চাকরি করতে হচ্ছে ওর পারিবারিক প্রয়োজন মেটাবার জন্যে! তাকে তুমি যতই কাছে টানতে যাও, ততই পটভূমিকার ভাই বোন মায়ের কথাটা স্পষ্ট হচ্ছে, আর তাদের বঞ্চিত করার পরিণামটাও সুস্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ছে। কি ক'রে তোমায় আমি নায়ক করব? আমাকেও দেখছ তো, আরও করুণার পাত্র আমার ব্যক্তিত্ব। কাকে ধরবে? এমনি তো সকলেরই জীবনে রয়েছে নিরন্ধ্র অন্ধকার।

কিন্তু তাই ব'লে তুমি জীবনকে বাদ দিয়ে মৃত্যুর পিছনে ছুটবে? সে তো আরও অসার, অচেতন!

না, না, না। এই অ্যালবার্ট হল হচ্ছে একটা বলিষ্ঠ যুগযুগান্ত-প্রসারী পুরুষ। ধর না উনিশ শতকের কথা।

তুমি উনিশ শতকের কথা কি জান?

আমি জানি। শুনেছি, এই অন্ধকার বলছে। আজকের এই আঁধারের মত চিহ্নহীন ছিল ১৮৭৫ সালে অ্যালবার্ট হল। ওর জন্ম হ'ল ১৮৭৬ সালে—বাংলার লেপ্টন্যাণ্ট গভর্নর উদ্বোধন করেছিল।

ইতিহাসের সালতামামী আর উপন্যাস তো এক কথা নয় সন্তোষ।

আচ্ছা, শোন তবে সেই সব রোমান্টিক গল্প। কেশব সেনের সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজের মাতব্বরদের ঝগড়ার কথাই বলি।

কেশব সেন তো ব্রাহ্মসমাজের শিরোমণি ছিলেন ?

ছিলেন বইকি। কিন্তু শিরোমণিরও তো ভুল হয়। আজকে আমাদের কোন বড় দলের নেতা যদি ভুল করেন, তা হ'লে তাঁর সে কাজ নিয়ে দলের মধ্যে সমালোচনা হয় না, কারণ আমাদের তেমন মেরুদণ্ড নেই যে! কিন্তু সে যুগ ছিল বিচারবুদ্ধি দিয়ে সব কিছুকে ক'ষে নেবার যুগ।

অরুণ অসহিষ্ণুভাবে বললে, তুমি আবার নিজেকে ছোট ক'রে ইতিহাসকে বড় ক'রে দেখছ। এটা দৃষ্টির দোষ।

না না। যা বলি শোন। কেশব সেন ভারতীয় ব্রাহ্মসমাজের সর্বেসর্বা তো! কিন্তু তিনি সমাজের প্রবর্তিত আইন যে মুহূর্তে লঙ্ঘন করলেন, সেই মুহূর্তে তাঁর বিরুদ্ধে এই অ্যালবার্ট হলে সভা ডাকা হ'ল। এর জীবনের বিদ্রোহের প্রথম উন্মেষ শুনতে পাচ্ছ ?

অরুণ হো-হো ক'রে হেসে উঠে লাথি মারল সন্তোষের চেয়ারে।

সন্তোষ অবেগকম্পিত কণ্ঠে বললে, শোন, কেশব সেন তখন অ্যালবার্ট হলের সেক্রেটারি। তাঁর কাছে সভা করবার জন্যে অনুমতি চাওয়াতে তিনিও অনুমতি দিলেন। সভার কাজ শুরু হবে, আলো জ্বালা হোক—গ্যাস জ্বালাও। শিবনাথ শাস্ত্রী, আনন্দমোহন বসু সবাই হাঁকাহাঁকি শুরু করলেন। কিন্তু গ্যাস জ্বলল না। জানা গেল, গ্যাস জ্বলবে না। কারণ ? 'হলে' সভা করবার জন্য অনুমতি আছে, কিন্তু গ্যাসবাতি জ্বালাবার জন্য কোন নির্দেশ চাওয়া হয় নি, অতএব সে ব্যবস্থা হবে না। আবার হৈ-হৈ।

অরুণ বললে, বাঃ, বেশ হচ্ছে ভাই। সেদিন কি আজকের চেয়েও বেশি হট্টগোল হয়েছিল?

নিশ্চয়। আজকে আমরা ভাল ক'রে দুধ-ঘি খেতে পাই নে, সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারি নে, আর তখন, হুঃ! ভিড় হয়েছিল খুব।—ব'লে সন্তোষ চুপ করল।

অরুণ বললে, ওই দেখ শিবনাথ শাস্ত্রীর চাপদাড়ি দেখতে পাচ্ছি। আচ্ছা, তার পর কি হ'ল?

সন্তোষ জবাব দিল না।

একটি, দুটি, তিনটি মোমবাতি পর পর জ'লে উঠল। কফি-হাউসের কাউণ্টারে ম্যানেজারের মুখখানা কেমন অস্পষ্ট দেখাচ্ছে। আবছা আলোতে বিরাট হলঘরখানাকে মায়া-রহস্যে ঢাকা কোন স্বপ্নপুরীর মত অসীম অজানা কাহিনীর অতল খনি ব'লে মনে হচ্ছে। কিছুই খুব স্পষ্ট দেখা যায় না, অথচ অর্ধপরিচয়ের আশ্রয়ে মন আর দৃষ্টি লুব্ধ, আশান্বিত।

তিনটি আলো জ'লে উঠতেই সন্তোষ সজীব হয়ে উঠল, বললে, হ্যাঁ, সেদিনও এমন ক'রে সভার উৎসাহী উদ্যোক্তারা ছুটে গিয়ে বাজার থেকে বাতি কিনে এনেছিল। কিন্তু কেশব সেনের ভক্তরা গালাগালি দিয়ে মহাগণ্ডগোল বাধিয়ে সভা বসতে দেয় নি।

অরুণ উত্তেজিত ভাবে জবাব দিলে, পিছনে নিশ্চয় আচার্য কেশব সেন ব্রহ্মানন্দের উস্কানি ছিল?

ছিল কি না জানি না।

তা হ'লে বুঝে দেখ, আমরা এই সব ঝগড়াটে লোককে কি রকম আদর্শ মহাপুরুষ ব'লে জানতে বাধ্য হই।

আমি সেদিক দিয়ে দেখছি নে। মানুষ চিরকালই মানুষ, কেশব সেন তাঁর মেয়ের বিয়ে দেবেন রাজপুত্রের সঙ্গে এটাও কি কম কথা! কি হয়েছিল জান তো, গোলমালের গোড়াই বল আর মোট কারণটাই বল, তা ওঁর মেয়ের বিয়ে নিয়ে। কুচবিহারের কুমারের

সঙ্গে ওঁর মেয়ের বিয়ে। এখন উনি ব্রাহ্মসমাজের খুঁটি হয়ে হিন্দু পৌত্তলিক পরিবারে মেয়ে দিচ্ছেন—এটাই যথেষ্ট উষ্মার উদ্রেক করে। তার ওপর আবার মেয়ের বয়স খুবই কম। এই ব্যাপারের কিছুদিন আগেই সমাজের সভ্যরা স্থির করেছিলেন, যোলর কম বয়সী কোনও মেয়েরই বিয়ে তাঁরা দেবেন না। কিন্তু কেশববাবুর মেয়ের বয়স তেরো।

বাঃ, চমৎকার! তার পর?

তার পর আবার কি? পরে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ থেকে প্রগতিবাদীরা বেরিয়ে গিয়ে দল করলেন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ।

আহা, তোমাকে কি ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস লিখতে বলেছে কেউ? ওসব বাদ দাও। বল, ঝগড়াটা কেমন জমেছিল? বাঙালী চিরকালই বাঙালী।

তোমার কথার প্রতিবাদ করি। যে সব পার্সনালিটির ওপর তুমি এই কাদা ছুঁড়লে, তাঁরা অনেক উঁচুতে উঠেছিলেন।

উত্তেজিত হ'য়ো না সন্তোষ। মানুষকে বড় করবার সময়ে একেবারে নির্দোষ ক'রে আঁকতে যেও না, তাতে তাঁদের মনুষ্যত্ব লোপ পায়। তবে হ্যাঁ, সুবর্ণসুযোগ, উপযুক্ত ক্ষেত্র, এগুলোর সঙ্গে আদর্শের প্রেরণা না থাকলে মানুষ বড় হয় না—এ আমি স্বীকার করি।

সন্তোষ বললে, বাস্তবের কষ্টিপাথর দিয়ে প্রত্যেকটা ব্যাপারকে যাচাই করতে গেলে পোদ্দারিই করা হয় অরুণ, শিল্পসৃষ্টির জন্যে মিঠে মন চাই—তা তোমার নেই। তোমার চোখ স্বপ্ন দেখে না, পোদ্দারি করে। আমি চাই গহনা গড়তে, সুন্দরের স্বপ্ন দেখি, খাদের কিছু মিশেল থাকলে আমার খুব এসে-যাচ্ছে না।

অরুণ উঠে দাঁড়াল—অসহ্য! আমি চললাম, তুমি থাক। কবেকার ম'রে-যাওয়া গল্পের পোকা বেছে বেছে মর। আমাকে বাইরের আকাশ ডাকছে। আজকের আকাশ আমাকে দেখতেই হবে আকাশে আজ তারাগুলো নিশ্চয় জলজলে হয়ে উঠেছে, বিজলীর

জ্বালাতন নেই, এই তো সুযোগ। চল, চল, তোমায় উদ্ধার করি এই প্রেতলোক থেকে।

সন্তোষ বললে, কিন্তু আমার উপন্যাস! আমি যে অনেক ভেবে রেখেছি, অ্যালবার্ট হলের পুরনো দিনের কথা নিয়ে করুণ একটা পরিণতির চিত্রে দাঁড় করাব আজকের কফি-হাউসকে। আমি যে ভেবেছিলাম প্রফেসর বিনয়েন্দ্র সেনের কথা লিখব। কবে কি ভাবে তিনি রেভারেণ্ড কালীচরণ বাঁড়ুজ্জের খ্রীষ্টানী বক্তৃতাকে খণ্ডন করেছিলেন, আর কি ভাবে তিনি সে যুগের ছাত্রসমাজকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন সোজা রাস্তা দিয়ে চলবার জন্যে—সে সব একে একে জ'মে উঠছে আমার মনে। কি যে কষ্ট হয়, তা বলা যায় না। আই ফীল্ ফর্ অ্যালবার্ট হল! আহা, আজ সে ঐতিহ্যের কি পরিণতি, পানশালার শাকী হয়েছে সেই মহারাণী!

দৃঢ় দৃপ্ত কণ্ঠে অরুণ বললে, ওঠ, দাঁড়াও, চল। ব'সে ব'সে মিছে কেন কাঁদছ! বিরাট অতীতও অতীতই। আজকের তুমি যদি আজকের আমাকে দেখতে না পাও, আজকের কোন কিছুই যদি তুমি স্বীকার না কর, তা হ'লে তোমাকে ক্ষমা করা যায় না। শোন সন্তোষ, যাকে তুমি খণ্ড ব্যক্তিত্বের অসংখ্য জোড়াতালি ব'লে বাতিল করছ, সে মানুষকে যদি মনের দরদ দিয়ে দেখতে, তা হ'লে তোমার চোখের কারুণ্য কঠিন উজ্জ্বল হীরের টুকুরো হয়ে যেত, অতীতের দিকে চাইতে গিয়ে আজকের দিকে পিছন ফিরছ যে! আমার ব্যর্থতা, তোমার পিপাসার্ত হাহাকার এসব অস্বীকার করবার নয়, অতিক্রম করতে হবে এই বাধার প্রাচীর।

কেমন ক'রে তা হয়! দেখছ না অন্ধকার, দৈন্য!

শুধু ঘরের অন্ধকারটুকু দেখেই হাত-পা এলিয়ে দিলে হবে না। কফিখানা থেকে নেমে এস খোলা আকাশের নীচে, দেখবে অন্ধকারই শুধু নেই, পৃথিবীটা খুব ছোট নয়, আকাশে তারা আছে, চাঁদ আছে। জীবনের আকাশে অনেক আশ্রয় আর সান্ত্বনা খুঁজে পাবে।

সন্তোষ টেবিলে ঘুষি মেরে বললে, আকাশ নয়—আকাশ নয়, মাটিতে কি আছে? মাটিতে কি মানুষ চলতে পারে—সব মানুষ পাশাপাশি?

সন্তোষের অস্থির হাত-নাড়ার ধাক্কাতে টেবিল থেকে একটা গ্লাস ছিটকে পড়ল মাটিতে। আচমকা কাচভাঙার ঝন্‌ঝন্‌ শব্দের যেটুকু সঙ্গীত আছে, বোধ করি, তারই প্রভাবে সহসা এই উত্তাল কোলাহল-বিক্ষুব্ধ হলঘরখানা স্তব্ধ হয়ে গেল। মোমবাতির মৃদুকোমল আলোর চেয়ে অনেক গাঢ় এই নীরবতার রেশ। যেন দিগন্তের মাথা ছোঁবার জন্য হাত তুলে দাঁড়ানো বিরাট দানবের কালো মূর্তির মতই থমথমে দেখাচ্ছে এই ঘরখানার জমাট নৈঃশব্দকে।

আশ্চর্য! কেউ কোন প্রশ্ন করল না। অখণ্ড স্তব্ধতাকে অটুট ক'রে দিয়ে ক্ষণিকের ভাঙা কাচের সঙ্গীত থেমে গেছে কখন। কি জানি, হয়তো এই আগন্তুকের এই বিশাল রূপ দেখেই স্তব্ধ হয়ে গেছে ওই একরত্তি সঙ্গীত।

অরুণ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে সন্তোষের হাত চেপে ধরল, চল সন্তোষ। আর দেরি নয়। এই অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে পথে নেমে যাই।

কোথায় যাবে?

যাব রঞ্জনাদের বাড়ি। আমি আজই, এখনই ওর কাছে গিয়ে বলব—জীবনটাকে বাঁধা দিয়ে ওকে পাবার যে ইচ্ছে, তাই সত্যি হোক।

তার পর?

তার পর সারাটা জীবন যদি ছটফট করতে হয় তাই করব। এই অন্ধকারটুকু থাকতে থাকতেই চ'লে যাই। নইলে ইলেক্‌ট্রিক আলো আর ট্রামের ভিড়ে মনটা হারিয়ে যাবে। উঃ, তুমি আজ পরম সত্যটুকু দেখিয়ে দিলে, লিভ্ ডেঞ্জারাস্‌লি অ্যাণ্ড ডেস্পারেট্‌লি আপ টু ডেথ!

তুমিই যাও। কিছু করবার সাহস নেই আমার।

প্রবল আকর্ষণে সন্তোষকে উঠে দাঁড়াতে হ'ল।

আশপাশের কোলাহল স্তিমিত হয়ে এসেছে। মোমবাতিগুলোর সামান্য আলোতে চোখের দৃষ্টি যেন অনেকটা অভ্যস্ত হয়ে গেছে। অরুণ সেই দিকে তাকিয়ে বললে, আলো, আলো, আলো!

সিঁড়ির মুখে অনেকগুলো মানুষ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে জটলা করছিল, তাদের সজোরে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে অরুণ পথ ক'রে নিল নীচে নামবার। সন্তোষ বললে, তুমি যাও। আমাকে বাড়ি ফিরতে হবে।

রাস্তায় বেরিয়ে ওরা দেখল, কাপড়ের ফেরিওয়ালাদের স্টলে অনেকগুলো গ্যাস জ্বলছে। সেখানে ক্রেতাদের ভিড়।

কলেজ স্ট্রীট অন্ধকার। যূথভ্রষ্ট পাইনগাছটা চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে আছে সব কিছুকেই অগ্রাহ্য ক'রে। অরুণ সেদিকে তাকিয়ে বললে, সন্তোষ, তুমি বাড়ি যাও। একলাই পারব আমার মনের সব কথা রঞ্জনাকে বলতে।

[সমাপ্ত]

শ্রীগৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য

পাগ্‌লা-গারদের কবিতা

(পাগলামির বিভিন্ন অবস্থায় রচিত)

একটি রূপক কবিতা! !!!

হায় রে, পিয়ালা হ'ল না হ'ল না ভরপুর!
যা ভরিতে যাই
হাওয়া হয়ে তাই
উড়ে যায় যেন কর্পূর।
যাহা চাই তার বেশিই চাই না,
যাহা পাই তার বেশিই পাই না,
সাধু-ধাম ভেবে আশা ক'রে গিয়ে
শেষকালে দেখি চোর-পুর।

ভেবেছিনু, রূপো—দাঁও মারা গেছে সস্তা।
কষ্টিপাথরে
কষাকষি ক'রে
দেখা গেল সে যে দস্তা!
গাঁট ভ'রে ভ'রে কাপড় বলিয়া
দিয়াছে চালায়ে পাটের থলিয়া,
চাল আশা ক'রে খুলে দেখি হায়
শুধু কাঁকরের বস্তা।
চেয়েছিনু হায় মৃদু পারিজাত-মালিকা।
দেখায়ে রম্ভা
দিল যে লম্বা
অজানা সে কোন্ বালিকা!
সাধ ছিল মনে পরাণবঁধুর
প্রাণ ভ'রে শুনি বচন মধুর,
হৃদয় দলিয়া গেল সে চলিয়া
দিয়ে বাছা বাছা গালিকা!
ভেবে ভেবে তাই দেখিলাম ভাই, যাক্ গে—
যত চায় প্রাণ
গেয়ে যাই গান
বরাতে যা থাকে থাক্ গে।
ওরে মন, মিছে হ'স নে খাপ্পা,
বিধাতার সাথে চলে না ধাপ্পা,
ভেবে লাভ নেই, যা হবে হবেই
লেখা থাকে যদি ভাগ্যে।

জাতক

কোন এক শুভরাত্রে কোন এক অভিজাত ভবনের দোতলার ঘরে
ছুটো বেজে তেত্রিশ মিনিট আর পনের সেকেণ্ড পরে
নব-জাতকের কণ্ঠ কাঁদিল। অমনি
উত্থত শঙ্খের সারি আরম্ভিল সুমঙ্গল-ধ্বনি।
পণ্ডিত ছিলেন ব'সে, সাথে ল'য়ে মুক্ত পুঁথি-পাঁজি ;
জাতক-জনক পানে তাকাইয়া কহিলেন, "মারিয়াছ বাজি।
এই তিথি এই লগ্নে যে জাতক জন্ম নিল আজি—
জ্যোতিষবিদ্যায় যদি কিছু সত্য থাকে,
সে-ই ধন্য করিবে তোমাকে।
এ লগ্নের জাতকের আয়ু দীর্ঘ, কান্তি সুদর্শন,
সৌভাগ্যের স্নিগ্ধধারা অবিরাম তার 'পরে হইবে বর্ষণ,
অপরূপ সুন্দর স্বভাব,
অর্থ যশ প্রতিপত্তি কিছুরি না রহিবে অভাব ;
হবে না সে শত্রু কারো, শত্রু তার রহিবে না কেহ,
সকলেরি স্নেহ পাবে, সকলেরে করিবে সে স্নেহ ;
যে কাজে সে দিবে হাত সে কাজে সফল হবে,
কর্ণেরে করিবে কানা দানের গৌরবে।
...ইত্যাদি ইত্যাদি। কত দিব বা তালিকা ?
মিথ্যা হইবার নহে, শাস্ত্রে আছে লিখা।"
ঠিক সেই ক্ষণে
ধরণীর নানা স্থানে প্রকাশ্যে অথবা সঙ্গোপনে
জন্ম নিল অগণিত সাপ, চিল, বাছুর, ব্যাঙাচী ;
বস্তিতে মা হ'ল কত পাঁচী ;
বাচ্চা দিল কত তিমি সাগরের তলের তিমিরে ;
কত যে পাঁঠার আত্মা পুনর্জন্ম নিয়ে এল ফিরে ;
বাবা হ'ল কাদের কশাই আর মেছোবাজারের কাল্লু মিয়া ;

ডিম হতে কত মুর্গী এল বাহিরিয়া
ভেদ করি বন্ধনের জাল।
হিসাব রাখিল বুঝি চিত্রগুপ্ত কিংবা মহাকাল।

ধর্মের কল

ধর্মের কল বাতাসে নড়িবে ব'লে
ওরে ও বৃদ্ধ আশা ক'রে ব'সে
থাকিস নে কুতুহলে।
চাকায় চাকায় বিনা তেলে হায়
বহুদিন হ'ল পার,
(তাই) ধর্মের কলে মরচে ধরেছে
বাতাসে নড়ে না আর।

য়া

আপনার মাঝে পাখিরে বন্দী দেখে
কাঁদিয়া মরিছে খাঁচা :
"ওরে দুর্ভাগা, ওরে ও বন্দী পাখি!
দিগন্ত তোরে হয়রান্ হ'ল ডাকি,
কোনো ফাঁকে তুই আমারে দিয়ে যা ফাঁকি,
উড়ে গিয়ে তুই বাঁচা রে আমায় বাঁচা।
নীলাকাশে তোরে উড়ায়ে দিতে যে চাই।
সাধ আছে, হায় সাধ্য যে মোর নাই!
তোর চেয়ে যে রে আমি অসহায় ভাই,
তোর চেয়ে যে রে বুদ্ধি আমার কাঁচা।
আপন দুয়ার আপনি খুলিতে নারি
বক্ষ জুড়িয়া এ দুঃখ মোর ভারি,
নিজে খিল খুলে বাহিরে দে তুই পাড়ি,
তুই ছাড়া পেয়ে মোরে আনন্দে নাচা।

তোরে ধ'রে রেখে মরমে যে ম'রে আছি,
উড়ে গিয়ে তুই বাঁচা রে আমায় বাঁচা।"

* * *

ঝন্ ঝন্ ঝন্ করুণ আর্তনাদে
কঠিন লৌহ-শৃঙ্খল হায় কাঁদে
বীর বন্দীর পায় :
"হে বন্দী, আমি বন্ধন নহি শুধু,
আমিও যে কাঁদি বন্ধন-বেদনায়।
তোমার রয়েছে আদর্শ সুমহান্
যার তরে তুমি করিছ আত্মদান
তোমার বেদনা ফুল হয়ে ফুটে
তোমারে দিতেছে মান।
আমার কি আছে সান্ত্বনা দিয়ে
জুড়াতে আমার প্রাণ ?
অসহায় আমি, তোমারে জড়ায়ে বেঁধে
দুঃসহ দুখে প্রতিক্ষণে মরি কেঁদে
বন্ধন হতে তোমারে ছাড়াতে
সাধ্য যে নাহি হায়!"
কাঁদে শৃঙ্খল শৃঙ্খল-পরা পায়।

ভূমৈব সুখম্, নাস্ত্যেব গতিরন্যথা

শ্রীঅঙ্গে মাখিয়া মাটি মৃদঙ্গে মারিয়া চাঁটি
শ্রীপথে লুটায়ে মুক্ত কাছা
নয়নে ঝরায়ে অশ্রু কাঁদিয়া ভরায়ে শ্মশ্রু
নাচিয়া ভকতি-যুক্ত নাচা
কে তুমি সাজিয়া সঙ দেখায়ে হরেক ঢং
গানে গানে ধরাইছ নেশা ?

জানি না তোমার নাম,   কোথা বা তোমার ধাম,
কি তোমার ব্যবসা বা পেশা।
যে তোমা করিবে ঠাট্টা   তাহারে মারিব গাঁট্টা
শুনাইব বাছা বাছা গাল,
ঘুচায়ে চুলের গোল   বুঝাব ঢালিয়া ঘোল
কত ধানে কত হয় চাল॥

তিমি-শফরী-সংবাদ

তিমি কহে, "সাগরেতে পাত্তা কোথা পাবি?
ওরে পুঁটি, হেথা এলে শুধু খাবি খাবি।"
শুনিয়া তিমির কথা পুঁটি কহে হেসে,
"অল্প জলে ফর্ ফর্ কর দেখি এসে!"

তাজমহল

মাথা থেকে ঘাম পায়ে ফেলে ফেলে গ'ড়ে গেছে যারা তাজমহল
গভীর নিশীথে তারি চারধারে আজো রোজ রাতে দেয় টহল
অশরীরী দেহ দেখে নাকো কেহ যতই জোছনা হোক না জোর
নিঃশ্বাস ভারী দিয়ে যায় পাড়ি কাঁপায়ে তাদের ছায়া-পাঁজর
অশ্রুত-ধ্বনি আর্ত নিনাদ তাদের কণ্ঠে কম্পমান :
"আমরা দিয়েছি বুকের শোণিত, তুমি কি দিয়েছ শাহজাহান্?
উদয় অস্ত খেটেছি কেহ বা, অস্তের থেকে উদয় কেহ,
তোমার স্বপ্নে রূপ দিতে, হায়, করেছি জীর্ণ শীর্ণ দেহ।
অতি মেহনৎ অল্প মজুরি, এতটুকু ঢিলে জোর চাবুক—
মোরা ছিনু যেন শুধুই মজুর—শুধু কাজ, নাই দুঃখ সুখ।
দিয়ে গেছি জান, পাই নি তো মান, বেনামী আঁধারে আমরা আজ।
বিশ্ব জুড়িয়া বিখ্যাত শুধু তুমি সম্রাট্, তোমার তাজ।

হায় রে হায়!
যারা দেয় তারা শুধু দিয়ে যায়, যারা পায় তারা শুধুই পায়!"
বিধির খেয়ালে কোনো এক রাতে মজদুরী এই নালিশী গান
বেড়াতে বেড়াতে অশরীরী-কানে শুনিতে পেলেন শাহজাহান,
বেতমিজদের বেওকুফি দেখে প্রথমটা তিনি গেলেন ক্ষেপে,
তারপর হেসে সম্রাটী হাসি চট্ ক'রে রাগ গেলেন চেপে,
বললেন, "হায় মহামূর্খের দল!
তোদের ছাড়াও এমনি ফলিত মোর স্বপ্নের ফল।
তোদের মতন হাজারে হাজারে
মেলে মজদুর হাটে ও বাজারে,
বুদ্বুদ সম তোদের জীবন, কিবা তার দাম বল্?
তোদের বাঁচায় তোদের মরায়
দুনিয়ার বল্ কিবা আসে-যায়?
লাখো মজুরের জান্ হতে দামী একটি তাজমহল।

হারেমে আমার অনেক বেগম ছিল এ সত্য মানি।
মমতাজ ছিল একটি মাত্র—দিল্-দুনিয়ার রাণী।
তারি বিচ্ছেদে শৌখিন শোকে
রচিলাম তাজ এ মর্ত্যলোকে
মাটিতে দাঁড়ায়ে আকাশের সাথে চলে যার কানাকানি!
শোক নহে মোর, শোকের বিলাস? কিবা তাতে লোকসান
আমার স্বপ্ন-বিলাস হতেই মর্মর পেল প্রাণ।
কালের ললাটে চির উজ্জ্বল
গড়িয়া উঠেছে এ তাজমহল
সারা দুনিয়ার রূপ-পিয়াসীরা রূপ-সুধা করে পান॥"

শ্রীঅজিতকৃষ্ণ বসু

উপন্যাসের উপকরণ

১৫

বিপদ কখনও একা আসে না।—এই কথা যদি প্রথম বিপদের সম্বন্ধে খাটে, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় বিপদেরও সে অধিকার নিশ্চয়ই আছে। বিশেষ ক'রে উপন্যাসের উপকরণ হিসাবে এদের মূল্য অনস্বীকার্য।

সাহিত্যসৃষ্টিতে বিতৃষ্ণ হ'লেও, সাহিত্যচর্চায় অরুচি ধরবার কারণ নেই। লেখার পথে অশেষ কণ্টক, পড়ার নেশায় বাধা দেবে কে? সেদিন সন্ধ্যায় যৌবনে-পড়া বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলীখানা ঝেড়ে মুছে নূতন ক'রে পড়তে বসি। প্রভাত, অতসী, অনু, কিশোর, পূর্ণিমার চেয়ে প্রতাপ, শৈবলিনী, সূর্যমুখী, চন্দ্রশেখর, রোহিণী ঢের ভাল। অন্তত এরা আমার দৈনন্দিন জীবনকে ব্যতিব্যস্ত ক'রে তুলবে না।

'তুমি বসন্তের কোকিল'—সবাই জানেন, এই বসন্তের কোকিলই রোহিণীর পদস্খলনের কারণ হয়েছিল এবং হয়তো প্রাণরক্ষারও। সাহিত্যক্ষেত্র থেকে বটবৃক্ষের (ভূতপূর্ব আমি) পদস্খলনের ইতিহাস পূর্বেই বলেছি। অচিন পাখি! ছাড়া পেয়ে বেঁচে গেছি। কিন্তু সেই সন্ধ্যার নবারব্ধ রোহিণী-কোকিল-সংক্রান্ত অতি নিরীহ সাহিত্য-চর্চাতেও আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত পদস্খলন ঘটল।

ও কিসের গোলমাল? ক্রন্দন, চিৎকার এবং হাহাকার! মনে হ'ল, যেন সরিদের পাড়া থেকে আসছে।

আগুন?

রাস্তায় বেরিয়ে দেখি, না, আগুন নয়। রাস্তা থেকে সরিদের পাড়া দেখা যায়।

গ্রন্থাবলী বন্ধ ক'রে খালি পায়েই ছুটে যাই, আমার পক্ষে যতটা সম্ভব। গিয়ে দেখি—

খুন!

আমাকে দেখে গোলমাল কিছু কমল। ভিড় ঠেলে এগিয়ে যাই

সরির কোলে মাথা রেখে শুয়ে আছে এক অপরিচিত যুবক, তার আহত মস্তক থেকে রক্ত ঝ'রে ঝ'রে সরির কোল ভেসে যাচ্ছে। সরির ক্রন্দন আর্তনাদে পরিণত হ'ল।

নিহত কিংবা আহত ব্যক্তিকে পরীক্ষা ক'রে দেখলাম, নিহত নয়, আহত। আঘাত কিছু গুরুতর হ'লেও মারাত্মক নয়। প্রচুর রক্তপাতে কিংবা রক্ত দেখে ভয়েই সে চেতনা হারিয়েছে। সরিকে থামিয়ে সকলকে গোল করতে নিষেধ ক'রে তাড়াতাড়ি বাসায় ফিরি।

আমার কাছে প্রাথমিক সাহায্যের বাক্স ছিল। সেইটা নিয়ে ফিরে আসি। রক্ত ধুয়ে ফেলে চোখে মুখে জল দিতেই ছেলেটা চোখ মেলে চেয়ে উচ্চৈঃস্বরে কেঁদে উঠল। আমার মুখে অভয় এবং সান্ত্বনা পেয়ে সে চুপ করল। আমাকে সে ডাক্তার মনে করেছিল। যথারীতি ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিয়ে দুধ ব্রাণ্ডি খাইয়ে দিলাম। সব সময়েই বাক্সটাতে কিছু ব্রাণ্ডি থাকত। কিছুক্ষণ পরে সে সুস্থ এবং শান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। সরির কোল থেকে বিছানায় শুইয়ে দেওয়া হ'ল। রক্তমাখা কাপড়খানা ছেড়ে এসে আমার পা দুটো জড়িয়ে ধ'রে কাঁদতে কাঁদতে সরি বললে, কি হবে বাবা?

ঘটনাটা এই—

আহত যুবক গোবরার পত্নীস্বসৃপতি, বাংলা ভাষায়—স্ত্রীর বোনের স্বামী, সোজা বাংলায়—ভায়রা-ভাই। নাম জংলা। ভাই শব্দের ডবল প্রয়োগে সুভ্রাতৃত্ব সূচিত হয়। গোবরাও সুভ্রাতৃত্বের পরিচয় দিতে কসুর কিছু করে নি।

গাঁয়ে ব'সে জংলার দিন চলছিল না। জংলা বিপত্নীক। দুটি ছেলে মেয়ে। তাদের বয়সের যোগফল পাঁচের বেশি হবে না। তাদের একলা ফেলে ভাগে-ভুতে জমি করা বা দিনমজুর খাটতে যাওয়া জংলার পক্ষে একরূপ অসম্ভব ছিল। পুনর্বিবাহেও এই সমস্যার মীমাংসা ছিল না, সৎমা এসে ছেলেমেয়ে দুটোকে হেনস্তা (হীনস্থ) করবে। তাদের সে প্রাণাপেক্ষা ভালবাসত।

তার এই অসহায় অবস্থায় করুণাপরবশ হয়ে গোবরা তাকে নিজের বাড়িতে ডেকে এনেছিল। গোবরা যে হাই-মাইণ্ডেড ছোকরা, খুঁটিনাটি ব্যাপারে আগে থেকেই আমার জানা ছিল। বলা বাহুল্য, বাচ্চা দুটোও সঙ্গে এসেছিল। অবশ্য তাদের ব্যয়ভার গোবরাকে দু-একদিনের বেশি বহন করতে হয় নি। তাতে কিছু যায়-আসে না। এমনিতেই তারা কুটুম্বের অধিকারে দুই-একদিন গোবরার আতিথ্য স্বীকার করতে পারত। এতে লজ্জা বা নিন্দার কিছুই ছিল না।

তাদের স্থায়ীভাবে বসবাসের ব্যবস্থাও গোবরাই ক'রে দিলে। তার সুপারিশে মহাজনের কাছ থেকে জংলাও একটা রিক্শ পেলে।

মহাজ্ঞানী মহাজন যে পথে ক'রে গমন
হয়েছেন প্রাতঃস্মরণীয়
সেই পথ লক্ষ্য ক'রে স্বীয় কীর্তি-ধ্বজা ধ'রে
আমরাও হব বরণীয়।

—হেমচন্দ্র যে অর্থে 'মহাজন' শব্দ ব্যবহার করেছেন, এ মহাজন সে মহাজন নয়। কর্মক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ ধনী ব্যবসায়ীকে এরা মহাজন ব'লে ডাকে। অবশ্য শব্দটা আজকাল উভয় ক্ষেত্রেই একার্থক হতে চলেছে।

বিশেষ কিছু বরণীয় না হ'লেও গোবরার পথ লক্ষ্য ক'রে জংলার দিন মন্দ কাটছিল না। মহাজনকে দিনান্তে পাঁচ সিকে পয়সা মিটিয়ে দিতে পারলে বাকি আয় রিক্শ-চালকের। নিজের ও দুটি শিশু-সন্তানের খাইখরচ বাবদ গোবরাকে রোজ সে একটি ক'রে টাকা দিত, এক হেঁসেলেই রান্না হ'ত। গোবরা বললে, অত ক্যানে?

একটা কাঁচি সিগারেট এগিয়ে দিয়ে বললে, তা হোক।

মা-মাসীতে তফাত কি? আপাতত সন্তানহীনা গোবরার বউ ছেলেমেয়ে দুটোকে খুব যত্ন করত। জংলাও হাই-মাইণ্ডেড। কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ উক্ত পরবধূকে সে কচিৎ একটা সাবান, কদাচিৎ একটা ফুলেল ত্যাল, কখনও বা একটা চিরুনি উপহার দিত। রিক্শর আয় থেকে সব খরচ মিটিয়েও কিছু উদ্বৃত্ত থাকত।

এই সব নজরে পড়তে গোড়ার দিকটায় গোবরা বরং খুশিই হ'ত। কিন্তু হাই-মাইণ্ডেড ছোকরাদেরও জানা আছে যে, সর্বম্ অত্যন্তং গর্হিতম্। শেষ পর্যন্ত মহাজনের প্রাপ্য বাকি পড়তে থাকে, সংসার-খরচেও টানাটানি পড়ে। একদিন স্পষ্টাক্ষরে তার মাকে বললে, বাড়াবাড়িটো কিছু ভাল লয়। এই সম্পর্কে প্রচলিত শ্লোকাংশও তার অজ্ঞাত ছিল না—অতিদানে হতো লঙ্কা। কিন্তু জংলা নিজের স্ত্রীকে কিছুই বললে না। উচ্চহৃদয় যুবকদের চক্ষুলজ্জা অত্যন্ত স্বাভাবিক।

কিন্তু জংলার দিকটাও একটু ভেবে দেখতে হবে। সুভ্রাতৃত্ব ছাড়াও গোবরার,সঙ্গে তার একটা রসিকতার সম্বন্ধ আছে। তার স্ত্রীর সঙ্গে তো আছেই। এবং এক ধরনের টুকিটাকি রসিকতাও মাঝে মাঝে তার নজরে পড়ত বইকি।

একদিন হঠাৎ ঘরে ঢুকে গোবরা দেখলে যে, জংলা তার বউয়ের কপালে টিপ পরিয়ে দিচ্ছে। চুল বাঁধা হয়ে গেছে। সম্মুখে আয়না থাকতে টিপ পরবার জন্য পরপুরুষের সাহায্যের প্রয়োজন হয় না, গোবরা-মাথাতেও এইটুকু বুদ্ধির অভাব ছিল না। সরি তখন ঘুমুচ্ছিল। এবং আর একদিন—

যুবতীর কোমল গণ্ডে মৃদু চপেটাঘাত যুবক ভগিনীপতির পক্ষে নিছক স্নেহবাৎসল্যের অভিব্যক্তি নয়। সরি সেদিন বাড়িতে ছিল না। এবং অপর একদিন—

এক পক্ষের আঁচল ধ'রে টানাটানি এবং অপর পক্ষের খিলখিল হাসির সঙ্গে 'আঃ ছাড়ো, ছাড়ো' গোবরা স্বচক্ষে দেখেছে এবং স্বকর্ণে শুনেছে। সরি গিয়েছিল কাপড় কাচতে।

এই সব অভিযোগ সরির কানে পৌঁছেছিল, কিন্তু সে তাদের এঁটে উঠতে পারে নি। পাড়াপড়শীদের ভিতরেও কানাঘুষা চলছিল। অবশেষে হাই-মাইণ্ডেড গোবরা নির্জনে ডেকে জংলাকে একদিন শাসিয়ে দিলে। জংলাও উচ্চহৃদয়। উচ্চহাস্যে কথাটা উড়িয়ে দিয়ে বলেছিল, উ তো আমার বুন ব্যাটে।

জংলা কতকটা নিশ্চিন্ত হ'লেও তার মুখে এই কথা শুনে সরি কিন্তু বিশেষ সন্তুষ্ট হতে পারে নি। বলেছিল, নজর রেখতে হবে।

নারীচরিত্র সম্বন্ধে গোবরার গাম্ভীর্যপূর্ণ মনোভাব আপনাদের অবিদিত নয়। বউকে সে একটি কথাও বলে নি।

খুব সম্ভব, সেদিন সন্ধ্যায় জংলার সহজ সরল রসিকতা একটু জংলী ধরনের হয়েছিল এবং তা সতর্ক গোবরার নজরে পড়েছিল। হাতের পাকা বাঁশের লাঠিটা সে সজোরে জংলার মাথায় বসিয়ে দিলে।

এই সব কথা সরি সর্বজনসমক্ষে প্রকাশ ক'রে দিলে। গোবরা পলাতক। বউটাকে দেখতে পাই নি। এর বিচার পরে হবে—এই কথা ব'লে হৈ-চৈ করতে কিংবা থানায় খবর দিতে বারণ ক'রে এবং আর একবার আমার ঘুমন্ত রোগীর নাড়ি দেখে আমি বাসায় ফিরি।

রাত্রে স্বপ্ন দেখলাম, গোবিন্দলাল রোহিণীকে গুলি করছে।

হা ভগবান! এও আমার অদৃষ্টে ছিল! শেষ পর্যন্ত ডিটেক্‌টিভ নভেল লিখতে হবে না কি?

১৬

পরদিন সকালবেলা। গ্রন্থাবলী পড়া বন্ধ ক'রে কবি অতীশের গদ্যকবিতার বই 'ভাম্পায়ার'খানা খুলে বসেছিলাম। বেশ লেখা।

ভস্‌ ভস্‌ ভস্‌ ভস্‌ ভস্‌ ভস্‌—শব্দটা ক্রমেই এগিয়ে আমার বাইরের ঘরের বারান্দায় এসে থামল। তারপর ক্রমাগত পু-উ-উ-উ—মনুষ্যকণ্ঠে বংশী ধ্বনির অনুকৃতি, দম নিতে শুধু মাঝে মাঝে অল্পক্ষণের জন্যে থামতে হচ্ছিল। ব্যাপার কি? দরজা খুলতে নজরে পড়ল—লিট্‌ল্‌ লিলিপুট এক্সপ্রেস—একটি দশ বছরের ছেলে! তার ধারণা, সে ইঞ্জিন হয়ে গেছে, কয়লাবিহীন নিষ্কলঙ্ক নির্ধূম···এনার্জির অক্টোপাস্‌!

সিগ্‌ন্যাল পড়ে নি, ইঞ্জিন আসে কি ক'রে? আমাকে দেখে কিন্তু ইঞ্জিন নিজেই সিগ্‌ন্যাল হয়ে গেল। দুটো হাত মাটির সঙ্গে সমান্তরাল ক'রে তুলে একটা হাত নামিয়ে দিলে।

হেসে বললাম, এস, ইঞ্জিন, ভেতরে এস।

ইঞ্জিন এসে আমার সামনে দাঁড়ায়। গম্ভীরমুখে শার্টের বুক-পকেট থেকে একটা চিঠি বের ক'রে টেবিলের উপর নামিয়ে রাখে। ফের বাঁশী বাজল। ইঞ্জিনের চাকার সঙ্গে যে হাতল জোড়া থাকে, হাত দুটো সেইটার অনুকরণে ন'ড়ে উঠল। তার পর পু-উ-উ, ভস্‌ ভস্‌ ভস্‌ ভস্‌—শব্দটা ক্রমে বেড়ে ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল।

এক মিনিটও অপেক্ষা করলে না। কেমন ক'রে করবে? হয়তো অপর একটা জংশনে অন্য কোনও গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে, দেরি করলে মিস করবে যে! একটু এদিক-ওদিক হ'লে কলিশনও হতে পারে।

টেবিল থেকে চিঠিখানা তুলে নিলাম। একখানি খোলা চিঠি—

খামের ভিতর আটকানো নয়…অতএব
প্রাণখোলা চিঠি একে বলতেই হবে।
ছন্দবিহীন প্রাণের স্পন্দন,
যেন আধুনিক গদ্য-কবিতা,
কোথাও সামঞ্জস্য আছে এবং অন্যত্র তা নেই।
অশিক্ষিতা অপরিচিতার চিঠি,
অপ্রত্যাশিত মাতৃস্নেহের অতিশুদ্ধ আদিম অভিযান।
লিখছে :
আমি তার ছেলের যখন দাদু,
তখন তার হাতের রান্না আমায় খেতেই হবে—
অসার অকাট্য যুক্তি। নিরালম্ব লজিক।
এ যেন বজ্রবিপদ এবং ঝড়ঝঞ্ঝাটের পর
অশ্রুসিক্ত বৃষ্টিধারার দান।

বুঝতে দেরি হ'ল না 'কে বা কাহাদের' প্ররোচনায় চিঠিখানার সৃষ্টি। বুঝতে দেরি হ'ল, ইঞ্জিন স্টেশন এবং স্টেশন-মাস্টারকে চিনল কেমন ক'রে! বোধ হয় ঝঞ্ঝা কিংবা বিপদ তাকে বুঝিয়ে দিয়েছিল।

স্টেশনটার বৈশিষ্ট্য তার গাঁদাফুলের বন (এখন আর বাগান বলা চলে না, যত্নাভাবে অন্যান্য ফুলের গাছ ম'রে গেছে)। সুবিস্তৃত টাক, স্বকীয় এবং সাদা দাড়ির দৈর্ঘ্যে স্টেশন-মাস্টার এ পাড়ার একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি। এত সব সুস্পষ্ট অভিজ্ঞান থাকতেও স্টেশন এবং স্টেশন-মাস্টার চিনতে পারবে না, সে কেমন ইঞ্জিন ?

'ভাম্পায়ার' পাঠে মনোনিবেশ করি। নীচের কবিতাটি আমার এবং সমরসজ্ঞ আরও অনেকের ভাল লাগবারই কথা—

চা !
ইউক্লিপটাসের দেশ হতে হয়তো,
অথবা ক্যাক্টাসের জঙ্গল হতে
কুড়িয়ে আনা পাতা,
তা ছাড়া আর কিছুই নয়—
তবু যেন বাষ্পের বিসুবিয়স !
আমার প্রিয় চা !
সসারে চা ঢেলে খেতে আমি ভালবাসি না,
ঠাণ্ডা চা—
যেন ক্যালাস—বার্ধক্য !
আমি চাই কাপ হতে লিপ এবং লিপ হতে কাপ—
আমার প্রিয় চায়ের পেয়ালা :
প্রখর অনিবার্য চুম্বন !

পড়তে পড়তে এবং গদ্য-কবিতার টেক্‌নিক ভাবতে ভাবতে বেলা হয়ে গেল। কটা বেজেছে ? কে জানে !

ক্লকটার দিকে চেয়ে দেখি,
মোটেই নড়ছে না তার পেণ্ডুলাম।
রিস্টওয়াচটা তুলে ধরি চোখের ওপর,
প্রায় দ্বিপ্রহরের খররৌদ্রেও ;
পাঁচটা বাজতে পনরো মিনিট।

বুঝতে দেরি হ'ল না,
রাত্রির যবনিকা তখনও নিশ্চিহ্ন হয়ে অপহৃত হয় নি,
আলো-ছায়া এবং নিদ্রা-জাগরণের মিষ্টিক কুজ্ঝটিকার অন্তরালে
স্তব্ধ হয়ে গেছে তার টিক-টিক-টিক।
দ্রুত দুর্বল অনিশ্চিত পদক্ষেপ—
সূক্ষ্ম তারে এবং ছোট্ট চাকায় আবদ্ধ
অবিশ্বাসী অতিক্ষীণ নিশ্বাস!

বুঝলাম, আধুনিকতার সঙ্গে তালে তালে পা ফেলে আর চলতে পারছি না। আর আমার পক্ষে আজকাল তার দরকারই বা কি? যাদের সঙ্গে মিশতে হ'লে ঘড়ি ধ'রে চলতে হয়—

হ্যাঁ, ঘড়ি না দেখেও মোটামুটি কাজ চ'লে যায়। রৌদ্রের তেজ দেখে বুঝতে পারি, বেলা প্রায় দশটা। তাড়াতাড়ি যথাকর্তব্য সেরে ফেলি। ভদ্রলোকেরা আমার জন্যে ব'সে থাকবেন। হিন্দু-পরিবারে পুরুষদের খাওয়া না হ'লে মেয়েদের অসুবিধার অন্ত থাকে না। [ক্রমশ]

শ্রীভোলা সেন

সংবাদ-সাহিত্য

আমাদেরই খণ্ড ও অখণ্ড ভারতবর্ষে স্মরণীয় কালের মধ্যে আমরা কয়েকটি অপঘাত-মৃত্যু দেখিয়াছি, সম্প্রতি আরও একটি দেখিলাম। ইহার মধ্যে হত্যা-আত্মহত্যা দুই-ই আছে, দুই-ই অপঘাত। কিন্তু আগেরগুলির সঙ্গে শেষেরটির পরিণামে গুরুতর পার্থক্য পরিলক্ষিত হইতেছে। পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মানব মহাত্মা গান্ধীকে অথবা পাকিস্তানের সর্বাধিনায়ক লিয়াকৎ আলিকে যখন গুলি করিয়া হত্যা করা হয়, ভক্ত মানুষের মনে সর্বধ্বংসী ক্রোধ জন্মিবার কথা। কিন্তু আশ্চর্য এই যে, গান্ধীজীর আততায়ীর কেশাগ্রও কেহ স্পর্শ করে নাই, লিয়াকৎ আলির হত্যাকারীকে অবশ্য সাময়িক ক্রোধানলে

জীবনাহুতি দিতে হইয়াছিল, কিন্তু জনতার প্রতিহিংসা সঙ্গে সঙ্গে রুদ্ধ হইয়াছিল, ব্যাপকতর ও ভীষণতর মূর্তি ধারণ করে নাই। অনশনে মৃত্যু দীর্ঘকাল ধরিয়া তিলে তিলে ঘটিয়াছে। ইহার শোচনীয় অনিবার্যতা সকলের—বিরোধী ও সমর্থকমাত্রের চিত্তকে প্রস্তুত করিয়াই রাখিয়াছিল; আকস্মিক অপঘাতজনিত শোক, ক্ষোভ ও ক্রোধের তীব্রতা এ ক্ষেত্রে থাকিবার কথা নয়। অথচ কাজের বেলায় দেখা গেল, যেখানে ভয়াবহ অগ্ন্যুৎপাতের সম্ভাবনা ছিল, মানুষ সেখানে স্তব্ধ ও মুহ্যমান হইয়া গেল; শান্তভাবে শবানুগমন করা ছাড়া মানুষের যেখানে আর কিছু করার ছিল না, সেখানেই দাবানল জ্বলিয়া উঠিল। এই শান্ত-ধীর-সশ্রদ্ধ শবানুগমন বীর যতীন দাসের ক্ষেত্রে আমরাই দেখিয়াছি। পত্তি শ্রীরামুলু যতই জনপ্রিয় হউন, মহাত্মা গান্ধীর সহিত তুলনায় তিনি একজন সাধারণ মানুষ। তাঁহার স্বেচ্ছাবৃত অপমৃত্যুকে উপলক্ষ্য করিয়া এত প্রাণ ও সম্পত্তি নাশ কেন ঘটিল, তাহা ভাবিবার কথা। যাহারা তাঁহার সমর্থক, তাহাদের অপেক্ষা যাহারা তাঁহার দাবিকে অযৌক্তিক ও অন্যায় মনে করে তাহাদের সংখ্যা অনেক বেশি। তৎসত্ত্বেও এরূপ ঘটিল কেন? একটু প্রণিধান করিয়া গত কয়েক দিনের ঘটনা অনুধাবন করিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে, হঠাৎ-উন্মত্ত বিক্ষুব্ধ জনতার সাময়িক কীর্তি ইহা নয়। বৈদেশিক নাশকতা-পদ্ধতির যে বীজ সুচিন্তিত ভাবে দক্ষিণ-ভারতবর্ষে উপ্ত হইয়াছিল, তেলেঙ্গানা অঞ্চলের বিষবৃক্ষগুলি যাহার প্রত্যক্ষ ফসল, এই সাংঘাতিক ঘটনা-পরম্পরা তাহারই পরিণাম মাত্র। পৃথিবীর উত্তরাবর্তের মারাত্মক প্রভাব ভারতের দক্ষিণাপথে শোচনীয় ভাবে কার্যকরী হইয়াছে। উত্তরাপথে এতদিন যাঁহারা নিশ্চিন্ত ছিলেন, তাঁহাদের অবহিত হইবার সময় আসিয়াছে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের গদিচ্যুত কয়েকজন মহাজন পুনঃপ্রতিষ্ঠার মোহে আগুন লইয়া যে ভাবে খেলিতেছেন, তাহাতে শুধু হনুমানের লেজই পুড়িবে না, লঙ্কাদহনেরও আশঙ্কা আছে। কিন্তু এ জয়চাঁদ-মীরজাফরের দেশে আত্মাবমাননার প্রতিশোধে

দেশের সর্বনাশ ঘটিতেই থাকিবে, আমরা 'পৃথ্বীরাজ', 'পলাশীর যুদ্ধ' লিখিয়াই কর্তব্য সমাধা করিব।

* * *

শ্রীরামুলুর মৃত্যুই যদি ভাষার ভিত্তিতে অন্ধ্রপ্রদেশ-গঠন-সিদ্ধান্তের কারণ হইয়া থাকে, তাহা হইলে বিহারের বঙ্গভাষাভাষী অঞ্চল সম্বন্ধেও সহৃদয় ভারতসরকারের অবিলম্বে অনুরূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে। এখনও সেখানে কোনও একজন না মরিলেও অনেকে মরিতে বসিয়াছে। আচার্য বিনোবা ভাবে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া তাঁহার ঔষধ-প্রায়োপবেশনের স্থানটি নির্ধারণ করিয়াছেন কি না বলিতে পারি না, ঘটনাটি কাকতালীয়বৎ ঘটিলেও ইহার সু-ইঙ্গিত ভারতভাগ্যবিধাতাদের সচকিত ও সচেতন করিলে ভাল হয়। ভারতের রাষ্ট্রপতি ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ এবার বঙ্গপরিক্রমায় আসিয়া বহুদিন পরে বঙ্গভাষায় মুখ খুলিবেন, সেই সঙ্গে দুর্ভাগা বঙ্গভাষাভাষীদের জন্য যদি একটু মন খোলেন! তাহা হইলে আমরা তাঁহার জয়-জয়কার করিব এবং বলিব—

জয়তু রাজেন্দ্রপ্রসাদ হে,
সদয় দৃষ্টিপাতে দাও বাংলার পাতে
বিহারোচ্ছিষ্ট প্রসাদ হে।
দাও মানভূম, দাও পূর্ণিয়া অংশ
পুণ্যভোজপুর-বংশাবতংস
ফরাক্কা বাঁধখানি পাঁচশালা প্ল্যানে আনি
মিটাও বাঙালী-মনোসাধ হে॥

বাল্যকালে অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফি মহাশয়ের একটা কমিক রেকর্ড প্রায়ই বাজিতে শুনিতাম; শুনিতে শুনিতে সর্বরোগহর ফোমেণ্টেশন-মাহাত্ম্য সবিশেষ উপলব্ধি করিয়াছিলাম। জ্বর হইয়াছে—ফোমেণ্টেশন সমঝায় দেও; দাঁত কনকন করিতেছে—দাও ফোমেণ্টেশন; চুল উঠিতেছে—লাগাও ফোমেণ্টেশন। আমরাও অনুকরণে ফোমেণ্টেশন-

মঝানোর খেলা খেলিতাম। এখন সাল্‌ফার ড্রাগ ও পেনিসিলিনের প্রবল প্রসারের যুগ, ফোমেণ্টেশনের কথা আর শুনিতে পাই না।

কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ডক্টরেট উপাধির কথা শুনি; এ যুগে ডক্টরেট ডিগ্রীই ফোমেণ্টেশনের মত হইয়া দাঁড়াইয়াছে; পাত্রাপাত্র বিচার নাই, রোগ-অরোগ বিচার নাই, কাহাকেও ঠাণ্ডা করিতে হইলেই দাও একটা অনররি ডক্টরেট দিয়া, সব গোল চুকিয়া যাইবে। ইংলণ্ডের রাজা যখন ভারতবর্ষের একটি মাত্র সম্রাট ছিলেন, তখন ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁহাকে ডক্টরেট দিলে ততটা দৃষ্টিকটু হইত না। এখন ঘরে ঘরে—প্রদেশে প্রদেশেই লাট বেলাট প্রেসিডেণ্ট প্রাইম মিনিস্টারের ছড়াছড়ি, তদুপরি আন্তর্জাতিক লেনদেন আছে, সুতরাং সমঝাও অনররি ডক্টরেট তা সে মাথা যত ইচ্ছা তেলা বা নিরেট হউক। ঘেন্না ধরিয়া গেল। সব চাইতে লজ্জাকর 'পরিস্থিতি' দাঁড়াইয়াছে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে, ভাইস-চ্যান্সেলরেরা প্রত্যেকেই স্ব স্ব পাতে ঝোল টানিতেছেন এবং চক্ষুলজ্জার খাতিরে বাঞ্ছিত-অবাঞ্ছিত অপরকেও দুই-চারিটা বাড়্‌তি প্রসাদ বিতরণ করিতেছেন, কেটি, কে-সি-আই-ই, কে-সি-এস-আইয়ের রেওয়াজ যখন আর নাই। শ্যামাপ্রসাদের কথা ধরি না, তিনি বর্ন (born) মহীরাবণ, কিন্তু জামাই প্রমথনাথ যখন নিজে ডক্টরেট লইলেন, তখন আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় ও আচার্য যদুনাথ সরকার ওই সম্মানিত পদবীর উপযুক্ত বিবেচিত হন নাই। অবশ্য আত্মোদরপরায়ণতার শাস্তি তিনি অচিরাৎ পাইয়াছিলেন। এবার আমাদের মাহিনা-করা ভাইস-চ্যান্সেলারের উদগ্র বাহু ডক্টরেট-ফল ধরিয়া উদ্বাহু হইতেছে, কিন্তু আচার্য যোগেশচন্দ্র-যদুনাথ এখনও জীবিত আছেন। চাকরির খাতিরে নেহরু-রাজেন্দ্রপ্রসাদে আমাদের আপত্তি নাই; কিন্তু ধর্মের খাতির, সত্যের খাতির, ন্যায়ের খাতির এবং সর্বোপরি বিদ্যার খাতিরও তো রাখা চাই। দেখিতেছি শম্ভু-প্রমথনাথেরা নিজেরা ডক্টরেট কাঁধে লইয়া ধেই ধেই করিয়া নাচিতেই জানেন, মানীর সম্মান রাখিতে জানেন না। যদুনাথ রয়াল সোসাইটি অব গ্রেটব্রিটেনের

অনররি মেম্বর হইতে পারিলেন (১৯২৩), নাইট হইতে পারিলেন (১৯২৯), ঢাকা (১৯৩৬) ও পাটনা (১৯৪৪) বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি-লিট. হইতে পারিলেন, অথচ ১৯২৬-১৯২৮ তিন বৎসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইসচ্যান্সেলরি করিয়াও নিজেকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনররি ডক্টরেট উপাধি দিবার মত শম্ভু-প্রামথিক উদারতা সংগ্রহ করিতে পারিলেন না। অন্য ভাইসচ্যান্সেলরদের উদারতার উপর তিনি সম্ভবত নির্ভর করিয়াছিলেন, কিন্তু পর পর দুই যুগ (২৪ বৎসর) তো কাটিয়া গেল, তাঁহার ভাগ্যে আর ফোমেণ্টেশন জুটিল না। আচার্য যোগেশচন্দ্র একশোর কোঠায় পা দিলেন, কিন্তু কোনও ডক্টর ভাইসচ্যান্সেলরই তাঁহাকে ফোমেণ্টেশন সমঝাইল না। বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ তো মরিয়াই গেলেন। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এখনও কোনও প্রকারে টিকিয়া আছেন; তাঁহারও কোনও আশা নাই।

—

স্মরণাতীত কাল হইতে ঢোক গিলিতে গিলিতেই ভারতবর্ষ হয়রান-লুব্রেজান হইয়া গেল। শক হুন দল পাঠান মোগল সবারই বেলায় ভারতবর্ষ ঢোক গিলিয়াছে, সে কাহাকেও দুঃখ দিতে চাহে না। ইংরেজ আমলে ইংরেজী ঢোক সে যে কত গিলিয়াছে তার ঠিক নাই; উর্দু বা হিন্দুস্থানী ঢোক এখনও ততটা রপ্ত হয় নাই, এখনও ইংরেজী ঢোকই চলিতেছে। আসল রাজারাজড়ার দিন গিয়াছে, নামে রাজা-রাজেন্দ্র-মহারাজারা মাথায় জহর ধারণ করিয়া ভারতবর্ষ শাসন করিতেছেন, কিন্তু সেই পুরাতন রাজকীয় ঢোক গেলার শেষ হয় নাই। কমনওয়েল্‌থে আছি কি নাই ইহা লইয়া ঢোক, ইউ-এস-এর সহিত বাণিজ্যিক সম্পর্কের ব্যাপারে ঢোক, চীনের সহযোগিতা লইয়া ঢোক, কাশ্মীরপ্রসঙ্গে ঢোক এবং পাকিস্তানের সহিত উদ্বাস্তু-সম্পত্তি, সীমান্ত-রক্ষা, পাসপোর্ট ও পাট-কয়লা চালান লইয়া ঢোক গিলিতে গিলিতে ভারতবর্ষ ঢোক-বিশারদ হইয়া উঠিয়াছে। ঢোকের ঢক্কানিনাদে

ইউনেস্কো মুখরিত, সেখানেও ভারতের কৃতিত্ব কম নয়। ভারতবর্ষ শেষ ঢোক গিলিয়াছে মহামতি স্টালিনের বাৎসরিক বক্তৃতা লইয়া। গত অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি কালে রাশিয়ার কম্যুনিস্ট-পার্টি-কংগ্রেসের উপসংহার-বক্তৃতায় মার্শাল স্টালিন সুস্পষ্ট ইঙ্গিত করেন যে, অকম্যুনিস্ট রাষ্ট্রসমূহে কম্যুনিস্ট-পার্টি রাষ্ট্রীয় অধিকার লাভে যে আন্দোলন চালাইতেছে, তাহাতে সোভিয়েট রাশিয়ার সম্পূর্ণ সমর্থন আছে এবং কম্যুনিস্ট-পার্টি-প্রবর্তিত স্থানীয় "মুক্তি"-আন্দোলনে সর্বপ্রকারে সাহায্য সে করিবে। এই উক্তি স্পষ্টত আন্তর্জাতিক নীতিবিরোধী এবং পরোক্ষে ভারতবর্ষের উল্লেখও ইহাতে আছে। ভারতের প্রধান মন্ত্রীর প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া ঠিকই ছিল, কিন্তু তিনি তাঁহার স্বভাবসুলভ ঢোক গিলিয়া পরে বলিয়াছেন, মার্শাল স্টালিনের উক্ত বক্তৃতা ভারতসম্পর্কবিরহিত, সুতরাং আমাদের সমালোচনা-বহির্ভূত। হায় রে! ম্যালেঙ্কভের উদ্বোধনী বক্তৃতা, শ্রীগোপালনের উল্লাস এবং কোরিয়া-প্রস্তাব-বিরোধী থাপ্পড়েও যাঁহাদের ঘুম ভাঙে না, তাঁহারা ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া বক্তৃতা দেন কেন? মার্শাল স্টালিন সংবৎসরে গুনিয়া গুনিয়া মাত্র আড়াইটি বাক্য উচ্চারণ করেন; তাঁহার মূক-বধির-বিদ্যালয় হইতে ইঁহারা শিক্ষা লন না কেন? শুধু নিজেরা নন, ইঁহাদের আশেপাশের মেনন-উওমেননদের বক্তৃতারই বা বহর কত! ফলে ঢোক গেলা অনিবার্য হইয়া উঠে। কিন্তু আসল কথাটা কি? সোভিয়েট লাউমাচার পশ্চিম-ইউরোপীয় প্রান্তের ডগাগুলি সেদিকে বাধাপ্রাপ্ত হইয়া পূর্ব-দক্ষিণ দিকে ফন্ ফন্ করিয়া বাড়িতে বাড়িতে করাল দ্রংষ্ট্রা ভারতের দিকে প্রসারিত করিতেছে। তিব্বত যায় যায়, নেপালও যাইবার দাখিল। সাবধান যদি হইতেই হয় ইহাই সময়, স্টালিনের জন্মদিনে হিন্দীতে শুভকামনা জ্ঞাপন করিয়াও তাহা করা চলে। কিন্তু স্টালিনের মুখ চাহিয়া দেশের আভ্যন্তরীণ শাসন-ব্যাপারেও যদি ঢোক গিলিতে হয় তাহা হইলে হে সঞ্জয়, আমাদের জয় দূরের কথা, বাঁচিবারও আশা নাই।

—

দৈত্যকুলে যেমন প্রহ্লাদ, ভারতকুলে তেমনই নীরদ সি. চৌধুরী। ঠিক রাতারাতি নয়—অনেক নিশীথ রাত্রের সাধনায় তিনি ভারতবর্ষের মাটিতে ইংরেজ বনিয়া যাইতে সক্ষম হইয়াছেন। লঙ্কার বিভীষণের সঙ্গে তাঁহার তুলনা আরও লাগসই হয়। রাক্ষুসে দেশে ইনিই একমাত্র রামভক্ত, শুধু কালাপানি পার হইয়া ও-পার পর্যন্ত এখনও পৌঁছিতে পারেন নাই। বুদ্ধত্ব (ইংরেজত্ব) লাভের পর তিনি 'অটোবায়োগ্রাফি অফ অ্যান আন্‌নোন ইণ্ডিয়ান' লিখিয়াছেন। এই নামের "আন্‌নোন" কথাটি ব্যঙ্গার্থে প্রযুক্ত হইয়াছে, কারণ লেখক ভালই জানিতেন যে পুস্তকটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে "আন্‌নোন ইণ্ডিয়ান" "নোন ইংরেজী-নবিস" হইয়া খ্যাতি অর্জন করিবেন। হইয়াছেও তাহাই। গরু খাইয়া অনেক হিন্দু মুসলমান-সমাজে প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছেন, স্বদেশের বদনাম করিয়া নীরদ সি. চৌধুরীও ইংরেজ-মহলে খ্যাত্যাপন্ন হইলেন। সুতরাং ইনি যদি 'স্টেট্‌স্‌ম্যানে' বাংলা-সাহিত্যকে হেয় প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন, তাহাতে অবাক হইবার কিছু নাই—যাঁহারা চেল্লাচিল্লি করিতেছেন, তাঁহারাই মূর্খ।

যে সকল মনীষী বাংলা দেশ তথা ভারতের সম্মান পৃথিবীর গুণীজ্ঞানীসম্প্রদায়ে বৃদ্ধি করিয়াছেন, দার্শনিক সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। দর্শনে ও সংস্কৃতজ্ঞানে তিনি বিশেষজ্ঞ হইলেও সাহিত্যে শিল্পে সৌন্দর্যতত্ত্বে অলঙ্কারশাস্ত্রে আয়ুর্বেদে তাঁহার প্রভূত অধিকার ছিল; সর্ববিধ জ্ঞানে-বিজ্ঞানে তাঁহার ন্যায় চৌকস ব্যক্তি ইদানীং দুর্লভ ছিল। বিষয়জ্ঞানের সঙ্গে প্রকাশক্ষমতার সামঞ্জস্য ঘটিলে তিনি বিশ্বভারতীর দরবারে শীর্ষস্থান অধিকার করিতে পারিতেন। ইংরেজীতে লেখা তাঁহার ভারতীয় দর্শনের বিরাট ইতিহাস তাঁহার অক্ষয় কীর্তি হইয়া থাকিবে। মাতৃভাষাতেও তাঁহার দান বড় কম নয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সেগুলি সুপ্রচারিত নয়। কোনও যোগ্য ব্যক্তি যদি তাঁহার রচিত পুস্তকগুলির সম্যক পরিচয়

প্রদান করেন, তাহা হইলে অধ্যাপক দাশগুপ্তের যথার্থ মর্যাদা বাঙালী জনসাধারণ উপলব্ধি করিতে পারিবে। আমরা তাঁহাকে শুধু কবি ও সমালোচক বলিয়া জানিতাম না, ভারতীয় রসশাস্ত্রের একটি বিপুল আধার বলিয়া জানিতাম। সাহিত্য ও দর্শন বিষয়ক যে কোনও প্রয়োজনে তাঁহার দ্বারস্থ হইলে সমাধান মিলিত। কিছুকাল পূর্বে তাঁহার বিরাট গ্রন্থাগারটি তিনি কাশী বিশ্ববিদ্যালয়কে দান করিয়া দেশবাসীর কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছিলেন। পঁয়ষট্টি বৎসর বয়স হইলেও তাঁহার স্মৃতি ও ধীশক্তি অটুট ছিল, আমরা তাঁহার নিকট হইতে আরও অনেক কিছু প্রত্যাশা করিতাম। তাঁহার আকস্মিক মৃত্যুতে দেশের সমূহ ক্ষতি হইল, বাঙালীর যে ক্ষতি হইল তাহা সত্য সত্যই অপূরণীয়।

বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় প্রায় নব্বইয়ের কোঠায় পৌঁছিয়া ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের আদিযুগ সম্পর্কে নানা গবেষণার কাজে তিনি আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন; প্রথমে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ ও পরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহার গবেষণার ক্ষেত্র ছিল। তিনি ভাষাতত্ত্ব এবং বিশেষ করিয়া পালি ভাষাতে সুপণ্ডিত ছিলেন, ফলে প্রাচীনতম বাংলা-ভাষার সম্যক অর্থ গ্রহণে তিনি পটু ছিলেন। স্বগ্রাম বাঁকুড়ার বেলেতোড়ের সন্নিকটে বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র পুথি আবিষ্কারের গৌরব মাত্র তাঁহার নয়। এই পুথি সুসম্পাদিত করিয়া প্রকাশ করাও তাঁহার চিরস্মরণীয় কীর্তি। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কর্তৃক নেপালে বাংলা-ভাষায় আদিমতম রচনা চর্যাপদগুলির আবিষ্কারের সমপর্যায়ের আবিষ্কার এই 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'—কারণ চর্যাপদের পুথি অপেক্ষাকৃত পরবর্তী কালের, 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র পুথি প্রায় সমসাময়িক। ইহাতে ভাষার কেবল তৎকাল-প্রচলিত রূপই নাই, বাংলা লিপির আদিমতম রূপের নিদর্শন আছে। এইরূপ একটি গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারকে সম্যক মর্যাদা দিয়া সুসম্পাদন করিবার ক্ষমতা

আবিষ্কারকের নিজের ছিল, ইহাই আমাদের সৌভাগ্য; বস্তুত, এরূপ সুসম্পাদিত গ্রন্থ বাংলায় আর দ্বিতীয় নাই। ফলে প্রাচীনতম বাংলা-ভাষা ও সাহিত্যের পঠন-পাঠনে বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয়ের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' একখানি অপরিহার্য গ্রন্থ, বাংলা ভাষার "অরিজিন অ্যাণ্ড ডেভালপমেণ্ট" নির্ধারণে ইহার গুরুত্ব চর্যাপদগুলির সঙ্গে সমান। বাংলা-ভাষার 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র সহিত সম্পাদক বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ চিরজীবী হইয়া থাকিবেন। ইনি বাগাড়ম্বরের পক্ষপাতী ছিলেন না, স্তুতিস্তাবকতা করিতে জানিতেন না, নিজের কাজ করিয়া যাইতেন। তাই বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহার যথার্থ মর্যাদা দিতে ভুল করিয়াছেন।

—

গত কার্তিক মাসের "সংবাদ-সাহিত্যে" ভগিনী নিবেদিতা সম্পর্কে আমরা যাহা লিখিয়াছিলাম তাহাতে ভ্রমক্রমে তাঁহার জীবনে শ্রীশ্রীসারদামাতার প্রভাবের কথা উল্লেখে আমাদের ভুল হইয়াছিল। ভগিনী নিবেদিতার বালিকা বিদ্যালয় স্বামী বিবেকানন্দের উপস্থিতিতে মাতার আশীর্বাদপূত হইয়া প্রতিষ্ঠিত হয়। নিবেদিতা যখন ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের শেষার্ধে একান্তভাবে কর্মক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হন, তখন স্বামীজী দেহরক্ষা করিয়াছেন। একমাত্র মায়ের নির্দেশই ভগিনী নিবেদিতাকে অন্ধকারে পথ দেখাইয়াছিল। মাতার সহিত ভগিনীর কি নিগূঢ় সম্পর্ক ছিল তাহা ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই ডিসেম্বর তারিখে কেম্ব্রিজ ম্যাস. হইতে লিখিত মাকে লেখা তাঁহার এক পত্রে প্রকাশ পাইয়াছে। উদ্বোধনের স্বামী আত্মবোধানন্দ পত্রটির প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। নিবেদিতা লিখিতেছেন:

"সাধের মা (Beloved Mother),

আজ সকালে, খুব সকালে, আমি গীর্জায় গিয়েছিলাম—সারার জন্যে প্রার্থনা করতে। যখন সেখানকার সবাই যীশুমাতা মেরির কথা ভাবছিল, তখন হঠাৎ তোমার কথা আমার মনে হ'ল। তোমার মন-ভোলানো মুখখানি, তোমার স্নেহ-দৃষ্টি, তোমার সাদা শাড়ি, তোমার

হাতের বালা—আমি সবই প্রত্যক্ষ দেখতে পেলাম। আর আমার মনে হ'ল তোমার এই আবির্ভাবই বেচারা এস. সারার রুগ্ন শয্যায় তাকে শান্তি দেবে, আশীর্বাদ দেবে। আর জানো মা, অমনি আমার মনে পড়ল সেদিন শ্রীরামকৃষ্ণের সন্ধ্যারতির সময় আমি কি বোকার মতন তোমার ঘরে ব'সে ধ্যান করবার চেষ্টা করেছিলাম; আমি কেন বুঝতে পারি নি, তোমার বাঞ্ছিত পায়ের তলায় শিশুর মতো ব'সে থাকাটাই যথেষ্ট! ভালবাসায় ভরা মা আমার! তোমার সেই ভালবাসায় আমাদের মত উচ্ছ্বাস আর উগ্রতা নেই, এই জগতের ভালবাসাও তা নয়, স্নিগ্ধ শান্তির মত তা সকলের কল্যাণ নিয়ে নেমে আসে, এতে কারুর কোন অকল্যাণের ছোঁয়া লাগে না—লীলাচঞ্চল সোনালি আলোর আভা যেন। কয়েকমাস আগের সেই রবিবারটা কি আশীর্বাদই না ব'য়ে এনেছিল, যখন গঙ্গায় স্নান করবার ঠিক আগে আমি তোমার কাছে ছুটে গিয়েছিলাম এবং স্নান সেরেই মুহূর্তের জন্যে আবার ফিরে এসেছিলাম তোমার কাছে! তোমার ঘরখানির স্বাগত সম্ভাষণ তোমার আশীর্বাদের সঙ্গে মিশে কি অপরূপ মুক্তিই দিয়েছিল আমাকে! আমার সবার চাইতে আপন মা তুমি—সাধ হয়, চমৎকার একটি স্তোত্র বা প্রার্থনা লিখে তোমার কাছে পাঠাই। কিন্তু এও জানি সেটাও শোনাবে কর্কশ চীৎকারের মতো, খুবই শব্দমুখর ব'লে মনে হবে। তুমি যে ভগবানের অপূর্বতম সৃষ্টি তাতে সন্দেহ নেই—তুমিই শ্রীরামকৃষ্ণের নিজস্ব আধার। তোমার মধ্য দিয়েই নর জগতের প্রতি তাঁর ভালবাসা প্রবাহিত হচ্ছে—তাঁর সন্তানদের অসহায় অবস্থায় তিনি তোমাকেই তাঁর প্রতীকস্বরূপ রেখে গেছেন; তোমার কাছেই খুব শান্ত হয়ে চুপ ক'রে আমরা থাকব—একটু মজা করার জন্যে মাঝে মাঝে গোলমালও আমরা করব বইকি! ভগবানের অপূর্ব সৃষ্টি সবই নিঃসন্দেহে শান্ত-নীরব। আমাদের জীবনে আমাদের অজ্ঞাতেই তারা প্রবেশ করে—এই বাতাস, এই সূর্যালোক, বাগানের মিষ্ট সুরভি এবং গঙ্গার স্নিগ্ধতা যেমন। এই সব শান্ত জিনিসের সঙ্গেই শুধু তোমার তুলনা হ'তে পারে।

বেচারা এস. সারাকে তোমার শান্তির আঁচলে ঢেকে রাখো। ঊর্ধ্বে যে শান্তি বিরাজ করে, যেখানে ভালবাসাও নেই, ঘৃণাও নেই, তোমার ভাবনা তো মাঝে মাঝে সেখানে পৌঁছয়; তোমার সেই ভাবনা কি পদ্মপত্রে শিশিরবিন্দুর মত ভগবানে কম্পমান স্নিগ্ধ আশীর্বাদ নয়—জগতের স্পর্শে যা মলিন হয় না!

প্রিয়তমা মা, আমি তোমার চিরদিনের, চিরদিনের সেই বোকা খুকু

নিবেদিতা"

ভগিনী নিবেদিতার যে পুস্তক-তালিকা আমরা প্রকাশ করিয়াছিলাম তন্মধ্যে ৭ নম্বর *The Civic and National Ideals* বইখানি উদ্বোধন অফিস কর্তৃক পুনঃপ্রকাশিত হইয়াছে, অদ্বৈত আশ্রম কর্তৃক নয়। "Myths of the Indo-Aryan Race (Stories from the Mahabharata)" গ্রন্থখানির উল্লেখ করিয়াছিলাম, কিন্তু উহা চোখে দেখি নাই। সম্প্রতি ইহার সন্ধান পাইয়াছি। পুস্তক-তালিকায় বইখানিকে স্থান দিতে হইবে। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডনের George G. Harrap & Company—Ananda K. Coomarswamy কর্তৃক সম্পূর্ণ করাইয়া নিবেদিতার অসম্পূর্ণ গ্রন্থখানি প্রকাশ করেন। উহার নাম রাখা হয় *Myths of the Hindus and Buddhists.* টাইটেল-পেজে এই পরিচয় আছে: "By The Sister Nivedita...and Ananda K. Coomarswamy with thirty two illutrations in colour by Indian Artists under the supervision of Abanindro Nath Tagore C. I. E." পুস্তকের এক-তৃতীয়াংশ ভগিনী নিবেদিতার লেখা, মহাভারতের অংশ প্রায় সম্পূর্ণ তাঁহার এবং ভূমিকাটি তাঁহার। আরও কয়েকটি প্রসঙ্গ তাঁহার রচনা। ইহাতে অবনীন্দ্রনাথের পাঁচখানি এবং নন্দলালের দশখানি বিলাতে মুদ্রিত ত্রিবর্ণ চিত্র আছে। পৃ. xii+400; কয়েকটি সংস্করণ হইয়াছিল, শেষসংস্করণ ১৯৩২।

শনিরঞ্জন প্রেস, ৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, বেলগাছিয়া, কলিকাতা-৩৭ হইতে শ্রীসজনীকান্ত দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ফোন: বড়বাজার ৬৫২০

ভারতে মাদক-নিরোধ অভিযান

বহু শতাব্দী ধরিয়া ভারতবর্ষের সুনাম আছে, ভারতে পানদোষের প্রাবল্য কম। অন্যান্য দেশের তুলনায় এ দেশে মদ এবং অনুরূপ নেশায় যাহারা অভ্যস্ত, এমন লোকের আনুপাতিক সংখ্যা নিতান্তই অল্প। তাহার কারণ ভারতের ধর্মবিশ্বাস, সামাজিক রুচি এবং চিরাগত প্রথা সমস্তই মাদক ব্যবহারের বিরোধী। এই দেশে মধ্যবিত্ত-শ্রেণীর মধ্যে পানপ্রথার প্রচলন নাই বলিলেও হয় এবং উচ্চশ্রেণীর মধ্যে এই প্রথা সীমাবদ্ধভাবে বর্তমান। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর মধ্যে, বিশেষত হরিজন এবং শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে, অধিকাংশ নরনারী পানদোষে এবং অন্যান্য মাদকদ্রব্য ব্যবহারে লিপ্ত। পাশ্চাত্য জগতে আইনের সাহায্যে মদ্যপান নিষিদ্ধ করা কঠিন ব্যাপার। ভারতে তাহা মোটেই কঠিন নয়।

ভারতে আইন করিয়া মদ্যপান বন্ধ করা হউক—এই দাবির প্রথম প্রেরণা জোগাইয়াছিলেন বাংলা দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নেতা ৺কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৯০২ সনে প্রথম তিনি এই অভিযানের সূত্রপাত করেন। তাঁহার এই মহান্ প্রচেষ্টার কথা স্মরণ করিয়া বাঙালী হিসাবে আমি মনে মনে গর্ব অনুভব করি।

১৯১২ সনে মহামতি গোখ্‌লে ঘোষণা করেন, মদ্যপান-নিরোধকে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের অন্যতম ব্রত বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। ঐ বৎসরই কংগ্রেসও প্রথম মদ্যপান-নিরোধ অভিযানের সংকল্প গ্রহণ করেন। কিন্তু মহাত্মা গান্ধী ভারতীয় রাজনীতিক্ষেত্রে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিবার পূর্বে কংগ্রেস এই মহান্ সংকল্পকে কার্যে পরিণত করার বিশেষ কোন কর্মপন্থা গ্রহণ করিতে সক্ষম হন না।

ইংলণ্ডে আইন-অধ্যয়নকালে তত্রত্য সমাজের বিভিন্ন স্তরের লোকদিগের সংস্পর্শে আসিয়া মহাত্মা গান্ধী দেখিতে পান যে, মদ্যপান-

প্রথা উক্ত দেশের জনসাধারণের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা-প্রণালীর সহিত অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত এবং ধনীদরিদ্রনির্বিশেষে সকলেই তাহাদের আয়ের এক অংশ মদ্যপানে ব্যয় করিয়া থাকেন। তিনি লক্ষ্য করেন যে, শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যেই মদ্যপায়ীর সংখ্যা সর্বাপেক্ষা অধিক এবং মদ্যপানে প্রচুর অর্থ ব্যয় করার ফলে তাহারা দারিদ্র্যে কষ্ট পাইয়া থাকে। এই সময় হইতেই গান্ধীজীর মন পানপ্রথার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া উঠে।

পরবর্তী কালে দক্ষিণ-আফ্রিকায় গিয়া তিনি লক্ষ্য করেন যে, পানপ্রথা সেখানেও সমাজের সর্বস্তরে ব্যাপকভাবে প্রচলিত এবং উক্ত প্রথা যে শুধু শ্বেতশ্রেণী এবং আদিম অধিবাসীদিগের মধ্যেই সীমাবদ্ধ তাহা নয়; তত্রত্য ভারতীয় অধিবাসীগণ, এমন কি ভারতীয় নারীরাও, প্রচুর পরিমাণে মদ্যপানে লিপ্ত। তিনি লক্ষ্য করেন, যে-সব ভারতীয় নরনারী ভারতবর্ষে মদ্যপান করার কথা কল্পনাও করিতে পারিতেন না, তাঁহারাও দক্ষিণ-আফ্রিকায় অবাধে এবং প্রকাশ্যে মদ্যপান করিতে লজ্জা বোধ করেন না। অত্যধিক মদ্যপানের ফলে তাঁহারা যে আর্থিক ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছেন, সে বিষয়ে তাঁহাদের বিন্দুমাত্রও ভ্রূক্ষেপ নাই। পানদোষে লিপ্ত হওয়ার ফলে দক্ষিণ-আফ্রিকাপ্রবাসী ভারতীয় অধিবাসীদিগের নৈতিক অধঃপতন এবং আর্থিক ক্ষতি গান্ধীজীর মনকে ব্যথিত করিয়া তুলে এবং তত্রত্য ভারতীয় সমাজ হইতে এই কুপ্রথার উচ্ছেদসাধনে তিনি বদ্ধপরিকর হন। বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে তিনি সেখানে যে আন্দোলন পরিচালনা করেন, পানদোষ-নিবারণকে সেই আন্দোলনের অন্যতম কার্যক্রম হিসাবে গ্রহণ করেন। কিন্তু অচিরেই গান্ধীজী উপলব্ধি করেন যে, প্রবাসী ভারতীয় অধিবাসীগণ তাঁহাকে তাঁহাদের অবিসম্বাদী নেতা বলিয়া গ্রহণ করিলেও পানদোষ-নিবারণকল্পে তাঁহার প্রচেষ্টা জনসাধারণের অন্তর স্পর্শ করিতে সক্ষম হয় নাই, এবং এই বিষয়ে তাঁহার উদ্যম ও প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইয়াছে। তিনি এই অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন যে,

অনুরোধ-উপরোধের দ্বারা অথবা সভা-সমিতির মাধ্যমে পানদোষের অপকারিতা বিশ্লেষণ করিয়া জনসাধারণকে মদ্যপানে বিরত করা সম্ভব নয়।

দক্ষিণ-আফ্রিকা হইতে ভারতে প্রত্যাবর্তন করিয়া ভারতীয় রাজনীতিক্ষেত্রে প্রবেশ করিবার পূর্বে গান্ধীজী এক বৎসর ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ভ্রমণ করেন। এই উপলক্ষে জনসাধারণের সংস্পর্শে আসিয়া তিনি লক্ষ্য করেন যে, প্রত্যেক প্রদেশেই জনসাধারণের এক অংশ পানদোষে লিপ্ত এবং মদ্য ও অন্যান্য মাদকদ্রব্যের ব্যবহার হরিজন এবং শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচলিত। প্রচুর পরিমাণে মাদকদ্রব্য ব্যবহারের ফলে তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর জনসাধারণের এক বিরাট অংশকে শারীরিক, আর্থিক এবং নৈতিক ধ্বংসের মুখে লইয়া যাইতেছে এবং তাহারা দারিদ্র্যের কঠোর কবলে পড়িয়া পশুর ন্যায় জীবন যাপন করিতে বাধ্য হইতেছে। ইহা দেখিয়া গান্ধীজী অত্যন্ত বেদনা অনুভব করেন। ভারতীয় জনসাধারণের, বিশেষত মধ্যবিত্ত এবং দরিদ্র শ্রেণীর, নৈতিক মনোবলের উপর নির্ভর করিয়াই গান্ধীজী তাঁহার অহিংস স্বাধীনতা-সংগ্রাম পরিচালনা করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন। তিনি ইহাও উপলব্ধি করেন যে, জনসাধারণের নৈতিক চরিত্র উন্নত করিতে না পারিলে স্বাধীনতা-সংগ্রামে জয়লাভ করা সম্ভব হইবে না এবং স্বাধীনতা লাভ করিলেও উন্নততর সমাজগঠন করিয়া দেশকে সমৃদ্ধিশালী করিয়া তোলা কঠিন হইবে। তাই স্বাধীনতা অর্জনের প্রয়াসের সঙ্গে সঙ্গে তিনি সামাজিক দুর্নীতি, কুপ্রথা প্রভৃতি দূরীভূত করিয়া জনসাধারণকে নৈতিক চরিত্রে বলীয়ান করিয়া তুলিতে মনোনিবেশ করিলেন। স্বাধীনতা অপেক্ষাও জনসাধারণের নৈতিক চরিত্র উন্নত করিবার উপরেই তিনি গুরুত্ব প্রদান করেন। ইংলণ্ড এবং দক্ষিণ-আফ্রিকায় তিনি যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন তাহার ফলে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, জনসাধারণকে নৈতিক চরিত্রে উন্নত করিতে হইলে সর্বাগ্রে তাহাদিগকে পানদোষ এবং মাদকদ্রব্য

হইতে মুক্ত করিতে হইবে। সুতরাং পানপ্রথার এবং অন্যান্য মাদকদ্রব্যের ব্যবহার ভারত হইতে সমূলে উচ্ছেদ-সাধন তিনি তাঁহার জীবনের শ্রেষ্ঠ ব্রত বলিয়া গ্রহণ করেন। স্বাধীনতা-সংগ্রাম-পরিচালনাকালে কংগ্রেসের মাধ্যমে রাজনীতিক্ষেত্রে যখনই তিনি কোনরূপ গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, তখনই পানদোষ নিবারণ এবং মাদকদ্রব্য বর্জন কংগ্রেসের অন্যতম লক্ষ্য বলিয়া ঘোষণা করেন।

দক্ষিণ-আফ্রিকার অভিজ্ঞতা হইতে গান্ধীজী উপলব্ধি করেন যে, আইনের সাহায্যে মাদকদ্রব্যের ব্যবহার নিষিদ্ধ করা ব্যতীত এই সামাজিক ব্যাধির সম্পূর্ণ উচ্ছেদ-সাধন অসম্ভব। কিন্তু পরাধীন ভারতে এইরূপ আইন প্রণয়ন করা সম্ভবপর ছিল না; কারণ বিদেশী সরকার মাদকদ্রব্য ব্যবহার নিষিদ্ধ করা দূরের কথা, রাজস্ব বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে উক্ত দ্রব্যের ব্যবহারের প্রসার সাধনেই যত্নবান ছিলেন। সুতরাং সরকারের সাহায্যের প্রত্যাশা না করিয়া জনসাধারণ যাহাতে স্বতঃ-প্রণোদিত হইয়া এই কুপ্রথা দূর করিতে সমর্থ হয়—সেই উদ্দেশ্যে গান্ধীজী ১৯২০ সনে তাঁহার প্রবর্তিত অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচীর মধ্যে মাদকদ্রব্য বর্জনকেও গ্রহণ করেন। তাঁহার এই মহান্ উদ্দেশ্যকে সফল করিবার নিমিত্ত তিনি দ্বিবিধ কর্মপন্থা গ্রহণ করেন। এক দিকে সভা-সমিতির মাধ্যমে মাদকদ্রব্যের অপকারিতা এবং কুফল বিশ্লেষণ করিয়া জনসাধারণকে মাদকদ্রব্য পরিহার করিতে অনুপ্রাণিত করা, অপর দিকে মনোনীত কর্মীদিগের দ্বারা আবগারী দোকানদারদের তাহাদের দোকানের লাইসেন্স পরিত্যাগ করিতে এবং উক্ত দোকানসমূহের পৃষ্ঠপোষকদের মাদকদ্রব্যের ব্যবসা বন্ধ করিতে অনুনয়-বিনয় করা। এই কর্তব্য পালন করিতে কর্মীগণকে মাদকদ্রব্য-ব্যবহারকারীদিগের হস্তে এবং আবগারী বিভাগের দোকানদার ও কর্মচারীদিগের হস্তে অশেষ প্রকার লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয়। কিন্তু সর্বপ্রকার লাঞ্ছনা এবং অত্যাচার ভোগ করিয়াও কর্মীগণ অবিচলিত নিষ্ঠার সহিত গান্ধীজীর নির্দেশ অনুযায়ী শান্তিপূর্ণ

ভাবে তাঁহাদের কর্তব্যপালন করেন। তাঁহাদের প্রচেষ্টার ফলে মাদকদ্রব্য-বর্জননীতি সাময়িকভাবে আশানুরূপ সাফল্য লাভ করে এবং ভারতের প্রত্যেক প্রদেশেই অনেক মদ, গাঁজা, অহিফেন প্রভৃতির দোকান লুপ্ত হইয়া যায়। অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার করিবার অত্যল্পকাল মধ্যেই পুনরায় বিদেশী সরকারের সহায়তায় উক্ত দোকান-সমূহ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয় এবং মাদকদ্রব্যের প্রসার পূর্ণোদ্যমে চলিতে থাকে। কিন্তু অবস্থার এই অবনতিতে গান্ধীজী একটুকুও বিচলিত হইলেন না। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, জনসাধারণের মধ্যে মাদকদ্রব্য বর্জনের যে চেতনা তিনি সঞ্চার করিয়াছেন অদূরভবিষ্যতে তাহা নিশ্চয়ই ফলপ্রসূ হইবে। তিনি ধৈর্যসহকারে সেই সুদিনের অপেক্ষায় রহিলেন।

অতঃপর ১৯২৫ সনে বড়লাটের নিকট একখানি দরখাস্ত উপস্থিত করা হয়। ইহাতে প্রার্থনা করা হইয়াছিল, নারী ও শিশুদিগের স্বার্থ-রক্ষার জন্য আইন করিয়া মদ খাওয়া এবং বেচা-কেনা বন্ধ করিয়া দেওয়া হউক। এই দরখাস্ত করিয়াছিলেন ত্রিশ হাজার নারী একত্র হইয়া, এবং ইঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন ভারতীয়। দিল্লীর আইন-পরিষদে এই বৎসরই পাননিরোধ লইয়া বিতর্ক উঠে, ভারত হইতে পানদোষকে একেবারেই উচ্ছেদ করিতে হইবে—এই মর্মে একটি প্রস্তাব গৃহীতও হয়। প্রস্তাবের স্বপক্ষে ছিলেন বে-সরকারী সদস্যদের একটি দল। সরকারী সদস্যরা এই প্রস্তাবকে বাধা দিতে প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিলেন, সে চেষ্টা বিফল হয়। নারীরা তাঁহাদের দরখাস্তে পানপ্রথার বর্জন চাহিয়াছিলেন; আইন-পরিষদের সদস্যদের মারফতে দেশের জনসাধারণও সেই দাবিই জানাইলেন। কিন্তু সরকার তখন এই দাবিতে কর্ণপাত মাত্র করিলেন না।

১৯২৮ সনে সর্বদল-সমন্বয়ের হাতে ভারতের শাসনতন্ত্রের খসড়া প্রস্তুত হইল; মাদক-বর্জনের অভিযানকে সেই শাসনতন্ত্রের অন্যতম প্রধান অঙ্গ বলিয়া ঘোষণা করা হইল। মাদক-বর্জন ও দেশবাসীর

কল্যাণ অতি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। সেই কল্যাণসাধনের সুযোগ চাহিয়া ভারতবর্ষ ধৈর্যভরে অপেক্ষা করিয়া রহিল—রাষ্ট্রিক ক্ষমতা হাতে আসিলে তখন নিজের ব্যবস্থা নিজের হাতেই করা যাইবে, এই ভরসায়। ১৯৩৭ সনে ভারতে আংশিকভাবে প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসনের প্রতিষ্ঠা হওয়াতে সেই সুযোগ উপস্থিত হইল। স্বায়ত্ত-শাসনের প্রতিষ্ঠা হইতেই ভারতের অধিকাংশ প্রদেশের শাসনভার কংগ্রেসের হাতে গিয়া পড়িল। মহাত্মা গান্ধী এই সুযোগ এবং ক্ষণকে উপেক্ষা করিলেন না। মাদক-বর্জনের অভিযান অবিলম্বে আরম্ভ করিতে হইবে, তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ সরল ও স্পষ্ট ভাষায় তিনি তাহার ইঙ্গিত দিলেন। ১৯৩৭ সনের ২৮শে আগস্ট তারিখের 'হরিজন' পত্রিকায় প্রকাশিত "আমাদের সর্ববৃহৎ কাজ" নামক প্রবন্ধে তিনি এই ইঙ্গিত ব্যক্ত করেন—প্রবন্ধটিকে যুগান্তকারী বলিলেও নিশ্চয়ই অত্যুক্তি করা হইবে না। এই প্রবন্ধে তিনি কংগ্রেসী মন্ত্রীসভার প্রতি নির্দেশ দিলেন—"তিন বৎসরের মধ্যে ভারত হইতে মাদক ব্যবহার একেবারে উচ্ছেদ করিয়া ফেলিতে হইবে।"

১৯৩৯ সনের প্রথম দিকে আমি মাদ্রাজে যাই। সেখানে শ্রীযুত রাজাগোপালাচারীর সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়। তিনি আমাকে স্পষ্টই বলিয়াছিলেন যে, সমস্ত প্রদেশেরই কংগ্রেসী মন্ত্রিসভার স্থির সংকল্প—শাসনক্ষমতা ছাড়িয়া দিবার পূর্বে তাঁহারা নিজ নিজ প্রদেশ হইতে মাদক ব্যবহার একেবারে নির্মূল করিয়া তবে ক্ষান্ত হইবেন।

এই সংকল্পকে কার্যে পরিণত করিতে কংগ্রেসী মন্ত্রীসভাসমূহ যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন, এবং ইহা সর্বজনবিদিত যে, সীমাবদ্ধ গণ্ডীর মধ্যে সাময়িকভাবে শাসনকার্য পরিচালনা করিয়াও তাঁহারা প্রত্যেক প্রদেশেই মাদকদ্রব্য-বর্জননীতিতে আংশিক সফলতা অর্জন করিয়াছিলেন।

১৯৩৯ সনে কংগ্রেসী মন্ত্রীসভাসমূহ পদত্যাগ করায় অধিকাংশ প্রদেশেই শাসনভার গভর্নরদিগের হস্তে ন্যস্ত হয়। এই সুযোগে

গভর্নরগণ জনসাধারণের স্বার্থ উপেক্ষা করিয়া রাজস্ববৃদ্ধির অজুহাতে প্রত্যেক প্রদেশে পুরাতন আবগারী-নীতি পুনঃপ্রবর্তন করেন। ফলে কংগ্রেসী-মন্ত্রীসভা-প্রবর্তিত নীতি সাময়িকভাবে বাধাপ্রাপ্ত হয়।

১৯৪৭ সনে ১৫ই আগস্ট পূর্ণ-স্বাধীনতা লাভ করিবার অব্যবহিত পরেই মহাত্মা গান্ধী উপর্য্যুপরি তিনটি ভাষণে মাদকদ্রব্যকে ভারত হইতে সম্পূর্ণ উচ্ছেদ করিবার নিমিত্ত জাতীয় সরকার এবং জনসাধারণকে অতি দৃঢ়তার সহিত নির্দেশ প্রদান করেন। জাতির জনকের নির্দেশে কংগ্রেসী মন্ত্রীসভাসমূহ অতি নিষ্ঠার সহিত মাদক-দ্রব্যের উচ্ছেদ সাধনে মনোনিবেশ করিয়াছেন। বিগত পাঁচ বৎসরে তাঁহারা বিভিন্ন রাজ্যে যে সফলতা লাভ করিয়াছেন, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

আজমীঢ়-মাড়বার।—কেন্দ্রীয় সরকারের প্রত্যক্ষ শাসনাধীন এই ক্ষুদ্র অঞ্চলে মাদকদ্রব্য বর্জনের একটি পঞ্চবার্ষিকী কর্মসূচী প্রবর্তন করা হইয়াছে। ফলে, জনসাধারণের কাছে যে পরিমাণ মদ এবং মাদকদ্রব্য বিক্রয়ের অনুমতি দেওয়া হইত, তাহা শতকরা দশ ভাগ কমাইয়া দেওয়া হইবে, ঐ সকল জিনিসের উপর আবগারী শুল্ক এবং অন্যান্য কর বাড়ানো হইবে, রবিবার এবং বেতনের দিন এবং কয়েকটি উৎসবের দিনে আবগারী দোকান বন্ধ রাখা বাধ্যতামূলক হইবে।

আসাম।—এই রাজ্যে মদ অপেক্ষা আফিং অনেক বেশি চলে। এই কারণেই কংগ্রেস-মন্ত্রী-পরিষদ্ পুরাপুরিভাবে আফিং বর্জনের দ্বারাই কাজ আরম্ভ করেন। মদ্যপান নিবারণের বিষয়টি এখনও তাঁহাদের বিবেচনাধীন।

বিহার।—এই অতি জনাকীর্ণ দরিদ্র রাজ্যে অনেক সময় অনুর্বর জমিতে চাষ করিতে হয়। সুতরাং বিহারে এখনও কোন স্থানেই মাদকদ্রব্য বর্জন চালু করা হয় নাই। কিন্তু দেশী মদের উৎপাদন সীমাবদ্ধ করিবার জন্য এ রাজ্যে সরকারের অধীনে মদের ভাটিখানার মারফতে দেশী মদ উৎপাদনের ব্যবস্থা এবং যে সকল দোকানকে জনসাধারণের নিকট সুরাসার জাতীয় পানীয় বিক্রয়ের অনুমতি দেওয়া হয় সেগুলিকে লাইসেন্স প্রদানের জন্য পূর্বাপেক্ষা ভাল প্রণালী প্রবর্তন করা হইয়াছে।

বোম্বাই।—দেশী ও বিলাতী মদ এবং মাদকদ্রব্য সরবরাহের পরিমাণ ক্রমবর্ধমান হারে শতকরা কুড়ি ভাগ হ্রাস করার নীতি ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে প্রথম প্রবর্তন করা হয়। তাড়ি তৈয়ারি করার জন্য যে সকল গাছ কাটা হইয়াছিল,

এই অনুপাতে সেগুলির সংখ্যাও হ্রাস করা হয়। তাহা ছাড়া সমস্ত আবগারী দোকান প্রত্যেক সপ্তাহে বুধবার ও শনিবার দিন বন্ধ রাখা হয়। এই সকল ব্যবস্থা অবলম্বনের ফলে রাজ্যে পুরাপুরিভাবে সুরাবর্জন সম্ভবপর হইয়াছে।

মধ্যপ্রদেশ।—এই রাজ্যের কংগ্রেস-সরকার সোৎসাহে মদ্যপান নিষিদ্ধ করিয়া আইন পাস করিয়াছিলেন। ফলে, বর্তমানে এই রাজ্যের প্রায় চল্লিশ হাজার বর্গ-মাইল স্থানে মদ্যপান নিবারণ সম্ভব হইয়াছে। এই বিস্তীর্ণ অঞ্চল রাজ্যের সমগ্র এলাকার প্রায় অর্ধেকের সমান। আকস্মিক অঘটন কিছু না ঘটিলে, আশা করা যায় অল্পকালের মধ্যেই এই রাজ্যের সর্বত্র মাদকবর্জন সাফল্যমণ্ডিত হইবে।

দিল্লী।—এই রাজ্যটি কেন্দ্রীয়-সরকার-শাসিত। দিল্লী শহর এবং উহার চারি পার্শ্বের গ্রাম উহার অন্তর্ভুক্ত। ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাস হইতে এই রাজ্যে মাদকদ্রব্য-বর্জন অংশত প্রবর্তন করা হয়। অর্থাৎ অধিকাংশ দেশী মদ এবং আফিঙের দোকান বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়, রেলওয়ে-রেঁস্তোরায় মদ প্রভৃতি বিক্রয় বন্ধ করিয়া দেওয়া হয় এবং সাধারণত সপ্তাহে একদিন মদ বিক্রয় নিষিদ্ধ করা হয়। উপরন্তু, উৎসব ও মেলা উপলক্ষ্যে সপ্তাহে আরও একদিন মদ বিক্রয় নিষিদ্ধ করা হয়।

পূর্ব-পাঞ্জাব।—পূর্ব-পাঞ্জাবের অমৃতসর এবং রোহ্‌টক জেলায় মাদকবর্জন চালু করা হইয়াছে। তবে রাজ্যে নিদারুণ অর্থাভাব এবং কেন্দ্রীয় সরকার এই অভাব পূরণে অক্ষম। সুতরাং রাজ্যের মন্ত্রীরা অন্যান্য অঞ্চলে মাদকদ্রব্যবর্জন চালু করিতে সাহসী হইবেন কি না, সে সম্পর্কে বিশেষ সন্দেহের অবকাশ আছে।

হায়দারাবাদ।—দক্ষিণ-ভারতের এই দেশীয় রাজ্যটি, ভারত-গণরাজ্যের সংলগ্ন জেলাগুলিতে সর্বপ্রথম মাদকদ্রব্যবর্জন প্রবর্তন করে এবং ভারতভুক্তির পর কংগ্রেসের উপদেশ অনুযায়ী শতকরা চল্লিশটি দেশী মদের দোকান এবং শতকরা বিয়াল্লিশটি তাড়ির দোকান তুলিয়া দেয়। তাল, খেজুর অথবা তালগাছের সুস্বাদু রস জ্বাল দিয়া তাড়ি প্রস্তুত করা হয়।

মাদ্রাজ।—মাদ্রাজের কংগ্রেস-সরকার, তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীরাজাগোপালাচারীর নেতৃত্বে ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে এই রাজ্যে সর্বপ্রথম মাদকবর্জন চালু করেন। তাহা ছাড়া, ভারতের রাজ্যগুলির মধ্যে মাদ্রাজেই সর্বপ্রথম রাজ্যের সর্বত্র মাদকদ্রব্যবর্জন চালু করা হয় এবং এই ব্যাপারে পথিকৃৎ হওয়ার দুর্লভ গৌরব মাদ্রাজেরই প্রাপ্য।

মহীশূর।—মহীশূর দক্ষিণ-ভারতের একটি দেশীয় রাজ্য। এই রাজ্যটি মদের দোকানের সংখ্যা এবং সেই অনুপাতে মদ সরবরাহের পরিমাণ কমাইয়া দিয়া ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাস হইতে মাদকদ্রব্যবর্জন চালু করে। ভারতীয় গণরাজ্যে যোগদানের

ও মহীশূর নয়টির মধ্যে পাঁচটি জেলাতেই মাদকবর্জন চালু করে। এই পাঁচটি জেলা মাদ্রাজ রাজ্যের সংলগ্ন। মাদ্রাজ সরকার যাহাতে অবৈধ উপায়ে মাদকদ্রব্য ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করিতে পারেন সেই জন্যই মহীশূর এই ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছে।

উড়িষ্যা।—উড়িষ্যার লোকেরা আফিং খাইয়াও থাকে, আবার ধূমপানের জন্যও ব্যবহার করে। রাজ্যের সর্বত্র আফিঙের প্রচলন নিষিদ্ধ করা হইয়াছে। তাহা ছাড়া, এই রাজ্যের বেশ গুরুত্বপূর্ণ এবং অপেক্ষাকৃত অধিক সমৃদ্ধিশালী তিনটি জেলার সুরাসার জাতীয় পানীয়ের ব্যবহার বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

সৌরাষ্ট্র।—বোম্বাইয়ের পশ্চিমে অবস্থিত এবং বোম্বাইয়ের সন্নিহিত প্রায় ত্রিশটি ছোট-বড় দেশীয় রাজ্য লইয়া এই সংঘটি গঠিত হইয়াছে। মাদকদ্রব্যবর্জন সম্পর্কে গৃহীত সাধারণ নীতি অনুযায়ী কর্মসূচী অনুসরণের ফলে এই রাজ্যেও ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাস হইতে মাদকদ্রব্যবর্জন চালু করা হইয়াছে।

ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন।—ভারতীয় গণরাজ্যে যোগদানকারী দুইটি দেশীয় রাজ্য লইয়া এই সংঘটি গঠিত হইয়াছে। ইহার এগারোটি জেলায় ইতিমধ্যেই মাদকদ্রব্য-বর্জন করা হইয়াছে। আশা করা যায়, আমাদের গণরাজ্যের অন্তর্গত এই সংঘটির সর্বত্র আগামী তিন বৎসরের মধ্যে মাদকদ্রব্যবর্জন করা সম্ভব হইবে।

উত্তর প্রদেশ।—এই রাজ্যের এগারোটি জেলায় সম্পূর্ণভাবে মাদকদ্রব্য বর্জন করা হইয়াছে এবং এই জেলাগুলি লইয়া রাজ্যের কেন্দ্রস্থলে একটি মাদকদ্রব্যবর্জিত অঞ্চল সৃষ্ট হইয়াছে। আশা করা যায়, তিন বৎসরের মধ্যে রাজ্যের সর্বত্র মাদকবর্জন চালু করা সম্ভব হইবে। চোরাই চালান বন্ধ করিবার জন্য কংগ্রেস-মন্ত্রী-পরিষদ্ মাদকদ্রব্যবর্জিত অঞ্চলের পাঁচ মাইলের মধ্যে অবস্থিত সমস্ত মদের দোকান বন্ধ করিয়া দিয়াছেন এবং উত্তেজক পদার্থের ব্যবহার যাহাতে হ্রাস পায়—সেই জন্য মাদকদ্রব্যের উপর সর্বোচ্চ শুল্ক ধার্য করিয়াছেন।

পশ্চিমবঙ্গ।—র‍্যাডক্লিফ-বিনির্ণয় (অ্যাওয়ার্ড) অনুযায়ী বাংলাকে দুই ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। পূর্ববঙ্গের হিন্দু সমাজের একটি বিরাট অংশ পশ্চিমবঙ্গে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। এই বিপুল উদ্বাস্তু-জনসংখ্যাকে নানাভাবে সাহায্য দানের জন্য পশ্চিমবঙ্গ-সরকারকে অগ্রসর হইতে হইয়াছে। ফলে এই রাজ্যের সঙ্গতির উপর প্রচণ্ড চাপ পড়িয়াছে। এই কারণেই পশ্চিমবঙ্গে মাদকবর্জনের কাজ মন্থরগতিতে চলিয়াছে। এ পর্যন্ত মাদক বর্জন সম্পর্কে এই রাজ্যে যাহা করা হইয়াছে তাহা এই : জনসাধারণের নিকট মাদকদ্রব্য বিক্রয়ের জন্য লাইসেন্সপ্রাপ্ত দোকানের সংখ্যা হ্রাস করা, সমগ্র ভারতের মধ্যে প্রচলিত সর্বোচ্চ শুল্কের হারে না পৌঁছান পর্যন্ত মাদকদ্রব্যের উপর ক্রমবর্ধমান হারে শুল্ক ধার্য করা, যেদিন শুধু মাদকদ্রব্য বিক্রয় করা হয়, সেই দিন বিক্রয়ের সময় হ্রাস করা

এবং মজুরেরা যাহাতে মদ খাইয়া পয়সা নষ্ট না করিতে পারে সেই জন্য শনিবারে মদ্যপান নিষিদ্ধ করা।

১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে মহাত্মা গান্ধীর অনুপ্রেরণায় ভারতের জাতীয় কংগ্রেস মাদকদ্রব্যবর্জনকে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করেন। উপরের বিবরণ হইতে স্পষ্টই বোঝা যাইবে যে, মাদকবর্জনের লক্ষ্যের অভিমুখে আমরা এই পর্যন্ত বহুদূর অগ্রসর হইয়াছি।

মাদক-নিরোধের ফলাফল কি হইয়াছে তাহা লইয়া আমি নিজে অনেক তদন্ত করিয়াছি এবং এই তদন্তের ফলে আমি যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছে তাহা নিম্নে বিবৃত করিতেছি।

সর্বত্রই নারী ও শিশুদিগের অবস্থার প্রভূত উন্নতি দেখা যাইতেছে। পরিবারের মধ্যে পুরুষেরাই প্রধানত উপার্জন করে; মাদকের অভ্যাসও ইহাদেরই প্রবল। পূর্বে ইহারা আয়ের একটা বৃহৎ অংশ ব্যয় করিত মাদক দ্রব্য কিনিতে; বাকি যাহা থাকিত তাহাতে সকলের স্বচ্ছন্দে খাওয়া-পরা চলিত না। ফলে নারী এবং শিশুরা প্রায়ই অনশন ও অর্ধাশনে দিন কাটাইত।

মাদক-দ্রব্য বর্জনের সঙ্গে সঙ্গে এই দুরবস্থার অবসান হইয়াছে। পূর্বে তাহারা মাদক-দ্রব্যে যে অর্থ ব্যয় করিত এখন সেই অর্থ দ্বারা অপেক্ষাকৃত ভাল খাওয়া-পরা তো পাইতেছেই, অধিকন্তু পুরানো দেনা পর্যন্ত পরিশোধ করিতেছে। তাহাদের নৈতিক চরিত্রেরও অনেক উন্নতি হইয়াছে এবং সম্ভ্রমবোধও বাড়িতেছে। মদ্যপায়ী দিগের পরিবারে ঝগড়া মারামারি নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার ছিল এবং নারী ও শিশুদিগের উপর অকথ্য নির্যাতন চলিত। এখন সেই সব পরিবারে অভাবের মধ্যেও শান্তি বিরাজ করিতেছে।

ভারতের অগণিত দরিদ্র জনসাধারণ, বিশেষত হরিজন এবং শ্রমিকদিগের পারিবারিক এবং সামাজিক জীবনের এই শান্তিপূর্ণ এবং মঙ্গলময় চিত্র কল্পনা করিয়াই মহাত্মাজী মাদক-দ্রব্যের উচ্ছেদ-সাধনে ব্রতী হইয়াছিলেন। মহাত্মাজী আজ আমাদের মধ্যে নাই। তাঁহা

বর্তিত এবং চিরবাঞ্ছিত নীতিকে পূর্ণ সফলতা প্রদানের দায়িত্ব তিনি দিয়া গিয়াছেন তাঁহার বিশ্বস্ত অনুগামীদিগকে এবং ভারতের জনসাধারণকে। মহাপ্রয়াণের মাত্র বারো দিন পূর্বে ১৯৪৮ সনের ১৮ই জানুয়ারি মহাত্মাজী তাঁহার প্রার্থনা-সভার ভাষণে হরিজন এবং শ্রমিক শ্রেণীকে স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া মাদকদ্রব্য-বর্জনের নিমিত্ত মর্মস্পর্শী ভাষায় আবেদন করিয়া গিয়াছেন আর কংগ্রেসী মন্ত্রীসভা-সমূহকে নির্দেশ দিয়া গিয়াছেন যে রাজস্বহ্রাসের কথা চিন্তা করিয়া তাহারা যেন ভারতব্যাপী মাদকদ্রব্য-নিষিদ্ধ-আইন প্রয়োগ করিতে কোনরূপ দ্বিধাবোধ না করেন। মহাত্মাজীর এই অন্তিম আবেদন যেন আমরা বিস্মৃত না হই। তাঁহার জীবনের শ্রেষ্ঠ ব্রতকে যে দিন আমরা পরিপূর্ণভাবে সফল করিয়া তুলিতে পারিব, সেই দিনই তাঁহার স্মৃতিপূজা আমাদের সার্থক হইবে।

(রাজ্যপাল) শ্রীহরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়

হিতোপদেশ

খেয়ে শুধু সুক্তো
হও ঋণমুক্ত ॥

* * *

যতই তুমি পাবে ততই বাড়লে তোমার ক্ষুধা
সকল পাওয়া ব্যর্থ হবে, গরল হবে সুধা ॥

* * *

অন্তরেরি অন্তস্তলে নিত্য তাঁহার বাস,
খুঁজতে তাঁরে হেথায় হোথায় ঘটছে সর্বনাশ ॥

* * *

একলা কেহ নয়,
সমান ভাবের ভাবুক আছে ছড়িয়ে বিশ্বময় ॥

মহাস্থবির জাতক

তিন

এইখানে আগ্রা সম্বন্ধে কিছু বলা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। শুধু আগ্রা নয়, দিল্লি সম্বন্ধেও বলি। আগ্রা শহরে তাজমহল ইৎমদউদ্দৌলা, সেকেন্দ্রা, কেল্লা এবং আগ্রার কাছেই ফতেপুর সিক্রি প্রভৃতি দ্রষ্টব্য ঐতিহাসিক স্থানগুলি আছে। দিল্লিতেও কুতব মিনার, কেল্লা ও হিন্দু, পাঠান ও মুগলযুগের কেল্লা, প্রাসাদ, বিখ্যাত ও কুখ্যাত অনেক বাদশার কবর প্রভৃতি দ্রষ্টব্য স্থান আছে। এই দুটি শহরের মাঝামাঝি জায়গায় হিন্দুদের অতি পবিত্র তীর্থ মথুরা ও বৃন্দাবন। এই সবের আকর্ষণে বছরের প্রায় সব সময়েই এই দুই শহরে যাত্রীর ভিড় হয় খুব বেশি। শুধু ভারতবর্ষেরই নানা জায়গা থেকে যে এখানে লোক আসে তা নয়, পৃথিবীর নানা দেশ থেকে যাত্রী আসে সেই সব দেখতে। এই সব যাত্রীদের দোহন এবং শোষণ ক'রে এখানে শত শত লোক জীবিকা উপার্জন ক'রে থাকে। একদল লোক আছে, যারা গাইডের কাজ করে। লাইসেন্সধারী গাইড, যারা ঐতিহাসিক স্থানগুলির ইতিহাস, কিম্বদন্তী প্রভৃতি বলে, এরা তারা নয়। এরা যাত্রীদের সঙ্গে গায়ে-প'ড়ে ভিড়ে যায়, তারপরে তাদের গাড়ি ভাড়া ক'রে দেওয়া থেকে আরম্ভ ক'রে জিনিস কেনা, সঙ্গে সঙ্গে ঘোরা ইত্যাদি সব তাতেই কমিশন মারে। এদের ফী কিছু নির্দিষ্ট নেই—চার আনা থেকে চার শো টাকা, যার কাছ থেকে যেমন আদায় করা যেতে পারে। আশ্চর্যের বিষয় যে, কার কতখানি দেবার শক্তি আছে তা লোক দেখলেই তারা ধরতে পারে—এতই বিচক্ষণ তারা। স্টেশনে ও স্টেশনের আশেপাশে এরা ঘোরে। যাত্রী নামলেই গায়ে প'ড়ে মুটে ঠিক ক'রে দেয়, গাড়ি ঠিক ক'রে দেয়, তারপরে সঙ্গে সঙ্গে হোটেলে আসে; তাজে যাও আর ফতেপুর সিক্রিতেই যাও, সঙ্গে আঠার মতন লেপটে থাকবে। কোনও জিনিস কেনবার উপায় নেই—ঠিক এসে উপস্থিত। তাড়ালে যায় না, গালাগালি দিলে জবাব দেয় না, শেষকালে যাত্রীরা

...কে মেনেই নেয়। সর্বত্র সে কমিশন তো মারেই, যাবার সময় যাত্রীরাও কিছু দিয়ে যায়। প্রায় অধিকাংশ যাত্রীরই এদের সম্বন্ধে কিছু না কিছু অভিজ্ঞতা আছে।

আগে যে হোটেলের কথা বলেছি, এই রকম অনেকগুলি হোটেল এই সব যাত্রীদের অবলম্বন ক'রেই তখন বেঁচে ছিল। তা ছাড়া আগ্রায় নরম পাথর ও শ্বেতপাথরের কাজ হয় খুব ভাল। সেখানকার তরঞ্চিও বিখ্যাত—যাত্রীদের দৌলতেই এই সব শিল্প এখনও টিকে আছে।

আমি যে সময়ের কথা বলছি, তখন প্রথম বিশ্বমহাযুদ্ধও মানুষের কল্পনার অতীত ছিল। তারপরে অনেক কাল অতীত হয়েছে, ভারতবর্ষও স্বাধীন হয়েছে। আশা করি, সেখানকার অবস্থা এখন অনেক উন্নত হয়েছে।

তারপর, সেই সব হোটেলে মানুষকে ফাঁদে ফেলে বেশ মোটা রকমের কিছু আদায় করবার যে কত রকমের ব্যবস্থা ছিল তার আর ঠিকানা নেই। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য—মানুষের এই ছড় রিপুকেই নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির উপায়স্বরূপ কাজে লাগিয়ে কিছু উপার্জন ক'রে নেবার যে অসামান্য কৌশল তারা প্রয়োগ করত, তাতে আশ্চর্য হয়ে যেতে হয়। হোটেলের মালিকদেরও তার মধ্যে নিশ্চয় যোগ-সাজস থাকত, তা ছাড়া ধর্মাধিকরণেরাও কি এ বিষয়ে কিছুই জানতেন না?

সে সময় এক শ্রেণীর লোক মাথায় শামলা চড়িয়ে একটা ছোট বাক্স নিয়ে রাস্তায় ও হোটেলে হোটেলে ঘুরে বেড়াত। এরা কান দেখতে অর্থাৎ কানের ভেতর থেকে খোল বার করতে ওস্তাদ। রাস্তা দিয়ে হয়তো কোনও নতুন লোক চলেছে—বলা বাহুল্য, নবাগত দেখলেই এরা চিনতে পারে—তাকে ডেকে কোনও কথা বলবার অবকাশ না দিয়ে একেবারে তার কানটা টেনে ধ'রে ভেতরটা দেখেই শিউরে ব'লে উঠবে—আরে বাস্ রে! কতদিন এ রকম হয়েছে?

স্বভাবতই লোকের কৌতূহল জাগে। যার জাগে না সে ব্যক্তি সে যাত্রা বেঁচে গেল। নবাগত হয়তো বললে—কেন, কি হয়েছে আমার কানে!

—কি হয়েছে! দেখবে তবে?

তখুনি সে তার বাক্স খুলে নরুনের মতন চ্যাপ্টামুখো একটা যন্ত্র বার ক'রে তার কানের মধ্যে সেটি সেঁধিয়ে দিয়ে এমন একটি তাল খোল বের করবে যা দেখলে যে-কোনও লোকের চক্ষু চড়কগাছে চড়বে। এর পর শুরু হবে দর-দস্তুর। দরের কিছু ঠিক নেই, দু আনা থেকে পাঁচ টাকা, যাত্রীর দেবার ক্ষমতা ও লেকচার দিয়ে তার নেবার ক্ষমতার ওপর নির্ভর করছে।

একবার আমরা পরীক্ষা করবার জন্য একই দিনে পাঁচ-ছজনকে কান দেখিয়েছিলুম। সকলেই কানের ভেতর থেকে প্রতিবারেই ডেলা ডেলা খোল বের করেছিল। এমন তাদের হাত সাফাই, কি ক'রে যে খোল বার করে তা আমরা চেষ্টা ক'রেও ধরতে পারি নি।

আর একবারের কথা বলছি—আমাদের পরিতোষ বেচারীর কান ছিল খারাপ। সে বলত, কানের ভেতরে দিনরাত কি সব খট্‌খট্ ঝন্‌ঝন্ করে। একবার আগ্রার একজন নাপিতকে ধ'রে বললুম, এর কানের মধ্যে কি হয়েছে দেখ তো! দিনরাত খট্‌খট্ করে।

লোকটা অনেক কসরৎ ক'রে দেখে শুনে বললে, নল বসাতে হবে।

আমরা মনে করতুম, এদের সব রকমের জোচ্চুরিই ধ'রে ফেলেছি, কিন্তু কোথায়? এই নল বসাবার কথা ইতিপূর্বে আর শুনি নি। জিজ্ঞাসা করলুম, সেটা কি রকম?

সে বললে, কানের ভেতরে পোকা হয়েছে। নল বসিয়ে সেটাকে বার ক'রে ফেলে দিতে হবে।

কথাটা আমরা বিশ্বাস না করলেও পরিতোষ আগ্রহসহকারে

নল বসাতে রাজী হ'ল। লোকটি বাক্স থেকে একটা সরু পেতলের নল তার কানে ঢুকিয়ে দিয়ে মুখ দিয়ে তাতে টান দিতে আরম্ভ করলে। তারপর মাথার পেছন দিকে বুড়ো আঙুল দিয়ে টিপে টিপে দেখে ঠিক কর্ণমূলের কাছে এক জায়গায় পোকাটা যেন ধরা পড়েছে এই রকম অভিনয় করতে লাগল। তারপর মাথা টেপার পালা শেষ ক'রে আবার নল মুখে দিয়ে টানতে আরম্ভ করলে। টেনে টেনে শেষকালে নলচে কান থেকে খুলে নিয়ে তার ভেতর থেকে ইয়া বড় একটা পোকা বের করলে। লোকটার হাত-সাফাই দেখে আমরা খুশি হয়ে তাকে আট আনা বক্‌শিশ দিয়ে ফেললুম।

হোটেলে কি রকম যাত্রীবধ ক'রে টাকা আদায় করা হ'ত, তার কিছু নমুনা আগে দিয়েছি। এ ছাড়া আরও কত রকমে যে যাত্রীবধ করা হ'ত, তা লিখতে গেলে শুধু সেই বিষয়েই একখানা বড় বই হয়ে যাবে। এই সব ছাড়া যাত্রীদের আশ্রয় ক'রে সেখানে যে আরও কত শিল্প গ'ড়ে উঠেছিল তার আর ঠিক-ঠিকানা নেই। তার মধ্যেও অনেকগুলি পুরোপুরি জোচ্চুরি না হ'লেও আধা-জোচ্চুরি বলা যেতে পারে।

দিল্লিকে এ বিষয়ে আগ্রার দাদা বলা যেতে পারত। সৈয়দ বন্দর ও আলেকজান্দ্রিয়া শহরের এ বিষয়ে খুব সুনাম আছে। দিল্লি তাদের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে কি না বলতে পারি না, তবে ভারতবর্ষের অন্য কোন শহরই দিল্লির সঙ্গে মুকাবিলা করতে পারত না। এই সম্পর্কে একটা গল্প চলতি আছে—অনেকে উপভোগ করবেন ব'লে এখানে উল্লেখ করছি।

বোম্বাই শহরের একজন নামজাদা পকেটমার সেখানে প্রতিযোগিতায় টিঁকতে না পেরে ব্যবসায়ে সুবিধা হবে ভেবে দিল্লিতে গিয়েছিল। কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতেই তাকে আবার স্বস্থানে ফিরে আসতে দেখে সমব্যবসায়ীরা জিজ্ঞাসা করলে, কি হে, কি হ'ল? ফিরে এলে যে?

লোকটি বললে, সেখানে কিছু সুবিধা করতে পারলুম না আমাদের মত এলেমের লোক সেখানে পথে ঝাড়ু দেয়। সেখানকার গাঁটকাটা, পকেটমার ও জোচ্চোরদের হালচালই আলাদা।

কথাটা শুনে বোম্বাইয়ের একজন বড় পকেটমারের অভিমানে আঘাত লাগল। সংবাদটির যাথার্থ্য পরীক্ষা করবার জন্য সেইদিনই সে দিল্লি রওনা হ'ল। সেখানে পৌঁছে একদিন সন্ধ্যের সময় সে ট্যাঁকে একখানা একশো টাকার নোট গুঁজে চাঁদনীচকের অলিগলি, চৌরি বাজারের অন্ধিসন্ধি জায়গায় ঘুরে বেড়াতে লাগল। গাঁটকাটাদের সুবিধা দেবার জন্য কোনও জায়গায় সে আতর কিনলে, কোথাও বা পান কিনে খেলে, কিন্তু সর্বদা সতর্ক হয়ে রইল গ্যাঁটটি না কাটা যায়। রাত্রি দশটা এগারোটা অবধি ঘুরে যখন দেখলে ট্যাঁকের নোট ট্যাঁকেই আছে তখন তার মনে হ'ল, এই তো দিল্লির গ্যাঁটকাটাদের ক্ষমতা—দূর থেকে অতি নগণ্য জিনিসেরও প্রশংসা শুনতে পাওয়া যায়। যা হোক বাড়ি ফেরবার মুখে সে একটা বড় পান-সরবতের দোকানে ব'সে সরবৎ খাচ্ছে এমন সময় পানওয়ালা তাকে জিজ্ঞাসা করলে, কি ভাই, বোম্বাইয়ের খবর কি? সেখানে আজকাল ব্যবসা-পত্র কেমন চলে? অমুক খলিফা কি এখনও বেঁচে আছেন, না, দেহরক্ষা করেছেন?

পানওয়ালার কথাবার্তা শুনে বোম্বাইয়ের লোকটি বেশ বুঝতে পারলে যে, সে তারই সমধর্মী। তখন বেশ খোলাখুলিভাবেই কথাবার্তা আরম্ভ হ'ল। কিছুক্ষণ আলাপ-পরিচয় ও উভয় পক্ষে আপ্যায়নের পর বোম্বাইয়ের লোকটি বললে, ভাই সাহেব, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি—যদি কিছু মনে না কর।

দিল্লিওয়ালা বললে, সে কি! তুমি মেহমান—স্বচ্ছন্দে জিজ্ঞাসা কর।

বোম্বাইয়ের লোকটি বললে, বোম্বাইয়ে দিল্লির খুব নামডাক শুনেছিলুম। তিন-চার ঘণ্টা ধ'রে এই রাস্তায় ঘুরছি, কিন্তু একটা চড়ুই পাখির ঠোকরও তো বুঝতে পারলুম না।

এবার দিল্লিওয়ালা বললে, ভাই সাহেব, কিছু না মনে কর তো বলি।

—হাঁ হাঁ, নিশ্চয় বলবে, ভয় কিসের?

দিল্লিওয়ালা বললে, ট্যাঁকে জাল একশো টাকার নোট নিয়ে ঘুরলে ঠোকর বুঝতে পারবে কি ক'রে?

বোম্বাইয়ের পকেটমার সেই রাত্রেই দিল্লির ওস্তাদের কাছে শিষ্যত্ব গ্রহণ করলে।

দিল্লি শহর এখনও সেই রকমই আছে—এ কথা যেন কেউ না মনে করেন। এ সব আমরা স্বাধীনতা পাবার পূর্বের ইতিহাস। এখন দিল্লি আমাদের ভারতরাষ্ট্রের রাজধানী—সেখানকার চক ও চৌরি বাজার চৌরস হয়ে গেছে। সেখানকার জোচ্চোরেরা কর্মক্ষেত্র পরিবর্তন ক'রে রাষ্ট্রের নানা বিভাগে ছড়িয়ে পড়েছে।

কিন্তু এই জোচ্চোরদের ব্যূহ ভেদ ক'রে একটু ঝাড়া হাত-পা হয়েই বুঝতে পারলুম, আগ্রা নেহাত খারাপ জায়গা নয়। প্রথমত এখানে খুব সস্তায় জীবনযাত্রা নির্বাহ করা যায়। ইতিপূর্বে কাশীতে জিনিসপত্র খুবই সস্তা মনে হয়েছিল, কিন্তু দেখলুম আগ্রায় সেখানকার চেয়েও সস্তায় জিনিস পাওয়া যায়। যদিও কাশী অথবা কলকাতার মতন এত রকমের তরি-তরকারি সেখানে পাওয়া যায় না, কিন্তু যা পাওয়া যায় তা জীবনধারণের পক্ষে যথেষ্ট এবং তা অত্যন্ত সস্তা। মোট কথা, মাসে দশ-বারো টাকায় একজন লোক বেশ ভদ্রভাবেই সেখানে বাস করতে পারে। তবে এই দশ-বারো টাকা উপায় করবার রাস্তা সেখানে খুবই কম, এমন কি, একরকম নেই বললেই চলে। হয়তো একটা উপায় ভবিষ্যতে হবেই—এই আশায় আমরা স্থির করলুম, আগ্রাতেই থেকে যাব। আগ্রাতে আর একটা মস্ত সুবিধা ছিল এই যে, সে সময় সেখানে অল্পসংখ্যক বাঙালী বাস করতেন। আর কিছু না হোক, দেখা হ'লেই কোথায় বাড়ি, বয়স কত, কেন বাড়ি থেকে পালালে—ইত্যাদি জেরার হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে।

হোটেলে দিন দশ-বারো কাটবার পর, সেখানে প্রত্যহ চার আনা

ক'রে দেওয়ার চেয়ে একটা বাড়ি ভাড়া করাই ঠিক করা গেল। অনেক খুঁজে-পেতে একটা বাড়ি ঠিক হ'ল। বেশ খোলামেলা, একতলা দোতলায় সর্বসমেত চার-পাঁচখানা ঘর—মাসিক ভাড়া পাঁচ টাকা। সেখানে আবার শহরের মধ্যে খোলামেলা বাড়ি পাওয়া মুশকিল। সরু সরু গলির মধ্যে খোলা বাড়ি তৈরি করাই যায় না। যা হোক, এদিকে বাড়িওয়ালার সঙ্গে কথা চলতে লাগল, ওদিকে আমরা বিছানা বালিশ প্রভৃতি তৈরি করাতে লাগলুম।

সেদিন আগ্রায় ছিল জলের উৎসব। এ ধরনের উৎসব বাংলা দেশে তো নেই-ই, অন্য কোথাও আছে কি না জানি না। দলে দলে লোক নানা রকমের ভেলা, বড় বড় ধোপার গামলা, কেউ বা মশককে কি ক'রে ফুলিয়ে তার ওপরে ঘোড়ার মতন চ'ড়ে যমুনার স্রোতে ভেসে যায়! কত লোক নানা রকমের অঙ্গভঙ্গী করতে করতে, কেউ বা সারেঙ্গী বাজাতে বাজাতে অদ্ভুত ভেলায় চ'ড়ে শন্ শন্ ক'রে ভেসে চলেছে—দেখতে দেখতে কোথা দিয়ে সময় কেটে যায়! এই খেলা দেখবার জন্য যমুনার দুই তীরে অসংখ্য লোকের ভিড় লাগে। বেলা দুটো আড়াইটে থেকে আরম্ভ ক'রে সন্ধ্যে অবধি খেলা চলতে থাকে।

আমরা তাজমহলের চত্বরে দাঁড়িয়ে এই তামাসা দেখছিলুম। সেখানে আরও অনেক হিন্দু-মুসলমান মেয়ে-পুরুষ দাঁড়িয়ে সেই জলকেলি দেখছিল। কেউ হাসছে, কেউ হাততালি দিচ্ছে, কেউ কথা বলছে, আমরাও মাতৃভাষায় নানারকম মন্তব্য করছি। হঠাৎ একটি লোক—এতক্ষণ সে আশপাশের লোকের সঙ্গে খুব কথা বলছিল, হাসি ঠাট্টা করছিল—বাংলা কথা শুনে হাঁ ক'রে আমাদের দিকে চাইতে লাগল। লোকটির পরনে চুস্‌ত্ পাজামা, অঙ্গে সুতির সেরওয়ানি, মাথায় গোল ফেল্‌টের টুপি অর্থাৎ হিন্দু টুপি—বয়স তার পঁচিশের মধ্যেই হবে, তবে বেশ হৃষ্টপুষ্ট ব'লে দু-এক বছর বেশি দেখায়। সরু একজোড়া গোঁফ, বেশ পরিপাটি ক'রে ছাঁটা। ভদ্রলোকই আগে কথা বললেন, তোমরা বাঙালী?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনি ?

—আমিও বাঙালী, ব্রাহ্মণ-সন্তান। আমার নাম পরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

বললুম, আপনাকে দেখে তো বাঙালী ব'লে মনে হয় না। তার ওপরে যা পোশাক পরেছেন—

ভদ্রলোক বললেন, বাড়িতে ও অন্য কোথাও যেতে হ'লে ধুতিই ব্যবহার করি, তবে আপিসের বেলায় এ দেশের পোশাকই পরতে হয়।

জিজ্ঞাসা করলুম, এখানে চাকরি করেন বুঝি ?

হ্যাঁ, এখানকার আদালতে কাজ করি। আসলে আমার চাকরি-স্থল দিল্লি—এখানে একজন ছুটি নেওয়ায় আসতে হয়েছে। তবে ছুটি ফুরিয়ে গেলে আমিও দিল্লি ফিরে যাব।

আমায় জিজ্ঞাসা করলেন—তোমার নামটি কি ভাই ?

নাম বললুম। এক বারে বুঝতে পারলেন না, আবার বলতে হ'ল। ভদ্রলোক বললেন, বেড়ে নামটি তো তোমার !

বন্ধুরাও নাম বললে। ভদ্রলোক কোনো রকম ভণিতা না ক'রে একেবারে সোজা প্রশ্ন করলেন, বাড়ি থেকে কতদিন হ'ল পালিয়েছ ?

আমরাও সোজা উত্তর দিলুম, এই দিন পনেরো হবে।

যমুনার তীর থেকে স'রে এসে একটা নির্জন জায়গা দেখে গোল হয়ে ব'সে যাওয়া গেল। বিড়ি ও সিগারেট আদান-প্রদান হতে লাগল। ভদ্রলোক বললেন, তোমাদের চেয়েও আমি যখন ছোট ছিলুম, তখন একবার ভাই বাড়ি থেকে পালিয়েছিলুম।

সুকান্ত বললে, তা হ'লে আমরা তো একই গোত্রের লোক বলতে হবে।

পরেশনাথ হেসে বললেন, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। আর একই গোত্রের যখন তখন আর আমাকে 'আপনি' ব'লো না।

বললুম, বেশ। আপনি আমাদের দাদা।

পরেশনাথ বললে, বেশ বেশ, খুব ভাল কথা। তার পরে ভাই শোন, পালিয়ে গিয়েছিলুম গয়া, গয়া থেকে রাজগীর। বাস্, ঐ পর্যন্ত!

—আপনার বাড়ি কোথায়?

—বাড়ি তো বাংলা দেশের চব্বিশ পরগনার কোন্ এক গ্রামে ছিল। কিন্তু আমার প্রপিতামহ ইংরেজ গবর্মেণ্টের কমিশারিয়েটে চাকরি নিয়ে দেশ ছেড়ে চ'লে এসেছিলেন। তারপরে আমরা আম্বালা, সাহারানপুর, মীরাট প্রভৃতি জায়গায় থেকেছি। শুনেছি আম্বালায় আমাদের বাড়িঘরও ছিল। আমার ঠাকুরদাদা দিল্লিতে বাড়ি করেছিলেন।

জিজ্ঞাসা করলুম, তা হ'লে দিল্লিতেই বাড়ি?

—হ্যাঁ, দিল্লিতে বাড়ি ছিল বলতে পার। সেখানেই জন্মেছি। লেখাপড়া কিছুই শিখি নি, তবু এনট্রেন্স্ ঐখান থেকেই পাস করেছি। দাদুর দরুন বাড়িখানা ছিল, তা বাবুজী অর্থাৎ বাবা বেচে মেরে দিলেন। তিনি সারাজীবন ব'সে ব'সে খেলেন, কোনও কাজকর্ম করলেন না, শেষকালে মরবার সময় বাড়িখানা বেচে দিয়ে আমাকে আর মাকে একেবারে পথে বসিয়ে গেলেন।

এই অবধি ব'লে পরেশদা মনের দুঃখ হো-হো ক'রে হেসে উড়িয়ে দিলে। তারপর একটান বেশ জমিয়ে বিড়ি টেনে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলতে লাগল, বাংলা দেশের একরকম কিছুই জানি না বললেই হয়। বাবা মারা যাবার পর মাকে নিয়ে একবার মামার বাড়ির গাঁয়ে গিয়েছিলুম, সে একেবারে অজ পাড়া-গাঁ। মামারা কেউ নেই, এক মামী থাকেন সেখানে, ছেলেপিলে নিয়ে। তা তিনি নিজেই খেতে পান না তো আমাদের খাওয়াবেন কি! দিন কতক সেখানে থেকে আবার দিল্লিতে ফিরে আসতে হ'ল।

একটু চুপ ক'রে থেকে পরেশদা বললে, তারপর, আমি তো নিজের কথাই ব'লে যাচ্ছি, এবার তোমাদের কথা শুনি। তোমরা এ রকম দল বেঁধে পালালে কেন? কি মতলব তোমাদের, দেশ দেখা?

বললুম, আমাদের উদ্দেশ্য কাজকর্ম জুটিয়ে নিজেদের উন্নতি করা। বাড়ি ভাল লাগে না, বাড়ির তাঁবেও থাকতে ইচ্ছা করে না, পড়াশুনো করতেও ভাল লাগে না।

আমার কথা শুনে পরেশদা উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠলেন। বললেন, বল কি ভায়া! বাড়ি ভাল লাগে না, পড়াশুনো করতে ভাল লাগে না তো জীবনে উন্নতি করবে কি ক'রে! বাড়ি ভাল লাগে না কেন?

এ প্রশ্নের আর কি উত্তর দেব—চেপে যাওয়াই সমীচান বোধ করলুম। পরেশদা বলতে লাগল, আমি কিন্তু ভাই বাড়িকে বড্ড ভালবাসি। বাড়ি বলতে এক মা—মাকে ছেড়ে এই বুড়ো বয়সেও আমি কোথাও থাকতে পারি না।

বলতে বলতে কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে সে বললে, এবার বোধ হয় মাকে একেবারেই ছাড়তে হবে।

জিজ্ঞাসা করলুম, কেন দাদা?

—মার শরীর খুবই খারাপ হয়ে পড়েছে। আর কাজকর্ম করতে পারেন না বললেই হয়।

পরেশদার সঙ্গে আরও অনেক কথা হ'ল। কথায়-বার্তায় একবার বুক ঠুকে জিজ্ঞাসা ক'রে ফেলা গেল, আমাদের কোন চাকরি-বাকরি জুটিয়ে দিতে পারে কি না!

বেশ খানিকক্ষণ ভেবে পরেশদা বললে, দেখ, আগ্রা তো আমার জানাশোনা জায়গা নয়—তবে তোমরা যদি আমার সঙ্গে দিল্লি যাও তবে নিশ্চয়ই পারি। কিন্তু একসঙ্গেই তিন জনের পারব না—এক-একজন ক'রে। তা মাস ছয়েকের মধ্যে তিনজনেরই হিল্লে ক'রে দিতে পারি বোধ হয়।

পরেশদাকে বললুম, আমরা তোমার সঙ্গে দিল্লিই যাব।

পরেশদা বলতে লাগল, একটা কথা তোমাদের আগে থাকতেই জানিয়ে রাখা ভাল ব'লে মনে হচ্ছে। তোমাদের চাকরি জোটবার

আগেই মা যদি মারা যান, তা হ'লে তোমাদের জন্য কিছু করা বোধ হয় আমার দ্বারা সম্ভব হবে না। কারণ মা মারা যাবার পর আমাকেই হয়তো সব ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে চ'লে যেতে হবে।

পরেশদার কথাগুলো কিছু রহস্যময় শোনালেও ও-বিষয়ে আর কিছু জিজ্ঞাসা না ক'রে তখনকার মত চেপেই গেলুম। জিজ্ঞাসা করলুম, তিনি আর কতদিন আগ্রায় থাকবেন। পরেশদা বললে, ছ মাসের প্রায় সাড়ে চার মাস কেটে গেছে—এখনও বুঝতে পারছি না কিছু। শুনছি সে লোকটা নাকি ছুটি বাড়াবার জন্য লিখেছে। দেখা যাক, কয়েকদিনের মধ্যেই টের পেয়ে যাব। আমার মনে হচ্ছে, শীতটা পুরোই এখানে কাটাতে হবে।

সেইখানে ব'সেই ঠিক ক'রে ফেলা গেল যে, পরেশদা যে কদিন আগ্রাতে থাকবে আমরাও সে কদিন এখানে থেকে তার পরে তার সঙ্গে দিল্লি চ'লে যাব।

পরেশদা বললে, চল ভাই, এবার ফেরা যাক, সন্ধ্যে হয়ে এল।

উঠে পড়া গেল। অস্তমান সূর্যের প্রভায় রঞ্জিত পশ্চিম-দিগন্তের মতন আমাদের মানসাকাশেও বিচিত্র রঙের খেলা শুরু হয়ে গেল। পরম উৎসাহে হোটেলের দিকে এগিয়ে চললুম।

পরেশদা আমাদের সঙ্গে গল্প করতে করতে হোটেলে একেবারে আমাদের ঘরে এসে উপস্থিত হ'ল। আমরা দৈনিক চার আনা ক'রে ঘর ভাড়া দিচ্ছি শুনে তিনি বললেন, বাবা, এরা তো একেবারে ডাকাত দেখছি!

সে হোটেলের একটা চাকরকে ডেকে বললে, তোমাদের ম্যানেজারকে একবার ডেকে দাও তো।

কিছুক্ষণ পরে হোটেলের একজন লোক আসতেই পরেশদা বললে, দেখ, বাবুরা কতদিন এখানে আছে তার একটা বিল তৈরি ক'রে নিয়ে এস—আমরা এখুনি চ'লে যাব।

বহুৎ আচ্ছা।—ব'লে লোকটি চ'লে যেতেই পরেশদা বললেন, চল

আমাদের বাড়ি। এখানে এই চোর জোচ্চোর ডাকাতদের মধ্যে থাকতে আছে! কখন কি ফ্যাসাদে পড়বে আর মারা যাবে!

ইতিমধ্যে হোটেলওয়ালা দশ দিনের ঘর ভাড়ার বিল নিয়ে এসে উপস্থিত হতেই পরেশদা ব্যাগ খুলে তাকে টাকা দিতে যাচ্ছিলেন, আমরা বাধা দিয়ে নিজেদের তহবিল থেকে তাদের প্রাপ্য চুকিয়ে দিয়ে ধুতি কম্বল বালিশ প্রভৃতি নিয়ে পরেশদার বাড়ির দিকে রওনা হলুম।

শহরের ঘিন্‌জি থেকে বেশ খানিকটা দূরে এক গলির মধ্যে একটা বড় বাড়ির এক অংশে পরেশদা মাকে নিয়ে বাস করেন। বাড়িখানার মালিকও পরেশদার সঙ্গে কাজ করে। তিনি বাড়ির এক অংশ পরেশদাকে অমনিই থাকতে দিয়েছিলেন; কিন্তু পরেশদা মাসে তিন টাকা ক'রে ভাড়া জোর ক'রে দিয়ে থাকে। এক তলায় একটা বড় ও একটা ছোট ঘর, বেশ বড় একটা উঠোন। দোতলায় এই উঠোনের চারদিকে ছাত ও ছাতের একদিকে পাশাপাশি দুটো বড় ঘর—দিব্যি খোলামেলা। রান্না এক তলাতেই হয়।

আমরা যখন পৌঁছলুম তখন সন্ধ্যে হয়ে গিয়েছে। কার্তিকের শেষাশেষি, শীত খুব জাঁকিয়ে না পড়লেও বাংলা দেশে অঘ্রাণের মাঝামাঝি যেমন ঠাণ্ডা পড়ে তেমনি শীত। সদর-দরজা ভেতর থেকে বন্ধ ছিল। পরেশদা অনেকক্ষণ ধ'রে ধাক্কাধাক্কি করার পর এক বুড়ী ঝি দরজা খুলে দিলে।

দরজা খুলে—সিধে চ'লে এস—ব'লে পরেশদা এগিয়ে চলল, তাকে অনুসরণ ক'রে আমরা চললুম। উঠোন পেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে আমরা ছাতে উঠলুম—ঘোর অন্ধকার। পরেশদা চেঁচিয়ে কি বলায় বুড়ীটা গজগজ করতে করতে সিঁড়ি দিয়ে উঠে এসে পাশের ঘর থেকে দুটো হ্যারিকেন লণ্ঠন নিয়ে এল। পরেশদা লণ্ঠন জ্বালাতে-জ্বালাতে বললেন, যেদিন বাড়িতে এসে দেখি যে আলো জ্বলে নি, সেই দিনই বুঝতে পারি মা বিছানা নিয়েছেন। বুড়ীর দিকে ইঙ্গিত ক'রে বললেন, ইনি আবার লণ্ঠন জ্বালাতে পারেন না—জংলি কোথাকার!

ইতিমধ্যে আলো জ্বালানো হয়ে গেলে একটা হ্যারিকেন নিয়ে বুড়ী চ'লে গেল, আর একটা হাতে নিয়ে পরেশদা ঘরের ভেজানো দরজা ধাক্কা দিয়ে আমাদের বললেন, এস।

আমরা ঘরের মধ্যে ঢুকতেই পরেশদা বললেন, আজকের মতন ভাই এইখানেই জায়গা ক'রে শুতে হবে। কাল জিনিসপত্র সরিয়ে সব ব্যবস্থা করা যাবে।

আমরা বললুম, তোমাকে কিছু ব্যস্ত হ'তে হবে না, সব আমরা নিজেই ঠিক ক'রে নিচ্ছি।

পরেশদা তার আপিসের বেশ ছেড়ে ওই ঘরেই ধুতি জামা পরল। তারপর কোণ থেকে একটা ঝাঁটা নিয়ে ঘর পরিষ্কার করতে আরম্ভ ক'রে দিলে। সুকান্ত তার হাত থেকে জোর ক'রে ঝাঁটা কেড়ে নিয়ে নিজে ঝাঁট দিতে শুরু করায় পরেশদা বললে, আচ্ছা, তা হ'লে আমি ও-ঘরে একবার মাকে দেখে আসি।

ঘর পরিষ্কার ক'রে কম্বল বিছিয়ে একটু বসতে না বসতেই পরেশদা ফিরে এসে বললেন, মাকে দেখে বিশেষ সুবিধার ব'লে বোধ হচ্ছে না।

—কেন, কি রকম দেখলে?

—কি রকম আচ্ছন্নের মত প'ড়ে আছেন। ডাকলুম, কিন্তু কোন সাড়া দিলেন না—কখনো এ রকম তো দেখি নি। সকালবেলা রান্না করেছেন—যখন আপিসে যাই তখন খেতে দিয়েছেন।

—কতক্ষণ এ রকম হয়েছে?

—তা তো বুঝতে পারছি না।—ব'লে পরেশদা ঝিকে ডেকে জিজ্ঞাসা করায় সে বললে যে, সে এসে দরজা ধাক্কাধাক্কি ক'রে খোলা না পেয়ে বাড়িওয়ালাদের বাড়ির ভেতর দিয়ে এ বাড়িতে ঢুকেছে। সে এসে অবধি দেখছে যে, মাইজী অমনি ক'রে শুয়ে আছেন।

পাশের ঘরে গিয়ে দেখলুম, পরেশদার মা একটা খাটে শুয়ে আছেন—বুকের ওপর হাত দুটি জোড় ক'রে রাখা। কোমর অবধি একখানা দিশী কম্বলে ঢাকা রয়েছে। অতি শীর্ণ, দেখলেই বুঝতে পারা যায় যে,

দীর্ঘ দিন রোগ ভোগ করছেন। ঘরের মেঝেতে লণ্ঠনটা রাখা ছিল, তাতে খাটের ওপরটা ভাল ক'রে দেখা যাচ্ছিল না। তবুও যা দেখলুম তাতে মনে হ'ল যে, রোগিণীর চেহারা খর্ব, চোখ বোজা থাকলেও তা কোটরগত—কেবল টিকোলো নাকটা বিগত রূপের নিশানস্বরূপ তখনও খাড়া রয়েছে। হঠাৎ দেখলে মনে হয়, যেন দেহে প্রাণ নেই; কিন্তু কিছুক্ষণ লক্ষ্য ক'রে বোঝা গেল, খুব ধীরে ধীরে নিশ্বাস পড়ছে। পরেশদা একবার খুব আস্তে ডাক দিলে, মা!

কিন্তু কোনও সাড়া পাওয়া গেল না। পরেশদা লণ্ঠনের আলোটা খুব কমিয়ে ঘরের এক কোণে রেখে ইশারা ক'রে আমাদের ঘরের বাইরে ডেকে নিয়ে গিয়ে বললে, রান্নার ব্যবস্থা ক'রে ডাক্তার আনা যাবে। কি বল?

সে ঝিকে ডেকে আটা ইত্যাদি বার ক'রে দিয়ে বললে, আটা মেখে ঘুঁটেগুলোতে আগুন ধরিয়ে দিয়ে তুমি চ'লে যেতে পার।

পরেশদাকে বললুম, তুমি মুখ-টুখ ধোও। মার কাছেই থাক, আমরা রান্না করছি—শুধু রুটি তৈরি করবার সময়ে তুমি এলেই চলবে।

আমরা ডাল ধুয়ে চড়িয়ে দিয়ে আলু ও কুমড়ো কুটতে আরম্ভ ক'রে দিলুম। কিছুক্ষণ বাদে পরেশদা হাত-মুখ ধুয়ে এসে বললে, এই ভাই আমার সংসার।

জিজ্ঞাসা করলুম, মা কি রকম?

—সেই রকমই প'ড়ে আছেন।

বললুম, তুমি ডাক্তার ডেকে নিয়ে এস।

পরেশদা বললেন, তাই যাই ভাই। আমি ফেরবার আগে যদি তোমাদের ডাল ও তরকারি রান্না হয়ে যায় তো উনুনে বড় দেখে খান দুই গোবর ফেলে রেখে দিও। আমি এসে রুটি তৈরি করব।

সেখানে একটা সুবিধা এই দেখলুম যে, উনুন ধরাবার হাঙ্গামা পোয়াতে হয় না। তাল তাল গোবর যে অবস্থায় রাস্তায় প'ড়ে থাকে সেই অবস্থাতেই শুকিয়ে তা ওজনদরে বিক্রি করা হয় এবং তাই

জ্বালিয়ে রান্না চলে। কতকগুলো উনুনে ফেলে তাতে কেরোসিন তেল ঢেলে দেশলাই জ্বালিয়ে দিলেই উনুন ধরানো হ'য়ে গেল।

বেরিয়ে যাবার আগে কোথায় কি দ্রব্য থাকে তা আমাদের দেখিয়ে দিয়ে ঝিকে ডেকে পরেশদা বললে, তুমি আজ একটু দেরিতে যেও। মার অসুখ, সেখানে গিয়ে একটু ব'স, আমি ডাক্তার আনতে যাচ্ছি—আমি ফিরে এলে তুমি যেও।

ঝিটা বক্‌বক্‌ করতে করতে ওপরে উঠে গেল। পরেশদা বেরিয়ে যেতে দরজা বন্ধ ক'রে দিয়ে এসে আমরা সমারোহে রাঁধতে আরম্ভ করলুম। গল্প করতে করতে সময় কেটে যেতে লাগল। রান্না করতে আমরা তখনও কেউ জানি না, রাঁধতে দেখেছি মাত্র। কোনও রকমে ভাত ও খিচুড়ি এর আগে রেঁধেছি। একবার হাতা দিয়ে তুলে দেখা গেল ডাল যেন সেদ্ধ হ'য়ে গেছে—এবার নাবিয়ে সম্বরা দিতে হয়। কাঁচা মুগের ডালে কি সম্বরা দেওয়া যায়! আমি বললুম, দুটো শুকনো লঙ্কা। জনার্দন ও সুকান্ত পূর্ববঙ্গের লোক, তাদের একজন বললে, সরষে ফোড়ন দাও। আর একজন বললে, না না, কালোজিরে দাও।

কিন্তু পরেশদা ব'লে গেলেও সেই ক্ষীণ আলোতে কোথায় যে কি আছে তা খুঁজে পেলুম না। ঝিকে জিজ্ঞাসা করলে সে ব'লে দিতে পারবে মনে ক'রে ওপরে গিয়ে দেখি যে, মেঝের ওপরে ময়লা ওড়নাটা পেতে সেই সন্ধ্যারাতেই সে তোফা ঘুম লাগিয়েছে—অগত্যা নেমে আসতে হ'ল। অনেক খোঁজাখুঁজির পর হলুদ ও লঙ্কার গুঁড়ো আবিষ্কার করা গেল। একটা বাটিতে ঘিয়ের মতন একটু ছিল, তাই দিয়েই ডালে সম্বরা দেওয়া হ'ল—নুন খুঁজে পাওয়া গেল না, কাজেই দেওয়াও হ'ল না।

ডাল নামিয়ে আলু ও কুমড়ো সেদ্ধ করতে চড়িয়ে দেওয়া গেল। সুকান্ত ও জনার্দন বাজারে ঘি ও নুন আনতে বেরিয়ে গেল। উনুনটা নিভে এসেছিল ব'লে কয়েক খণ্ড শুক্‌নো গোবর দিয়ে নীচু

দিয়ে জোরে ফুঁ দিতে লাগলুম, ঘর ধোঁয়ায় অন্ধকার হ'য়ে উঠল। একবার এমনি ক'রে ফুঁ দিয়ে মুখ তুলেছি এমন সময় দরজার সামনে দেখলুম, এক নারীমূর্তি দাঁড়িয়ে। সে এক অদ্ভুত মূর্তি, ঠিক যেন একখানা সম্পূর্ণ নরকঙ্কাল একটা ছেঁড়া ময়লা কাপড় জড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে। চোখ দুটো কোটরগত হ'লেও অপরূপ ঔজ্জ্বল্যে জ্বলজ্বল করছে। ওদিকে উঠোনের মধ্যে কৃষ্ণপক্ষ রাত্রির অন্ধকার ও শীতের ধোঁয়ায় এক ভয়াবহ পটভূমির সৃষ্টি করেছে, আর সামনে সেই কঙ্কাল। ঘরের মধ্যেকার উনুনের আগুন জ্বলছে আর নিভছে, আর তাই সেই জ্বলজ্বলে চোখে প্রতিবিম্বিত হচ্ছে। সে এক ভয়াবহ দৃশ্য! সে মূর্তি দেখে ভয়ে সেই শীতকালেও আমার ঘাম ছুটতে আরম্ভ ক'রে দিলে। কিন্তু একটু পরেই কে যেন আমার মধ্যে ব'লে উঠল— ইনি পরেশদার মা। তখুনি নিজেকে সামলে নিয়ে উঠে গিয়ে তাঁকে একটা প্রণাম ক'রে বললুম, মা, আপনি উঠে এলেন কেন? আমরা তো নিজেরাই সব ক'রে নিচ্ছিলুম।

মা হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, তোমাকে তো—চিনতে পারছিনা— তুমি কে বাবা?

সব বললুম। আমার কথা শুনে তিনি মাতৃহৃদয়ের সমস্ত মধু ঢেলে বললেন, আ ম'রে যাই—ম'রে যাই বাছা আমার। তা আমাকে ডাকতে হয়। কোথায়—পরু গেল কোথায়? অ পরু।

বললুম, পরেশদা ডাক্তারের বাড়ি গিয়েছেন।

—ওমা, কেন? তার শরীর ভাল আছে তো?

—তিনি ভালই আছেন। আপনি সন্ধ্যেবেলা অমন নিঝুম হ'য়ে পড়েছিলেন, আপনাকে ডেকে সাড়া না পেয়ে তিনি ভয় পেয়ে ডাক্তার আনতে গিয়েছেন।

মা বললেন, জোরে ডাকলেই হ'ত। আমার কি মরণ আছে বাবা—আহা, তোমাদের কত কষ্টই হ'ল।

পরেশদার মা উনুন থেকে কড়া নামিয়ে রীতিমত রান্না শুরু ক'রে

দিলেন। ইতিমধ্যে সুকান্ত ও জনার্দন বাজার থেকে ফিরে এল; তাদেরও পরিচয় জানলেন। তরকারি নামিয়ে রুটি করছেন, এমন সময় পরেশদা ডাক্তার নিয়ে এসে হাজির হ'ল।

ডাক্তার এসে দেখলেন যে, তাঁর মুমূর্ষু রুগী রুটি সেঁকছে। ঘরে অভ্যাগত এসেছে—মরবার সময় তাঁর নেই।

পরেশদা হাঁকডাক ক'রে মাকে ওপরে নিয়ে গেল। ডাক্তার অনেকক্ষণ ধ'রে রোগিণীকে পরীক্ষা ক'রে প্রেস্‌ক্রুপশন লিখে দিয়ে যাবার সময় আমাদের সবাইকে ব'লে গেলেন যে, রুগীর অবস্থা ভাল নয়। দিনরাত একেবারে বিছানায় শুয়ে থাকতে হবে। ফল দুধ ইত্যাদি পথ্য। কিন্তু পথ্য যাই হোক—বিশ্রামের দরকার। আপনাদের ভরসা দিতে আমি পারছি না, তবে এ রকম অবস্থা থেকেও সুস্থ হয়ে উঠতে আমি দেখেছি—চিকিৎসা আরও অনেক আগে আরম্ভ হওয়া উচিত ছিল। রুগীর মানসিক শক্তি অসামান্য, কারণ তাঁর শরীরের যে অবস্থা তাতে উঠে হেঁটে কাজ করা একরকম অসম্ভব।

ডাক্তারের সঙ্গে পরেশদাও বেরিয়ে গেল ওষুধ আনতে। সেখানে আবার নটা সাড়ে নটার মধ্যে সব ডাক্তারখানা বন্ধ হ'য়ে যায়, শীতের দিনে তো কথাই নেই। পরেশদা যাবার সময় মাকে শুইয়ে রেখে গেলেন। আমরা তিনজনে রান্নাঘরে ব'সে রুটিগুলো সেঁকব কি না ভাবছি এমন সময় দেখি, মা নেমে এসেছেন।

—এ কি, আপনি নামলেন কেন ?

—আর খানকয়েক রুটি আছে সেঁকে দিয়ে যাই।

—কিন্তু ডাক্তারে যে আপনাকে শুয়ে থাকতে ব'লে গেলেন !

বলুকগে ডাক্তার।—তিনি আর কিছু বলতে পারলেন না। বেশ বোঝা গেল, অশ্রুতে তাঁর কণ্ঠ রোধ হ'য়ে এল। রুটি উনুনে ফেলে সেঁকবার সময় মুখখানা আগুনের কাছে নিয়ে যাচ্ছিলেন—সেই আগুনের আভায় আমি স্পষ্ট দেখলুম তাঁর দুই চোখ দিয়ে দুটি ধারা শুকনো গাল বয়ে নামছে—ভাবতে লাগলুম, এ অশ্রুর উৎস কোথায় ?

খান কয়েক মাত্র আর রুটি ছিল, সেগুলো সেঁকে দিয়ে হাত মুখ ধুয়ে মা ওপরে চ'লে গেলেন, আমরা উনুনের ধারে ব'সে হাত পা সেঁকতে লাগলুম। ঘণ্টা খানেক পরে পরেশদা ওষুধ নিয়ে ফিরে এল। মাকে ওষুধ খাইয়ে সেই শীতে স্নান ক'রে পরেশদা আমাদের সঙ্গে এসে খেতে বসল। ওপরে যখন উঠলুম তখন এগারোটা বেজে গেছে—আগ্রা নগরী সুষুপ্তির কোলে ঢ'লে পড়েছে।

[ক্রমশ]

"মহাস্থবির"

নতুন ফসল

পথ

মনটা হঠাৎ ঠেকল ফাঁকা ফাঁকা,
চলতে চলতে পথটা যেন একটু হ'ল বাঁকা—
মিলিয়ে গেল সামনে দিগন্তর।
মনের চলার পথে হঠাৎ নিশান স্বতন্তর
কে দেখাল—মনে হ'ল, একটু থেমে থাকি,
একটুখানি নিই জিরিয়ে, পথ তো অনেক বাকি!
চলেছিলাম এক মনেতে, একটা কাজের ধারা
ছিলাম ধ'রে, তাই তো মনে ছিল খানিক তাড়া।
চমকে দেখি কখন কোথায় আঁধার মাটির তলে
লুকিয়ে রেখে জলধারা তপ্ত মরু জ্বলে;
কোথাও নাহি সবুজ শ্যামল তৃণের আস্তরণ,
এক নিমেষে মরুর মত করছে ধু-ধু মন!
ভিন্নধারায় চলতে এবার হবে,
নতুন নিমন্ত্রিতের দলই আসছে মহোৎসবে।
পুরাতনের বিদায়-ঘণ্টা কখন গেল বেজে—
শূন্য হ'ল জমাট আসর, নিবল বাতি সেজে,

জ্বালতে হবে ফিরে—
সামনে যখন আঁধার হ'ল খেয়ার তীরে নীরে,
ধ্রুবতারার জ্যোতি
নতুন ক'রে ইঙ্গিতে মোর বাৎলে দেবে গতি।
হঠাৎ মনে জাগল অবসাদ—
চড়া সুরেই বাঁধা ছিলাম, একটুখানি খাদ
নামল জীবন-বীণায় মম, করুণ হ'ল সুর—
নিকট মম আপন মম হঠাৎ গেল দূর।
মিলিয়ে গেল সুনীল আকাশ কালো মেঘের ছায়া,
বিছিয়ে দিল চতুর্দিকে বেদনাতুর মায়া;
আমি যেন সে আমি আর নই,
গাছে আমায় চড়িয়ে কে যে কাড়ল শেষে মই।
পায়ের মাটির সঙ্গে আমার ঘটল ব্যবধান,
পাখা মেলে উড়তে গেলে ভয়েই কাঁপে প্রাণ।
আকাশপানে মন ছুটে যায়, সয় না পাখা ভর—
নীড়-আকাশের দ্বন্দ্বে আমার অন্তরে বয় ঝড়;
বুঝতে পারি সে আমি আর নই—
ভয়ের মাঝে কানে বাজে কার বাণী মাভৈঃ,
যায় না তবু ভয়—
কে যেন মোর 'আমি' কেড়ে করছে 'তুমি'ময়।
থমকে গেলাম থেমে, জানি চলতে হবে পথ
যেথায় আছি সেখানে নয় আমার ভবিষ্যৎ।

প্রবাসান্তে কলিকাতা

আবার সেই,
আসছে লোক গিলছি ঢোক
সময় নেই।

চলে অথির লোকের ভিড়
গাড়ির সার
ফিরে তাকাই সময় নাই
যে যার তার।
সভার ডাক্—খাতায় রাখ্
লিখে সময়;
মানুষ জন—সম্ভাষণ
কাজেই হয়
হৃদয়হীন, প্রেমের বীণ
বাজে কচিৎ
মামুলি সব মহোৎসব
সকল গীত
সুরবাহার নাই তাহার
প্রাণের মীড়
জলস্রোত ভাসছে পোত
কোথায় তীর!

কান

তোমার কথা বলবে খুলে
শোনার মত কান কোথায়?
কান ঢেকেছে এলোচুলে
গান শোনে সে প্রাণ কোথায়?
তুমি চাইছ গাইতে গান
লাগিয়ে সুর লাগিয়ে তান,
ঢাক বাজিছে কর্ণমূলে
গানের বল মান কোথায়?

শোনাতে চাও নিজের কথা ?
ক'ষে তবে ঢাক বাজাও,
জেনে রাখো প্রাচীন প্রথা
পরচুলাতে টাক সাজাও।
যেন তেন প্রকারেণ
ঢোকাও জল হ'লেও বেনো
ভাঙতে রাতের নীরবতা
ঘুমের ছলে নাক বাজাও।
কান নিয়ে সব টানাটানি—
কানে-কানে বলছি সার,
কাটলে পরে কান দুখানি
ঘুচতে পারে অন্ধকার !
সিকেয় তুলে লজ্জাশরম
চেঁচাও ক'ষে গরমাগরম
মান খোয়ালে হবে মানী—
যুগের খেলা চমৎকার !

সার্কাস

সার্কাসেতে দেখতে পেলাম ছোট্ট 'আমি'টারে।
এটা সেটা দেখে সে হয় অবাক বারে বারে।
লুকিয়ে ছিল কোথায় সে যে
প্রবীণ জ্ঞানী বিজ্ঞ সেজে
খুশি হলাম হারিয়ে-যাওয়া 'আমি'র আবিষ্কারে।
রমা মীরা সোমা ইরার সঙ্গে দিয়ে তাল
উট হাতী বাঘ দেখে জ্ঞানীর বুদ্ধি হ'ল ঘাল,
বুক থেকে মোর হঠাৎ নামি
বললে খোকা, এই তো আমি—
ঘণ্টা দুয়েক ফিরে পেলাম মধুর বাল্যকাল।

পাগ্‌লা-গারদের কবিতা

(পাগ্‌লা-গারদে অবস্থানোচিত অবস্থায় রচিত)

...ত্রীর প্রতি

ওরে যাত্রী !
এ মরু পাথার কবে হবি পার সাঁতরি ?
দুই চোখে তোর ভাঙা পিয়ালার গন্ধ,
মনের গহনে মহুয়া-মদির ছন্দ,
তবু বার বার হবে রে দুয়ার বন্ধ
ঘনায়ে আসিলে রাত্রি।
ওরে যাত্রী !
ওরে চঞ্চল, ওরে ওরে অস্থির !
জীবনের সাথে মিছে সাধ দোস্তির।
সে যে পথচারী, সে চির পাগল,
ঘরে ঘরে দেখে বন্ধ আগল,
আন্ধার পথে অন্ধের মতো
চলে সে হাতড়ি হাতড়ি
উষর মরুর ধূসর পথের
ওরে দুরন্ত যাত্রী !
ওরে উজ্‌বুগ্‌, ওরে ওরে বোক্‌চন্দ !
তপ্ত নেশায় রপ্ত ক'রে নে
বিপথে চলার ছন্দ।
প'ড়ে প'ড়ে শুধু পথের পাঁচালী
এতদিন চাচা আপন বাঁচালি,
"এসেছে জোয়ার, খুলে দে দুয়ার"
হাঁকিতেছে শোন্‌ ধাত্রী।

ছাঁদ্‌না-তলায় ঐ শোন্‌ নানা ছাঁদে
আন্‌মনা কে গো উন্মনা হয়ে কাঁদে।

কাঁদে লুচি, দই, কাঁদে সন্দেশ,
কাঁদিছে সানাই "পিয়া কোন্ দেশ?"
বিবাগী পাত্র কোথায় উধাও,
নিরালায় কাঁদে পাত্রী।

হায় রে ভীষ্ম, মিছে তোর শর-শয্যা!
লাজ দিতে গিয়ে নিজেই পাবি যে লজ্জা।
ওরে বোম্‌ভোলা, ব্যর্থ আশায়
রচিস ব্যঙ্গ ছুঁচোলো ভাষায়,
খোঁচা মেরে মিছে কলম ভোঁতাস,
হাসে গণ্ডার-গাত্রী।

পথ বলে "হায়, মিছে মোরে পিছু ডাকা।
বুকে বহু দাগ এঁকেছে গাড়ির চাকা।
সেই দাগ ধ'রে সকাল বিকাল
অচল গতিতে চলে মহাকাল,
পায়ে পায়ে বাজে অসীমের সুর,
পিঠে দোলে তার গাঁঠরি।
তারি সাথে চল্ ওরে চঞ্চল
অজানা পথের যাত্রী।"

ঝড়ের প্রতি কবিরাজ

শোন্ শোন্ ওরে শন-শন বওয়া ঝটিকা!
(তোর) কুপিত হয়েছে পিত্ত
(তাই) ছট্‌ফট্ করে চিত্ত,
আয় তোরে দিই অনুপান সহ
পিত্ত-বারিণী বটিকা।

আয় দেখি তোর নাড়ী টিপে কিছু বলি
কে ছলনাময়ী তোরে গেছে হায় ছলি'

তারি পিছে পিছে কেন মিছে ধাওয়া ?
না-ই যদি পেলি, না-ই গেল পাওয়া,
ওরে নট, তুই চুপ মেরে থাক্‌
যেথা গেছে যাক নটিকা।

পাগলের মত এলোমেলো কত নাচবি ?
ভালে চাল ঢেলে মিছে কত আর বাছবি ?
বাগ্‌দাদ থেকে আনায়ে গোলাপ
তারি পাপড়ির নিবি কি জোলাপ ?
কোথা দেখেছিস ঘটের সঙ্গে
চটাচটি করে ঘটিকা ?

ওরে কানা গরু, তোর কি ভিন্ন গোষ্ঠ ?
পাচন খেলেই সাফ হয় না রে কোষ্ঠ।
কেমন ব্যাধিতে কেমন দাওয়াই
সব কবিরাজ জানে না রে ভাই,
তবু পথে পথে করে চটাপট্‌
চরণে চর্ম-চটিকা।

আমি) ভিষক্‌-রত্ন, নই নই আমি হাতুড়ে
ধমনীতে মোর বহিছে আলাদা ধাতু রে।
আমি ভাই গুলে খেয়েছি নিদান
তাই দিতে পারি সূক্ষ্ম বিধান,
নাই নাই ভয়, হবি নিরাময়
থেমে যাবে ছট্‌ফটিকা।
ওরে ঝটিকা !

প্রার্থনা

প্রভু, বেলফুলে মোর কাজ নাই, তুমি
বেলফল মোরে দিয়ো

ফুলে হবে না তো, ফল দিয়ে হবে
মোরব্বা রমণীয়।
না-ই হোক্ খাঁটি, থাকুক ভেজাল
মালা-র চাইতে তবু ভালো মাল,
শিশুকাল হতে ফুল হতে মোর
ফুল-কপি বেশি প্রিয়।
গোলাপের চেয়ে ঢের বেশি ভালো
প্রভু হে, গোলাপ-জাম
লেডি-র চেয়েও ভালবাসি যারে
লেডিকেনি তার নাম।
চাঁপা-কলি হতে ভালো চাঁপা-কলা,
তুমি তো তা জান, না হ'লেও বলা,
বাকি যা রহিল, অন্তরযামী,
নিজগুণে জেনে নিয়ো।

জীবন-জুয়া (গান—মিশ্র রামপ্রসাদী সুর)

আয় তোরা কে জীবন নিয়ে খেলবি জুয়া!
বাঁচার মতন বাঁচবি যদি
বদলে নে রে গানের ধুয়া।
হয়তো রে তোর বিজন মাঠে
স্যযি-মামা বসবে পাটে,
বনে বনে নামবে আঁধার,
ডাকবে শিয়াল হুক্কাহুয়া।
হয়তো কোন ধূমকেতু তোর নাগাল পাবে।
কেতুরে একলা ফেলে ধুম পালাবে।
হয়তো রে তুই কলসী কাঁখে
মরবি ঘুরে জলের ডাকে,

দেখবি গিয়ে পথের শেষে
জল সেথা নাই, শুকনো কুয়া।
তবু পথ চলতে হবে
খেলবি যদি জীবন-জুয়া।

আপন বুকের পাঁজর দিয়ে বানিয়ে পাশা
খেলে যা আপন ভুলে
খেয়াল খুলে সর্বনাশা।
যেথা নেই মরণ-ভোলা
সেথা নেই জীবন-দোলা,
কাকার খোঁজে হাতড়ে সেথায়
মিলবে শুধুই কাকাতুয়া।

ভয়েরে ভয় দেখিয়ে রুদ্র তালে
গুঁড়িয়ে পথের কাঁকর চলার চালে
বিপথে চল্‌ রে বেঁকে
চরণের চিহ্ন এ কে
যেথায় মহাকালের তাড়ায়
এক হয়ে যায় আসল-ভুয়া।

তুমিই ধন্য

ধন্য তুমি হে, বুদ্ধির নাহি পার।
আলোকের সাথে দিয়েছ অন্ধকার।
দিয়েছ মিষ্টি, তেতো, টক্‌, ঝাল,
দিয়েছ ক্ষুদ্র, দিয়েছ বিশাল,
মাটি ও আকাশ, মরুভূমি—পারাবার।
তোমার ভুবনে কেহ সাধু কেহ চোর,
আছে কত গাঁজা-চণ্ডু-আফিং-খোর।

তোমারি তো দান সুধা ও গরল,
তোমার লীলা যে জটিল-সরল,
তোমার রাত্রি তুমিই করাও ভোর।
ম্যালেরিয়া দিয়ে কুইনিন দাও হাতে,
জনম মরণ খেলা করে একই সাথে।
আরো যে কাণ্ড কত রকম বা,
লিখিতে গেলেই হইবে লম্বা,
সংক্ষেপে তাই এই বলি বার বার—
ধন্য তুমি হে, বুদ্ধির নাহি পার!

জগা-খিচুড়ি

লেগেছে আড়াআড়ির বাড়াবাড়ি খিচুড়ি জগায় রে
খিচুড়ি জগায়
এতদিনের পিরীত বুঝি এবার ভেঙে যায় রে
(মরি) হায় হায় হায় রে!
(ছিল) বরাবর দুইজনাতে
মনের মিলে একই সাথে,
খিচুড়ি ডাইনে ছিল, জগাইচন্দ্র বাঁয় রে
(এখন) বাঁয়ের ওপর ক্ষেপে জগাই ডাইনে যেতে চায় রে
বলে সে "শোন্ খিচুড়ি,
চলবে না আর এ জোচ্চুরি
ভেঙেছিস অনেক কাঁঠাল আমার এ মাথায় রে।
ভেবেছিলি পেয়ে বোকা,
বরাবর দিবি ধোঁকা,
ভুলিয়েই রাখবি বাঁয়ে চিরকাল আমায় রে?
এবার আমায় ডাইনে দিয়ে বাঁ দিকে তুই আয় রে।"
(শুনে) খিচুড়ি কয় "শোন রে জগাই, আমার প্রাণের ভাই রে
তোর মতো মোর প্রাণের মিতা ত্রিভুবনে নাই রে।

(তোরে) কে দিল এই পরামর্শ
অঙ্গ আমার ক'রে স্পর্শ
বল্ তো দেখি, ছুটে গিয়ে মুণ্ডুটা তার খাই রে।
এই দুনিয়া পাগ্‌লা-গারদ,
আছে হেথায় অনেক নারদ
(তারা) সুড়্‌সুড়িতে উস্‌কে দিয়ে ঠাণ্ডাকে তাতায় রে
(আর) ভায়ে ভায়ে মন কষিয়ে লড়াইতে মাতায় রে।
ভেবে তুই দেখ্ রে দাদা
এই কথাটা সহজ সাদা—
যার যেখানে ঠাঁই সেখানে তারেই যে মানায় রে।
দু চোখ ঠেলে কর্ণ দুটি
নাকের পাশে এলে ছুটি'
দু কান যেথায় ছিল, সেথায় দু চোখ যদি ধায় রে
তা হ'লে সেই কেলেঙ্কারির কে সামলাবে দায় রে?"
জগা কয় ঝাঁকিয়ে মাথা
"বকেছিস অনেক যা-তা,
এবারে আয় চ'লে আয়, কাল বহে বৃথায় রে।"
শুনে কয় ধনপতি
"এ বড় সূক্ষ্ম গতি,
এতে মোর নাক গলানো ভালো না দেখায় রে।
(তবু) ঝগড়াতে তাই কাজ কি ওরে?
ছ মাস ছ মাস পালা ক'রে
ডাইনে বাঁয়ে মনের মিলে থাক্ না দুজনায় রে।"
(শুনে) দুইজনাতে ফিরে আবার গলাগলি হ'লো।
(সবাই) হরি হরি বলো রে ভাই, হরি হরি বলো।

শ্রীঅজিতকৃষ্ণ বসু

উপন্যাসের উপকরণ

(পূর্বানুবৃত্তি)

কিছুক্ষণ অপেক্ষা ক'রে যখন দেখলাম, কারও আসবার লক্ষণ নেই, তখন ধীরে ধীরে বেরিয়ে পড়ি। আমার সম্বল ছিল নগীর ইঙ্গিত, সামনের রাস্তা ডাইনে রেখে সাতখানা বাড়ির পর আমার কর্তব্য নিমন্ত্রণরক্ষা, অসম্ভব হ'লে না হয় ফিরে আসব। রাস্তায় এসে খটকা লাগে, গোনবার সময় আমারটাও ধরব কি না? যাই হোক, বাদ দিয়েই গুনে চলি—এক, দুই, তিন ... সপ্তমদ্বারে পৌঁছে দেখি, একটা একতলা বড় বাড়ি। বাড়িখানা বহুদিন হ'ল তার যৌবনসীমা অতিক্রম করেছে, বার্ধক্যে না হোক প্রৌঢ়দশায় পা দিয়েছে। সম্প্রতি চুনকাম করা হয়েছে—পাকা চুলে কলপের ঠিক উল্টো দিক। তার সামনের ঘরে দরজার পাশে ব'সে আছেন।

আমার টেকো-বন্ধুর দাদা।
তাঁর মাথায় টাক ছিল না···কিন্তু,
ইনি যে তাঁরই সহোদর তা বুঝতে দেরি হ'ল না।
অতএব :
নূতন ক'রে রূপবর্ণনা অনাবশ্যক।
সেই গালভরা হাসি—এবং
হেসেই শশব্যস্তে চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে
আমায় অভ্যর্থনা করলেন।

বললেন, আসুন আসুন। আমি আপনার অপেক্ষাতেই ব'সে আছি কর্মকর্তার মুখভাব নিয়ে, চেয়ারটা তুলে তাঁর মনোমত জায়গায় এবং আমার হাত ধ'রে সেই চেয়ারটায় বসিয়ে দিলেন।

আমি তার ঠাণ্ডা-কঠিন দারুময় বক্ষে আশ্রয় নিলাম।
অ্যারিস্টোক্র্যাটিক কুশান কিংবা গদির সঙ্গে
কোনদিন তার কিছু পরিচয় ছিল না।

শুষ্কং কাষ্ঠং—

মৃতবৃক্ষের অস্থিপঞ্জর হতে নির্মিত

অবিমিশ্র কৃত্রিম অবয়ব।

একটু নড়তে চড়তেই দুলতে থাকে—অনেকটা অটোমেটিক।

এবং তিনি বসলেন বিনীতভাবে নিকটস্থ তক্তপোশে। সেটা ক্যাঁচ-ক্যাঁচ ক'রে আর্তনাদ ক'রে উঠল।

অল্প আলাপেই জানিয়ে দিলেন, তাঁদের এটা জয়েণ্ট ফ্যামিলি। তিনিই বাড়ির বড়কর্তা। তাঁরা তিন ভাই—জ্যেষ্ঠাদিক্রমে তাঁদের নাম—মনোহর, নরহরি এবং মধুসূদন।

মধুসূদন! আমার মনে ভাবোদয় হ'ল—

বিশ্বরূপের বিভীষিকা দেখে সেদিন আমি ডেকেছিলাম,

হে বিপদতারণ মধুসূদন···

এবং সঙ্গে সঙ্গে মধুসূদনবাবু গিয়ে হাজির হয়েছিলেন।

আমার জীবন-কাব্যে এমন সুন্দর মিল আর কখনও হয় নি।

তার পর আর সকলের পরিচয় দিলেন। তাদের বর্ণনা কিছু কিছু আমি আমার "বিশ্বরূপ-দর্শন" অধ্যায়ে করেছি। বাকিটার যতটুকু দরকার, এর পরে পাওয়া যাবে।

তিনি গল্প করছেন, হঠাৎ ঘরে ঢুকে ইঞ্জিন তাঁর কোল ঘেঁষে বসল সাধারণ ভদ্রলোকের মত, কারণ এখন সে আর ডিউটিতে নেই। মনোহরবাবু জানালেন, তিনিই ইঞ্জিনের জন্মদাতা এবং এইটিই তাঁর শেষ সন্তান। ভদ্রলোক আমার সমবয়স্ক, এবং পূর্বেই বলেছি—ইঞ্জিনের বয়স দশ। বললেন, দাও তো ইঞ্জিন, তোমার কবিতাটা শুনিয়ে। দেখা গেল, এরাও তাকে 'ইঞ্জিন' ব'লে ডাকে।

কথাটা শুনেই সে দাঁড়িয়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে হাতল দুটো ন'ড়ে উঠল, তারই গতিবেগের সঙ্গে তাল দিয়ে দিয়ে—

ভোঁশ ভোঁশ ফোঁশ ফোঁশ

ইঞ্জিন করে আপসোস—

সবটা আমার মনে নেই। ভাবটা এই: ইঞ্জিন বলছে, ফন্দি ক'রে মানুষ আমাকে রেল-লাইনে বন্দী ক'রে রেখেছে, অহোরাত্র ভার বইয়ে খাটিয়ে নিচ্ছে। যে স্বাধীনতা মানুষ ভোগ করতে চায়, পরকে তা দিতে কুণ্ঠিত—মানুষের এই স্বভাব। ইঞ্জিনকে সান্ত্বনা দিয়ে শেষের দিকে কবি বলছেন—

চুপ কর ইঞ্জিন
তোমার এসেছে দিন—

মানুষের ক্ষীণদৃষ্টি তোমাকে সৃষ্টি ক'রে ভেবেছিল, তোমাকে চির-পরাধীন রাখবে। এতদিনে ঋণ পরিশোধের সময় এসেছে। হে দানবরাজ!

ধরেছ যে রণসাজ
তোমা হতে হ'ল আজ
মানুষের দশা সঙ্গীন!

তার আবৃত্তি শুনে এবং অভিনয় দেখে—

আমি তাকে সম্বর্ধিত করতে উঠে যেতেই
ওর দৃষ্টি আমার দৃষ্টিতে নিবদ্ধ করলে—
স্বচ্ছ বড় বড় চোখ দুটো বিস্ফারিত হ'ল।
তারপর হাঁ ক'রে বাইরে থেকে খানিকটা হাওয়া
ওর ক্ষুদ্র ফুসফুসে পুরে নিতেই—
হাতল দুটো ন'ড়ে উঠল। এবং তৎসঙ্গে—
পু-উ-উ-উ···ভস্ ভস্ ভস্···
খুব সম্ভব, ফের ডিউটির সময় হয়েছে।

ইঞ্জিন চ'লে গেল। কি ভেবে 'ইঞ্জিনিয়ার' চাদর-ঢাকা ছোট টেবিলটা আমার সম্মুখে টেনে আনলেন। টেবিলে ছিল দোয়াতদানি, কলম, রাইটিং প্যাড—তাতে ছিল বহুব্যবহৃত ব্লটিং পেপার, সেদিনের সংবাদপত্র এবং একটা চীনামাটির ছোট প্লেটে রক্ষিত কয়েকটি সিগারেট, একটি দেশলাই, প্রচুর বিড়ি। শেষোক্ত দ্রব্যগুলিতে

আমার দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে ও সংবাদপত্রখানা এগিয়ে দিয়ে তিনি ভিতরে চ'লে গেলেন।

আগেই বলেছি, আমার 'নিজস্ব' সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপনের স্তম্ভ ছাড়া আর কিছুই আমি পড়ি না। উক্ত সংবাদপত্রে নিয়মিত একটা বিজ্ঞাপন দিয়ে আসছি বহুদিন যাবৎ, আজ পর্যন্ত তার উত্তর মেলে নি।

একটা সিগারেট ধরাই। টেবিল-ক্লথের সূচীশিল্প প্রশংসনীয়। কাজটা দো-রোখা কিনা পরীক্ষা করতে কাপড়টা খানিক উল্টে দেখি। না, দো-রোখা নয়, এক-রোখাই, কিন্তু টেবিলটা কেরোসিন-পাটার।

মধ্যবিত্ত হিন্দু ফ্যামিলি।
দারিদ্র্য ছাড়া এদের কোনও গোপন কথা নেই—
সর্বত্র এই দারিদ্র্যকে ঢেকে রাখবার 'আপ্রাণ' প্রচেষ্টা।
ভাঙা বাড়িকে বছর বছর পূজার সময়
হোয়াইটওয়াশ করতে অবহেলা করে না—
বার্নিশ-করা নড়ব'ড়ে চেয়ার—
জাজিম-পাতা ক্যাঁচকেঁচে খাট,
চাদর-ঢাকা কেরোসিন-পাটার টেবিল।
নিজেরা বিড়ি-তামাক খায়,
অতিথিকে খাওয়ায় সিগারেট।

গদ্য-কবিতার টেক্‌নিকের সঙ্গে সঙ্গে এই সব কথা ভাবছি, ব্যতিব্যস্তভাবে ঢুকলেন মধুসূদনবাবু। তাঁর ভ্রূ চোখ কপালে উঠেছে। মুখে হাসি টেনে নমস্কার ক'রে বললেন, এই যে, দাদা এসেছেন। না ডাকতেই এসেছেন! তা তো আসবেনই। ছোট ভাইয়ের সঙ্গে আর মান-অভিমান কি! আর হয়ে এসেছে। আপনার ছোট বউমাটি (অর্থাৎ তাঁর স্ত্রী) বড় রোগা কিনা! নগীও এদিকে আসতে পারে নি। বড্ড বেলা হয়ে গেল। আপনাকে কষ্ট দেওয়া হ'ল শুধু শুধু। চলুন, ভেতরে চলুন।

তিনি ক্রমাগত ব'লে যাচ্ছিলেন, আমি শুধু ঘাড় নাড়ছিলাম এইবার তাঁর নির্দেশক্রমে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াই।

যেতে যেতে সাবধানে চারদিক চেয়ে গলা খাটো ক'রে বলতে লাগলেন, আর দেখুন দাদা, নগীর কথায় আপনি কিছু মনে করবেন না। ওর কথা, ওর কাজ আমরা কেউ গায়ে মাখি না। আহা—

ঢাকতে চেষ্টা ক'রেও তিনি প্রকাশ ক'রে ফেললেন, প্রথম জীবনে স্বামী-পরিত্যক্তা নগী! ঈশ্বরদত্ত অপরাধে। অবশ্য, কেশবিরল মস্তক টাইফয়েডের ফল। ফ্রয়েড কি বলেন?

তাঁর পিছু পিছু ভিতরে ঢুকলাম। একখানি পরিপাটী ঘর, মধ্যবিত্ত হিন্দু পরিবারের সেই একই ইতিহাস—বাইরে নিখুঁত চাকচিক্য, অন্তরে অসীম দৈন্য। দেখে সহজেই অনুমান করতে পারি, কতখানি গায়ের রক্ত জল ক'রে এর সৌন্দর্যসাধন করা হয়েছে।

এক কোণে ঈজি-চেয়ার পাতা ছিল একটা, তার কোলে গা ঢেলে দিলাম। 'ওদিককার ব্যবস্থা' দেখতে মধুবাবু চ'লে গেলেন।

কর্মব্যস্ত নগী এসে বললে, তোমার ভারি কষ্ট হ'ল দাদা! তা কি করব বল! মেজদার সেজো ছেলেটার জ্বর এসেছে, দেখতে না দেখতে একশো পাঁচ। মাথায় জল ঢেলে ঢেলে একশোতে নামিয়ে তবে আসতে পেলাম। খুব অসুবিধে হ'ল তোমার।

আমি বললাম এবং সত্য কথাই বললাম যে, আমার কোনও কষ্টই হয় নি। চা খেতে খেতে প্রায়-দিনই একটা বেজে যায়। কিচ্ছু তাড়া নেই। নিঃসঙ্কোচে বলি, বরং তোমাদের শেষ হতে হতে একটু চা যদি—। স্টোভ এবং চায়ের সরঞ্জাম সেই ঘরেই আমি দেখতে পেয়েছিলাম।

ঐ দেখ! ছোটদার যদি কোন-কিছুতে খেয়াল থাকে! চিৎকার ক'রে উঠল, এই মীরা! এদিকে আয় শীগগির! জোরে জোরেই বলতে লাগল, ঐ এক রকম লোক! যেমন কথাবার্তা, তেমনি কাজ! ছোটদার ব্যাপারে তুমি কিছু মনে ক'রো না দাদা!

নিম্নকণ্ঠে বললে, সম্মুখে কন্যাদায়, ভালমানুষ লোক, কি করবে, কি ক'রে কি হবে—কিছুই যেন ভেবে ঠিক করতে পারছে না। আরও যেন হতভম্ব সেজে গেছে।

মীরা ঢুকতেই বললে, তোর নতুন দাদুকে চা ক'রে দে। এই ব'লে ব্যস্তভাবেই বেরিয়ে গেল।

একটি ঋজু শ্যাম লজ্জাবতীর লতা আমার পায়ের ওপর নুইয়ে পড়ল। ওকে আমি কি আশীর্বাদ করব? ভাল বর হোক? তা ছাড়া আর কি হতে পারে? ওর বাপের অবস্থা স্মরণ করি। আমার আশীর্বাদকে সফল করতে হ'লে অন্তত হাজার পাঁচেক টাকা আমাকেই দিতে হয়। কিন্তু গোটা বাংলা দেশে এর মত অনূঢ়া কন্যার সংখ্যা এত বেশি যে, তাদের সকলের সদ্‌গতি করতে হ'লে পৃথিবীর সবচেয়ে ধনবান স্টেটকেও ফেল পড়তে হয়। অগত্যা মনে মনে ধ্যান করি, প্রজাপতয়ে নমঃ।

পাঁচ মিনিটে চা তৈরি হ'ল। স্টোভ, পেয়ালা, পিরিচ, চামচে, চা এবং চিনির কৌটো কেউ কিছু শব্দ করলে না—স্টোভটার নিজস্ব যান্ত্রিক নির্ঘোষ ছাড়া। একটু চিনি, একটু চা মেঝেতে পড়ল না। পরিপূর্ণ একটি কাপ চা, পেয়ালার চা উপচিয়ে পড়ল না পিরিচে। চুমুক দিয়ে দেখি, দুধ চিনি এবং লিকারের অপরূপ সামঞ্জস্য। জয়েণ্ট হিন্দু ফ্যামিলির এই অংশের গৃহিণী রুগ্না, রন্ধনাদি ক্রিয়া প্রধানত নগীর দ্বারা নিষ্পন্ন হয়। অতএব প্রমাণ পাওয়া গেল, কক্ষটির এই পরিচ্ছন্নতা তার হস্তনৈপুণ্যের ফল।

জিজ্ঞাসা করি, কি বই পড়?

লজ্জায় জবাব দিতে পারলে না। চোখ দুটি মাটির দিকে নেমে আসে। পরে চোখ তুলে বইয়ের শেল্‌ফ্‌টার দিকে তাকায়।

ওকে আর বিব্রত করতে ইচ্ছা হ'ল না। পিঠময় ছড়ানো রেশমের মত নরম একরাশি চুলের গায়ে হাত বুলিয়ে বললাম, যাও, তোমার মার কাছে যাও।

মীরা চ'লে গেল। নরম মাটির ওপর আঙুল দিয়ে আঁকা রেখার ওপর দিয়ে জল যেমন ক'রে এঁকেবেঁকে যায়।

শেল্‌ফের একটা তাকে এক রকমের অনেকগুলি নূতন বই সাজানো ছিল। একখানা টেনে নিয়ে এসে পূর্বস্থানে বসি।

বইটার মলাটে লেখা ছিল—'মাটির কোলে আমরা'। লেখক—শ্রীমধুসূদন চক্রবর্তী বি. এ.। বইখানা ভূগোল। কয়েক পৃষ্ঠা প'ড়ে ফেলি। এমন সরল ভাষায় লিখিত নূতন ধরনের ভূগোল আর কখনও আমার দৃষ্টিপথে পতিত হয় নি। আশ্চর্য, পাঠ্যতালিকায় স্থান পায় নি এবং অবিক্রীত প'ড়ে আছে।

নগীর ছোটদা একজন স্কুলমাস্টার, উচ্চশিক্ষিত এবং পুস্তক-লেখক। উপন্যাসলেখক হতে যাচ্ছি, অথচ এ কথা আমি ধারণাও করতে পারি নি। আমার দোষ নেই, তাঁর চালচলন দেখে কারও পক্ষে তা সম্ভব হ'ত না।

কৌতূহল বাড়ল। মীরার বইয়ের শেল্‌ফটার কাছে উঠে গিয়ে একখানা বই খুলে দেখি, তার প্রথম পৃষ্ঠায় লেখা রয়েছে—মীরা দেবী, ফার্স্ট ইয়ার ক্লাস, ···কলেজ।

বুঝলাম, এই সব তাদের চেষ্টাকৃত নয়, অভিনয়ও নয়। শিক্ষার ফলও নয়, আদর্শও নয়। এদের দারিদ্র্য-কুণ্ঠিত জীবনে শিক্ষার গৌরব চাপা প'ড়ে গেছে। গর্ব-অহংকারের কথাই ওঠে না।

শূন্যমনে বইখানা নিয়ে নাড়াচাড়া করছি, হঠাৎ কানে ঢুকতেই চমকে উঠি একটা পরিচিত শব্দে—তাদ্‌দাঃ!

শ্রীমান বিশ্বরূপ!
স্তূপীকৃত বিছানাপত্রের অন্তরালে
প্রভু যোগনিদ্রায় নিদ্রিত ছিলেন,
আমার পাপচক্ষু এতক্ষণ তা নিরীক্ষণ করে নি।
নিদ্রাভঙ্গে চোখ কচলিয়েছেন,
চোখের কাজলে সমগ্র খমুমণ্ডল উদ্‌ভাসিত!

একটি রঙ-বেরঙের ছোট লাঠি হাতে নিয়ে যোগস্থ ছিলেন,
এখন উঠে বিছানার উপর ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে,
সেই হাতের পাচনি আমার দিকে প্রসারিত ক'রে বলছেন :
তাদ্দাঃ !

আমি তাকে কোলে তুলে নিতে উঠ ছি, চক্ষের নিমেষে ঘরে ঢুকে মীরা তাকে ছোঁ মেরে নিয়ে চ'লে গেল, পাছে আমাকে বিরক্ত করে।

চুপ ক'রে ব'সে আছি। দ্রুতবেগে নগীর পুনঃপ্রবেশ। বললে, দেখে-শুনে নিও দাদা। এ তোমারই বাড়ি। ছেলেটার আবার কাঁপিয়ে জ্বর এসেছে।—এই ব'লে সবেগে প্রস্থান।

বাড়িটা পূব-মুখো। দক্ষিণ দিকের অংশ থেকে অর্গানের বাজনা বেজে উঠল। উত্তর দিক থেকে কাটা কাটা কথা আমার কানে ঢুকছে—জোরে জোরে বাতাস কর্। জলপটিটা ভিজিয়ে নাও। ওরে, কে আছিস, আর এক বালতি জল এনে রাখ্ এই ঘরে। এবং সেই সঙ্গে অর্গানে নারীকণ্ঠে ধ্বনিত হ'ল—জানিতে যদি গো তুমি। সঙ্গে সঙ্গে ক্রুদ্ধ চিৎকার—এই শোভা! বাজনা থামা। আমি একা ব'সে ব'সে ভাবছি—

জয়েণ্ট হিন্দু ফ্যামিলি!
একই ছাদের তলায় মস্ত বড় পরিবার—
অসংখ্য লোকজন। ভিচিকিচির ওম্‌নিবাস।
ভিতরে তার বহুবিধ পার্টিশান,
পৃথক পৃথক হিস্যা—
ঈর্ষা, কলহ, মতদ্বৈধ নিশ্চয় আছে—
এবং তাই নিয়েই তাদের দৈনন্দিন জীবন হয়তো।
কিন্তু :
বিপদে—
শত্রুর বিরুদ্ধে-

উৎসবে এবং পরের সঙ্গে সৌজন্যে ওরা জয়েণ্ট ;
আর জয়েণ্ট প্রপার্টি এই বাড়িখানা, এবং
বাড়ির মধ্যে সবচেয়ে ছোট শিশু—বিশ্বরূপ।
ইণ্টারেস্টিং খেলনা হিসাবে ও সবারই কাছে পায় সমান আদর।
একান্নবর্তী হিন্দু পরিবার!
একটা বিরাট পুষ্করিণী—
শ্যাওলা শালুক পানারি আর পদ্মপাতায় ঢাকা—
ফুলও ফোটে তাতে—
তলায় বজবজে পাঁক!
বুকের ভিতর অজস্র জলজন্তু খাদ্যের খোঁজে কিলবিল করছে—
প্রায়-অস্ত্রহীন নিরীহ সব জীব—
কাতলা, পুঁটি, চ্যাং, ব্যাং, কাঁকড়া, গুগলি, ঢোঁরসাপ···
এবং তাদের ছোটবড় ছানাগুলি।
জলকেউটে? তাও হয়তো থাকে কোনটায়—
কিন্তু এখন আমি তার পরিচয় পাই নি।
জয়েণ্ট হিন্দু ফ্যামিলি!
এ বরং অনেক ভাল যে—
দারিদ্র্য ভিন্ন তাদের কোনও সমস্যা নেই—আর নেই :
না বলতে পারার মত না-বলা বাণী!
একান্নবর্তী মধ্যবিত্ত হিন্দু পরিবার : ওরা বলে—
শুধু সুবিধার জন্য অন্ন-পরিবেশনের ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থা।
স্বার্থে স্বার্থে প্রচুর সংঘাত—
পরার্থে শুধু গাল-ভরা নাম—'জয়েণ্ট'।

মধুসূদনবাবু এসে আমাকে এই অনাবশ্যক দুশ্চিন্তা থেকে রক্ষা করলেন। উপন্যাসের পক্ষে অনাবশ্যক, কারণ বাড়িখানাকে উদ্দেশ করে স্বচ্ছন্দে বলা যেতে পারে, সারা শহরে 'তুমিই তোমার মাত্র তুলনা কেবল'। মধুবাবু বললেন, আসুন দাদা, জায়গা হয়েছে।

পাশাপাশি দুটি আসন পাতা। একটাতে আমি দাঁড়িয়ে আছি। মধুবাবু গেছেন রান্নাঘরের ভিতর। তিনি না আসা পর্যন্ত বসতে পারছি না। কিন্তু তাঁর বদলে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসে মাথায় আধ-ঘোমটা কাপড় দিয়ে, আঁচলের খুঁটটা গলায় জড়িয়ে, একটু দূর থেকে প্রণাম করলে—

একখানি চামড়া-ঢাকা জীর্ণ কঙ্কাল! গায়ের রঙ? বলতে পারব না। ও যখন বধূবেশে প্রথম এই বাড়িতে আসে, তখন তার চেহারা কি রকম ছিল, আমি কেন, কোনও কবিই তা বলতে পারবে না। কোনও বিজ্ঞ চিকিৎসকও না। কষ্টে হেসে বললে, আপনাকে আমি কি খাওয়াব, আমার কি আছে?···তবু আপনি এসেছেন···শুনলাম··· নিজের থেকেই এসেছেন···

খাওয়া-দাওয়া হ'ল তার আয়োজনের ভিতরেও বিলাসের আবরণে দারিদ্র্য লক্ষিত হ'ল—দৃষ্টান্ত নিষ্প্রয়োজন। আমি ভাল ক'রে খেতে প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলাম। ঐ হাড় কখানার ভিতর হৃদয় ব'লে কোনও বস্তু যদি আজও থাকে, তাকে নূতন ক'রে পীড়িত করতে আমার প্রবৃত্তি হ'ল না।

কটা বাজল? দরকার কি জেনে? ফেরবার সময় মনে হ'ল, আমি যেন এক দুর্দান্ত ক্ষুধার্ত শিশু, মাতৃস্তন্য টেনে চুষতে গিয়েছিলাম, বেরিয়ে এল রক্তমাংস—তাতে দুধ নেই। ভাবতে আমার সমস্ত মন ঘিনঘিন ক'রে উঠল।

নগী বড় মিথ্যাবাদী! হায়, ওরই কথা শুনে চলেন তার ছোটদা? বরং তার উল্টো দিকটাই সম্ভব—সকলের কথা শুনে চ'লে সবার মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে আজ ওর এই দশা।

গৃহকর্তার কর্তব্য সেরে সেই যে স'রে পড়েছিলেন, মনোহরবাবুর আর দেখা পাই নি। নরহরিবাবুর তো একেবারেই না।

আর দেখা পেলাম না তার, যার নিমন্ত্রণে আমি এখানে এসেছিলাম—বিশ্বরূপের মা যশোদার। কে সে? কার পুত্রবধূ?

সধবা, না, বিধবা ? এই নিষ্প্রয়োজন ব্যাকুল প্রশ্নের উত্তর চিরকালের জন্য অজানা র'য়ে গেল।

১৭

হ্যাঁ, এই বাড়িটা থেকে প্রচুর উপকরণ পাওয়া যেতে পারে। নগীর বিবাহিত জীবনের ইতিহাস, মীরার ভবিষ্যৎ জীবন এবং অর্গানের বাজনার ছিদ্রপথে প্রবেশ ক'রে ছিদ্রান্বেষী চতুর ঔপন্যাসিক লোকচক্ষে অনেক কিছু তুলে ধরতে পারেন। সমগ্র পরিবার অবলম্বন ক'রে লিখলে, সেটা হবে কুরুক্ষেত্তর কাণ্ড—ভীষ্মপব্ব, দোরোন-পব্ব ইত্যাদি। পৌরাণিক না হ'লেও ঐতিহাসিক—'জয়েণ্ট হিন্দু ফ্যামিলি' বাংলা দেশে আজ অতীতের ইতিহাস মাত্র। কিন্তু ঐতিহাসিক উপন্যাস আজকাল বড় একটা কেউ পড়তে চায় না।

যতদিন বাপ-মা বেঁচে থাকে, ভয়ে-ভক্তিতে জোড়াতালি দিয়ে কোনও ক্রমে চলে, কখনও সম্পত্তির লোভে (যদি কিছু থাকে), কখনও বা স্নেহের আওতায় (যদি তার তোয়াক্কা রাখে)। এবং দুঃখের বিষয়, এই দুটো জিনিসের অভাবে উকিল-গিন্নীর ভারবাহী নৌকাখানা কয়েক মাসের মধ্যে হালকা হয়ে গেছে।

সেদিন সকালবেলায় উকিল-গিন্নী নিজে এসে বললেন, আজ সন্ধ্যেয় একবার আমাদের বাড়ি এস ভাই, গোটাকতক কথা আছে। খুব জরুরি কথা, উনিও যেতে বলেছেন। যেয়ো কিন্তু। এই ব'লে তাড়াতাড়ি চ'লে গেলেন। সদাহাস্যময়ী উকিল-গিন্নীর মুখে দুশ্চিন্তার ছায়া—দেহের দিক থেকেও হালকা হয়ে গেছেন।

উকিলবাবু এবং উকিল-গিন্নীর 'গোপন কথা'! ব্যাপার কি? সারাদিনটা ঔৎসুক্যে কাটল। উদ্বেগ? তাও কতকটা ছিল বইকি। পাড়াপড়শী।

তখনও ঠিক সন্ধ্যা হয় নি। বাড়িখানা প্রায়ান্ধকার। বৈঠকখানায় মক্কেল নেই। কয়েকবার কড়া নাড়তে, লণ্ঠন হাতে উকিল-গিন্নী

বৈঠকখানার দরজা খুললেন। ম্লানহাসি হেসে বললেন, এস ভাই, ভেতরে এস। তাঁর পিছু পিছু ভিতরে ঢুকি। বিরাট বাড়ি খাঁ-খাঁ করছে। একটা ঘরে উকিলবাবু শয্যাশায়ী। টেবিলের উপর একটা মোমবাতি জ্বলছিল। একটু আগেই ধরানো হয়েছে। শিয়রের কাছে শূন্য চেয়ারটার দিকে চাক্ষুষ ইঙ্গিত ক'রে ক্ষীণকণ্ঠে উকিলবাবু বললেন, ব'স ভাই। লণ্ঠন হাতে উকিল-গিন্নী চ'লে গেলেন।

প্রায় দু মিনিটের নীরবতা ছিন্ন ক'রে উকিলবাবু বললেন, আমরা এখান থেকে চ'লে যাচ্ছি ভাই। এতদিন এই শহরে বাস করছি, তোমার মত নিরুপদ্রব পরোপকারী ভদ্রলোক একটিও আমার নজরে পড়ে নি। আর আছেন ডক্টর রায়, কিন্তু তাঁকে আমি তুচ্ছ বিষয়ে বিরক্ত করতে চাই না। একটা কাজের ভার তোমাকে আমি দিয়ে যাচ্ছি। এই বাড়িটায় ভাড়াটে আসবে পয়লা থেকে। আজ পঁচিশে। এই কদিনের ভেতর আমাদের চ'লে যেতে হবে। চাবিটা তোমার কাছেই থাকবে। যিনি আসছেন, তাঁকে আমি সেই কথা ব'লে দিয়েছি। ভাড়ার টাকাও তোমাকেই দেবেন।

বুঝলাম, ভাড়ার টাকাটা মাস মাস আদায় ক'রে ওঁদের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিতে হবে। বুঝলাম না, এ কাজের জন্য আমার মধ্যস্থতার প্রয়োজন কি ছিল, ভাড়াটেই তো পাঠিয়ে দিতে পারত। এবং বুঝলাম না অনেক কিছুই। কৌতূহল দমন ক'রে জিজ্ঞাসা করি, আপনারা কোথায় যাচ্ছেন?

দেশে। ঠিকানা দিয়ে যাব। চোখ নামিয়ে সসংকোচে বললেন, তোমাকে বলতে আমার লজ্জাও নেই, সংকোচও নেই, না-ব'লেও উপায় নেই। ডক্টর রায়ের কাছে আমার কিছু দেনা আছে। আমার বর্তমান অবস্থা খুলে ব'লে কিস্তি চাইলাম। তিনি হ্যাণ্ডনোটখানাই ফেরত দিতে চাইলেন। আমি নিলাম না। ইতিমধ্যে তিনি এক কাণ্ড ক'রে বসেছেন।—এই ব'লে বালিশের তলায় হাত চালিয়ে একখানা ছেঁড়া খাম আমার হাতে দিলেন। রেজেস্টারি খাম।

টেবিলের কাছে উঠে গিয়ে মোমবাতির আলোতে প'ড়ে দেখি, ডক্টর রায় লিখছে—

মাস্টবরেষু,

অবিশ্বাসী বৈজ্ঞানিক হয়েও ব্রহ্মহত্যার কারণ হতে পারি না। আপনার গুরুতর হার্টের অসুখ। এই হ্যাণ্ডনোটখানাই আপনার মৃত্যুর কারণ হতে পারে। অতএব—

আপনার
প্রভাতরবি রায়

চিঠিটুকুর সঙ্গে হ্যাণ্ডনোটটা আলপিন দিয়ে আঁটা। ফিরে এসে চেয়ারে বসি। উকিলবাবু বললেন, ওটা তোমার কাছে রাখ। হ্যাণ্ডনোটটা ফিরিয়ে দিতে চেয়ে ডক্টর রায় বলেছিলেন, যখন যা দিতে পারেন দেবেন, ও নিয়ে মাথা ঘামাবেন না। ভাড়ার টাকা পঞ্চাশ। ওর থেকে প্রতি মাসে পঁচিশটা টাকা ডক্টর রায়কে দিও, বাকিটা মনি-অর্ডার খরচ কেটে নিয়ে আমার ঠিকানায় পাঠিয়ে দিও। যতদিন না শোধ হয়।

সখেদে ব'লে চললেন, কথা বেচেই খাওয়া, পেটের দায়ে সত্য-মিথ্যা অনেক কিছু বলতে হয়েছে। কিন্তু জীবনে কাউকে কখনও বঞ্চনা করি নি। ঋণ রেখে মরতে চাই না।···এইটুকু তুমি করবে?

আমি আমার সম্মতি জানাই। নিশ্চিন্ত হয়ে পাশ ফিরে শুয়ে বললেন, কাজের কথাটা বলা হ'ল। বাকি সব গিন্নীর কাছে শুনতে পাবে। আমি একটু ঘুমোব। আলোটা নিবিয়ে দিয়ে যেয়ো ভাই।

ফুঁ দিয়ে মোমবাতিটা নিবিয়ে বাইরে এসে দরজা ঠেসিয়ে দিলাম। রান্নাঘরে আলো জ্বলছে। রান্নাঘরের সামনে গিয়ে ডাকি, দিদি!

ভিতর থেকে বললেন, ব'স ভাই, বারান্দায় মোড়া আছে। আমি এলাম ব'লে। অনেক কথা আছে। একটু পরেই বেরিয়ে এলেন। তাঁর এক হাতে চা, অন্য হাতে খাবার। আমার সামনে নামিয়ে দিয়ে বললেন, এইটুকুন খাও। ধরা-গলায় বললেন, আর কি কখনও দেখা

বে? ফের রান্নাঘরে ঢুকে বেরিয়ে এলেন। এক হাতে লণ্ঠন, অন্য হাতে ছোট একটা মোড়া। মুখোমুখি বসলেন।

মধুবাবুর বাড়ির মধ্যাহ্ন-ভোজনের কথা মনে পড়ল। বিপদ কখনও একা আসে না। ভোজনের সঙ্গে করুণরস মিশ খায় না, রাসায়নিক মিশ্রণের (কেমিক্যাল কম্বিনেশন) পরিপন্থী। তবু উপায় ছিল না, খেতেই হ'ল। মনে পড়ল, স্বামীর অবধারিত মৃত্যুর পূর্বে বালিকাবধূকে জোর ক'রে ধ'রে শেষ মাছ-ভাত খাইয়ে দেওয়ার যৌবনে-দেখা এক অপরূপ মর্মন্তুদ দৃশ্য।

তাঁর মুখে সকল কথা শুনে দুঃখিত হই। উকিল-পরিবারের এই কয় মাসের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস—

ছেলেরা যে যার ফ্যামিলি কর্মস্থলে নিয়ে গেছে। এতে কিছু দোষ দেওয়া যায় না। তাঁর আপত্তির কারণ বড় ছেলের ব্যবহার। আজ দু বছর চাকরি করছে, ভাল চাকরিই, বৃদ্ধ পিতাকে একটি পয়সাও সাহায্য করে নি। মেজো ছেলে কলেজের প্রফেসার, আয় কম, তবু সে মাঝে মাঝে কিছু কিছু পাঠিয়ে দিত। ছোট ছেলে মেডিক্যালে ফোর্থ ইয়ারে পড়ে—শ্বশুরের পয়সায়। সেদিন কোর্টে বক্তৃতা করতে করতে উকিলবাবু অজ্ঞান হয়ে পড়েন। পাঁচটি কন্যা পার করেছেন, তিনটি ছেলে মানুষ করেছেন, আর কি তিনি খাটতে পারেন? এখন বিশ্রাম চাই। ডাক্তারও তাই বলেছেন। ছেলেমেয়েদের বিষয়ে দায়িত্ব তাঁরা শেষ করেছেন, দেশে সামান্য কিছু জমি-জায়গা আছে, কোনও রকমে দিন চ'লে যাবে। তারপর ওদের ধর্ম ওদের কাছে। ছোট বউমাকে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছেন, সেইখানেই থাকবে। তাদের অবস্থা ভাল।

এই সব কথা শুনতে শুনতে রাত্রি হয়ে গেল। একান্ত আত্মীয়ের মত সকল পারিবারিক ঘটনা খুঁটিনাটি খুলে বললেন। শেষে নিজেই বললেন, রাত হচ্ছে, এবার তুমি এস ভাই। আলো নিয়ে রাস্তা পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন।

রাস্তায় নেমে নজরে পড়ল, আমার বাইরের ঘরের বারান্দায় ব'সে দুটো লোক সিগারেট কিংবা বিড়ি টানছে। বিড়িই হবে—আমাকে দেখে বিড়ি ফেলে দিয়ে উঠে দাঁড়ায়। দুটি উচ্চহৃদয়কে অন্ধকারেও চিনতে পারি—গোবরা এবং জংলা। দাঁত বের ক'রে হাসতে থাকে, অন্ধকারেও তাদের দন্তবিকাশ দৃষ্টিগোচর হ'ল। জংলার মাথায় তখনও ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। বিরক্ত হয়ে পাশ কাটিয়ে ভিতরে ঢুকি।

ভিতরে সরি ব'সে ছিল। সরির মুখে শুনলাম—

গোবরা যেদিন ফিরে আসে, সেই দিনই তাদের সামাজিক বিচার শেষ হয়ে গেছে। শুনে আশ্বস্ত হই। আমার ভয় ছিল, এই অতি সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক বিচারে আমাকেই যদি বিচারপতির আসন গ্রহণ করতে হয়। বিষয়টি অত্যন্ত জটিল—'কজ অফ অ্যাক্‌শন'—অপরাধের মূল কারণ অনুসন্ধান করতে হ'লে, প্রথমেই আবিষ্কার করতে হবে, হয় জংলার মনে কিছু দুরভিসন্ধি ছিল, কিংবা হয়তো জংলী ধরনের হ'লেও জংলার কার্যকলাপ তার সরল মনের সহজ রসিকতা ছাড়া আর কিছুই ছিল না। অর্থাৎ গোবরার লাঠিমারার সঙ্গত কারণ ছিল কি না!

সরিদের পাড়ার সমাজপতিরা কিন্তু সহজ সমাধান খুঁজে পেয়েছেন। অনুতপ্ত গোবরা স্বীকার করেছে, ওইটুকুন 'রঙ্গরস' তার 'নিজের' শালীর সঙ্গেও সে করতে পারত। তবে, প্রচুর তালরস সেবনের ফলে, দুর্ঘটনার সন্ধ্যায় সে কি দেখে কি ভেবে কি কাণ্ড করেছিল কিছুই তার মনে পড়ছে না। রক্ত দেখে 'চ্যাতনা' হতেই সে ছুটে পালিয়েছিল। প্রকাশ্য সভায় সরি বলেছিল, আমি অতসত বুঝি না বাপু! পরের ছেলেকে ডেকে আনাই বা ক্যানে, লাঠি মারাই বা ক্যানে, ঘাড়ে ধ'রে বিদেয় ক'রে দিলেই পারতিস। খুনোখুনি হ'লে কি করতিস তু?

সমাজপতির রায়—যথা, জংলার সঙ্গে ব্যালফুলের বিবাহ। আমার ভূতপূর্বা একদিনের গৃহিণী 'ব্যালফুল'কে নিশ্চয়ই আপনাদের মনে আছে। দ্বিতীয় শর্ত—বিবাহের ব্যয়ভার (মায় 'এক হাঁড়া' পচুইয়ের দাম—'হাঁড়া' হাঁড়ির বৃহত্তম সংস্করণ) উভয় পক্ষকে সমানভাগে বহন

করতে হবে। এবং সস্ত্রীক ও সপুত্রকন্যা জংলাকে বিবাহের পর এক সপ্তাহের মধ্যে স্বগ্রামে ফিরে যেতে হবে।

বিচারে উভয় পক্ষই সন্তুষ্ট, বলতে কি আমিও। কিন্তু আসল প্রমাণ এখনও বাকি। জংলাকে ব্রাহ্মণের পা ছুঁয়ে দিব্যি করতে হবে যে, তার মনে কিছু 'কু' ছিল না। এবং সে সদ্‌ব্রাহ্মণ আমিই।

প্রমাণের আগেই বিচারফল! আমি যতদূর জানি, কোনও হাইকোর্টই এই প্রকারের মনস্তাত্ত্বিক বিচার এমন সুষ্ঠুভাবে নিষ্পন্ন করতে পারতেন না। শুনেছি, ডক্টর রায় যে যন্ত্রটা আবিষ্কার করছেন, তার নাম 'মনোবিকলন'-যন্ত্র (ডক্টর রায় ইংরেজী পরিভাষা পছন্দ করেন না)। মানুষের মনের কথা ওই যন্ত্রটায় ফুটে উঠবে। আঃ, যন্ত্রটা যদি সম্পূর্ণ হ'ত, আমার পা দুটোকে এই ব্যাপারে অনাবশ্যক তৃতীয় পক্ষে পরিণত হতে হ'ত না। অবশ্য আপাতত এ ছাড়া উপায় ছিল না। শাস্ত্রে আছে—

বিবাদেঽন্বিষ্যতে পত্রং পত্রাভাবে তু সাক্ষিণঃ
সাক্ষ্যভাবাৎ ততো দিব্যং প্রবদন্তি মনীষিণঃ।

মামলা-মকদ্দমায় প্রথমে দলিল খুঁজতে হবে, তার পরে সাক্ষী। সাক্ষীর অভাবে শপথ গ্রহণ। বলা বাহুল্য, আলোচ্য মামলায় দলিল কিছুই ছিল না। বাস্তব ঘটনার সাক্ষী অবশ্য ছিল, ভাল সাক্ষীই— উচ্চহৃদয় গোবরা এবং 'পাড়াকুঁদুলি' সরি নির্ভীক স্পষ্টবাদিতার জন্য সমগ্র পল্লীতে সুবিখ্যাত। কিন্তু হায়, মনস্তত্ত্বের সাক্ষী হবে কে?

শাস্ত্রীয় প্রক্রিয়া নিষ্পন্ন হ'ল। আপত্তি করলাম না, কারণ আমিও ব্যাপারটা মিটিয়ে দিতে চাই। এরই জন্য অপেক্ষা ক'রে উভয় পক্ষ এতক্ষণ ধ'রে আমার বাইরের বারান্দায় ব'সে ব'সে বিড়ি ফুঁকছিল।

পরদিন প্রাতর্ভ্রমণের পথে সরিদের পাড়ায় গিয়ে উক্ত পাড়ার "মনীষী'দের ন্যায়বিচারের প্রশংসা করি। আপসোস ক'রে বলি, আমার ওপর কিন্তু অবিচার হ'ল। গিন্নীটি আমার হাতছাড়া হয়ে গেল। প্রসঙ্গক্রমে বিড়ালদম্পতির মৎস্যভক্ষণের বৃত্তান্তটাও শুনিয়ে

দিলাম। আমার দুঃখে কেউ দুঃখিত হ'ল না। সবাই হেসে উঠল। 'যার ব্যথা সেই জানে'। বালিকা-বধূর শ্বশুরবাড়ি-যাত্রা আনন্দ-বেদনার অপূর্ব সংমিশ্রণ!

জংলাকে বললাম, তোর কপাল ভাল। বুড়ো বরের জন্যে কে মাছ চুরি করে—

গিন্নী বললে, ধ্যেৎ!

ব্যালকুলের বানরীয় বুদ্ধি নারীত্বের দিকে অগ্রসর হচ্ছে কি?

[ক্রমশ]

শ্রীভোলা সেন

ঢেঁকি ও পরকাল

অনামক ঋষি একখানি ক্ষুদ্র তপোবনে বসবাস করিতেন; পত্নী ও এক বিবাহিতা ভগ্নী ভিন্ন তাঁহার সংসারে আর কেহই ছিল না।

একদিন ঋষি প্রত্যূষে স্নান ও তপস্যা সমাপনান্তে কুটিরে প্রত্যাবর্তন করিয়া দেখিলেন, ঋষিপত্নী শীতলজলপূর্ণ কলসীর মধ্যে দক্ষিণ হস্ত প্রবিষ্ট করাইয়া অধোবদনে বসিয়া আছেন। দর্শন মাত্রেই ঋষিবর পত্নীর প্রতি দুঃখানুভব করিলেন এবং প্রশ্ন করিলেন, অয়ি ব্রাহ্মণি, কি হেতু তুমি মলিনবদনে উপবিষ্টা আছ? তোমার দক্ষিণ হস্তই বা কলসীপ্রবিষ্ট কেন? সত্বর উত্তর দান করিয়া আমার চিন্তার অবসান কর। লজ্জাবনতাননা ঋষিপত্নী ঈষৎ হাস্যসংযোগে কহিলেন, কি আর বলিব আর্যপুত্র! ধান্য নিষ্পেষণকালে আমার হস্ত ঢেঁকিপিষ্ট হইয়াছে; তজ্জনিত বেদনার উপশমকল্পে হস্তটিকে শীতলজলে নিমজ্জিত রাখিয়াছি। ইহা শুনিয়া ঋষিহৃদয় ব্যথিত হইল; সোদ্বেগে তিনি কহিলেন, সত্বর তোমার আহত হস্তটি আমায় দেখাও।

আগ্রহাতিশয্যে ঋষিবর স্বয়ং পত্নীর হস্তটি কলসীর মধ্য হইতে নিষ্ক্রান্ত করাইয়া পরীক্ষা করিতে লাগিলেন; দেখিলেন, পত্নীর নবনীত-কোমল হস্তটি বিশেষভাবেই পিষ্ট হইয়াছে, এক স্থানে একটি ক্ষতচিহ্নও

হইয়াছে, তাহাতে রুধির নির্গমনের চিহ্ন বিদ্যমান। এই শোচনীয় দৃশ্য দর্শনে তাপসের তপঃক্লিষ্ট হৃদয় হইতে রুধিরস্রোত প্রবাহিত হইল। অল্পক্ষণের মধ্যে তিনি ক্রোধোদ্দীপ্ত হইয়া উঠিলেন, পলকহীন নেত্রে ঢেঁকিটি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন ; মনে হইল যেন তাঁহার নয়নদ্বয় হইতে রেখাকারে অগ্নি নির্গত হইতেছে। তিনি দন্ত নিষ্পেষণ করিতে করিতে কহিলেন, আরে রে কাষ্ঠহৃদয় ঢেঁকি! ধিক্! সহস্র ধিক! তুই আমার সাধ্বী পত্নীর হস্ত অতি নির্মমভাবে পিষ্ট করিয়াছিস। তোকে কি বলিয়া অভিসম্পাত দিব! ঋষিবরের ভাববিপর্যয় দেখিয়া ঋষিপত্নী ঈষৎ কৌতুক অনুভব করিলেন এবং বুঝিলেন যে, মাত্রাহীন ক্রোধের ফলে স্বামীর জড়-চেতনের পার্থক্যবোধ লুপ্ত হইয়াছে ; তাহা না হইলে তিনি সামান্য ঢেঁকিকে সম্বোধন করিয়া অভিসম্পাত দিতে উদ্যত হইবেন কেন? দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে উপবীত ধারণ করিয়া ক্রোধকম্পিত কণ্ঠে ঋষিবর বলিলেন, রে ঢেঁকি! আমি তোকে অভিশাপ দিতেছি, চিরজীবন তোকে নারীর পদাঘাত সহ্য করিয়া ধান্য ভানিতেই হইবে ; স্বর্গে গিয়াও তোর পরিত্রাণ নাই।

ঋষিপত্নী সশব্দে হাসিয়া বলিলেন, আর্যপুত্র, কি করিলে তুমি? রামের অপরাধে শ্যামকে দণ্ডিত করিলে? বিস্মিত ঋষিবর প্রশ্ন করিলেন, কেন ব্রাহ্মণি, আমার কি বিচার-বিভ্রাট হইয়াছে? ঋষিপত্নী বলিলেন, আমার হস্তের আঘাতের জন্য ঢেঁকি দায়ী নয়। ঋষিবর অধীর হইয়া বলিলেন, তুমি শীঘ্র বল, কে সেই অপরাধী? আমি তাহাকেও কঠিন অভিসম্পাত দিব। ঋষিপত্নী বলিলেন, আর্যপুত্র, ধৈর্য ধারণ কর ; আসল অপরাধীকে অভিশপ্ত করিলে মৃতের উপর খড়্গাঘাত হইবে। হে তাপস, তুমি কোমল হও। ঈষৎ সংযত হইয়া ঋষিবর বলিলেন, বেশ, আমি বাক্যদান করিতেছি, আর কাহাকেও অভিশাপ দিব না ; এখন বল, কে সেই অপরাধী? ঋষিপত্নী বলিলেন, অপরাধী তোমারই ভগিনী ; সে প্রোষিতভর্তৃকা, তাই স্বভাবতই অন্যমনস্কা ; তাহারই অসাবধান পদাঘাতে নিরপরাধ ঢেঁকি আমার

হস্তে পতিত হইয়াছে। এই কারণে যদি তুমি আর্যকন্যার প্রতি ক্রুদ্ধ হও বা তাহাকে কোনরূপ ভৎর্সনা কর, তাহা হইলে আমি প্রাণে অত্যন্ত ব্যথা পাইব। ঋষিবর সব শুনিয়া কহিলেন, গতস্য শোচনা নাস্তি; আগামীকাল হইতে তুমিই ঢেঁকিকে পদাহত করিতে থাক, আর ঐ অন্যমনস্কা ভগিনীটি ঢেঁকির মুখরক্ষা করুক। ঋষিপত্নী বলিলেন, ইহা অতি উত্তম প্রস্তাব; তোমার জীবদ্দশায় আমার অন্যমনস্কা হইবার কোনও সম্ভাবনা নাই; তোমার ভগিনীর হস্তও কোনদিন আহত হইবে না। এখন বল আর্যপুত্র, ঢেঁকির শাপ-মোচনের উপায় কি? ঋষিবর বলিলেন, কোনও উপায় নাই; সত্যদ্রষ্টা তপঃক্লিষ্ট ঋষি আমি; আমার বাক্য কোনদিন মিথ্যা হইবে না। তবে ঢেঁকির দুর্ভোগের কারণ ধান্য; সুদূরভবিষ্যতে যদি কোনদিন ধরণী ধান্যহীন হয়, তাহা হইলে হয়তো ঢেঁকির শাপমোচন হইতে পারে। ঋষিপত্নী মৃদুহাস্যসহকারে কহিলেন, হায় আর্যপুত্র, সেই সুদিন বা দুর্দিন কি কখনও আসিবে? তুমি ঢেঁকির শাপমোচনের পথান্তর নির্দেশ কর। ঋষি কহিলেন, নান্যঃ পন্থা। হয়তো একদিন ঢেঁকি মানবের অগ্রগতির সহিত সমতালে চলিতে পারিবে না, সেই সময় মর্ত্যে হয়তো তাহার নিগ্রহসমাপ্তি ঘটিবে; কিন্তু স্বর্গে তাহার সে সম্ভাবনা নাই; দেবীর পদাঘাত খাইতে খাইতে স্বর্গে যাবতীয় ধান্য তাহাকেই ভানিতে হইবে।

* * *

এই হ'ল 'কল্পনা-পুরাণে' বর্ণিত 'ঢেঁকি'-তত্ত্বের সংক্ষিপ্ত বিবরণ। এই পুরাণ কবে লেখা হয়েছে, কে লিখেছে, তা জানবার কোনও উপায় নেই; কেননা, পুরাণ ইতিহাস নয়। অনামক ঋষির শাপের ফলে ঢেঁকিকে আজও আমাদের চোখের সামনেই ধান ভানতে হচ্ছে, তার এই মহৎ কাজের একমাত্র পুরস্কার নারীপদাঘাত। মানুষের ধানের প্রয়োজন আজও মেটে নি, বরং বেড়েই চলেছে; তাই ঢেঁকির শাপমোচনের দিনও অদূরাগত নয়। মানুষের গোষ্ঠী যে রকম বাড়তির পথে, তাতে বুড়ো ঢকঢকে ঢেঁকি আর তার চাহিদা মেটাতে পারছে না; বাধ্য হয়েই

তাকে যন্ত্রের সাহায্য নিতে হচ্ছে। তবুও ঢেঁকি ইন্‌ভেলিড পেন্‌শন পাচ্ছে না, তাকে খাটতেই হচ্ছে; অধিকন্তু যে লাথি সে আজ খাচ্ছে, তাও আবার মূর্খ নারীর পায়ের। মর্ত্যে আর নরকে ঢেঁকির কাজের ভার অনেকটা লাঘব করছে যন্ত্র, ঢেঁকি খালি বেরিবেরি-রোগীদের নিয়ে আছে। স্বর্গে কিন্তু এখনও দেবভোগ চলছে ঢেঁকিছাঁটায়! তার কারণ সেখানে যন্ত্র তৈরি করবে কে? বৈজ্ঞানিকরা নাস্তিক, কাজেই স্বর্গে তাদের প্রবেশনিষেধ। মেকানিক্যাল ব্রেনওয়ালা দেবতা তো বিশ্বকর্মা একা; তিনি যদি কিছুদিন স্বর্গ ছেড়ে মর্ত্যে এসে যন্ত্র তৈরি করা শিখে যান, তা হ'লে হয়তো স্বর্গেও যন্ত্র চালু হতে পারে। কিন্তু সেই সঙ্গে রাজনীতি সমাজনীতি অর্থনীতিও স্বর্গে ঢুকে পড়বে, ফলে স্বর্গীয় সভ্যতার অবসান ঘটবে, স্বর্গীয় শান্তি বিঘ্নিত হবে। আরও একটা কথা এই যে, স্বর্গের চাহিদা মেটাতে ঢেঁকিই যথেষ্ট; কেননা সেখানের দেবতাসংখ্যা মাত্র তেত্রিশ কোটি। কিন্তু মর্ত্যে বা নরকে তা সম্ভব নয়; মর্ত্যের লোকসংখ্যাই তো দু শো কোটির ওপর; আর নরকের আদমসুমারী হ'লে আদমীসংখ্যা যে কত কোটি হবে, তার ঠিক নেই। এত লোকের পেট ভরানো কি ঢেঁকির কর্ম? যন্ত্র না হ'লে কোন মতেই চলে না। বৈজ্ঞানিকের দৌলতে মর্ত্যে আর নরকে চলছে কল, ঢেঁকি বিদায় নিচ্ছে; কিন্তু স্বর্গে সেই সনাতন ঢেঁকি অমরতা লাভ করেছে।

* * *

পুরাণ নিয়ে যাঁরা মাথা ঘামান তাঁরা জানেন, সব পৌরাণিক কাহিনীতেই কোন না কোন রূপকের সন্ধান পাওয়া যায়। 'কল্পনা-পুরাণ'-বর্ণিত ঢেঁকির কাহিনীতেও আমরা সন্ধান পাই কর্মবাদের; ঢেঁকির উদাহরণ দিয়ে আমাদের শেখানো হয়েছে যে, কর্ম মানুষের অনুগামী হয়; মৃত্যুর পর মানুষ স্বর্গেই যাক আর নরকেই যাক, তার কর্মসমাপ্তি কোনদিন ঘটে না। মর্ত্যে যে চুরি করে, তাকে নরকেই যেতে হবে, কেননা চুরি করার সুযোগ-সুবিধে সেইখানেই মিলবে;

চোরকে যদি ধ'রে বেঁধে স্বর্গে নিয়ে যাওয়া হয়, তা হ'লে তাকে ডাঙায় তোলা মাছের মত খাবি খেতে হবে। স্বর্গে তার চুরি চালাবার মত অভাব আর স্বভাব দুইই থাকবে না। স্বর্গে কারুর কোন অভাব নেই, চাইলেই সেখানে সব জিনিস পাওয়া যায়; সেখানে এক অপরূপ সাম্যবাদ চালু আছে। সোভিয়েট-সাম্যবাদে আগে খাটুনি, তারপরে খাবার; কিন্তু স্বর্গীয় সাম্যবাদে না খেটেই খাবার জোটে; সোভিয়েটে সর্বাধিনায়ক মাত্র একজন, আর স্বর্গে 'বিগ থ্রী'। এ হেন অভাবহীন স্বর্গে চুরি করবে কে? স্বভাবের ব্যাপারটাও ওই রকম; চোরের সাহচর্যে সাধুও যেমন চোর হয়, দেবতার সাহচর্যে চোরও দেবতা না হয়ে পারে না। কাজেই মর্ত্যের চোরকে মরণের পর নরকেই যেতে হবে; আর যদি সে মর্ত্যেই আবার ফিরে আসে, তা হ'লে সে নিঃসন্দেহে উন্নততর চোর বা ডাকাত হবে; কেননা পূর্বজন্মের সুকৃতির বলে সে ভূমিষ্ঠ হবে প্রথমভাগ দ্বিতীয়ভাগ শেষ ক'রেই, তার হাতেখড়ি হবে একেবারে বোধোদয়ে।

কর্মফলই মানুষকে স্বর্গে নিয়ে যায়, নরকে নামায়, আবার পুনর্মূষিক করে। সৎ, সত্য আর সুন্দর—এই তিন সেরা জিনিস নিয়েই স্বর্গের সংসার; মর্ত্যের সংসারে যিনি এই সেরা জিনিসগুলি নিয়ে জীবন কাটাবেন, তাঁর স্বর্গে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই, কেননা নরকে এগুলি অচল। স্বর্গে যাবার পথ অতি সঙ্কীর্ণ ও দুর্গম; কিন্তু নরকের পথ অতি দরাজ ও সুগম, সেখানে যাবার উপায়ও অসংখ্য। মর্ত্যের মানুষ জীবিকা অর্জনের জন্যে অসংখ্য উপায় অবলম্বন করে—কেউ কেরানী, কেউ মাস্টার, কেউ জন-মজুর, কেউ উকিল, কেউ ব্যারিস্টার, কেউ ডাক্তার, কেউ ব্যবসাদার, কেউ লেখক, কেউ সাংবাদিক, কেউ গায়ক, কেউ নর্তক, কেউ বাদক, কেউ অভিনেতা; এমনি কত উপায়ে মানুষ (স্বাধীনা মেয়েমানুষও) জীবিকা অর্জন করে। ইহজীবনভোর যে যা করলে, পরজীবনেও তাকে তাই করতে হবে। এত রকমের কর্মসংস্থান স্বর্গে যদি সম্ভব হয়, তা হ'লে মানুষ স্বর্গে যেতে পারে;

তা না হ'লে নরকগমন খণ্ডায় কে? এখন একটু তলিয়ে দেখা যাক, স্বর্গে কোন্ কোন্ কাজের চাহিদা আছে।

কেরানী—স্বর্গে সবই নগদা-নগদি ব্যাপার, হিসেবের ধার বিশেষ কেউ ধারে না। একটু আধটু হিসেব যা রাখতে হয়, তা কলমবাজ চিত্রগুপ্তই রাখেন; তিনি রিটায়ার করার নামই করেন না। তাই স্বর্গে কেরানীর 'নো ভেকানসি,' নরকে কিন্তু কেরানীদের জন্যে বিরাট এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ খোলা আছে।

মাস্টার—স্বর্গে সবাই ত্রিকালজ্ঞ ও সর্বজ্ঞ; সেখানে কে কাকে কি শেখাবে? মাস্টারের কোন ছাত্র জুটবে না, কাজেই স্বর্গে তার ঠাঁই নেই।

জন-মজুর—দেবতাদের তল্পি বইতে, স্বর্গের উদ্যানগুলির দেখাশোনা করতে, ধানের চাষ করতে জনমজুর চাই; তবে কলের কুলির দরকার নেই, কেননা সেখানে কল-কারখানা নেই।

উকিল-ব্যারিস্টার—মিথ্যা আর অ-ন্যায় নিয়ে যাদের কারবার, তারা কি জন্যে স্বর্গে যাবে? চিরশান্তির দেশে ঝগড়া-মারামারি কাড়াকাড়ি কিছুই নেই, তাই আইন-আদালতের বালাই নেই। যাদের এখানে যতখানি 'রোরিং প্র্যাকটিস,' নরকেও তাদের পশার ততখানি জমবে; কিন্তু স্বর্গে তাদের 'নো-অ্যাডমিশন'।

ডাক্তার—স্বর্গ যে নিরোগ, তা অনায়াসেই সেই ধ'রে নেওয়া যেতে পারে; সেখানে যদি রোগ থাকত, তা হ'লে কি আর দুই অশ্বিনীকুমারে তেত্রিশ কোটিকে সামলাতে পারত? তা ছাড়া যে সমস্ত দেবদেবীকে তুষ্ট ক'রে আমরা রোগমুক্তি লাভ করি, তাঁরা সশরীরে স্বর্গে বিদ্যমান; স্বর্গবাসীরা এমন কোন অপকর্ম করেন না, যার জন্যে মড়ক আমদানির প্রয়োজন হতে পারে। তাই স্বর্গে ডাক্তারি একেবারে অচল।

ব্যবসাদার—সকল অনর্থের মূল অর্থ; এই অর্থের মাধ্যমে চলে পৃথিবীর কারবার। শান্তির স্বর্গে এই অনর্থকারী অর্থ প্রবেশ করতে

পারে না, তাই সেখানে কারবারও চলতে পারে না। স্বর্গে যার যা দরকার, তা চাইলেই পায়; দিব্যি খেয়ে প'রে অমৃত পান ক'রে দেবতারা নিশ্চিন্তমনে গান-বাজনা শুনে, নাচ দেখে কাটাচ্ছেন; কারবারের ঝামেলায় তাঁরা যাবেন কেন? তাই কারবার জমাবার উপযুক্ত স্থান নরক।

লেখক—লেখকদের ব্যাপারটা খুবই গোলমেলে। আমরা মানুষ, তাই নরনারীর সুখদুঃখের কাহিনীই আমরা পড়তে ভালবাসি; কাহিনীতে দেবতা এলেই আমরা নাক সিঁটকে বলি—ওটা সেকেলে, ক্ল্যাসিক্। দেবতাদের বেলায়ও ঠিক তাই; দেব-দেবীর লীলা-কাহিনীতেই তাঁদের আনন্দ। যে সব লেখক দেব-দেবী নিয়ে সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন, স্বর্গে তাঁদের খুব কদর; তাঁদের লেখা প'ড়ে দেবতারা আনন্দ পান। বাল্মীকি, হোমার, কালিদাস, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, মিল্‌টন, মাইকেল প্রভৃতি অসংখ্য কবি স্বর্গের সাহিত্য-বাসর জমিয়ে ব'সে আছেন। কিন্তু কাহিনীতে যারা মানুষ ঢুকিয়েছে, তারা কোন্ মুখে স্বর্গে যাবে? মানুষের কবি রবীন্দ্রনাথ "স্বর্গ হইতে বিদায়" নিয়ে এসেছিলেন এই ধরণীর ধূলির 'পরে; ঐ কবিতাটি স্বর্গে 'প্রস্‌ক্রাইব্‌ড্' হয়ে আছে; এই অবস্থায় তাঁকে যদি আবার স্বর্গে যেতে হয়, দেবতারা তাঁকে নিশ্চয়ই নাকে-খৎ দেওয়াবেন; তবে রবীন্দ্রনাথ নাকে-খৎ দিয়ে স্বর্গে যাবার পাত্র নন, মাটির পৃথিবীর ওপরেই তাঁর লোভ বেশি। এই থেকেই বোঝা যাবে, নরনারীসর্বস্ব আধুনিক সাহিত্যের কদর স্বর্গে হওয়া সম্ভব নয়; আর এই সাহিত্যের স্রষ্টারাও স্বর্গে যেতে পারে না।

সাংবাদিক—মিথ্যের সঙ্গে সত্য ভেজাল দিয়ে সুস্থ লোককে ব্যতিব্যস্ত করাই হ'ল সাংবাদিকের কাজ; রাজনীতিতে সাংবাদিক হ'ল 'নেসেসারি ইভিল'। রাজনীতিহীন স্বর্গে সাংবাদিকের কোনও দরকার নেই। তা ছাড়া ত্রিজগতের সমস্ত ঘটনা তো দেবতারা স্বচক্ষেই দেখেছেন; প্রত্যক্ষদর্শীর কাছে সংবাদপত্র নিরর্থক, সাংবাদিক

অনাবশ্যক ; নরকই তাদের যোগ্য স্থান, যাকে গুলজার করতে অনেক সাংবাদিকের প্রয়োজন।

গায়ক, বাদক, নর্তক, অভিনেতা—এক কথায় এরা আর্টিস্ট ; এদের মধ্যে যারা নারী, তারা সবাই দেবীত্ব লাভ করেছে এবং যোগ্য পূজাও পাচ্ছে ; মরণের পরে তারা নিশ্চয়ই অক্ষয়স্বর্গ লাভ করবে, ফলে উর্বশী মেনকারা একটু রিলিফ পাবে। মুশকিল বাধবে পুরুষ আর্টিস্টদের নিয়ে ; লেখকদের মত এদেরও স্বর্গগমন নির্ভর করবে সাধনার বিষয়-বস্তুর ওপর। দেবতাকে কেন্দ্র ক'রে যারা চালাবে শিল্পসাধনা, যারা করবে দেব-দেবীর রূপগুণকীর্তন ; যারা গাইবে দেবতার ভজন, তারা স্বর্গে গিয়ে নারদের সঙ্গে দোয়ার্কি করবে। আর যাদের গানের একমাত্র বিষয়বস্তু হ'ল ব্যর্থ প্রেম আর অপূর্ণ কাম, চিরমিলনের স্বর্গে তারা কি ক'রে যাবে? যমদূত বেচারী সবচেয়ে মুশকিলে পড়বে অভিনেতাদের নিয়ে ; আজ যে ভক্তিমান নারদ, কালই হয়তো সে ভ্রাতৃহত্যাকারী আওরঙ্গজেব! দুটো অভিনয়ই তার অনবদ্য ; একটিতে তার স্বর্গে যাওয়া উচিত, আর একটিতে নরকে। এ হেন অভিনেতাকে যমদূত কোথায় চালান দেবে কে জানে?

* * * *

স্বর্গে সবই অনন্ত—অন্ত ব'লে কিছুই নেই ; যেন দৃশ্যের পর দৃশ্য থিয়েটার হচ্ছে, যবনিকা পড়ছে না। সেখানে সুখ শান্তি আনন্দ জীবন—সবই অনন্ত অক্ষয়, কেউ সেখানে মরবার নাম করে না। বছর ঠিক চলছে, অথচ কেউ বুড়ো হচ্ছে না (ভারতীয় নেতার মত)। সমুদ্রমন্থনের পর সেই যে উর্বশী নেচে স্বর্গ মাত করেছিল, সেই উর্বশী আজও মিস্ প্যারাডাইস্ হয়ে রয়েছে। জন্ম মৃত্যু না থাকাতে দেবতার সংখ্যা তেত্রিশ কোটিতেই থেমে আছে ; সংখ্যার নড়চড় হচ্ছে না, তাই সেন্‌সাস নেবারও প্রয়োজন হচ্ছে না। পৃথিবীতে উন্নতি ক'রে এ পর্যন্ত যে সব লোক স্বর্গে যেতে পেরেছে, তারা সংখ্যায় এত অল্প যে তেত্রিশ কোটিকে তারা নড়চড় করাতে পারে নি।

এখন বোঝা যাচ্ছে, স্বর্গ আর নরক বহুদূরের জিনিস নয়; মানুষের কর্মপ্রচেষ্টার মধ্যেই তার দূরত্ব নির্ভর করছে। একটি কাজের জোরেই এক লাফে নরকে যাওয়া যায়; আর একশোটি কাজ ক'রেও স্বর্গে যেতে কালঘাম ছুটে যায়। চুলে পাক ধরলেই মানুষ বুঝতে পারে, ওপারের সমন এল, নির্ধারিত দিনে আদালতে হাজির হতে হবে। ওপারটা উপরে কি নীচে তা ঠিক করা বিশেষ শক্ত নয়। আমার নামেও সমন এসে গেছে। কেরানীগিরি ক'রে জীবন কাটাচ্ছি, কাজেই আমার কপালে উর্ধ্বগমন নেই, আমায় অধোগমন করতেই হবে। তাই যোগ্যতা, পূর্ব-অভিজ্ঞতা, প্রশংসা-পত্র প্রভৃতি দিয়ে বেশ ক'রে গুছিয়ে একখানা দরখাস্ত লিখে রাখছি, নরকে গিয়েই এম্প্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জের রিজিওনাল অফিসারের কাছে সাবমিট করব; আপনারা যদি কেউ একটু তদবির করেন, তা হ'লে হয়তো চাকরিটা একটু তাড়াতাড়ি পেয়ে যেতে পারি। গরিবকে কেউ সাহায্য করবেন না?

শ্রীপ্রবোধকুমার চট্টপণ্ডী

আদিবাসীদের অনুকরণে

মিনারে তখন ঝরা সূর্যের আলো
ভিন্‌দেশী মেয়ে নামল এখানে এসে।
হে রূপকন্যা, বলো
তুমি কি আমায় কখনো বাসবে ভালো!

ভিনদেশী মেয়ে নামল এখানে এসে।
কন্যা, তোমার কি আশ্চর্য চুল!
হে রূপকন্যা, শোনো
বিকেল গড়িয়ে রাত্রি নামবে শেষে।

কন্যা, তোমার কি আশ্চর্য চুল!
না হয় ক্ষণেক আমার ঘরেই এলে—
হে রূপকন্যা, জানো
তোমাকে পরাব দোলন-চাঁপার ফুল।

শ্রীপ্রণব মিত্র

মহারাজা নন্দকুমার

ফাঁসির বিবরণ

(১) প্রকাশ্যস্থানে ফাঁসি দিবার ব্যবস্থা

১৭৭৫, ৫ই আগস্ট ফাঁসির দিন স্থির ছিল। কলিকাতা ফোর্টের উত্তর দিকে কুলি স্ট্রীট বলিয়া একটি রাস্তা ছিল। তখনকার দিনের হেস্টিংস ব্রীজের সন্নিকটে ঐ রাস্তা। ঐ স্থানে উন্মুক্ত মাঠের মধ্যে ফাঁসির মঞ্চ নির্মিত হয়। কারাগারের মধ্যে লোকচক্ষুর অন্তরালে ফাঁসি দেওয়া হইল না। হেস্টিংস বোধ হয় দেশীয় জনতাকে ভীত করিবার উদ্দেশ্যেই প্রকাশ্য ফাঁসির ব্যবস্থা করাইয়াছিলেন। প্রকাশ্যে ফাঁসি দেওয়া বর্বর যুগের প্রথা। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকেও ইংরেজদের শ্লীলতাবোধ বিস্তার লাভ করে নাই। নন্দকুমারের মত সে সময়কার দেশীয় সমাজের শীর্ষস্থানীয় সম্ভ্রান্ত এবং প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিকে প্রকাশ্যে ঘটা করিয়া বধ করায় ইংরেজজাতি কলঙ্কিত হইয়াছে। কোম্পানির যে কর্মচারীগণের অসদাচরণের বিরুদ্ধে নন্দকুমার সাহসের সঙ্গে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন, তাঁহারা এই প্রকাশ্য ফাঁসিতে উল্লাস প্রকাশ করিয়াছিলেন সন্দেহ নাই। কিন্তু আমরা ইহাকে হৃদয়হীনতা এবং নিষ্ঠুরতার চরম দৃষ্টান্তস্বরূপই মনে করিব। তথাপি এই প্রকাশ্য হত্যা দেশবাসীর হৃদয়ে বাঙালী বীরের মৃত্যু-আলিঙ্গনের যে উজ্জ্বল চিত্র অঙ্কিত করিয়া গিয়াছে, তাহার একটি মূল্য আছে।

সে সময় কোনও সংবাদপত্র ছিল না। ভাগ্যক্রমে ডক্টর বাস্টিডের *Echoes from Old Calcutta* পুস্তকে এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের প্রত্যক্ষদর্শীর বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া গিয়াছে (ঐ পুস্তকের পৃ. ৯৪ দ্রষ্টব্য)।

(২) প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ

অ্যালেক্জাণ্ডার ম্যাক্‌ক্রাবি তখন কলিকাতার সেরিফ (Sheriff) ছিলেন। সেরিফস্বরূপে তাঁহার কর্তব্য ছিল, ফাঁসির সময় উপস্থিত

থাকা। তিনি যে দীর্ঘ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহার পূর্ণ অনুবাদ এই —

"অনেকে মনে করিয়াছিলেন যে, ফাঁসির মঞ্চে আরোহণের পূর্বে মহারাজা নন্দকুমার সাধারণকে উদ্দেশ করিয়া একটি ভাষণ দিবেন। সেই কথা শুনিয়া আমি সেই সময়কার ঘটনাগুলির যথাযথ বিবরণ লিখিতে বসিয়াছি। ফাঁসির আগের দিন সন্ধ্যায় আমি কারাগারে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাই। সেই সময় এবং ফাঁসির সময় যাহা ঘটিয়াছিল সবই লিখিয়া রাখিতেছি। সব ঘটনাই আমার পরিষ্কারভাবে মনে আছে।

"শুক্রবার সন্ধ্যা ৪ঠা আগস্ট।

"আমি কারাগারে মহারাজের নির্দিষ্ট কক্ষে প্রবেশ করা মাত্র তিনি উঠিয়া রোজকার মত আমাকে নমস্কার জানাইলেন। আমরা উভয়ে আসন গ্রহণ করিবার পর তিনি সহজভাবেই কথাবার্তা বলিতে লাগিলেন। তাঁহার এই স্বাচ্ছন্দ্য ও নিরুদ্বেগ ভাব দেখিয়া আমার সত্যই সন্দেহ হইয়াছিল যে, মহারাজ তাঁহার আসন্ন দুর্ভাগ্যের বিষয় হয়তো সম্যক উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। তাই আমি দোভাষীকে দিয়া রাজাকে জানাইলাম যে, আমি রাজাকে শেষ বারের মত শ্রদ্ধা-ভক্তি জ্ঞাপন করিতে আসিয়াছি। তাঁহাকে আমি আশ্বাস দিলাম আগামী কাল সকালে যে করুণ ও নিদারুণ ঘটনাটি ঘটিবে সে সময় তাঁহাকে একটু আরাম ও শান্তি দিবার জন্য সব রকমের সাহায্য আমরা করিব। আমার চাকরির কর্তব্য-খাতিরে এই কার্যে আমার উপস্থিত না থাকিয়া উপায় নাই; কিন্তু ইহাতে অংশ গ্রহণ করিতে আমার মন উঠে না। আমি শেষ পর্যন্ত রাজার সঙ্গে থাকিব এবং রাজার শেষ ইচ্ছা পূরণ করিবার চেষ্টা করিব। রাজা নিজের পালকিতেই যাইবেন এবং সঙ্গে তাঁহার নিজের ভৃত্যগণ থাকিবে। রাজার যে বন্ধুরা ঐ সময় উপস্থিত থাকিবেন, তাঁহাদের আমরা রক্ষা করিব।

"রাজা আমাকে এই সৌজন্যের জন্য ধন্যবাদ জানাইলেন এবং

তাঁহার পরিবারের প্রতি এইরূপ মনোভাব রাখার জন্য আমাকে অনুরোধ করিলেন। তাঁহার বিশ্বাস যে, বিধিলিপি কেহ খণ্ডন করিতে পারে না। তাই ললাটে অঙ্গুলি স্পর্শ করিয়া কহিলেন, ভগবানের ইচ্ছা অবশ্যই পূর্ণ হইবে। তিনি আমাকে জেনারেল কর্নেল জনসন ও মিঃ ফ্রান্সিসকে তাঁহার শ্রদ্ধা ও সম্ভাষণ জানাইয়া দিবার জন্য অনুরোধ করেন। তাঁহার প্রার্থনা ছিল যে উক্ত মহোদয়গণ যেন রাজা গৌরদাস (গুরুদাস) ও তাঁহার পরিবারকে রক্ষা করেন এবং গৌরদাসকে (গুরুদাস) ব্রাহ্মণ-প্রধান বলিয়া মানিয়া লন। তাঁহার চিত্তসংযম আশ্চর্যজনক ছিল। একটি দীর্ঘশ্বাসও তিনি ফেলেন নাই, গলার স্বর বা মুখ একটি বারের জন্যও বিকৃত হয় নাই। অথচ অল্লক্ষণ আগেই তিনি তাঁহার জামাতার নিকট হইতে চিরবিদায় লইয়াছিলেন। তাঁহার মত মনোবল আমার ছিল না। আমি আর সেখানে থাকিতে পারিলাম না। নীচে আসিলে জেলার আমাকে জানাইলেন যে, রাজার বন্ধুরা দেখা-সাক্ষাৎ সারিয়া চলিয়া গেলে তিনি নিত্যকার মত হিসাব লেখার কাজ করেন। এতক্ষণে আমি বুঝিতে পারিলাম যে, পরদিন প্রভাতে মৃত্যু নিশ্চিত জানিয়া তিনি প্রস্তুত হইয়াই ছিলেন। শনিবার সাতটার সময় আমার কাছে খবর আসিল যে, জেলে ফাঁসির সব আয়োজন করা হইয়াছে। আমি সাড়ে সাতটায় সেখানে পৌছিলাম। যাহারা রাজাকে শেষ দেখা দেখিতে আসিয়াছিল, তাহাদের কাতর ক্রন্দন ও বিলাপের বিবরণ দেওয়াই বাহুল্য। ফাঁসির তিন ঘণ্টা পরে আমি বিবরণটি লিখিতে বসিয়াছি। এখন পর্যন্ত আমি আমার বিচলিত ভাব কাটাইয়া উঠিতে পারি নাই। আমি আসিয়াছি— এই খবর পাইয়াই রাজা নীচে আসিয়া জেলারের ঘরে আমার সহিত মিলিত হইলেন।

"তাঁহার আচরণে দ্বিধার চিহ্ন ছিল না। তিনি প্রফুল্লভাবে ঘরে ঢুকিয়া আমাকে নমস্কার জানাইলেন এবং আমি আসন গ্রহণ না করা পর্যন্ত দাঁড়াইয়া রহিলেন। তারপর একজনকে ঘড়ির প্রতি চাহিয়া

থাকিতে দেখিয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া কহিলেন, তিনি প্রস্তুত আছেন, এবং যে তিনটি ব্রাহ্মণের শেষ পর্যন্ত থাকিবার কথা ছিল তাহাদের একে একে সস্নেহে আলিঙ্গন করিলেন। তাহারা শোকে বিচলিত ছিল, কিন্তু রাজার মুখে বা মনে বিষাদের কোনও চিহ্ন ছিল না। আমি তাঁহাকে জানাইলাম যে, আরও সময় পাওয়া যাইতে পারে এবং মহারাজা প্রস্তুত না হওয়া পর্যন্ত আমি অপেক্ষা করিব ও তিনি ইঙ্গিত না করা পর্যন্ত আমি আসন ছাড়িয়া উঠিব না। তাঁহাকে এ কথাও জানানো হইল যে, ফাঁসির সময় তাঁহার ইঙ্গিত পাইলে তবে শেষ অনুষ্ঠানটি শুরু হইবে। ইহার পর আমরা আরও ঘণ্টাখানেক একত্র ছিলাম। তখন তিনি কয়েকবার আমার সঙ্গে রাজা গৌরদাস (গুরুদাস), জেনারেল কর্নেল জনসন ও মিঃ ফ্রান্সিসের বিষয় উল্লেখ করিয়া কথা বলেন। কিন্তু তাঁহার কোনও উদ্বেগ আমি দেখি নাই। বেশির ভাগ সময়ই তিনি প্রার্থনা করিয়া কাটান। তখন তিনি মালা জপ করিতেছিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার ঠোঁট নড়িতেছিল। তারপর তিনি আমার দিকে চাহিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং জেলের ভৃত্যদের ডাকিয়া বলিলেন যে, তিনি যদি কোন কার্য ভুলিয়া গিয়া থাকেন তবে সেগুলি যেন রাজা গৌরদাস (গুরুদাস) দেখিয়া লন। তারপর তিনি প্রফুল্লভাবে হাঁটিয়া ফটক পর্যন্ত গেলেন এবং নিজের পালকিতে বসিলেন। যেন কিছুই বিশেষ ঘটে নাই—এই ভাবে তিনি চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন।

"আমি ও ডেপুটি শেরিফ তাঁহাকে অনুসরণ করিলাম। পথে উল্লেখযোগ্য কিছুই ঘটে নাই। ফাঁসির জায়গায় বিরাট জনসমাগম হইয়াছিল, কিন্তু জনতা উত্তেজিত হয় নাই।

"বেহারাদের কাঁধে পালকির মধ্যে বসিয়া রাজা প্রথমে কিছু মনোযোগ দিয়া এই দৃশ্য দেখিতেছিলেন। ফাঁসির মঞ্চ ও সেখানকার অনুষ্ঠান দেখিয়া তাঁহার কোনরূপ পরিবর্তন হইল না। তাঁহার মুখে বা চেহারায় কোনরূপ বিকৃতি আমি দেখিলাম না। তিনি ব্রাহ্মণদের

খোঁজ করিলেন। তাহারা তখনও আসিয়া পৌঁছায় নাই। এই সময় তাঁহার একটু ব্যগ্রতা দেখিলাম, সম্ভবত তিনি আশঙ্কা করিতেছিলেন যে, তাহারা আসিবার আগেই তাঁহার ফাঁসি হইয়া যাইবে। আমি তাঁহাকে আশ্বাস দিলাম, আমি তাঁহার সময় না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করিব। সবে সেটা প্রাতঃকাল। কোন তাড়া ছিল না। ব্রাহ্মণরা আসিবার পরই আমি কর্মচারীদের সরাইয়া দিতে চাহিলাম, কারণ আমি মনে করিয়াছিলাম যে রাজার হয়তো ব্রাহ্মণদের নিকট কিছু বলিবার আছে। তিনি ইঙ্গিতে নিষেধ করিলেন। বলিলেন যে, তাঁহার বিশেষ কিছুই বলার নাই। তিনি ব্রাহ্মণদের শুধু পুনরায় স্মরণ করাইয়া দিতে চান যে, তাহারা যেন রাজা গৌরদাস (গুরুদাস) ও তাহার অন্তঃপুরিকাদের দেখাশুনা করার ভার লন। তারপর তিনি আমাকে বলেন যে, যে ব্রাহ্মণেরা তাঁহার মৃতদেহ সৎকারের জন্য লইয়া যাইবে তাহাদের যেন বাহিরের লোকেরা কেহ না ছুঁইয়া দেয়—এইটি যেন আমি দেখি। তিনি বার বার ঐ ইচ্ছাই প্রকাশ করেন। তাঁহার চতুর্দিকের লোকের ভিড় দেখিয়া তিনি বিন্দুমাত্র ভীত বা বিচলিত হন নাই। তথাপি লোকগুলির অপটুতার জন্য ও নানা আয়োজনে খানিকটা দেরি হইয়া গেল। রাজার দেরি করার ইচ্ছা ছিল না। তিনি বার বার আমাকে জানাইতেছিলেন যে, তিনি প্রস্তুত। আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তিনি আর কোনও বন্ধুর সঙ্গে দেখা করিতে চান কি না? তাহাতে তিনি উত্তর দেন যে, তাঁহার অনেক বন্ধু আছে, কিন্তু এটি বন্ধুর সহিত সাক্ষাতের উপযুক্ত স্থান ও কাল নয়। তাঁহার বোধ হয় আশঙ্কা ছিল যে, ভিড়ের মধ্য দিয়া বন্ধুরা তাঁহার কাছে আসিতে পারিবেন না। যাহা হউক, তিনি একজনের নাম উল্লেখ করিলেন। তাহার নাম ধরিয়া ডাকা হইল, কিন্তু রাজা তৎক্ষণাৎ বলিতে শুরু করিলেন, 'উহাকে ডাকিয়া কোন ফল হইবে না, হয়তো আসে নাই।' আমাকে তিনি অনুরোধ করিলেন, আমি যেন জেনারেল ক্লেভারিং, কর্নেল জন্‌সন্‌ ও মিঃ ফ্রান্সিসকে তাঁহার কথা স্মরণ

করাইয়া দিই। এই সময় তিনি খুবই শান্তভাবে ছিলেন। তারপর তিনি পালকির মধ্যে হেলান দিয়া বসিয়া আবার জপ করিতে লাগিলেন।

"তিনি শেষ অনুষ্ঠানটির জন্য কি রকম ইঙ্গিত করিবেন জিজ্ঞাসা করায় জানান যে, তিনি প্রস্তুত হইলে হাত দিয়া ইঙ্গিত করিবেন, কারণ কথা বলিলে ভিড়ের মধ্যে শোনা যাইবে না। কিন্তু ফাঁসির সময় হাত বাঁধা থাকে—এ কথা তাঁহাকে জানানো হয়, এবং আমি তাঁহাকে পা দিয়া সংকেত করিতে বলি। তাহাতে তিনি রাজী হন। এখন শেষ করুণ দৃশ্যটি ছাড়া আর কোন কার্য বাকি রহিল না। আমি তাঁহার পালকি ফাঁসির মঞ্চের নিকট আনিতে আদেশ দিলাম, কিন্তু তিনি হাঁটিয়াই আসিলেন, এবং তাঁহাকে এত সোজা হইয়া হাঁটিতে আমি দেখি নাই। মঞ্চের সিঁড়ির নিচে তাঁহার হাত বাঁধিয়া দেওয়া হইল। তিনি তখনও যেন কিছু ঘটে নাই—এই ভাবে চারিদিকে তাকাইতেছিলেন। তাঁহার মুখে কাপড় বাঁধা লইয়া একটু অসুবিধা হয়। তিনি বলিয়াছিলেন যে, আমরা কেহ তাহা করিতে পারিব না। আমি এক ব্রাহ্মণ পুলিস কর্মচারীকে ঐ কাজ করিতে বলিলাম, কিন্তু রাজা তাহাতে রাজী হইলেন না। তাঁহার পায়ের কাছে তাঁহার একজন ভৃত্য পড়িয়া ছিল, তাহাকে ডাকিয়া মুখ বাঁধিতে বলিলেন। তাঁহার পা দুটি দুর্বল ছিল এবং হাত বাঁধা থাকায় সিঁড়ি দিয়া উঠিতে তাঁহার বেশ কষ্ট হইতেছিল। কিন্তু তিনি কোনও রকম অনাগ্রহ প্রকাশ না করিয়া উপরে উঠিতে লাগিলেন। তারপর তিনি মঞ্চের উপর সোজা হইয়া দাঁড়াইলেন। যতক্ষণ তাঁহার মুখ ঢাকা না হইল ততক্ষণ আমি নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাঁহাকে লক্ষ্য করিতেছিলাম, যদি এতটুকু ভীতি বা আশঙ্কার ভাব তাঁহার মুখে দেখিতে পাই। কিন্তু তাহার কোন চিহ্নও দেখিতে পাইলাম না। আমি আর স্থির থাকিতে পারিলাম না। নিজের পালকিতে গিয়া বসিয়া পড়িলাম। আমি বসিবার আগেই রাজা তাঁহার শেষ সঙ্কেতটি জানাইয়া দিলেন।

তাঁহার পায়ের নীচের মঞ্চটি সরাইয়া লওয়া হইল। আমি যখন প্রকৃতিস্থ হইলাম তখন দেখিলাম, তাঁহার হাত দুইটি সেই ভাবেই আবদ্ধ আছে, মুখের যে অংশটুকু দেখা যাইতেছিল তাহাতে কোন বিকৃতি ছিল না। এই যে একটি শোকাবহ ঘটনা ঘটিল ইহার প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত রাজার দৃঢ়তা, স্থিরতা এবং স্থিরপ্রতিজ্ঞা জগতে একটি আদর্শ স্থাপন করিল। জগতে দৃঢ়তা ও ধৈর্যের যতগুলি আদর্শের কথা আমার জানা বা পড়া আছে, তাহার কোনটা অপেক্ষা ইহা কোন অংশে ছোট নহে।

"নির্ধারিত সময় পর্যন্ত ফাঁসির রজ্জুতে আবদ্ধ রাখার পর মৃতদেহ ব্রাহ্মণদের হাতে সৎকারের জন্য দেওয়া হইল।"

(৩) ফাঁসির পরে

যে জনতা ফাঁসির সময় উপস্থিত ছিল তাহারা শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ভাবিয়াছিল যে, কোনও অদৃশ্য শক্তি আসিয়া এই অকারণ ব্রহ্মহত্যা নিবারণ করিবে। কিন্তু যখন নন্দকুমারের দেহ লইয়া ফাঁসির মঞ্চ নীচে নামিয়া গেল, তখন সকলেই দুঃখে ও ভয়ে "হায় হায়" করিয়া আর্তনাদ করিতে করিতে গঙ্গাতীরে ধাবমান হইল এবং গঙ্গাসলিলে অবগাহন করিয়া ব্রহ্মহত্যাদর্শনের পাপ ধৌত করিতে লাগিল।

সার্ গিল্‌বার্ট ইলিয়ট এই মর্মস্পর্শী বিবরণটি পার্লামেণ্টে ইম্পের ইম্‌পিচ্‌মেণ্টের সময় সমস্তই পাঠ করিয়াছিলেন। মৃত্যুকালে নন্দকুমারের এই বীরোচিত দৃঢ়তা এবং স্থিরচিত্ততার সংবাদ পাইয়া ইংলণ্ডের জনসাধারণও বিচলিত হইয়াছিলেন। তখনকার অনেক সংবাদপত্রে ম্যাক্‌ক্রাবির এই বিবরণটি মুদ্রিত হয়।

যে মেকলে বাঙালীর নিন্দায় পঞ্চমুখ তিনিও এই রিপোর্ট পড়িয়া এই মন্তব্য করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।—

But the Bengalee who would see his country over-run, his house laid in ashes, his children murdered or dishonoured without having the spirit to strike one blow, has yet been known to endure torture with the firmness of Mucius and to mount the scaffold with the steady steps and even pulse of Algernon Sidney.

নন্দকুমারের মৃত্যুকালীন দৃঢ়তা-বীরত্বের সঙ্গে একটি গ্রীক বীর আর সপ্তদশ শতাব্দীর ইংলণ্ডের রিপাব্লিকান পার্টির মৃত্যুদণ্ডে-দণ্ডিত নেতার তুলনা করিয়াছেন। "এ যে বাঁ হাতে প্রশংসা"—left handed compliment যাহাকে বলা হয়।

ইম্পের ইম্‌পিচ্‌মেণ্টের সময় গিল্‌বার্ট ইলিয়ট যে বক্তৃতা দিয়াছিলেন তাহা ইতিহাসে স্থান পাইয়াছে। ডক্টর বাস্টিডের পুস্তকের পৃ. ৯৮ হইতে আরও কয়েকটি কথা উদ্ধৃত করিতেছি—

The humane and intelligent reader will not fail to recollect that in Bengal in 1757 the East India Company's servants with Colonel Clive at their head were guilty of a most infamous forgery in counter-feiting the signature of Admiral Watson to a treaty by which they defrauded Omichand, a Gentoo merchant, of £250,000 promised him. Colonel Clive had even the maliguity in person to inform Omichand of the deception by which he had cheated him. The Colonel's words overpowered him like a blast of sulphur and he fell fainting on one of his attendants.···We first committed a successful forgery on a native of Bengal and gloried in it though it occasioned his death. Soon after we sent out English Judge to establish English laws in that country and with a

justice peculiar to wise and innocent men, a retrospective view of past crime is taken and a native of the country who knew nothing of English laws, is hanged for a crime which we had triumphed in committing Clive was made a peer in England though he committed the same crime for which we hanged Nun Coomar.

ইহার মর্মাংশ পূর্বেই লেখা হইয়াছে বলিয়া অনুবাদ দেওয়া হইল না।

(৪) পার্লামেণ্টে হেস্টিংস অভিযুক্ত

হেস্টিংসকে এড মণ্ড বার্ক যে ভাষায় অভিযুক্ত করেন, তাহার সঙ্গে পাঠকদের পরিচয় হওয়া প্রয়োজন—

I impeach Warren Hastings of high crimes and misdemeanors. I impeach him in the name of the Commons' House of Parliament, whose trust he has betrayed. I impeach him in the name of the English nation whose ancient house he has sullied. I impeach him in the name of the people of India whose rights he has trodden under foot aud whose country he has turned into a desert. Lastly in the name of human nature itself, in name of both sexes, in the name of every age, in the name of every rank, I impeach the common enemy and appressor of all.—Quoted from *Macaulay's Essays*, p. 531.

আমি ওয়ারেন হেস্টিংসকে গুরুতর অপরাধে অভিযুক্ত করিতেছি। আমি কমন্সসভার নাম করিয়া অভিযোগ করিতেছি যে, হেস্টিংস তাঁহাদের বিশ্বাস ভঙ্গ করিয়াছেন।

আমি ইংরেজ জাতির হইয়া অভিযোগ করিতেছি যে, তিনি আমাদের প্রাচীন সুনামে কলঙ্ক লেপন করিয়াছেন।

আমি ভারতবর্ষের অধিবাসীর হইয়া অভিযোগ করিতেছি যে, তিনি তাহাদের সমস্ত অধিকার পদদলিত করিয়া সমগ্র দেশকে মরুভূমিতে পরিণত করিয়াছেন।

অবশেষে মানবচরিত্র ও ধর্মের নামে, নারী-পুরুষ উভয়ের হইয়া, সমস্ত শ্রেণীর লোকের হইয়া আমি হেস্টিংসকে সকলের শত্রু এবং অত্যাচারী বলিয়া অভিযুক্ত করিতেছি।

ইম্‌পিচ্‌মেণ্টের বিস্তৃত বিবরণ এ প্রবন্ধে অবান্তর। এইটুকু মাত্র বলিব হেস্টিংস্‌-ইম্পে এই বন্ধুযুগল পার্লামেণ্টে ভোটাধিক্যে অভিযোগ-মুক্ত হইলেন। ইহাতে আশ্চর্য হইবার কিছুই নাই, কেননা যাঁহারা ভারতবর্ষে ইংলণ্ডের বিস্তৃত সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছেন বা করিতে সাহায্য করিয়াছেন তাঁহাদের শত অপরাধ মার্জনীয়। ইহাই ছিল তখনকার দিনের ইংলণ্ডের রাষ্ট্রনীতি।

তৎকালে কলিকাতায় কয়েকটি বিশিষ্ট ব্যক্তির সহিত নন্দকুমার সম্বন্ধে ডক্টর বাস্টিডের আলাপ হইয়াছিল, তাঁহারা একবাক্যে বলিয়াছেন, নন্দকুমার অপরিণামদর্শীর মত লাটসাহেবের সঙ্গে কলহে লিপ্ত হইয়াই নিজের উপর বিপদ টানিয়া আনিয়াছিলেন এবং তখনকার কলিকাতাবাসী ইংরেজগণও নন্দকুমারের উপর চটিয়া যান এবং জুরির আসন গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে শাস্তি দেন। (*Echoes from Old Calcutta*, p. 396)

উপসংহার

উপসংহারে বলিব ইংরেজদের মধ্যে বহু ন্যায়বুদ্ধিসম্পন্ন উদারহৃদয় ব্যক্তি ইম্পে ও হেস্টিংসকে পার্লামেণ্টে অভিযুক্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু আমরা নন্দকুমারের স্বদেশবাসী তাঁহার জন্য কিছুই করি নাই। তাঁহার সম্বন্ধে ইতিহাস তো একখানা রচিত হয় নাই। এখনও ইম্পের

তৈলচিত্র দ্বারা কলিকাতা হাইকোর্টের একটি কক্ষ কলঙ্কিত হইয়া আছে। এখনও একটি বিশিষ্ট রাস্তা হেস্টিংসের নাম বহন করিয়া আছে। আর আমরা বাঙালী হইয়া তাহা সহ্য করিয়া যাইতেছি।

নন্দকুমার বড়লাটকে অভিযুক্ত করিয়া যে সাহস দেখাইয়াছিলেন, সে সাহসকে শ্রদ্ধা করি। মৃত্যু আসন্ন জানিয়া যে ব্যক্তি স্থির ধীর নিরুদ্বিগ্ন থাকিতে পারেন, যিনি নির্ভয়ে দ্বিধাহীন দৃঢ় পদবিক্ষেপে ফাঁসি-মঞ্চে আরোহণ করিয়া মৃত্যুকে বরণ করিতে পারেন, সেই বীরশ্রেষ্ঠকে পুনঃ পুনঃ স্মরণ করিয়া নমস্কার জানাইব।

পরিশিষ্ট

প্রমথনাথ মল্লিক মহাশয়ের 'কলিকাতার কথা' পুস্তকখানিতে অনেক তথ্য আছে। নন্দকুমার সম্বন্ধেও তিনি কিছু লিখিয়াছেন, কিন্তু পূর্বাপর ঘটনা পরম্পরার বিবরণ বা আলোচনা নাই। তিনি ঐ পুস্তকের ২০১ পৃষ্ঠায় যাহা লিখিয়াছেন, তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম—

"নন্দকুমার ব্রাহ্মণ-সন্তান, তাঁহার ধমনীতে আর্যরক্তস্রোত প্রবহমান, উহার অনন্যসাধারণ শক্তিতে মস্তিষ্কে জ্ঞান বুদ্ধি পুষ্ট হইলেও কালোপযোগী শিক্ষা দীক্ষার অভাবেই উহা তাঁহার কৃতকার্য্যতার সম্পূর্ণ অন্তরায় হইয়াছিল। সে সময়ে সকলেই উচ্চ ইংরাজ কর্ম্মচারী-গণের অনুগ্রহ প্রাপ্তির জন্য অর্থদান তোষামোদ বা কোনরূপ হীন কার্য দোষের মনে করিতেন না। তখন সেই সকল কর্ম্মচারী-গণকে উপেক্ষা করিয়া তাহাদের বিরুদ্ধে বিলাতে অভিযোগ করিলে তাহাদের মনের অবস্থা কিরূপ হইতে পারে উহা অনায়াসে উপলব্ধি করা যায়।...পরাধীনতায় বাঙালীর বিদ্যাবুদ্ধি সম্পূর্ণ রূপে শিক্ষিত ও দীক্ষিত না হইলেও উহার যে স্বাভাবিক স্বতঃসিদ্ধপ্রভাব দ্বারা স্থিধর নন্দকুমারাদির আদর্শে বিলাতের মহাপুরুষগণ মুগ্ধ হইয়াছিল ইহা কি গৌরবের কথা নয়? নিজের স্বার্থ অন্তর্নিহিত না থাকিলে কেহ

কোনো কার্য্য করে না সত্য, কিন্তু নন্দকুমার ভিন্ন কে তখন সাহস করিয়া মুর্শিদাবাদের দরবারের সর্ব্বাপেক্ষা অর্থশালী বলবান মুসলমান কর্ত্তৃপক্ষ রেজাখাঁর সহিত শত্রুতা বা তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত ও বিচার প্রার্থনা করিতে পারিত?...মহারাজ নন্দকুমার সম্পূর্ণ মূর্খ ছিলেন না, তিনি সে কালের উচ্চদরের রাজনৈতিক পুরুষ বলিলে অত্যুক্তি হয় না।...পুরাকালে পুরাণে নিজের হৃদয়াস্থি দ্বারা যে-রূপ দৈত্যবিনাশের সহায়তা করায় দধীচি মুনির নাম চিরস্মরণীয় হইয়া আছে—সেইরূপ মহারাজা নন্দকুমার নানা অনাচারের প্রতিকারের জন্য আপনার ধনমান জীবন সর্ব্বস্ব পণ করিয়া বিলাতে দূতাদি পাঠাইয়া বিচার প্রার্থনা করায় অক্ষয় কীর্ত্তি করিয়াছেন।

"...যদি অতীত ঘটনার দ্বারা সেই ব্যক্তির বিচার করিতে হয় তাহা হইলে সর্ব্বাগ্রে বলিতে হয় যে, সেকালের প্রধান শ্রেণীর ন্যায়পরায়ণ পাশ্চাত্য-শিক্ষিত রাজনৈতিক মহাপুরুষগণ যাঁহারা কখনো নন্দকুমারকে চক্ষে দেখেন নাই তাঁহারা কেন নগণ্য নন্দকুমারের জন্য স্বদেশবাসী প্রসিদ্ধ নরশার্দূলগণের বিরুদ্ধে বিলাতের মহাসভায় বক্তৃতা করিলেন। সেই বক্তৃতায় সাক্ষাৎ সরস্বতীর যেন তাঁহাদের কণ্ঠে অধিষ্ঠান হইয়াছিল বলিয়াই সকলে স্তম্ভিত ও বিস্মিত হইয়াছিল।"

যদি উচ্ছ্বাসবাক্যের মাত্রা কমাইয়া দিয়া প্রমথবাবু প্রতিটি উক্তির সমর্থনে প্রামাণিক গ্রন্থাদির উল্লেখ করিতেন, তাহা হইলে ভবিষ্যৎ পাঠক ও জীবনচরিত-লেখকদের উপকার হইত।

আমি যে সকল পুস্তকের সহায়তা লাভ করিয়াছি, তাহা এই—

1. Beveridge's 'Trial of Nunda Kumar'
2. James Mills' 'History of British India'
3. Dr. Busteed's 'Echoes from Old Calcutta'
4. Rulers of India Series 'Warren Hastings' by J. Trotter
5. 'Macaulay's Essays'

শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন

মালতী বাঁচিতেছে

১

জমিদারের নায়েব ছিল রমাকান্ত। জমিদারের নায়েব প্রজাদের কাছে প্রায় জমিদার। দশ বছরের নায়েবি যে জমিদারী মেজাজ আনিয়া দিয়াছিল সেটা ছয় মাসে একটুও ভাঙে নাই। সরকারী উদ্বাস্তু-ঋণের টাকায় তৈয়ারী টিনের চালের নীচে বাঁশের চাটাইয়ের বেড়ার মধ্যেও রমাকান্তের প্রাক্তন প্রজারা নাচিয়া বেড়ায়। ঘরের মেঝেটা অবশ্য পাকা।

কাজেই কোন ছোট কাজ সে করিতে পারে না।

বেশ তো, ছোট কাজ না কর, কোন বড় কাজই কর।—স্ত্রী মালতী রাগ করিয়া বলে।

বড় কাজ পেলেই করব।—বলিয়া গড়গড়ার নলটা মুখে দিয়া আরামে টানিতে থাকে রমাকান্ত।

গড়গড়াটা রমাকান্ত পাকিস্তান হইতে লইয়া আসিয়াছিল।

মালতী বলে বটে, কিছু কিছুটা সহানুভূতিও বোধ করে। ভাবে, সত্যি তো, যা-তা কাজ কি আর সকলের মত করতে পারে?

নায়েবি কাজটা রীতিমত বড় কাজ বলিয়াই মালতীর ধারণা ছিল।

কিন্তু একটা কিছু না করলে তো আর চলবে না।—মালতী দুঃখের স্বরে বলিয়া উঠে।—যে কটা টাকা নিয়ে এসেছিলে সে তো ফুরিয়ে এল। কত লোকে কত কি করছে! ওই তো মাধববাবু হাটে হাটে কাপড় বিক্রি ক'রে বেশ চালাচ্ছে এখন। কবে বড় কাজ হবে সেই ভরসায় থাকলে—

আঃ, সব সময় বকবক ক'রো না তো।—রমাকান্ত ধমক দিয়া থামাইয়া দেয়।

আবার দিন কতক বকবক করা বন্ধ করিয়া দেয় মালতী। কিন্তু মনের মধ্যে দুর্ভাবনার চাপ বাড়িয়া যায়। নিজে উপার্জন করিয়া স্বামীকে আদরে বসাইয়া খাওয়াইবার সুখস্বপ্ন দেখে। কিন্তু পরক্ষণে দীর্ঘনিশ্বাসের সঙ্গে নিজের উপর রাগ হয় লেখাপড়া শিখে নাই বলিয়া।

সকালবেলায় এক উদ্বাস্তু পরিবারের ছোট একটি মেয়ে দুধ জোগান দিয়া যায়। মাঝে মাঝে ডিম আনিয়া দেয়। একটি ছোট ছেলে মাঝে মাঝে তরকারি লইয়া আসে। মালতী না রাখিলে সে সোজা বাজারে চলিয়া যায়। সন্ধ্যার পরে একজন ঘুঁটে দিয়া যায়।

কিন্তু এই সব কাজ মালতী করিতে পারে না। দুই-তিনটা গাই রাখিয়া দুধ বিক্রয় করিয়া খুকুদের সংসার চলে। কয়েকটা হাঁস পালিলে ডিম বিক্রয় করিয়াও অনেক পয়সা হয়। কিন্তু এসব কাজ, ছিঃ! বড় ছোট কাজ।

রমাকান্তের অসুখ হইয়া পড়ায় বড় কাজের জন্য চেষ্টা করাও বন্ধ হইয়া গেল। ক্ষয়প্রাপ্ত জীবনীশক্তি এবার ভাঙিয়া পড়িল। শয্যাশায়ী হইয়া পড়িল রমাকান্ত।

ডাক্তারী পরীক্ষায় ধরা পড়িল যে, ব্যাধিটাও রমাকান্তের ছোট-খাট নয়। বেশ বড় জাতের। যক্ষ্মা।

তিন মাসের মধ্যে রমাকান্তের জীবনের সঙ্গে সঙ্গে টাকার তহবিলও নিঃশেষ হইয়া গেল। স্বামীর মৃত্যুর পরে অসহায় একাকীত্ব আর ভবিষ্যত্যের অভাব মৃত্যুর মতই অন্ধকারে ডুবাইয়া দিল মালতীকে। মালতী যেন মরিয়া গেল।

শোকের মূর্ছাহত অবস্থা যখন কাটিয়া গেল, তখন বাঁচিয়া থাকা নিরর্থক মনে হইল মালতীর। শুধু নিরর্থক নয়, অসম্ভব। অথচ মরা অত্যন্ত সহজ। একগাছা দড়ি অথবা একটু আফিঙ অথবা গোটা কয়েক করবীফুলের বিচি। সব সমস্যা শোক দুঃখ অতি অল্প সময়ে নিঃশেষে মিটিয়া যায়। তবে কেন? কিসের জন্য? মনে মনে প্রশ্ন তুলিল মালতী। সম্মুখে যতদূর দৃষ্টি চলে তাকাইয়া দেখিল, জীবনটা খাঁ-খাঁ করিতেছে মরুভূমির মত। কোন আশা নাই, ভরসা নাই—শুধু অভাব, শুধু দুঃখ, শুধু জ্বালা।

তবে কেন?

কিন্তু মরা হইল না। একটা মুহূর্ত মালতী একা থাকিবার সুযোগ

পাইল না। রাত্রিতে কাছে শুইয়া রহিল পাশের বাড়ির একটি মেয়ে আর মালতীর গ্রাম-সম্পর্কের পিসীমা। কাজেই বাঁচিতে হইল।

দিন কয়েক আরও বাঁচিবার পর মরিতে ভুলিয়া গেল মালতী। ক্রমে বাঁচিতে আরম্ভ করিল।

নানা লোকে নানা রকমের পরামর্শ দিল মালতীকে।

সেলাইয়ের কাজটা ভাল ক'রে শিখে নাও—একটা পেট তোমার বেশ চ'লে যাবে।

তাঁতের ইস্কুলে ভর্তি হয়ে যাও। কত মেয়ে কাজ শিখছে ওখানে—তোমার কোন ভাবনাই থাকবে না।

পাশের বাড়ির মাধব বলিল, নার্সিং শিখুন আপনি। আমাদের কলোনিতে কোন ধাত্রী নেই। এখানেই বেশ চলবে আপনার।

মাধবের সঙ্গে আগে সোজাসুজি কথা বলিত না মালতী। কিন্তু কখন যে পরদার সঙ্গে দূরত্ব সরিয়া গিয়াছে, মালতী টেরও পায় নাই। তাহার অগোচরেই একসঙ্গে কয়েক ধাপ খসিয়া গিয়াছে। নায়েবের স্ত্রীর তাসের ঘর হইতে নামিয়া মাধবের সামনে দাঁড়াইতে কোন অসুবিধাই হইল না। মুখামুখি দাঁড়াইয়া বলিল, কোথায় শেখা যায়? আমি তো কিছুই জানি নে।

মাধব বলিল, রামকৃষ্ণ আশ্রমে নাকি শেখায়। আপনি যদি বলেন, আমি খোঁজ-খবর নিতে পারি।

মালতী একটু হাসি দেখানো কর্তব্য মনে করিল। হাসিমুখ করিয়া বলিল, আপনারা যদি একটা হদিস ক'রে না দেন, আমি মেয়েমানুষ কি ক'রে কি করব?

তাঁতের ইস্কুলেরও খবর সংগ্রহ করিল মালতী। নিজেই একদিন যাইয়া ছাত্রীদের দুই-একজনের সঙ্গে আলাপ করিয়া আসিল।

কিন্তু কিছু স্থির করিতে না পারিয়া অস্থির হইয়া পড়িল মালতী। তাঁতের ছাত্রীদের সঙ্গে দেখা হইলে তাঁত শিখিবার বাসনা প্রবল হয়। আবার আশ্রমের হাসপাতালে গেলে ধাত্রী হইবার ঝোঁক চাপে

বেশি। তাছাড়া সবই সময়সাপেক্ষ। শিখিতে সময় লাগিবে। মালতীর সময় নাই। অবিলম্বে ব্যবস্থা হওয়া দরকার। বিলম্ব হইলে গায়ের সোনা যা সামান্য অবশিষ্ট আছে, উহাও থাকিবে না।

শেষ পর্যন্ত কোনটাই হইল না। সর্বত্রই আরও অনেক মেয়ে ঘুরিতেছিল। নির্দিষ্ট সংখ্যা পূরণ হইয়া গিয়াছে বলিয়া ফিরাইয়া দিল মালতীকে।

নানা দিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া মালতীর দেহ ক্লান্ত হইয়া পড়িল কিন্তু মনটা ভয়ে ভাবনায় উত্তেজিত ও তীক্ষ্ণ হইয়া উঠিল। আ: বিলম্ব নয়। যা হোক একটা কিছু অবিলম্বে করা দরকার।

২

সেদিন সন্ধ্যায় ক্লান্তপদে রেশনের দোকান হইতে ফিরিতেছিল মালতী। মাধব বাসার সামনে পায়চারি করিতেছিল, একটু কাশিয়া বলিল, কে—বউদি নাকি?

মালতী থামিল। কোন খবর, কোন আশার কথা থাকিতে পারে। বলিল, হ্যাঁ। হাটে যান নি আজ?

না। আজ হাট নেই। আপনার খবর কি?

কিছু খবর নেই ঠাকুরপো। কিন্তু কি যে করব কিছুই ভেবে পাই নে।

মাধব মালতীর বাসার দিকে মুখ করিয়া একটু অগ্রসর হইল। বলিল, ভাববেন না। অত ভাববার কি আছে? একটা ব্যবস্থা হবেই। আমি—আমরা তো আছি।

মালতীকে বাধ্য হইয়াই মাধবের সঙ্গে সঙ্গে চলিতে হইল। বলিল, সে ভরসাই তো করি।

মাধব আরও মৃদুস্বরে বলিল, খুব দরকার হ'লে বলবেন, লজ্জা করবেন না।

মালতী চুপ করিয়া গেল। বুকটা যেন কাঁপিয়া গেল একটু।

সময়, স্থান, অবস্থা আর মাধবের কণ্ঠস্বর মিলিয়া একটা অনির্দেশ্য আশঙ্কার ঢেউ তুলিয়া দিল।

খানিকটা খালি জমির পরেই মালতীর বাড়ি। বাকি পথটুকু উভয়েই নীরবে পার হইয়া গেল। বাড়ির সম্মুখে আসিয়া মালতী দাঁড়াইল। কাজেই মাধবকেও দাঁড়াইতে হইল। মাধব বলিল, আপনার পিসীমা বুঝি নেই আজ?

আছে। কালীবাড়ি গেছে পাঠ শুনতে।

ও, সেই জন্তেই সন্ধ্যে থেকে দেখছি না তাঁকে।

মালতী চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

কিছু দরকার-টরকার হ'লে বলবেন। পর মনে করবেন না।—অর্থটা কথার মধ্যে যেটুকু প্রকাশ করিতে পারিল না, সেটুকু চোখের দৃষ্টিতে ঢালিয়া দিল মাধব। প্রায় অন্ধকারে দৃষ্টিটা মালতীর ভাল চোখে পড়িল না। কিন্তু সর্বাঙ্গে অনুভব করিল। জবাব না দিলে রাগিয়া যাইবে ভয়ে মালতী মৃদুস্বরে বলিল, আচ্ছা। বলিয়াই তৎক্ষণাৎ সচকিত হইয়া উঠিল। চারিদিকে ত্রস্ত দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া করুণকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, আমি যাই ঠাকুরপো। অনেক কাজ আছে।

ঘরে ঢুকিয়া ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া দেখিল, রাস্তায় মাধব তেমনই দাঁড়াইয়া আছে। দরজা বন্ধ করিয়া দিল মালতী। ক্ষণকাল স্থাণুর মত দাঁড়াইয়া থাকিয়া হঠাৎ দ্রুতপদে জানালার পাশে দাঁড়াইয়া উঁকি দিয়া দেখিতে লাগিল। মাধব এক-পা এক-পা করিয়া চলিয়া যাইতেছে আর মালতীর রুদ্ধ দরজার দিকে বার বার ফিরিয়া ফিরিয়া তাকাইতেছে। শরীরটা সিরসির করিয়া উঠিল মালতীর।

তাড়াতাড়ি সরিয়া গিয়া আলোটা জ্বালিয়া লইল। আলো সম্মুখে লইয়া মেঝের উপর শরীরটা ছাড়িয়া দিয়া বসিল। এই দিকটা সে প্রায় ভুলিয়া গিয়াছিল। রমাকান্তের মৃত্যুর সঙ্গে সেও এই দিক দিয়া মরিয়া গিয়াছে বলিয়াই মানিয়া লইয়াছিল। এতদিনের মধ্যে মনেও হয় নাই। মাধব আজ খোঁচা দিয়া সজাগ করিয়া দিল।

মালতীর বয়স ত্রিশ পার হইয়া গিয়াছে। যৌবন বলিতে সাধারণত যে মরীচিকা বুঝায় তাহা তাহার নাই। কিন্তু অনেক দিন পরে আজ মালতী টের পাইল, আসল যৌবনের স্পন্দন তাহার আজও সুস্পষ্ট। সে স্পন্দনের সঙ্গে রমাকান্ত মিশিয়া ছিল। বিধবা মালতী হঠাৎ এবার শিহরিয়া উঠিল সেখানে মাধবকে কল্পনা করিয়া। ছিঃ! ছিঃ! ছিঃ!

মাধব তাহার চোখের মত চাহনি, কুকুরের মত ভঙ্গী আর সাহায্যের প্রস্তাব মিলিয়া একটা অত্যন্ত ঘৃণার বস্তুতে পরিণত হইল মালতীর চোখে। চাপা শব্দে আবার বলিয়া উঠিল, ছিঃ!

কিন্তু অজ্ঞাতসারে একটা স্বস্তির নিশ্বাস বাহির হইয়া আসিল। একটা সঞ্চয়, একটা শেষ আশ্রয়স্থল তাহার নিজের মধ্যেই অস্পষ্টভাবে বোধ করিল মালতী। সেই দৃষ্টিতে মাধব শুধু নৈর্ব্যক্তিক পুরুষ হিসাবে আর একবার ঝলকিয়া উঠিল।

কিন্তু অস্বীকার করিয়া বেগে উঠিয়া দাঁড়াইল মালতী। ওর মত লোকে বলে—দরকার হ'লে বলবেন, লজ্জা করবেন না! টাকা দিতে চায়!

পরের দিনই মালতী পাড়ার হরিমোহনের কাছে গেল বিড়ির কাজ শিখিতে। হরিমোহন বিড়ির ব্যবসা করে। নিজে বিড়ি তৈয়ারি করিয়া হাটে হাটে বিক্রি করে।

বারান্দায় মাদুর বিছাইয়া বসিয়া হরিমোহন বিড়ি বানাইতেছিল, সম্মুখে পড়িয়া একটু দাঁড়াইল মালতী। চেনা হইলেও কোনদিন কথাবার্তা হয় নাই। হরিমোহন শুধু জিজ্ঞাসু নয়নে তাকাইয়া রহিল।

মালতী সরিয়া গিয়া হরিমোহনের মাকে ধরিয়া আনিয়া তাহার দ্বারাই কথাটা পাড়িল। হরিমোহন বিস্ময়ে আনন্দে তৎক্ষণাৎ সম্মত হইল। বলিল, তা বেশ তো, তা বেশ তো। শিখতে মোটেই সময় লাগবে না। তারপরে অভ্যেস করতে করতেই হাত চলবে।

হরিমোহনের মা একখানা পিঁড়ি আনিয়া দিলে বসিল মালতী।

হরিমোহন বলিল, এখনই বসবেন ?

মালতী কুণ্ঠিতস্বরে বলিল, আপনার যদি সময় না হয় এখন কালকেই আসব।

আমার সময় আছে।—হরিমোহন আগ্রহভরে তাড়াতাড়ি জবাব দিল।

তখনই পাতা কাটিয়া বাঁধিবার প্রণালীটা দেখাইয়া দিল হরিমোহন। কিছুক্ষণ দেখিয়া লইয়া, বার-কয়েক নিজে হাতে বাঁধিয়া মালতী বলিল, আমাকে কিছু পাতা আর মসলা এনে দেবেন ? আমি দাম দিয়ে দিচ্ছি।

হরিমোহন বলিল, আজ এখান থেকেই নিয়ে যান। যদি তৈরি করতে পারেন ভালই। না হয় ফিরিয়ে নিয়ে আসবেন। আমি কাল আবার দেখিয়ে দেব।

মালতী সম্মত হইল। একটু হাসিয়া বলিল, নষ্ট হ'লে কিন্তু দাম নিতে হবে। তখন 'না' বলতে পারবেন না।

আচ্ছা, আচ্ছা—বলিয়া বোকার মত হাসিয়া উঠিল হরিমোহন।

বাহিরে আসিয়া অনেক দিন পরে আজ হঠাৎ আবার চোখে জল আসিয়া পড়িল মালতীর। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া আঁচল দিয়া তাড়াতাড়ি মুছিয়া ফেলিল চোখ। মনে মনে বলিল, উপায় কি ?

কথাটার সঙ্গে সঙ্গে মাধবের গত সন্ধ্যার চেহারা মনে পড়িয়া গেল। ছিঃ—বলিয়া মনটাকে টিপিয়া ধরিতে চাহিল। দ্রুতপদে অগ্রসর হইল। হঠাৎ একবার নিজের শরীরটার দিকে চোখ বুলাইয়া লইল। লজ্জিত নৈরাশ্যের মৃদু হাসি ফুটিয়া উঠিল মুখে। পরক্ষণে আবার গম্ভীর হইয়া হাঁটিতে লাগিল।

রাত্রিতে পিসী প্রসন্নময়ীর সঙ্গে মেজাজ ভাল থাকিলে সুখ-দুঃখের আলাপ হয়। মাঝে মাঝে ঝগড়া হয়। আজ উভয়েরই মেজাজ ভাল। প্রসন্নময়ী আজ ছেলের নিকট হইতে মাসিক বরাদ্দের টাকাটা পাইয়াছে আর মালতী বিড়ি বাঁধিয়া উপার্জনের পথে প্রথম পা দিয়াছে।

মালতী বলিল, বুঝলে পিসী, আজকাল কাজের আর ছোট বড় কিছু নেই। স্বাধীন কাজ—সব কাজই ভাল। পরের কাছে খাওয়ার চেয়ে নিজের হাতে কাজ ক'রে খাওয়া ঢের ভাল।

প্রসন্নময়ী সায় দিয়া বলিল, তা নয় তো কি!

ওই তো আমার ননদের বাড়ির এক শরিকের মেয়ে কাজল। বিধবা হয়ে একবার এর আশ্রয়ে, একবার ওর আশ্রয়ে—এই ক'রে ক'রে শেষে কত কেলেঙ্কারি!

মালতী নির্বাক হইয়া গেল ক্ষণকালের জন্য। পরে মৃদুস্বরে বলিল, কি কেলেঙ্কারি?

ধর্মের ঢাক তো বাজবেই। একবার—

দম বন্ধ হইয়া গেল মালতীর। ক্ষণপরে একটা স্বস্তির দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে মৃদু হাস্যে মনে হইল, না, আমার সে ভয় নেই। সে ভয় নেই।

তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করিল, তার পরে?

তার পরে আর কি! প্রাণটা তো কোনমতে বাঁচল, শরীরটা গেল ভেঙে।

এখন কি করে? কোথায় আছে?

এখন নাকি চিক্ষেত্রে আছে। মন্দিরে তরকারি কুটছে সেখানে।

তরকারি কুটছে?

হ্যাঁ। আর কি করবে?

মালতী চুপ করিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে ক্রুদ্ধস্বরে বলিয়া উঠিল, তা প্রাণটার কি ওর এতই মায়া হ'ল—গলায় দড়ি দিয়ে মরতে পারলে না?

মরলে পর ওর ভোগ ভুগবে কে?

পরক্ষণে শান্ত হইয়া গেল মালতী। মনে পড়িয়া গেল, সেও মরিতে পারে নাই। অত কেলেঙ্কারির পরে আমি কিন্তু বাঁচতে পারতাম না—গর্বের সঙ্গে ভাবিল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বুক ঠেলিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস উঠিল।

প্রসন্নময়ী ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। মালতী উঠিয়া আলো জ্বালিয়া শতরঞ্চিটা নীচে বিছাইয়া বিড়ি তৈয়ারি করিতে বসিল। প্রসন্নময়ীর ঘুম ভাঙিয়া গেল। অবাক হইয়া বলিল, ও কি লো? এত রাত্রে আবার বসলি যে?

দিনে অত সময় কোথা পিসী?—মালতী শান্তস্বরে বলিল।—রাত তো বেশি হয় নি। যা দু-চারটে পারি।

পরের দিন সকালবেলায় ঘরের কাজ সারিতে সারিতেই কাঁপুনি দিয়া জ্বর আসিল মালতীর। ভয়ে মুখ শুকাইয়া গেল। ভাবিল, এইবার সব শেষ। সব শেষ।

তাড়াতাড়ি বিড়িগুলি হরিমোহনকে দিয়া আসিল মালতী। হরিমোহন মজুরি বাবদ আট আনা পয়সা দিতে গেল। মালতী লইল না। বলিল, পাতাগুলো নষ্টই করেছি বোধ করি। ওর আর পয়সা নেব না।

না, না, নষ্ট হয় নি। ভাল হয়েছে।—হরিমোহন প্রতিবাদ করিল।

বেশ, যদি ভাল হয়ে থাকে তো ওগুলো আপনাকে গুরুদক্ষিণা দিলাম।

হরিমোহন খুশিতে লাল হইয়া হাসিয়া উঠিল।

মালতী জ্বরের ঘোরে বকিয়া যাইতেছিল, তবে শেখা আমার এই প্রথমে আর এই বোধ করি শেষ। আর বোধ হয় আসব না।

মালতী কাঁপিতেছিল এতক্ষণে লক্ষ্য করিল হরিমোহন। ব্যস্ত হইয়া বলিল, কি হয়েছে আপনার?

জ্বর। জ্বর হয়েছে। আচ্ছা, যদি বাঁচি তো আবার আসব।—বলিয়া চলিয়া আসিল মালতী।

বাড়িতে আরও কিছুক্ষণ জ্বরের উত্তাপে ছুটাছুটি করিয়া কাজ করিল। জ্বর বাড়িতেছিল। দাঁড়াইয়া থাকা অসম্ভব হইয়া উঠিলে শয্যা লইল।

প্রসন্নময়ী গোবরের বালতি রাখিয়া হাত ধুইয়া আসিয়া মালতীর

কপালে হাত রাখিতেই মালতী কাঁদিয়া ফেলিল। বলিল, পিসী! আমি আর বাঁচব না পিসী।

প্রসন্নময়ী ধমক দিল, ও কি কথা! জ্বর হ'লেই মরে নাকি কেউ?

তুমি জান না পিসী। এ জ্বর আমার শেষ জ্বর। যাক, ভালই হ'ল। বিষ খেয়ে মরতে চেয়েছিলাম, মরতে পারি নি। এবার আর ছাড়বে না—

নে, একটু চুপ ক'রে শুয়ে থাক্। মাথাটা ঢেকে নে। ঘামলেই জ্বর ছেড়ে যাবে।

কম্বল টানিয়া মাথাটা নিজেই ঢাকিয়া লইল মালতী। বলিল, এ জ্বর আর ছাড়বে না পিসী। ছেড়ে লাভ কি! আমার মত বিধবার প্রাণ এমনই যদি বেরিয়ে যায়, সেই তো ভাল।

বিধবা প্রসন্নময়ী ক্রুদ্ধস্বরে বলিল, বিধবার পরান অত সস্তায় গেলে তবে আর—

কথাটা অসমাপ্ত রাখিয়া প্রসন্নময়ী বাহির হইয়া গেল। খানিক বাদে আবার ঘুরিয়া আসিয়া বলিল, খাবি কি? বার্লি কি আছে? না হ'লে দোকান থেকে এই বেলা আনতে হয়।

কিছু খাব না পিসী।

কিছু না খেলে কি হয়? বার্লি নিয়ে আসি।

অগত্যা মালতী আঁচলের খুঁট খুলিয়া বার্লির পয়সা দিয়া দিল।

সেদিন রাত্রে জ্বর ছাড়িল না। কিছু কম হইল মাত্র। সকাল-বেলা প্রসন্নময়ী উঠিতেই মালতী ককাইতে ককাইতে বলিল, পিসী, দেখ তো, জ্বরটা ছাড়ল না কি?

প্রসন্নময়ী মালতীর কপালে বুকে হাত দিয়া বলিল, নাঃ। বেশ জ্বর আছে গায়ে।

তা হ'লে কি হবে?—মালতী প্রায় কান্নার স্বরে বলিয়া উঠিল।

হবে আবার কি? ছেড়ে যাবে। জ্বর কি হতে হতেই ছাড়ে?—প্রসন্নময়ী বাহির হইয়া গেল।

মালতী নিঃশব্দে পড়িয়া রহিল। আজ অল্প জ্বরে দুর্বল শরীরে রমাকান্তের স্মৃতি মাথা তুলিয়া অনেকক্ষণ স্থায়ী হইয়া রহিল। আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল মালতীকে। নীরবে কাঁদিল কিছুক্ষণ। চোখের জল মুছিয়া কিন্তু শান্ত হইল। ভাবিল, এমনি শুইয়া থাকিতে থাকিতে চোখ বুজিয়া এক সময় মরিয়া যাইবে।

নিজের মৃতদেহের সম্ভাব্য ছবিটা দেখিল। একা একা মরিয়া পড়িয়া আছে সে। পিসী আসিয়া দেখিয়াই চিৎকার করিয়া উঠিল। লোকজন জমা হইল। শ্মশানে লইয়া যাওয়ার আয়োজন হইতেছে। বল হরি—

চাপা চিৎকারের সঙ্গে উঠিয়া বসিল মালতী। প্রসন্নময়ী ছুটিয়া আসিল, কি হ'ল ?

না, এমনি। মাথাটা কি রকম—। বলিতে বলিতে উঠিয়া দাঁড়াইল মালতী।

কি যে সব রকম তোর!—পিসী বাহির হইয়া গেল আবার।

মালতী রাস্তার দিককার দরজা খুলিয়া দাঁড়াইল। ঠাণ্ডা এক ফালি বাতাস আসিয়া যেন জড়াইয়া ধরিল মালতীকে। চক্ষু মুদিয়া ভোগ করিয়া লইল বাতাসটা। নাকে গন্ধ টানিয়া লইল। রাস্তায় লোক চলাচল করিতেছিল। চারিদিকে জীবনের শব্দ। পৃথিবী প্রাণপণে বাঁচিয়া চলিয়াছে। ধীরে ধীরে সযত্নে দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া ভিতরে গেল মালতী।

কিন্তু জ্বর বাড়িতে শুরু করিল। অস্থির হইয়া উঠিল মালতী। প্রসন্নময়ীকে বলিল, একজন ডাক্তার তো আর না ডাকলে চলে না। মরণ তো হবে না—খামকা ভুগে লাভ কি ?

প্রসন্নময়ী গজর গজর করিতে করিতে সরিয়া গেল।—একদিনের জ্বরেই ডাক্তার লাগে!

দুপুরবেলায় প্রায় অচেতন হইয়া পড়িল মালতী। চোখের দিকে তাকাইয়া প্রসন্নময়ী ভয় পাইয়া চেঁচামেচি করিতে আরম্ভ করিল।

মাধবের ছোট বোন রেবাকে ডাকিয়া আনিল মাথায় জল ঢালিবার জন্য। ব্যস্ত হইয়া সেই সঙ্গে মাধবও ছুটিয়া আসিল।

রেবা জল ঢালিতেছিল। মাধব বলিল, ঠিক চাঁদিটাতে ঢাল্; চোখে একটু জল দে। পাখা—পাখা কোথায়?

প্রসন্নময়ী পাখা আনিয়া দিল। মাধব মাথায় হাওয়া দিতে শুরু করিল।

মালতী চোখ মেলিয়া দেখিল মাধবকে। একবার মাত্র চমকিয়া উঠিয়াই পরক্ষণে গভীর আশ্বাসে চক্ষু বড় বড় করিয়া তাকাইল। মাধব প্রায় নৃত্য করিয়া উঠিল। বলিল, আমি ডাক্তার ডেকে নিয়ে আস'ছি। তোরা জল ঢালতে থাক্।

ডাক্তারের ভিজিটও মাধবই দিয়া দিল।

মালতী বালিশের তলা হইতে চাবির গোছা বাহির করিতেই মাধব বলিয়া উঠিল. ভিজিটের টাকা আমি দিয়ে দিয়েছি। আপনি ব্যস্ত হবেন না। আচ্ছা, আমি ওষুধ আনবার ব্যবস্থা ক'রে যাচ্ছি—

বলিয়াই মালতীর কপালে হাত দিল মাধব। মালতীর একখানা হাত টানিয়া তুলিয়া নিজের দুই হাতের মধ্যে রাখিল কিছুক্ষণ। বলিল, ভয় নেই—জ্বর ক'মে আসছে।

৩

ভাল হইয়া উঠিয়াছে মালতী। মাধব রোজ নিজে আসিয়া খবর লয়। রেবাকে পাঠাইয়া দেয় কাজে সাহায্য করিতে। অভিভাবকের মত উপদেশ দেয়, বাহিরে যাইতে সম্পূর্ণ নিষেধ করিয়া দিয়াছে। আর বলিয়াছে, ও-সব বিড়ি-ফিরির কাজের মধ্যে এখন যেতে পারবেন না।

মাধবের সব কথাই প্রায় মানিয়া চলিয়াছে মালতী। বড় দুর্বল, একা চলিবার আর শক্তি নাই তাহার। মাধবের উপর ভর দিয়া ভাসিয়া চলিয়াছে যেন।

মাধবের নিকট ঋণ বাড়িয়া যাইতেছে। কথাটা ভাবিতে চায় না মালতী। নেহাত এড়াইতে না পারিলে নিজের কাছে কৈফিয়ৎ দেয়, টাকা তো দিয়েই দেব। একটু ভাল হ'লেই দিয়ে দেব।

কিন্তু গোপন মনে অনুভব করে, হয়তো দিতে হইবে না। হঠাৎ নিজের কাছে ধরা পড়িয়া গেলে তৎক্ষণাৎ চাপা দিয়া বলে, না, তা কেন? চাইলেই দিয়ে দেব।

মাধবের গতিবিধি লক্ষ্য করে মালতী। চোখের দিকে তাকাইয়া দেখে। একটা ভয়ঙ্কর দিন অতি দ্রুত আগাইয়া আসিতেছে সর্বাঙ্গে বোধ করে যেন। কিন্তু রোধ করিবার শক্তি নাই তাহার।

কয়েক দিনেই অনেকটা সুস্থ হইয়া উঠিল। মাধবের চোখে ক্রমবর্ধমান চাঞ্চল্যের মধ্যে তাহার প্রতিবিম্ব দেখিতে পাইল।

সেদিন রাত্রিতে প্রসন্নময়ী কীর্তন শুনিতে গেল। মালতী বাধা দিল না, বরং মাধবের বাড়ি হইতে রেবাকে সঙ্গে লইয়া যাওয়ার পরামর্শ দিল।

মাধব বাড়িতে আছে জানে মালতী। বাড়ির সামনে কয়েকবার পায়চারি করিতে দেখিয়াছে। ভিতরের দিককার দরজা বন্ধ করিয়া বাহিরের দরজাটা খোলা রাখিয়া ঘরের টুকিটাকি কাজ সারিতে লাগিল। আর রাস্তার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করিতে লাগিল। মাঝে মাঝে রাস্তায় দুই-একজন অন্য লোককে যাতায়াত করিতে দেখিয়া কি ভাবিয়া ভিতরের দরজাটাও খুলিয়া দিল। দরজার পাশে মেঝের উপর একটা সেলাই লইয়া বসিল।

কিছুক্ষণ পরেই পায়ের শব্দে চমকিয়া মুখ তুলিল মালতী। মাধব আসিয়াছে। মাথাটা পরক্ষণে হেঁট হইয়া গেল মালতীর। মাধব একবার মাত্র চাপা স্বরে বলিল, কি করছেন? বলিয়া সঙ্গে সঙ্গে হেঁট হইয়া আলোটা নিবাইয়া দিল। ভিতরের দরজাটা বন্ধ করিয়া ছুটিয়া গেল রাস্তার দিককার দরজা বন্ধ করিতে। মালতী উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রতিবাদ করিতে গেল, আওয়াজ বাহির হইল না।

কিন্তু অকস্মাৎ সচল হইয়া উঠিল। মাধব কাছে আসিয়া পড়িবার পূর্বেই দরজা খুলিয়া বারান্দায় নামিয়া দাঁড়াইল। মাধব ভ্রূকুটি করিয়া থামিয়া গেল। অন্ধকারেও দেখিতে পাইল মালতীকে। চাপাকণ্ঠে বলিল, এ আবার কি ?

মালতী একটু কাছে সরিয়া আসিয়া কিছু বলিবার উদ্যোগ করিল। কিন্তু হাত বাড়াইয়া ধরিতে গেল মাধব। মালতী ত্রস্ত হরিণীর মত আবার সরিয়া গিয়া চারিদিকে তাকাইয়া দেখিল। মাধবের বাড়ির উঠানে আলো দেখা যায়। সভয়ে ক্ষিপ্রপদে ঘরে ঢুকিয়া গেল মালতী। মাধব জড়াইয়া ধরিয়া ফেলিল।

ক্ষণকালের জন্য কোন বাধা দিল না মালতী। ক্ষণপরে মাধব একটু শান্ত হইয়া দরজা বন্ধ করিতে উদ্যত হইলে মালতী হঠাৎ মাধবের পায়ের কাছে বসিয়া দুই পা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, আপনি আমার অনেক করেছেন। আমি ঋণী। আমাকে ক্ষমা করবেন। কিন্তু আমার সর্বনাশ করবেন না। শিগগির যান।

মনে মনে হাসিল মাধব। মেয়েমানুষ—এটুকু ঢঙ তো করিবেই। ধরিয়া তুলিতে গেল মাধব। বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত উঠিয়া সরিয়া দাঁড়াইল মালতী। বলিল, এবার আমি চিৎকার করব। শিগগির যান—

বার বার বাধা পাইয়া ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল মাধব।—এ আবার কি ঢঙ ?

যে ঢঙই হোক, শিগগির চ'লে যান আপনি।

কেন, পছন্দ হচ্ছে না ?

না—

ও, আমার টাকাগুলো ? ওগুলো খুব মিষ্টি, না ?

মাটির সঙ্গে মিশিয়া যাইতে চাহিল মালতী। আগাম টাকা দিয়াছে মাধব এই জন্য! পাওনা লইতে আসিয়াছে! অস্ফুট কণ্ঠে প্রবল ঘৃণায় একটা 'আঃ' ধ্বনি করিল। বলিল, আপনার টাকা আমি কালই দিয়ে দেব।

কালই দিয়ে দেবে ?

হ্যাঁ, এবার যান।

রাস্তায় লোকের কথা শুনা গেল। মাধব বলিল, আচ্ছা, দেখা যাবে। বলিয়া ভিতরের দিক দিয়া নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেল।

ছুটিয়া গিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া ক্ষণকাল কান পাতিয়া দাঁড়াইয়া রহিল মালতী। ফিরিয়া আসিয়া আলোটা জ্বালিয়া মেঝের উপর বসিয়া পড়িল। 'কাজল এখন চিক্ষেত্রে তরকারি কুটছে'—প্রসন্নময়ীর কথাটা মনের তলা হইতে নিঃশব্দে স্পষ্ট বাহির হইয়া আসিল।

পরের দিন সকালবেলায় প্রথমেই প্রসন্নময়ীকে পাঠাইয়া মাধবের টাকা শোধ করিয়া দিল মালতী।

তারপরে চোখ বুজিয়া ঝাঁপ দিল যেন পথে। সব দ্বিধা ঘুচিয়া গেল মালতীর। বিড়ি তৈয়ারি করে, রাস্তার গোবর কুড়াইয়া আনিয়া ঘুঁটে দেয়, হাঁস পালিয়া ডিম বিক্রয় করে। যেটুকু খালি জমি ছিল বাড়িতে, নানা রকম সবজিগাছে ভরিয়া ফেলিল। বাড়িতে একটা ঢেঁকি বসাইয়া লইল। সারাদিন রুদ্ধশ্বাসে যেন যুদ্ধ করিয়া চলিয়াছে মালতী।

আর ভয় নাই। প্রাণপণে বাঁচিতেছে মালতী। প্রসন্নময়ীও প্রায় পাল্লা দিয়া বাঁচিতেছে। প্রসন্নময়ীকে তাহার ছেলে সাহায্য করে। মালতীর কাহারও সাহায্যের আর প্রয়োজন নাই। নিজের পায়ে দাঁড়াইয়াছে সে। কঠিন পরিশ্রমের মধ্যে জীবনের একটা নূতন স্বাদ পাইয়া মাতিয়া উঠিয়াছে যেন। বাঁচার স্বাদ।

আর মুক্তির স্বাদ। জীবনের খোলা মাঠে সমতলে দাঁড়াইয়া টের পাইল, আর নীচে পড়িবার ভয় নাই।

মাধবের কথা প্রায় ভুলিয়া গিয়াছে মালতী। শুধু মাধব নয়, সব পুরুষকেই সে এখন শুধু মানুষ হিসাবে দেখে।

কিন্তু একদিন অকস্মাৎ সে হোঁচট খাইয়া থামিয়া গেল। প্রসন্নময়ী

একটা লাউগাছের ডগা তুলিয়া লইয়াছে। টের পাইয়া মালতী দুঃখে রাগে ফাটিয়া পড়িল। অনেক গালাগালি করিয়া শেষে বলিল, বুড়ী মরেও না।

অপরাধ করিয়া প্রসন্নময়ী অনেকটা চুপ করিয়া ছিল। কিন্তু মরার গালি সে কোনদিন সহ্য করিতে পারে না। ক্ষিপ্তের মত বাহিরে আসিয়া উচ্চকণ্ঠে খা-খা করিয়া উঠিল যেন।—আমি মরব কেন লা? তুই মর্ না! লজ্জার মাথা খেয়েছিস তো, তাই বেঁচে আছিস! আর কেউ হ'লে কবে গলায় দড়ি দিত!

প্রথম ধাক্কায় থমকিয়া গিয়াছিল মালতী। পরক্ষণে জবাব দিল, গলায় দড়ি দিতে হ'লে তুমি দাও না। বয়স তো হ'ল! আর কেন? বেঁচে থেকে মানুষের হাড় জ্বালানো ছাড়া আর তো কোনও কাজ নেই!

আরও জ্বলিয়া উঠিল প্রসন্নময়ী।—না-আ, তোর বড় কাজ আছে? তোর কাজ তো—। হঠাৎ এখানে চাপিয়া গেল প্রসন্নময়ী। শেষে দিশাহারার মত বার তিনেক 'তুই মর্' বলিয়া লইয়া ছুটিয়া আবার ঘরে ঢুকিয়া গেল।

মালতী থামিয়া গেল।

খাওয়াদাওয়ার পর ঠাণ্ডা মেজাজে ধরিল পিসীকে।—আচ্ছা পিসী, আমি লজ্জার মাথা খেয়েছি—আরও কি কি সব বললে তখন; কিসের জন্যে বললে?

প্রসন্নময়ী প্রথমে মুখখানা এদিক ওদিক করিতে করিতে কথাটা উড়াইয়া দিতে চাহিল—কি আবার? রাগের সময়—

মালতী ছাড়িল না। অগত্যা প্রসন্নময়ী স্বীকার করিল, কানাঘুষো দু-এক কথা লোকে বলে।

লোকে বলে?—মালতীর নিশ্বাস বন্ধ হইয়া আসিল।

বলে বলুকগে।—পিসী সান্ত্বনা দিল—লোকের মিছে কথায় কি হবে?

কোনও জবাব দিল না মালতী।

সেদিন আর কোন কাজও করিতে পারিল না। অনেকদিন পরে আজ আবার মাধবের কথা মনে পড়িয়া গেল। জানালার ধারে দাঁড়াইয়া অবশ দেহে ভাবিতে লাগিল, ভুল হয়েছে। সেদিন উচিত ছিল। কলঙ্ক তো হ'লই। তবে কেন? বেশ, তাই করব। চঞ্চল হইয়া উঠিল মালতী। অকস্মাৎ শরীরটা যেন বাঁধভাঙা নদীর জলের মত বহিয়া যাইতে চাহিল। মাধবের বাড়ির দিকে তাকাইয়া রহিল। মাধবের স্ত্রী বাহিরে আসিয়াছিল। তাহাকে দেখিয়া পিছাইয়া আসিল মালতী। মাধবের নিকট হইতেও মনটা সঙ্কুচিত হইয়া সরিয়া আসিল।

পর-মুহূর্তে হঠাৎ চকিত হইয়া উঠিল। রাস্তায় হরিমোহন! হ্যাঁ, হরিমোহন! এই তো! আশ্চর্য, হরিমোহনকে এতদিন সে দেখে নাই। আজ প্রথম পুরুষমূর্তিতে হরিমোহনকে দেখিয়া গায়ে কাঁটা দিয়া উঠিল মালতীর। চঞ্চল পদক্ষেপে বাহির হইয়া গেল। হরিমোহন কাছে আসিয়া পড়িতে মৃদুস্বরে ডাকিয়া বলিল, একটু শুনে যাবেন।

হরিমোহন আসিল। তাহার ঈষৎ লজ্জিত আয়ত চক্ষু দেখিয়া আর একবার মালতীর বুকটা ছ্যাঁক করিয়া উঠিল। মালতী কাছে আসিলে হরিমোহন খুশি হইয়া উঠে, আজ স্পষ্ট স্বীকার করিল মনে মনে।

ব্যবসা সম্বন্ধে কাজের কথা কিছু বলিতে হইল মালতীকে। কিন্তু মালতীর হাসিময় চোখের দিকে তাকাইয়া হরিমোহনের সাহসও যেন নৃত্য করিয়া উঠিল। মাত্র কয়েক দিনের প্রশ্রয়ে স্বীয় মহিমায় প্রকাশ পাইতে হরিমোহনের বিলম্ব হইল না।

হরিমোহনের স্ত্রী নাই। অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই বিবাহের প্রস্তাব না করিয়া হরিমোহনের আর উপায় রহিল না।

নিজের হাতে সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া নিজে সাজিয়া কনে হইয়া বসিল মালতী। বিবাহ হইয়া গেল।

৪

কিন্তু বছর তিনেক পরে নিঃসন্তান মালতী দ্বিতীয় বার বিধবা হইল। টিকায় অবিশ্বাসী বুদ্ধিমান হরিমোহন বসন্ত রোগে মারা গেল।

আবার স্বামীর পায়ের কাছে মাথা ঠুকিয়া কাঁদিল মালতী। কিন্তু এবার জ্ঞান হারাইল না। বেশিদিন কাঁদিতেও পারিল না। এবার পিসী বা পাড়ার কেহ সাহায্য করিতে যেন উৎসাহ দেখাইল না ততটা। অথবা সাহায্যের বেশি প্রয়োজন হইল না।

প্রায় সব কাজই নিজ হাতে করিতে হইল মালতীকে। মৃতদেহ ঢাকিবার জন্য একখানা কাপড় দরকার। নিজেই দেখিয়া শুনিয়া একটু বেশি পুরনো কাপড়খানা আনিয়া দিল মালতী। পিসী হয়তো নূতন-খানাই দিয়া দিত। মৃতের শিয়রে তুলসীপাতা ইত্যাদি নিজেই আনিয়া দিল। পিসী বা আর কাহারও হয়তো খেয়াল না হইতে পারে।

কাজ মালতীকে টানিয়া লইল। আশ্রয় দিল আবার।

সকালে উঠিয়া বাহিরে আসিতেই বুক ঠেলিয়া কান্না উঠে মালতীর। কাঁদিতে বসে। কিন্তু একটা গরু যদি বাগানে ঢুকিয়া পড়ে, মালতীর না উঠিলে চলে না। ঘুঁটে না বানাইলে পয়সা দিয়া কিনিতে হয়। অত পয়সা কোথায়? বিড়ি না বাঁধিলে খাওয়াই চলিবে না। উপায় কি? গরুগুলি সে না দেখিলে কে দেখিবে?

অসংখ্য কাজ জীবনের।

তবু মাঝে মাঝে কাঁদিতে হয়। সেদিন বৈকালে বাড়ি ফিরিয়া যখন দেখিল যে, তাহার অতি যত্নের কাঁঠালগাছের চারাটি গরুতে সম্পূর্ণ খাইয়া ফেলিয়াছে, একেবারে ভাঙিয়া পড়িল মালতী। অনেকক্ষণ কাঁদিয়া একটু শান্ত হইয়া শেষে ঝগড়া বাধাইয়া দিল। কারণ তাহার নিজের গরু বাঁধা ছিল। নিশ্চয়ই পাড়ার কাহারও গরু!

শ্রীভূপেন্দ্রমোহন সরকার

আমার সাহিত্য-জীবন

নয়

গতবার রসিক পাগলের কথায় ছেড়েছি।

রসিক পাগল এই সময়টায় আমাকে খুব অভিভূত করেছিলেন। আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিতে রসিকবাবু পাগল ছাড়া কিছুই নন। তাঁদের বংশেও নাকি এই ব্যাধি ছিল। তাঁর পূর্বপুরুষের কথা জানি না; তবে তাঁর ছোট ভাইকে দেখেছি, তাঁর মস্তিষ্কও সুস্থ নয়। রোগা লোক, খোনাটে সুরে কথা বলতেন। অত্যন্ত ভীতু, বিশেষ ক'রে বড় ভাইকে প্রায় ভূতের মতই ভয় করতেন। রসিকবাবুকে পথে আসতে দেখলে সঙ্গে সঙ্গে কারুর বাড়ি ঢুকতেন বা উলটো পথ কি পাশের গলি ধ'রে স'রে পড়তেন। বলতেন, ওঁটা পাগল—বদ্ধ পাগল। বোধ করি এক ভগ্নীও পাগল ছিলেন। প্রথম দিকে রসিকবাবু ভয় করবার মতই মানুষ ছিলেন। অনেক কাল আগে, বোধ করি ১৯১৫।১৬ সনে তাঁকে যখন প্রথম দেখি তখন আমিও ভয় পেয়েছিলাম। সবল পেশীপরিপুষ্ট জোয়ান, মাথায় ঝাঁকড়া চুল, দাড়ি-গোঁফে আচ্ছন্ন মুখ, কৌপীনসার নগ্ন দেহ, কাঁধে কম্বল নিয়ে উন্মাদের মত পথ হাঁটতেন, আর অনবরত বলতেন, ছুঃ! ছুঃ! ছুঃ! ছুঃ!

যেন ফু দিয়ে কিছু উড়িয়ে দিচ্ছেন বা ঘৃণায় ফুৎকার দিচ্ছেন—ছুঃ! ছুঃ! মুখটা এদিকে ফিরত একবার, ওদিকে একবার। সব দিকেই যেন সেই বস্তুটা রয়েছে, যাকে উড়িয়ে দিতে চান বা যার উপর ঘৃণায় নিষ্ঠীবন নিক্ষেপ করছেন।

লোকে বলত, কালী সাধনা করতে গিয়ে শবাসনে ব'সে পাগল হয়ে গেছেন।

হওয়া কিছু বিচিত্র নয়। কারণ দেশে ও-পদ্ধতিটা তখনও ছিল, আজও একেবারে ও-সাধনা বিলুপ্ত হয় নি এবং পাগলও বহুজন হয়েছে। এতে কেউ কোন প্রতিবাদই করবেন না। সিদ্ধি পেয়েছেন, সাধনা পূর্ণ হয়েছে বললেই ঝগড়া হবে, কিন্তু রসিকবাবু তা থেকে রেহাই দিয়েছেন মানুষকে। তবে তাঁর কথাবার্তা আচার-আচরণ অত্যন্ত

বিচিত্র। সেই কারণেই আমাকে আকৃষ্ট করেছিলেন রসিকবাবু। যখন তিনি উন্মাদ পাগল, তখনকার একটি কথা মনে পড়ছে। তখনই তাঁর প্রতি মন প্রথম আকৃষ্ট হয়। মামাদের বাড়ির সামনে রাস্তার উপরে একটা কুকুরের ছানাকে একটা এক্কা চাপা দিয়ে গেল। কুকুরছানাটা মরণ-যন্ত্রণায় চিৎকার ক'রে উঠল। ছুঃ! ছুঃ!—শব্দ ক'রে রসিক পাগল যাচ্ছিলেন, মুহূর্তে সেই শব্দ শুনে নিজেই যেন একটা নিষ্ঠুর যন্ত্রণা অনুভব ক'রে, বেঁকেচুরে ঘুরে দাঁড়িয়ে, চিৎকার ক'রে উঠলেন—মরণ!

তারপর ছানাটা তাঁর চোখে পড়ল। পাগল ছুটে এসে পাশে হাঁটু গেড়ে ব'সে, ঝুঁকে প'ড়ে দেখে, চিৎকার ক'রে উঠলেন—জল! পানি! জলদি! ডাক্তার! ডাক্তার বোলাও! জলদি!

এর মধ্যেই কুকুরছানাটা শেষ হয়ে গেল।

যে মুহূর্তে পাগলের তা উপলব্ধি হ'ল, সেই মুহূর্তে উঠে দাঁড়িয়ে সারা শূন্যলোকটা খুঁজে চিৎকার ক'রে উঠলেন—কাঁহা গয়া? কাঁহা? কিধর?

এর পর দীর্ঘকাল পরে রসিকবাবুকে দেখলাম—শান্ত পাগল। গভীর কোন ভাবনায় যেন মগ্ন হয়ে আছেন। মানুষের সঙ্গে কদাচ কথা বলেন। কথা বললেও স্বল্প কথায় মৃদুস্বরে উত্তর দেন। তখন দুপুর হ'লেই কারুর বাড়িতে গিয়ে বসেন। তারা খেতে বললে খান, না বললে কিছুক্ষণ পর উঠে চ'লে যান। আমার মামাদের বাড়িতে তাঁর খুব খাতির ছিল। আমার দিদিমা-মাসীমারা বিশ্বাস করতেন যে, শবাসন ছেড়ে পাগল হয়েও আবার সাধনা ক'রে রসিক সিদ্ধ হয়েছেন।

সিদ্ধ হোন বা না হোন, বৃদ্ধ বয়সে শান্ত নীরব রসিকবাবুকে সেই এক ভাবনাতেই মগ্ন থাকতে দেখেছি। যে উন্মাদ উচ্চ চিৎকারে ওই কুকুরছানাটার আত্মা বলুন, জীবন বলুন, প্রাণ বলুন—সেটা কোন্ দিকে গেল খুঁজেছিলেন, সেই পাগলকেই শান্তভাবে শীতের রাত্রে রাস্তার ধারে

ব'সে একটা গ্যাস-পোস্টকে নিউটন ঠাউরে তাকে যখন প্রশ্ন করতে শুনলাম—গাছ থেকে ফল পড়া দেখে মাধ্যাকর্ষণ আবিষ্কার তো করলে তুমি; কিন্তু কই, বল তো মানুষের প্রাণটা কিসের আকর্ষণে, কেমন আকর্ষণে কোথায় যায়? কি হয়? তখন এ সন্দেহ আর থাকে না যে এই লোকটি—মৃত্যু কি, মৃত্যু কেন, মৃত্যু কোথায়—সেই আদিম মহাপ্রশ্ন নিয়েই পাগল হয়ে গেছেন।

রসিক পাগলকে শান্তরূপে দেখি উনিশ শো তিরিশ সনের মে বা জুন মাসে। তখনও তাঁর মুখে এই প্রশ্নই শুনেছিলাম। আমি জেলে যাব, কোর্টের সমন হয়েছে হাজির হতে। আমার মা তখন পাটনায় ছিলেন; কোর্টের সমন পেয়েই তাঁকে আনতে গিয়েছি। বেলা সাড়ে দশটা এগারোটার সময় পাগল এসে বাড়ি ঢুকে বসলেন—কম্বল নামালেন, আপন মনেই বিড় বিড় করতে লাগলেন। জিজ্ঞাসা ক'রে জানলাম, এই সেই উন্মাদ পাগল রসিকবাবু। দিদিমা-মাসীমারা তাঁর সিদ্ধিলাভের কথা বললেন। আমার কৌতূহল বাড়ল। বেশ তীক্ষ্ণ মনঃসংযোগ ক'রেই তাঁকে দেখতে শুরু করলাম। খুব কাছে ব'সে কথা শোনবার চেষ্টা করতাম, কিন্তু কাছে গেলেই পাগল চুপ ক'রে যেতেন। একদিন কিছু যেন আলোচনা করছিলাম আমরা, সে আলোচনার মধ্যে 'বিষ' কথাটা ছিল, এবং 'মৃত্যু'ও ছিল। একটার সঙ্গে অন্যটার সম্বন্ধ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ।

ঠিক এই সময়েই পাগলের জন্য ভাতের থালা কেউ নিয়ে এলেন, আসনের সামনে নামিয়ে দিলেন। আমরা আলোচনাই করছি, পাগলের দিকে দৃষ্টি কারও ছিল না। হঠাৎ এক সময়ে আমার বড় মামার দৃষ্টি পড়ল, তিনি বললেন, কি হ'ল রসিকদা, খাচ্ছেন না যে?

এবার আমি দৃষ্টি ফেরালাম; দেখলাম, পাগল ভাতের থালা সামনে রেখে আসনে ব'সে আছেন, ভাতে হাত দেন নি; হাত নেড়ে যাচ্ছেন এবং বিড় বিড় ক'রে বকছেন।

মামার কথার উত্তরে পাগল মামার দিকে তাকিয়ে বললেন, বিষ?

না? বিষ যেখানে, মৃত্যু সেখানেই। তা হ'লে মৃত্যু যেখানে, সেখানেই বিষ। মৃত্যু তো সর্বত্র। বিষও সর্বত্র। ভাতেও তা হ'লে বিষ!

আমি এমনি, বোধ করি, তাঁর বিষভীতি ঘোচাবার জন্যেই বললাম, সর্বত্র কি শুধু মৃত্যুই আছে? জীবনও যে রয়েছে সর্বত্র। ভাতে কি শুধু বিষই আছে? জীবন নেই? নইলে ওতেই জীবন বাঁচে কেন? জীবনই তো অমৃত।

মুখের দিকে তাকিয়ে তারিফ ক'রে পাগল বললেন, ভাল বললে তো! হ্যাঁ! তাই তো বটে! তাই তো! তা হ'লে ভাতটা বিষ নয় বলছ? উঁহু।

বললাম, বিষও বটে, অমৃতও বটে। বিষামৃত।

খুব খুশি হয়ে কথাটা বার বার যেন মুখস্থ করলেন কিছুক্ষণ, তারপর খেলেন। যে কয়দিন সেবার ছিলাম, তার মধ্যে কয়েকদিন তিনি মামাদের ওখানে এসেছেন, রোজই কথাটা জিজ্ঞাসা করেছেন পাগল—কি কথাটি হে? বিষামৃত, নয়?

হ্যাঁ। বিষামৃতেই সংসার সৃষ্টি হয়েছে।

হুঁ। ঘাড় নাড়তে শুরু করতেন পাগল।

শুধু তাঁর পাগলামির এই বিচিত্র একমুখিত্বই তার বিশেষত্ব নয়, আরও একটু ছিল। পাটনার অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তাঁকে ভাল খাওয়াতে চাইতেন, ভাল পরাতে চাইতেন, ভাল স্থানে আরামে রাখতেও চাইতেন, কিন্তু পাগল তা চাইতেন না। জগৎবাবু উকিল শীতকালে পাগলকে গাড়ি ক'রে দোকানে নিয়ে গেলেন, দোকানদারকে বললেন, খুব ভাল কম্বল দাও। দোকানদার বিলাতী র‍্যাগের গাঁটরি খুলে দিলে। পাগল একবার নেড়ে-চেড়ে বললে, উঁহু।

আবার অন্য গাঁটরি খুললে। পাগল ঘাড় নাড়লেন এবং শেষে আঙুল বাড়িয়ে যে কম্বল দেখিয়ে দিলেন, তা সামনেই তাকে রয়েছে—একেবারে অতি সাধারণ, যার দাম সেকালে ছিল দু টাকা কি তিন টাকা।

রসিক পাগলই। কোন সিদ্ধিযোগের বিভূতি তাঁর ছিল না; থাকলেও তার জন্যে আমি তাঁর দিকে আকৃষ্ট হই নি, আমি আকৃষ্ট হয়েছিলাম এই বিচিত্র প্রশ্ন নিয়ে পাগল হয়েছেন ব'লে। আকাশের দিকে তাকিয়ে যারা পাগল হয়, সে পাগলেরা পাগল হয়েও যে শ্রদ্ধা পায়, রসিককে আমিও সেই শ্রদ্ধার চোখে দেখেছি। এ সংসারে দুনিয়ার মঙ্গল করতে যারা বদ্ধপরিকর হয়ে লক্ষ লক্ষ মানুষকে নির্যাতন করে, যুদ্ধ বাধায়, ধ্বংস করে দুনিয়া, তাদের চেয়ে এ পাগল অনেক শ্রদ্ধার মানুষ আমার কাছে। এক রাজনৈতিক নেতার গল্প শুনেছি। "তিনি স্বপ্ন দেখেছেন, একদা দুনিয়ার কর্তৃত্ব তাঁর হাতের মুঠোয় আমলকী-ফলবৎ আয়ত্ত হবে। এবং তিনি এখন থেকে ফর্দ করছেন, তখন তিনি কাকে রাখবেন, কাকে কাটবেন!" কবি কাজী নজরুল ইসলামকেও ঠিক এমনি কথা বলতে শুনেছি তাঁর উন্মত্ততা জানাজানি হবার অব্যবহিত পূর্বে। উনিশ শো একচল্লিশ সনে। নাট্যনিকেতনে 'কালিন্দী' অভিনয় হবে; 'কালিন্দী'র গান লেখবার জন্য প্রবোধ গুহ মশায় একদা কাজী সাহেবকে এনে এক বাটা পান জরদা সিগারেট দিয়ে ঘরে বন্ধ করলেন। সঙ্গে রইলাম আমি এবং বিখ্যাত কীর্তন-গায়িকা রাধারাণী, আরও রইলেন নীহারবালা। কাজী গান লেখা রেখে শুরু করলেন অধ্যাত্ম কথার আবরণে তাঁর নিজের কথা। বললেন, আর কিছুদিন পরেই তাঁর সিদ্ধি হবে। এ কি কম কষ্ট পেতে হ'ল হে? প্রথমে গেলাম শক্তির কাছে। বুঝেছ? এল শক্তি। বললে—দেখ, তুমি যা চাও বা তোমার মত সাধককে দেবার মত বস্তু আমার কাছে নেই। তুমি শিবের কাছে যাও। তথাস্তু ব'লে শক্তিকে বিদায় দিলাম। গেলাম শিবের কাছে। শিব বললে—আরে বাপ রে, তুমি আমার কাছে কেন? তোমাকে দেবার মত আমার কাছে কিছু নেই। তুমি যাও বিষ্ণুর কাছে। এখন সেই বিষ্ণুর সঙ্গে মামলা চলছে। সে বলছে—দেব না, দিলে আমার কি থাকবে? আমি বলছি—সে ন্যায় নহি শুনুঙ্গা। কেড়ে নেবই।

অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। ঠিক ধরতে পারি নি। কিন্তু সমস্ত কিছুর মধ্যে যে অহংয়ের উৎকট উঁকিঝুঁকি দেখেছিলাম, তাতে মন পীড়িত হয়েছিল। এর কিছুদিন পরই লীগ আমলে সেই বিখ্যাত নো-কন্‌ফিডেন্স-মোশনের পালা সে দিন। নাট্যনিকেতনেই স্টেজের ভিতরে ব'সে আছি, এদিকে অভিনয় চলছে, আমরা উৎকণ্ঠিত হয়ে ফলাফল জানবার জন্য ব্যগ্র হয়ে রয়েছি, এমন সময়ে কাজী এলেন। এই আলোচনার মধ্যে বললেন, ও-কথা আর বলবেন না। জ্বালিয়ে খেলে আমাকে। জিন্না থেকে গান্ধী পর্যন্ত। বলছে—ফজলুল হকের জায়গায় তুমি বাংলার প্রাইম মিনিস্টার হও। আমি হ'লেই সব গোলমাল মিটে যাবে। কিন্তু দিচ্ছে না এই ইংরেজ ব্যাটারা। আমি প্রাইম মিনিস্টার হ'লেই ওদের ডিঙি ভাসাতে হবে। এক ব্যাটাকেও তো রাখব না আমি। অট্টহাস্য ক'রে উঠলেন কাজী সাহেব।

সেই দিন বুঝেছিলাম কাজী সাহেবের মাথার গোলমাল হয়েছে। কিন্তু এই আত্মসর্বস্বতামূলক পাগলামি আর রসিক পাগলের পাগলামি কত স্বতন্ত্র! প্রথমটা আমাকে বেদনা দেয়, দুঃখ পাই, মর্মাহত হয়ে ভাবি—অহংয়ের কি শোচনীয় পরিণতি! শেষেরটায় জাগে বিস্ময় এবং মুগ্ধও হতে হয় এই ভেবে যে, এই মহাতত্ত্বটা যে এমন দিশাহারা হয়ে ভাবলে, সে মানুষটার মধ্যে সম্ভাবনা তো কম ছিল না!

রসিক পাগল আমাকে এমনই প্রভাবান্বিত করেছিলেন যে, তাঁকে নিয়ে গল্প লিখেছি সে সময়। গল্পটির নাম "প্রতিধ্বনি"। পাগল মূর্খ ছিলেন না। কলেজে পড়েছেন, তবে কতদূর পড়েছেন আজ ঠিক মনে পড়ছে না। এবং প্রথম দিকে নাকি সে আমলের ইয়ংবেঙ্গলদের মতই রীতিমত ইংরেজীনবিস ছিলেন। যাঁরা পশ্চিমপ্রবাসী বাঙালী-সমাজের সঙ্গে পরিচিত, তাঁরা জানেন এমনিতেই প্রবাসী বাঙালী-সমাজ কতখানি ইংরেজীভক্ত ছিলেন। সে আমলে ইংরেজের রাজ্যবিস্তারের সঙ্গেই ইংরেজীতে রাজকার্য সুগম ক'রে দেবার জন্যই বাঙালী দেশ ছেড়ে ভারতের বড় বড় শহরে গিয়ে বাস করেছিলেন।

ইংরেজীতে দখলটাই ছিল জীবনে জীবিকা উপার্জনের মূলধন। এর উপর মডার্ন বা সে আমলের ইয়ংবেঙ্গল হবার ঝোঁক চাপলে সে মানুষ কেমন ধারার মানুষ ছিল তা অনুমান করতে কষ্ট হয় না। কষ্ট হয়, সে মানুষ এই ধারায় ঘুরল কি ক'রে ভেবে।

* * *

পাটনায় আর একজন বৃদ্ধকে দেখেছিলাম। বাংলা-সাহিত্যের প্রতি অনুরাগী বঙ্গবাণীর প্রবীণ সেবক। সেকালের পশ্চিমী হাওয়ায় মানুষ, ডাল রুটি ও ব্যায়ামে সবল দেহ—মথুরবাবু। আমি যখন তাঁকে দেখলাম, তখন তিনি অশীতিপর বৃদ্ধ। তবুও বঙ্গ-সাহিত্যকে উপলক্ষ্য ক'রে যে কোন অনুষ্ঠান হোক, বৃদ্ধ এসে উপস্থিত হতেন। বঙ্গ-সাহিত্যের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা এবং অনুরাগ দেখে শ্রদ্ধানত চিত্তে ভাবতাম, প্রবাসী বাঙালী-সমাজে জন্মে, মানুষ হয়ে, কি ক'রে সে আমলে এত বড় অনুরাগ তিনি অর্জন করেছিলেন। সে আমলে প্রবাসী বাঙালীর পক্ষে বাংলার চেয়ে ইংরেজীটাই ছিল বেশি রপ্ত। বাংলাতে একখানা সে আমলের ছোট আকারের পোস্টকার্ড লিখতে হ'লে তাঁরা বেশ একটু কষ্ট এবং মনে মনে তিক্ততা অনুভব করতেন।

এই ভাবটা খানিকটা কেটেছে জাতীয় আন্দোলনে, খানিকটা কেটেছে রবীন্দ্রনাথের নোবেল প্রাইজ প্রাপ্তির গৌরবে।

অবশ্য সর্বস্থানেই সর্বকালেই ব্যতিক্রম থাকে, পাটনার বাঙালী-সমাজে মথুরবাবুর কালেও ছিল। তিনি নিজেই ছিলেন ব্যতিক্রম। এবং ছিলেন আচার্য যদুনাথ সরকার।

আর একজন ছিলেন স্বর্গীয় যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার মহাশয়। এঁদের পর কিন্তু পাটনার বাঙালী-সমাজে দীর্ঘকাল এঁদের মত নিষ্ঠাবান বাংলা-সাহিত্যের সেবকের আর আবির্ভাব হয় নি। এই দীর্ঘ ছেদের পর ঠিক এই সময়ে, অর্থাৎ আমি যখন গেলাম, তখন একদল বাঙালী তরুণ নতুন ক'রে সাহিত্য-সাধনার আসন পেতেছেন পাটনায়। এঁদের সবাকেই কৃতবিদ্য। কেউ এম. এ. পাস করেছেন, কেউ এম.এ. পড়ছেন,

কেউ বি. এ. পড়েন এবং সকলেই ছাত্র হিসাবে কৃতী। অবশ্য এর আগেই বর্তমান কালের বাঙালী সাহিত্যরথীদের মধ্যে একজন বিশিষ্ট সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত অন্নদাশঙ্কর রায় পাটনায় কয়েক বৎসরের জন্য এসেছিলেন। তিনি কোন আন্দোলন সৃষ্টি করেছিলেন ব'লে শুনি নি। তবে তাঁর ছাত্র-জীবনের অসামান্য সাফল্যের গল্পের মধ্যে বাংলা-ভাষায় দখলের কথা শুনেছিলাম। তারও একটি বৈশিষ্ট্য আছে। ম্যাট্রিকুলেশনে শ্রীযুক্ত রায়ের বাংলা ভাষা ছিল না। তিনি নাকি ওড়িয়া ভাষা নিয়ে পাস করেছিলেন। পাটনায় কলেজে পড়তে এসে তিনি বাংলা-ভাষা নিতে চান। এবং সে জন্য তাঁকে এক বছরের মধ্যে নতুন ক'রে বাংলা-সাহিত্যে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিতে হয়। সেই পরীক্ষায় তিনি বাংলা-ভাষায় সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করেন। তারপর আই. সি. এস. পরীক্ষা দিয়ে শিক্ষার্থী হিসেবে বিলেত গিয়ে যখন 'পথে প্রবাসে' লিখতে শুরু করেন, তখন তাঁর অসামান্য সাফল্য পাটনার তরুণ-সমাজে একটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল। একজন আই.সি.এস. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ বাঙালীর সাহিত্যপ্রীতি এবং আই.সি.এস. খ্যাতি অপেক্ষাও সাহিত্যিক খ্যাতির মূল্যের তারতম্য পাটনার ছেলেদের মনে নূতন প্রভাব বিস্তার করেছিল—এতে সন্দেহ নেই।

এই ছেলেদের দলের মধ্যমণি ছিলেন যিনি, তাঁর নামও ছিল মণি। বাংলা-সাহিত্যের সেবায় অনুরাগে এবং অধিকারে জন্মাধিকারে উত্তরাধিকার ছিল। অবশ্য সাহিত্যক্ষেত্রে উত্তরাধিকার জন্মাধিকারে থাকে না; দুনিয়ার বিষয়গত জাতিগত উত্তরাধিকার আইন এখানে অচল। তবুও ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে এ উত্তরাধিকার সার্থক হয়। মণির ক্ষেত্রে তাই হয়েছিল। মণি—মণীন্দ্রনাথ সমাদ্দার স্বর্গীয় যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দারের ছোট ছেলে। মণির বড় ভাইয়েরা সরকারী চাকুরে। এক ভাই ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট, এ আমার মনে আছে। মণি এম. এ. পাস ক'রে চাকরির চেষ্টা না ক'রে সাহিত্যসাধনার বাসনা পোষণ করে। তাকেই কেন্দ্র ক'রে নবেন্দু ঘোষ, শিশির ঘোষ, শিশিরের

দাদা, যোগীনবাবুর ছেলে প্রভৃতি একদল বাঙালী তরুণ "প্রভাতী সংঘ" নাম দিয়ে একটি সংঘ স্থাপন করেছে এবং হাতে লিখে 'প্রভাতী' নামে একখানি হাতে-লেখা মাসিক-পত্রে লেখার সাধনা শুরু করেছে।

এঁরা এলেন একদিন আলাপ করতে, ওঁদের সংঘে যাবার জন্য নিমন্ত্রণ জানাতে। সকলেই আমার বড় ছেলের প্রায় সমবয়সী—দু বছর চার বছরের বড়। লাজুক ছেলের দল, চোখে মুখে স্বপ্নের ছাপ, এবং সংকোচও আছে। সে সংকোচ আমাকে নয়; সংকোচ প্রতি বাড়িরই অভিভাবকদের কাছে। তাঁরা তো এই সাধনাকে বেশ প্রীতির চক্ষে দেখেন না, কারণ সাহিত্য-সাধনা যতই ভাল বস্তু হোক, ওটা মানুষের ভবিষ্যৎ নষ্ট করবার পক্ষে স্বাস্থ্যনষ্টকারী ডিস্‌পেপসিয়ার মতই দুরারোগ্য এবং কুটিল ব্যাধি। ধরলে বড় একটা ছাড়ে না এবং চোঁয়াঢেকুর অগ্নিমান্দ্যের মত নিরীহ উপসর্গে শুরু হয়ে বৎসর কয়েকের মধ্যেই যখন পেড়ে ফেলে, তখন আর উপায় থাকে না। সাহিত্য-সাধনাকে তাঁরা মানসিক ডিস্‌পেপসিয়া ব'লেই মনে করতেন।

'প্রভাতী সংঘ' পাটনার বাঙালী-সমাজে সত্যকারের সাহিত্যরুচি সৃষ্টি ক'রেই ক্ষান্ত হয় নি। মণীন্দ্র শক্তিশালী সম্পাদক সমালোচক হয়ে উঠেছিলেন। 'প্রভাতী সংঘে'র নবেন্দু ঘোষ বাংলা-সাহিত্যে শক্তিমান লেখক হিসেবে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। শিশির ঘোষ আজ বিশ্বভারতীতে অধ্যাপক, বর্তমানে তিনি শুনেছি শ্রীঅরবিন্দের দর্শনের পথে সাধনা করেন, অন্যথায় তিনিও বাংলা-সাহিত্যে সম্পদ যোজনা করতে পারতেন। মণীন্দ্র অকালে মারা গেছেন। মণীন্দ্রের হাতে লেখা 'প্রভাতী' বৎসর কয়েকের জন্যে ছাপা হয়ে প্রকাশিত হয়েছিল। 'প্রভাতী' স্বল্পকালের মধ্যেই বিশিষ্ট একটি ছাপ রেখে গেছে। 'প্রভাতী'র দাবিতেই "বনফুলে"র বিখ্যাত উপন্যাস 'রাত্রি' প্রকাশিত হয়েছে। আমার 'কবি' উপন্যাসও 'প্রভাতী'তে প্রকাশিত হয়েছে। কয়েকজন নবীন লেখকের কয়েকটি বিখ্যাত গল্পও 'প্রভাতী'ই হাতে তুলে সাহিত্যের দরবারে হাজির করেছে।

চোখে হাই-পাওয়ার চশমা, মাথায় কোঁকড়া চুল, ভারী গলা মণি সমাদ্দারের মুখে হাসি লেগেই থাকত। তাঁর বাড়িতেই ছিল 'প্রভাতী সংঘে'র স্থায়ী আসর। আর তাঁদের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন আমাদের রতীনদা। অকৃতদার রতীনদা নিজের ঘরদোর গোছগাছ করতে এবং আশপাশ পরিচ্ছন্ন পবিত্র রাখতেই সারা জীবন নিজে সাহিত্য-সাধনার সময় পেলেন না; কিন্তু এই উদারচরিত্র সাহিত্যানুরাগী মানুষটি যেখানেই এবং যার মধ্যেই সাহিত্য-সাধনার সন্ধান পেয়েছেন, সেইখানেই সেই জনকেই অকৃপণ স্নেহে সাহায্যে সমৃদ্ধ করবার প্রাণপণ চেষ্টা করেছেন।

উনি আমাকে বলেছিলেন, তুমি যেও তারাশঙ্কর, ওদের উৎসাহ দিও। বুঝলে! বড় ভ ল ছেলে ওরা।

আমি একদিন গেলাম মণির বাড়ি।

গিয়েই মনে হ'ল, এ কোথায় এলাম? এ যে সাধকের সাধনপীঠ! স্বর্গীয় যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার মশায়ের লাইব্রেরি-ঘর। রাশি রাশি বই চারিদিকে, মাঝখানে এবং আলমারিগুলির ফাঁকে অসংখ্য প্রস্তরমূর্তি—সে এক বিচিত্র সংগ্রহশালা! এক জ্ঞানীর জ্ঞানভাণ্ডার!

বুঝলাম, মণির উত্তরাধিকার কিসের জোরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

অল্পবয়সে পিতৃহীন ছেলেটি, এই ঘরের চারিপাশে ঘুরেছে আর স্বপ্ন দেখেছে। পৈতৃক সাধনার মূল্য উপলব্ধি করেছে দেহের প্রতি রোমকূপে-কূপে, আবেগময় রোমাঞ্চের মধ্যে।

সেদিন মণি আমাকে তার বাবার লেখা বিখ্যাত গ্রন্থ 'সমসাময়িক ভারতে'র কয়েক খণ্ড উপহার দিয়েছিল। স্বর্গীয় সমাদ্দার মশায়কে প্রণাম জানিয়ে তা গ্রহণ করেছিলাম। তারপর আরও কয়েক দিন গেলাম ওদের আড্ডায়। সকলেই ওরা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র, রাশি রাশি ইংরেজী বই পড়েছে। আমি তার কিছুই পড়ি নি। ওরা আলোচনা করত, আমি মুগ্ধ হয়ে শুনতাম। কিন্তু মধ্যে মধ্যে মনে হ'ত, এই প'ড়ে ওদের ইউরোপের সাহিত্য এবং ওই দেশের

বিচিত্র জীবনধর্ম সম্পর্কে যা ওরা জেনেছে তাই যদি এ দেশের মানুষের জীবনধর্ম সম্পর্কে সত্য ব'লে মনে করে, কি প্রয়োগ করে, তবে কিন্তু ভুল হবে

যেমন মনে হয়েছে, এ কালের বুদ্ধদেব বসুর তখনকার লেখা প'ড়ে। তিনি শক্তিমান লেখক, কিন্তু লেখা প'ড়ে তার মধ্যে এ দেশের জীবনের সন্ধান পাই নি। ভাষা প'ড়ে তারিফ করতে হয়—যেমন মাজা-ঘষা, তেমনি চোখা, চমৎকার বাংলা। কিন্তু তবু এ কথা নির্ভয়ে বলব যে, এ ভাষা তো বাঙালীর ভাষা নয়। পাত্র-পাত্রীগুলির দেশী কাপড় জামা বেশভূষা সত্ত্বেও মনে হয় এরা কারা? বাঙালী? ইংরেজ? মানুষ? তাই যদি হয়, তবে জীবন কোথায়? তার স্পর্শ কই?

যাই হোক, ওরা আমাকে কিছু কিছু বই পড়ালে। তারপর একদিন বললে, ওরা একটি উৎসব-অনুষ্ঠান করবে। 'প্রভাতী সংঘে'র প্রথম বার্ষিক অনুষ্ঠান। আমি আছি এখানে, আর ওরা নিমন্ত্রণ করছে শ্রীসজনীকান্ত দাসকে, বনফুলকে এবং শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়কে। রতীনদা উৎসাহিত করেছেন। শচীমামা বলেছেন, খুব ভাল, আন, আন। জমিয়ে তোল আসর। আমি সেদিন শচীমামার সান্ধ্যমজলিসে যাওয়ামাত্র বললেন, ওগো, ভাগ্নেকে ভাল ক'রে খেতে দাও। ওকে সারিয়ে তোল। এবার আসরে গাওনা গাইতে হবে। গায়ে জোর না হ'লে গাইবে কি ক'রে?

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

সংবাদ-সাহিত্য

খোকা পাঁচ বছরেরটি হইয়াছে, জন্ম হইতেই বিকলাঙ্গ বলিয়া পাঁচ বছরেও তেমন মজবুত হয় নাই, ফলে বুদ্ধিটাও তেমন আশানুরূপ খোলে নাই। পাঠশালায় দেওয়া দূরের কথা, এখনও তাহার "খাব খাব" বায়না সামলাইতে কর্তাগিন্নীদের প্রাণান্ত হইতেছে। তাই তাঁহারা অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া একটি পঞ্চবার্ষিকী

চুষিকাঠি প্রস্তুত করিয়া তাহার হাতে তুলিয়া দিবেন স্থির করিয়াছেন। দেখিয়া আনন্দিত হইলাম, হায়দারাবাদে সম্প্রতি-অনুষ্ঠিত কংগ্রেসও এই সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়াছেন। এখন আর ভয় নাই, খোকা যথেচ্ছ খাবার পাইবে অর্থাৎ চুষিকাঠি চুষিতে চুষিতে ভাবিবে, খাবার খাইতেছে—তাহার কান্না থামিবে। যাহাদের হাতে তাহার দেখা-শোনার ভার তাহাদের জন্যও কর্তারা যথাসাধ্য ঝুমঝুমি-আওয়াজের ব্যবস্থা করিয়াছেন। ঝুমঝুম আওয়াজটা যত দিন থাকিবে, তত দিন খোকার সম্বন্ধে আমরা একরূপ নিশ্চিন্ত।

* * *

অনেকে সন্দেহ করিবেন, উপরোক্ত মন্তব্যের দ্বারা আমরা পলিটিক্স করিতেছি। আমাদের পলিটিক্স-বর্জন-প্রতিজ্ঞা যাঁহাদের স্মরণ আছে, তাঁহারা কৌতুক বোধ করিতে পারেন। তাঁহাদিগকে আমরা শুধু এইটুকুই স্মরণ করাইয়া দিতে চাই, যুগধর্মকে এড়ানো আমাদের মত দুর্বলের পক্ষে সহজ নয়; স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যুগধর্মকে অতিক্রম করিতে পারেন নাই। এ-যুগে—যাহার যাহা করিতে নাই সে তাহাই করিবে ইহাই ভবিতব্য; অন্তত ভারতবর্ষে। দেখুন না, যাঁহার পুরাপুরি মোগল বাদশাহী মেজাজ, প্রায় সম্রাট্ ঔরংজেবের মত —মসনদে না বসিয়া তিনি টো-টো করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন আর বক্ বক্ করিতেছেন, বক্ বক্ করিতেছেন আর টো-টো করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন; আর বিদুরের মত যাঁহার ভিক্ষালব্ধ ক্ষুদেই তৃপ্তি, তিনি হস্তিনাপুরের রাজা সাজিয়াছেন। যে সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের উচিত ছিল সমগ্র ভারতের শিক্ষা-বিভাগের অধিনায়কত্ব করা, তিনি অ্যাসিস্টাণ্ট বড়লাট হইয়া জুতোসেলাই হইতে চণ্ডীপাঠ করিতে করিতে সকল শিক্ষাদীক্ষা ভুলিতে বসিয়াছেন; যাঁহার উচিত ছিল আবগারী বিভাগের সর্বময় কর্তৃত্ব করা, তিনি একহাতে নিজের ছুঁচলো ফ্রেঞ্চকাট দাড়িতে হাত বুলাইতে বুলাইতে বুড়া বয়সে কবীরপন্থী হইয়া দেওয়ানা হইবার দাখিল। পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ

্কিৎসক ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় ভারতের স্বাস্থ্যমন্ত্রী না হইয়া ্কৃষ্ট পরিবহন-প্রণালীর কথা ভাবিয়া ভাবিয়া গলদ্ঘর্ম হইতেছেন, আর ্রীমতী অমৃত কাউর যিনি অন্তঃপুরসম্রাজ্ঞী হইতে পারিতেন, চোস্ত ্ংরেজীতে দেশের মৌখিক স্বাস্থ্যপরিচর্যা করিতেছেন! কত দেখাইব? বাংলা দেশেও দেখুন ভাল দাঁতের ডাক্তার হইয়াছেন ্ই-লাঙলের কাজী। পানদোক্তার মহামন্ত্রী হইয়াছেন মৎস্যমন্ত্রী। আর বশি বলিলে বন্ধুত্ব ছুটিবার আশঙ্কা আছে, সুতরাং নিরস্ত হইলাম। ্কলেই যখন অনধিকারচর্চা করিতেছেন, তখন আমরাও না হয় করিলাম! এটা সত্যযুগ তো নয়।

—

কং্গ্রেস-সভাপতির পদত্যাগ করিবার কিছুকাল পরে ১৯৩৯ ্নে সুভাষচন্দ্রের একবার শান্তিনিকেতন যাইবার কথা হয়, সেই উপলক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সংবর্ধনার জন্য একটি অভিভাষণ রচনা করেন। কবি হঠাৎ গুরুতর রোগাক্রান্ত হওয়ায় শেষ পর্যন্ত সুভাষচন্দ্রের যাওয়া ঘটিয়া উঠে নাই। কবির অভিভাষণটি পরে প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে তিনি লিখিয়াছিলেন, "নানা কারণে আত্মীয় ও পরের হাতে বাংলাদেশ যত কিছু সুযোগ থেকে বঞ্চিত…আজ চারিদিকেই দেখতে পাই বাংলাদেশের অকরুণ অদৃষ্ট তাকে প্রশ্রয় দিতে বিমুখ।" যত দিন যাইতেছে, তাঁহার এই নালিশ ক্রমেই বড় হইয়া উঠিতেছে। স্বাধীনতালাভের কিছু আগে রাজাজী বলিয়াছিলেন, বাংলা ও পাঞ্জাবের জন্য ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আটকাইয়া যাইতে পারে না। সে সময় এখানে আন্দোলন না হইলে হয়তো গোটা বাংলাটাকেই পাকিস্তানে ঠেলিয়া দিয়া ভারতের স্বাধীনতালাভের চেষ্টা হইত। সেই অবস্থায় বাধ্য হইয়াই বাঙালী বাংলা-বিভাগে রাজী হইয়াছিল, অর্থং ত্যজতি পণ্ডিতঃ—এই নীতি গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। এই বিভাগের খড়্গ বাংলার উপর পড়ার পর হইতে আমরা এখনও কেবলই মার খাইতেছি। পাঞ্জাবে উদ্বাস্তুদের জন্য

যে খরচ এবং যে হারে খরচ হইয়াছে, বাংলায় তাহা অপেক্ষা অনেক কম হইয়াছে। বাংলা দেশের আয়তন বৃদ্ধির জন্য বার বার অনুনয়-বিনয় ব্যর্থ হইতে চলিয়াছে, বরং সে কথা তোলার জন্য আমাদের কড়া ধমক খাইতে হইয়াছে। বাংলা দেশ হইতে আয়কর আদায় হয় সবচেয়ে বেশি, অথচ আয়করের যে অংশ বাংলা দেশের প্রাপ্য তাহা ধাপে ধাপে ক্রমশই কমাইয়া দেওয়া হইতেছে। ফাইনান্স কমিশনের সামনে সেই কথা স্পষ্ট করিয়া বলার জন্য কমিশনের সভাপতি ধমক দিয়াছিলেন— এ খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। বাংলার সঙ্গত দাবি-দাওয়াও গৃহীত হয় না। অন্য সব জায়গায় নূতন নূতন নদী-পরিকল্পনা গৃহীত হইল, কিন্তু বাংলা দেশের পক্ষে অতি প্রয়োজনীয় ফরাক্কা-পরিকল্পনা পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা হইতে বাদ গেল—নানা চেষ্টা সত্ত্বেও কোনও ফল হইল না। ওয়ার্কিং কমিটীতে বাংলা দেশের কাহারও স্থান হইল না, এমন কি ডক্টর রায়ের মত লোক থাকা সত্ত্বেও ওয়ার্কিং কমিটীতে লইবার জন্য বাংলা দেশ হইতে কোনও লোক পাওয়া গেল না। বাংলা দেশে এই রকম নালিশ ক্রমেই বাড়িতে থাকিলে শেষ পর্যন্ত তাহা সামলাইতে পারা যাইবে তো? আমরা আপাতত কবি-বাণী স্মরণ করিয়াই ক্ষোভ সংবরণ করিব—

"ভাগ্যের সেই বিড়ম্বনাকেই সে [বাংলাদেশ] আপন পৌরুষের আকর্ষণে ভাগ্যের আশীর্বাদে পরিণত ক'রে তুলবে, এই চাই। আপাত পরাভবকে অস্বীকার করায় যে বল জাগ্রত হয়, সেই স্পর্ধিত বলই তাকে নিয়ে যাবে জয়ের পথে।..."

—

বাংলার মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রীয় অনুজ্ঞার বিরুদ্ধাচরণ করিতেছেন দেখিয়া দুঃখিত হইয়াছি। সম্ভবত তাঁহাকে সে সব প্রাচীন কথা স্মরণ করাইয়া দিবার মত পণ্ডিত কেহ আশেপাশে নাই। অতবড় ভাওয়াল-মামলার রায় লিখিয়া শিক্ষামন্ত্রী মহাশয়ের প্রাচীন শাস্ত্রজ্ঞান একেবারে ঘুলাইয়া যাওয়ার কথা,

সুতরাং বিধানচন্দ্রকে বিধান দিবে কে? আমাদের শাস্ত্র বলিতেছেন, "সর্বনাশে সমুৎপন্নে অর্দ্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ"। অথচ দেখিতেছি, আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় বাংলা দেশের মন্ত্রীর সংখ্যা প্রায় ডবল করিয়া ফেলিলেন! সর্বনাশ যে সমুপস্থিত, তাহাতে কাহারও সংশয় নাই, বিধানচন্দ্রেরও নাই। মনে হইতেছে, কোনও জাল পণ্ডিত তাঁহাকে শাস্ত্রবাক্য বিকৃত করিয়া নির্দেশ দিয়াছেন—"সর্বনাশে সমুৎপন্নে ডবলং করোতি ডাক্তারঃ।" এই হালী উপদেশ যে, রোগীর সর্বনাশ উপস্থিত হইলে চিকিৎসার ফিজ (fees) ডবল করা বিষয়ক—ইহা বিস্মৃত হইয়া ডক্টর রায় রাষ্ট্রের উপরেই তাহা প্রয়োগ করিতেছেন, ইহা অত্যন্ত পরিতাপের কথা।

—

বিধানচন্দ্রের কথা বলিতে মনে পড়িল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন-উৎসবের শেষ দিনে আমরা উপস্থিত ছিলাম; পরস্পর-পিঠ-চুলকানি-সমিতির (সংক্ষেপে প. পি. চু. স.) উদার কার্যকলাপ দেখিয়া সেদিন পরম পরিতোষ লাভ করিয়াছিলাম। নিজের মুখে অন্নের গ্রাস যে অমন ঘটা করিয়া তোলা যায়, সমগ্র 'পুরোহিত-দর্পণ' ঘাঁটিয়াও তাহার তুলনা পাইলাম না। যাহা হউক, ডক্টর রায়ের প্রারম্ভিক ভাষণের কথা বলিতেছি। তিনি আমাদের ভাইস-চ্যান্সেলার শম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয়ের পরিচয় দিতে গিয়া তাঁহার মারাত্মক সাধুতার উল্লেখ এই ভাবে করিলেন, "এমন একজন ন্যায়পরায়ণ সাধু ব্যক্তি সমগ্র দেশে দুর্লভ। তাঁহার পিতাও যদি কোনও গুরু অপরাধে ধৃত হইয়া তাঁহার আদালতে বিচারার্থ নীত হন, ইনি তাঁহাকে অপরাধী সাব্যস্ত করিলে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলাইতেও ইতস্তত করিবেন না, অবশ্য পরে আত্মহত্যা করিয়া চিত্তের গ্লানি অপনোদন করিবেন।" যে সাধুতা পিতাকে হত্যা করিয়া আত্মঘাতী হয়, তাহা ত্রিভুবনে দুর্লভ বইকি! সত্য সত্যই এইরূপ মারাত্মক সততার দৃষ্টান্ত পুরাণে ইতিহাসে পাই না। গত সংখ্যায় ডক্টরেট-দান প্রসঙ্গে এমন সাধু ব্যক্তির প্রতি কটাক্ষ

করিয়া আমরা অতিশয় লজ্জিত হইয়াছি। আচার্য যোগেশচন্দ্র, আচার্য যদুনাথ প্রভৃতি মনীষীকে অনররি ডক্টরেট না দিবার নিশ্চয়ই কোনও সঙ্গত কারণ আছে, যাহা আমরা জানি না। তাহা বিজ্ঞাপিত করিয়া সাধু শম্ভুনাথ আমাদের ভ্রান্তি দূর করিবেন, ইহাই আমরা চাই। গত সংখ্যায় বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক সত্যেন্দ্রনাথ বসুর ডক্টরেট না পাওয়ার উল্লেখ করিতে ভুলিয়াছিলাম ভাবিয়া কন্‌ভোকেশনের দিন পর্যন্ত আমরা অতিশয় লজ্জিত ছিলাম। বিধানবাবুর মুখে ডক্টর শম্ভুনাথের গুণকীর্তন শুনিয়া সে দিক দিয়াও আমরা নিশ্চিন্ত হইয়াছি। কোনও ত্রুটি বা অপরাধ না থাকিলে শম্ভুনাথের রাজত্বে এইরূপ হইতেই পারে না। আচার্য যোগেশচন্দ্র, আচার্য যদুনাথ ও আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ, এ কথা আজ আপনারা জানিয়া রাখুন, যতই গুণসম্পন্ন আপনারা হউন, কোনও ছিদ্র দিয়া আপনাদের অঙ্গে কলির প্রবেশাধিকার ঘটিয়াছে, নহিলে কলির জামদগ্ন্য শম্ভুনাথ নিশ্চয়ই আপনাদের অনররি ডক্টরেট দানে সম্মানিত করিতেন। চেষ্টার ত্রুটি করি নাই, এখন আমরা নাচার।

ভূতপূর্ব প্রবাসী-বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলন—অধুনা নিখিল-ভারত-বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলনের আটাশতম অধিবেশন কটকে মহাসমারোহে হইয়া গেল; এই ব্যাপারে উড়িষ্যাবাসীরা যে উদারতা বদান্যতা ও ধৈর্যের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। সাহিত্যকে এতখানি সম্মান ইদানীং কালের মধ্যে আর কোনও প্রদেশ দেয় নাই। আমরা কৃতজ্ঞ, এবং সম্মেলনের কর্তৃপক্ষের প্রতিও এই ভাবিয়া কৃতজ্ঞ যে, বাংলা-সাহিত্যের অগ্নি তাঁহারা নানা অসুবিধার মধ্যেও প্রজ্বলিত রাখিয়াছেন। মূল সভাপতি ডক্টর শ্যামাপ্রসাদের ভাষণ পড়িয়া আমরা আশান্বিত ও আশ্বস্ত হইয়াছি। ডক্টর মুখোপাধ্যায় সভাপতির উচ্চাসন হইতে যে কথাটা কম্বুকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন, আমরা দীর্ঘকাল যাবৎ সে কথাটাই বলিবার চেষ্টা করিয়াছি—

"বাংলা দেশের কবি সাহিত্যিক ও চিন্তাশীল ব্যক্তিরা যদি বাংলা-ভাষার উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধির চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করেন, জীবনের

সকল ক্ষেত্রকে জড়াইয়া লইয়া যদি সাহিত্যের মাধ্যমে নূতন ভাবধারা সৃষ্টি করিতে পারেন, বর্তমানের পরিধিকে অতিক্রম করিয়া ভবিষ্যতের ইঙ্গিত দিতে পারেন, তাহা হইলে কোন আঘাতই তাহাকে খর্ব করিতে পারিবে না। আপন প্রাণ-প্রাচুর্যে, অন্তরের শক্তির বেগে সে ভাষা সকল বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া স্বমহিমায় সুদৃঢ় গৌরবোজ্জ্বল ভিত্তিতে আত্মপ্রতিষ্ঠ হইয়া উঠিবে।"

শ্রী মুখোপাধ্যায় মহাশয় রাষ্ট্রভাষা হিন্দী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তাও চমৎকারভাবে বুঝাইয়া দিয়াছেন, ভাষা ও সাহিত্যে বাঙালী চিরদিন অগ্রণী। এ ক্ষেত্রেও সামান্য সঙ্কীর্ণতা পরিহার করিতে পারিলে তাহার প্রাধান্য অনিবার্য। তিনি বাঙালীকে আত্মস্থ হইতে বলিয়াছেন, তাহার যথার্থ গৌরব স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন; তাঁহার ভাষণ প্রত্যেক বাঙালীর পঠনীয় ও চিন্তনীয়।

* * *

"বনফুল" স্মরণ করিয়াছেন বাঙালীর অতীত গৌরব-মহিমা। বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছিলেন, যে নিজের জাতিকে ধিক্কার দেয় সে ধিক্। "বনফুল" সে ধিক্কার হইতে বাঙালী জাতিকে রক্ষা করিতে চাহিয়াছেন, বাঙালী-গৌরবের যে ফিরিস্তি তিনি দিয়াছেন, আজিকার অধঃপতিত বাঙালী তাহা সম্মুখে রাখিয়া চলিলে উপকৃত হইবেন। তিনি সাহিত্যিক, বর্তমান সাহিত্যের বিকৃতি দেখিয়া তিনি বিষণ্ণ; কিন্তু সাহিত্যের প্রতি তাঁহার ভরসা অপরিসীম।

* * *

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, বৃহত্তর-বঙ্গ-শাখার সভাপতি শ্রীদেবেশচন্দ্র দাস আই. সি. এস. রবীন্দ্রোত্তর বাংলা-সাহিত্যে যে উল্লেখযোগ্য কিছু সৃষ্টি হইয়াছে তাহা স্বীকার করেন না। এমন অজ্ঞ ব্যক্তি যে কি করিয়া একটা শাখায় বসিলেন জানি না। রবীন্দ্রোত্তর বাংলা-সাহিত্যে স্মরণীয় এবং গণনীয় অনেক কিছু হইয়াছে এবং হইতেছে। রবীন্দ্রনাথ যে স্কাই-স্ক্র্যাপার নির্মাণ করিয়াছেন, তাহার আশেপাশে অসংখ্য সৌধ নির্মিত হইয়াছে এবং প্রতিদিন হইতেছে ও সমগ্র বাংলা-সাহিত্যক্ষেত্র

একটা সুগঠিত নগরীর আকার ধারণ করিতেছে। ইতিহাস বিজ্ঞান দর্শন ব্যাকরণ অলঙ্কার অভিধান নৃতত্ত্ব ভূতত্ত্ব সমাজতত্ত্ব—প্রত্যেক বিষয়েই আমরা মাতৃভাষায় আলোচনা করিবার অধিকারী হইয়াছি; গল্প-উপন্যাস-কবিতা-প্রবন্ধে যে একটুও পিছাইয়া আছি তাহা নয়। যে কোনও পুস্তকালয়ের তালিকা একটু নজর দিয়া লক্ষ্য করিলেই দাস মহাশয় দেখিতে পাইতেন, বাংলা-সাহিত্য তাহার একপেশেমি কাটাইয়া উঠিয়া সুষম স্বাস্থ্যকর অবস্থায় উন্নীত হইতেছে এবং এইরূপ হইতে থাকিলে অদূরভবিষ্যতে আমাদের সন্তানদের মাতৃভাষায় কোনও কিছু শিক্ষারই অসুবিধা হইবে না। দেখিতেছি, দেবেশ দ. মহাশয় এই সম্মেলনের আগামী বৎসরের সভাপতি হইলেন। আশা করি, তিনি বৎসরকালের মধ্যে মাতৃভাষা ও সাহিত্যের বর্তমান অবস্থাকে সম্মান করিবার মত জ্ঞান অর্জন করিবেন।

ডাইরি ও ক্যালেণ্ডার দিয়া অনেকে আমাদিগকে বিপন্ন ও কৃতার্থ করিয়াছেন। বিপন্ন কেন, তাই বলিতেছি—যথাযথ রূপে ডাইরি-ব্যবহার একটা তপস্যা। নূতন ডাইরি পাওয়া মাত্র নানা-ভাবে এই সাধনা শুরু হয়, কিন্তু কিছুদিন যাইতে না যাইতে তপঃ-ভঙ্গের গ্লানি অনিবার্য হইয়া উঠে। এ বিপদ আমাদের ব্যক্তিগত। বহু ব্যক্তি যে উপকৃত হন, তাহার খবর জানি। সুতরাং ব্যবসায়ী এ. মুখার্জি অ্যাণ্ড কোং ও এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্সকে তাঁহাদের ছোট বড় বিবিধ ডাইরির জন্য এবং অ্যামেচার বেঙ্গল কেমিক্যাল, ক্যালকাটা কেমিক্যাল, দেব-সাহিত্য-কুটির, হিমানী, ইণ্ডিয়ানা লিঃ, কিরীট অ্যাডভারটাইজিং এজেন্সি প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানকে ছোট ডাইরি ও ক্যালেণ্ডারের জন্য ধন্যবাদ দিতেছি। পূর্বোক্তদের সকল ডাইরি নিঃশেষ হইয়া যাক এবং শেষোক্তদের ব্যবসায়ে প্রসার ঘটুক—ইহাই কামনা।

শনিরঞ্জন প্রেস, ৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, বেলগাছিয়া, কলিকাতা-৩৭ হইতে শ্রীসজনীকান্ত দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ফোন: বড়বাজার ৬৫২০

শনিবারের চিঠি
২৫শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ফাল্গুন ১৩৫৯

জেলের চিঠি

[গত পৌষ মাসে "জেলের চিঠি" শীর্ষক প্রবন্ধে শ্রীপান্নালাল দাশগুপ্ত এবং শ্রীনির্মলকুমার বসুর দুইখানি পত্র প্রকাশিত হয়। সে সম্পর্কে শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ একটি প্রশ্ন উত্থাপন করেন ও শ্রীপান্নালাল দাশগুপ্ত দ্বিতীয় এক পত্র লেখেন। নির্মলবাবুর উত্তর সহ সেগুলি প্রকাশিত হইল।—শ. চি. স.]

প্রিয়বরেষু,

'শনিবারের চিঠি'তে আপনার যে চিঠিখানি (শ্রীযুক্ত পান্নালাল দাশগুপ্তকে লেখা) ছাপা হয়েছে, সেটা দেখবার সুযোগ ঘটেছে।

ব্যক্তিগতভাবে খুশি হবারও দুটি কারণ ঘটেছে চিঠিটি প'ড়ে। আপনি লিখেছেন :—

(১) "ব্যক্তিগতভাবে আমি রাষ্ট্রশক্তিতে বিশ্বাসী এবং গান্ধীবাদকে প্রতিষ্ঠিত করতে হ'লেও যে শেষ পর্যন্ত রাজধর্মের আশ্রয় নিতে হবে এ কথাও মনে করি।"

বহুকাল পূর্বে 'শনিবারের চিঠিতে'ই "গান্ধীবাদ ও হিন্দু-মুসলমান-সমস্যা" নামে আমাদের যে আলোচনা হয়েছিল, তার মধ্যে আমি ঠিক এই কথাটাই বলবার চেষ্টা করেছিলাম। লিখেছিলাম, "রাষ্ট্রভীতি কি আজও বজায় রাখিবার কোনও কারণ আছে?" তখন আপনি থোরো-র মতবাদ উদ্ধৃত ক'রেই ক্ষান্ত হয়েছিলেন, আপনার নিজের মতবাদ দেন নি। এখন আপনার নিজের মতামতে আমার কথাটার সমর্থন পেয়ে বড় আশ্বাস মিলল।

(২) দ্বিতীয়ত, আপনি লিখেছেন, "নাবিক যেমন ধ্রুবতারার প্রতি লক্ষ্য রেখে সমুদ্রে নৌকার গতি নিয়ন্ত্রণ করে, আমাদের তেমনই গান্ধীবাদের মৌলিক নীতিগুলির প্রতি দৃষ্টি অবিচল রেখে নৌকার হালকে পরিচালনা করতে হবে।"

এটাও খুব বড় কথা। সূত্র ঠিক থাকলেও ব্যাখ্যার চোটে সূত্র মারা যায়, এ তো প্রায়ই ঘ'টে থাকে। কম্যুনিজ্‌মের বেলাতেও তাই ঘটেছে অনেক সময়, যদিচ লেনিন স্বয়ং বলেছিলেন—Communism is not a dogma। এখানেও যদি সে বিপদের হাত না এড়ানো যায়, তা হ'লে গান্ধীবাদ পর্যবসিত হবে কেবল নিমপাতার রস খেয়ে থাকায়। সম্প্রতি আমি ভয়ে ভয়ে এই কথাটার ইঙ্গিত করতে চেয়েছিলাম 'বিশ্বভারতী পত্রিকা'র এক প্রবন্ধে। কিন্তু আপনি এই কথাটা বলায় এ বিষয়েও একটা খুব বড় নির্ভর মিলল।

কিন্তু আরও দুটো কথা মনে হচ্ছে। "গান্ধীবাদ সম্বন্ধে কর্মীর অভাব নেই, জ্ঞানীর অভাব ঘটেছে"—এই কথাটা আর একবার ভেবে দেখবার জন্য অনুরোধ করি। আমার মনে হয় দুয়েরই অভাব ঘটেছে। কারণ কর্ম করবার অবসর কোথায়? সমাজ ও রাষ্ট্রের গঠন যে অন্য পথে চ'লে যাচ্ছে। এ অবস্থায় ঐ ধরনের কর্মের অবকাশ খুব ক'মে যাচ্ছে না কি? এমন কি আজ বিনোভার কর্মকেও যদি রাষ্ট্র সহায়তা না দিত, তা হ'লে তাঁর সাধনাও ব্যক্তিক সাধনার ক্ষীণ ধারাতেই শেষ হয়ে যেত। সমাজে ঢেউ জাগানোর অবশ্য-প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আপনি যে কথা লিখেছেন, তার ধারে-কাছেও পৌঁছত না। এমন কি, এত চেষ্টা সত্ত্বেও তা বড় কোনও ঢেউ জাগাতে পেরেছে কি না সে বিষয়েও সন্দেহের অবকাশ এখনও যায় নি। তা ছাড়া কম্যুনিজ্‌মের মত গান্ধীবাদেরও একটা ব্যাপার হ'ল যে, ওটা কেবল idle theory নয়, philosophy and action একসঙ্গে জড়ানো। আগে থিওরি নিখুঁত ক'রে তবে কাজে নামব, এমন কথা সেজন্য বলা চলে না। বরং কাজ করতে করতে খুঁতগুলো চোখে পড়লে সেই অনুসারে মৌলিক ভঙ্গীটা বজায় রেখে কিছুদূর গ'ড়ে-পিটে নেওয়া যায়। যাঁরা এ বিষয়ে জ্ঞানী তাঁরাই কর্মী,—আবার কর্মীরা (অর্থাৎ আসল কর্মীরা, শুধু নিমপাতার রস খাওয়ার অনুকরণকারীরা নয়) নতুন জ্ঞান দিতে পারবেন। সেইজন্য আমার মনে হয়, ও দুটিকে তফাত ক'রে দেখবার

দরকার নেই। আসল কথা হ'ল, জ্ঞানে ও কর্মে যুগপৎ গান্ধীবাদের প্রতিষ্ঠা ও আচরণ।

কিন্তু এইখানেই আমার দ্বিতীয় কথা মনে হয়। আপনি জানেন যে, ভারতবর্ষের বর্তমান সমস্যায় গান্ধীবাদের মূল নীতির মধ্য দিয়ে তার প্রকৃত এবং সত্যিকারের নতুন ধরনের সমাধান হতে পারে—এ কথা আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি। এই বিশ্বাস হৃদয়াবেগের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, যুক্তির উপরই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আমার মনে। কারণ, অন্ধভক্তি বা নির্বিচার শ্রদ্ধা করতে পারি গান্ধীজীকে, কিন্তু গান্ধীবাদকে নয়। ভারতবর্ষের মাটির সঙ্গে সত্যিকারের যোগ রেখে ভারতীয় ধারার সঙ্গে এতখানি মিলিয়ে মনুষ্যত্বের এত বড় আহ্বানের মধ্য দিয়ে এক নতুন ভঙ্গীতে আমাদের সমস্যা সমাধানের এমন কথা আর কেউ বলেন নি ব'লেই গান্ধীবাদের মূল কথাটায় বিশ্বাস করি। কিন্তু বিশ্বাস করলে কি হবে, এদিকে যে 'বহিয়া যেতেছে সুসময়'। আপনি তো জানেন, ইতিহাসের চাকা কখনও উলটো পাকে ঘোরে না। এক দিকে ঘটনার স্রোত একবার চ'লে গেলে তা আর কখনও উৎসমুখে ফেরানো যায় না। যত দিন যাচ্ছে আমরা একটা দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। বলা বাহুল্য, সেটা গান্ধীবাদের দিকে নয়, উলটো দিকে। যেমন, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা। এখন সেই অনুসারে যদি আমরা Private sector-এ বড় বড় শিল্প খুব কেন্দ্রীভূতভাবে স্থাপনা ক'রে ফেলি, তখন আমরা স্বেচ্ছাতেই হোক অনিচ্ছাতেই হোক, এমন একটা কাঠামো গ'ড়ে ফেলব এবং সমাজবিন্যাস ও শ্রেণীসংঘর্ষকে এমন চেহারা দিয়ে দেব যে, তা থেকে স'রে এসে আবার নতুন ক'রে গান্ধীবাদ আরম্ভ করা যাবে না। তখন আমাদের সামনে এগোবার একটিমাত্র রাস্তাই খোলা থাকবে, যে রাস্তা হ'ল কেতাবমাফিক পশ্চিমী সোস্যালিজম্। অথবা যদি আইনের ও ভয়ের গদা ঘুরিয়ে দেশময় collective farm স্থাপন করি, তখন আর গান্ধার enlightened individual collaboration-এর মধ্য দিয়ে জাতীয় স্বার্থরক্ষার উপায় থাকবে না, তখন সেই যান্ত্রিক পদ্ধতির

পরাকাষ্ঠার পাঠ নিতে হবে রুশিয়া বা চীন থেকেই। এই সচল জগতে আমরা ব'সে নেই, স্বেচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক, জ্ঞানে হোক অজ্ঞানে হোক, কোনও না কোনও দিকে এগোচ্ছিই। সম্প্রতি রাষ্ট্রের কার্যক্ষেত্র যত বাড়ছে এবং কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রোত্থিত পরিকল্পনা যত বাড়ছে, ততই আমাদের সজ্ঞানে একটা দিকে এগোবার চেষ্টাই দেখা যাচ্ছে। আমার মতে আপাতত সে চেষ্টা হচ্ছে ক্যাপিটালিস্ট ইমারতের উপর সোশ্যালিস্ট পলেস্তারা লাগানো। তাতে আর যাই হোক, গান্ধীবাদের ভিত্তি স্থাপনের নামগন্ধও নেই। কিন্তু আমরা যখন ঐ দিকেই এগোচ্ছি, তখন শেষ পর্যন্ত আমরা এককালে বুঝতে পারবই যে পলেস্তারা চাপিয়ে ইমারতের ফাটল চিরকাল ঢাকা যায় না। কিন্তু সেটা যখন বুঝতে পারব, তখন আমরা গান্ধীবাদের স্নিগ্ধ কুটির থেকে এতদূরে গিয়ে পড়ব যে, আর সেদিকে নজর ফেরাবার উপায় থাকবে না, তখন নতুন ইমারত গড়তে লেগে যাব রুশিয়া বা চীনের আদর্শে।

তাই মনে হচ্ছে, এখনই বুঝি 'বহিয়া গিয়াছে সুসময়।' আপনি কি মনে করেন? আর কি গান্ধীবাদের প্রতিষ্ঠা হবে? যদি তা হবে না ব'লে মনে করেন, তা হ'লে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন লোকেরা কি এখন থেকেই কোমর বেঁধে কেতাদুরস্ত সোশ্যালিজ্‌ম্ করতে লেগে যাবেন? ইতি

শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

গত ১৫ই ডিসেম্বর আপনাকে দ্বিতীয় পত্রখানা পাঠিয়েছি, আশা করি, তা এতদিনে পেয়েছেন। ইতিমধ্যে টেণ্ডুলকরের 'গান্ধীজী' ও আপনার *Studies in Gandhism* শেষ করেছি। আপনার বইয়েতে গান্ধীজীর যাবতীয় দিকগুলিই বেশ গুছিয়ে দেখানো হয়েছে এবং তাঁর লেখা থেকে বহু উদ্ধৃতি আছে ব'লে বেশ নির্ভরযোগ্য ও আকর্ষণীয় জিনিস হয়েছে। বইখানা আমার কাছেই আপাতত

থাকুক, কেন-না আমাদের আলোচনায় প্রায়ই দরকার হবে। গান্ধী-সাহিত্য ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে যা পাওয়া যায় তা ক্রমে ক্রমে আনিয়ে পড়ছি।...আপনি আরও কিছু বইপত্র পাঠাবেন, বিশেষ ক'রে গান্ধীজীর অর্থনৈতিক উদ্যমের দিকটা একটু ভালভাবে দেখতে চাই। আজকে আমার চিন্তাধারার একটা বিশেষ দিক আপনার কাছে উপস্থিত করছি, তার থেকেই বুঝতে পারবেন আমার সমস্যা কোন্ জাতীয়। বিষয়টা সম্বন্ধে আমার চেয়ে অভিজ্ঞ ও বিদ্বান লোকের হাতে দেওয়া উচিত ছিল, কিন্তু প্রয়োজনের তাগিদে আমাকেই অগ্রসর হতে হচ্ছে।...

(১) যন্ত্র-সভ্যতার প্রচণ্ড আক্রমণে ভারতের গ্রামবাসীদের বৃত্তি-হীনতার জন্য যে বেকার জীবন ও অলসতা এল, প্রচুর শ্রমশক্তি অপচয়ে অপব্যয়ে নষ্ট হতে লাগল, এই দৃশ্যটাই গান্ধীজীকে কুটিরশিল্প, গ্রামোদ্যোগ, গো-সেবা ও সর্বোপরি চরকার ওপর নজর দিতে উৎসাহ দেয়। যন্ত্রদানবের অবারিত আক্রমণ থেকে রক্ষা পাবার উপায় হিসাবে চরকা ও চরকা-সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গী। গান্ধীজী দেখলেন, ভারতের অবস্থা এই যে গড়ে দৈনিক পাঁচ ঘণ্টার অধিক এখানে কাজ হয় না; তাও সেই মান্ধাতার আমলের মোটা মেহনৎ মাত্র, আধুনিক যন্ত্রতৎপর শ্রমশক্তির সাহায্যে নয়। তাঁর নিজেরই ভাষায়, "The problem is how to utilize these billions of hours of the nation without disturbing the rest.," Y I, 6. 4. 21. *Studies in Gandhism*, page 39. কামার, কুমোর, ছুতোর, নাপিত, গুরু, শিক্ষক, কবিরাজ, সবাইকে আবার কাজ দিতে হবে, যন্ত্র-সভ্যতার প্রতিযোগিতাকে প্রতিরোধ করতে হবে, ধনতান্ত্রিক সভ্যতার আপাতমধুর চাকচিক্য ও তথাকথিত বৈজ্ঞানিকতার মুখোশ খুলে দিতে হবে, কোটি কোটি লোকের শ্রমশক্তি আবার তাদের নিজস্ব বৃত্তির মধ্যে নিয়োজিত ক'রে গ্রাম্য জীবন কর্মচঞ্চল ও জীবন্ত ক'রে তুলতে হবে এবং তাতেই যে সঙ্ঘশক্তি, নৈতিকশক্তি ও সংগ্রামশক্তির সৃষ্টি হবে তাতে

দেশ শুধু স্বাধীনই হবে না, তা কোনদিনই আর পরাধীন হবে না, এমন কি দশটা হিটলারের আক্রমণকে শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ করতে পারবে, ইত্যাদি। আধুনিক জীবনের বিলাসপ্রিয়তার মধ্য দিয়ে যে নানা দুর্বলতার সৃষ্টি হচ্ছে তার দিকে সকলের খেয়াল করিয়ে দিয়ে শারীরিক শ্রমের মর্যাদা ও গৌরব প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন তিনি তাঁর সর্বক্ষণের চরকা সহচরটিকে দিয়ে।

(২) কিন্তু চরকা-জীবনের প্রায় ৩৫ বৎসরের ইতিহাস থেকে আজ যে অবস্থাটি দেখা যাচ্ছে তার নমুনা হ'ল এই—প্রচুর খদ্দর অবিক্রিত অবস্থায় চরকা-সঙ্ঘের অর্থনৈতিক কাঠামোকে ভারাক্রান্ত ক'রে তুলেছে, খদ্দর সম্বন্ধে সরকারী ও কংগ্রেসী উৎসাহের প্রাচুর্য থাকা সত্ত্বেও। তাঁতের সম্বন্ধে রাজাজী এক প্রচণ্ড কলরব তুলেছেন এবং আপাতত মিল-মালিকদের কিছু চাপ ও কণ্ট্রোল ক'রে কতকটা অংশ তাঁতীদের জন্য সুরক্ষিত করার ব্যবস্থা হয়েছে। কিন্তু এই গোঁজামিল এই জন্যই সম্ভব হয়েছে যে বর্তমান মুহূর্তে মিলের কাপড়ের চাহিদা দেশে ও বিদেশে সঙ্কুচিত হয়ে উঠেছে। কাপড়ের চাহিদা ও দর তেমনি তেজী থাকলে মিল-মালিকেরা কৃষ্ণমাচারীকে নস্যাৎ ক'রে দিতেন নিশ্চয়। 'উড়ো খই গোবিন্দায় নমঃ' ক'রে মিল-মালিকেরা কিছু কাট (cut) স্বেচ্ছায় মেনে নিলেন। বাটা কোম্পানীর ম্যানেজিং এজেণ্ট সেদিন বাজার-দরের মন্দা নিয়ে যে কান্নাকাটি করলেন তাও অন্যান্য ছোটখাট জুতাশিল্পী ও মুচিদের ওপর আক্রমণের ইঙ্গিত মাত্র। পটারিদের কল্যাণে কুমোর মাথা তুলতে পারছে না, কাটলারি ও কারখানার দৌলতে কামারের হাপর বন্ধ, ইত্যাদি ইত্যাদি। মোট কথা এই কুটিরশিল্প ও শ্রমোদ্যোগ কার্যটি গঙ্গাজলকে আবার গঙ্গোত্রীতে ফিরিয়ে নেবার মতই কঠিন ব'লে মনে হচ্ছে। শুধু তাই নয়, শহরের ছোটখাট শিল্প তো বটেই, এমন কি প্রমাণ-সাইজের শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলিও বিদেশী শিল্পবাণিজ্যের চাপে ত্রস্ত হয়ে উঠছে। মজুর ছাঁটাই হচ্ছে সর্বত্র। বাজারের মন্দার সঙ্গে সঙ্গে দেশীয় শিল্পের

ক্রমবর্ধমান পদধ্বনিও আর শোনা যায় না। সেদিন কৃষ্ণমাচারীর পাঁচশালা কর্মোদ্যমের উৎসাহপূর্ণ বক্তৃতার উত্তরে চেম্বার অফ কমার্সের সভাপতির প্রতিবাদটা লক্ষ্য করেছেন নিশ্চয়ই; লোকটা সটান ব'লে দিলে যে, ভারতের কর্তব্য হচ্ছে এখন প্রচুর উৎপাদন নয়, উৎপাদন হ্রাস!! ধনতান্ত্রিক জগতের ক্রমক্ষীয়মাণ বাজারে একচেটিয়া পুঁজিপতি প্রভুদের ক্রমবর্ধমান প্রতিযোগিতার চাপ ভারতের অবশিষ্ট কুটিরশিল্প ও অপেক্ষাকৃত দুর্বল মূলধনীদের ও ছোট শিল্পপতিদের আরও ধ্বংস ক'রে ছাড়বে। ভারতকে শিল্পপ্রধান দেশে পরিণত করার অতিরিক্ত ও বেসামাল আগ্রহ ভারতের অবস্থা না-ঘরকা না-ঘাটকা ক'রে ছাড়বে এবং এমন কি তার কৃষিকর্মেও সঙ্কট ডেকে আনবে। Cash crop-এর লোভে পাট, চা, আখ, তুলো ইত্যাদি কাঁচা মালের চাষ দেশের চাষবাসটাকেও বিশ্বের ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক সঙ্কটের চাকায় জুড়ে দেবার উৎসাহে চলেছে—অর্থাৎ বিশ্বযুদ্ধ, বিশ্বসঙ্কট ও বিশ্বপ্রতিযোগিতার ভয়াবহ সমুদ্রে ভারতের টলটলায়মান অর্থনৈতিক নৌকাটাকে ঠেলে দিচ্ছে লাভের লোভে, দেশগঠনের প্রয়োজনে নয়। মোট কথা গান্ধীজী যা চেয়েছিলেন, দেশে তার উল্টোটাই চলেছে; অথচ গঠনমূলক কাজ করতে এগিয়ে এসে প্রত্যেক কর্মীকেই গ্রামের শিল্পোদ্যমকে দাঁড় করাবার দায়িত্ব হাতে নিতে হচ্ছে, কিন্তু ধনতান্ত্রিক সভ্যতার প্রতিযোগিতা গ্রাম্য শিল্পকে কিছুতেই দাঁড়াতে দিচ্ছে না। এই পরস্পরবিরুদ্ধ পরিস্থিতির একটা সন্তোষজনক উত্তর যদি না পাই, তবে গঠনমূলক কাজ করব—এ কথা বলার কোন সত্যিকার অর্থ হয় না।

(৩) একটি নিরক্ষর লোকের কাছেও এ কথা আশ্চর্যজনক ব'লে মনে হবে যে, তার হাত দুখানার শ্রমের মূল্য আজ নেই, নিজের অভাব মেটাতেও তা কোন কাজে আসবে না এবং billions of working hours নষ্ট হতেই হবে। Means of production বলতে যদি আধুনিক যন্ত্রপাতি, মাটি ও ব্যাঙ্ক বোঝায় এবং তা ছাড়া যদি চটি

জোড়াও তৈরি হতে না পারে এবং এই উৎপাদিকাশক্তি যদি ধনপতিরাই দখল ক'রে থাকে, তবে উপায়? কম্যুনিজ্‌মের মতে বিপ্লব ক'রে সে উৎপাদিকা-শক্তিকে ধনীদের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে জনসাধারণের হাতে আনতে হবে। গান্ধীজীর মতে ওসব means of production একান্তভাবে আবশ্যক নয়, ও না হ'লেও চলবে, মোটা ভাত মোটা কাপড় তৈরি কর, খাটো, খাও। চরকা মিলকে পরাস্ত করবে, হাপর ব্লাস্ট-ফারনেসকে কেয়ার করবে না ইত্যাদি। কিন্তু তা যদি পারতই, তবে হাপরের ও চরকার এই পরাজয় কেন? সহজে তো কামার তার হাপর ছেড়ে দেয় নি, সহজে গ্রাম থেকে চরকা ও তাঁত উঠে যায় নি। এই চিন্তাধারা কার্যত, বারবার পরীক্ষা করার পরেও ব্যর্থ হয়েছে, গান্ধীজীর মত প্রচণ্ড শক্তিশালী নেতার একান্ত জেদ সত্ত্বেও। কিন্তু এতৎ সত্ত্বেও এ কথা প্রমাণ হয় নি যে, কামার, কুমোর, তাঁতী, কলু ও গ্রামবাসী নরনারীদের ঘণ্টাগুলির আজ আর কোন মূল্য বা উপায় নেই। এবং এই উপায় সহসা সমাজতান্ত্রিক শিল্পোদ্যমের মধ্যেও নেই, কেন-না সমাজতান্ত্রিক শিল্পীকরণ রাতারাতির ব্যাপার নয়, এবং সেই সমাজতান্ত্রিক শিল্পীকরণ(industrialization)-এর সঙ্গে কামার-কুমোরের প্রাচীন কর্মকুশলতার কোন নীতিগত বা বাস্তব বিরোধ নেই। চরকা তাঁত ঘানি কুঠার হাপর হাতুড়ি বাটালি কাটারি এগুলিকে সম্মিলিত গণশক্তির পরিকল্পিত সহযোগিতায় ব্যবহার করতে পারলে তাদেরই সাহায্যে ভারতে বৃহৎ কৃষি ও শিল্পোদ্যম গঠন করা যায়। কিন্তু তাদের বিচ্ছিন্নভাবে ধনতান্ত্রিক কায়দায় ধনতান্ত্রিক যন্ত্রদানবের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় দাঁড় করাতে গেলে পরাজয় অনিবার্য। অর্থাৎ, যে পথে কুটিরশিল্পের পরাজয় ঘটেছে, সেই পথ কুটিরশিল্পকে ছাড়তে হবে। কুটিরশিল্পকে এবারে collective কর্মোদ্যমের মধ্যে আনতে হবে। ব্যক্তিগত মুনাফার সন্ধানে মূলধনীদের মত অগ্রসর হতে চাইলে কুটিরশিল্পের ধ্বংস কেউ রুখতে পারবে না। কুটিরশিল্পের সাহায্যে আজ যারা ধনতান্ত্রিক লাভের বাজারে প্রতিষ্ঠিত হতে চায়, তারা ব্যর্থ

হতে বাধ্য। এমন কি পাঁচ-দশ হাজার মূলধন নিয়েও কোন কারবার করতে যাওয়া বিপদজনক। কিন্তু কুটিরশিল্প, পশুপালন ও চাষকে collective রাস্তায় নিতে পারলে তাদের দ্বারা এমন অর্থনৈতিক দুর্গ তৈরি করা সম্ভব, যার প্রতিরোধশক্তিকে ধ্বংস করতে পারে এমন ক্ষমতা যন্ত্রদানবচালিত ধনতন্ত্রের নেই—ধনতন্ত্রের নিজেরই অবস্থা আজ ত্রাহি ত্রাহি। Collective use of labour on individual ownership এই কৌশলটিকে কার্যত চালু করতে হবে। দ্বিতীয়ত, গ্রামদেশে collective ownership বা বারোয়ারী মালিকানার কাজকর্মের ক্ষেত্র বা public life-এর ক্ষেত্রগুলি ক্রমেই বাড়াতে হবে। রাস্তাঘাট মেরামত, পরিচ্ছন্নতা, জল, চিকিৎসায় group system, নৈসর্গিক সঙ্কট থেকে ত্রাণের উদ্যম, শিক্ষা ইত্যাদি কাজ সর্বতোভাবে collective effort-এর অন্তর্গত করতেই হবে। তৃতীয়ত, বাজারের পণ্য অর্থের মারফৎ বিনিময়ের বদলে বস্তুবিনিময়-প্রথা চালু করতে হবে এবং শ্রমের মাপ দিয়ে বস্তুর মূল্যামূল্য ও শ্রমিকের পাওনা নির্ধারিত করতে হবে। চতুর্থত, পরিকল্পনা অনুযায়ী উৎপাদন ও বণ্টন নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। পঞ্চমত, গ্রামবাসীদের নিজস্ব প্রেরণায় ও সহযোগিতায় অর্থাৎ গণতান্ত্রিক প্রেরণায় ও নেতৃত্বে নিজেদের অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর ক'রে সকল কর্মোদ্যম চালু রাখতে হবে। বস্তুর বিনিময় (exchange of goods and payment in goods according to one's labour) প্রথা চালু করতে পারলে বাজারের উৎপাত, অর্থাৎ price, টাকার মান ও দরের ওঠা-নামার হাত থেকে আত্মরক্ষা করা চলবে এবং যুদ্ধ-জাতীয় বিশ্বসঙ্কটেও ঘাবড়াবার কারণ থাকবে না। ক্রমে এসব কথার বিস্তৃত আলোচনা করছি।

(৪) গান্ধীজী এক জায়গায় বলেছেন যে, চরকার সাহায্যে গ্রামদেশে লক্ষ লক্ষ লোকের মধ্যে একটা বিরাট কাজের সহযোগিতার ক্ষেত্র সৃষ্টি হবে। ব্যক্তিগতভাবে সুতো-কাটা, কাপড়-বোনার মধ্যে

এই শিল্পকে আবদ্ধ রাখলে বিরাট সহযোগিতার ক্ষেত্র তৈরি হয় কি? লক্ষ কোটি লোককে চরকা কাজ দিলেও—সংগঠন দিতে পারে নি, কেন-না চরকার প্রবর্তনে সংগঠনের দিক থেকে নতুন কোন পথ খোলা হয় নি, প্রাচীন কালের চরকা প্রাচীন কালের মতই ঘরে ঘরে ঠাঁই করতে চেয়েছিল। ফলে মিলজাত দ্রব্যের প্রতিযোগিতায় সে হ'টে গেল। মোট কথা, কুটিরশিল্পগুলিকে যদি চালু করতে হয় তবে তা করতে হবে market, price, profit ক্রয়-চক্র থেকে ভিন্ন এক অর্থনৈতিক রাস্তায় এবং যদি তাকে কখনও ধনতান্ত্রিক বাজারে উপস্থিত করতেই হয়, এবং বর্তমানে তা মাঝে মাঝেই দরকার হবে, তবে তাকে উপস্থিত হতে হবে collective শক্তির সমন্বয়ে—লক্ষ কোটি লোকের সুনিয়ন্ত্রিত পরিকল্পিত সঙ্ঘশক্তি ও সংগঠনের যোজনায় যাতে ধনতান্ত্রিক শোষণদুষ্ট ক্ষয়গ্রস্ত বাজার সুস্থ ও শোষণহীন বিপুল জনশক্তির বলিষ্ঠ বাহুবলের ও সংগঠনের কিঞ্চিৎ পরিচয় পায় ও মাথা হেঁট ক'রে লেন-দেন করে এবং অন্যায় সুবিধা না নিতে পারে। আপনি আপনার বইয়ের ১৯৮ পৃষ্ঠায় লিখছেন—"The expression 'our aim should be purely humanitarian, that is economic' does not mean that the khadi worker should merely aim at providing some relief within the present social and economic framework. He should really aim at building up *a new productive system* based on the people's own effort and under their own control." গ্রামে বিলীয়মান কুটিরশিল্পকে সেই পুরনো কায়দায়ই আবার চালু করা, এর মধ্যে new productive system কোথায়? এটা হয় সেই old system, নয়তো existing but dying system-এরই অনুসরণ মাত্র। হাতের কাজটাকেই যদি নতুন প্রথায় চালু করা যায়, তবেই হবে new system। এমন কি আজ গ্রামদেশে কেটারপিলার বা বুলড্রোজার জাতীয় যন্ত্রদানব এনে উপস্থিত করলেও তা new

productive system হ'ল না। New system বলতে আজ বোঝাবে collective system—যার অন্য নাম বলা যায় সোস্যালিস্টিক। এই সোস্যালিস্টিক পথেই কুটিরশিল্প হাতের কাজ পশুপালন ও অব্যবহৃত billions of hoursগুলি নিয়োজিত করা যায়। কিন্তু যদি ধনতান্ত্রিক বাজার, লেন-দেন লাভ-ক্ষতি ও বিনিময়ের রাস্তায় যাওয়া যায়, তবে সেই কুটিরশিল্পই হবে প্রতিক্রিয়াশীল ও অচল এবং সময় আলস্য-বিনোদন ছাড়া অন্য কোন কাজে ব্যবহৃত হবে না, বেকার দিনকে দিন বাড়বে বই কমবে না। এই দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিচার ক'রে দেখতে হবে AIVIA, AISA [গ্রামোন্নয়ন ও কাটুনি সঙ্ঘ] প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানগুলি বাস্তবিকই কোন new productive system প্রবর্তন করতে পেরেছিল কি না। Co-operative marketing ছাড়া তারা আর কি বিশেষ নতুনত্ব এনেছিল আমার জানা নেই। যদিও Co-operative marketing-এর কাজটাও আবশ্যকীয় collective উদ্যমেরই একটা অঙ্গ, তবু তার সীমা অন্যান্য ব্যক্তিগত লাভাকাঙ্ক্ষা দিয়ে এমনি ঘিরে ছিল যে তাতে বিশেষ কোন পার্থক্যের সৃষ্টি হয় নি এবং তা ধনতান্ত্রিক নির্মম প্রতিযোগিতা ও জনতার ক্রয়শক্তির ক্রমবর্ধমান হ্রাস রুদ্ধ করতে পারে নি।

(৫) কথা হচ্ছে billons of working hours আবার কাজে লাগাতে হবে অথচ they should not disturb the rest। এটা অসম্ভব কথা নয় এবং খুব practical proposition। গ্রামদেশে সাধারণত যে সম্পত্তি-সম্বন্ধ বর্তমান, অর্থাৎ যার যা কাজ ও আয় তাতে এক্ষুনি কোন সংঘাত ওঠবার দরকার নেই। (জমিদার-শ্রেণীকে তো সরকারই আইন ক'রে সরিয়ে দিচ্ছেন।) মধ্যবিত্তের বিলোপসাধন করা আধুনিক সমাজতন্ত্র বা কম্যুনিজমের কারোরই প্রোগ্রাম নয়, তাদের absorb বা সংশোধন ক'রে নতুন সমাজব্যবস্থায় প্রতিষ্ঠিত ক'রে দেওয়াই হ'ল পলিসি। এমন কি সাধারণ জাতীয় শিল্পপতিদের টপ ক'রে গিলে ফেলাও তাদের নীতিবিরুদ্ধ। বরং তাদের কাজটাকে

সমাজতান্ত্রিক গতিপথে সাময়িকভাবে কাজে লাগিয়ে নেওয়াতে বিশ্বাসী। নয়াগণতন্ত্রবাদী কম্যুনিস্ট ও সাধারণ সোস্যালিস্টদের কল্পিত বিরুদ্ধতাকে অতিক্রম করার জন্য আমি এই pointটা তুলছি, আপনাকে উপলক্ষ্য ক'রে নয়। দেশে এমন একটা বৈপ্লবিক গঠনমূলক কাজের কথা যখন ভাবছি, তখন তাকে একটা sectarian cry ক'রে তুললে তার সার্থকতা নেই; একটা তর্কের বাহাদুরি সৃষ্টি করা আমার উদ্দেশ্য নয়, বেশির ভাগ দেশভক্ত কর্মীরা ও সমগ্র জনতা যাতে এই প্রোগ্রামে কোন না কোন কারণে সবাই আকৃষ্ট হয় ও করবার মত কিছু একটা কাজ পায়, অন্তহীন ও অর্থহীন গোলমালেতেই আবদ্ধ না থাকে—এই সব কথাও আমার মনে জেগে আছে। মোট কথা যে যেভাবে বর্তমানে রুজিরোজগার করছে, তাতে কোন ওলটপালট না করা এই প্রোগ্রামের লক্ষ্য নয়। লক্ষ্য হচ্ছে অব্যবহৃত শ্রমশক্তি ও কুটিরশিল্পগুলিকে পরিকল্পিত পথে collective রাস্তায় চালু করা। অর্থাৎ গ্রামদেশে দুটো ক'রে sector চালু থাকবে। একটা private sector যা এতকাল চালু হয়ে এসেছে এবং যা ছাড়তে কেউ রাজী নয় ও সহসা ছেড়ে দেওয়া সম্ভবও নয়। অপরটা হ'ল public sector, যেখানে অব্যবহৃত billions of hours নিযুক্ত হবে collective উদ্যমের সাহায্যে এবং উৎপাদিত দ্রব্যের বিনিময় হবে বস্তুর মাধ্যমে ও শ্রম-শক্তির মানদণ্ডে, সম্মিলিত নতুন জীবনের পথে। ব্যক্তিগতভাবে যে যা রোজগার করে করুক, বাকি সময়, সুযোগ ও অব্যবহৃত means of production including fallow land etc. ব্যবহার করতে হবে collective effort দিয়ে on the principle of "to each according to his or her labour"। এই private ও public sector বর্তমানে সমান্তরালে পাশাপাশি চলতে থাকবে—আস্তে আস্তে public sectorটাই প্রধান হতে থাকবে এবং private sectorটা প্রয়োজন হারিয়ে ফেলতে থাকবে।

(৬) এই private sector-এর রূপটা ঠিক socialism হ'ল না,

কেননা এখানে collective effort হচ্ছে বটে, কিন্তু তা হচ্ছে বেশির ভাগ ব্যক্তিগত মালিকানারই উপর। ক্রমে এই সমবেত শক্তির যোজনা সমবেত সম্পত্তি ও সমবেত জীবনই গঠন করতে এগিয়ে আসবে— নিজেরই স্বাভাবিক গতিপথে ও অর্থনৈতিক প্রেরণায় এবং তখন উৎপাদনের বণ্টনের বেলায় সম্পত্তির হিসাব না এনে শ্রমের হিসাবটাই মানদণ্ড হবে জনতার অভিজ্ঞতা ও স্বীকৃতির মধ্য দিয়েই।

(৭) Mutual aid team-এর সাহায্যে চাষবাস চালু করা যেতে পারে। এই Mutual aid team সাময়িক ও স্থায়ী উভয় ধরনেরই হতে পারে এবং অনেক রকমের করা সম্ভব। কিন্তু উৎপাদিকাশক্তি এতে প্রচুর পরিমাণে বাড়িয়ে নতুন সমাজ গড়ার পক্ষে বিপুল উৎসাহ উদ্যম সৃষ্টি করা সম্ভব হবে।

(৮) সকলকে To each according to his or her labour হিসাবে সমস্ত উৎপাদন বণ্টন ক'রে দেবার সময় ভবিষ্যতের জন্য একটা reserve কেটে রাখতে হবে এবং আর একটা reserve কেটে রাখতে হবে নিতান্ত অক্ষম ও পিছিয়ে-পড়াদের উন্নতির জন্য বীমা হিসাবে সাহায্য করার জন্য।

(৯) কতকগুলি collective ownership-এর ক্ষেত্রও তৈরি করতে হবে—collective labour on collective property of the village। রাস্তাঘাট, স্কুল, আনন্দ-নিকেতন, গোপালন প্রভৃতি ছাড়াও কতকগুলি প্রয়োজনীয় ছোট আধুনিক শিল্প গ্রামের সম্পত্তি হিসাবে introduce করা যায় যাদের ওপর collective life-এর সুপ্রয়োগ আরও দ্রুতগামী ক'রে আনা যায়। এই ক্ষেত্রটা ধীরে ধীরে বাড়াতে হবে, জনতার স্বেচ্ছাপ্রণোদিত উৎসাহ ও অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর ক'রে, জোর-জবরদস্তি ক'রে নয়।

(১০) বিশেষ কয়েকটি ক্ষেত্রে বিনিময়ের প্রথা টাকাপয়সার পথে না নিয়ে বস্তু-বিনিময়ের প্রথা (exchange of goods and payment in goods) চালু করতে হবে। গ্রামের মধ্যেই শুধু নয়—অঞ্চল জুড়ে

এই প্রথা চালু করতে হবে। বাজার-দরের ওঠা-নামার ওপরে দ্রব্যের উৎপাদন নির্ভর করালে চলবে না এবং লাভালাভ দিয়েও শিল্পের নিয়ন্ত্রণ চলবে না। হিসেব করার প্রয়োজনীয়তার ওপর শিল্পজাত জিনিস পূর্বপরিকল্পিত পথে এবং বস্তুর বিনিময়ে আদান-প্রদান হতে থাকবে। এটা primitive প্রথার প্রচলন হ'ল না, আগামী দিনের ইঙ্গিত আছে এতে। যুদ্ধ লাগুক আর না-ই লাগুক, শিল্প-সঙ্কট হোক আর না-ই হোক, বাজারের মন্দা আসুক আর না-ই আসুক, public sector-এর এই উৎপন্ন দ্রব্যের চলাচল প্রয়োজনীয় বস্তু-বিনিময়ের পথে সম্পূর্ণ অব্যাহত থাকবে। এই রকম সম্ভব হ'লে, এমন কি আংশিকভাবে সম্ভব হ'লেও, জনতার শক্তি ও সাহস অটুট থাকবে, ধনীদের চেয়ে জনতার শক্তি বেশি প্রতিপন্ন হবে, ধনতন্ত্রের চেয়ে এই জনতন্ত্র বেশি শক্তিমান ব'লে জয়ী হয়ে যাবে, তখন রাজনৈতিক প্রশ্নটাও খুব সহজ হয়ে যাবে।

(১১) নীচের থেকে এইভাবে গ্রামে গ্রামে লোকের প্রয়োজন ও শ্রমশক্তির আনুপাতিক হিসাবের যে public sector-এর collective উদ্যম তা চালু হবে ছোট ছোট people's plan-এর ওপর। জনতা নিজেরাই plan করবে এবং তা চালু করবে। ক্রমে অঞ্চলকে অঞ্চল, এমন কি সমগ্র দেশটাকে নিয়েই সত্যিকার গণতান্ত্রিক people's plan-এর উদ্ভব হবে। এই people's plan চালু করবার জন্য বৈদেশিক অর্থ ও ঋণের পর্বত সৃষ্টি কোনটারই দরকার হবে না এবং কোটি কোটি টাকার অপব্যয় হবে না।

(১২) যদিও এই প্রোগ্রামের ভিতর একটা mixed economy-র কথা আছে, তা সত্যি ভারতীয় সরকারের অনুসৃত mixed economy নয়। যদিও ভারত সরকার পাঁচশালা প্ল্যানে mixed economy-র কথা বলেছেন, আসলে তা mixed নয়। Public sector বা state sector-কে দোহন ক'রে অগণিত ঠিকাদার ও অসৎ কর্মচারীর দল প্রচুর লাভলভ্য সেবন করবেন মাত্র। তা ছাড়া বর্তমান রাষ্ট্রের ভিতরকার দুর্নীতি, আলস্যপরায়ণতা, উদ্যমহীন কর্মচারীবহুলতার ভারে এই

public sector public lifeকে আরও দূষিত ক'রে ছাড়বে। পঞ্চবার্ষিকী প্ল্যান হয়তো একটি ঠিকাদারের স্বর্গে পরিণত হবে, সহস্র কোটি টাকা একদিন তাদের পকেট দিয়ে আস্তে আস্তে বিদেশে চ'লে যাবে, প'ড়ে থাকবে জনতার ওপর এক বিরাট দেনার ভার, ট্যাক্সের পর্বতপ্রমাণ ভার ও লক্ষমুখী দানবীয় রাষ্ট্রের এক বিরাট কঙ্কালমূর্তি। কিন্তু আমি যে people's plan-এর কথা বলতে চাইছি, তা সত্যিকার জনতার সহযোগিতায়, অভিজ্ঞতায়, উৎসাহে এবং একমাত্র তাদেরই বাহুবলে তাদেরই চোখের সামনে তৈরি হবে—অঙ্কের ধাঁধা তাতে নেই, আর নেই ঠিকাদারির ও দালালির আনাগোনা। যুদ্ধের সময়ে ঠিকাদারেরা যেমন পয়সার খেলা দিয়ে দেশের অন্তঃসারশূন্যতা ও নীতিহীনতা এনে দিয়েছিল, যার জের আজও কাটে নি—হয়তো এই পঞ্চবার্ষিকী প্ল্যান সে রকমই একটা কিছু উত্তেজনা, শেষ পর্যন্ত এক বিরাট বঞ্চনা সৃষ্টি ক'রে ছাড়বে। এটা আমার prejudice হতে পারে। তা হ'লেও people's own plan under their own control তাদের পরীক্ষিত রাস্তাতেই নির্ভরযোগ্য হতে পারে।

(১৩) বস্তু-বিনিময়ের মাপ হবে working hour দিয়ে এবং তার হিসাবনিকাশ করার জন্য এক রকমের Statistical Bank স্থাপন করতে হবে গ্রামে গ্রামে। Collective effort-এ সবারই শ্রম গ্রহণ করতে হবে, সে যে শ্রেণীর যে জাতের হোক না কেন—স্ত্রীপুরুষ সবার। শারীরিক শ্রমটাই প্রধান বিচার্য বস্তু, বিদ্যা বা বর্ণের মহিমা চলবে না, যোগ্যতা বা efficiency-র আলাদা মূল্য নিশ্চয়ই থাকবে। শারীরিক মেহনতের মর্যাদাকে সর্ব উপায়ে প্রধান স্থান দিতে হবে। কিন্তু সকলেরই শ্রম লাগাবার উৎসাহে যাতে গ্রাম্য মজুরের আয় না ক'মে যায় সেই জিনিসটায় লক্ষ্য রাখতে হবে, কেন-না মূল একটা কথা রয়েছে—not to disturb the rest। তা ছাড়া এহেন উদ্যমে গ্রাম্য মজুরদের ষোল আনা উৎসাহের ওপর অনেক কিছু নির্ভর করে, তাদেরই উপকার সবার চেয়ে বেশি—এ জিনিসটা প্রত্যক্ষভাবে দেখাতে হবে।

(১৪) নতুন সমাজগঠনের মূলে মূলধন মস্ত কথা হচ্ছে না, মস্ত কথা হচ্ছে মানুষের শ্রম ও তার শুভবুদ্ধি। মূলধন না হ'লে প্ল্যান হয় না, দেশ-গঠন হয় না, এ কথা ভাবা বিপজ্জনক এবং এ কথা অস্বীকার করবার সাহস চাই। কোন দরিদ্র দেশকে বড় হতে হ'লে বিদেশী অর্থ চাই-ই চাই, এ কথা ভুল। মানুষের উদ্যম, উৎসাহ ও শ্রম চাই, আর চাই বৈজ্ঞানিক সমাজচেতনা। দেশে কতগুলি labour saving machinery introduce করাই বা উৎপাদন করাই একমাত্র বিজ্ঞান নয়, সকলের শ্রম নিয়োগ করতে পারাটাই উৎপাদিকাশক্তির সত্যিকার মুক্তি, সত্যিকার বিজ্ঞানসম্মত সমাজতন্ত্র। ১৯৩৭ সনের শাসনতন্ত্রে কংগ্রেস-মন্ত্রীরা অর্থাভাবে দেশের মঙ্গল করতে পারবেন না—এই ভয়টাকে অমূলক ব'লে অগ্রাহ্য করতে গান্ধীজী বার বার উৎসাহ দিয়েছিলেন। গান্ধীজী দেশগঠনে বা নতুন সমাজগঠনে পর্বতপ্রমাণ মূলধনের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করতেন না।

(১৫) উপরোক্ত প্রোগ্রামের সবটাই একবারে চালু হবে না। স্থান, কাল ও নেতৃত্বের ওপর তার গতি ও পরিণতি অনেকটা নির্ভরশীল। তবে কিছুদূর চালু হ'লেই নতুন জীবনের স্বাদ সবাই পাবে, সম্মিলিত জীবন ও সমাজচেতনার উচ্চতর প্রেরণা একবার পেয়ে বসলে যে আন্দোলন সৃষ্টি হবে, তা দিয়ে পরবর্তী ধাপে অগ্রসর হওয়া সহজ হবে এবং সুদূরপ্রসারী রাজনৈতিক কার্যক্রমের জন্য জনতা অধিকতর প্রস্তুত হবে।

(১৬) জনতার ঐক্য, আত্মচেতনা, সংগ্রামী শক্তি এই পথেই তৈরি হবে। আর তৈরি হবে কর্মীরা জনতার সঙ্গে এই অচ্ছেদ্য সম্পর্কে এসে। কর্মীদের বর্তমান নৈরাশ্যবাদিতা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, অহঙ্কার ও মিথ্যাচার এই পথেই দূর হবে। নিষ্ফল বাক্যযুদ্ধ ও অন্তরের উষরতা সম্বল ক'রে আর কেউ বেশি এগুতে পারবে না। এই গঠনমূলক কাজ একটা বিরাট গণজাগরণেরই নামান্তর। এ একই সঙ্গে গঠনশীলতা ও নতুন সমাজের জন্য সংগ্রাম।

(১৭) পৃথিবীতে যুদ্ধবিগ্রহ ও অর্থনৈতিক সঙ্কটাদির বিপদ যে ভাবে ঘনিয়ে আসছে, তা থেকে বাঁচতে হ'লে যে জাতীয় প্রস্তুতির দরকার ও শক্তি সংগ্রহের প্রয়োজন, তা এই জাতীয় গঠনকারিতা থেকে পাওয়া সম্ভব। যুদ্ধবাজ শক্তিসমূহ ও সাম্রাজ্যবাদী অহঙ্কার নিজেদের আত্মহত্যার জন্ম দুর্দান্ত বেগে এগিয়ে চলছে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে জনতার উপর তারা একটা অভূতপূর্ব অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা এনে ধ্বংসকার্যকে আরও ভয়াবহ ক'রে ছাড়তে পারে। সেই সর্বধ্বংসী পরিস্থিতির জন্ম প্রস্তুত হতে হ'লে জনতার শক্তি, সংগঠন ও ধীরতা চাই এবং তার উপায় নতুন সমাজগঠনের কাজে এখনই অগ্রসর হওয়া এবং যতটুকু সম্ভব ততটুকুই নিজেদের হাতে স্বাধীন সমাজশক্তি অধিকার ক'রে নেওয়া।

বিস্তর লিখে ফেললুম, ধৈর্য ধ'রে পড়াই কঠিন হবে হয়তো। নমস্কার নেবেন। ইতি

পান্নালাল দাশগুপ্ত

প্রিয়বরেষু,

আপনার দ্বিতীয় পত্র পেলাম। বর্তমান ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক অবস্থা ও গান্ধীজীর অর্থনীতি সম্পর্কিত মতবাদ সম্পর্কে আপনি কয়েকটি মৌলিক প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন। সেগুলির যথাসম্ভব আলোচনা করার চেষ্টা করব।

পূর্বের পত্রে আমি আপনাকে জানিয়েছিলাম, চরকার চেয়ে চরকার মূলগত নীতি, অর্থাৎ বিকেন্দ্রীকরণকেই আমি গান্ধীবাদের মূলতত্ত্ব ব'লে মনে করি। দ্বিতীয়ত, এই বিকেন্দ্রীকরণের মূলে মানুষ বা গাই-বলদের শক্তিই শুধু ব্যবহার করতে হবে, তা আমি মনে করি না। কয়লা এবং বাষ্পীয় শক্তির পরিবর্তে বৈদ্যুতিক শক্তিকে আশ্রয় ক'রে শিল্পকার্যে বিকেন্দ্রীকরণ সম্ভব ব'লে আমার মনে হয়। সেই বৈদ্যুতিক শক্তি পরিচালিত হবে সমাজের প্রয়োজনে এবং সমাজের শাসনাধীনে। সে সমাজ বা রাষ্ট্রের মূলে যারা পরিশ্রমবিমুখ নয়, পরশ্রমজীবী নয়, তারাই স্থান পাবে। এ বিষয়ে আমি লুইস মামফোর্ড বা পূর্বকালের

অধ্যাপক প্যাট্রিক গেডিস অথবা পিটার ক্রোপট্‌কিনের মতাবলম্বী। লুইস মামফোর্ডের *Technics and Civilization* নামে একখানি বই আপনাকে পাঠাচ্ছি, পরে অন্য বই পাঠাব।

ভারতবর্ষের অধিকাংশ গান্ধীবাদী, এমনকি গান্ধীজী স্বয়ং চরকার উপরে যে পরিমাণ একান্ত জোর দিতেন, তার কারণ মনে হয়, কার্য-সিদ্ধির আশু উপায়স্বরূপ তমসাকিষ্ট ভারতবাসীর মনকে তাঁরা একটি বস্তুর উপরে বিশেষভাবে নিবদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সাময়িক প্রয়োজনে মানুষ যদি মূলনীতিকে অবহেলা করে, তার ফল ভুগতেই হবে। তাই চরকা যখন চলছে না, তখন তার মূলনীতিকে অবস্থান্তর ঘটাবার পর আমরা নতুন আসন পেতে বসাতে পারছি না। জ্ঞানকে কর্মের মধ্যে টেনে এনে অবহেলা করলে কর্মও ম্রিয়মাণ হয়ে যায়। জ্ঞান এবং কর্ম সমতালে না চললে কর্ম অবশেষে বন্ধনে পরিণত হয়, জ্ঞান বিলাসে পরিণত হয়; এবং উভয়ে মানুষের জীবনের সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে সম্পর্কচ্যুত হয়ে পড়ে।

আপনার পত্রে মনে হচ্ছে, জনসাধারণের মধ্যে বিপ্লবাত্মক গঠনকর্মে আপনার যথেষ্ট আস্থা আছে। জনতার সংঘশক্তি যদি বিপ্লবধর্মী অর্থনৈতিক সংগঠনে নিয়োজিত হয়, তা হ'লে ধনতন্ত্র বা ধনতন্ত্রের প্রতিভূস্বরূপ রাষ্ট্র অবশেষে পরাস্ত হবে—এই আশা আপনি পোষণ করেন ব'লে মনে হয়। এ সম্পর্কে আপনার চিন্তা কুমারাপ্পা এবং ধীরেন মজুমদার মহাশয়ের চিন্তা থেকে ভিন্ন নয়। তাঁরাও রাষ্ট্রশক্তিকে উপেক্ষা ক'রে অগ্রসর হওয়ার পক্ষপাতী। বর্তমান ভারতবর্ষে রাষ্ট্রশক্তি অন্ধভাবে অগ্রসর হচ্ছে, এবং সেদিক থেকে কোনও সাহায্য পাওয়া যাবে না ব'লেই তাঁরা আপাতত মনে করেন। বিনোভার মতও সেই দিকে ঝোঁক নিয়েছে ব'লে মনে হয়। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে আমার মনে হয়, সহায় না হ'লেও বাধা দেবার, এমন কি নস্যাৎ ক'রে দেবার ক্ষমতা রাষ্ট্রের যথেষ্ট আছে। অতএব, গান্ধীবাদের বিকেন্দ্রী-করণ প্রতিষ্ঠিত করতে গেলে জনশক্তির সহায়তায় গড়ার কাজে এগি

গেলেই শেষ মীমাংসা হয়ে যাবে, এমন ভরসা আমি পাই না। রাষ্ট্রশক্তির সঙ্গে একটা ভালমন্দ বোঝাপড়া গঠনকর্মীদের করতেই হবে ; নয়তো গান্ধীবাদ অবশেষে কয়েকটি আশ্রম-রচনায় পর্যবসিত হবে। সমাজদেহে ক্রিয়া তার স্তব্ধ হয়ে যাবে।

প্রশ্ন হ'ল, বিরুদ্ধ মনোভাবাপন্ন রাষ্ট্রশক্তিকে বশে আনার উপায় কি ?

বর্তমান ভারতে গান্ধীবাদীদের কাছে সেইটেই সকলের চেয়ে বড় চিন্তার বিষয়। এবং সে চিন্তায় যদি আমরা পরাস্ত হই, তা হ'লে কস্তুরবা ধনভাণ্ডার বা গান্ধীজীর নামে যে সব ধনভাণ্ডার সংগৃহীত হয়েছে, তার দ্বারা সমর্থিত হ'লেও গঠনকর্মের উত্তরোত্তর সঙ্কোচন ঘটবে, সম্প্রসারণের আশা কম। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, পথ নেই। আমার বিশ্বাস, পথ আছে, প্রয়োজন হ'ল সম্যক্ চিন্তা এবং জ্ঞানের।

কয়েক দিন পূর্বে এক বন্ধুর বাড়িতে পুণার অধ্যাপক গড্‌গিলের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। তিনি ভারতের মধ্যে শুধু পণ্ডিত নয়, সত্যিকারের চিন্তাশীল অর্থশাস্ত্রবিৎ। বর্তমানের প্রতি দৃষ্টি হারান নি, ভবিষ্যতের প্রতিও লক্ষ্য রাখেন। মাটিতে চলেন, কিন্তু আকাশের নক্ষত্রের দ্বারা পথনিয়ন্ত্রণের অভ্যাস হারান নি। এমন লোক ভারতে যত বৃদ্ধি পায় ততই ভাল ; এঁদের প্রভাবে নূতন ভারত গ'ড়ে উঠলে আমরা লাভবান হব ব'লেই আমার বিশ্বাস।

আপনি পত্রে বর্তমান অর্থনৈতিক কাঠামোকে বেশি না ঘাঁটিয়ে গঠনকর্মের যে ইঙ্গিত করেছেন, সেই ধরনের একটি প্রসঙ্গ অধ্যাপক গড্‌গিল সেদিন উত্থাপন করেছিলেন। তিনি বললেন, আজ আমরা একটা জনমতের আভাস পাচ্ছি যে, ১০ হোক, ১৫ হোক, এক নির্দিষ্ট পরিমাণ একরের অতিরিক্ত জমি কেউ রাখতে পারবে না। তেমনই উৎপাদনের দিকে লক্ষ্য রেখে নিম্নতম পরিমাণও একটি নির্দিষ্ট করতে হবে। বিনোভার মতানুযায়ী, প্রতি ভূমিহীন কৃষককে জমি দেওয়ার পক্ষপাতী তিনি নন ; তাঁর কথা হ'ল অর্থনীতির দিকে দৃষ্টি রেখে

সর্বনিম্ন পরিমাণ নির্ধারণ ক'রে যত লোককে আমরা চাষে নিয়োজিত করতে পারি, তাই করব; অপর লোকেদের জন্য অন্য ব্যবস্থা করতে হবে। এর পর, যে-সব জমি বড় মালিকদের কাছ থেকে, অথবা নির্ধারিত নিম্নতমের নীচের দিক থেকে সংগৃহীত হ'ল, সেগুলি গভর্মেণ্টের বা কো-অপারেটিভ ব্যবস্থার অধীনে চাষ কবতে হবে।

চাষের ব্যাপারেব সঙ্গে ধান ভানা, তেল পেড়া, প্রভৃতি শিল্প অঙ্গাঙ্গীভাবে সম্পর্কিত। যদি গভর্মেণ্ট এই কাজগুলি সমবায়-সমিতি ভিন্ন অপরকে করতে না দেন, এবং সমবায়-সমিতি মুনাফার প্রতি দৃষ্টি না রেখে স্থানীয় প্রয়োজনেব প্রতি লক্ষ্য রেখে জিনিসের দাম নির্ধারণ করেন, তা হ'লে ভাল হয়।

সমবায় চাষ ও সমবায় শিল্পের এইভাবে যে দুটি ক্ষেত্র প্রস্তুত করা হবে, যদি গভর্মেণ্ট তাদের সর্বতোভাবে সহায়তা করেন, যথা ভাল বীজ, ভাল সার, ঋণদানের ব্যবস্থা, জিনিসপত্র ইতস্তত নিয়ে যাওয়া-আসার সুযোগসুবিধা দেওয়া ইত্যাদি, তা হ'লে অবশিষ্ট ব্যক্তিগত চাষীবা—বিশেষ ক'বে যাদের জমির পরিমাণ উচ্চতম বা নিম্নতম সীমারেখার কাছে—তারাও স্বেচ্ছায় সমবায়ের দিকে আকৃষ্ট হবে।

অধ্যাপক গড্‌গিলের উপরোক্ত কর্মপদ্ধতির উল্লেখ আমি এই জন্যই করলাম যে, গভর্মেণ্টের আইনের ও কর্মের খানিক সাহায্য না পেলে দেশের চাষকে শুধু জনতার ইচ্ছায় আজ পরিবর্তন করা সম্ভব ব'লে আমার মনে হচ্ছে না। গান্ধীবাদের বিকেন্দ্রীকরণের প্রচেষ্টায় রাষ্ট্রশক্তিকে এইভাবে ব্যবহার করা সম্ভব এবং উচিত ব'লেই আমি বিবেচনা করি।

এখন মৌলিক প্রশ্ন হ'ল, যদি রাষ্ট্র বিকেন্দ্রীকরণে সহায় না হয়ে জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে শত্রুতা করেন, তখন গান্ধীবাদী সংগঠনকর্মীদের কর্তব্য কি?

আপনার সঙ্গে এবং কুমারাপ্পা, ধীরেন মজুমদার বা বিনোভার সঙ্গে আমি এই বিষয়ে একমত যে, রাষ্ট্রের অপেক্ষা না রেখেই গঠনকর্মে

আমাদের অগ্রসর হওয়া উচিত। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আর একটু কাজও আমি এর সঙ্গে জুড়ে দেব। আমাদের আইন-সভায় যাঁরা প্রতিনিধি আছেন, তাঁদের কাছে নূতন আইন প্রবর্তনের দ্বারা কি ভাবে গান্ধীবাদের প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করা যায়, তারও রাস্তা দেখাতে হবে; দ্বিতীয়ত, যেখানে অনুকূল আইন আছে, কেবল কিছু সংস্কারের প্রয়োজন সেখানে সংস্কারের প্রস্তাব নির্দেশ ক'রে আইন-কর্তাদের সাহায্য করতে হবে। তৃতীয়, যেখানে আইন সর্বতোভাবে অনুকূল, কিন্তু কাজে আসে না, সেখানে তাকে কার্যকরী করার পথ খুঁজতে হবে।

শেষেরটিই সর্বাপেক্ষা শক্ত কাজ। গঠনকর্মী স্বীয় কর্মে, অর্থাৎ বিকেন্দ্রীকরণের সাধনায়, অগ্রসর হবেন। যেখানে পথে চলতি আইন বা রাজকর্মচারীদের অজ্ঞানস্বরূপ বাধা উপস্থিত হবে, সেখানে ধৈর্যের সঙ্গে, দৃঢ়ভাবে নতুন নতুন দাবি জানিয়ে অগ্রসর হবেন। যদি বারংবার নিয়মতান্ত্রিক পথে সংস্কার পরাস্ত হয়, তা হ'লে শেষ পর্যন্ত অহিংস সত্যাগ্রহ পর্যন্ত যেতে হবে। আমাদেব যে সব প্রতিনিধি আইন-সভায় রয়েছেন অথবা রাজ্যপরিচালনা করছেন, তাঁরা যদি সর্বভাবে অযোগ্যতা দেখান, তা হ'লে গঠনকর্মী সর্ববিধ সংস্কার-চেষ্টার শেষে আইন অমান্যের জন্য প্রস্তুত হবেন। এ বিষয়ে আমার সংশয় নেই।

আজ দেশে কেউ কেউ মনে করেন, আমাদের প্রতিনিধিগণ দুর্বল বা শ্রেণীস্বার্থের দ্বারা এমনভাবে আচ্ছন্ন যে গান্ধীজীর পরিকল্পিত গণমুক্তি বা রামরাজ্যের প্রতিষ্ঠা তাঁদের দ্বারা আদৌ সম্ভব নয়। আমি অতটা হতাশ এখনও হই নি। লক্ষণ অবশ্য খারাপ দেখা যাচ্ছে; কিন্তু তার দ্বারা সত্যাগ্রহের আশু প্রয়োগ সিদ্ধ হয় না। সত্যাগ্রহের পথস্বরূপ আমাদের গঠনকর্ম ও নিয়মতান্ত্রিক প্রচেষ্টার দ্রুত প্রয়োজন আছে। প্রস্তুতির উপরে যে ঝোঁক দিচ্ছি, সেটি সত্যাগ্রহকে ঠেকিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে নয়। শুধু সংগ্রামে আমি বিশ্বাসী নই, সত্যাগ্রহ-সংগ্রাম হ'লেও নয়। হিংসার সংগ্রামে যেমন প্রস্তুতি ভিন্ন পরাজয় অবশ্যম্ভাবী, অহিংসার সংগ্রামেও তাই।

আজ গঠনকর্মের বুদ্ধিযুক্ত চেষ্টার প্রয়োজন। এবং রাষ্ট্রকে বাদ দিয়ে নয়; বর্তমান ভারতের রাষ্ট্রশক্তিকে বিকেন্দ্রীকরণের ব্যাপারে সহায় হবার জন্য জ্ঞানীর মত দৃঢ়ভাবে আকর্ষণের রজ্জু প্রয়োগ করতে হবে। পরের কথা, সময়কালে ভাবা যাবে।

আমার উত্তরে আপনি লক্ষ্য করবেন, আপনার সঙ্গে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমি একমত। প্রভেদ হ'ল, সত্যাগ্রহের পথে অগ্রসর হতে হ'লে প্রথম দফায় নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে রাষ্ট্রের যে সংস্কার প্রয়োজন, তার সম্পর্কে আমার চিন্তা বেশি। সে দিক উপেক্ষা করলে গান্ধীবাদীরা একটি সংকীর্ণ ধার্মিক সম্প্রদায়ে পরিণত হবেন ব'লে আমার বিশ্বাস এবং অপরে অসহিষ্ণু হয়ে জনতাকে হিংসাত্মক বিপ্লবপ্রয়াসী করবেন ব'লে আমার বিশ্বাস। দ্বিতীয় পথে, ক্ষমতার হস্তান্তর ঘটলেও গোষ্ঠীবিশেষের হাতে ক্ষমতা অবতরণ করবে, জনসাধারণের স্ব-রাজ হবে না ব'লেই আমার ভয়।

ভবদীয়
নির্মলকুমার বসু

টুকরি

খুনে ও-রত্নাকর ফেঁসে গেলে ফাঁসিতে,
কে শোনাত রাম-নাম ছন্দের বাঁশীতে॥

তুমি আমি সবাই,
এই দুনিয়ার স্টার-হোসে হচ্ছি নিত্যি জবাই।
তিলে তিলে যাচ্ছি ক'য়ে তৈলধারাবৎ,
এরেই বলে টেনে চলা জগন্নাথের রথ॥

মানভূম নিয়ে বেহারে বঙ্গে চলে মান-অভিমান,
নেহেরু-প্রসাদ মানপত্রই পান মণ-পরিমাণ।
মানে মানে চুপ প্রসাদ-লোভীরা, যাহারা ইমানদার
তারা মনে মানে বঙ্গের দাবি। মানসাঙ্কই সার॥

পুণ্য ভারতভূমি

স্বাধীন গণতান্ত্রিক ভারতের সন্তান আমরা। আমরা স্বরাট্ আমরা স্বপ্রতিষ্ঠ আমরা আত্মনির্ভর—এই কথা সর্বত্র সর্বদা ঘোষণা ক'রে সমগ্র দেশকে সঞ্জীবিত করতে হবে, পরস্পরের মিলনে সার্থক ক'রে তুলতে হবে পুণ্য ভারতভূমিকে। কল্পনা-দৃষ্টি প্রসারিত করলেই আমরা দেখতে পাব ঋষি-কবি-মনীষী সবাই রয়েছেন ঊর্ধ্বলোকে আশীর্বাদ ও বাণীর ডালি নিয়ে—আছেন রামমোহন বিদ্যাসাগর মধুসূদন রঙ্গলাল বঙ্কিম হেমচন্দ্র সুরেন্দ্রনাথ বিপিনচন্দ্র নবীনচন্দ্র ব্রহ্মবান্ধব রবীন্দ্রনাথ চিত্তরঞ্জন বিবেকানন্দ অরবিন্দ সকলেই। তাঁদের দীর্ঘ শতাব্দীব্যাপী কল্পনা ও চিন্তাধারাকে সমগ্র জীবনের কর্মতৎপর সাধনায় বাস্তবে রূপদান করেছেন যে বাপুজী ও নেতাজী, তাঁরাও আশীর্বাদে আশীর্বাদে ধন্য করছেন আমাদের। তাঁরা যা চেয়েছিলেন, জানি, এখনও পর্যন্ত আমরা তা সম্পূর্ণ অধিকার ও অর্জন করতে পারি নি। তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রে আমরা এগিয়ে চলেছি সেই লক্ষ্যের দিকে—প্রাণে ভরসা আছে, একদিন পাবই পাব তাঁদের প্রার্থিত আকাঙ্ক্ষাকে আমাদের প্রত্যক্ষ বাস্তবের মধ্যে। তারই আয়োজন চলেছে ভারত জুড়ে নানা পরিকল্পনায়। ভবিষ্যতের সেই বিপুল সম্ভাবনার দিকে চেয়ে আমাদের সম্মিলিত অভিযান। আমরা বন্দনা করব শুধু আমাদের ধ্যানের ভারতবর্ষকে নয়, আমাদের চোখের সামনে অপরূপ মহিমায় নিত্যপ্রসারিত আহিমাচল-কুমারিকা আগুর্জর-ব্রহ্ম পর্বত-অরণ্য-প্রান্তরশোভিত নদীমেখলামণ্ডিত আমাদের মাটি-মাকে, যাঁর কথা বলেছেন স্বামী বিবেকানন্দ—

"নীচে সিন্ধু গায় নানা তান ;
মহীয়ান, সে নহে ভারত !
অম্বুরাশি বিখ্যাত তোমার ;
রূপরাগ হয়ে জলময়
গায় হেথা, না করে গর্জন।"

একটু মন দিলেই শুনতে পাব ভারতের নদীজলময় অম্বুরাশির রূপরাগময় কলধ্বনি !

গান

যুগে যুগে গেয়ে চলি এই ভারতের গান।
হিমাচলের বুকটি চিরে আমরা বাহির হয়েছি রে,
কোন্ আদিকাল হতেই করি সাগর-অভিযান।
তারি মাঝে দেখি চেয়ে বিদেশীরা আসছে ধেয়ে
রক্তধারায় ছন্দ হারায় মোদের উছল প্রাণ।
দস্যু এসে রাজ্য গড়ে কালের ঝড়ে ভেঙে পড়ে
ধ্বংসাবশেষ-ভস্ম মোদের স্রোতেই অবসান।
কত এল গেল কতই ভাঙল লক্ষ রইল শতই
হ'ল মহাভারতভূমি ক্ষুদ্র সিন্ধুস্থান।
কুলুকুলু গান গেয়ে যাই কূলে কূলে ফসল ফলাই
ভাসিয়ে অতীত গ'ড়ে তুলি নতুন বর্তমান॥

ভারত-মায়ের গলার এই শতনরী হার, কি মধুর এদের নাম ! গঙ্গা যমুনা গোদাবরী সরস্বতী নর্মদা সিন্ধু কাবেরী রেবা আত্রেয়ী করতোয়া মহানন্দা পদ্মা ময়ূরাক্ষী মহেন্দ্রতনয়া কংসাবতী কপোতাক্ষী অজয় ব্রহ্মপুত্র রূপনারায়ণ দামোদর চন্দ্রভাগা অলকানন্দা ভাগীরথী চূর্ণি— এরাই সস্নেহ স্পর্শ দিয়ে আমাদের মাকে ক'রে রেখেছে—সুজলা সুফলা মলয়জশীতলা শস্যশ্যামলা। কিন্তু হায়, আমরা এই প্রসন্না জলধারাগুলির পরিচর্যা করি নি। ক্রমে শীর্ণ জীর্ণ ফল্গুধারায় পরিণত হতে চলেছে ভারতের এই সব প্রাণ-গঙ্গা। ভয় হয়, কবে বুঝি বা এরা নিঃশেষে শুকিয়ে গিয়ে আমাদের মাকে ক'রে তোলে উষর মরুভূমি ! এদের প্রতি পূজাহীন সেবাহীন উদাসীন আমরা—সত্যি ভয় হয় !

কিন্তু ভয় ভেঙে যায় উত্তরে দৃষ্টি প্রসারিত করলে। তুষারমৌলি

হিমালয় যতদিন আছেন ততদিন ভয় নেই, তিনিই আদি, তিনিই উৎস। এই সব নির্ঝরধারা তাঁরই নিত্যকালের আশীর্বাদ। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এই হিমালয়ের যে রূপ দেখেছিলেন, আজ আমরা তাই স্মরণ করি :

"এক দিকে সমস্ত হিন্দুস্থান শতযোজনব্যাপী মাঠের ন্যায়, এক দিকে পর্বতশ্রেণীর পর পর্বতশ্রেণী, তাহার পর পর্বতশ্রেণী, তাহার পরে—কত পরে বরফের পাহাড় দেখিয়াছ কি? সেই শ্বেত স্বচ্ছ বরফের উপর সূর্যকিরণ পড়িয়া ঝক্ ঝক্ করিয়া জ্বলিতেছে, বোধ হইতেছে যেন রাজপুত্রের আগমনে বিশাল নগরীসমূহ নানা দীপমালায় মণ্ডিত হইয়া রহিয়াছে, দেখিয়াছ কি? পূর্বে ও পশ্চিমে কেবল দেখিবে চূড়ার পর চূড়া, তাহার পর চূড়া, তাহার পর আবার চূড়া; শেষ নাই, বিরাম নাই, অনন্ত বলিলেও হয়।...চারিদিকে ঝরনা হইতে ঝম্ ঝম্ রবে দুধের ফেনার মত সাদা জল বেগে পড়িতেছে, কোথাও তাহার উপর সূর্যের আলোকে রামধনু দেখা যাইতেছে, কোথাও কোন নির্ঝরিণী চির-অন্ধকারমধ্য দিয়া চিরকাল অলক্ষিতভাবে প্রবাহিত হইতেছে, কেহ দেখিতেছে না, অথচ গতিরও বিরাম নাই।...এই হিমালয় তুমি আজি যেমন দেখিতেছ, ইহা অনন্তকাল এইরূপ, অনন্তকাল ধরিয়া বরফের পাহাড় এইরূপই আছে, ঝরনা এইরূপই বহিতেছে, আকাশও এইরূপ গাঢ় নীল, সবই এইরূপ।"

সুতরাং ভয় নেই। আমরা সেই তুষারমৌলি নগাধিরাজের বন্দনা করি :

গান

উত্তর দিশি জুড়ি তুমি দেবতাত্মা,
হিমালয়, রক্ষিছ এ ভারতে নিত্য ;
বক্ষের স্নেহধারে মৃত্তিকা সিঞ্চিয়া
ফলে ফুলে শস্যে করিছ বিচিত্র।

তোমার ছত্রছায়ে ভারতের ঐক্য,
রক্ষিছ চিরকাল, চিরকাল রক্ষ ;
মহান্ মূর্তি হেরি নতশির আমাদেরি,
বন্দিছে তোমারেই স্পন্দিত চিত্ত।
হিমালয়, রহ চির জাগ্রত চক্ষে
রহ অভ্রংলেহী ভারতের বক্ষে।
আমাদের গ্লানি দূর কর দেবতাত্মা,
দূর কর বিরোধের দ্বন্দ্ব,
প্রান্তরে পল্লীতে নির্ঝর-ধারে তব
ব'য়ে যাক্ মিলনের ছন্দ।
উপনিষদের মহা-ঋষিদের বাক্য,
মহাহিমাচল, তুমি একা তার সাক্ষ্য,
নমো নমো হিমালয়, ধরণীর আশ্রয়
নমো নগ-অধিরাজ, ভারতের মিত্র॥

কিন্তু ওই আকাশচুম্বী হিমালয়ের দিকে আমরা অনন্তকাল চেয়ে থাকতে পারি নে, প্রান্তর-পল্লীই আমাদের লক্ষ্য—যেখানে মুনি-ঋষি-দেবতা নয়, আমাদের মতো মানুষ আছে, সংসার আছে, স্নেহ-মমতা-ভালবাসা আছে। মনে হয়, ভারতের আসল প্রাণপ্রবাহ সেই সাত লাখ গ্রামের বুক দিয়েই ব'য়ে যাচ্ছে, আমাদের আশা আনন্দ আশ্বাস ভরসা সব এখনও সেখানেই। এই গ্রামকে অবহেলা ক'রেই আমাদের সর্বনাশ ঘটতে বসেছে, পুণ্যভূমি ভারত হারাতে বসেছে তার মহিমা। আমরা আত্মভ্রষ্ট হয়েছি, তাই শুনতে পাচ্ছি না ভারতের গ্রামের বুক থেকে দীর্ঘনিশ্বাসের মতো আজও উঠছে যে গান, কান পেতে শুনলেই শোনা যাবে—

গান

ছড়িয়ে আছি ভারত জুড়ে আমরা লক্ষ গ্রাম,
(যারা) মাটি-মায়ের কোল ঘেঁষে রয় হেথায় তাদের ধাম।
রৌদ্রজলে শুদ্ধকায়া
বিছিয়ে আছি স্নেহচ্ছায়া
মোদের ক্ষেতের ফসল ওদের পূরায় মনস্কাম।

হিমালয়ের কন্যারা দেয় মোদের প্রাণধারা,
রূপেগুণে আমরা হয়ে উঠি সালঙ্কারা।
পরিয়ে ভালবাসার রাখী
সবায় মোরা বেঁধে রাখি
এক ভারতের অঙ্গ মোরা হাজার লক্ষ নাম॥

কিন্তু হিংসালোভের ঘৃণাবিদ্বেষের বিষবাষ্পে কলুষিত হয়ে উঠেছে গ্রামের মানুষের শান্ততৃপ্ত মন, যার এসে প্রবেশ করেছে আমাদের পুণ্যভূমিতে, তাই ভারতের গান—গ্রামের গান শুনতে পাচ্ছে না মানুষ। ধনিকের মদমত্ততা, বর্ণের অভিমান, কূটবুদ্ধির কুৎসিত কৌশল এনে ফেলেছে মানুষে মানুষে ভেদ, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে হানাহানি, এসেছে পরানুবাদ, পরানুকরণ, পরমুখাপেক্ষা, আত্মহিংসা নিয়ে এসেছে পরবশতা, তার থেকে এসেছে জাতীয় দুর্বলতা, ঘৃণা করতে শিখেছি আত্মীয়জনকে, নিষ্ঠুর হয়েছি ভায়ের ওপর। তাই আমাদের বিবেকানন্দকে সভয়ে উচ্চ-কণ্ঠে ঘোষণা করতে হয়েছে :—

"হে ভারত, ভুলিও না—তোমার নারীজাতির আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী; ভুলিও না—তোমার উপাস্য উমানাথ সর্বত্যাগী শঙ্কর;...ভুলিও না—তুমি জন্ম হইতেই 'মায়ের' জন্য বলি-প্রদত্ত; ভুলিও না—তোমার সমাজ সে বিরাট্ মহামায়ার ছায়ামাত্র; ভুলিও না—নীচজাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত, তোমার

ভাই। হে বীর, সাহস অবলম্বন কর, সদর্পে বল—আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই; বল মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই; তুমিও কটিমাত্র-বস্ত্রাবৃত হইয়া সদর্পে ডাকিয়া বল—ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ…”

কিন্তু কে শোনে?

গান

লোভী মানুষ রইতে নারে গাঁয়ের ক্ষেতে,
লক্ষ্মী তাদের ডাক যে দিলেন বাণিজ্যেতে।
গাঁয়ের মানুষ শহরে যায়,
লোহা-ইটের কোঠা বানায়;
দিনের আলোর তপস্যা তার চল্‌ল বেতে।
কুবের হ'ল প্রভু, মানুষ উঠ্‌ল মেতে।

রাজধানীতে গড়্‌ল ধনী বিধান ভেদের,
পণ্ডিতেরা পাড়্‌ল দোহাই মনু-বেদের।
মানুষ হ'ল বামুন চাঁড়াল
ভায়ে ভায়ে পড়্‌ল আড়াল,
“তফাৎ তফাৎ” উঠ্‌ল ধ্বনি বস্‌তে খেতে,
সর্বনাশা মরণ থাকে ওৎ টি পেতে॥

স্বামী বিবেকানন্দের সেই আদর্শকে রূপ দিতে গান্ধীজি তাই শুরু করলেন তাঁর হরিজন-আন্দোলন। খণ্ডিত বেদনাবিদ্ধ ভারতকে আবার মিলনের পুণ্যভূমি ক'রে তোলবার সাধনায় মেতে উঠল মায়ের সেবকেরা। ভারতবর্ষের চিরন্তন আদর্শকে তাঁরা তুলে ধরলেন পৃথিবীর সম্মুখে, নিজেদের সম্মুখে। ভারতের কবিরা গাইলেন

সেই আদর্শের গান, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ আমাদের স্মরণ করিয়ে দিলেন সেই কথা :

"হে ভারতবর্ষের চিরারাধ্যতম অন্তর্যামীবিধাতৃপুরুষ, তুমি আমাদের ভারতবর্ষকে সফল কর। ভারতবর্ষের সফলতার পথ একান্ত সরল একনিষ্ঠতার পথ। তোমার মধ্যেই তাহার ধর্ম, কর্ম, তাহার চিত্ত পরম ঐক্য লাভ করিয়া জগতের, সমাজের, জীবনের সমস্ত জটিলতার নির্মল সহজ মীমাংসা করিয়াছিল। যাহা স্বার্থের, বিরোধের, সংশয়ের নানা শাখাপ্রশাখার মধ্যে আমাদিগকে উত্তীর্ণ করিয়া দেয়, যাহা বিবিধের আকর্ষণে আমাদের প্রবৃত্তিকে নানা অভিমুখে বিক্ষিপ্ত করে যাহা উপকরণের নানা জঞ্জালের মধ্যে আমাদের চেষ্টাকে নানা আকারে ভ্রাম্যমাণ করিতে থাকে, তাহা ভারতবর্ষের পন্থা নহে। ভারতবর্ষের পথ একের পথ, তাহা বাধাবর্জিত তোমারি পথ—আমাদের বৃদ্ধ পিতামহদের পদাঙ্কচিহ্নিত সেই প্রাচীন প্রশস্ত পুরাতন সরল রাজপথ যদি পরিত্যাগ না করি, তবে কোনমতেই আমরা ব্যর্থ হইব না। জগতের মধ্যে অদ্য দারুণ দুর্যোগের দুর্দিন উপস্থিত হইয়াছে—চারিদিকে যুদ্ধভেরী বাজিয়া উঠিয়াছে—বাণিজ্যরথ দুর্বলকে ধূলির সহিত দলন করিয়া ঘর্ঘর শব্দে চারিদিকে ধাবিত হইয়াছে—স্বার্থের ঝঞ্চাবায়ু প্রলয়-গর্জনে চারিদিকে পাক খাইয়া ফিরিতেছে—হে বিধাতঃ, পৃথিবীর লোক আজ তোমার সিংহাসন শূন্য মনে করিতেছে। ধর্মকে অভ্যাস-জনিত সংস্কারমাত্র মনে করিয়া নিশ্চিন্তচিত্তে যথেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত হইয়াছে—হে শান্তং শিবমদ্বৈতম্, এই ঝঞ্চাবর্তে আমরা ক্ষুব্ধ হইব না, শুষ্ক মৃত পত্ররাশির ন্যায় ইহার দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া ধূলিধ্বজা তুলিয়া দিগ্বিদিকে ভ্রাম্যমাণ হইব না—আমরা পৃথিবীব্যাপী প্রলয়তাণ্ডবের মধ্যে একমনে একাগ্রনিষ্ঠায় এই বিপুল বিশ্বাস যেন দৃঢ়রূপে ধারণ করিয়া থাকি যে, অধর্মের দ্বারা আপাতত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়া যায়, আপাতত মঙ্গল দেখা যায়, আপাতত শত্রুরা পরাজিত হইতে থাকে কিন্তু পরিণামে সমূলে বিনাশ পাইতে হয়।"

এসো, আমরা সেই ভারতের বন্দনা করি!

গান

রক্তরাঙা কাঁটার মুকুট নাও নি তুমি শিরে,
স্নিগ্ধ প্রেমের জ্যোতি তোমার ললাটখানি ঘিরে।
মাগো, তোমার চরণতলে
বিশ্বসাগর-ঢেউ উথলে,
যুগে যুগে লক্ষধারা তোমার সাগরনীরে
মিলছে এসে—সত্তা তোমার হারায় নি সেই ভিড়ে।

তরবারির হিংসা কভু নয়কো তোমার পথ,
প্রেমের ঐক্য মাঝে তোমার উজল ভবিষ্যৎ।
এই বাণী মা, জীবন দিয়ে
ভক্ত তোমার যায় বুঝিয়ে,
কবিরা গায়—মিলবে সবাই ভারতসিন্ধুতীরে।
আমরা যে মা ভুলে থাকি অনেক মতের ভিড়ে॥

ভবিষ্যতের দিকে চেয়ে সেই ভুল আমাদের সংশোধন করতে হবে। এই পুণ্যভূমি ভারতের মহান্ আদর্শ হিমালয়ের মত অচল অটল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে আমাদের মানসপটে। মাঝে মাঝে কুজ্মটিকা এসে আড়াল করেছে ভারতের সেই চিরন্তন সত্য আদর্শকে, সেই মহান্ একের জ্যোতিকে। কোলাহলের মধ্যে আমরা শুনতে পাই নি মিলনের মঙ্গলশঙ্খ; শুদ্ধ শান্ত চিত্তে ধ্যান করলেই দেখব সেই আদর্শকে, আর কৃতজ্ঞ হৃদয়ে স্মরণ করব তাঁদের, যাঁরা কঠিন মাতৃসাধনায় জীবন উৎসর্গ ক'রে মুক্তির পথে, স্বাধীনতার পথে এগিয়ে দিয়েছেন আমাদের। আমাদের সকলের অন্তস্তল হতে উৎসারিত সঙ্গীত ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হবে এই পুণ্যভূমির এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত অবধি, আমরা সমবেতকণ্ঠে মহাভারতের বন্দনা-গান গাইব।

গান

মহাভারতের পুণ্যে দীনের হোক গ্লানি অবসান,
ভুলি ভেদাভেদ জাতিধর্মের সবে হই একপ্রাণ।
হয়ে ভবিষ্য-সন্ধানী
কৃতজ্ঞচিতে অতীতেরে যেন স্মরণে আমরা আনি—
মহৎ যাহারা আমাদের লাগি দিল প্রাণ-বলিদান।
মহাভারতের পুণ্যে দীনের হোক গ্লানি অবসান॥
সারা ধরণীর মিলনতীর্থ পুণ্য ভারতভূমি,
সেই ভাস্বর ভবিষ্যতের স্রষ্টা যে আমি তুমি।
মোরা এ কথা ভুলি বা যদি
অজ্ঞান-তম দেশের মানুষে ঢেকে রবে নিরবধি।
আমাদের পাপে ধিক্কৃত হবে পুণ্য হিন্দুস্থান।
মহাভারতের পুণ্যে দীনের হোক গ্লানি অবসান॥

* * *

সংজ্ঞানসূক্তম্

শুন শুন শুন বিশ্বজন,
শুন অমৃতের পুত্রগণ।
অভিন্ন সঙ্কল্প তোমাদের,
এক হোক সকল হৃদয়,
ঘুচে বাধা অন্তঃকরণের
এক চিন্তা হউক উদয়।
তোমরা সকলে মিলি
লভ লভ ঐক্য চিরন্তন।
শুন শুন শুন বিশ্বজন,
শুন অমৃতের পুত্রগণ—
হয়ে দীর্ঘ ধ্যানে নিমগন,
আমি বার্তা করেছি শ্রবণ॥

সরস্বতী

১

অতীতের অন্ধকারে নয়ন মেলিয়া
দেখিতেছি বহে এক নদী,
সে নদী অদ্ভুত।

অঙ্গে তার নাহি জাগে ঊর্মি-শিহরণ,
সে তটিনী নহে তরঙ্গিণী,
নহে কল্লোলিনী,
নহে উচ্ছলিতা।
হয় না সে দুকূল-প্লাবিনী অসংযত প্রবল বন্যায়।
সন্ধ্যা-উষা-চন্দ্র-সূর্য-মেঘ-নক্ষত্রের
প্রতিবিম্ব-বিলাসেতে হয় না সে আত্মহারা কভু।
বক্ষে তার ধু-ধু করে বালুরাশি শুধু,
মনে হয় মরুভূমি
শুষ্ক নিষ্করুণ;
নদী নয় যেন।

কিন্তু দেখিতেছি
অতীতের অন্ধকারে জ্যোতির্ময় অক্ষরেতে লেখা
এ নদী সরসা।
সরস্বতী অন্তরসলিলা,
মূর্তিমতী জ্ঞানের দেবতা,
রুক্ষতার অন্তরালে রেখেছে ঢাকিয়া দুঃখহরা পিপাসার বারি,
সূক্ষ্ম পথে বহে ধারা তার লোকচক্ষু-অন্তরালে
অসংখ্য সরসী খনি' সে নদীর বুকে
দীপ্তচক্ষু ঋজুদেহ স্বর্ণকান্তি তপস্বী ব্রাহ্মণ
পান করে পুণ্য জলধারা

গান করে বেদমন্ত্র ব্রহ্মাবর্ত মুখরিত করি
বাক্ দেবী মূর্ত হন আর্য-প্রতিভায়।
কোথা ছিল ব্রহ্মাবর্ত
কোথা ছিল নদী সরস্বতী··· ?
ইতিহাস-ভূগোলের পাতায় পাতায়
পাণ্ডিত্যের পণ্ডশ্রম চলিতেছে আজও
সন্দেহের অন্ধকারে।
কিন্তু জানি
সরস্বতী নিত্য প্রবাহিণী রসিকের মর্মলোকে।
সেখানে সন্দেহ নাই,
নাহি অন্ধকার,
জ্ঞানের প্রতীক নদী আজও সেথা অন্তর্বাহিনী।

২

কার মনোসরোবরে জানি না তো কতদিন আগে
ফুটেছিল শতদল নীলাকাশে নয়ন মেলিয়া,
কোন্ মহাশূন্য হতে দুগ্ধশুভ্র পক্ষ বিস্তারিয়া
এসেছিল উন্মুখ মরাল,
জানি না সে কবে
কোন্ কবিমানসের কল্পলোক হতে
শুভ্রবাসা কুন্দকান্তি কুচভরনমিতাঙ্গী
মদিরাক্ষী মোহিনী রূপসী
অবতীর্ণ হয়েছিল
সৃষ্টিকর্তা মানবের দৃষ্টিপথ 'পরে
বীণাপাণি পুস্তক-রঞ্জিতা,
স্বপ্নের পসরা বহি'
সত্যের ইঙ্গিত,
কোন্ সে বিস্মিত সূর্য তাহারে ঘিরিয়া

বর্ষণ করিয়াছিল আনন্দিত কনক-অঞ্জলি
হর্ষে বেদনায়
জানি না সে কবে।
শুধু জানি তারপর কালের প্রবাহে
ভেসে গেছে ডুবে গেছে বিলুপ্ত হইয়া গেছে
কত কোটি মানবের কীর্তি-অকীর্তির
কত লক্ষ ছবি,
এ ছবি মোছে নি আজও।

সে মানস-সরোবরে সে কমল আজিও অম্লান,
এখনও হয় নি ক্লান্ত সে উৎসুক উন্মুখ মরাল,
নব নব তপনের অজস্র কিরণপাতে
সে তরুণী আজিও প্রোজ্জ্বলা,
মহাকাল মন্দিরেতে মৃত্তিকার শাশ্বতী প্রতিমা
দেবী সরস্বতী।

৩

শুনেছি কাহিনী
আপন সৃষ্টির প্রেমে আত্মহারা স্রষ্টা একদিন
ডেকেছিল দেবতারে ;
বলেছিল, হে দেবতা, হে সর্বসম্ভব,
আমার প্রার্থনা শোন,
শোন—শোন—শোন—শোন—
সঞ্চারিত কর প্রাণ প্রাণহীন আমার সৃষ্টিতে,
জড়েরে জীবন্ত কর,
ওষ্ঠে তার ফুটাইয়া তোল মিষ্ট হাসি,
অপাঙ্গে মাখায়ে দাও সলজ্জ মাধুরী,
জীবন্ত ঝঙ্কারে

সঙ্গীতের মতো তাহা উঠুক বাজিয়া
মূক মৌন জীবন-বীণায়।
সিরিয়া দেশের রাজা পিগ্‌ম্যালিয়ানের
অসম্ভব এ প্রার্থনা
দেবতা শুনিয়াছিল
সৃষ্টি তার হয়েছিল প্রাণময়ী জীবন-সঙ্গিনী।

৪

শুনেছি কাহিনী
স্রষ্টার মানসসৃষ্টি মানসী ভারতী
সরস্বতী সতী নিষ্কলুষা
স্রষ্টার প্রেয়সী রূপে হয়েছেন বাণী,
নিখিল সৃষ্টির মাঝে যে বাণীর বিচিত্র প্রকাশ
ছন্দে গন্ধে রূপে রসে
বিকশিত নিত্য নব অজস্র লীলায়।

৫

রসিকের কল্পলোকে
অন্তর্লীনা সরস্বতী আজও বহমান,
কবির মানসলোকে
বিরাজিছে সরস্বতা মরালবাহিনী
বীণাপাণি পদ্মাসনা,
কাহিনীর সরস্বতী কল্পনা-আকাশে
লভিতেছে নবরূপ স্রষ্টার খেয়ালে।
নবরসে নববর্ণে করিতেছে আত্ম-আবিষ্কার
খেয়ালী মানবস্রষ্টা
ক্ষণিকের খেলাঘরে বসি;
ক্ষণিকের খেলা তবু হতেছে শাশ্বত:
মানবের সৃষ্টির প্রকাশ

লোক হতে লোকান্তরে
যুগ হতে যুগান্তরে
চলিয়াছে মন্ত্রে যন্ত্রে আনন্দে ব্যথায়,
রক্তাক্ত সমরাঙ্গণে
পুষ্পাকীর্ণ বাসকশয্যায়
চলিয়াছে তালে ও বেতালে
তারে ও বেতারে ;
আলোকে আঁধারে
সে বাণীর যাত্রাপথ অনন্ত অসীম।
মহাকাল-পটভূমিকায়
পদচিহ্নগুলি মাঝে মাঝে জেগে আছে শুধু।
আকাশেতে রাজহংস আজও উড়িতেছে
তার পাশে উড়িতেছে প্লেন
সেদিনের শতদল হয়েছে সহস্রদল আজ
মৃন্ময় দীপের পাশে জ্বলিতেছে বিদ্যুৎবর্তিকা
জ্বলিতেছে মানুষের মন।
মানবের ইতিহাসে যুগে যুগান্তরে
বিকাশের গতি দুর্নিবার
প্রকাশের অদম্য প্রয়াস
রচিতেছে নব নব শ্রীপঞ্চমীতিথি।
আমি কবি
আজি এই পুণ্যলগ্নে
তাহারেই করিনু প্রণাম।*

"বনফুল"

* ভাগলপুর সাহিত্য-পরিষদে শ্রীপঞ্চমীর দিন অনুষ্ঠিত সাহিত্য-অধিবেশনে পঠিত।

১৮

উকিল-পরিবার চ'লে গেছেন। তাঁদের বাড়িতে স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন উদ্বাস্তু বাঙাল-পরিবার। গৃহকর্তা অবসরপ্রাপ্ত সাবজজ, ল-কলেজে উকিলবাবুর সহপাঠী, পাঁচ মাস হ'ল এই শহরে এসেছেন। যে বাড়িটায় ছিলেন তাতে স্থানসংকুলান হচ্ছিল না। এ সব কথা দিদির (উকিল-গিন্নীর) মুখেই শুনেছিলাম।

এমন নীরব নিরুৎসাহ পরিবার আর কখনও আমার দৃষ্টিগোচর হয় নি। ছেলেমেয়ে অনেকগুলি, নেই তাদের বিবাদ-বিসম্বাদ আনন্দকলরব, বয়স্ক লোকদেরও এক টুকরো কথা কানে আসে না। অসহ্য রকমের শঙ্কিত বিষণ্ন নিস্তব্ধতায় সর্বক্ষণ সমস্ত বাড়িটা ঘেরা। সেই ভাব তাদের চোখে মুখেও। কিন্তু কি তারা হারিয়ে এসেছে? ধনসম্পত্তি যাদের গেছে, তাদের আমি অনেক দেখেছি, তারা তো এমন নয়! 'গতস্য শোচনা নাস্তি' ভেবে তারা নূতন ক'রে ঘর বাঁধছে। পিছনপানে তারা ফিরেও চাইছে না, তাদের দৃষ্টি সম্মুখের দিকে। কিন্তু এদের যেন গুরুতর কোনও পিছটান আছে।

এদের নিয়ে আমি ঘাঁটাঘাঁটি করতে চাই না। এদের দুঃখ ভাগাভাগির বস্তু নয়। এবং সেই দুঃখকে উপন্যাসের উপজীব্য করতে মনুষ্যত্বে না হোক—ভদ্রতায় বাধে।

উকিল-পরিবারের অতীত এবং বর্তমান সমস্যাটাকে বরং ভদ্রভাবে ফেনিয়ে ফেনিয়ে ইনিয়ে বিনিয়ে, যৌন-আবেদন-হীন হ'লেও, সাধারণ একখানা 'দেহতাত্ত্বিক' কিংবা মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসে পরিণত করা যায়। দেহতত্ত্ব যথা,—'কস্তে পুত্রঃ, সংসারোঽয়মতীব বিচিত্রঃ'। মনস্তত্ত্ব যথা, হে উকিলবাবু! 'তত্ত্বং তদিদং চিন্তয় ভ্রাতঃ'! এই প্রকারের মনস্তত্ত্ব নিয়ে উপন্যাস চলে কি? 'আপন কথা' চাই। উকিল-দম্পতি (আগেই প্রমাণ করেছি যে তাঁরা দুজনেই উকিল) যে সব কথা

গোপনে বলেছিলেন তা অতিসাধারণ—সর্বজনবিদিত গুপ্তকথা—ইংরেজীতে যাকে বলে 'ওপেন সিক্রেট'।

আমি যখন দেশ ছেড়ে চ'লে যাই, সে আজ কিছু-বেশি তিরিশ বছরের কথা। এর মধ্যে বেশভূষা, রীতিনীতি, সামাজিক ও পারিবারিক জীবনে কতই না পরিবর্তন এসেছে! সাহিত্যেও তাই। এও দেখেছি, বধূদের জামা-শেমিজ পরা সেকালের গৃহিণীরা বিলাসিতা ব'লে মনে করতেন। স্বামীপ্রদত্ত ওই সব উপহার তারা লুকিয়ে রাত্রিতে ব্যবহার করত। আজ কিন্তু উল্টো। না পরলে একালের গৃহিণীরা তাদের লজ্জাহীনা ব'লে অভিহিত করেন। মেয়েদের জুতো পরা তুমুল আন্দোলনের সৃষ্টি করত—সকাল-সন্ধ্যা এই ক্ষুদ্র শহরের পথে তাদের যখন দেখি, সে কথা আর বিশ্বাস করবার উপায় থাকে না। লেখাপড়া বর্ণপরিচয় পর্যন্ত—আজকের পাকা গিন্নীরা বিবাহযোগ্যা মেয়েদের প্রথম পরিচয়েই জিজ্ঞাসা করেন, কোন্ ক্লাসে পড়? মেয়েদের তো দূরের কথা, ছেলেদেরও গুরুজন-সমক্ষে গান গাওয়া অশিষ্টতা ব'লে গণ্য হ'ত। ছেলেদের সঙ্গীত-প্রতিভা বিকাশের একমাত্র উপযুক্ত ক্ষেত্র ছিল যাত্রার দল—অধঃপাতেরও। আজ এইটুকু শহরে মেয়েদেরও গানের স্কুলের প্রয়োজন হয়েছে—অসুর ক্ষুদ্র সংসার সচ্ছন্দে চলে। রুচি এবং অক্ষমতার মিশ্রিত কারণে বাল্যবিবাহ লুপ্ত হতে চলেছে।

সাহিত্যক্ষেত্রে, নীতি এবং দুর্নীতির বিচারে বঙ্কিম অতিকষ্টে আসামীর কাঠগড়া থেকে মুক্তি পেয়েছেন। রোহিণীকে খুন ক'রে এবং শৈবলিনীর প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা ক'রে চতুর বঙ্কিম আত্মরক্ষা করেছিলেন। যে-সব সমালোচক বলেন যে, এইভাবে বঙ্কিম আর্টকেও হত্যা করেছেন, তাঁরা ভ্রান্ত না হ'লেও স্থূলদর্শী—দেশকালপাত্রভেদে এবং অভেদে চাতুর্যই একটা আর্ট!

'ঘরে-বাইরে' নিয়ে রবীন্দ্রনাথ তখন আসামীর কাঠগড়ায়। কাব্য এবং সাহিত্যের আর পাঁচটা দিক থেকে 'ক্যারেক্টার সার্টিফিকেট'

খালিশ ক'রে রেহাই পেয়েছেন। দেশ ছাড়ার অব্যবহিত পরে খবর পাই, 'চরিত্রহীন'-লেখকের ফাঁসির হুকুম হয়ে গেছে, কিন্তু ঘাড় শক্ত ব'লে ফাঁসি দিয়েও মারতে পারে নি। 'শিষ্যবিদ্যা গরীয়সী'। শরৎ-শিষ্য ছোট-বড় অনেককেই তারা 'কোর্ট মার্শাল' অর্থাৎ গুলি ক'রে মেরেছে, কিন্তু এই নীতি-বিদ্রোহী রক্তবীজের ঝাড় নির্মূল করতে পারে নি।

শুনেছি, ইংরেজের পুলিস লাঠি মেরে মেরে মহাত্মাজীর অসহযোগ-আন্দোলন ব্যাপকতর ক'রে তুলেছিল। সমালোচনার বন্যা স'রে যেতেই, তার পলিমাটিতে দুর্নীতির চাষ জোর পেয়ে গেল। আমার আপত্তি এইখানেই। সাহিত্যের প্রায় সবটুকু জমিতেই যদি এই গলা-কুটকুটে সিঁদুরে-পাতা কচুর চাষ চলে, এই রোগ-শোক-দুঃখ-দৈন্য-ভরা পৃথিবীতে অন্ন-পথ্য জুটবে কেমন ক'রে?

দেশ-দেশান্তর ঘুরেছি, বহু পরিবারের আতিথ্য নিয়েছি, কিন্তু নরনারীঘটিত সমস্যা একটার বেশি আমার জানা নেই। এই শহরেও এক বৎসর বাস করছি, নিষ্কর্মা লোকের মেলামেশার সুযোগও প্রচুর, উক্ত সমস্যা শুধু একটি আমার নজরে পড়েছে। 'মন্-মন্‌মে' অনেক কিছু থাকতে পারে, কিন্তু তা বাস্তব উপন্যাসের বিষয়বস্তু হতে পারে না। বাস্তবকে অবলম্বন ক'রে যে মনস্তত্ত্ব, তাই হবে উপন্যাসের উৎকৃষ্ট উপকরণ।

জংলা-গোবরা-ঘটিত ব্যাপারে যে সুগভীর মনস্তত্ত্ব বা গোপন কথা কিছু ছিল না, তা প্রমাণ হয়ে গেছে। জংলা আমার পা ছুঁয়ে দিব্যি করেছে। জয়েন্ট হিন্দু ফ্যামিলির বাড়িখানা আজও আমার কাছে রহস্যাবৃত। অর্গান-বাজানো মেয়েটি, কে জানে, কি!

তারপর ডক্টর রায়ের ফ্যামিলি। উচ্চশিক্ষিত এবং আধুনিক। ফ্যামিলি মানে তিনি এবং তাঁর স্ত্রী এবং আশপাশের দু-চারটে ডালপালা যা বাড়ির ওপর এসে পড়েছে। এদের জীবনে সমস্যা আছে আর সে সমস্যা নিতান্ত অবহেলার যোগ্য নয়। সহজে মন থেকে ঝেড়ে ফেলা যায় না।

হ্যাঁ, তাঁর স্ত্রী অতসী। বিদুষী এবং কবি। ক'দিনের বা আলাপ বয়সের ব্যবধানও প্রচুর। কিন্তু সে আমার কাছে তার জীবনের কঠিন প্রশ্ন তুলতে চেয়েছিল, চেয়েছিল তার সমাধান, যার ভয়ে আমি ওদের কাছ থেকে দূরে স'রে পড়েছি। স্বামী-স্ত্রী হয়েও তাদের মধ্যে সদ্‌ভাবও নেই, বিবাদও নেই—স্ত্রীর জীবনে গোপন কথা আছে, এর চেয়ে সন্দেহজনক ব্যাপার আর কি হতে পারে?

কিন্তু এ নিয়ে আমি কেন এত ভীত হয়ে পড়লাম? পাছে কোনও কলঙ্কিত ইতিহাস উদ্‌ঘাটিত হয়ে পড়ে, এই তো? কিন্তু তাতে আমার কি? আমার পবিত্র জীবনে পাপস্পর্শ করবে?

নিজের দিকে পিছন ফিরে চাই।
প্যারিসের ক্ষুদ্র পরিবার—
একটি তরুণী, তার বিধবা মা, দুটি ছোট ছোট ভাই—
আমি তাদের অতিথি, পেয়িং গেস্ট—
মেয়েটিকে আমি ভালবেসেছিলাম—
এবং সেও বোধ হয়...
মাত্র পাঁচ মাসের অবস্থিতি—

ভাগ্যক্রমে তার মা অতিকষ্টে ব্যাপারটাকে সামলে নিয়েছিলেন। আমি শুনে শিউরে উঠেছিলাম, মেয়েটি অন্যপূর্বা। তার স্বামী যুদ্ধে যাবার আগে তার মার কাছে রেখে গেছে। মাসে মাসে খরচ পাঠায়।

আজ ভেবে আশ্চর্য হচ্ছি, কি অন্ধ আবেগে আমি অগ্রসর হয়েছিলাম, যাকে ভালবাসতে যাচ্ছি, সে বিবাহযোগ্যা কি না—সে সন্ধান নিতেও ফুরসুত পাই নি।

অথচ আজকের এই বয়সে নিষ্কলঙ্কতার ভান করা কত সহজ! মনে মনে লজ্জিত হলাম। অশক্তস্তস্করঃ সাধুঃ—

ডাকে চিঠিপত্র এল। চিঠিপত্র মানে একটা মাসিকপত্র, দুখানা সংবাদপত্র—একখানা বাংলা দৈনিক, অন্যখানা ইংরেজী সাপ্তাহিক।

কিন্তু তার সঙ্গে একখানা খাম। আমাকে খামে চিঠি লিখলে কে? তবে কি···তবে কি···বাংলা দৈনিকটায় এতদিন ধ'রে যে বিফল বিজ্ঞাপন দিচ্ছিলাম, আজ এতদিন পরে তার জবাব পাওয়া গেল? দুরুদুরু বক্ষে কম্পিত হস্তে খামখানা ছিঁড়ে দেখি—প্রভাতরবি লিখছে:

দাদু, যন্ত্রের কয়েকটা সূক্ষ্ম অংশের পরীক্ষার জন্য কলকাতা এসেছি। হঠাৎ ঝোঁকের মাথায় চ'লে এলাম, আপনাকে ব'লে আসা হয় নি। অতসী এখনও সম্পূর্ণ সেরে উঠতে পারে নি, দয়া ক'রে ও-দিকটায় নজর রাখবেন। আমার ফিরতে কিছু দেরি হবে।

আপনার প্রভাতরবি

বুঝলাম, যে আশায় খামটা খুলেছিলাম, সে আমার সারা জীবনের দুরাশা মাত্র।

ডক্টর রায় তা হ'লে এখানে নেই। নিজের দৈহিক ও মানসিক অবস্থা নিয়ে অতসী কি করছে কে জানে। হয়তো আমি তাকে কিছু সাহায্য করতে পারতাম, হয়তো আমার সাহায্যে সে মনের অশান্তি দূর করতে পারত। অতসী বলেছিল, আমি তার উপকার করতে পারি···

আমার মনে এই আত্মপ্রবঞ্চনা কোথা হতে এল? তলিয়ে ভেবে দেখলাম, স্বার্থপরতা ভিন্ন কিছুই নয়। যে কাদা নিজে মেখেছি, পরের জন্য তা মাখতে যাব কেন?

আমার ভাবা উচিত ছিল, নিশ্চয় এ তার কোনও বেদনার ইতিহাস, একটা কিছু জীবন-মরণ-সঙ্কট হয়তো, যা থেকে উদ্ধার পেতে সে পিতৃস্থানীয় আমার আশ্রয় চেয়েছিল।

সন্ধ্যাবেলায় অতসীর সঙ্গে দেখা করব ব'লে দৃঢ়সংকল্প হই। আজই।

যথারীতি অর্থাৎ যেমন-তেমন ক'রে দুপুরবেলাটা কাটল। ভাবনা হ'ল, অতসী আবার অসুখে পড়ে নি তো? সেও তো আমার সঙ্গে দেখা করতে পারত! অথচ ডক্টর রায় এখানে নেই। কিন্তু তা নয়। তা হ'লে তার অসুস্থতার খবর অমু পূর্ণিমা এরা কেউ আমার কাছে পৌঁছে দিত—নিশ্চয় আমার সাহায্য নিত। ব্যাপার কি?

খুব সম্ভব, অসুস্থ অবস্থার মানসিক দুর্বলতায় আমার কাছে তার মনের দুয়ার খুলতে গিয়ে, আধ-খোলা ক'রে সে লজ্জিত হয়ে পড়েছে। তাই হবে। এত কথা আমি আগে ভাবি নি।

যাই হোক, সন্ধ্যার আগেই বেরিয়ে পড়ি।

সাদা ধবধবে প্রকাণ্ড বাড়িখানার উপর অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে।

ডক্টর রায়ের উচ্চ উদার নির্মল হৃদয়ে সন্দেহের ছায়া ও কি?

ঘরে ঘরে আলো জ্বলছে, দুয়ারে দুয়ারে পর্দা ফেলা, পর্দার আশপাশ দিয়ে গোপন হৃদয়ের আবছায়া কথার মত ছিটেফোঁটা আলোর রেখা—

আমার পায়ে কেড্‌স্।

বাড়িখানা নিস্তব্ধ।

শঙ্কিত মনে ধীরে ধীরে ল্যাবরেটরি-ঘরের পর্দা তুলে ঢুকতেই—

যা দেখলাম তা আমার কল্পনাতীত!

যন্ত্রের টেবিলটার সম্মুখে দাঁড়িয়ে অতসী আর বিভূতিবাবু। কিন্তু এমন একটা অবস্থায় যা স্বামী-স্ত্রী ভিন্ন আর কারও পক্ষে সম্ভবও নয়, শোভনও নয়।

বিভূতিবাবুর হাত গিয়ে উঠল অতসীর কাঁধে, এবং—

এর বেশি আর নাই বা লিখলাম।

একটি মুহূর্তের ব্যাপার। নিঃশব্দে পর্দা ফেলে দিয়ে পিছু হঠলাম।

এই তবে তার আসল কথা! কষ্ট ক'রে খুলে বলতে হ'ল না, ঘটনাচক্রে আমার কাছে এখন দিবালোকের মত স্পষ্ট। ধৃষ্টতা তো কম নয়! ওর ছেলেবেলাকার প্রাইভেট টিউটর···

পশ্চাতে অতসীর ক্রন্দনমিশ্রিত ক্রুদ্ধ চিৎকার কানে ভেসে এসে মিলিয়ে গেল···

চতুরিকার চাতুর্য বুঝতে দেরি হ'ল না। আমাকে চিনতে পারুক আর নাই পারুক, তৃতীয় ব্যক্তির আগমন-বার্তা ওদের অজ্ঞাত ছিল না। চমৎকার অভিনয়!

...শিক্ষার সঙ্গে রুচিরও কি কোনও সম্বন্ধ নেই? কোথায় প্রভাতরবি আর কোথায় বিভূতি!

দুঃখিত, ওর জন্যে আমি সত্যই দুঃখিত।

৯

সকালবেলা চুপ ক'রে ব'সে আছি, বাড়িখানা বিক্রি ক'রে দিয়ে এখান থেকে পালাব কি না ভাবছি। এবার যেখানে যাব, অবশ্য এখনও তা স্থির করি নি, আর কোনও কিছুর সঙ্গে জড়িয়ে পড়ছি না,—না, কিছুতেই না। মানুষকে যারা ভালবাসে, তাদের উচিত মানুষের কাছ থেকে বহু দূরে বাস করা।

দূর নিভৃত পল্লীতে গিয়ে বাসা বাঁধব। উকিল-দিদির গাঁয়ে? না, সেও হবে এক বিরক্তিকর নূতন বন্ধন। কাজ নেই। বন্য কিংবা পার্বত্য কোনও আদিমজাতির গ্রাম্য পরিবেশ...সেই ভাল। বেছে নিতে হবে, খুঁজে খুঁজে বের করতে হবে। সভ্যসমাজের সংস্পর্শে এসে যারা হিংস্রত্ব ভুলেছে, সারল্য ভোলে নি—চমৎকার! সরিকে সঙ্গে নিতে হবে, অবশ্য যদি আপত্তি না করে। আপত্তি? আমি খুব ভাল ক'রেই জানি, সে আপত্তি করবে না। নিরাশ্রয় জগতের পথে একলা সে আমাকে ছেড়ে দিতে চাইবে না, এ সুনিশ্চিত। তার তিনটি ছেলেমেয়ের মধ্যে, তার দৃষ্টিতে আমিই সবচেয়ে বেশি অপোগণ্ড। ওদের সম্বন্ধে দেখেছি তার স্বভাব-স্নেহ, আমার বিষয়ে ওর চোখে দেখেছি সেই ব্যাকুল শঙ্কা, যা সমগ্র শিশুজগৎকে ঘিরে রেখেছে।

কোলের মেয়ে ব্যালফুলেরও বিয়ে হয়ে গেছে। (ওর প্রকৃত নাম ভানুমণি, কারণ সে ভাদ্র মাসে হয়েছিল।) শুনলাম, সে সুখেই আছে। একেবারে পাকা গিন্নী, জংলার মাতৃহীন সন্তান দুটিকে শাসনও করে, যত্নও করে।

আর একটা পথ খোলা আছে। কিশোর-পূর্ণিমার বিয়ে দিয়ে,

অমুকে কন্যারূপে গ্রহণ করলে উভয়ে উভয়ের আশ্রয়স্থল হতে পারি। ডক্টর রায় আপত্তি করবেন না নিশ্চয়, অমুকেও খেটে খেতে হবে না। বিয়েটা না হয় আমার খরচেই হ'ল। পুতুলের বিয়ে মনে আছে আপনাদের ?

এরা দুজন নির্ঝঞ্ঝাট, কোনও প্রকারের অশান্তির কারণ হবে না। বড় জোড় সরি এসে মাথায় তেল দিতে লেখার কাগজে তেলের ছিটে লাগাবে। না হয় অমুর দুটো ধমক খাব। নগীর কথা উঠতেই পারে না, সংসারী না হয়েও সে ঘোর সংসারী।

এই সব আবোল-তাবোল ভাবছি, হুড়মুড় ক'রে ঘরে ঢুকে মধুসূদনবাবু বললেন, দাদা, একটু উপকার করতে হবে।

না, ও-সবে আর আমি নেই। তিক্তকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলাম, কি ?

তিনি বললেন, আসছে মাসে তাঁর মেয়ের বিয়ে। সেই ব্যাপারে আমার একটু সাহায্যের দরকার। এই তো দু-দশ পা পরেই তাঁর বাড়ি, একটু কষ্ট ক'রে হেঁটে যাওয়া আর কি। তার বেশি বিশেষ কিছুই করতে হবে না।

মীরার বিয়ে। কিন্তু আমাকে কি করতে হবে, খুলে বললেন না। পাড়াপড়শী, সামান্য একটু উপকার, মেয়েটারও একটা গতি হবে। চটি পায়েই দাঁড়িয়ে উঠে বলি, চলুন।

দুজনে নীরবে পথ চলেছি, কতটুকুই বা পথ। বাড়ির কাছাকাছি এসে বললেন, একটা দলিলে সাক্ষী হতে হবে। সই ক'রে দেবেন, তা ছাড়া আর কিছুই নয়।

চমকে উঠলাম। এই আর এক অপ্রিয় সংস্রব। কন্যাদায়ে প'ড়ে সম্পত্তি বেচবেন। বিরক্ত হলাম, কিন্তু তখন এসে পড়েছি।

খাটের ওপর ব'সে আছেন মনোহরবাবু এবং অন্য এক ভদ্রলোক। দেখে মনে হয়, ইনিই মধ্যমকর্তা নরহরিবাবু। পরে জানলাম, আমার ধারণা সত্য।

আমার জন্য একটা চেয়ার এগিয়ে দিলেন মধুবাবু।

ঘরে আরও তিনজন লোক ছিল। দুজনকে প্রস্তাবিত দলিলের সাক্ষী ব'লে বোঝা গেল, দেওয়াল ঘেঁষে বেঞ্চির ওপর ব'সে ছিল তারা।

অপর একটা চেয়ারে ব'সে ছিল আমার অপরিচিত এক যুবক, বোধ হয় এই বাড়িরই কেউ। ব্যাকব্রাশ করা চুল, স্বচ্ছ কপাল, চোখের দৃষ্টি উজ্জ্বল, রিম্‌লেস চশমার ফাঁক দিয়ে উজ্জ্বলতর উঁচু নাক, মুখখানি ভরাট না হ'লেও সুশ্রী মসৃণ, মুখে সৌজন্যের স্মিতহাস্য। আমার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই চেয়ার থেকে একটু উঠে নমস্কার জানালে।

দলিল লেখা হয়ে গেছে। বাকি শুধু টাকার আদান-প্রদান, সাক্ষীদের স্বাক্ষর। পরে রেজেস্টারি হবে। নরহরিবাবু এক হাজার টাকায় মধুবাবুর অংশটা কিনে নিচ্ছেন। মধুবাবু কোথায় যাবেন? সম্ভবত এখনও ভেবে ঠিক করেন নি। বিয়েটা তো চুকে যাক।

কাগজখানা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে যুবক বললে, আমার ইচ্ছে, কাকার এই অংশ আমি নিজেই কিনে রাখি আমার নিজের টাকায়। অবিশ্যি বাবা কিনলেও সেই একই কথা, কিন্তু আমার নিজস্ব নিরিবিলি খান-কতক ঘরের দরকার। মাঝে মাঝে বাড়ি আসি, আমি গোলমাল সইতে পারি না মোটেই।

এই কথা শুনে নরহরিবাবুর মুখখানা ক্রোধে রক্তবর্ণ ধারণ করতে গিয়ে আরও বেশি কালো হয়ে গেল। কথাটা আসলে একই নয়, যথেষ্ট তারতম্য ছিল। নরহরিবাবুর দুই ছেলে, এইটি জ্যেষ্ঠ। উত্তেজিত ভাবে বললেন, এখন তা বলবি বইকি। গায়ের রক্ত জল ক'রে মানুষ করলাম, দুপয়সা রোজগার করছিস, নিজের বুঝ বুঝে চলতে চাস, নয়? ভবিষ্যতে নরু যদি ভাগ বসায়, এই তো?

বিন্দুমাত্র উত্তেজিত না হয়ে ছেলেটি চিবিয়ে চিবিয়ে বললে, নিজের বুঝ কে না বোঝে বল? গোড়া থেকে বুঝে সুঝে না চললে শেষের দিকে ঠকতে হয়। তার দৃষ্টান্ত কাকা নিজেই।

পিতা বললেন, বটে! পেটে পেটে তোর এত সব ছিল? বউমা পরামর্শ দিয়েছেন বুঝি?···আমি দেড় হাজার টাকা দেব।

পিতা-পুত্রে প্রকাণ্ড বিবাদ। এ আমার বিধিলিপি—একটা কিছুতে জড়িত হয়ে পড়া।

তাক বুঝে জ্যেষ্ঠ মনোহরবাবু বললেন, কন্যাদায়ে প'ড়ে মধু তার বসতবাটি বিক্রি করছে। আমার কাছে ন্যায্য বিচার, যে বেশি দাম দেবে, সেই পাবে। তার কাজ টাকা নিয়ে।

ছেলেটির হাত ধ'রে মধুসূদনবাবু বললেন, কথাটা ভাল হচ্ছে না হরু। ছি বাবা, এই নিয়ে কি বাপের সঙ্গে ঝগড়া করে? তা ছাড়া দলিল যখন মেজদার নামেই লেখা হয়ে গেছে—

এমন সময় সেই মজলিসে (দলিল-সম্পাদন-সভাকে আইনের ভাষায় 'মজলিস' বলে) প্রবেশ করলেন এক অপরূপ চতুর্থ সাক্ষী—কেউ তাকে ডাকে নি। অক্ষম পদক্ষেপে হরুর কাছে গিয়ে বললে, বা-ব-বাঃ! বিশ্বরূপ।

তাকে কোলে তুলে নিয়ে শান্ত দৃঢ় কণ্ঠে হরেন্দ্র জবাব দিলে, বাড়ি তুমি মোটেই বেচবে না কাকা। বাড়ি আমি কিছুতেই বেচতে দেব না।

মধুবাবু কেঁদে ফেললেন। তা হ'লে উপায়? সামনের মাসে মীরার বিয়ে। এক ছাদের তলায় তিন অংশ, মাঝেরটা তাঁর। এ বাড়ি বাইরের লোক কিনতে চাইবে না, আর কিনলেই কি দেওয়া উচিত?

আমাকে লক্ষ্য ক'রে নরহরিবাবু প্রশ্ন করলেন, দেখলেন মশাই, উপযুক্ত ছেলের ব্যবহারটা? কলি পূর্ণ হয়েছে, কি বলেন?

আমি কোনও উত্তর দিলাম না, কারণ কলির কালপরিমাণ আমার জানা ছিল না। উত্তর দিলে তাঁর উপযুক্ত পুত্র। বললে, আমার দ্বারা কলি পূর্ণ হ'ল কি না জানি না, তবে তা আরম্ভ হয়েছে অনেক আগে। কলির ভাগ্যে যাই ঘটুক, আমি ভুলতে পারি না, সারাদিন ইস্কুলে ব'কে সকাল-সন্ধ্যে আমার পিছনেই লেগে থাকতেন তিনি, যাতে আমি স্কলারশিপ পাই। পরীক্ষার সময়, শীতের শেষরাত্রে ঘুম থেকে

তুলতেন। বৈকালে সামান্য অবসর, আমাকেই সঙ্গে ক'রে বেড়াতে যেতেন, মুখে মুখে উজাড় করতেন দেশ-বিদেশের জ্ঞানভাণ্ডার।··· নিজের নামে সম্পত্তি কিনছি, এতে তোমার আপত্তি কি থাকতে পারে? তোমার আপত্তি এইখানে যে, নরু তার অর্ধেক থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। নরুকে আমি ফাঁকি দেব—এ ধারণা তোমার কেমন ক'রে হ'ল?···কেন, কাকাকে এই টাকাটা তো তুমি এমনি দিয়ে দিতে পারতে? তোমার অভাব কিসের? তোমারও তো সে মায়ের পেটের ভাই! (আমার দিকে চেয়ে) জ্যাঠা-খুড়োকে পর ভাবতে শিখিয়ে এঁরা নিজেদেরই আসন আলগা করেন, সেই সঙ্গে শিথিল করেছেন বাঙালীর পারিবারিক জীবন।

আমার মনে হচ্ছিল, আমি যেন কোনও উচ্চশ্রেণীর রঙ্গমঞ্চের সামনে ব'সে আছি। তার বক্তৃতাস্রোতে বাধা দিয়ে, 'যা ভাল বোঝ কর'—এই কথা ব'লে ক্রুদ্ধ ও বিরক্ত নরহরিবাবু উঠে চ'লে গেলেন।

ছেলেটি তার পকেট থেকে একতাড়া নোট বের ক'রে বললে, এই নাও কাকা, আপাতত এক হাজার টাকা। আপনারা সাক্ষী, বিনা শর্তে টাকাটা আমি মীরাকে দিলাম।

বোঝা গেল, গোড়া থেকেই সে মহত্ত্বের জন্যে প্রস্তুত হয়ে বসেছিল। বললে, কাল রাত্রে কলকাতা থেকে এসে ব্যাপারটা সে জানতে পারে তার স্ত্রীর কাছে। সকালে উঠে দেখে, দলিল এবং সবই প্রস্তুত।

সবেগে পুনঃপ্রবেশ ক'রে নরহরিবাবু জানালেন, দলিল প্রস্তুত। আপনারা দেখছেন, ছেলেটাকে ভুলিয়ে মধু এক হাজার টাকা আদায় ক'রে নিচ্ছে। এ কথা আদালতে প্রমাণ হবে।

হরেন্দ্র বললে, দলিল চুলোয় যাক। টাকাও থাক্ আমার পকেটে। মীরার বিয়ের ভার আমার। আমি কাকীমার কাছে যাচ্ছি। কালই দেখা করব বরপক্ষের সঙ্গে। হ'ল তো?

সসংকোচে মধুবাবু বললেন, কাজটা কি ভাল হবে বাবা? এই নিয়ে একটা গৃহবিবাদ সৃষ্টি করা—

গৃহবিবাদ তো হয়েই আছে কাকা। এই বয়সে বাড়ি ছেড়ে তুমি কোথায় যাবে? কাকীমার শরীর দেখেছ? না, সে দিকে তোমার দৃষ্টি আছে?...আমি এর একটা হেস্তনেস্ত করতে চাই। হয় আমি এ বাড়ির ছাদ ভাঙব, না হয় ভাঙব পার্টিশনের দেওয়াল।

তার চূড়ান্ত বিচার জানিয়ে দিয়ে বোধ হয় সে তার কাকীমার কাছে চ'লে গেল। আমি আশ্চর্য হলাম, উত্তেজনার যথেষ্ট কারণ সত্ত্বেও আগাগোড়া তার মুখের স্মিতহাস্য একটুও বিকৃত হয় নি। বিমূঢ় মধুবাবু তার পিছু পিছু বাড়ির ভিতর ঢুকলেন।

মনোহরবাবুর সঙ্গে নরহরিবাবুর অর্থপূর্ণ দৃষ্টিবিনিময় হ'ল। আমি তার অর্থ বুঝলাম না। সাক্ষী দুজন নির্লিপ্ত ভাবে বেরিয়ে গেল।

ভাবপ্রবণ বাঙালী যুবক! কিন্তু এটা তার মহত্ত্ব নয়, খাঁটি অভিনয়ও নয়, মহত্ত্বের প্রলোভন মাত্র। কর্তব্যবোধও ছিল কতকটা। কিন্তু সে যদি এই সাহায্য গোপনে করত, এত সব হাঙ্গামার সৃষ্টি হ'ত না। এ যেন টেনে-বুনে তৈরি করা ভাবুকতার নাটকীয় দৃশ্য একটা।

ডক্টর রায়ের হ্যাণ্ডনোটঘটিত মহত্ত্বের কথা মনে পড়ল। উক্ত হ্যাণ্ডনোটের মহান্ অঙ্কটা দান করবার জন্য উকিলবাবুর চেয়ে যোগ্যতর পাত্র বাংলা দেশের পথে-ঘাটে ছড়িয়ে আছে। যোগ্যতম! দুঃখের বিষয় ব্যাকরণে ওর চেয়ে যোগ্যতর প্রয়োগবিধি নেই। মহত্ত্বের প্রলোভন! মহত্ত্বের চেয়ে কর্তব্যবোধকে আমি অনেক বেশি শ্রদ্ধা করি। মনস্তত্ত্বের আর একটা দিক হয়তো তার স্বার্থপর বৃদ্ধ পিতাকে সর্বজনসমক্ষে সমুচিত শিক্ষাদানই এই অত্যুৎসাহী যুবকের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। তার মনের কথা তার বক্ষস্থিত বিশ্বরূপই বলতে পারেন।

উপন্যাসের উপকরণ হিসাবে আমার এইটুকু লাভ হ'ল যে, আমি জানতে পারি, এই মহাত্মাই বিশ্বরূপের মা-যশোদার পতিদেবতা। 'মা যশোদা, বাবা নন্দ'।

[ক্রমশ]

শ্রীভোলা সেন

মহাস্থবির জাতক

চার

পরেশদার মা সেই যে গিয়ে বিছানায় শুলেন আর তাঁকে উঠতে হ'ল না। ডাক্তারে ঠিকই বলেছিল। অসামান্য মানসিক শক্তিবলেই তিনি এতদিন উঠে হেঁটে কাজ করছিলেন—সে দিন শেষ শক্তিটুকু ব্যয় ক'রে আমাদের জন্য রান্না ক'রে দিয়ে শয্যাগ্রহণ করলেন।

পরের দিন সকালবেলা আমরা রান্না করলুম। রান্না এমন কিছুই না—ভাত, ডাল ও একটা আলু কিংবা কুমড়োর ঘ্যাঁট। সে কাজ করতে আমাদের ভালই লাগছিল, কিন্তু পরেশদা শুনলে না। সে এক ব্রাহ্মণের মেয়েকে যোগাড় ক'রে নিয়ে এল, সে এসে দু বেলা রেঁধে দিয়ে যেতে লাগল। আমরা নিজেদের টাকা দিয়ে চাল ডাল ও জিনিসপত্র কিনে আনতে লাগলুম। পরেশদা সামান্যই মাইনে পেত—অবিশ্যি তাতে তার সংসার সচ্ছল ভাবেই চ'লে যেতে পারত—আমরা আসা সত্ত্বেও। কিন্তু মার অসুখে একদিন অন্তর ডাক্তার ডাকা ও তা ছাড়া ওষুধপত্তর এবং অন্যান্য খরচের ঠেলায় সে বেচারী বিব্রত হ'য়ে পড়ল। পরেশদার আপিসেরও দু-একটি বন্ধু এই সময়ে দেখাশুনো ও খোঁজখবর করতেন।

এক ভদ্রলোক, তাঁর ওই দেশেই বাড়ি, তিনি প্রায় প্রত্যহ সন্ধ্যেবেলায় আসতেন এবং আমাদের বলতেন যে, পরেশ হয়তো চক্ষুলজ্জার খাতিরে কিছু বলতে পারে না, কিন্তু তোমরা তার ছোট ভাই, তোমাদের বলা রইল যখন যা প্রয়োজন হবে—অর্থ, লোকজন, সেবার জন্য নারী—যদি কিছু সাহায্যের প্রয়োজন হয় তো নিঃসঙ্কোচে আমায় জানাবে।

অনেক চেষ্টা ক'রেও আজ লোকটির নাম মনে করতে পারছি না, হয়তো এমন সময় মনে পড়বে তখন আর কোন কাজে লাগবে না—স্মৃতি চিরদিন আমার সঙ্গে এমনি লুকোচুরি খেললে।

পরেশদা প্রতিদিন সকালে মার সমস্ত কাজ ক'রে বেলা দশটার

পর আপিসে বেরিয়ে যেত। খাওয়াদাওয়া শেষ ক'রে আমরা এক-একজন পালা ক'রে তাঁর কাছে গিয়ে বসতুম। সন্ধ্যের সময়ে পরেশদা আপিস থেকে ফিরে সমস্ত দিনের সংবাদ নিয়ে ডাক্তারের কাছে ছুটত—কারণ ডাক্তার ব'লে দিয়েছিলেন প্রতিদিনের সংবাদ যেন তাঁকে দেওয়া হয়। সেখান থেকে ফিরে হাত মুখ ধুয়ে তিনি মাতৃসেবায় লেগে যেতেন আবার পরদিন ভোরবেলা অবধি।

প্রায় প্রতিদিনই সন্ধ্যেবেলাটায় আমি রোগিণীর কাছে ব'সে তাঁর সঙ্গে গল্পসল্প করতুম। বাইরে থেকে বুঝতে না পারা গেলেও ডাক্তার বলতেন যে, রোগিণীর অবস্থা উত্তরোত্তর মন্দের দিকেই চলেছে—কোনও ওষুধই ধরছে না। রোগিণী অধিকাংশ সময়েই সেই আচ্ছন্নের মত প'ড়ে থাকলেও হঠাৎ মাঝে মাঝে বেশ সজীব হয়ে উঠতেন—তখন মনেই হ'ত না যে, ওই রকম একটা সাংঘাতিক রোগে তিনি ভুগছেন। যতটুকু সময় ভাল থাকতেন, শুধু কথা বলতেন একেবারে বিরাম-বিহীনভাবে। আমাদের উপদেশ দিতেন বাড়ি ফিরে যেতে। বলতেন, এ সংসার বড় খারাপ জায়গা, কোথায় কি বিপদ লুকিয়ে জাল পেতে ব'সে আছে, টপ ক'রে সেই ফাঁদে প'ড়ে যাবি আর সামলাতে পারবি না। কখনও বলতেন, আমি জীবনে কোনও কামনাই পোষণ করি নি, শুধু একটি মাত্র সাধ ছিল যে মরবার আগে পরুর বিয়ে দিয়ে তাকে সংসারে স্থিতি ক'রে যাব; কিন্তু সে-ও এই তোদেরই মত মার আশ্রয় ছেড়ে পালিয়ে গিয়ে এমন ফাঁদে প'ড়ে গেল যে তা থেকে আর পালাবার পথ রইল না—সবই আমার বরাত তা না হ'লে পরুর মত ছেলে মাকে ছেড়ে পালাবে কেন? বালক সে বুঝতে পারে নি যে, মার কোলের চাইতে নিরাপদ আশ্রয় আর নেই।

বললুম, কিন্তু পরেশদা তো মার দুঃখ ঘোচাবে ব'লেই বাড়ি থেকে চ'লে গিয়েছিল।

আমার কথার আর কোনো উত্তর না দিয়ে তিনি চুপ ক'রে রইলেন। অনেকক্ষণ কেটে যাবার পর তিনি আপন মনে বলতে

লাগলেন, আমার আবার দুঃখ কি বাবা! আমি সুখেই আছি—তোমরা সুখে থাকলেই আমার সুখ।

সেদিন মার কথায় মনে হ'ল পরেশদার জীবনের সঙ্গে নিশ্চয় কোনও রহস্য জড়িয়ে আছে, যার জন্যে বিয়ে করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। প্রেমঘটিত কোনও ব্যাপার মনে ক'রে সে সম্বন্ধে পরেশদাকেও আর কোনও কথা জিজ্ঞাসা করি নি।

আর একদিন সন্ধ্যেবেলা মার ঘরে তাঁর চৌকির সামনেই পরেশদার চৌকিতে ব'সে আছি, সুকান্ত ও জনার্দন দুজনেই পরেশদার সঙ্গে সেই ক্যাণ্টন্‌মেণ্টে ডাক্তারের বাড়ি গিয়েছে। নীচের তলায় মধ্যে মধ্যে রাধুনী ও ঝিয়ের গলার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। মার দিকে চেয়ে আছি—খুবই ধীরে ধীরে তাঁর নিশ্বাস পড়ছে। সাধারণত এই সময়টা তাঁর আচ্ছন্ন ভাব কিছুক্ষণের জন্য কেটে যায়, কিন্তু সেদিন তখনও কাটে নি। তাঁর দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছি, হঠাৎ দেখলুম তিনি চোখ খুলে মাথা ঘুরিয়ে একবার আমার দিকে চাইলেন। কিন্তু আমাকে কোনও কথা না ব'লে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে সামনের দিকে কি দেখতে লাগলেন। কিছুক্ষণ এইভাবে দেখতে দেখতে অতি ক্ষীণস্বরে যেন কি বললেন।

আমি চৌকিতে ব'সে ব'সেই জিজ্ঞাসা করলুম, মা, কিছু বলছেন?

দেখলুম, আবার তিনি চোখ বুজে ফেললেন। কিছুক্ষণ সেইভাবে কেটে যাবার পর আবার চোখ চেয়ে কি যেন বললেন। এবার আমি চৌকি থেকে নেমে তাঁর কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলুম, কি বলছেন মা?

অতি ক্ষীণস্বরে তিনি বললেন, ঘরে যিনি এসেছেন তিনি কে?

আমি চারিদিক চেয়ে দেখলুম, কেউ কোথাও নেই। বললুম, কই, কেউ তো আসে নি মা।

মা বললেন, দেখতে পাচ্ছিস না, এই যে সামনে—মাথায় জটওয়ালা এক সন্ন্যাসী—ওই যে একেবারে তোর পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন!

আমার সর্বাঙ্গে কাঁটা দিয়ে উঠতে লাগল—এমন কি পাশের দিকে

চাইতেও সাহস হচ্ছিল না। শেষকালে জোর ক'রে মন থেকে ভয় ঝেড়ে ফেলে পাশের দিকে চেয়ে দেখলুম, কেউ কোথাও নেই। মা কিন্তু দুই হাত যুক্ত ক'রে কাকে বার বার নমস্কার করতে লাগলেন।

কিছুক্ষণ কেটে যাবার পর আমি জিজ্ঞাসা করলুম, বাতিটা কি একটু বাড়িয়ে দেব মা?

মা বললেন, না, ঠিক আছে।

আবার জিজ্ঞাসা করলুম, মা, সন্ন্যেসীকে কি এখনও দেখতে পাচ্ছেন?

মা বললেন, না, তিনি চ'লে গেছেন। কালও অনেক রাত্রে একবার তাঁকে দেখেছিলুম। একেবারে আমার বিছানা ঘেঁষে দাঁড়িয়েছিলেন। আমি নমস্কার করতেই তিনি হেসে চ'লে গেলেন।

সেদিন রাত্রে খেতে খেতে মার কথা ওঠায় পরেশদাকে এই সন্ন্যাসীর কথা বললুম। পরেশদা কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বললে, লক্ষণ ভাল নয়। মা শীগ্‌গীরই চ'লে যাবেন—এ সব হচ্ছে তারই ইঙ্গিত।

আজকের এই বিষণ্ণ শীত-সন্ধ্যায় অতীতের সেই সন্ধ্যাটির কথা ভাবতে ভাবতে আর একটি সন্ধ্যার চিত্র আমার স্মৃতিপটে স্পষ্ট হয়ে উঠছে—এই দিনটির ঠিক দশ বছর পরে শ্রাবণের এক মেঘভরা সন্ধ্যায় তেমনি এক অন্ধকার ঘরে এক রুগীর পাশে বসেছিলুম—রুগী আর কেউ নয়, আমারই ছোট ভাই অস্থির। কয়েকদিন থেকে তার জ্বর চলেছে, কিছুতেই ছাড়ে না। আমার সামনেই মেঝেতে উঁচু গদির ওপরে সে শুয়ে রয়েছে—চোখে আলো লাগে ব'লে ঘরের বাতি নিবিয়ে দিয়ে বারান্দার বাতি জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। দুই ভাইয়ে গল্প হচ্ছে—অস্থির বলছিল, ওই টোব্যাকো মিক্‌চারগুলো আর পাকাতে ভাল লাগে না। টিনটা তুই নিয়ে যা, কাল সকালে আমার জন্যে এক টিন ভাল তৈরী সিগারেট এনে দিস।

এমনিধারা হালকাভাবে এ-কথা সে-কথা চলেছে, এমন সময় কথার মাঝখানে অস্থির ব'লে উঠল, দেখ্‌ স্থবরে, এই বুড়োটাকে চিনিস?

—কে রে ! কে বুড়ো ?

—ওই যে আলমারির পাশে ব'সে রয়েছে।

অস্থিরের শয্যার পাশে প্রায় পায়ের কাছে একটা আলমারি ছিল, আমি সেটার আশেপাশে বেশ ক'রে দেখলুম, কিন্তু কিছুই দেখতে পেলুম না। অস্থির বললে, আজ দু দিন ধ'রে লোকটা দিনরাত ওইখানে ব'সে আছে ভাই। আমি এত চেষ্টা করছি, কিন্তু কিছুতেই চিনতে পারছি না—তুই চিনতে পারলি ?

বললুম, কই ভাই, আমি তো কারুকে দেখতেই পাচ্ছি নে।

—দেখতেই পাচ্ছিস নে—কি আশ্চর্য !

পরের দিনই অপ্রত্যাশিতভাবে অস্থিরের অসুখ সঙ্গিন অবস্থায় দাঁড়াল—ঠিক দু দিন পরে সে চ'লে গেল।

এরা সত্যিই কি সে সময় কারুকে দেখতে পেয়েছিল, না, সবই রোগার্ত মস্তিষ্কের বিকৃত কল্পনা-মাত্র ! কে এ প্রশ্নের জবাব দেবে ?

পরের দিন ডাক্তার এসে বেশ ক'রে পরীক্ষা ক'রে ব'লে গেলেন, রোগিণীর বুকের দু দিকেই সর্দি জমেছে বটে ; কিন্তু দু-একদিনের মধ্যে কিছু হবে ব'লে মনে হয় না। এই ভাবে রোগ বৃদ্ধি পেতে থাকলে সাত-আট দিন পরে মারা যাবার সম্ভাবনা।

পরদিন থেকে মার সেই আচ্ছন্ন ভাবটা খুবই বেড়ে গেল। দিনে রাতে প্রায় সমস্তক্ষণই সেইভাবে প'ড়ে থাকতেন। যতক্ষণ পরেশদা বাড়ি না থাকতেন, ততক্ষণ আমরা তিন জনেই পালা ক'রে তাঁর কাছে থাকতুম। সুকান্ত ও জনার্দন বিকেলে বেড়াতে যেত ব'লে সেই থেকে রাত্রি অবধি আমাকেই রোগিণীর কাছে থাকতে হ'ত।

আজ অতীতের সেই সব ছবি ধীরে ধীরে মানসপটে ফুটে উঠছে। সেই শীতের সন্ধ্যাগুলি—সেই ছোট ঘরে পাছে একতলার ধোঁয়া এসে ঢোকে, তাই জানলাগুলো ভাল ক'রে বন্ধ করা, ঘরের এক কোণে সদ্য-জ্বালা হ্যারিকেনটা রাখা হয়েছে। তার শিখাকে যতদূর সম্ভব নাবিয়ে দেওয়া হয়েছে, তা থেকে আবার যেটুকু আলো বেরুচ্ছে তাও একখানা

বইয়ের ছেঁড়া মলাট দিয়ে আড়াল করা হয়েছে। সামনেই চৌকির ওপর যে রোগিণী নিঃসাড় অবস্থায় প'ড়ে রয়েছে তার জীবন-প্রদীপও ওই দীপশিখারই মত স্তিমিত।

নিস্তব্ধ সন্ধ্যাকালে আমি সেই চৌকিতে ব'সে ব'সে ভাবতে থাকি—আমার স্মৃতিকে নামিয়ে দিতে থাকি বিস্মৃতির গভীরে, জন্ম-জন্মান্তরের পারে। মৃত্যুপথযাত্রী কে এই নারী যাকে আমি আজ মা ব'লে ডাকছি, যাকে সেবা করছি—বিনা দ্বিধায় যিনি আমার সেবা গ্রহণ করছেন। এঁর সঙ্গে কি আমি জন্ম-জন্মান্তরের কোনও সম্বন্ধে বাঁধা আছি, না, সমস্তটাই অকস্মাতের খেলা! অকস্মাতের খেলাও তো সুসম্বদ্ধ নিয়ম মেনে চলে—এমনি সব কল্পনায় সময়টা হু-হু ক'রে কেটে যায়।

এমনি একদিন সন্ধ্যেবেলা মার মুখের দিকে চেয়ে ব'সে আছি, হঠাৎ চোখ চেয়ে তিনি যেন কাকে খুঁজতে লাগলেন। আমি জিজ্ঞাসা করলুম, মা, কিছু বলছেন?

তিনি একখানা হাত তুলতেই আমি হাতখানা ধ'রে আস্তে আস্তে নামিয়ে দিলুম। মা খুব ধীরে ধীরে বললেন, এইখানে ব'স্, আমার খাটে—এই আমার পাশে।

আমি সেই অপরিসর জায়গায় কোনও রকমে কুঁকড়ে বসলুম। মা ধুঁকতে ধুঁকতে বলতে লাগলেন, তোদের হাতের এই সেবাটুকু পাবার জন্যে এতদিন অপেক্ষা করছিলুম—তা না হ'লে অনেক আগেই আমি ম'রে যেতুম। এই মাকে মনে থাকবে বাবা? হঠাৎ এই কথা শুনে আমি অশ্রু রোধ করতে পারলুম না। জিজ্ঞাসা করলুম, তোমার সঙ্গে কি আমার জন্ম-জন্মান্তরের সম্বন্ধ? কি সে সম্বন্ধ, আমায় বল না মা।

একটুখানি সম্মতিসূচক হাসিতে সেই রোগক্লিষ্ট বিবর্ণ মুখখানা উদ্ভাসিত হয়ে উঠল—হতে পারে সে আমার দৃষ্টিবিভ্রম।

সেই রাত্রে আহারাদি সেরে ঘরে আমরা ঘুম দিচ্ছি, বোধ হয় রাত্রি তখন বারোটা—পরেশদা দরজা ধাক্কা দিয়ে আমাদের তুলে বললে, মা মারা গেলেন।

পরেশদাদের বাড়ি থেকে শ্মশান বোধ হয় চার মাইল দূরে, যমুনার ধারে। সেই শীতের রাত্রে আমরা চারজনে মৃতদেহ এই চার মাইল দূরের শ্মশানে নিয়ে গিয়ে দাহ করলুম—আমার জীবনে এই প্রথম শববাহন।

পরের দিন থেকেই পরেশদার মধ্যে একটা অদ্ভুত পরিবর্তন লক্ষ্য করতে লাগলুম। মায়ের মৃত্যুতে তাকে এক ফোঁটা চোখের জল ফেলতে দেখি নি। নীরবে সে আমাদের সঙ্গে শব বহন ক'রে শ্মশানে গেল, মুখাগ্নি ও অন্যান্য কৃত্য যা কিছু ক'রে ফিরে এল। কোনও রকম হা-হুতাশ বা শোকের কোনও প্রকাশ তার মধ্যে দেখতে পেলুম না। আমাদের সঙ্গে কথাবার্তা হাসি আগেও যেমন করত তেমনি করতে লাগল—তবুও যেন মনে হতে লাগল, সে আমাদের কাছ থেকে অনেক দূরে স'রে গিয়েছে। শ্মশান থেকে ফিরে আসবার কিছু পরে আমাদের সেই ব্রাহ্মণী এসে রাঁধবার ব্যবস্থা করতেই সুকান্ত তাকে বললে, আজ আর রান্না ক'রে কাজ নেই, আমরা বাজার থেকে কিছু আনিয়ে খেয়ে নেব 'খন—কি বলেন পরেশদা?

পরেশদা আমাদের তিনজনকেই ওপরে মা যে ঘরে মারা গিয়েছিলেন সেই ঘরে ডেকে নিয়ে গিয়ে বললেন, দেখ ভাই, তোমাদের একটা কথা বলি। আমার মার স্বাস্থ্য কোনদিনই ভাল ছিল না, বিশেষ ক'রে এই শেষ দশ বছর তিনি মুমূর্ষু অবস্থাতেই ছিলেন বললে হয়। কিন্তু এবারকার বন্ধন মোচন হতে দেরি হচ্ছিল কেন জান?

—কেন দাদা?

—তোমাদের জন্যে। তোমরা ছিলে তাঁর পূর্ব পূর্ব জন্মের সন্তান। কেন তা বলতে পারি না, তবে কোন বিশেষ কারণে তোমাদের জন্যই তাঁর এতদিন মৃত্যু হয় নি। তোমরা আসবে, তোমাদের সেবা নিয়ে তবে তাঁর প্রাণ বেরুবে—এই ছিল নির্দিষ্ট বিধান। আমার ইচ্ছা, আমার সঙ্গে তোমরাও তাঁর জন্যে অশৌচ গ্রহণ কর। এতে তাঁর শান্তি হবে।

তারপরে হেসে বললে, ভাই, জানই তো মেয়েদের সংস্কার আমার সঙ্গে তোমরাও যদি তাঁর শ্রাদ্ধ কর, তা হ'লে তিনি হাল্‌কা হবেন—মুক্তি পাবেন।

আমার বেশ মনে আছে, পরেশদা বিশেষ ক'রে ওই 'হাল্‌কা' শব্দটি ব্যবহার করেছিল।

পরেশদার অনুরোধে আমরা তখুনি আমাদের পূর্বজন্মের মায়ের আত্মার তৃপ্তির জন্য অশৌচ ধারণ করলুম। রাঁধুনী ব্রাহ্মণীকে তার প্রাপ্য চুকিয়ে দিয়ে বলা হ'ল, শ্রাদ্ধশান্তি হয়ে যাবার পর সে যেন দেখা করে। তখুনি সবাই বাজারে গিয়ে নতুন ধুতি কেনা হ'ল। পরেশদা আমাদের তিনজনকে তিনখানা গরম ধোশা কিনে দিলে—পরদিন থেকে শ্রাদ্ধের যোগাড়ে মন দেওয়া গেল।

মায়ের সম্পত্তির মধ্যে দু-তিনটে থানধুতি ও একখানা অতিছিন্ন গরম গায়ের কাপড় ছিল। ভিখিরী ডেকে পরেশদা একে একে সেগুলো বিলিয়ে দিলে। কাঠের তৈরী একখানা ডালাভাঙা বাক্স ছিল মায়ের ঘরে—বিয়ের পর বাপের বাড়ি থেকে সেটা এনেছিলেন। সংসার-খরচের পয়সাকড়ি যখন যা পেতেন তাতে রেখে দিতেন। এই বাক্সটা ঝাড়া-মোছা করতে করতে এক জোড়া সোনার মাকড়ি পাওয়া গেল—সেই পুরনো দিনের বাংলা পাঁচের মতন আকৃতি মাকড়ি।

পরেশদা বললে, মায়ের বিয়ের সময় বাপের বাড়ি থেকে দেওয়া এই মাকড়ি। কিন্তু বাবার হাত থেকে এ দুটোকে তিনি রক্ষা করলেন কি ক'রে! নিশ্চয় তাঁর মনে ছিল না।

পরেশদাই হবিষ্যান্ন রেঁধে আমাদের ভাগ ক'রে দিয়ে নিজেও বসতেন। রাত্রিবেলা দুধ আর মিষ্টি খাওয়া হ'ত। প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলা শীতের অন্ধকার বেশ ঘনিয়ে ওঠার পর পরেশদা আমাদের নিয়ে যে ঘরে মা মারা গিয়েছিলেন সেই ঘরে গিয়ে বসতেন। মায়ের শূন্য চৌকিখানার ওপরে একটা রেড়ির তেলের প্রদীপ জ্বলত, আর আমরা সেটার সামনেই পরেশদার চৌকিখানায় বসতুম—পরেশদা মায়ের গল্প

করতে থাকত। পরেশদা বলত, মা আমার চিরদুঃখিনী ছিলেন। আট-ন বছর বয়সে বিয়ে হয়ে যাবার পর ঠাকুরদা মাকে নিয়ে এসেছিলেন। ঠাকুরদার সংসারে কোনও স্ত্রীলোক ছিল না—সেই অল্পবয়সে মা আমার বাংলা দেশ থেকে সুদূর পশ্চিমে এসে সংসারের হাল ধরেছিলেন। ঠাকুরদা যতদিন বেঁচে ছিলেন, ততদিন এক রকম চলেছিল, কিন্তু তিনি মারা যাবার পরই বাবা নিজমূর্তি ধারণ করলেন। দিল্লির যত গুণ্ডা বদমাইস ছিল তাঁর বন্ধু। দিনরাত মদ, ভাং প্রভৃতি নানা রকমের নেশা করতেন—বলতে গেলে কোনও সময়েই তিনি প্রকৃতিস্থ থাকতেন না। শুধু তাই নয়, সংসারের প্রতি তাঁর আদৌ মন ছিল না। কি ক'রে যে সংসার চলে অথবা চলবে, সে বিষয়ে কোনও হুঁশই তাঁর ছিল না। ঠাকুরদার কিছু টাকা ছিল—বাবা তা দু দিনেই ফুঁকে দিলেন। তারপরে তাঁর নজর পড়ল মায়ের গয়নাগুলোর দিকে। সেজন্য প্রতিদিন মারধোর চলত—এক-একদিন মায়ের সঙ্গে সঙ্গে আমার ওপরেও প্রহার চলত। আমরা মায়ে-পোয়ে কতদিন যে অনাহারে ব'সে ব'সে কেঁদে দিন কাটিয়েছি, তা আর কি বলব!

পরেশদা প্রতিদিনই অত্যন্ত দরদ দিয়ে মায়ের কথা বলতে থাকত। মা যে কত সহ্য করতেন, তাঁর যে কত গুণ ছিল, সে কথা বলতে বলতে কখন কখন অশ্রুতে তার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে যেত, আর কথা বলতে পারত না। দুঃখে ও সহানুভূতিতে আমাদের বুকের ভেতরটা মোচড় দিতে থাকত, কোন প্রশ্ন করতে পারতুম না, চুপ ক'রে অশ্রু রোধ করবার চেষ্টা করতুম। এক-একদিন এমনও হয়েছে, আমরা দু পক্ষই চুপ ক'রে ব'সে আছি, ওদিকে সেই ক্ষীণপ্রভ প্রদীপশিখাও নিবে গিয়েছে, অন্ধকারের মধ্যে আমরা চার জন চুপচাপ ব'সে আছি। শেষকালে পরেশদাই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ ক'রে উঠে গিয়ে বাতিটা জ্বালিয়ে দিত।

ক্রমে শ্রাদ্ধের দিন এগিয়ে আসতে লাগল। পরেশদার আপিসের দুই-একটি বন্ধু, তার বাড়িওয়ালা—এরা সব এসে পরামর্শ দিতে লাগল।

সেখানে যে দু-চারজন বাঙালী ছিলেন, পরেশদার সঙ্গে তাঁদের পরিচয় ছিল না। এই সময় তাঁদের শরণাপন্ন হওয়ার কথায় পরেশদা বললে, এখানকার এই বন্ধুরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে যখন তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছে, তখন আমাদের এদের মতেই চলা উচিত। বাঙালীরা এসেই এখন পাঁচশো রকমের ফ্যাকড়া তুলবে, এটা কর, ওটা ক'রো না, এ কি করছ হে! ইত্যাদি—এদের মতের সঙ্গে তাদের মতের মিল হবে না, মাঝে থেকে আমার মাতৃশ্রাদ্ধ পণ্ড হবে। দিল্লিতে দেখেছি কিনা! দুই তরফ রক্ষা করতে গিয়ে অনেক শ্রাদ্ধই সেখানে পণ্ড হয়েছে—দিল্লিতে থাকলে এদের কাছে ঘেঁষতেই দিতুম না।

যা হোক, শেষে ঠিক হ'ল ওই দেশেরই দ্বাদশটি ব্রাহ্মণকে খাওয়ানো হবে এবং এখানকারই ভাল ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতকে দিয়ে শ্রাদ্ধ করানো হবে।

মাতৃশ্রাদ্ধ যতই এগিয়ে আসতে লাগল, পরেশদা ততই ব্যস্ত হয়ে পড়তে লাগল। সে বাইরে গেলেই আমরা তিনজনে পরামর্শ করতে থাকতুম—মায়ের শ্রাদ্ধ হয়ে গেলে এখানে থাকা আর আমাদের সমীচীন হবে কি না! যদি এখান থেকে চ'লেই যেতে হয়, তা হ'লে আমরা আগ্রা থেকেই চ'লে যাব ব'লে স্থির করলুম। দিল্লিতে যাবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু সেখানে আমাদের তিন জনেরই জানাশোনা লোক থাকায় যেতে মন সরছিল না। যদি পরেশদার ওখান থেকে স'রে পড়তেই হয় তো কবে নাগাদ যেতে হতে পারে, তা জানা দরকার। শ্রাদ্ধের ঠিক দিন দুই আগে সন্ধ্যের পর আমরা রোজ যেমন মায়ের ঘরে গিয়ে বসি সেদিনও তেমনি বসেছি। এ-কথা সে-কথা চলেছে, এমন সময় একটু ফাঁক পেতেই আমি পরেশদাকে জিজ্ঞাসা ক'রে ফেললুম, হ্যাঁ দাদা, মায়ের শ্রাদ্ধ হয়ে গেলেই কি আমরা চ'লে যাব?

আমার প্রশ্ন শুনে পরেশদা অনেকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বললে, না, তোমরা চ'লে যাবে কেন? হয়তো আমাকেই চ'লে যেতে হবে।

রহস্যটা আরও গভীর হয়ে উঠল বুঝতে পেরে পরেশদা বললে

ব্যাপারটা তোমাদের খুলে বলাই উচিত—এর আগে এক মা ছাড়া এ কথা আর কেউ জানত না।

পরেশদা বলতে আরম্ভ করলেন, তোমাদের তো আগেই বলেছি আমার বাবা মার ওপরে ভয়ানক অত্যাচার করতেন। একটি পয়সাও তিনি রোজগার করতেন না, অথচ তাঁর নেশা ইত্যাদির জন্য রোজ পয়সা চাই। মার কিছু গয়না ছিল—কিছু বাপের বাড়ি থেকে পেয়েছিলেন আর ঠাকুরদাও অনেক কিছু করিয়ে দিয়েছিলেন। এই গয়নাগুলোর জন্য বাবা প্রায়ই মাকে মারধোর ক'রে একটা একটা নিয়ে যেতেন। মার কান্না আমি সহ্য করতে পারতুম না, আমিও কাঁদতে থাকতুম। মার সঙ্গে কাঁদছি দেখলে আমার ওপরেও বাবার রাগ হ'ত, আর সেই সঙ্গে আমাকেও নির্দ্দম ঠেঙানি দিতেন।

বাবা যখন মারা গেলেন, আমার বয়স তেরো কি চোদ্দ। কয়েক দিন পরেই পাওনাদারেরা এসে আমাদের বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিলে। পাড়ার একজনেরা আমাদের একখানা ঘর ছেড়ে দিলে, বললে, ভাড়া লাগবে না, থাক তোমরা।

সেই সময়ে মা যে কি ক'রে দিন চালাতেন জানি না। মাকে রোজই দেখতুম একলা ব'সে ব'সে কাঁদছেন। আমি ঠিক করলুম, চাকরি করলে মার দুঃখ কিছু ঘুচতে পারে। কিন্তু দিল্লি শহরে কে আমায় চাকরি দেবে! ঠিক করলুম, কলকাতায় গিয়ে লোকের বাড়িতে চাকরি করলেও তো দু পয়সা পাব। মাইনের টাকাটা মাকে পাঠিয়ে দিলে তবু তিনি দু বেলা খেতে পাবেন। পৈতের সময় আমি গোটা তিনেক সোনার আংটি পেয়েছিলুম—সেইগুলো মার বাক্স থেকে চুরি ক'রে এক সোনারকে বেচে গোটা পঁচিশেক টাকা পাওয়া গেল। এই টাকা ভরসা ক'রে একদিন সন্ধ্যাবেলায় কলকাতাযাত্রী এক ট্রেনে বিনা টিকিটে সওয়ার হওয়া গেল।

কিন্তু গাড়ি ছাড়বামাত্র আমার ভয়ানক কান্না পেতে লাগল। এতক্ষণে মা আমার দেখা না পেয়ে কি রকম উতলা হয়েছেন ভেবে

আমার ভয়ানক কষ্ট হতে লাগল। ভেবে-চিন্তে ঠিক করলুম, একটা কোন বড় জায়গায় নেমে মাকে একখানা চিঠি লিখে আবার যাত্রা শুরু করা যাবে।

পরদিন গয়া স্টেশনে নেমে পড়লুম। সেখানে এক পাণ্ডার বাড়িতে উঠে মাকে চিঠি লিখে ডাকবাক্সে ফেলে দিয়ে স্টেশনে যাবার উদ্যোগ করছি, এমন সময় পাণ্ডাজী বললেন, সে হতে পারে না, গয়াতে এসে মৃত বাপের পিণ্ডি না দিলে মহাপাপ হবে।

তার পরে ভাই, সেই মহাপাপ থেকে উদ্ধার পাবার জন্য পঁচিশ টাকা থেকে পাঁচটি টাকা খরচ ক'রে বাপের পিণ্ডি দিলুম—যে বাপ শিশু-বয়স থেকে উঠতে বসতে আমাকে ঠেঙিয়েছে, আমার আত্মীয়-স্বজনহীনা রুগ্না মায়ের ওপর অকথ্য অত্যাচার করছে। স্বামী, পিতা কিংবা পুত্র কোন হিসাবেই যে কখনও কোনও কর্তব্য পালন করে নি তাকে স্বর্গে পাঠাবার ব্যবস্থা ক'রে গয়া থেকে স'রে পড়ব, এমন সময় এক সুবিধা জুটে গেল।

আমি আসবার আগের রাত্রে পাণ্ডাদের বাড়িতে একটি ভদ্রলোক এসেছিলেন। ইনি পাণ্ডাদের পুরানো যজমান, অনেকদিন থেকেই জানাশোনা—বাবা-মার পিণ্ডি দিতে গয়ায় এসেছিলেন। ভদ্রলোক আমার সঙ্গে গায়ে প'ড়ে আলাপ করলেন। কোথায় বাড়ি, কি বৃত্তান্ত ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করায় আমি অকপটে তাঁকে আমার সব কথা ব'লে ফেললুম। আমার কথা শুনে তাঁর দয়া হ'ল। তিনি বললেন, ভাই, তুমি আমার সঙ্গে কলকাতায় চল। সেখানে আমার বাড়িতে তুমি থাকবে, আমি তোমার লেখাপড়ার ব্যবস্থা ক'রে দেব। তোমার মাকেও কিছু ক'রে পাঠাবার বন্দোবস্ত করা যাবে—যদি তাঁর দিক দিয়ে কোন বাধা না থাকে তবে তাঁকেও কলকাতায় নিয়ে আসা যেতে পারে। কি বল ? আমি তখুনি রাজী হয়ে গেলুম। তিনি বললেন, তাঁরা রাজগীরে বেড়াতে এসেছেন। তাঁর স্ত্রী অসুস্থ ছিলেন, এখন ভাল হয়ে উঠেছেন, আর দিন পনেরো বাদেই কলকাতায় ফিরে যাবেন।

আমরা আরও দিন দুই গয়াতে কাটিয়ে পাটনায় এলুম। সেখান থেকে অনেক ঘোরপ্যাচ খেয়ে রাজগীরে পৌঁছলুম। ভদ্রলোকের গিন্নীটি তাঁর চাইতেও ভালমানুষ। আমাকে পেয়ে খুবই খুশি হলেন। তাঁদের সন্তানাদি ছিল না, ভদ্রমহিলা দুঃখ ক'রে বলতে লাগলেন, পরের ছেলে মানুষ করতেই পৃথিবীতে এসেছিলুম—

যাই হোক, রাজগীর জায়গাটি আমার বড় ভাল লাগল। সুন্দর নির্জন জায়গা, কাছে দূরে—যত দূর দেখা যায় পাহাড়ের পর পাহাড়। দুপুরবেলা বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়ে আমি এই সব পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে বেড়াতুম, বড় ভাল লাগত। মার জন্য মন-কেমন করলেও শীগ্‌গীরই আমাদের ভাল একটা কিছু হবে—এই আশায় মনটা খুবই উৎফুল্ল থাকত। এই সব পাহাড়ে মাঝে মাঝে অনেক সন্ন্যাসী, যোগী, ফকির ইত্যাদি দেখতুম। ছেলেবেলা থেকে কেন জানি না ফকির-সন্ন্যাসীদের ওপর আমার প্রবল ভক্তি ছিল। আমার ঠাকুরদার এক সন্ন্যাসী-গুরু ছিলেন, ঠাকুরদার এক ভাই সন্ন্যাসী হয়ে সংসার ত্যাগ করেছিলেন। মার কাছে শুনতুম, ঠাকুরদার এই গুরু মাঝে মাঝে আমাদের বাড়িতে আসতেন—তিনি নাকি অনেক অলৌকিক ক্রিয়া করতেন। ঠাকুরদা মারা যাবার পর তিনি আর আসেন নি। মার কাছে সন্ন্যাসীদের সম্বন্ধে আরও অনেক গল্প শুনে তাঁদের ওপর ভক্তির মাত্রা আমার আরও বেড়ে গিয়েছিল। এই সব পাহাড়ে সন্ন্যাসী-ফকির দেখলেই তাঁদের কাছে গিয়ে বসতুম। কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করতেন, কেউ চুপ ক'রে থাকতেন, কিছুক্ষণ ব'সে ব'সে আমিও উঠে যেতুম। আমি মনে করতুম, এই রকম বসতে বসতেই হয়তো কোনদিন অলৌকিক ক্রিয়া কিছু দেখবার সৌভাগ্য হয়ে যাবে।

একদিন আমার আশ্রয়দাতা ও তাঁর স্ত্রী পাটনায় তাঁদের এক আত্মীয়ের সঙ্গে দেখা করতে চ'লে গেলেন। কথা হ'ল, তাঁরা পাটনায় তিন-চারদিন থেকে ফিরে আসবার দু-তিনদিন পরেই আমরা কলকাতায় যাব। রাজগীরে তাঁদের দুটি চাকর আর আমি রইলুম বাড়িতে পাহারা দেবার জন্যে।

সেদিন বেলা নটা বাজতে না বাজতে আমি বেরিয়ে পড়লুম। আমাদের বাড়ি থেকে অনেক দূরে একটা পাহাড় দেখা যেত। আমি ঠিক করলুম, সেদিন সেই পাহাড়টাতে যাব। এর আগে কয়েক দিন সেটাতে যাবার চেষ্টা করেছি, কিন্তু সন্ধ্যা হয়ে যাবার ভয়ে তাড়াতাড়ি ফিরে আসতে হয়েছে। সেদিন বাড়ি থেকে বেরিয়ে কিছুক্ষণ চলতে না চলতেই আমি বুঝতে পারলুম, কি যেন একটা শক্তি আমার দেহ-মনে সঞ্চারিত হয়েছে। আমি যেন দৌড়ে চলতে লাগলুম সেই পাহাড়টার দিকে। মনে পড়ে, রাস্তায় একবার কি দুবার বিশ্রামের জন্য বসতে হয়েছিল, কিন্তু বেলা একটা বাজবার আগেই আমি পাহাড়টার তলায় গিয়ে উপস্থিত হলুম।

পাহাড়ে অনেক ঘুরে ঘুরে ওপরে উঠতে লাগলুম। এক জায়গায় একটা গুহার মতন দেখে দাঁড়ালুম। সেটার মধ্যে যে কেউ থাকে তা বাইরে থেকে দেখেই বোঝা যায়। আমার যেন মনে হ'ল, ভেতর থেকে একটু একটু ক'রে ধোঁয়া বাইরে বেরিয়ে আসছে। জায়গাটা ভারি সুন্দর। গুহার সামনেই অনেকখানি পরিচ্ছন্ন সমতল জায়গা দেখে সেখানে গিয়ে বসলুম। ঠাণ্ডা বাতাস বইছিল, অতক্ষণ হাঁটা ও পাহাড়ে ওঠার জন্য পরিশ্রান্তও হয়েছিলুম—কিছুক্ষণ ব'সে থেকে হাতে মাথা রেখে সেইখানেই লম্বা হয়ে পড়লুম। শরীর ছিল ক্লান্ত, যেমনি শোয়া অমনি ঘুম।

ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে ভাই স্বপ্ন দেখছিলুম, আমি যেন কলকাতায় গিয়ে ব্যবসা ক'রে অনেক অর্থ উপার্জন করছি—মা সেখানে রয়েছেন, তিনি যেন কাকে কি বলছেন আর হাসছেন। সেদিন স্বপ্নে সেই প্রথম দেখলুম মার মুখে হাসি আর সেই শেষ। বেশ আনন্দে সময়টা কাটছিল, এমন সময় আসরে উদয় হলেন এক সন্ন্যাসী। তাঁর যেমন লম্বা-চওড়া চেহারা, তেমনি লম্বা জট মাথায়, চোখ দিয়ে যেন করুণা ঝ'রে পড়ছে। কিছুক্ষণ সেই দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে থেকে অতি স্নিগ্ধ ও স্নেহার্দ্র স্বরে সন্ন্যাসী বললেন—বেটা পরেশনাথ, আ গয়া তুম!

তখুনি ঘুম ভেঙে গেল। ধড়মড় করে উঠেই দেখি স্বপ্নে দৃষ্ট সেই সন্ন্যাসী সামনে দাঁড়িয়ে আমার দিকে চেয়ে মৃদু মৃদু হাসছেন। প্রথমটা হকচকিয়ে গিয়েছিলুম, সম্বিত ফিরতেই আমি একেবারে ভূমিষ্ঠ হয়ে তাঁকে প্রণাম করলুম।

সন্ন্যাসী আমাকে তুলে তাঁর বুকে জড়িয়ে ধরলেন, তারপরে আমার হাত ধ'রে সেই অন্ধকার গুহার মধ্যে নিয়ে গেলেন। অনেকখানি সরু পথ দিয়ে গিয়ে একটা ঘরের মতন জায়গা—গুহার পক্ষে সেই স্থানটুকুকে বেশ বড়ই বলা যেতে পারে। সূর্যের আলো সেখানে সামান্যই পৌঁছয়। এক কোণে কাঠ জ্বালিয়ে ছোট একটি ধুনি করা হয়েছে। গুহার মধ্যে হ'লেও কিন্তু জায়গাটা ঝুপ্‌সি নয়। সেখানে বেশ হাওয়া বইছিল, কারণ দেখলুম ধুনি থেকে যে ধোঁয়া উঠছে তা বাইরের দিকে উড়ে যাচ্ছে—তবে কোথা দিয়ে যে বাতাস আসছে তা বুঝতে পারলুম না।

এক জায়গায় রোঁয়া-ওঠা একটা চামড়া প'ড়ে ছিল। সন্ন্যাসী সেই আসনে ব'সে আমাকে আদর ক'রে পাশে বসিয়ে বললেন, আমি আশা করেছিলুম, তুমি এর আগেই এখানে এসে উপস্থিত হবে। তুমি গয়াতে এলে, তারপর রাজগীরে এসেছ, তাও জানতে পেরেছিলুম।

আমি মনে মনে ভাবলুম, কে ইনি? কি ক'রেই বা আমার সব খবর জানতে পারলেন।

আমি চুপ ক'রে আছি দেখে সন্ন্যাসী বললেন, বাবা পরেশনাথ, তুমি বোধ হয় আমাকে চিনতে পারছ না?

পরেশদা ব'লে চললেন, তোমাদের আগেই বলেছি যে আমার ঠাকুরদারা দুই ভাই ছিলেন। আমার ঠাকুরদার নাম ছিল নরনাথ বাঁড়ুজ্জে, তাঁর বড় ভাইয়ের নাম ছিল দীননাথ। এই দীননাথ কিশোর বয়সেই গৃহত্যাগ ক'রে সন্ন্যাসী হয়ে চ'লে গিয়েছিলেন। সন্ন্যাসী হবার পর ইনি দুবার বাড়িতে এসেছিলেন। মার মুখে তাঁর চেহারার যে বিবরণ শুনেছিলুম তা অনেকটা এঁর সঙ্গে মেলে। এঁর কথা শুনে

চট ক'রে আমার সেই সন্ন্যাসী ঠাকুরদার কথা মনে প'ড়ে গেল। জিজ্ঞাসা করলুম, আপনি কি আমার দীনুদাদা ?

সন্ন্যাসী অপূর্ব মধুর হাসি হেসে বললেন, নেহি বেটা, ম্যয় তুম্‌হারা দীনদাদা নেহি হুঁ।

সন্ন্যাসী বললেন, আমি তোমার পূর্বজন্মের গুরু—ভাল ক'রে মনে করবার চেষ্টা কর।

পরেশদা আমাদের বলতে লাগলেন, একবার ভেবে দেখ আমার অবস্থা ! সেই বিদেশে, অপরিচিত জায়গায়, চারিদিকে পাহাড় আর পাহাড়, তারই এক গুহায় সন্ন্যাসীর সামনে ব'সে আছি, বয়স চোদ্দ কি পনেরো। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, আমার কিছুই ভয় হচ্ছিল না, বরং মনে হতে লাগল—এখানে আমার কোন অনিষ্ট হবে না, আমি যেন অতি আপনার লোকের কাছে রয়েছি।

সন্ন্যাসী আবার ধীর মধুর হেসে বললেন, বেটা, মনে করবার চেষ্টা কর।

আমি যতদূর সম্ভব মনকে একাগ্র করবার চেষ্টা করতে লাগলুম, কিন্তু কিছুই মনে পড়ল না। সন্ন্যাসী আবার জিজ্ঞাসা করলেন, কিছু মনে পড়ছে ?

বললুম, কই, না, কিছুই তো মনে করতে পারছি না।

তখন তিনি আমাকে আরও কাছে এসে বসতে বললেন। আমি ঘেঁষে ঘেঁষে তাঁর কাছে এগিয়ে গেলুম। তিনি বললেন, চোখ বন্ধ কর।

চোখ বন্ধ করতেই তিনি তাঁর প্রকাণ্ড একখানা হাত দিয়ে আমার চোখ দুটো কিছুক্ষণের জন্য ঢেকে রেখে হাত তুলে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, এবার কিছু দেখতে পাচ্ছ ?

পাচ্ছি প্রভু।

রুদ্ধ নিশ্বাসে আমরা তিনজনেই ব'লে উঠলুম, কি দেখলে !!!

[ক্রমশ]

"মহাস্থবির"

পাগ্‌লা-গারদের কবিতা

(পাগ্‌লা-গারদে অবস্থানোচিত অবস্থায় এবং বদ্ধ পাগল অবস্থায় রচিত

চৈতী হাওয়া বইবে ভেবে কাঁদিস নে রে ফাগুন।
যা এনেছিস সাথে সাথে
বিলিয়ে যা তুই আপন হাতে,
বনের মনে, মনের বনে জ্বালিয়ে দে রে আগুন।
মাঘের সাথে পালিয়ে গেল শীতের কুজ্‌ঝটিকা
বসন্ত তুই আনলি সাথে, আমরা নিলেম টিকা।
ঋতুরাজের তুই যে আধা,
তুই কেন ভাই মানবি বাধা ?
খামখেয়ালীর নিশান ওড়া, যতই যিনি রাগুন।
কালের গতি উল্‌টো দেখে হ'স নে রে উদাসী—
শ্যামের হাতে ধনুক এবং রামের হাতে বাঁশি।
পৌষে খাওয়া হয় নি পিঠে,
স্মরণখানি তবুও মিঠে
এই কথাটি স্মরণ রেখে যাহার খুশি ভাগুন॥

বাঘের স্বপ্ন

লোহার খাঁচায় ব'সে চিড়িয়াখানায় শ্রান্ত চোখে
সোনার স্বপন দেখে বাঘ।
হলদে গায়েতে তার কালো কালো দাগ।
খাঁচার বন্ধনে বাঁধা হাওয়া,
মাপা মাপা মরা মাংস খাওয়া,
দর্শনার্থী মানুষের নিত্য আসা-যাওয়া
চিত্তে তার আনে ব্যর্থ রাগ।

চক্ষে আর বক্ষে তার থেকে থেকে জাগে শুধু
অরণ্যের ধূ-ধূ,
মনে পড়ে কত ষাঁড়, গরু, ভেড়', হারিণ-হরিণী,
কত ঝরনা, খাল, ডোবা', পুষ্করিণী,
কত ভোর, দ্বিপ্রহর, অপরাহ্ণ, সন্ধ্যা ও যামিনী—
দুঃখের বাড়ায় শুধু ভাগ;
সেই দুঃখ বক্ষে চেপে চিড়িয়াখানায় শ্রান্ত চোখে
বনের স্বপন দেখে বাঘ।

কল্পনার দৃষ্টি তার চলে দূর অরণ্যের পানে।
ভাবে সে "আমার প্রিয়া, হায়, সে কি জানে
আমি হেথা বন্দী এই মানুষের লোহার খাঁচায়,
মেলে না মেলে না যেথা পরান যা চায়?
হায়, তারে বলেছিনু 'হে কল্যাণি!
তুমি মোর একমাত্র হৃদয়ের একমাত্র রাণী।
তুমি বিনা অন্য কোনো বাঘিনীর ঠাঁই
আমার অন্তরে নাই নাই।'
সে মোরে কহে নি কিছু,
হেসেছিল মৃদু মৃদু নত নেত্রে মাথা করি নিচু।
সেই শেষ দেখা, আর সেই শেষ কথা। তার পর
বন্দী হয়ে এনু হেথা, এই খাঁচা হ'ল মোর ঘর।
মোরে না ফিরিতে দেখে হয়তো ব্যাকুলা ব্যাঘ্র-বালা
অন্য কোনো বাঘের গলায় দিয়া ফেলিয়াছে মালা
ভাসিয়া সপ্রেম অশ্রু-নীরে।
কি লাভ এখন মোর জঙ্গলেতে ফিরে?
সে-হারা জঙ্গল হতে চিড়িয়াখানার খাঁচা ভালো।..."
আনমনে ভাবে বাঘ, সোনালী গায়েতে তার ডোরা
কালো কালো॥

চিলের বলাকা

পাখা দিয়ে আকাশেরে সুড়্‌সুড়ি দিয়ে
সারি সারি চিল উড়ে যায়।
যত দূরে যায়,
যত বেগে চালায় পাখা স,
আকাশ এড়াতে গিয়ে রয় সে আকাশে।
নীল আকাশের নীচে নীল নীল জল
হাওয়ায় হাওয়ায় ছলছল,
মাঠের সবুজ ঘাস, সবুজ ঘাসের মাঠ গোধূলির রঙে ঝলমল।
চিলের সচল ছায়া নেমে নেমে নেমে নেমে আসে—
মাঝপথে বেমালুম মিলায় বাতাসে।
সুর দিয়ে আকাশেরে সুড়্‌সুড়ি দিয়ে
সারি সারি চিল গায় গান।
যত ছাড়ে তান
পাখার ঝাপ্‌টা দিয়ে তাল ঠুকে ঠুকে,
আকাশ পেরোতে গিয়ে তবু গান জেগে রয় আকাশেরি বুকে।
নীল আকাশের নীচে কত কারখানা থেকে কত কালো ধোঁয়া
উঠে এসে নিতে চায় আকাশের ছোঁয়া;
কত বিরহিণী, আহা, নিরালায় কাঁদে,
আনমনে এলো চুল ভুল ক'রে বাঁধে;
তানপুরা হাতে ল'য়ে হেঁড়ে গলা সাধে
কত কালোয়াৎ,
চোখ বুজে মনে মনে কত যে আসর করে মাত।
বেতার-ভবন হতে কিছু কিছু সুর আর অনেক বেসুর
উঠে গিয়ে কিছু দূর
চিলের গানের সাথে হেসে করে দেখা—
চিলের গানেরা তবু অন্য পথে বেঁকে বেঁকে চ'লে যায় একা।

আমার নীরব চোখ আকাশের চিল দেখে
খোলা ছাতে বসে নিরালায়
আমার মনের চিল আকাশের চিল হয়ে
বলাকার সাথে উড়ে যায় ॥

বিধাতার প্রতি

হে বিধাতা, এ কি সত্য ?
আপনার তরে আনমনে তুমি
আপনি রচেছ গর্ত ?
এ কি সত্য ?
আপন বিধানে আপনি বন্দী,
তার সাথে কোনো চলে না সন্ধি,
পরের ললাটে কলম চালাতে
তাই তুমি চির মত্ত ?
এ কি সত্য ?
নিজ ললাটের লেখা মুছিবার
সাধ্য তোমার নাই হে,
অ-মোছ্য লিপি পর-ভালে লেখা
সাধ কি তোমার তাই হে ?
বিধাতা, প্রাণের ভাই হে !
বহু-তালি-মারা তোমার কন্থা
তাই দিয়ে ঢাকো গোপন পন্থা,
নিয়তির সাথে পিরীতি করিয়া
তুমি নাকি বাগ্‌দত্ত ?
এ কি সত্য ?
পথে ঘাটে আর অলিতে গলিতে
জ্যোতিষী ছোট ও মস্ত
ব্যস্ত তোমার লিখন বলিতে
দেখে দেখে শুধু হস্ত ।

বানায় ইহারা ঠিকুজী কোষ্ঠী
দিনে দিনে বাড়ে ভক্তগোষ্ঠী,
একদিন নাকি জেনে নেবে এরা
তোমার সকল তথ্য !
এ কি সত্য ?

খোলাখুলি

বিড়ি-সিগারেট-তামাক-চুরুট সবি হয়ে যায় ধোঁয়া
জানি, হে বন্ধু, জানি,
(তবু) ট্যাঁকে কুলাইলে বিড়ি টানি নাকো, দামী সিগারেটই টানি
অর্থ হতেই অনর্থ আসে জানি এ তথ্য ভাই
(তবু) পকেট ছাপায়ে অর্থ এলেও কোনও আপত্তি নাই।

* * *

সুখের চাইতে দুঃখ মহত্তর
সুখের বদলে দুঃখ পাইলে হয় নাকি শাপে বর,
হেন উপদেশ শুনিতে সরেশ এ কথা সত্য মানি
কিন্তু, বন্ধু, আমায় বরং বরে শাপ দিও আনি।

* * *

(শুনি) প্রাসাদে যখন রাত জাগে ধনী অনিদ্রা-জর্জর
কুটিরে তখন দীনের নাসিকা ঘন ডাকে ঘর্ঘর ;
অট্টালিকায় শুধু অশান্তি,
সদা উদ্বেগ সদাই শ্রান্তি,
দীনের কুটির শান্তির নীড় প্রশান্ত-অন্তর।
তবু বিধি, মোরে প্রাসাদের ধনী করিও ভাগ্য-যোগে,
না হয় ভুগিব দামী শয্যায় নিদ্রাহীনতা-রোগে॥

পলায়ন

হায় রে, কাঁটাল যদি না থাকিত ভবে
পরের মাথায় লোকে কি ভাঙিত তবে ?

দানা-ই সর্বস্ব যার, হায় গো বেদানা,
তবু সে 'বে-দানা' কেন নাহি মোর জানা।

* * *

হে বেল, বাহিরে তুমি সদা শক্ত থাকো।
কাকের কি আসে যায় যদি তুমি পাকো?
আসিতে তোমার তলে ছ্যাড়া সাবধান।
ধনপতি ভনে আর শোনে বুদ্ধিমান।

* * *

আম পড়ে, জাম পড়ে, পড়ে নারিকেল,
আতা, নোনা, নাশপাতি, কলা আর বেল;
কাঁটাল, কমলা, লিচু ডালিম, পেয়ারা,
সব কিছু ভুঁয়ে পড়ে হ'লে বোঁটা-ছাড়া।
কিন্তু হায় শেষকালে বিধিলিপি মতে
আপেল হইল খ্যাত বিজ্ঞান-জগতে।
কেমনে, কহিব তাহা, শুন দিয়া মন।
ইংরাজ বিজ্ঞানী এক, নামে নিউটন,
আপেল-বৃক্ষের তলে বসিয়া বসিয়া
কি যেন ভাবিতেছিল রসিয়া কষিয়া।
বৃন্ত এক টুটে গেল, আর তারি ফলে
সহসা আপেল এক পড়িল ভূতলে।
নিউটন চমকিয়া ভাবিল "তাই তো!
এ রহস্য-সমাধান করাই চাই তো!
আপেল ছিঁড়িয়া বোঁটা এল নিম্নপানে।
এল, কিন্তু কেন এল? কিবা এর মানে?"
নিউটন চলিয়া গেল ভাবিতে ভাবিতে।
অন্য ব্যক্তি ছিল সেথা, সে প্রফুল্ল চিত্তে
সুপক্ক আপেলটিরে করিল ভক্ষণ।

নিউটন আবিষ্কল মাধ্য-আকর্ষণ।
ধন্য ধন্য পড়ে চারিদিকে সেই হতে
আপেল বিখ্যাত হ'ল বিজ্ঞান-জগতে।

* * *

নর-বানরের সমান প্রিয় হে
কদলী, ওরফে কলা,
তব গুণ-কথা আমার কলমে
কত আর যাবে বলা?
করা যায় অনুমান
অশোক-কানন-পথে যে তোমারে
খেয়েছিল হনুমান।
তুমি না থাকিলে পরে
তোমার খোসাটি ফুটপাথে লোকে
ফেলিত কেমন ক'রে?
তুমি তো মোদের আহার্য শুধু নহ।
নৃত্যে, গীতে ও চিত্র-শিল্পে
স্ব-নামে জাগিয়া রহ।
এক চাঁদে তুমি থাকো ষোলোবার,
দুইটি পক্ষে কম্‌তি ও বাড়,
তোমার পাতায় ভাত খেয়ে করি
লক্ষ্মী অচঞ্চলা।
পাকা-রূপে তুমি সোনার বরণ
কদলী, ওরফে কলা॥

টাক-মনস্তত্ত্ব

অসংখ্য টাকের তলে কেঁদে মরে একটি কামনা
"আয় চুল আয়।"

চুল তবু ফেরে না মাথায়।
টাকেরে বিদায় দিতে কত টাকা নেয় যে বিদায়,
টাক তবু টিকে থাকে, মাথা ছেড়ে যেতে নাহি চায়।
কাগজে কাগজে শত বিজ্ঞাপনে বাজে এক সুর
"এ তৈল মাখিলে পরে টাক হবে দূর।
অব্যর্থ টাকঘ্ন এ যে, বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠ অবদান।"
পড়িয়া এ বিজ্ঞাপন বহু টেকো-চিত্ত কম্পমান
সীমাহীন হর্ষ-ভরে। কিন্তু হায়, অব্যর্থ দাওয়াই
বারে বারে ব্যর্থ হয়, টাক নাহি ছাড়ে নিজ ঠাঁই।
মাঝে মাঝে মুহূর্তেক তরে
সুবুদ্ধি কাঁদিয়া কহে অর্ধস্ফুট স্বরে
"টাকের ওষুধ নহে, এ যে হায় টাকের পালিশ।
যত ইহা করিবে মালিশ
তত টাক হবে চক্‌চকে।"
তবুও টেকোরা হায় শেখে না শেখে না ঠ'কে ঠ'কে,
পড়ে তবু বিজ্ঞাপনী ফাঁদ হতে ফাঁদান্তরে,
ফাঁদান্তর হতে ফের ফাঁদে—
প্রতিটি টাকের তলে একটি মগজ ঠাসা
আরোগ্যবিহীন আশাবাদে॥

সবজান্তা

(আমায়) নতুন ক'রে কি শেখাবি?
সবি আমার জানা;
(আমি) অনেক কথাই কইতে পারি,
কইতে শুধু মানা।
তোদের পুথি তোদের পাঁজি
দেখতে আমি নইকো রাজী

মিথ্যে হবে তোদের ছবি
আমার কাছে আনা—
আমায় তোরা যা দেখাবি
সবি আমার জানা।
আমার কাছে সিদ্ধ যেটা
তোদের সাধ্য সে কি ?
(তোরা) চোখ চেয়ে যা দেখতে নারিস
চোখ বুজে তা দেখি।
তাই তো সকল শঙ্কা ঝেড়ে
চলতে পারি ডঙ্কা মেরে,
পথ এসে মোর পায়ের কাছে
আপনি যে দেয় হানা—
আমার সঙ্গে চালাকি নয়,
সবি আমার জানা।

হায় রে পাগল, বিশ্ব-ভূগোল
নিঃস্ব হয়ে শিখে
আমার 'আমি' ছড়িয়ে গেছে
সকল দিকে দিকে
এখন তারে যতই ডাকি
বারে বারেই দেয় সে ফাঁকি,
কোথায় গেলে পাত্তা মেলে
দেয় না সে ঠিকানা—
আমায় তোরা কি শেখাবি ?
সবি আমার জানা॥

শ্রীঅজিতকৃষ্ণ বসু

আকাশবাণী

আমি ম্যালথসবিশ্বাসী। আমার বন্ধু নরেনের চেয়েও বেশি। আমি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের প্রেরণায় নানা দুর্ভিক্ষপ্রপীড়িত ও বন্যাবিধ্বস্ত অঞ্চলে সেবাকার্য ক'রে প্রকৃতির এই সব প্রজননপ্রতিষেধের ভয়াবহ রূপ প্রত্যক্ষ করেছি। কলেজ ছেড়ে চাকরি পাওয়ারও পরে আমি আমার বিশ্বাস বিসর্জন দিই নি। কন্যাদায়গ্রস্ত পিতাদের সঙ্গে ক্ষীয়মাণ খাদ্যোৎপাদন ও বর্ধমান জনোৎপাদনের অবশ্যম্ভাবী ফলাফল নিয়ে তর্ক করেছি, তর্কে ক্লান্ত হ'লে অসৌজন্য সত্ত্বেও ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেছি। বিবাহে সম্মতি দিই নি।

বেরিয়ে গিয়ে নরেনের বাড়ি গিয়েছি। সেখানে সঙ্গেরও অভাব ছিল না, আতিথ্যেরও না। বেন্টিংক স্ট্রীটে অবাঙালীবেষ্টিত নিরালা সেই চারতলার ঘরটিতে নরেন আর আমি স্ত্রীভূমিকাবর্জিত একটি আলাদা বিশ্ব রচনা করেছিলুম। চায়ের আয়োজন ছিল, বেতের ঝুড়িতে ডিম ছিল, ছোট আলমারিতে রুটি ছিল। তার উপর ঘরে ঘড়ির বালাই ছিল না। অতএব, নরেনের নীড়ে আমার প্রবেশ যেমন অবাধ ছিল, অবস্থিতিও তেমনি দীর্ঘ ছিল। একবার গল্প শুরু হ'লে কখন শেষ হ'ত তার ঠিক ছিল না।

নরেনের ঘরে অন্যতর আকর্ষণ ছিল তার রেডিওটি। আমাদের আলাপ বেতারের অনুষ্ঠানে কখনও ব্যাহত হ'ত না। গীতশ্রীরা গান গেয়ে যেতেন, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নানা অধ্যাপক সরল বিষয়কে জটিল ক'রে তুলতেন, অর্থমন্ত্রী বাংলার তরুণদের উদ্দেশে বাণী দিয়ে যেতেন, বেতার-নাটকে যাত্রার অভিনেতারা তারস্বরে চিৎকার করতেন। আমরা কর্ণপাতও করতুম না, কদাচিৎ খুব ভাল কিছু না হ'লে—যেমন নিরঞ্জন মজুমদারের বক্তৃতা বা কণিকা মুখোপাধ্যায়ের রবীন্দ্রসঙ্গীত।

তবু রেডিওটা খোলা থাকত সর্বক্ষণ। ওটার শব্দ যেন সিনেমার মৃদু আবহসঙ্গীত। কথার বা কাজের বাধা নয়, বরং সহায়ক। গতের পিছনে যেন মিড়।

কথা বলতে বলতে অনেক রাত হয়ে গেলে নরেন বলত, আজ বরং এইখানেই থেকে যাও। কাল ভোরে চা খেয়ে চ'লে যাবে।

আমি বলতুম, না। তা হ'লে অফিস যেতে বড় দেরি হয়ে যায়। চলি এখন।

বিদায় নিতে আমার ভাল লাগত না, বিদায় দিতে নরেনের। আমি ছাড়া নরেনের সঙ্গী ছিল না, নরেন ছাড়া আমার। আমি ঘর থেকে বেরুলেই নরেন রেডিওটা একটু জোরে ক'রে দিত, নিঃশব্দ নিঃসঙ্গতা নিরসন করবার করুণ প্রয়াসে।

আর আমি? আমি বিষণ্ণ মনে ক্লান্ত চরণে আমার কলেজ স্ট্রীটের মেসে ফিরতুম। পথ চলতে চলতে পথের দু ধারের দেয়ালগুলির মধ্যে আর ছাদগুলির তলায় কি কি ঘটেছে তা মনে মনে কল্পনা করতুম। ক-কে দেখতুম খ-এর বাহুতে; আত্মহারা, বিশ্ববিস্মৃত। ঈর্ষিত হবার পূর্বেই আসন্ন গ-এর চিন্তায় আতঙ্কিত হয়ে উঠতুম। আবার ম্যালথসের বিভীষিকা চোখের সামনে ভেসে উঠত। বিবাহবিরোধী সংকল্প তৎক্ষণাৎ দৃঢ়তর হয়ে উঠত।

যার যা খুশি করুক। আমি ওই পাপের ভাগী হব না। আগামী দুর্ভিক্ষে আর যারই দায়িত্ব থাক্‌, আমি নির্দোষ। আমার বিবেক একেবারে পরিষ্কার।

কিন্তু বিবেকই তো মানুষের সবটা নয়। বিপদ সেই বৃহৎ বাকিটা নিয়ে।

আর এইখানেই কলকাতার নাগরিক দৈন্যটা সবচেয়ে প্রকট। ভদ্র অকৃতদারের অবসরযাপনের সুযোগ এই শহরে এত অল্প যে প্রায় নিরুপায় হয়েই প্রায় সবাইকে বিয়ে করতে হয়। স্থায়ী আর্ট-গ্যালারি নেই, যেখানে অফিস থেকে বেরিয়ে অফুরন্ত সুন্দরের ঝরনায় প্রতিদিন অবগাহন ক'রে মানুষের কর্মক্লান্ত আত্মা পুনর্জীবন লাভ করতে পারে। এমন একটা সুন্দর প্রমোদোদ্যান নেই, যেখানে অলস চরণে ভ্রমণ করলেই মানুষের সৌন্দর্যতৃষ্ণা তৃপ্ত হতে পারে। মধ্যবিত্তের জন্যে এমন কোন

অত্মুর্লভ নাইটক্লাব নেই, যেখানে রুচি ও পুরো মাসের মাইনে না বিকিয়েও সন্ধ্যাটা কাটানো সম্ভব।

কলকাতাকে অভিশাপ দিতে দিতে আমার মেসের ঘরে ফিরে এসে আরও নিঃসঙ্গ বোধ হ'ত। নরেনের তবু একটা রেডিও আছে। মধুর হোক, কর্কশ হোক, ঘরে একটু শব্দ হয়। একেবারে একা মনে হয় না নিজেকে। কিন্তু আমার অবস্থা আরও শোচনীয়। এখানে আমার কথা শুনতে হ'লে আমার নিজেকে কথা বলতে হয়। মাঝে মাঝে বলিও। পরক্ষণেই মনে হয়, নিজের সঙ্গে কথা কয় তো শুধু পাগলে। আমি কি তা হ'লে পাগল হয়ে গেছি?

সেদিন রাত্রে কিছুতেই ঘুম আসছিল না। দু প্যাকেট সিগারেট ধ্বংস ক'রে নিঃসঙ্গতার যন্ত্রণা আর যখন সহ্য করতে পারলুম না তখন ঠিক ক'রে ফেললুম যে, নরেনের অনুরোধ আর উপেক্ষা করব না। কালই ওকে গিয়ে বলব যে, আমি মেস থেকে উঠে ওরই ঘরে থাকব ব'লে স্থির করেছি। জানতুম যে নরেন খুশি হবে। সে আমারই মত একা। আমারই মত সঙ্গভিক্ষু, কিন্তু বিবাহবিরোধী। আমার নরেনকে প্রয়োজন, নরেনের আমাকে।

ভারতবর্ষ লোকাধিক্যের চাপে অনাহারে ম'রে যাক, এমন কোন ব্যবস্থা না করুক যাতে মানুষ বিবাহিত না হয়েও ভদ্রভাবে স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে পারে, যাতে সুস্থ ক্ষুধার শোভন উদ্‌বায়ন সম্ভব হতে পারে। কিন্তু আমি আর নরেন আমাদের বিশ্বাস শিথিল হতে দেব না। আমাদের ব্যবস্থা আমরাই করব। আমরা পরস্পরকে সঙ্গ দেব। বাংলা দেশের বিবাহব্যাপ্ত মরুভূমির মধ্যে আমাদের বন্ধুত্বের মরূদ্যান সদাসবুজ থাকবে। কালই নরেনকে বলব।

পরদিন গিয়ে দেখলুম, নরেন বাড়ি নেই। পর পর তিন দিন। কিছু বুঝতে পারলুম না। কোন সন্ধ্যায় নরেনের বাড়ি গিয়ে তাকে না পাওয়া প্রায় অভাবনীয় ব্যাপার ছিল। কেননা সে কোথাও যেত

না, আমারই মত। আমারই মত বন্ধুত্বটা সে বহুজনের উপর ছড়িয়ে দিতে পারত না। আমরা হয় একা থাকতুম, নয় তো একসঙ্গে। কি হ'ল তা হ'লে নরেনের? যাই হোক, পঞ্চম দিন আমি আমার কার্ড রেখে এলুম নরেনের দরজায়। অন্তত জানবে যে আমি এসেছিলুম।

নিঃসঙ্গ আমি আমাকে নিয়ে যেতুম এখানে ওখানে। সব ইংরেজী ছবিগুলি দেখা হয়ে গেলে হিন্দী ছবি পর্যন্ত দেখতে যেতুম। নিঃসঙ্গতার সমুদ্রে যে কোন তৃণখণ্ড আঁকড়ে না ধ'রে আমার উপায় ছিল না। অতৃপ্ত সঙ্গক্ষুধার তাড়নায় আমি রাস্তায় দাঁড়িয়ে দোকানের রেডিও পর্যন্ত শুনেছি।

আমার কার্ড রেখে আসবার পরেও বেশ কয়েক দিন নরেশের কোনও খবর পাই নি। জানতুম যে সে আমার কার্ড পেয়েছে, কেননা পরে একদিন গিয়ে দেখেছিলুম কার্ডটা সেখানে ছিল না। নরেন তবু খবর দেয় নি, দেখা করে নি ব'লে অভিমানও হয়ে থাকবে বা। আমিও আর যাই নি।

শেষে নরেন এসে একদিন উপস্থিত আমার অফিসে। প্রায় তখন পাঁচটা বাজে। আমিও বেরুতে যাচ্ছিলুম। আমি যে রোজই নরেনকে আশা করতুম, সে কথা গোপন ক'রে সাধ্যমত নির্লিপ্ত স্বরে বললুম, কি খবর? আমাকে মনে আছে তা হ'লে!

নরেনের মুখ দেখে আমার এই মৃদু তিরস্কারও আমার নিজেরই কাছে অত্যন্ত নিষ্ঠুর মনে হ'ল। বেচারীর সংকোচের সীমা ছিল না। কিন্তু শুধু সংকোচ নয়। আরও কি যেন বৃহৎ পরিবর্তন হয়েছে আমার বন্ধু নরেনের। নরেন সেই পরিবর্তন যথাসম্ভব লুকোবার চেষ্টা ক'রে বললে, ক'দিন আসতে পারি নি। এ-এ বাড়ি ফিরতেও একটু দেরি হয়েছে। তা—

নরেন আমার এমন বন্ধু যে তার উপর আমি বেশিক্ষণ অভিমান ক'রে থাকতে পারি নে। তার উপর ওকে এমন লজ্জিত ও বিব্রত দেখে ওর প্রতি আমার স্নেহ ও মায়া আরও শতগুণ বর্ধিত

হ'ল। হেসে বললুম, তা কি হয়েছে? রোজই যে আমার সঙ্গে দেখা করতে হবে এমন কি কথা আছে? আরও একটু সান্ত্বনা দেবার জন্যে যোগ করলুম, আমার যদি কাজ থাকে সন্ধ্যাবেলা, তা হ'লে আমিই কি তোমার সঙ্গে দেখা করতে যেতে পারি? বললুম, কিন্তু জানতুম যে সন্ধ্যাবেলা আমার নরেনের সঙ্গে দেখা করার চাইতে কোনও কাজ কখনও বেশি জরুরী মনে হয় নি।

নরেনের কাছেও কাজের উল্লেখটা ভাল লাগল না। এই মিথ্যার আড়ালে সে আশ্রয় নিতে চাইল না। বললে, না, কাজ নয় ঠিক, তবে—। নরেন আর বলতে পারল না।

আমাদের মধ্যে কখনও কিছু লুকনো ছিল না এত দিন পর্যন্ত। কিন্তু আজ যখন দেখলুম, এমন কিছু আছে যা নরেন আমাকে বলতে নারাজ, তখন আহত হ'লেও তা নিয়ে বিবাদ করবার ইচ্ছা আমার ছিল না। কথা এড়াবার সুযোগ দেবার জন্যেই বললুম, চল, আমার সঙ্গে চা খাবে।

আমরা দুজনে এত দিন এত কথা বলেছি। কিন্তু কথা কোন-দিন ফুরোয় নি। কোনদিন মনে হয় নি, এবারে কি নিয়ে আলোচনা করব? বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের এমন কোনও বিষয় ছিল না যা নিয়ে আমরা তর্ক করতুম না। যুদ্ধ হ'লে বা কোথাও ভূমিকম্প হ'লে তখনই দুজনে সমস্বরে প্রায় তৃপ্তির সঙ্গে বলতুম, আবার প্রকৃতি দেবী লোক-ছাঁটাইয়ের কাজে লেগেছেন। পরিচিত কারও বিয়ের খবর পেলে দুজনে মিলে তাকে অভিশাপ দিতুম। রাস্তায় প্রসূতিসদনের একতলা বাড়ি দোতলা হ'লে ইচ্ছা হ'ত, রাত্রে ও-বাড়িতে গিয়ে আগুন লাগাতে।

কিন্তু সেদিন অফিস থেকে বেরিয়ে আমাদের দুজনের সব কথা কোথায় যেন হারিয়ে গেল। নরেন কি ভাবছিল সেই জানে। আমি এমন কিছু ভেবে পাচ্ছিলুম না যা বললে নরেন আরও বিব্রত হ'ত না। নিঃশব্দে, প্রায় পরস্পরের দৃষ্টি এড়িয়ে, আমরা একটা চায়ের দোকানে গিয়ে বসলুম। রাস্তায় চলতে চলতে তবু কথা না বলবার

কটু অজুহাত ছিল। এখন দুজনে মুখোমুখি ব'সেও যখন মুখে কথা
গাগাল না, তখন অস্বস্তির আর সীমা রইল না।

আমাকেই শুরু করতে হ'ল, আচ্ছা, বাংলা দেশের শেষ সেন্সাস
য়ে তুমি যে প্রবন্ধটা আরম্ভ করেছিলে, ওটা শেষ হয়েছে?

এমন নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নেও যে নরেন বিব্রত হবে, ভাবতে পারি নি।
তস্তত করতে করতে বললে, না। এই, এই—ওটা আর শেষ ক'রে
ঠতে পারি নি। বল তো, তোমাকে রিপোর্টটা দিয়ে দিই।
মি বরং—

বুঝতে বাকি রইল না যে, নরেনের ও-প্রবন্ধ লিখতে আর ইচ্ছা
ই। অনুমান করলুম যে প্রশ্নটা সত্যি যতটা নৈর্ব্যক্তিক মনে
রেছিলাম ততটা নৈর্ব্যক্তিক ছিল না। আমি আবার চুপ ক'রে
ইলুম। খণ্ড আলাপটাকে বার বার বাজে কথার লাঠির উপর ভর
রিয়ে চালাতে আর ভাল লাগছিল না।

কিছুক্ষণ পরে নরেন বললে, তারপর তোমার আর খবর কি? কি
রলে সন্ধ্যায় এই কদিন?

বিশেষ কিছু নয়। তোমার খোঁজে গেছি। না পেয়ে পথে পথে
কা একা ঘুরেছি। কি জান, রেডিও শোনাটা প্রায় অভ্যাসে দাঁড়িয়ে
গছে। তাই কোন দোকানের সামনে দাঁড়িয়েও মাঝে মাঝে—

নরেন আমাকে থামিয়ে দিয়ে বললে, ও, হ্যাঁ। আমিই বলতে
াচ্ছিলুম কথাটা। আমি বলি কি, রেডিওটা বরং তুমি নিয়ে নাও।
ামার আর ভাল লাগে না ওটা শুনতে। মানে—

রেডিওটা আমায় দিলে সত্যি দুঃখিত হতাম না। কিন্তু বন্ধুর
াছ থেকে অমন উপহার নিতে আমার দ্বিধা ছিল। বললুম, সে কি
থা? তোমার রেডিও আমি কেন নিতে যাব? সন্ধ্যায় না হোক,
রে বাড়ি ফিরে তুমি শোন নিশ্চয়ই। চলন্ত রেডিও ছাড়া তোমার
র যে বোবা মনে হবে!

নরেনের সঙ্কোচ তখনও কাটে নি। তবু বললে, না ভাই, ফিরে

এসেও আর শুনি না। তখন ওই গোলমাল আর ভাল লাগে না রেডিওটা তুমিই নিয়ে নাও।

আমি তবু আপত্তি জানিয়ে বললুম, তা হোক। কিছুদিন পরে আবার তোমার ওটার দরকার হতে পারে। রেডিও অত নাড়াচাড়া করতে নেই। খারাপ হয়ে যেতে পারে।

লক্ষ্য করছিলুম যে নরেন একটু পরে-পরেই তার ঘড়ি দেখছিল। যেন এখনই উঠতে হবে। নির্দিষ্ট সময়ে কোথাও যেন উপস্থিত থাকতে হবে। নরেন আমার কথার উত্তরে বললে, সে ভাবনা তোমায় ভাবতে হবে না। রেডিও আর আমার দরকার হবে না। কাল তুমি ওটাকে তোমার মেসে নিয়ে যাও। আমি সার্ ফিলিপ সিডনি: ইওর নীড ইজ গ্রেটার দ্যান মাইন।

নরেন একটু হাসল। কিন্তু আমি সেই হাসিতে যোগ দিতে পারলুম না। গত কয়েক দিন শুধু অনিশ্চিতভাবে আশঙ্কা করেছিলুম যে হয়তো আগের বন্ধু আমি হারাতে বসেছি। এখন জানলুম যে আমার আশঙ্কা অমূলক ছিল না। বন্ধু হারালে রেডিওটা আরও বেশি কাজে আসবে। তাই নরেনের অনুরোধে রাজী হয়ে গেলুম। বললুম, কাল সন্ধ্যায় তা হ'লে তোমার ঘর থেকে নিয়ে যাব? না, কি আজই ফেরবার পথে—?

নরেন আবার বিব্রত হয়ে বললে, না ভাই, আজ নয়। আজ আমায় একটু বাদেই উঠতে হবে। আবার সে ঘড়ি দেখল। কালও সন্ধ্যায় বোধ হয় অফিস থেকে সোজা বাড়ি ফেরা হবে না। কিন্তু তোমার আসার দরকার কি? আমি নিজেই লোক দিয়ে রেডিওটা তোমার ওখানে পাঠিয়ে দেব।

ধন্যবাদ।

আমাদের সম্বন্ধটা এমন নয়, অন্তত ছিল না যে কোন কিছুর জন্যে কেউ কাউকে লৌকিকতার সঙ্গে ধন্যবাদ দেব। অন্য সময় হ'লে আমিও কথাটা বলতুম না, আর বললে নরেনও আমার উপর রাগ

করত। কিন্তু আজ আমার কথা সে প্রায় শুনলই না। একটু পরেই উঠে বললে, আচ্ছা ভাই, এখন আমাকে উঠতেই হবে। আবার দেখা হবে।

আমি চায়ের দোকানে ব'সেই দেখলুম যে নরেন ছুটে গিয়ে একটা ট্যাক্সিতে উঠল। নিশ্চয়ই আমি ওকে দেরি করিয়ে দিয়েছি। ট্যাক্সি মিলিয়ে গেল। সেই সঙ্গে আমার সর্বশেষ বন্ধু। বাংলা-সাহিত্যে স্বামীহারার বেদনা, ব্যর্থ প্রেমিকের আর্তনাদ, সন্তানহারার বিলাপ আছে। কিন্তু বন্ধু-হারানোর ব্যথার কোন সার্থক সাহিত্যিক দৃষ্টান্ত স্মরণ করতে পারি নে। যেখানে ম্যালথসের মুখে ছাই দিয়ে আজ বাল্যবিবাহ প্রচলিত সেখানে পরিণত বন্ধুত্বের সুযোগ নেই ব'লে বোধ হয়।

যাই হোক, পরের দিন অফিস থেকে আমি সোজা আমার মেসে ফিরলুম। উদ্দেশ্যহীন পথপরিক্রমায় আর অভিরুচি ছিল না। সেটা শনিবার। মেসের বেশির ভাগ কেরানীবাবুরা সপ্তাহান্তে দেশে গেছেন। পাঁচ দিনের আবশ্যিক নিঃসঙ্গতার পরে দু দিনের বিলাস। আমি শুধু একা আমার ঘরে আলো নিবিয়ে দিয়ে শুয়ে শুয়ে একটার পরে একটা সিগারেট খেয়ে যাচ্ছিলুম। এর আগে অন্যান্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছি, এবারে নরেনশূন্য নিঃসঙ্গতাও সহ্য ক'রে নিতে হবে। তবু বিয়ে করব না।

নরেন যে রেডিওটা দিয়ে যায় নি, এতক্ষণ সে কথা মনেই ছিল না। রাত যখন প্রায় দশটা, তখন নরেন হঠাৎ এসে হাজির। সে আলোটা জ্বালতেই আমি উঠে বসলুম। সে তার নিজের আনন্দে এমন বিভোর হয়ে ছিল যে, আমার বিষণ্ণতা সে লক্ষ্যই করে নি। আপন উচ্ছলতায় প্রায় চেঁচিয়ে বললে, দেখ, নিজেই তোমার জন্যে রেডিওটা নিয়ে এলুম। উঃ, সারাটা পথ এটাকে কোলে ক'রে আনতে হয়েছে! নাও। কোথায় তোমার প্লাগ পয়েণ্ট? এরিয়েলটা কাল সকালে লাগিয়ে নিও। ওটা বাদেই কলকাতা বেশ ভাল শুনতে পাবে। আর্থ

কনেকশনটাও কাল ক'রে নিলে চলবে। বলতে বলতে নরেন নিজেই দক্ষ মিস্ত্রীর মত সব ব্যবস্থা করছিল। আমার দিকে তাকায়ও নি।

আমি আবার প্রতিবাদ জানিয়ে বললুম, এটা না আনলেই পারতে নরেন। তোমার রেডিও তোমার ঘরেই থাকা ভাল।

নরেন এবার ব'সে প'ড়ে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বললে, শোন বলি, আমি কাল বিয়ে করছি। বিয়েতে তোমাকে আসতে বলব না, কেননা বিয়ের সম্বন্ধে তোমার মতামত আমার অজানা নেই। তোমার মতের আমি বদল করতে পারব এমন যুক্তি আমি জানি নে। কিন্তু আমার বস্তুত যুক্তিতে আর কাজ নেই। নরেন একটু থেমে মন্ত্রমুগ্ধের মত হয় চোখ বুজে আপন মনে প্রায় কবিতার সুরে ব'লে চলল, আর আমার নিঃসঙ্গতা নেই। জীবনের সাথীকে এবার খুঁজে পেয়েছি। একবার ইলার কথা শুনলে কণিকা মুখোপাধ্যায়ের গানও বেসুরো শোনায়। সেই সুরে যখন আমার মন ভরপুর তখন আমি নিরঞ্জন মজুমদারের বক্তৃতা শুনতে বসব কোন্ দুঃখে? এসব আর কানে তুলব না। এখন থেকে মৃত্যু পর্যন্ত আমার কানে শুধু আসবে ইলার কথা, ইলার কণ্ঠ। কাছে থাকলে কানে, দূরে থেকে প্রাণে। আগে মনে হ'ত, দিনে চব্বিশটা ঘণ্টা কেন? চারটেই কি যথেষ্ট হ'ত না? এখন কি জান, তিনটে দিনকে মনে হয় তিনটে সংক্ষিপ্ত মুহূর্ত।

নরেন আরও কি বলেছিল মনে নেই। ওই প্রলাপের নিশ্চয়ই ওর কাছে অনন্ত অর্থ ছিল। কিন্তু আমার শোনবার মত ধৈর্য ছিল না। কিছুক্ষণ পরে একটু প্রকৃতিস্থ হয়ে নরেন বললে, না ভাই, আর আমার রেডিও শোনবার সময় নেই। এটা তোমারই থাক্। চলি।

নরেন তখনই চ'লে গেল।

তারপর এক মাস কেটে গেছে। নরেনের সঙ্গে আমার আর দেখা হয় নি। আমার প্রতিজ্ঞায় আমি অটল ছিলুম। তবু নরেনের সম্বন্ধে সব কৌতূহল কি এত তাড়াতাড়ি শেষ হবার? মাঝে মাঝে

ওর কথা ভেবেছি। আনন্দে মুখর নরেন ও ইলার ছবি মনে মনে কল্পনা করেছি। ওদের জীবনে জায়গা কোথায় রেডিওর? বা রেডিওটার বর্তমান উপভোক্তার?

আজ অফিস থেকে বেরিয়ে আবার নরেনের কথা মনে পড়ল। একবার ভাবলুম, ওর বাড়ি যাই। বেন্টিংক্ স্ট্রীটের কাছাকাছি গিয়েও ওর বাড়িতে শেষ পর্যন্ত প্রবেশ করলুম না। কাজ কি ওদের স্বর্গে অনাহূত অতিথি হয়ে? সেখান থেকে ডান দিকে ফিরে একটা ছবি দেখতে গেলুম। তারপর বাইরেই একটা পাঞ্জাবীর দোকানে খেয়ে প্রায় দশটায় মেসে ফিরলুম।

ফিরে দেখি, দরজায় তালার সঙ্গে এক টুকরো কাগজ লাগানো। ঘরে ঢুকে আলো জ্বেলে দেখি, ওটা নরেনের লেখা। লিখেছে, "দেখা হ'ল না। কিন্তু যদি কিছু মনে না কর, এবং তোমার যদি খুব অসুবিধা না হয়, তা হ'লে রেডিওটা আমি ফিরিয়ে নেব। কাল সন্ধ্যায় আমি একজন লোক পাঠিয়ে দেব।—নরেন।"

"রঞ্জন"

কাঁচি

আমি অনেক ভাবিয়া দেখিলাম, এ সংসারে আমাদের কাঁচি ছাড়া বাঁচিবার অন্য কোন উপায় নাই। সুস্থ হইয়া, সম্মান লইয়া, পাঁচজনের একজন হইয়া বাঁচিয়া থাকিতে চান, কাঁচি আপনার চাই-ই, নতুবা রাঁচি। কোন এক ফাঁকে রাঁচির কাছেই কাঁকে গিয়া সেখানকার সরকারী অতিথিদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করিয়া আসিলেই আমার কথা বুঝিতে পারিবেন। বুঝিবেন, রাঁচি অপেক্ষা কাঁচিই ভাল।

আপনি যদি স্রেফ জল খাইয়া পেট জয়ঢাক করিতে চান, আপনার কাঁচির দরকার নাই; কিন্তু সাংসারিক দুধের চাঁচিটুকু যদি ভোগ করিতে চান, তবে কাঁচি আপনাকে যোগাড় করিতেই হইবে; তা সে বড় কাঁচিই হোক বা ছোট কাঁচিই হোক—সেটা আপনার কাঁচি চালাইবার শক্তি ও কৌশলের উপর নির্ভর করে।

কলিকাতা একটি মহানগরী এবং কাঁচি হইল মানব-জীবনের মহাযন্ত্র। তাই কাঁচির মাহাত্ম্য বুঝা যায় এই মহানগরীতেই অনেকেই লক্ষ্য করিয়াছেন, ভারতের অন্য প্রদেশ হইতে যাহারা হাওড়ায় আসিয়া নামে, তাহারা গঙ্গা পার হইতে না হইতেই কোলা ব্যাং হইয়া উঠে; আর যাহারা আসিয়া নামে শিয়ালদায়, তাহারা তো দেখি প্ল্যাটফর্মে আম্‌সি হইয়া পড়িয়া আছে। ইহার কারণ কি?

কারণ, কাঁচি। আপনি নিশ্চয়ই হাসিতেছেন। আমার সামনে হইলে ভদ্রতার খাতিরে হাঁচি সামলাইবার অছিলায় মুখ ঢাকিয়া খুক্-খুক্ করিয়া হাসিতেন, তাহাও জানি। তবু আমি বলি ওই অবস্থা-ভেদের কারণ, কাঁচি।

এইবার আপনি হয়তো আমার কথায় হাঁ হইয়া গিয়াছেন। কিন্তু কারণ দর্শাইলেই বলিতে হইবে, হ্যাঁ, ঠিকই তো বটে!

আপনি সন্ধ্যার পরে কোন ট্রেনে আসিয়া হাওড়ায় নামিলেন। সঙ্গে তেমন কিছু নাই (আসল জিনিস নাই বলিয়াই), তাই পায়ে হাঁটিয়াই কিংবা বাসে ট্রামে যাইবার জন্যই স্টেশনের বাহিরে আসিলেন। পশ্চিম-গগনে দেখিবেন সিগারেটের একটি আলোক-বিজ্ঞাপন; তাহাতে এক জোড়া কাঁচি। একবার খুলিতেছে, একবার বন্ধ হইতেছে। চোখ যদি থাকে এইখানেই মহানগরীতে ঢুকিবার শিক্ষা ও দীক্ষা লওয়া হইয়া গেল। আর আপনাকে রোখিবে কে? শুধু মনকে বুঝাইতে হইবে, জীবনের পথে মহাযন্ত্র কাঁচি, মহামন্ত্র ধোঁয়া। সিগারেটের ধোঁয়ার মতই অসার যখন জীবন, তখন সে জীবনের সার বা চাঁচি যতটুকু পাই, ভোগ করিয়া বাঁচিতে চাই। হে কাঁচি, চাঁচি খাইয়া বাঁচিবার পথ আমাকে দেখাইয়া দাও।—বলিয়াই মহানগরীতে যাইবার পথে হাঁটা দিবেন বা বাস ট্রাম ধরিবেন। কাঁচি আপনার কাঁচা মনকে পাকা ঝুনো করিয়া দিবে।

কিন্তু শিয়ালদায় যদি নামেন? বাহিরে আসিয়া প্রথমেই পড়িবেন দ্বিধায়: সামনে নানা পথ; কোন্ পথে যাইবেন? ডাইনে,

না, বাঁয়ে? সম্মুখে, না, পশ্চাতে কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া হয়তো শেষে ভুল পথে পা দিবেন, কিংবা আবার প্ল্যাটফর্মে ফিরিয়া আসিয়া বসিবেন। এখানে হাওড়ার মত মহানগরীর ঠিকপথে লইয়া যাইবার জন্য হাওড়ার পুল নাই, তাই পদে পদে ভুল হইবার সম্ভাবনা। এখানে মহানগরীর শিক্ষা বা দীক্ষা লইবার জন্য কাঁচি-দর্শন করিবার উপায় নাই, তাই বাঁচিবার পথ ইহাদের জানা নাই—চাঁচি খাওয়া তো দূরের কথা।

তাই বলিতেছিলাম, কাঁচি ছাড়া আমাদের বাঁচিবার উপায় নাই।

এত করিয়া বুঝাইবার পরও অনেকে হয়তো ঠিকমত বুঝিতে পারেন নাই বা বুঝিতে ইচ্ছুক নন; কারণ এই সংসারে 'গবেট' ও অবিশ্বাসী লোকের সংখ্যাই বেশি। সুতরাং কাঁচি-ব্যবহারী যাঁহারা, তাঁহারা অনাহারী থাকেন কি না এবং তাঁহারা কে এবং কি করেন সে বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা এ বিষয়ে আলোকপাত করিবে সন্দেহ নাই।

কাঁচি যে জাত-ব্যবসায়ীর জীবিকা উপায়ের একমাত্র উপায়—তাহার ধূর্ত বুদ্ধির কথা প্রবাদের মতই প্রচলিত। একটু লক্ষ্য করিলেই দেখা যাইবে, প্রায়ই তাহার করতলগত হইতে হয়। অবস্থার বিপাকে পড়িলে আমরা দু হাঁটু মুড়িয়া মাথা হেঁট করিয়া তাহার পায়ের কাছে বসি আর সে নির্বিবাদে আমাদের ঘাড় ধরিয়া, চুল টানিয়া, কান টানিয়া পয়সা আদায় করে। আমরা তাহাতে খুশিই হই। এমনটি আর যদি কেহ করিত! বিবাহের সময়েও দেখুন, শুভদৃষ্টির সময় যা-তা বলিয়া গালাগালি দিতে লাগিল। আমরা শুনিয়া শুধু হাসি।

কাঁচি লইয়া আর এক শ্রেণীর কাজ হইল গলাকাটা ও পকেট-কাটা। যে যত ভাল করিয়া গলা বা পকেট কাটিতে পারে, তাহারই কদর বেশি। স্মার্ট যাঁহারা তাঁহাদের শার্ট ও পাঞ্জাবি তো সে-ই করিয়া থাকে। আমি দর্জির কথা বলিতেছি।

পকেট অবশ্য আর এক বিশেষ দল কাটিয়া থাকে, তবে তাহাদের হাতে কি থাকে—কাঁচি, না, ব্লেড জানি না, আর জানিবার বা দি:

করিয়া? আমাকে তো তাহারা যন্ত্র দেখাইয়া কাটে না কিংবা তাহাদের সহিত এমন গাঢ়তর বন্ধুত্বও নাই যে, বিশ্বাস করিয়া দেখাইবে। যাহাই হউক, তাহারা যদি কাঁচি ব্যবহার করিয়া থাকে তবে এখানে তাহারাও উল্লেখযোগ্য সন্দেহ নাই।

তা ছাড়া নিজেরাই কি কাঁচি কম ব্যবহার করি বা করিয়া থাকি! এই পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হইবার সময় প্রথম যান্ত্রিক পরশ পাই কাঁচির, নাড়ি কাটিবার সময়। সেই হইতে যতদিন বাঁচি, কাঁচি আমাদের জীবনে হাঁচির মতই মাঝে মাঝে অত্যাবশ্যক। ছেলেবেলায় মায়ের দরকারী কাঁচিখানা লইয় কাগজ কাটিতে গিয়া আচমকা মায়ের তাড়া খাইয়া চমকাইয়া কাঁদিয়া উঠিয়াছি। পরে আবার হয়তো মায়ের ঐ কাঁচিখানা লইয়াই রেশম-সম নব-অঙ্কুরিত গোঁফ ছাঁটিয়াছি 'বাটার-ফ্লাই' করিয়া; আর মা তাহা দেখিয়া সগর্বে মুচকি হাসিয়াছেন শুধু। পরবর্তী জীবনে ফিল্ম-সম্পাদক হইয়া কাঁচির সাহায্যে কত ছবির সেলুলয়েডের ফিতাই না কাটিয়া থাকি, পত্রিকা-সম্পাদক হইলে ছাঁটি কত না গল্প উপন্যাস! আর নেতা হইলে? কত না অনুষ্ঠানের উদ্বোধন-উৎসবের রেশমের ফিতা কাটিতে হয় ওই কাঁচির দ্বারাই।

কাঁচির বহু গুণ। ছোট ছেলের ভরপেট খাওয়া-কোমরে আঁটিয়া-বসা কসি কাটিয়া তাহাকে আরাম দেয়। শখ করিয়া আংটি পরিয়া আঙুল বসিয়া গেলে আংটি কাটিয়া আঙুল বাঁচায়। বাড়ির রাঁধুনে বামুনের টিকি কাটিয়া মজার ব্যাপার ঘটায়। বাগানের মালির মাধ্যমে গাছ ছাঁটিয়া মন ভুলায়। অনাথারা অন্ন সংস্থান করে ছিট-কাপড় কাটিয়া। আবার রূপসী বিধবার অতি সাধের চুল কাটিয়া তাহার রূপ ঘুচায়, আবার রূপসীর চুল বব্ করিয়া ছাঁটিয়া তাহার রূপ বাড়ায়। নেশার জিনিসে হস্তক্ষেপ করিতেও কাঁচি পেছপা নহে: বিড়ির পাতা কাটে, আবার দুইটা টিনের পাতের রূপ ধরিয়া পানের পাতায় কাটে দেখি।

বিবাহ-বিচ্ছেদে কাঁচির দরকার হয় কি না জানা নাই, তবে বিবাহ-

বন্ধন অটুট রাখিবার জন্ম দুই পক্ষেরই কিছু কিছু বদ অভ্যাস কাঁচিকাই করা বিশেষ দরকার। সংসারে আয় কম হইলে ব্যয়ের ফর্দে কাঁচি চালাইতেই হইবে। আবার পরের জন্ম নিজের সুখে কাঁচি ব্যবহার করিতেও দেখিয়াছি। শত্রুকে জব্দ করিবার ইচ্ছা? তবে কাঁচির মতই তাহাকে দুই দিক হইতে গ্যাক্ করিয়া ধরিয়া, অল্প অল্প চাপ দিবেন শুধু, দেখিবেন অবস্থাখানা! এ সবই অদৃশ্য কাঁচির কাজ।

আর শেষ কাঁচির কাজ কখন জানেন? যখন চিতায় শুইব, শ্মশান-সঙ্গীর যে কেউ আসিয়া আমার শরীরের বন্ধন, যদি কিছু থাকে, কাটিয়া দিবে, আমাকে মরজগৎ হইতে বন্ধনমুক্ত করিবে তখনই তখনই শেষ হইবে আমার জীবনের কাঁচির লীলা।

কাঁচির হাত হইতে তখনই বাঁচিব।

শ্রীকুমারেশ ঘোষ

হিতোপদেশ

নিজের সঙ্গে ঘণ্টাখানেক যে না রইবে একা,
নিজের মাঝে পরমজনের পাবে না সেই দেখা॥

*　　*　　*

নিজের মনের কথা কারেও শোনাতে চাও যদি,
শুনতে হবে পরের কথা যত্নে নিরবধি॥

*　　*　　*

রাগ হ'ল চণ্ডাল,
হবেই তোমার নৌকাডুবি সে নেয় যদি হাল॥

*　　*　　*

মন্দের সাথে মন্দ হইতে গেলে,
ভালরেই দেবে অতল পাতালে ঠেলে॥

*　　*　　*

সাধু বলি সেই জনে,
নিজের মনের কালোরে যে পারে রাখিতে সঙ্গোপনে॥

আমার সাহিত্য-জীবন

দশ

পাটনার সঙ্গে আমার সাহিত্য-জীবনের যোগ ঘনিষ্ঠ। কলকাতার পরেই। আগেই বলেছি, এখানে শিখেছি অনেক। যাঁদের কাছে শিখেছি, তাঁদের মত সহৃদয় গুণীজন আমার জীবনে আমি অন্য কোথাও পাই নি। কলকাতায় এমন লোকদের আসরে যাবার অধিকারও ছিল না, ভরসাও রাখতাম না। এ বিষয়ে যদি বলি যে, এখানকার লোকেরা এ দিক দিয়ে উচ্চনাসা বা বেশিমাত্রায় গোষ্ঠী-ঘেঁষা, তা হ'লে দোষের হবে না ব'লেই মনে হয়। এখানকার আড্ডায় গোষ্ঠিগত সাহিত্যিক দম্ভটাই বড়, রসিকতার নামে বক্রবাক্য-বিলাসই বেশি। চিনির মত মিষ্টরসের কারবার এখানে সরবতের নয়, এমন কি দেশী মিষ্টান্নেরও নয়; কারবারটা একেবারে বন্দুকের বুলেটের আকারের ও প্রকারে শক্ত জমানো লজেন্সের। মারবেলের মত টিপ ক'রে ছুঁড়ে মেরে বেশ আঘাত দিয়েই পরিবেশন করাই এখানকার বিধি। মার খেয়ে তবে মুখে পুরে চুষে খাও, রস উপভোগ কর এবং কপালে হাত বুলোও। এ দিক দিয়ে সব বিষয়েই কলকাতার চালটা হ'ল শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্তে'র দর্জিপাড়ার দাদার মত। সে কি সাহিত্যে, কি শিল্পে, কি রাজনীতিতে, কি পোশাকে-আষাকে। জীবনের চালিয়াতির এই ঢঙটা আজ ক্রমশ দেশময় ছড়াচ্ছে। মেয়েদের অঙ্গরাগ থেকে মিষ্টান্নের দোকান পর্যন্ত রঙ ও রাঙতার ময়মর কাণ্ড থেকে সেটা সহজেই চোখে পড়ে। পুরুষদের সযত্ন ঔদাসীন্যের রুখু লম্বা চুল, কাঁধ ঝাঁকি, গগল্‌স্‌, পরিহাসের প্যাঁচ, অবজ্ঞাভরা চতুর দৃষ্টি থেকে মরসুমী ফুলের বাহুল্যের মধ্যেই ঢঙটা খুব পরিস্ফুট। এ কায়দাটা ঠিক কোন্ দেশী তা আমার পক্ষে বলা কঠিন। দেশান্তর দূরের কথা, প্রদেশান্তরে পাটনা পর্যন্তই আমার জানা-শোনা। এর আগে কানপুরে ছিলাম মাস তিনেক; তাতে কানপুরকে ভাল ক'রে দেখা হয় নি। পরে সাহিত্য উপলক্ষ্য ক'রে

সেকালের প্রবাসী-বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলনে একবার কানপুর একবার বোম্বাই গিয়েছিলাম, তারও মেয়াদ দিন তিন-চার। তবে বাংলা দেশকে জানি চিনি; বই প'ড়ে নয়, কোন বাদের বিশেষ দৃষ্টি অনুযায়ী নয়; মাঠে মাঠে গ্রামে গ্রামে ঘুরে ঘুরে দেখেছি, চিনেছি। তাতে এইটেই মনে হয়, এ বাংলা দেশের নয়, ভারতবর্ষেরও নয়। এ ইউরোপের। বিলিতী অর্থাৎ ইংরিজী কি ফরাসী—ঠিক বলতে পারব না। আজকের দিনে দেশে মার্ক্‌সবাদের প্রভাব—সেটাও ছড়াচ্ছে ওই রঙে ওই ঢঙের লোলুপতায় ও আগ্রহে। এ দেশে ইংরেজ-বিদ্বেষ প্রবল হয়ে উঠলে এই লোলুপতা বা আগ্রহ লজ্জা পেয়েছিল, কিন্তু আত্মসংবরণ করতে পারে নি; দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর রুশবিপ্লব পৃথিবীর ইতিহাসে একটা নূতন অধ্যায় সৃষ্টি করলে এই লোলুপতা এই আগ্রহ আশ্রয় এবং প্রশ্রয় দুই পেয়ে বেঁচে গিয়েছে। এ দেশে অনেক আচার, অনেক শব্দ, অনেক বিলাস, অনেক ধারণা, এমন কি ধ্যান পর্যন্ত নানা বিদেশী সভ্যতা ও ভাষা থেকে নেওয়া হয়েছে, বেমালুম শব্দটার মতই একেবারে নিজস্ব হয়ে গেছে। কিন্তু এই নেওয়াটার ঢঙ আলাদা। বুদ্ধি দিয়ে গ্রহণ ক'রেই অর্থাৎ চেখেই প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয় নি, হজম ক'রে নিজের ক'রে নিয়েছে। ইংরিজীকে শুধু বুদ্ধি দিয়ে আয়ত্ত ক'রে জীবনবোধের সঙ্গে মিশিয়ে নিয়েছেন যাঁরা, তাঁরাই করেছেন নবযুগের সৃষ্টি। সে মানুষের সংখ্যা কম হওয়াতেই এমনটা হয়েছে। আজ ইংরেজ চ'লে গেছে। ইংরিজী আরও পনের বছর রাখবার কথা রয়েছে। পনের বছর পর যদি আর রাখা সম্ভবপর না হয়, এবং এই পনের বছরের (তার মধ্যে চ'লেও গেল ক বছর) মধ্যে যদি গোটা দেশটাকে ইংরিজীনবিস ক'রে না তুলতে পারা যায় তবে এ ঢঙ এবং এ রঙের রেওয়াজ নিশ্চিতরূপে থাকবে না। এরোপ্লেনের স্পীড এবং আন্তর্জাতীয়তার পৃষ্ঠপোষকতাতেও নয়। তবে যদি এরই মধ্যে একনায়কত্বের প্রতিষ্ঠা হয় তো কি হবে তা বলতে পারি নে। কারণ তার ঢঙ আলাদা। বড় কঠিন এবং জবরদস্ত। থাক্ ও-আলোচনা।

তখনকার কথা বলি। তখন বোহেমিয়ান স্বপ্নই জীবনে প্রবল। সে যেন এক যাযাবর বা বেদের দল জীবনে শুধু হৈ-হৈ ক'রে পকেট থেকে ওই চিনির তৈরী মারবেল বের ক'রে গুলতি ছুঁড়ে পরস্পরকে আঘাত করতে করতে নিরুদ্দেশের পথে চলেছে।

এত কথা বলছি এই কারণে যে, পাটনাতে গিয়ে একজন বেহারী ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল, তিনিই বাঙালীর এই দৃষ্টি সম্পর্কে আমার কাছে কঠিন অভিযোগ করেছিলেন। ওই শচীমামার ওখানেই তিনি আসতেন। শচীমামার উদার প্রসন্ন সাহচর্য শুধু বাঙালীকেই মুগ্ধ করে নি, ও-দেশের গুণীজনদেরও মুগ্ধ করেছিল।

ভদ্রলোকটির নাম ছিল খুব সম্ভব অম্বিকাপ্রসাদ। রাজনৈতিক কর্মী ছিলেন, কিন্তু সাহিত্যানুরাগ ছিল প্রবল। ইংরিজী পড়েছিলেন নিশ্চয়, কিন্তু কতদূর তার পরিচয় দেওয়া আমার মত স্বল্প-ইংরিজী জানা লোকের পক্ষে বুঝে ওঠা কঠিন। তবে বাংলা-সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান এবং পড়াশুনার ব্যাপকতা দেখে বিস্মিত না হয়ে পারি নি। অম্বিকাপ্রসাদ জীবিত নেই। দেশ স্বাধীন হবার অব্যবহিত পূর্বেই বা পরেই তিনি ইহলোক ত্যাগ করেছেন। দু বছর আগে কলকাতায় প্রান্তীয় হিন্দী-সাহিত্য-সম্মেলন উপলক্ষ্যে পাটনার খ্যাতনামা রাজনৈতিক কর্মী এবং প্রসিদ্ধ হিন্দী-সাহিত্যসেবী বেণীপুরীজী তাঁর সম্পর্কে আক্ষেপ প্রকাশ ক'রে বলেছিলেন, অম্বিকাপ্রসাদের অভাবে তাঁদের অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে। তখন কিন্তু বাঙালীদের মধ্যে অনেকেই অম্বিকাপ্রসাদকে ভাল চক্ষে দেখতেন না। শচীমামার কথা ছাড়া অবশ্য। অম্বিকাপ্রসাদকে বাঙালী-বিদ্বেষী বলতেন অনেকে। অম্বিকাপ্রসাদ একদিন আমাকে আমার 'জলসাঘর' গল্পসংগ্রহখানি এনে বললেন, এ শব্দটা কেন আপনি প্রয়োগ করেছেন তারাশঙ্করবাবু?

শব্দটি 'খোট্টা' শব্দ। "টহলদার" গল্পে এক জায়গায় ছিল, "বাবুদের খোট্টা চাপরাশীটা ভোরের আমেজে নাক ডাকাইয়া ঘুমাইতেছে।" অম্বিকাপ্রসাদ বললেন, কথাটার অর্থ কি বলুন তো?

চমৎকার বাংলা বলতেন। তেমনি বুঝতেন। তাঁর কথায় প্রশ্নটা প্রথম মনে জাগল, তাই তো, অর্থ কি? ঠিক অর্থ বুঝে তো লিখি নি। দেশপ্রচলিত শব্দ। আমাদের রাঢ়ের পল্লী অঞ্চলে হিন্দীভাষী লোকেদের 'খোট্টা' ব'লে থাকে। শব্দটার অর্থ কি, কি হিসেবে ব্যবহার করে, তা সত্যিই ভাবি নি। আমাদের দেশে এই রকম কয়েকটা কথাই আছে। একটা 'ভোজপুরে'। 'ভোজপুরে' শব্দটার অর্থ স্পষ্ট—ভোজপুরের অধিবাসী। কিন্তু ব্যবহার করি যখন, তখন মনে ভাসে একটা বলশালী দুর্দান্ত জোয়ান—যে হয় লাঠি, নয় কুস্তিগীরের কাজ করে। 'খোট্টা' শব্দটার অর্থ বা ব্যঞ্জনা আরও খানিকটা নীচুস্তরের। কাঠখোট্টা আমরা তাদেরই বলি, যারা কাঠের মত নীরস কিন্তু নীরস তরুবর নয়, গড়া-পেটা মুগুরও নয়, সাদা কথায় খেঁটে। অর্থাৎ একেবারে অসংস্কৃত শুষ্ক কাষ্ঠখণ্ড যা দিয়ে আঘাতই করা যায়। সেই অর্থে খোট্টা শব্দের অর্থটা দাঁড়ায়—বর্বর, হৃদয়হীন বা নিষ্ঠুর।

কথাটা নিয়ে খানিকটা তর্ক উঠেছিল, কিন্তু আমিই সে দিন প্রকাশ্যেই তাঁর কাছে মার্জনা চেয়ে বলেছিলাম, প্রচলিত শব্দ ব'লে না বুঝেই ওটা আমি প্রয়োগ করেছি। পরে ওটা সংশোধন ক'রে দেব।

অম্বিকাপ্রসাদ বলেছিলেন, তারাশঙ্করবাবু, বাঙালী সাহিত্যিকরা সকল দেশ থেকে এগিয়ে আছেন আজ। তাঁদের খুব সাবধান হতে হবে। এগিয়ে আছেন তাঁরা ইংরিজীর জোরে। এই ইংরিজীর জোরেই তারা সব প্রভিন্সে গিয়ে মাতব্বরি করছেন; সেখানে তাঁরা অনেক কিছু করেছেন—সে অবশ্যই বলব। কিন্তু তাঁরা সব প্রভিন্সের লোকদের এত ছোট নজরে দেখেছেন, এত অবজ্ঞা ঘৃণা করেছেন যে, সবার অন্তরেই দগ্‌দগে ক্ষত হয়ে রয়েছে। আমি ঠিক জানি না, তবে আমার মনে হয়, ইংরিজীনবিশ বাঙালী বাংলা দেশের দেহাতী বাঙালীকেও ঠিক এমনি আঘাতই দিয়েছে। ইংরেজ থাকবে না তারাশঙ্করবাবু। তাকে যেতে হবে। সে যেদিন যাবে, সেদিন

এদের বিপদ ঘটবে। তার সঙ্গে ইংরিজী ভঙ্গির এবং ভাবনার সাহিত্যেরও বিপদ আসবে।

তখন বেশি কেউ ছিল না আড্ডায়। সময়টা দুপুরবেলা। সেদিন শচীমামার ওখানেই নিমন্ত্রণ খেয়েছি। অম্বিকাপ্রসাদও নিমন্ত্রিত ছিলেন। শচীমামার বাড়িতে এসেছেন শ্রদ্ধেয়া বাসন্তী দেবীর ছোট বোন—শ্রীযুক্তা মাধুরী দেবী, বিখ্যাত গায়িকা শ্রীমতী সতী দেবীর মা। এককালে শ্রীযুক্তা মাধুরী দেবীর স্বামী পাটনায় ওকালতি করতেন। পাটনার বাঙালী-সমাজে এবং কিছু বাংলা-জানা বেহারী-সমাজে তাঁর একটি পরম প্রীতির স্থান ছিল। অম্বিকাপ্রসাদ ছিলেন সেই প্রীতি-মুগ্ধদের একজন। দুপুরে খাওয়ার পর বাইরের ঘরে অম্বিকাপ্রসাদ কথাগুলি বললেন। শচীমামা শুনছিলেন।

আমি বলেছিলাম, অম্বিকাবাবু, কথাগুলির মধ্যে সাবধান-বাণী যা উচ্চারণ করলেন তা আমার মনে থাকবে। কিন্তু ইংরিজীনবিসদের কথা এবং ইংরিজী সাহিত্যের প্রভাবে প্রভাবান্বিত সাহিত্যের কথা যা বললেন তার সঙ্গে একমত হতে পারছি নে। কারণ ইংরেজ গেলেও ইংরিজী যেতে পারে না। পৃথিবীর সঙ্গে এ দেশের লোককে সম্বন্ধ রাখতে হবে। তা ছাড়া ইংরিজী শিক্ষা ও সভ্যতার মারফত যে বিজ্ঞানবাদ ও বোধ এসেছে তাকে দূর করে কার সাধ্য?

অট্টহাসি হেসেছিলেন অম্বিকাপ্রসাদ।

এই দেশের কোটি কোটি লোক, যারা মাটির মানুষ, তারা এই ইংরিজী চাল আর চালিয়াতিকে ঝেঁটিয়ে তাড়াবে। তারা নিজের বুকের ভাষা আর ভাবকে গঙ্গার ধারার মত ঢেলে দেবে। বস্তুবিজ্ঞান দিয়ে ভয় দেখাচ্ছেন, তার ভয়ই বা তারা কেন করবে? তাকে তারা নেবে। আপনার মত ক'রে নেবে। দেখে নেবেন। তারাশঙ্করবাবু, এ দেশে তুলসীদাসজীর 'রামচরিত-মানস'ই এ দেশের লোককে বাঁচিয়ে রেখেছে। আপনার দেশে কৃত্তিবাস কাশীরামের রামায়ণ মহাভারত কত চলে খোঁজ নেবেন। আপনি বা আপনারা তার কাছে মক্ষি।

পরের দিন, বোধ করি কি দু-একদিন পর অম্বিকাপ্রসাদ রবীন্দ্রনাথের একখানি বই হাতে ক'রে এলেন। সে দিনও অপরাহ্ন-বেলা। শচীমামা বাগানে কিছু করছিলেন। আমি একা ব'সে ছিলাম। আমার হাতে বইখানি দিয়ে তিনি বললেন,, পড়ুন। এই শেষটা পড়ুন। দাগ দেওয়া আছে।

পড়লাম, "ভস্মাচ্ছন্ন মৌনী ভারত চতুষ্পথে মৃগচর্ম পাতিয়া বসিয়া আছে—আমরা যখন আমাদের সমস্ত চটুলতা সমাধা করিয়া পুত্রকন্যাগণকে কোট ফ্রক পরাইয়া দিয়া বিদায় হইব, তখনো সে শান্ত চিত্তে আমাদের পৌত্রদের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া থাকিবে। সে প্রতীক্ষা ব্যর্থ হইবে না, তাহারা সন্ন্যাসীর সম্মুখে করজোড়ে আসিয়া কহিবে, 'পিতামহ, আমাদের মন্ত্র দাও'।"

পাটনার কথায় অম্বিকাপ্রসাদকে মনে প'ড়ে গেল। তাঁর কথাগুলি মনের মধ্যে ছাপ রেখে গেছে।

পর পর কয়েক বৎসর পাটনায় গিয়েছি। তিন বৎসর তাঁকে দেখেছিলাম।

অম্বিকাপ্রসাদের কথা এইখানে থাক্।

এর আগে মণি-মণ্ডলের "প্রভাতী সংঘে"র উদ্যোগে সাহিত্য-সভার আয়োজনের কথা বলেছি। যে বৎসর আমি সাহিত্যিক পরিচয় নিয়ে প্রথম গেলাম, সেই বৎসরই এর শুরু হ'ল। শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত সভাপতি হিসেবে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন। আমি ওখানে ছিলাম। আর নিমন্ত্রিত হলেন ভাগলপুরে বনফুল, মুঙ্গেরে শ্রীযুক্ত শরদিন্দুবাবু। বাঙালী-সমাজে বেশ সাড়া প'ড়ে গেল।

পাটনায় আরও একটি সাহিত্যিক সংঘ ছিল। তাঁরা ছিলেন একটু অভিজাত-শ্রেণীর। একমাত্র রবীন্দ্র-সাহিত্য নিয়েই তাঁরা আলোচনা করতেন। এবং সে আলোচনায় আসরও ছিল অতি অল্প কিছু লোকের মধ্যে আবদ্ধ। তাঁদের দু-একজন আমার মামার বাড়ির সম্পর্কে

আত্মীয় হ'লেও তাঁরা এগিয়ে আসেন নি। আলাপও হয় নি। পরে হ'লেও সেকালে হয় নি।

সজনীকান্ত বনফুল এসে উঠলেন মণি সমাদ্দারের ওখানে। স্বর্গত যোগীন্দ্র সমাদ্দার মশায়ের প্রশস্ত লাইব্রেরি-ঘরে তাঁদের ঠাঁই হয়েছিল। মনে পড়ছে, বনফুল এরই মধ্যে অর্থাৎ আমি তাঁর ওখান থেকে পাটনা আসার পর সপ্তাহ তিনেকের মধ্যেই একখানি উপন্যাস—তাঁর প্রথম উপন্যাস 'তৃণখণ্ড' লিখে শেষ করেছিলেন। সকালবেলায় গেলাম, পড়া শুরু করলেন। তাঁর প্রথম উপন্যাস, তার উপর সুস্থ সবলদেহ বলাইচাঁদ। সতেজকণ্ঠে আবেগের সঙ্গে প'ড়ে গেলেন।

'তৃণখণ্ড' কেমন বই, সে আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। তবে সেদিন লেগেছিল অপূর্ব। কাব্যে এবং গদ্যে রচনার টেকনিক তাঁর সেই প্রথম। পরে তিনি আরও লিখেছেন। এর সঙ্গে নাটকীয় টেকনিক মিশিয়ে 'মৃগয়া' লিখেছেন। টেকনিকের দিক দিয়ে মধুদাদার অক্ষয় ভাণ্ডের অধিকারী তিনি। সেই দিন তার প্রথম পরিচয় পেয়ে আমরা যেন বুঁদ হয়ে গিয়েছিলাম। বনফুলের ভিতরের কবি-সাহিত্যিক সেই দিনই যেন বলেছিল, ওই মানসীর হাতছানিতেই আমার জীবনতরী চলবে, ভাসবে, কেউ ঠেকাতে পারবে না। বাইরেটা নিতান্তই খোলস।

বই শেষ হতে বাজল ছুটো।

বাড়ি এসে খাওয়া-দাওয়া করছি, এমন সময় খবর এল, যে বেহার ন্যাশনাল কলেজ হলে সম্মেলন হওয়ার কথা, সেখানকার কর্তৃপক্ষ খবর পাঠিয়েছেন—তারাশঙ্করবাবু রাজনৈতিক অপরাধে কারাদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তি, তাঁকে কলেজ-হলে বক্তৃতা করতে দিলে কলেজের পক্ষে ক্ষতিকর হতে পারে; সুতরাং তাঁকে বাদ দেওয়া হোক অথবা আই. বি. পুলিসের কাছে যথারীতি অনুমতি নেওয়া হোক।

সজনীকান্ত, বনফুল, শরদিন্দু বললেন, তারাশঙ্করকে যোগ দিতে না দিলে আমরা যোগ দিতে পারি না।

মণি সমাদ্দারের দলটি ব্যাকুল হয়ে উঠল—কি হবে?

রতীনদা একেবারে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। তিনি বললেন এ হতে পারে না। প্রিন্‌সিপ্যালের কাছে কেউ গিয়ে নানা ভুয়ো সংবাদ দিয়ে ভুল বুঝিয়ে এই কাণ্ড করেছে। এবং কে করেছে সে আমি জানি।

টেবিলটার ওপর তিনি প্রচণ্ড একটা মুষ্ট্যাঘাত করলেন।

বেশ গরম হয়ে উঠল বাঙালী-সমাজ। বিপদে পড়ল তরুণ ছেলে কয়টি। আমি নিজে হলাম বিব্রত। আমার বড়মামার রাগ সবচেয়ে বেশি। ওই শচীমামাই তখন হাসিমুখে এগিয়ে এসে বললেন, আরে, এ নিয়ে এত রাগারাগি কর কেন? হৈ-চৈ কেন? চল, আমরা কজন যাই প্রিন্‌সিপ্যাল সাহেবের কাছে। দেখি কি বলেন তিনি!

আসল প্রিন্‌সিপ্যাল স্বর্গীয় ললিতবাবু তখন অসুখে শয্যাশায়ী। তাঁর জায়গায় কাজ চালাচ্ছেন ভাইস্‌প্রিন্‌সিপ্যাল জনাব মৈনুদ্দিন সাহেব। ললিতবাবু, যতদূর মনে পড়ে, শচীমামাদেরও শিক্ষক ছিলেন। শচীমামা ও আর দু-তিন জন গেলেন এবং আধ ঘণ্টার মধ্যেই সব গণ্ডগোল মিটিয়ে ফিরে এলেন। সেই স্বকীয় ভঙ্গিতে থেমে থেমে ঝোঁক দিয়ে দিয়ে বললেন, নাও, এইবার কি বলে—আসর পাত। শুরু ক'রে দাও গাওনা।

গাওনাই বটে। সে এক জমজমাট আসর। আজ যত দূর মনে হচ্ছে, তাতে হলখানা ছিল মস্ত বড় এবং ঘরখানার এ-মাথা থেকে ও-মাথা পর্যন্ত লোকে ঠাসা। লোকগুলি প্রবাসী-সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং ছাত্র-সমাজের ভাল ছেলের দল। সত্যিকারের তৃষ্ণা নিয়ে এসেছে। আজকের দিনে বলাটা বাহুল্য হবে না যে, লোকের কাছে সেদিন সবচেয়ে বড় ঔৎসুক্য ছিল সজনীকান্ত সম্পর্কেই। 'শনিবারের চিঠি'র তীব্র তীক্ষ্ণ সমালোচনায় তখন আধুনিক সাহিত্য-ক্ষেত্র প্রায় ছিন্নভিন্ন, তিনি তখন সদ্যযুদ্ধজয়ী বীরের মতই গৌরবান্বিত। তখন

'কল্লোলে' শুরু আধুনিক সাহিত্যের অভিযান প্রায় ছত্রভঙ্গ হয়ে গেছে। 'কল্লোল', 'কালিকলম', 'ধূপছায়া' উঠে গেছে ; এমন কি শনিবারে বের-হওয়া চিঠির প্রসার রুখতে রবিবারে যে লাঠি বেরিয়েছিল সে লাঠিতে ঘুণ ধ'রে ভেঙে গেছে। ওই সময়ের লেখকদের মধ্যে শৈলজানন্দ এবং প্রবোধ সান্যাল ছাড়া সকলেই যেন সাময়িকভাবে কলম থামিয়েছেন। সজনীকান্ত তখন সম্মুখবাহিনী ছত্রভঙ্গ ক'রে দিয়ে পিছনের রথীদের আক্রমণোদ্যোগের আভাস দিয়েছেন।

সত্যি কথা বলতে কি, লোকে দুঃখও অনুভব করে,আবার 'শনিবারের চিঠি'র মারের চাতুর্য দেখে তারিফ ক'রে না হেসেও থাকতে পারে না। সেই সজনীকান্ত কি বলবেন। এক দল তাঁকে বলে—কালাপাহাড়, সব ভেঙে-চুরে দিলে, বিগ্রহগুলোর নাক কেটে বিকৃত ক'রে ফেললে। বলে অবশ্য গোপনে। তবে মারের তারিফ করে। হ্যাঁ, মার বটে।

আর এক দল বলেন—হ্যাঁ, বলশালী সংস্কারক বটে।

যাই হোক, সে দিন সজনীকান্তের বক্তব্য শুনতে লোক ভিড় ক'রে এসেছিল। প্রবীণ মথুরবাবু থেকে মণি-দলের পরের দল পর্যন্ত।

সজনীকান্ত আধুনিক সাহিত্যকে গাল দিয়ে শরৎচন্দ্র সম্পর্কেও সুকঠোর মন্তব্য ক'রে বসলেন। তাঁর সেই সময়ের লেখা 'পথের দাবি' 'শেষপ্রশ্ন' প্রভৃতি ওই ধরনের লেখাগুলি সম্পর্কে বলেছিলেন—পল্লী-সমাজের দাদাঠাকুর মুদির দোকানে বসিয়া থেলো হুঁকায় তামাক খাইতে খাইতে পল্লীজীবনে গল্পে আসর মাত করিয়াছেন, কিন্তু যেই তিনি থেলো হুঁকা ছাড়িয়া মুদির দোকান ফেলিয়া বালিগঞ্জের ড্রয়িংরুমে সোফা-সেটিতে হেলান দিয়া পাইপ টানিতে টানিতে গল্প বলিতে গিয়াছেন, হাস্যাস্পদ হইয়াছেন, নাজেহাল হইয়াছেন।

কথাগুলি ঠিক এই কথাই নয়, আমার স্মৃতি থেকে উদ্ধার ক'রে দিলাম। স্মৃতির উপর বিশ্বাস আছে।

সজনীকান্তের এই উক্তির সঙ্গে সে কি হাততালি! ঘরখানা যেন ফেটে পড়েছিল। আশ্চর্যের কথা, কেউ তাঁকে এ নিয়ে প্রশ্ন

করে নি। উল্লসিতই দেখেছিলাম সকলকে। আমি সে দিন একটি ছোট লেখা পড়েছিলাম। লেখাটির উল্লেখযোগ্যতা কিছুই ছিল না। তখন প্রবন্ধ বা অভিভাষণ জাতীয় কিছু লিখতে হ'লে বিব্রত হতাম। কেন না, সেকালে ইংরিজী কোটেশন কিছু না থাকলে এবং মতামত ইংরিজী-সমালোচনা-সাহিত্য-সম্মত না হ'লে সেটা গ্রাহ্যই হ'ত না। লেখাটি বেরিয়েছিল 'দেশ' পত্রিকায়।

আমি কিন্তু একটু আঘাত পেয়েছিলাম সজনীকান্তের এই উক্তিতে। বিষণ্ণ হয়েছিলাম। পরের দিন আসর মাত করলেন বনফুল ও শরদিন্দু। বনফুল হাসির কবিতা প'ড়ে হাসির হুল্লোড় বইয়ে দিলেন, শরদিন্দু পড়লেন 'তিমিঙ্গিল' নামক হাসির গল্প। আমি পড়েছিলাম 'জলসাঘর' গল্প। লোকে জুতো ঘষতে লাগল। আমার বড়মামা রেগে আগুন। আমি কিন্তু নিজের কণ্ঠস্বরে ঢাকা প'ড়ে জুতো-ঘষার আওয়াজ পাই নি। শেষ পর্যন্ত প'ড়ে তবে ছেড়েছিলাম।

পাটনাতে এই বছরেই কিছুদিন পর এলেন বাংলা-সাহিত্যে রসিক-চূড়ামণি "পরশুরাম"—শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু মশায়। এবং ঠিক তাঁর সঙ্গেই এসেছিলেন 'অমৃতবাজারে'র সম্পাদক শ্রীযুক্ত তুষারকান্তি ঘোষ।

পরশুরামকে দেখবার পরম আগ্রহ ছিল। না জানি, এই লোকটি কি বিচিত্র ঢঙে কথা বলবেন! হয়তো বা কথায় কথায় হাসির তুফান উঠবে! আমার তখন শরীরের যে অবস্থা তাতে হয়তো জিজ্ঞাসা ক'রেই বসবেন, কৌন বা? কারিয়া পিরেত?

শরীর দেখে অসুখের কথা উঠলে হয়তো বলবেন, এই উপসর্গ হয়?

হয়তো সে উপসর্গ নেই—সে কথা বললে ব'লে বসবেন, হয়, প্রানতি পার না।

হয়তো বা 'কচিসংসদে'র উত্তরখণ্ডে কোন ডিস্‌পেপ্‌সিয়াগ্রস্ত গাল্লিকের চরিত্রই দেখতে পাব। নানা শঙ্কায় শঙ্কিত আগ্রহ নিয়েই দেখতে গেলাম। রঙীনদা তাঁর সম্মানে বি. এন. কলেজের মাঠে একটা

চায়ের মজলিসের অনুষ্ঠান করেছিলেন। সেখানে তিনি আমাকে একেবারে রাজশেখরবাবুর টেবিলেই সামনের চেয়ারে বসিয়ে দিলেন; দেখে অবাক হয়ে গেলাম।

ইনিই পরশুরাম? 'গড্ডলিকা'-'কজ্জলী'র স্রষ্টা রসসাগর ব্যক্তিটি!

শান্ত স্নিগ্ধ স্বল্প এবং মৃদুভাষী প্রসন্ন একটি মানুষ; স্থির ধীর। এমন মানুষের কাছে গেলে মনটি জুড়িয়ে যায়; পবিত্র হয়; জীবনে গভীরতার সন্ধান পায়। বুঝলাম, হাস্যরসের সৃষ্টি এঁর খেলা। আসলে গভীর ভাবের ভাবুক। মধ্যে মধ্যে বিশ্রাম নেওয়ার মত খেলা করেন।

শ্রীযুক্ত রাজশেখরবাবু প্রথম জীবনে বা কৈশোরে পাটনার ওদিকে ছিলেন। পাটনা কলেজে কিছুদিন পড়েও ছিলেন। তাঁর মা বলতে গেলে দানাপুরের মেয়ে। তাঁর বাবা দানাপুরের সামরিক বিভাগে কাজ করতেন। শ্রীযুক্ত বসুর মায়ের বয়স যখন মাস খানেক কি মাস দুয়েক তখনই হয় মিউটিনি। দিদিমার কাছে মিউটিনির অনেক গল্প তাঁরা শুনেছেন। 'যুগান্তরে' বর্তমানে তাঁর দাদা শ্রীযুক্ত শশিশেখর বসু তার অনেক কাহিনী লিখেছেন।

সেবার পাটনা কলেজে ছেলেরা তাঁকে একটি অভিনন্দন দিয়েছিল। স্বল্প কথায় একটি ছোট বক্তৃতা দিয়ে তিনি সবিনয়ে জানিয়েছিলেন, লেখার কথা আলাদা, কিন্তু বক্তৃতা দিতে তিনি ঠিক পারেন না। সেই সভায় শ্রীযুক্ত তুষারকান্তি ঘোষও বক্তৃতা দিয়েছিলেন। ঘোষ মশায় চতুর বক্তা। কি যেন একটি সরস গল্প ব'লে বক্তৃতা শেষ ক'রে আসরটা খুব জমিয়ে দিলেন।

পাটনায় আর একজন বড় মানুষকে দেখেছিলাম, তাঁর কাছে আসবার সৌভাগ্যও হয়েছিল—শ্রীযুক্ত পি. আর. দাস মশায়।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

ভাগ্য

লক্ষ লক্ষ টাকা কামায় লক্ষ লক্ষ লোকে,
আমার ভাগে জুটল শুধু ঋতু-ফুলের বোকে।

অভিভাষণ*

আজ আপনাদের সহিত মিলিত হইবার সুযোগ লাভ করিয়া আমি আনন্দিত হইয়াছি। এই আনন্দের সহিত বিষাদও মিশ্রিত আছে। বাংলা-সাহিত্যের তিনজন কৃতী সাধকের তিরোধানে বাংলা-সাহিত্য-সংসার আজ ম্রিয়মাণ। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মোহিতলাল মজুমদার এবং ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নিজ নিজ ক্ষেত্রে এক-একজন দিক্‌পাল ছিলেন। তাঁহাদের অকালমৃত্যু শুধু বাংলা-সাহিত্যেরই নয়, ব্যাপকভাবে সমগ্র ভারতীয় সাহিত্যেরই ক্ষতিজনক। তাঁহাদের উদ্দেশে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া তাঁহাদের পরলোকগত আত্মার কল্যাণ কামনা করিতেছি।

তাহার পর প্রণাম নিবেদন করিতেছি এই কলিঙ্গভূমিকে, যাহার সহিত বঙ্গের নাম ইতিহাসে, গল্পে, সাহিত্যে, শিল্পে, ধর্মে, দৈনন্দিন জীবনের স্মৃতিসংস্কারে ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত, প্রণাম নিবেদন করিতেছি সেই সব কৃতী কলিঙ্গকবিদের যাঁহাদের প্রাদেশিকতা-বর্জিত উদার সাহিত্য-সাধনা বঙ্গের মনীষাকে প্রেমবন্ধনে আবদ্ধ করিয়াছে।

একসঙ্গে এতগুলি শ্রদ্ধেয় গুণীর সান্নিধ্য লাভ করা কম সৌভাগ্যের কথা নহে। বর্তমান সময়ে এরূপ সম্মেলনের প্রয়োজনও আছে। আজ সাহিত্য-শাখার সভাপতিরূপে আপনাদের নিকট যাহা নিবেদন করিব তাহা রবীন্দ্রোত্তর বঙ্গসাহিত্যের বিস্তারিত সমালোচনা নয়, রবীন্দ্রোত্তর বঙ্গসাহিত্যের নানা বিভাগে গর্ব করিবার মতো অনেক কৃতিত্ব সঞ্চিত হইয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহা লইয়া আস্ফালন অথবা বাগাড়ম্বর আমি করিব না। জাতি হিসাবে আমরা আজ বিপন্ন, যে জীবন সাহিত্যের উৎস আমাদের সেই জীবনই আজ দুর্দশাগ্রস্ত, আত্মপ্রশংসার ঢক্কানিনাদ করিয়া এ নিদারুণ সত্যকে চাপা দিবার প্রবৃত্তি আমার নাই।

স্বাধীনতালাভের অব্যবহিত পূর্বে ও পরে পৃথিবীর সকল জাতির জীবনে দুঃখ যেমন নানা মূর্তিতে দেখা দিয়াছিল, আমাদের জীবনেও তেমনি তাহা দিয়াছে। সেই দুঃখের ভারে আজ আমরা নিষ্পিষ্ট, সেই দুঃখের করাল

---

* নিখিল-ভারত বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলনের কটকে অনুষ্ঠিত অষ্টাবিংশতি অধিবেশনের সাহিত্য-শাখার সভাপতির অভিভাষণ।

কবল হইতে মুক্তি পাইবার শক্তি আমাদের আছে কি না এবং আজ আমরা যে স্বাধীন রাষ্ট্রের অঙ্গ সেই রাষ্ট্রের কোনও কর্তব্য আমাদের প্রতি আছে কি না—এই অভিভাষণে তাহাই আলোচনা করিবার প্রয়াস পাইব। আমরা যদি এ বিপদ উত্তীর্ণ হইতে না পারি, আমাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার।

আমি রাজনৈতিক নহি, আমি সাহিত্যিক। আমি সেই সরস্বতীর উপাসক, যিনি তরুণশকলমিন্দোর্বিভ্রতী শুভ্রকান্তি, যিনি কুন্দেন্দু-তুষার-হার-ধবলা, সকল বর্ণের সমসম্মিলনে যে শ্বেতবর্ণের উদ্ভব তাহাই সর্বাঙ্গে ধারণ করিয়া যিনি সর্ব-শুক্লা স্বরসুরের শোভন সমন্বয়ে যে সঙ্গীত তাহারই অধিষ্ঠাত্রী দেবতারূপে যিনি বীণাবরদণ্ডমণ্ডিতভুজা, সর্বজ্ঞানের প্রতীক পুস্তকমালা বাম অঙ্কে ধারণ করিয়া যিনি পুস্তকধারিণী, যাঁহার পদ্মাসন একদল নহে—শতদল, যাঁহার বাহন আকাশচারী মানসসরোবরবাসী, যিনি ভগবতী, নিঃশেষজাড্যাপহা, যিনি ব্রহ্মাচ্যুত-শঙ্করপ্রভৃতির্দেবৈ বন্দিতা, সত্যশিবসুন্দরের এই চিরন্তন প্রকাশপ্রতিমার উপাসনা করিয়া আসিয়াছি বলিয়া আজ মর্মে মর্মে অনুভব করিতেছি যে, আমাদের জীবনে অসত্য অশিব এবং অসুন্দরের ছায়াপাত হইয়াছে। সে ছায়া প্রতিদিন ঘনতর হইতেছে। আমাদের শক্তি ও দুর্বলতার বিচার করিয়া অবিলম্বে আমরা যদি এ বিষয়ে অবহিত না হই, আমাদের সাধনা, সংস্কৃতির জগতে আমাদের কৌলীন্য অবলুপ্ত হইয়া যাইবে।

রাজনীতিই যাঁহাদের উপজীব্য, তাঁহারা বহু দলে বিভক্ত হইয়া রাজনৈতিক কৌশলে এ সমস্যা সমাধানের প্রয়াস পাইতেছেন। তাঁহাদের সে প্রয়াস কতটা আন্তরিক, কতটা মৌখিক, কতটা দাবার চাল, কতটা কার্যকরী, কতটা বিপক্ষকে হীন করিবার কৌশল, তাহা আমি জানি না। তাহার আলোচনা করিয়া অনধিকার-চর্চাও আমি করিব না। আমি যাহা মর্মে মর্মে অনুভব করিয়াছি, তাহাই আজ অকপটে ব্যক্ত করিব।

বাঙালী জাতির একটা বৈশিষ্ট্য আছে। অতিশয় আত্মসচেতন জাতি এই বাঙালী। ইতিহাসের পাতা উলটাইলেই প্রতীয়মান হয় যে স্বাধীন রাষ্ট্র স্থাপনের আকাঙ্ক্ষা, নিজের স্বাধীন সত্তাকেই কেন্দ্র করিয়া শৌর্যে-বীর্যে-মহিমায়, রূপে-রসে-রঙে প্রস্ফুটিত হইবার আগ্রহ বহু প্রাচীন কাল হইতেই তাহার অন্তরে বদ্ধমূল। এই বৈশিষ্ট্যটিকে অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য

যুগে যুগে সে প্রাণপাত করিয়াছে, গৌরবের তুঙ্গশীর্ষে আরোহণ করিয়াছে, গ্লানির কর্দমেও অবলিপ্ত হইয়াছে। এই বৈশিষ্ট্য তাহাকে উন্নতির আলোকেও যেমন লইয়া গিয়াছে, অবনতির অন্ধকারেও তেমনি টানিয়া আনিয়াছে।

নৃতত্ত্ববিদ্‌ বৈজ্ঞানিকদের মতে দ্রবিড়, আদি-অস্ট্রেলীয়, নিগ্রোবটু ও আর্য জাতির সংমিশ্রণে আমাদের উৎপত্তি। অস্ট্রিক জাতিরই উত্তরাধিকার আমরা ভোগ করিতেছি আমাদের কৃষিকর্মে। আমাদের ধান, কলা, নারিকেল, পান প্রভৃতিও নাকি তাহাদেরই দান। আমাদের উদ্ভবের এই বৈচিত্র্যই হয়তো আমাদের শিল্পীও করিয়াছে। বস্তুত চিন্তা করিলেই এই কথাটাই স্পষ্ট হইয়া উঠে যে, আহারে-বিহারে, সমাজ-ব্যবস্থায়, রীতি-নীতিতে, তৈজসপত্রে, গৃহনির্মাণে, ধর্মে-প্রথায় আমাদের যে প্রতিভা ব্যক্ত তাহা শিল্প-প্রতিভা। যুগ যুগ ধরিয়া তাই আমরা শিল্পীজনসুলভ স্বতন্ত্রতার পক্ষপাতী, অনন্যতার সাধক, সেই জন্যই আমরা গুণগ্রাহী, সেই জন্যই আমরা কথায় কথায় বিদ্রোহ করি, দলে দলে শহীদ হইয়া ফাঁসিকাঠে ঝুলিয়া পড়ি।

ইতিহাসের পটভূমিকায় আলোচনা করিলে কথাটা আরও স্পষ্ট হইবে।

ঐতিহাসিকগণ বলেন, প্রাচীন আর্য ঋষিগণ বাঙালীদের উপর তেমন সন্তুষ্ট ছিলেন না। প্রাচীন সংস্কৃত-সাহিত্যে তদানীন্তন বঙ্গবাসী সম্বন্ধে যে উল্লেখ পাওয়া যায় তাহা প্রশংসাসূচক নহে। দস্যু, পক্ষী, ম্লেচ্ছ, পাপ প্রভৃতি শব্দ দ্বারা তাঁহারা আমাদের যে পরিচয় রাখিয়া গিয়াছেন তাহা হইতে একটি কথাই সূচিত হয় যে, তাঁহারা তদানীন্তন বঙ্গবাসীদের সুনজরে দেখিতেন না। কোনও বিজেতাই দুর্দমনীয় শত্রুকে সুনজরে দেখেন না। মুসলমানরা আমাদের কাফের বলিতেন, ইংরেজরা বলিতেন—Black niggers.

আর্য-উপনিবেশের প্রত্যন্ত-প্রদেশে যে সকল জাতি তখন বাস করিতেন যদিও তাঁহারা বিভিন্ন নামে অভিহিত, কিন্তু তাঁহাদের ধরন-ধারণ, আচার-আচরণ, চিন্তাপ্রণালী একই প্রকার ছিল। পৌরাণিক গল্পে ঋষি দীর্ঘতমসের পাঁচ পুত্রের নাম—অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র এবং সুহ্ম। বৈজ্ঞানিকদের মতেও প্রত্যন্তবাসী এই সমস্ত জনগণই একই গোষ্ঠির অন্তর্ভুক্ত। অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ

পুণ্ড্র ও সুহ্ম নানা বন্ধনে পরস্পরের সহিত আবদ্ধ। বিজয়ী বৈদিক আর্য-সভ্যতার প্রতি বিরূপতায় ইঁহারা সকলেই একদলভুক্ত ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের বাঁশী পরবর্তী যুগে যদিও ভাবপ্রবণ বাঙালীকে মুগ্ধ করিয়াছিল, কিন্তু অসিধারী শ্রীকৃষ্ণের বিরুদ্ধে প্রত্যন্তবাসী অঙ্গ বঙ্গ যে সম্মিলিত হইয়াছিল তাহার ইঙ্গিত মহাভারতে বর্তমান। পুণ্ড্ররাজ বাসুদেব মগধরাজ জরাসন্ধের সহিত সন্ধি করিয়া শ্রীকৃষ্ণের বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযান করিয়াছিলেন।

ইহা তদানীন্তন বাঙালী মনের স্বকীয়তার পরিচায়ক। কিন্তু পরবর্তী ইতিহাস হইতে ইহাও নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয় যে, আর্যসভ্যতাকে বাঙালী চিরকাল বর্জন করিয়া থাকিতে পারে নাই। অবশেষে তাহাকে সে গ্রহণ করিয়াছিল। ঐতিহাসিকগণ ইহার যে সামরিক ও সামাজিক কারণ অনুমান করিয়াছেন তাহা নিশ্চয়ই সত্য। কিন্তু আমার মনে হয়, বাঙালীর গুণগ্রাহিতা, অভিনবত্বের প্রতি বাঙালীর স্বাভাবিক আকর্ষণ এবং নূতন কিছুকে অনুকরণ করিবার স্পৃহাও বঙ্গদেশে আর্য-সভ্যতার পথ কম সুগম করে নাই। আর্য-প্রতিভার বলিষ্ঠতা, বৈদিক যজ্ঞের আড়ম্বর বাঙালীর শিল্পীমানসকে অভিভূত করিয়াছিল, পিঙ্গলকেশ নীলচক্ষু তপ্তকাঞ্চনবর্ণ আর্যদের দেখিয়া বাঙালী মুগ্ধ হইয়াছিল, তাই তাহাদের বরণ করিয়া লইতে ইতস্তত করে নাই। যাহা নূতন তাহা যদি মনোহর হয়, তাহাতে যদি উচ্চ আদর্শের অথবা বিরাট কল্পনার খোরাক থাকে, বাঙালী তাহাকে সাগ্রহে বরণ করে। নূতন কিছুর প্রতি বাঙালীর এই আগ্রহ লক্ষণীয়। কবি দ্বিজেন্দ্রলাল যদিও ব্যঙ্গের সুরে একদিন গাহিয়াছিলেন "নূতন কিছু কর একটা নূতন কিছু কর"—কিন্তু নূতন কিছু করিবার বাসনাই বাঙালীর চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য। সম্পূর্ণ নূতনকে সম্পূর্ণরূপে আত্মসাৎ করিয়া নিজস্ব করিবার ক্ষমতাও বাঙালী-চরিত্রে আছে।

আর্য-সভ্যতা বঙ্গদেশে আসিল, কিন্তু বেশি দিন টিকিল না। বৈদিক বর্ণাশ্রম-ধর্মের মধ্যে বৈষম্যের বীজ নিহিত ছিল। বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণই সে সভ্যতার শিরোমণি, একমাত্র দ্বিজ ক্ষত্রিয়ই সে সভ্যতার শক্তির প্রতীক এবং দ্বিজ বৈশ্যই বাণিজ্য-সম্রাট, বাকি সকলে শূদ্র—দাস। ভেদনীতিপূর্ণ এই আর্য-আভিজাত্য বাঙালী সহ্য করিল না। তাই যখন মগধে ইহার প্রবল প্রতিবাদ বাঙ্ময় হইল, জৈন তীর্থঙ্কর মহাবীর বর্ধমানের নবধর্মপ্রচারে এবং

কপিলবাস্তুর রাজবংশে আর্যসভ্যতাপুষ্ট ক্ষত্রিয় রাজপুত্র সিদ্ধার্থের উদাত্তকণ্ঠে তখন বাঙালী জনসাধারণ—আর্যসভ্যতা বরণ করিবার পূর্বে যাহারা পঞ্চায়েত-চালিত গণতন্ত্রে অভ্যস্ত ছিল—তাহারা এই সাম্যের বাণীতে উদ্বুদ্ধ হইল। বৈদিক সভ্যতায় যাহারা শূদ্র বলিয়া অবজ্ঞাত হইতেছিল, তাহারা দলে দলে বৌদ্ধ হইতে লাগিল। সাম্য ও প্রেম—এই দুইটিই তো বাঙালীর প্রাণের কথা। যুগ যুগ ধরিয়া ইহার জন্যই সে তৃষিত। ইহারই অন্বেষণে বহু আলেয়া, বহু মরীচিকার পিছনে ছুটিয়া সে দিগ্‌ভ্রান্ত হইয়াছে। আজও হইতেছে।

অনার্য বাঙালী আর্য হইল, আর্য বাঙালী বৌদ্ধ হইল, কিন্তু তাহার অন্তরের পিপাসা মিটিল না। কিছুকাল পরে সে সবিস্ময়ে লক্ষ্য করিল যে, ভগবান বুদ্ধের বাণীতে অথবা জিনাচার্যগণের ধর্ম-উপদেশে সাম্যবাদের যে বিরাট সম্ভাবনা ছিল কার্যক্ষেত্রে তাহার কিছুই নাই। বৌদ্ধ ভিক্ষু এবং বৈদিক ব্রাহ্মণ একই জিনিসের এপিঠ-ওপিঠ, বৌদ্ধ রাজা এবং বৈদিক সম্রাট্ প্রজা-সম্পর্কে উভয়েই সু-উচ্চ সিংহাসন-সমাসীন। কেহ হয়তো প্রজাপীড়ক, কেহ প্রজারঞ্জনকারী, কিন্তু কার্যত উভয়েই প্রজাশোষক। যে অনাবিল প্রেম ও উদার সাম্যের প্রতিশ্রুতি বৌদ্ধধর্মে বিঘোষিত হইয়াছিল, তাহা রাজনীতি ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে তো নহেই—ধর্মের ক্ষেত্রেও সব সময় রক্ষিত হইল না। বৌদ্ধদের মহাযান মতই বাংলা দেশ সাগ্রহে বরণ করিয়াছিল; কারণ মহাযান উদারতর, তাহার আকাঙ্ক্ষা শুধু আত্মোদ্ধার নয়—জগতের উদ্ধার। বুদ্ধ অপেক্ষা ধর্মই মহাযানে বড়। এই মহাযান শেষে সহজযানে রূপান্তর লাভ করিল। সহজযানী বলিলেন, মানুষ সকলেই নিত্যমুক্ত, পাপপুণ্য বলিয়া কোন জিনিসই নাই। ইহা প্রাণধর্মী বাঙালীর চিত্তকে প্রথম প্রথম খুবই মাতাইয়া দিয়াছিল। ইহাকে কেন্দ্র করিয়া বাংলা দেশে সে যুগে নানারাগে সন্ধ্যাভাষায় যে কাব্য মূর্ত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার মূল সুর—মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ভাষায়—"বাপু হে সবই তো শূন্য, সংসারও শূন্য, নির্বাণও শূন্য, তবে যে আমি আমি বলিয়া বেড়াই এটা কেবল ধোকা মাত্র। এই ধোকার পরদা নামাইয়া ফেল। তখন দেখিবে কিছুই কিছু নয়। সুতরাং আনন্দ কর। আনন্দই শেষ পর্যন্ত থাকিবে। আদিতেও আনন্দ, মধ্যেও আনন্দ, শেষেও আনন্দ।" এই আধ্যাত্মিক আনন্দ কিন্তু

শেষ পর্যন্ত পাশবিক পঞ্চকাম উপভোগে পরিণত হইল। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ই বলিতেছেন, "যে পঞ্চকামোপভোগ নিবারণের জন্য বুদ্ধদেব প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছিলেন, যে চরিত্রবিশুদ্ধি বৌদ্ধধর্মের প্রাণ, যে চরিত্রবিশুদ্ধির জন্য হীনযান হইতেও মহাযান মহত্তর, যে চরিত্রবিশুদ্ধির জন্য আর্যদেব 'চরিত্র-বিশুদ্ধিপ্রকরণ' নামে গ্রন্থই রচনা করিয়া গিয়াছেন, সহজযানে সেই চরিত্রবিশুদ্ধি একেবারেই পরিত্যাগ করিয়া দিল। বৌদ্ধ-ধর্ম সহজ করিতে গিয়া, নির্বাণ সহজ করিতে গিয়া, অদ্বয়বাদ সহজ করিতে গিয়া, সহজযানীরা যে মত প্রচার করিলেন তাহাতে ব্যভিচারের স্রোত ভয়ানক বাড়িয়া উঠিল।..." ধর্ম ব্যভিচারপূর্ণ হইয়া উঠিলে তাহাতে সাম্যও থাকে না, মহত্ত্বও থাকে না। সত্যশিবসুন্দরের পূজারী বাঙালী পুনরায় সচেতন হইয়া উঠিল।

বৈদিক আর্যসভ্যতার সংস্পর্শে বাঙালী মনীষা উদ্দীপ্ত হইয়াছিল সন্দেহ নাই। তাহার প্রমাণ বাঙালী গৌড়মীমাংসক শালিকনাথ, ভবদেব ভট্ট, তাহার প্রমাণ বাঙালী হলায়ুধ, রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, তাহার প্রমাণ মধুসূদন সরস্বতী, মহেশ্বর, বাসুদেব সার্বভৌম। সাংখ্যের প্রবর্তক বাঙালী কপিল। তাঁহার আশ্রম নাকি ছিল গঙ্গাসাগর-সঙ্গমে। পতঞ্জলির যোগদর্শন আর্য-সভ্যতার একটি বিশেষ দান। এই পথে বাঙালীর দানও কম নয়। আদিনাথ, মীননাথ, গোরক্ষনাথ, ময়নামতী, গোপীচাঁদ প্রভৃতি এই পথের গুরু। এই সব পথে বাংলা দেশ যোগমতেরও একটা বিশিষ্ট পথ নির্দেশ করিয়াছে। এ সব সত্ত্বেও বৈদিক আর্যসভ্যতা যেই অসাম্যনীতিদুষ্ট-দম্ভের প্রতীক হইয়া উঠিল, তখন বাংলা দেশ তাহাকে বর্জন করিতে ইতস্তত করিল না।

জৈন ও বৌদ্ধধর্মও ঠিক ওই কারণে বাংলায় টিকিল না। উক্ত দুই ধর্মের বীজ বাংলার উর্বর মৃত্তিকায় বিস্ময়কর ফসল ফলাইয়া গেল বটে, ইতিহাসে দেখিতে পাই সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের গুরু ভদ্রবাহু বাঙালী, মহাযান-আচার্য শান্তরক্ষিত বাঙালী, নালন্দার সর্বাধ্যক্ষ শীলভদ্র বাঙালী, তিব্বতের ধর্মগুরু দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অতীশ বাঙালী, চর্যাপদে ও দোহাকোষে বাঙালীর প্রতিভা দেদীপ্যমান, সে যুগের ভাস্কর্যে বাঙালী শিল্পীর দান ক্রমশ আবিষ্কৃত হইতেছে—তবু কিন্তু বৌদ্ধ রাজত্বকে বাংলা দেশ সহ্য করিল না তাহার

যথেচ্ছাচারের জন্য। তাহার শিল্পীমনই ইহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিল। শশাঙ্ক-প্রমুখ বুদ্ধবিদ্বেষী শক্তিশালী সম্রাটেরও উদ্ভব হইল এবং যে বঙ্গদেশ একদা সাম্যের আশায় বৌদ্ধধর্মকে বরণ করিয়াছিল সেই বঙ্গদেশই বৌদ্ধধর্মকেই সাম্যের পরিপন্থী এবং কুনীতির আকর বলিয়া বিদলিত করিতে লাগিল। অন্যায়কে, অসুন্দরকে, উন্নাসিক আধিপত্যকে বাঙালী কোনদিনই সহ্য করে নাই। এই আদর্শ-প্রীতির জন্য বাঙালী অনেক লাঞ্ছনা সহ্য করিয়াছে। বাধ্য বালকের মতো সেদিন বাঙালী যদি কোনও শক্তিশালী বৌদ্ধরাজার নিকট অবনতি স্বীকার করিত, তাহা হইলে পরবর্তী যুগে তাহাকে বোধ হয় একাধিক বৈপ্রান্তিক আক্রমণে বিব্রত হইতে হইত না, মাৎস্যন্যায়ের কবলেও পড়িতে হইত না। কিন্তু যাহার প্রতি শ্রদ্ধা নাই, বাঙালী তো কিছুতেই তাহার নিকট শির নত করে না, কিছুদিনের জন্য করিতে বাধ্য হইলেও অবশেষে সে যে সেই অবাঞ্ছনীয় শৃঙ্খল ছিন্ন করে ইতিহাসের ইহাই সাক্ষ্য। ইহাই বাঙালীর মজ্জাগত স্বভাব।

ইহার পরবর্তী যুগে বাংলার ইতিহাসে একটি বিস্ময়কর ঘটনা ঘটিয়াছে। খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতকের মাঝামাঝি বাঙালী সাধারণতন্ত্র বা রিপাবলিক স্থাপন করিয়াছে। মাৎস্যন্যায়ের পাশবিকতায় সমস্ত বাংলা দেশ যখন কিংকর্তব্য-বিমূঢ়, তখন সহসা বাঙালী-প্রতিভা যেন আত্ম-আবিষ্কার করিল। বাংলার সুবৃহৎ নায়কেরা এবং বাংলার প্রকৃতিপুঞ্জ একমত হইয়া গোপালদেবকে রাজপদে বরণ করিলেন, একটি কেন্দ্রীভূত শাসনপরিষদের সহায়তায় দেশের সুখশান্তি ফিরাইয়া আনিলেন, বহিঃশত্রুর প্রতিরোধ করিলেন। 'বাঙালীর ইতিহাস'-পুস্তকপ্রণেতা শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ডক্টর নীহাররঞ্জন রায় এই প্রসঙ্গে বলিতেছেন—"এই শুভবুদ্ধির ফলে বাংলাদেশ নৈরাজ্যের অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা এবং বৈদেশিক শত্রুর কাছে বারবার অপমানের হাত হইতে রক্ষা পাইল। শুধু বাংলার ইতিহাসে নয়, সমগ্র ভারতবর্ষের ইতিহাসেই এ ধরণের সামাজিক বুদ্ধি এবং রাষ্ট্রীয় চেতনার দৃষ্টান্ত বিরল। পালরাজাদের লিপিতে এবং সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিতে এই নির্বাচন কাহিনীর সংক্ষিপ্ত উল্লেখ আছে বটে, কিন্তু ভারতীয় সাহিত্যে কোথাও তাহা যথোচিত কীর্তন ও মর্যাদা লাভ করে নাই…।"

শূদ্র গোপালদেব যে পালবংশ স্থাপন করিয়াছিলেন তাহা একাদিক্রমে

সুদীর্ঘ চারিশত বৎসর রাজত্ব করিয়াছিল। পৃথিবীর আর কোথাও কোন একটি বংশ এত দীর্ঘকাল ধরিয়া রাজত্ব করে নাই। এই শূদ্রবংশের প্রভাবে বাংলা দেশ একসময় উত্তর-ভারতে সার্বভৌমত্ব করিয়াছে। এই বংশের দেবপালের সময় পালসাম্রাজ্যের খ্যাতি ও মর্যাদা ভারতবর্ষের বাহিরেও বিস্তৃত হইয়াছিল। যবদ্বীপ, সুমাত্রা এবং মলয় উপদ্বীপের অধিপতি যে দেবপালের নিকট দূত পাঠাইয়াছিলেন এবং নানারূপ ঘনিষ্ঠসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন, তাহার ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে। এই পালরাজাদের আমলেই শিল্পী ধীমান ও বিটপাল, শিল্পী মহিধর, শিল্পী কর্ণভদ্র, শিল্পী শশীদেব প্রভৃতির উদ্ভব হইয়াছিল। কিন্তু আলোর পর যেমন অন্ধকার আসে, এই গৌরবময় যুগের পর তেমনি লজ্জাকর যুগও আসিয়াছিল। মাৎস্যন্যায়ের যুগে স্ব স্ব প্রধান আত্মকর্তৃত্ব দেশকে যেমন উৎসন্নের পথে লইয়া গিয়াছিল, সেই আত্মকর্তৃত্বই আবার নানাভাবে আত্মপ্রকাশ করিল এবং পালরাজ্যের অধঃপতনের কারণ হইল। ব্যক্তিগত বা দলগত অহমিকার যূপকাষ্ঠে যখনই সত্য-শিব-সুন্দরের আদর্শকে বলি দেওয়া হইয়াছে তখনই বাঙালী ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে। জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত গোপালদেব যে পালবংশ স্থাপন করিয়াছিলেন, সেই পালবংশের বংশধরেরা যে বাঙালীর আদর্শবোধকে ক্ষুণ্ণ করিয়াছিলেন, তাহার ঐতিহাসিক প্রমাণ মহীপালের সময় উত্তরবঙ্গে কৈবর্ত-বিদ্রোহ। অল্পস্বল্প বিদ্রোহ নয়, দুই পুরুষ ধরিয়া সশস্ত্র বিদ্রোহ, উদ্দেশ্য—পুনরায় স্বাধীন রাষ্ট্র সংস্থাপন করা। এই বিদ্রোহ করিয়া কিন্তু বাঙালী অভিজাতদের দমন করিতে পারেন নাই, প্রকৃতিপুঞ্জ-নির্বাচিত রাজাও আর বাংলার সিংহাসনে বসিবার সুযোগ পান নাই। ইহার পর আমরা রাজত্ব করিতে দেখি বর্মবংশকে। অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন যে, বর্মবংশ হয় পাঞ্জাব না হয় উৎকল হইতে আসিয়াছিলেন। কিছুই আশ্চর্য নয়। বাহির হইতে সমাগত (হয়তো বাঙালীদের দ্বারা আনীত) রাজবংশের কর্তৃত্ব বাঙালী একাধিকবার সহ্য করিয়াছে, কিন্তু অধঃপতিত নিজের লোকের প্রভুত্ব সে স্বীকার করে নাই। স্বজাতি-প্রীতি অপেক্ষা আদর্শ-প্রীতি, শিল্প-প্রীতি তাহার চরিত্রে প্রবলতর। ইহার পরবর্তী সেনরাজগণও বাঙালী নহেন। তাঁহাদের আদিপুরুষ নাকি সুদূর দক্ষিণ-ভারতের কর্ণাটকদেশবাসী ছিলেন। এই সেনরাজারা বাঙালী পালবংশকে সম্পূর্ণরূপে বিতাড়িত করিয়া বাংলা

দেশের একচ্ছত্র রাজা হইয়া বসিয়াছিলেন। বাঙালী বহুকাল ধরিয়া সে প্রভুত্ব সহ্যও করিয়াছিল। এই সকল ঐতিহাসিক ঘটনা হইতে এই কথাই মনে হয় যে, আদর্শবাদী বাঙালী জীবনের ও সমাজের উচ্চ আদর্শ রক্ষার জন্য সর্বস্ব পণ করিতে পারে, এবং সে আদর্শের মূল সুর সাম্য ও শিল্পবোধ। অশিল্পী বর্বর অসাম্যবাদী দাম্ভিক ব্যক্তি যদি তাহার আপনজনও হয়, তাহাকে বিষবৎ ত্যাগ করিতে বাঙালী কোনদিন দ্বিধা করে নাই। প্রাণধর্মী শিল্প-সঙ্গত আদর্শই তাহার অন্তরের বস্তু। অতি বিশুদ্ধ কাঠখোট্টা আদর্শও সে বরদাস্ত করিতে পারে না, তাহার সাম্যবোধ পাউণ্ড শিলিং পেন্সের মানদণ্ডে নির্ণীত নহে, তাহার আদর্শের মাপকাঠি আছে তাহার প্রাণধর্মী শিল্পচেতনায়। এই আদর্শই তাহার সব। দেশপ্রেম যতক্ষণ তাহার এই আদর্শনিষ্ঠার সঙ্গে খাপ খায় ততক্ষণ সে দেশপ্রেমিক, রাজা যতক্ষণ তাহার আদর্শে আঘাত না করে ততক্ষণ সে রাজভক্ত, দেশের প্রচলিত ধর্ম যতক্ষণ তাহার আদর্শকে ক্ষুণ্ণ না করে ততক্ষণ সে ধার্মিক। কিন্তু আদর্শে ঘা লাগিলেই বাঙালী বিদ্রোহী। দেশ ধর্ম আত্মীয়স্বজন কেহই তখন তাহার আপন নয়, যে তাহার আদর্শকে রক্ষা করিবে সেই তখন তাহার সর্বাপেক্ষা প্রিয়জন, সে ব্যক্তি স্বদেশী বিদেশী বৈদিক বৌদ্ধ যে-ই হোক তাহাতে কিছুই আসে-যায় না, বাঙালী তাহাকেই অন্তরের বেদীতে বসাইয়া পূজা করিবে। বাঙালী-চরিত্রের এই আদর্শপ্রিয়তার সুযোগ লইয়া বহু বিদেশী বাংলা দেশে আসিয়া আসর জমাইতে সমর্থ হইয়াছে।

পালরাজাগণ—যাঁহাদের বিরুদ্ধে উত্তরবঙ্গে কৈবর্তগণ বিদ্রোহ করিয়াছিলেন—সকলেই বৌদ্ধ ছিলেন। তাই বোধ হয় নির্যাতিত অধঃপতিত বাংলার জনসাধারণ মুক্তির আশায় বৌদ্ধধর্মবিরোধী ব্রাহ্মণ্যবাদী সেনরাজগণকে বরণ করিয়া লইয়াছিল। নির্যাতন কিন্তু কমিল না। কারণ, সেনরাজগণ নির্মমভাবে বৌদ্ধদলন আরম্ভ করিলেন। অর্থাৎ দরিদ্র জনসাধারণকেই পীড়ন করিতে লাগিলেন। কারণ, বর্ণাশ্রম-ধর্মী বৈদিক আর্যসভ্যতায় যাহাদের গৌরবের স্থান ছিল না, যাহারা অনার্য, শূদ্র, দাস প্রভৃতি অপমানজনক আখ্যালাভ করিয়া সমাজের নিম্নস্তরে হীন জীবনযাপন করিতেছিল তাহারাই একদা বৌদ্ধ হইয়াছিল। সেনরাজগণের বৈদিক শাসন ইহাদিগকেই নির্মমভাবে পেষণ করিতে লাগিল। অর্থাৎ বৌদ্ধ

অভিজাতসম্প্রদায়ের কবল হইতে পরিত্রাণের আশায় বাংলার জনসাধারণ বৈদিক রাজার আধিপত্য স্বীকার করিল, মানে, তপ্ত কটাহ হইতে আগুনে ঝাঁপাইয়া পড়িল। কিছুকাল পেষণ চলিল। বৌদ্ধ ও বৈদিক ধর্মের সংঘর্ষে, অভিজাত সম্প্রদায়ের অবিচার-অত্যাচারে যখন ঘরে-বাহিরে কোথাও শান্তি রহিল না তখন ভারতবর্ষের বাহির হইতে আসিল মুসলমান। ভারতের পশ্চিম-সীমান্তে আগেই তাহারা হানা দিয়াছিল এবং ক্রমশ অগ্রসর হইতেছিল বঙ্গ-বিহারের দিকে। ঐতিহাসিকগণ বলেন, উত্তর-প্রদেশের গাহড়বাল রাজন্যশক্তিই নাকি মুসলমানদের অগ্রগতি রোধ করিয়া রাখিয়াছিল; কিন্তু লক্ষ্মণসেন মগধ জয় করিয়া এবং প্রয়াগ পর্যন্ত সমরাভিযান করিয়া উক্ত গাহড়বাল রাজন্যবর্গকে দুর্বল করিয়া দেন। প্রতিরোধকারীরা যখন দুর্বল হইয়া গেল তখন মুহম্মদ বখ্‌তিয়ার খিলিজি বিনা বাধায় বিহার ও বঙ্গ জয় করিয়া ফেলিলেন। লক্ষ্মণসেন তাঁহাকে বাধা দিতে পারিলেন না। জরার সঙ্গে যৌবনের যুদ্ধে জরাকেই হার মানিতে হয়। বাংলা দেশের রাজতন্ত্র তখন মৃতপ্রায়, লক্ষ্মণসেনের স্বপক্ষে জনসাধারণের আনুকূল্যও ছিল না, আত্মকর্তৃত্বের বল্মীক সিংহাসনের ভিত্তিকেও জীর্ণ করিয়া ফেলিয়াছিল। শোনা যায়, অশ্ববিক্রেতার ছদ্মবেশে মাত্র সতের জন অশ্বারোহী লইয়া বখ্‌তিয়ার খিলিজি লক্ষ্মণসেনের রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করেন। পলায়ন করা ছাড়া লক্ষ্মণসেনের গত্যন্তর ছিল না।

বঙ্গদেশে মুসলমান আসিল এবং এমন একটা সাম্যের আদর্শ লইয়া আসিল যাহা বিস্ময়কর, যাহার নিকট ব্রাহ্মণ, বৌদ্ধ, শূদ্র সকলেই সমান, যাহার চক্ষে স্পেনের মুসলমান এবং বাংলার মুসলমান একজাতি, আরবের মুসলমান এবং চীনের মুসলমানে কোনও তফাত নাই; যে ধর্ম ভৃত্যকে প্রভুর সহিত একাসনে বসিয়া এক পাত্র হইতে অন্নগ্রহণ করিতেও বাধা দেয় না, যে ধর্ম ক্রীতদাসকেও প্রভুকন্যার পাণিপীড়নে অনুমতি দেয়। বাঙালীর অন্তর উদ্বুদ্ধ হইল। ইসলাম-সভ্যতার শিল্প-শ্রীও তাহাকে কম মুগ্ধ করিল না। তাহাদের সদর ও অন্দরের নবাবী বৈশিষ্ট্য, তাহাদের সুমার্জিত সুমিষ্ট ভাষা, এক কথায় তাহাদের ইসলামী চালচলন বাঙালীর শিল্পীমনকে যে নাড়া দিয়াছিল তাহার প্রমাণ তাহার সাহিত্যে শিল্পে ভাষায় আজও

জাজ্বল্যমান। বাঙালী কবি অশ্বারোহী মুসলমানকে ত্রাণকর্তা কল্কি অবতার বলিয়া বন্দনাই করিয়া বসিলেন।

নির্যাতিত বৌদ্ধগণ দলে দলে মুসলমান হইতে লাগিল, রাজধর্ম বলিয়া অনেক অভিজাত শ্রেণীর লোক মুসলমান হইতে লাগিল। হয়তো সমস্ত দেশই মুসলমান হইয়া যাইত, যদি না পুনরায় বাঙালীপ্রতিভা তাহাতে বাধা দিত। বাঙালীর ইহাও একটি বৈশিষ্ট্য। বাঙালী নূতন আদর্শে মুগ্ধ হইয়া অগ্রপশ্চাৎ না ভাবিয়া তাহাকে সোৎসাহে গ্রহণ করে, কিন্তু যখনই সে আদর্শের গলদ ধরা পড়ে, অমনই তাহার প্রতিক্রিয়াশীল প্রতিভা নূতন পথের সন্ধান করিতে থাকে এবং এমন একটা পথ বাহির করে যাহা বাঙালী প্রতিভারই উপযুক্ত। পাঠান-শাসনের প্রবল প্রতিবাদ দুইজন বাঙালী-বীরের কীর্তিতে অমর হইয়া আছে। একজন রাজা গণেশ, দ্বিতীয়জন দনুজমর্দনদেব। ইঁহারা সম্মুখ-সমরে দুর্ধর্ষ পাঠান রাজাদের পরাভূত করিয়া তাহাদের সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন। কিন্তু চিন্তার ক্ষেত্রে, ভাবের ক্ষেত্রে, উচ্চকোটি-মানবতার ক্ষেত্রে বাঙালী-মনীষা সে সময় যে দিব্য প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিল তাহা আরও বিস্ময়কর, তাহা সত্যই যুগান্তরকারী। এক দিকে আগমবাগীশ প্রভৃতি তান্ত্রিক ব্রাহ্মণের দল বাঙালীর রক্ষণশীল মনের উপযোগী আন্দোলন করিতে লাগিলেন, অন্য দিকে অদ্বৈত আচার্য, নিত্যানন্দ ও চৈতন্যদেব এমন একটা মধুর প্রেমের ধর্মপ্রচার করিলেন যাহার অবাধ উদারতা, যাহার মর্মস্পর্শী প্রেমময় আবেদন, সাম্যবাদী রসপিপাসু বাঙালী-সমাজে যুগান্তর আনয়ন করিল। বিনা রক্তপাতে একটা বিরাট রাজনৈতিক বিদ্রোহ হইয়া গেল। বৈদিক, বৌদ্ধ, মুসলমান, ধনী-দরিদ্র উচ্চ-নীচ উন্নত-পতিত আচণ্ডালব্রাহ্মণ সকলকেই প্রেমানন্দে আলিঙ্গন করিয়া বাঙালী-প্রতিভা যেন চরিতার্থ হইল। বৈষ্ণবধর্ম স্রোতের মুখ ফিরাইয়া দিল। ইসলাম ধর্মের সাম্য-মোহ বাঙালীকে আর আচ্ছন্ন করিয়া রাখিতে পারিল না। বরং অবশেষে সেই পুরাতন সত্যই সে পুনরায় আবিষ্কার করিল যে হিন্দু ও বৌদ্ধ রাজাগণের ন্যায় মুসলমানেরাও রাজা, সাম্যের মহিমা প্রচার করিবার জন্য তাঁহারা বঙ্গদেশে আসেন নাই, আসিয়াছেন প্রবলপ্রতাপে রাজত্ব করিবার জন্য। অর্থাৎ আর একটা সমস্যা বাড়িল, হিন্দু-মুসলমান-সমস্যা। মুসলমান-রাজাকে সিংহাসনচ্যুত করিবার জন্য হিন্দু-মুসলমানের

ষড়যন্ত্র এবং সেই ষড়যন্ত্রকে বিফল করিয়া দিবার জন্য ও ষড়যন্ত্রকারীদের শাসন করিবার জন্য মুসলমান-রাজাদের নানাবিধ প্রচেষ্টা—ইহাই হইল সংক্ষেপে তখনকার রাজনীতি।

মুসলমানদের অত্যাচারে অবশেষে ভদ্র বাঙালীর মানসম্ভ্রম রক্ষা করাই দুরূহ হইয়া পড়িল। নিরুপায় বাঙালী অবশেষে তাহাই করিল, যাহা সে চিরকাল করিয়াছে। বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজদ্দৌলার ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া পলাশীর যুদ্ধাঙ্গনে বাঙালী তাহাকে যে শিক্ষা দিল তাহা ঐতিহাসিক পুনরাবৃত্তিরই নিদর্শন এবং অতিশয় মর্মান্তিক।

একটি প্রশ্ন স্বতঃই মনে জাগে। শত্রুকে উচ্ছেদ করিবার জন্য বাঙালী বারম্বার বাহিরের লোক ডাকিয়া আনিয়াছে কেন? এই সেদিনও তো নেতাজী জাপানের সাহায্য লইতে গিয়াছিলেন। বাঙালীর নিজের কি শক্তি নাই?

ইহার উত্তরে প্রথমেই একটা কথা বলা আবশ্যক। বাহির হইতে শক্তিশালী লোককে আহ্বান করিয়া অত্যাচারী গৃহশত্রুকে উচ্ছেদ কেবল বাঙালীই করে নাই, আরও অনেক জাতি করিয়াছে। ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্মানি, ইটালি প্রভৃতির জাতীয় ইতিহাসে ইহার একাধিক সাক্ষ্য বর্তমান; ইহা রাজনীতিরই একটা অঙ্গ। ইহাকে যদি কলঙ্কই বলিতে হয় তাহা হইলে ইহা সমগ্র সভ্যজাতির কলঙ্ক, একা বাঙালীর নহে। কারণ পৃথিবীর কোন সভ্যজাতিই তাহার আদিম রূপ বজায় রাখিতে পারে নাই, অধিকতর শক্তিশালী জাতির সংমিশ্রণ অল্পবিস্তর সকলের মধ্যেই অনিবার্যভাবে ঘটিয়াছে এবং সে সংমিশ্রণের ইতিহাস বাঙালী জাতির ইতিহাসের ভিন্ন সংস্করণ মাত্র।

তবে এ প্রসঙ্গে একটা কথা বলিবার আছে। যদিও পৌরাণিক গল্পে আমরা দেখিতে পাই যে, দ্বারকাপতি শ্রীকৃষ্ণের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছেন বঙ্গ তাম্রলিপ্ত এবং পৌণ্ড্ররাজেরা, যদিও রাজা যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধযজ্ঞের ঘোড়া ধরিয়াছিলেন বাঙালী তাম্রধ্বজ, ভীমের দিগ্বিজয়ে বাধা দিয়াছিলেন বাঙালীরা, অর্জুনকেও সম্মুখসমরে আহ্বান করিয়াছিলেন বাঙালীরা, এবং এ সবের বহু পূর্বে দশাননজয়ী রামচন্দ্রের প্রপিতামহের সঙ্গেও যদিও বাঙালী বীরেরা চতুরঙ্গ সেনা সাজাইয়া শক্তি-পরীক্ষায় অগ্রসর হইয়াছিলেন,

ইতিহাসে যদিও আমরা গঙ্গা-রাঢ়ীদের বিবরণ, কৈবর্ত-বিদ্রোহ, বিজয়সিংহ, শশাঙ্ক, ধর্মপাল, দেবপাল, রাজা গণেশ, দনুজমর্দনদেব, কেদাররায়, চাঁদরায়, প্রতাপাদিত্য, সীতারাম, বাংলার লাঠিয়াল প্রভৃতির বীরত্ব-কাহিনী পাঠ করি, যদিও আধুনিক যুগের অরবিন্দ, বারীন, ক্ষুদিরাম, কানাইলাল, বাঘা যতীন, রাসবিহারী, বিনয় বোস, সূর্য সেন, প্রভৃতি বাঙালী বীরেরা বাংলার স্বাধীনতা-সংগ্রামের অগ্রণী নেতারূপে জ্যোতির্ময় গৌরবে ইতিহাসের পৃষ্ঠায় দেদীপ্যমান, আমাদের নেতাজী যদিও এই সেদিন অদ্ভুত সাহস কৌশল ও বীর্যবলে সম্মুখসমরে শত্রুকে পরাজিত করিয়া বাহুবলে-অর্জিত স্বাধীন ভারতভূমিতে প্রথম স্বাধীনতার পতাকা প্রোথিত করিয়া গিয়াছেন, যদিও এই কিছুদিন আগেই কাশ্মীর-রণাঙ্গন হইতেও বাঙালী বীর রঞ্জিৎ রায়ের কীর্তি চতুর্দিকে বিঘোষিত হইয়াছে, তবু কিন্তু এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে যে পেশীতান্ত্রিক সমরপ্রতিভা বাঙালীর বৈশিষ্ট্য নহে। বাঙালী যুগে যুগে বিদ্রোহ করিয়াছে সত্য, কিন্তু সে বিদ্রোহ মনোজগতের বিদ্রোহ, মারামারি কাটাকাটি নহে। যখনই মারামারি-কাটাকাটির প্রয়োজন ঘটিয়াছে, বাহির হইতে পালোয়ান জুটিয়াছে এবং বাঙালী-বুদ্ধি তাহাকে কাজে লাগাইয়াছে। বাঙালীর এই সমরবিমুখতার কারণ বঙ্গদেশের প্রকৃতি। যে দেশে প্রভূত পরিশ্রম না করিলে খাদ্যদ্রব্য উৎপন্ন হয় না, লুণ্ঠন করিয়া না আনিলে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করা যায় না, যে দেশের প্রকৃতি এত বিরূপ যে অহরহ শারীরিক পরিশ্রম না করিলে রক্তস্রোতই সচল থাকে না, অর্থাৎ যে দেশে নিছক জীবনযাপন করিবার জন্যই অবিরাম পেশী-সঞ্চালন করিতে হয় (এবং সেই জন্যই যে দেশের দর্শন উদার নয়, উদরকেন্দ্রিক) সেই দেশেই পেশীশক্তিশালী পরস্বাপহারী সামরিক জাতি জন্মগ্রহণ করে। প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসারেই এ সব হয়। শস্যশ্যামল বঙ্গভূমিতে এ রকম বীর জন্মিবে কেন? যে দেশের গাছে গাছে ফল, মাঠে মাঠে ফসল, যে দেশের গঙ্গায় ব্রহ্মপুত্রে, যে দেশের ইচ্ছামতী-ময়ূরাক্ষী-কপোতাক্ষে, যে দেশের চূর্ণী-রূপনারায়ণ-দ্বারকেশ্বরে, সুবর্ণরেখায়-কংসাবতীতে, দামোদরে অজয়ে জলাঙ্গীতে, মহানন্দায় পদ্মায় মেঘনায় বিগলিত পর্বতের প্রসাদলীলা তরঙ্গে তরঙ্গে উচ্ছলিত, ঋতুতে ঋতুতে যে দেশের আকাশে সূর্য-চন্দ্র-নক্ষত্রের দীপালী, মেঘমহিমার মহোৎসব, সে

দেশের লোক স্বপ্ন দেখিবে, দার্শনিক হইবে, কাব্য লিখিবে, আদর্শ সৃষ্টি করিবে। শখের জন্য বা সামরিক আদর্শে উবুদ্ধ হইয়া পেশীচর্চা করিলেও পেশীচর্চাই তাহার জীবনের বৈশিষ্ট্য হইতে পারে না। যে দেশ বেদ-উপনিষদের মন্ত্রে মুগ্ধ হইয়াছে, বুদ্ধের অভিনব দর্শনে উদ্বুদ্ধ হইয়াছে, চৈতন্যের প্রেমের ধর্মে অবগাহন করিয়াছে, সে দেশে কি বর্বরমনোবৃত্তি-সৈনিকের উদ্ভব হইতে পারে? স্বাভাবিক নিয়মেই পারে না। তাই বাঙালীর শৌর্য চিন্তায়, পেশীতে নহে। তাহার সাম্য-অনুসন্ধিৎসু মন তাই বারম্বার বহিরাগত বিদেশীর সাহায্য লইয়া অন্তর্দ্বন্দ্বের সমাধান করিয়াছে। বহিরাগত সভ্যতাকে সে গ্রহণ করিয়াছে বটে, কিন্তু সে সভ্যতার কাছে সে নির্বিচারে আত্মসমর্পণ করে নাই।

পাশ্চাত্য সভ্যতার বাহন হইয়া অধঃপতিতকে উদ্ধার করিবার সাধু মনোভাব লইয়া সাম্যের ও ন্যায়ের ছদ্মবেশ পরিধান করত ইংরেজ-বণিক বঙ্গে পদার্পণ করিলেন। নূতন কিছু দেখিলেই বাঙালী আত্মহারা হইয়া পড়ে। দেখিতে দেখিতে বাঙালী ভাবে, ভাষায়, আচারে, ব্যবহারে পাকা সাহেব হইয়া উঠিল। সেকালের ইয়ং-বেঙ্গলদের মতো পাকা সাহেবী-মনোভাবাপন্ন লোক ভারতবর্ষের অন্যত্র তো নহেই, ইংলণ্ড ছাড়া পৃথিবীর অন্যত্র ছিল কি না সন্দেহ। কিন্তু সাহেবীয়ানার মধ্যেও খাদ ছিল, হিন্দুধর্মের খাদ এবং নবাবী আমলের খাদ। স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর একটি প্রবন্ধে ইহার স্বরূপ চমৎকার ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। তাঁহার কথাগুলি উদ্ধৃত করিতেছি:—"ইংরেজি আমলের অনতিপূর্বে নবদ্বীপের হিন্দুধর্ম এবং মুরশিদাবাদের নবাবী আমলের রীতিনীতি উভয়ে বিবাহপাশে বাঁধা পড়িয়া বঙ্গদেশে নূতন এক সভ্যতার জন্মদান করিয়াছিল; সে সভ্যতার প্রধান আড্ডা ছিল কৃষ্ণনগর এবং তাহার প্রধান নায়ক ছিলেন রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়; সেই হিন্দুসভ্যতা আমাদের পিতামহদিগের সময়ে যৌবনে পদনিক্ষেপ করিয়া কলিকাতায় কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইল ও রাজা রামমোহন রায়কে আপনার অধিনায়ক পদে বরণ করিল। পরিশেষে রাজা রামমোহন রায় উদ্যোগী হইয়া সেই নবাবী হিন্দুসভ্যতাকে জ্ঞানোজ্জ্বল ইংরেজি সভ্যতার সহিত বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করিলেন, নব্যবঙ্গ সেই বিবাহের শুভফল।"

মুসলমান-রাজত্বের শেষ দিকে, ইংরেজ আসিবার কিছু আগে পর্যন্ত

বাঙালী-প্রতিভা যেন নিষ্প্রভ হইয়া গিয়াছিল। একটা অত্যুর্বর জমি চাষের অভাবে যেন পতিত হইয়া পড়িয়া ছিল। পাশ্চাত্য-সভ্যতার বীজ পড়িয়া সে জমিতে সোনার ফসল ফলিয়া উঠিল। ইংরেজ-প্রবর্তিত শিক্ষার মাধ্যমে বাঙালীর মনীষা সর্ববিভাগে ভারতের শীর্ষস্থান অলঙ্কৃত করিল। ভারতবর্ষের নবজাগরণের উষালগ্নে বাঙালী প্রতিভার সূর্য দশ দিক উদ্ভাসিত করিয়া দিল। মাত্র কয়েকটি নাম করিতেছি। ভারতবর্ষে কংগ্রেসের প্রথম প্রেসিডেন্ট—উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রথম গভর্নর সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ, প্রথম আই. সি. এস. সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রথম নোবেল পুরস্কার পাইলেন—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ইউরোপে প্রথম ভারতীয় মনীষী—রাজা রামমোহন রায়, প্রথম হাইকমিশনার অতুল চ্যাটার্জি, প্রথম কর্নেল সুরেশ বিশ্বাস, প্রথম শব-ব্যবচ্ছেদক মধুসূদন গুপ্ত, প্রথম ব্যারিস্টার জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রথম বৈমানিক ইন্দ্রলাল রায়, প্রথম সার্জন-জেনারেল মন্মথনাথ চৌধুরী, প্রথম চীফ জাস্টিস রমেশচন্দ্র মিত্র, প্রথম র‍্যাংলার আনন্দমোহন বসু, প্রথম হাইকোর্টের জজ রমাপ্রসাদ রায়, কংগ্রেসের প্রথম মহিলা প্রেসিডেন্ট সরোজিনী নাইডু, ভারতীয় চিত্রশিল্পের ধারা পুনঃপ্রবর্তক অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রথম 'সত্যাগ্রহ' বাংলার নীলকরদের বিরুদ্ধে জনগণের আন্দোলন, অনশনে প্রাণ বিসর্জন করিলেন যতীন দাস, ইংরেজী ভাষায় প্রথম ভারতীয় মহিলা কবি তরু দত্ত, লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভারতীয় ডি. এস-সি, জগদীশচন্দ্র বসু, প্রথম লর্ড ও আইন-সচিব সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ, আই. সি. এস. পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন প্রথম সার্ অতুল চ্যাটার্জি, সাংবাদিকতার জনক হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, প্রথম ভাইসচ্যান্সেলার হন গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রথম ইঞ্জিনিয়ার নীলমণি মিত্র, প্রথম মহিলা গ্রাজুয়েট কাদম্বিনী গাঙ্গুলী ও চন্দ্রমুখী বসু, প্রথম মহিলা এম. বি. ভার্জিনিয়া মেরী মি-, আমেরিকায় বেদান্তধর্মের প্রথম প্রচারক স্বামী বিবেকানন্দ, মাউণ্ট এভারেস্ট আবিষ্কারক রাধানাথ সিকদার। ইউরোপে প্রাচ্য-নৃত্যের প্রথম জনপ্রিয় প্রদর্শক—উদয়শঙ্কর, আমেরিকায় জনপ্রিয় প্রথম ভারতীয় নট—শিশির ভাদুড়ী। আরও কত আছে।

অতি অল্পকালের মধ্যে জাতীয় জীবনের সর্ববিভাগে প্রতিভার এমন বিস্ময়কর আবির্ভাব আর বোধ হয় কোথাও ঘটে নাই।

ইংরেজী সভ্যতার তীব্র স্রোতে ভাসিয়াও বাঙালী কিন্তু আত্মসম্মান

হারাইয়া আদর্শভ্রষ্ট হয় নাই। সে যুগের বিখ্যাত ব্যক্তিগণের জীবন আলোচনা করিলেই ইহা স্পষ্ট বোঝা যায়। রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন খ্রীষ্টান হইয়াও বাঙালীত্ব বজায় রাখিলেন, রসিককৃষ্ণ, রামগোপাল, রাধানাথ, রামতনু সমাজ-বিদ্রোহী হইয়াও মনে প্রাণে স্বদেশী রহিলেন, মাইকেল মধুসূদন হোমার-মিল্‌টনের ভজনা করিয়া অবশেষে 'ব্রজাঙ্গনা' 'বীরাঙ্গনা' লিখিলেন, রামমোহন রায় সাহেবদের অধীনে দেওয়ানী করিয়াও খ্রীষ্টধর্মের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া খ্রীষ্টধর্মমুখী বাঙালী-চিত্তকে স্বগৃহে ফিরাইয়া আনিবার প্রয়াস পাইলেন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কট্‌কি চটি, থান ও চাদর পরিয়া লাট-সাহেবের প্রাসাদ পর্যন্ত বিচরণ করিলেন, বঙ্কিমচন্দ্র ইংরেজের অধীনে ডেপুটিগিরি করিতে করিতে 'আনন্দমঠ' লিখিলেন, নবীনচন্দ্র লিখিলেন 'পলাশীর যুদ্ধ,' হেমচন্দ্র গাহিলেন "ভারতসঙ্গীত," ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত নাস্তিক-প্রকৃতির নরেন্দ্রনাথ দত্ত শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া বিবেকানন্দ হইলেন, ব্রাহ্মধর্মের গণ্ডিকে সমস্ত বিশ্বে প্রসারিত করিয়া বাঙালী কেশবচন্দ্র সবধর্মসমন্বয়ের বিরাট পরিকল্পনা করিলেন, বাঙালীর কবি রবীন্দ্রনাথ সমস্ত বিশ্ব পরিভ্রমণ করিয়া বাংলার পল্লীপ্রান্তে আসিয়া বিশ্বভারতীর আসন পাতিলেন, বিলাতফেরত ব্যারিস্টার চিত্তরঞ্জন বৈষ্ণব-সন্ন্যাসীর প্রেম-বৈরাগ্যভরে ঐশ্বর্যের শিখর হইতে দেশের ধূলিতে নামিয়া আসিতে পারিলেন, ইংরেজের প্রভুত্ব-প্রতীক লোভনীয় আই. সি. এস. চাকরির মোহ ত্যাগ করিয়া সুভাষচন্দ্র স্বদেশের জন্য কারাবরণ করিতে ইতস্তত করিলেন না।

আদর্শবাদী বাঙালী কোনও সভ্যতার সংঘাতেই আদর্শচ্যুত হয় নাই; আদর্শের জন্য সে সব করিতে পারে। কেবল অসাম্য ও সঙ্কীর্ণতা সে সহ্য করিতে পারে না।

একটা কথা প্রায়ই অনেকের মুখে শুনিতে পাই, বাঙালীর নাকি সর্বভারতীয় দৃষ্টি নাই, তাহার মনোভাব নাকি বড় বেশি প্রাদেশিক, তাহার নিখিল-ভারতীয় প্রেম শিক্ষা করা উচিত। ইহা যেন জননীকে অপত্য-স্নেহ শিক্ষা দেওয়া।

ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়ের বিখ্যাত গ্রন্থ 'বাঙালীর ইতিহাস' হইতে উদ্ধৃত করিতেছি :—"শুধু রাষ্ট্রীয় সম্বন্ধ আশ্রয় করিয়াই নয়, ব্যবসা বাণিজ্য এবং

র্য ও সংস্কৃতিগত সম্বন্ধ আশ্রয় করিয়াও বাংলাদেশ নিখিল ভারতের সঙ্গে নিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করিয়া চলিত—কাশ্মীর হইতে সিংহল এবং গুজরাট হইতে কামরূপ পর্যন্ত। ভারতবর্ষের বাহিরে—তিব্বতে ব্রহ্মদেশে সুবর্ণদ্বীপে, পূর্বদক্ষিণ সমুদ্রশায়ী অন্যান্য দেশ ও দ্বীপগুলিতেও তাহার যোগাযোগ নানাসূত্রে বিস্তার লাভ করিয়াছিল। কাজেই প্রান্তীয় দেশ বলিয়া বাংলাদেশ শুধু তাহার পুকুর পাড়ে বটের ছায়ে ঘরের দাওয়ায় বসিয়া নিজের ক্ষুদ্র সুখ দুঃখ লইয়া একান্ত আত্মকেন্দ্রিক জীবন যাপন করিত এমন মনে করিবার কারণ নাই…।"

ইহা গেল প্রাচীন বাংলার কথা। মাঝে কিছুদিন—সেন-পর্বের শেষভাগে সে হয়তো কিছুটা আত্মকেন্দ্রিক হইয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু তাহার পরেই আবার দেখি তাহার চৈতন্য প্রেমবাহু বিস্তার করিয়া সমগ্র মানব-জাতিকেই আলিঙ্গন করিতে উদ্যত। বাংলার চণ্ডীদাস গান করিয়াছেন, "সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।"

আধুনিক যুগের ইতিহাস তো সকলেরই সুবিদিত। কংগ্রেস হইবার বহু পূর্বে ইংরেজের বিরুদ্ধে আন্দোলনকে নিখিল-ভারতীয় প্রতিভার সংস্পর্শে আনিবার জন্য সারা ভারত ভ্রমণ করিয়াছিলেন বাঙালী সুরেন্দ্রনাথই। বাঙালীর প্রতিষ্ঠিত কংগ্রেস-প্রতিষ্ঠানে সর্বভারতীয় বিদ্বৎসমাজকে বাঙালীই আমন্ত্রণ করিয়াছিল। এবং সেইজন্যই বাঙালীর উপরই ইংরেজের রাগ সর্বাধিক। ইংরেজ জানিত যে, বাঙালীই তাহার একমাত্র শত্রু, ইংরেজ-সাম্রাজ্যের বনিয়াদে ফাটল ধরাইয়াছে বাঙালীই। তাই বাঙালীকে জব্দ করিবার আয়োজন সে বরাবর করিয়াছে এবং ভারত ত্যাগ করিবার পূর্বে ভালভাবেই করিয়া গিয়াছে। আজ আমরা যে দুর্দশা ভোগ করিতেছি, ইংরেজের বিরাগ তাহার অন্যতম কারণ। অগ্নিযুগের বোমা-বিস্ফোরণ এবং তৎপরবর্তী যুগের স্বদেশী-আন্দোলন যে শুধু ইংরেজ সাম্রাজ্যের বনিয়াদকে কাঁপাইয়া দিয়াছিল তাহা নয়, মধ্যবিত্ত বাঙালীর সুখের ঘরেও আগুন ধরাইয়া দিয়াছিল। লর্ড কার্জন বাঙালীর মেরুদণ্ড ভাঙিয়া দিবার জন্য বঙ্গবিভাগ করিয়াছিলেন, কারণ তিনি বুঝিয়াছিলেন যে বাঙালীরাই ইংরেজের একমাত্র শত্রু। তাই বাঙালীকে হীনবল করিবার জন্য হিন্দু-মুসলমান-বিরোধের বীজ তখনই তিনি বপন করিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার

সে চেষ্টা তখন সফল হয় নাই, এখন হইয়াছে। এক আদর্শভ্রষ্ট স্বাধীনতা লাভ করিবার জন্য জনকয়েক নেতা আজ পাঞ্জাব ও বঙ্গকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া দিয়াছেন, মহাত্মা গান্ধীর বারণও শোনেন নাই। এই স্বাধীনতার জন্য বাঙালী একদিন রক্তপাত করিয়াছিল, আজও তাহার রক্তমোক্ষণ চলিতেছে। বস্তুত বাঙালী যেদিন হইতে সর্বভারতীয় স্বাধীনতার জন্য জীবনপণ করিয়াছে, সেদিন হইতেই তাহার দুর্দশার আরম্ভ। তাহার পরই ভারতের রাজধানী কলিকাতা হইতে দিল্লীতে স্থানান্তরিত হইয়াছে, র‍্যাম্জে ম্যাকডোনাল্ড কমিউন্যাল অ্যাওয়ার্ড কায়েম করিয়াছেন, আইনের পর আইন প্রণীত হইয়াছে বাঙালী-দলনের জন্য। বেহার ফর বেহারীজ, আসাম ফর আসামীজ প্রভৃতি প্রাদেশিক বুলিও শোনা গিয়াছে বাঙালীর স্বদেশী-আন্দোলনব্রত গ্রহণ করিবার পর হইতে। এখনও শোনা যাইতেছে। ইংরেজের আমলে তবু খানিকটা ন্যায়বিচার ছিল, গুণের আদর ছিল, এখন যেন তাহাও নাই। প্রাদেশিক ভিত্তিতে প্রদেশ গঠনের ফলে আমরা ক্রমশ উগ্রভাবে প্রাদেশিক হইয়া উঠিতেছি, বাহিরে একটা সাম্যের ঢং বজায় আছে বটে কিন্তু তাহা যে একটা রঙ্গমঞ্চীয় প্রসাধন মাত্র—বুদ্ধিমান ব্যক্তির নিকট তাহা একটুও অগোচর নাই। প্রাচীনকালে ভারতবর্ষ, আর্যাবর্ত, মগধ, গৌড়, পুণ্ড্র, কলিঙ্গ, সমতট, প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর, বঙ্গাল, চোল, রাষ্ট্রকূট প্রভৃতি নানা রাষ্ট্রে বিভক্ত ছিল, এবং সুযোগ পাইলেই তাহারা পরস্পরকে আক্রমণ করিত। আমাদের অতি-আধুনিক ভারতীয় রাষ্ট্রও নানা প্রদেশে বিভক্ত, তাঁহারা খোলাখুলিভাবে পরস্পরকে আক্রমণ না করিলেও মনে মনে এবং মাঝে মাঝে ফতোয়া জারি করিয়া পরস্পরকে আক্রমণ করিতেছেন। আমার মনে হয় পাকিস্তানের বীজ যেন প্রত্যেক প্রদেশেই উহ্য হইয়া আছে, যে কোন মুহূর্তে তাহা আত্মপ্রকাশ করিলে বিস্ময়ের কিছু হইবে না। এই প্রাদেশিক সঙ্কীর্ণতা বাঙালীর ধাতে সহ্য হয় না। কারণ রাজনীতির ক্ষেত্রে সর্বভারতীয় উদার স্বাধীনতার জন্যই সে জেলে গিয়াছে, ফাঁসি গিয়াছে, দ্বীপান্তরে গিয়াছে, জীবনের সমস্ত সুখ-শান্তিকে বিসর্জন দিয়াছে, আর সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তাহার সর্বভারতীয় দৃষ্টি তো সুবিদিত। বর্তমানের প্রদেশ-বিভাগের ফলে তাহাকে আজকাল বলিতে হইতেছে বটে যে—বেঙ্গল ফর বেঙ্গলীজ, কিন্তু ইহাতে তাহার প্রাণের সুর ঠিক যেন লাগিতেছে না।

বাংলা দেশের আধুনিক সাহিত্য খ্রীষ্টান মিশনরিদের জয়গানে মুখরিত, বিদেশী ডেভিড হেয়ার আমাদের আপন লোক, অবাঙালী রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, সখারাম গণেশ দেউস্কর বাংলা-সাহিত্যের পূজ্য লেখক, এণ্ড্রু সাহেবের স্মৃতিরক্ষার জন্য বাঙালী আকুল। পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেন মধ্যযুগীয় সাধুদের যে বাণী সংগ্রহ করিতেছেন তাহা কেবল বাঙালী সাধুদেরই বাণী নহে, তাহা সর্বভারতীয় সাধনার সঞ্চয়ন-ভাণ্ডার। এই সেদিন পর্যন্ত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকের উচ্চাসন নির্দিষ্ট থাকিত প্রকৃত গুণীর জন্য, কেবলমাত্র বাঙালীর জন্য নহে। অধ্যাপক রমন, অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণন্, বর্তমান রাষ্ট্রপতি অধ্যাপক রাজেন্দ্রপ্রসাদ, তিব্বতী লামাগণ, আরবী-পার্সীর মৌলবীবৃন্দ সকলকেই বাংলা দেশ তাঁহাদের প্রাপ্য শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছে।

বাঙালীর প্রতিভা চিরকালই সর্বভারতমুখী; বিশ্বমুখী বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলা প্রয়োজন। 'ঘর-জ্বালানে পর-ভালানে' প্রেম প্রেম নয়। যে বাঙালীর বাঙালী-প্রেম নাই অথচ যিনি ভারত-প্রেমে উদ্বাহু, তাঁহার ভারত-প্রেম সম্বন্ধেও সন্দেহ হয়। মনে হয় ওটা আপাত-উজ্জ্বল মেকি একটা জিনিস। দার্শনিক দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষায় বলিলে বলিতে হয়—"প্রেম বিস্তারের একটা বিহিত পদ্ধতি আছে। আগে প্রেম পরিপুষ্ট হয়, তাহার পর তাহা বিস্তৃত হয়। প্রথমে প্রেম গৃহাভ্যন্তরে পরিপুষ্ট হয়, তাহার পর তাহা দেশে বিস্তৃত হয়। প্রথমে প্রেম স্বদেশে পরিপুষ্ট হয়, তাহার পর তাহা বিদেশে বিস্তৃত হয়। অগ্নির ন্যায় প্রেমের স্বভাবই প্রসারিত হওয়া। আপনার দেশের প্রতি তোমার প্রেম যথোচিত পরিপুষ্ট হইতে না হইতেই যদি তাহা চকিতের মধ্যে সাত সমুদ্র পারে উত্তীর্ণ হইয়া আসর জমকিয়া বসে, তবে সে প্রেমে ভিতর কোন পদার্থ নাই—কোন রসকস নাই—তাহা অন্তঃসারশূন্য অলীক আড়ম্বর মাত্র। এ সকল ইঁচড়ে পাকা প্রেম হাঁটিতে শিখিবার পূর্বেই দৌড়িতে ও লম্ফ দিতে আরম্ভ করে। আপনার মা-বাপের পরিচয় পাইতে না পাইতেই অপর লোককে মা-বাপ বলিতে শিখে। এইরূপ ভূতগত প্রেমকে কেহ কেহ বলেন সার্বভৌমি উদারতা, কেহ বলেন বিশ্বব্যাপী সমদর্শিতা, আমরা বলি গাছে না উঠিতেই এক কাঁদি।..."

বলা বাহুল্য, সুস্থমনা কোনও বাঙালীর এরূপ হাস্যকর ভারত-প্রেম নাই। বাঙালীর গুণকীর্তন করিবার জন্য আমি বর্তমান প্রবন্ধের অবতারণা করি নাই। ইতিহাসের নজিরে আমি বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছি, কোথায় বাঙালীর শক্তি, কোথায় তাহার দুর্বলতা। আমার ধারণা হইয়াছে, বাঙালী আদর্শপ্রিয় ভাবপ্রবণ শিল্পীর জাতি। তাহার সঙ্গীতে ছন্দপতন ঘটিলেই, তাহার জীবনবীণা বেসুরা বাজিলেই সে ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে, দিগ্বিদিক্‌জ্ঞানশূন্য হইয়া বিদ্রোহ করিয়াছে, রাজ্যের উত্থানপতন ঘটাইয়াছে। এই শিল্পীর জাতি যখনই সুখে স্বচ্ছন্দে থাকিবার সুযোগ পাইয়াছে, তখনই তাহার জীবনে প্রতিভার দীপ্তি নানা দিকে ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য সে একবার পাইয়াছিল গুপ্ত-সাম্রাজ্যের আমলে। ঐতিহাসিকদের মতে সেই যুগই ভারতের স্বর্ণযুগ, সেই স্বর্ণযুগের দ্যুতি বাংলাকেও উজ্জ্বল করিয়াছিল। ইংরেজ-শাসনের প্রথম যুগেও দেখি বাঙালী-প্রতিভা সমস্ত ভারতবর্ষকে মহিমান্বিত করিয়াছে, তাহারও একমাত্র কারণ ইংরেজশাসনের প্রথম যুগে বাঙালীরা সুখে স্বচ্ছন্দে ছিল; ভাত-কাপড়ের জন্য তাহাকে এমনভাবে আত্মবিক্রয় করিতে হয় নাই। যখনই বাঙালীকে পেটের দায়ে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়াছে, তখনই তাহার চরিত্র শুধু যে নিম্নস্তরে নামিয়া গিয়াছে তাহা নয়, তাহার শিল্পীমন তির্য্যকপথে তাহার চরিত্রে এমন সব দোষের সৃষ্টি করিয়াছে যাহা লজ্জাকর। বাঙালীর একতা নাই, বাঙালী পরশ্রীকাতর, বাঙালী পরনিন্দা করে, বাঙালী চাকুরি-প্রিয়। আমার মনে হয়, এ সমস্তই দারিদ্র্য-পীড়িত শিল্পীচরিত্রের বিকৃত রূপ অথবা অবশ্যম্ভাবী পরিণাম। কারণ তাহার শিল্পসৃষ্টি মানবতাকে কেন্দ্র করিয়াই বিকশিত, অত্যুচ্চ মহামানবতার প্রতি তাহার তেমন টান নাই। প্রাচীন বাঙালী কবিদের কাব্য সাধারণ লোকদেরই জীবনলীলার আলেখ্য। চর্যাপদের কবি তো ডোম্বিনীর প্রেমে মাতোয়ারা, আনন্দই তাহার লক্ষ্য, জাতিকুলের আড়ম্বর নয়, শুষ্ক জ্ঞানচর্চা নয়, আধ্যাত্মিকতার কৃচ্ছ্রসাধন নয়। স্বর্গের দেবদেবীরাও তাঁহাদের মহিমান্বিত রূপে বাঙালীর কাছে আমল পান নাই, আমল পাইয়াছেন ধুলায় নামিয়া আসিয়া বাঙালীদের সহিত ঘরকরনা করিয়া। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—"বাংলাদেশ দেবভূমি নয়, এ দেশ মানবের দেশ। বাঙালী মানুষকেই জানে। দেবতাকেও সে ঘরের মানুষ ক'রে নিয়েছে। বাংলার

শিবে-দুর্গায় বাঙালী চরিত্রেরই প্রকাশ। গঙ্গা-গৌরীর কোন্দলে, শিব-দুর্গার কলহে আমাদেরই ঘরোয়া ঝগড়া। ভালোমন্দ সব নিয়েই আমাদের শিব আমাদেরই আপনমানুষ। বাঙালীর রাম তো বাল্মীকির রাম নন। আমাদের কৃষ্ণকেও শাস্ত্রে খুঁজে পাইনে অথচ আমাদের জীবনের মধ্যে তাঁকে খুবই দেখতে পাই···।" বাঙালীমাত্রে অনুভব করিবেন, রবীন্দ্রনাথের এ উক্তি কত সত্য। অমন যে প্রবল প্রতাপান্বিত সূর্য্যদেব, বৈদিক কবি গুরুগম্ভীর সংস্কৃত মন্ত্রে যাঁহার স্তব করিতেছেন উদাত্ত ভাষায়—

ওঁ জবাকুসুম-সঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্।
ধ্বান্তারিং সর্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্॥

সেই সূর্য বাঙালীর ব্রতকথায় একেবারে ঘরের মানুষ।

আসবেন সূর্য বসবেন পাটে
নাইবেন ধুইবেন গঙ্গার ঘাটে
গা হেলাবেন সোনার খাটে
পা মেলাবেন রূপোর পাটে।

আধুনিক বাংলা-সাহিত্যেও দেখি 'মেঘনাদবধ কাব্যে' রামের অপেক্ষা রাবণই বেশি মহিমান্বিত। রবীন্দ্রনাথ সেদিনও তাঁহার এক প্রবন্ধে লিখিয়া গিয়াছেন—"দেখতে পাই ফলস্টাফের সঙ্গে কন্দর্পের তুলনা হয় না, অথচ সাহিত্যের চিত্রভাণ্ডার থেকে কন্দর্পকে বাদ দিলে লোকসান নেই, লোকসান আছে ফলস্টাফকে বাদ দিলে। সীতার চরিত্র রামায়ণে মহিমান্বিত বটে কিন্তু স্বয়ং বীর হনুমান, তার যত বড় লাঙ্গুল তত বড়ই সে মর্যাদা পেয়েছে। সর্বগুণাধার যুধিষ্ঠিরের চেয়ে হঠকারী ভীম বাস্তব, রামচন্দ্র যিনি শাস্ত্রের বিধি মেনে ঠাণ্ডা হয়ে থাকেন তার চেয়ে লক্ষ্মণ বাস্তব যিনি অন্যায় সহ্য করতে না পেরে তার অশাস্ত্রীয় প্রতিকার করতে উদ্যত···।" এই রবীন্দ্রনাথেরই বিখ্যাত কবিতা এবং বাঙালী জনসাধারণের মর্মবাণী—

বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়
অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ।···

এই বন্ধনময় ভাবাবেগই বাঙালী শিল্পীর বিশিষ্টতা। পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রভাবে বৈদিক সংস্কৃতির সংস্পর্শে রবীন্দ্র-সাহিত্যও চিরকাল ভাবাবেগ-প্রধান

থাকিতে পারে নাই, ক্রমশ তাহা বিশুদ্ধ বুদ্ধির মহিমায় প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু যে-ই উঠিয়াছে অমনি তাহা সাধারণ বাঙালীর রসবোধের সীমাকেও অতিক্রম করিয়াছে। মুষ্টিমেয় কৃতবিদ্য অথচ রসিক বাঙালী ছাড়া সমগ্র রবীন্দ্র-সাহিত্যের রসাস্বাদন কয়জন করিতে সক্ষম? সাধারণ বাঙালী পান করিতে চায় তাহার দৈনন্দিন জীবনের সুখ-দুঃখ-মন্থিত অমৃত। বাংলার বাজারে তাই 'গোরা' 'চতুরঙ্গ' অপেক্ষা 'বিন্দুর ছেলে' 'অরক্ষণীয়া'র চাহিদা বেশি। রবীন্দ্রসঙ্গীত জনপ্রিয় অবশ্য, কিন্তু তাহা ঔপনিষদিক বা আধ্যাত্মিক আবেদনের জন্য নহে, জনপ্রিয় তাহাদের নিতান্ত-মানবিক আবেদনের জন্য।

সে যে পাশে এসে বসেছিল, তবু জাগি নি
কি ঘুম তোরে পেয়েছিল হতভাগিনি

ইহার মধ্যে হয়তো গভীর আধ্যাত্মিক ইঙ্গিত আছে, কিন্তু বাঙালী ইহাকে গ্রহণ করিয়াছে ইহার অতি-স্পষ্ট করুণ কোমল ভাবটির জন্য। বাঙালীর ভাবধারা উদ্বেলিত তাহার মর্ত্যজীবনকে কেন্দ্র করিয়া। সে ভোগী। তাহার যত কিছু আত্মত্যাগ, তাহার কংগ্রেস, তাহার অগ্নিযুগের মৃত্যুপণ, তাহার তান্ত্রিকের শবসাধনা, তাহার বৈষ্ণবের প্রেমবিলাস সমস্তই জীবনকে বিচিত্ররূপে ভোগ করিবার জন্য। জীবনশিল্পী বাঙালী জীবনকে শিল্পীর মতই উপভোগ করিতে চায়। সামাজিক জীবনে সেই জন্যই তাহার সাম্য-প্রীতি, সেই জন্যই তাহার স্বাধীনতার তপস্যা।

তাই মনে হয় বাঙালীর পরশ্রীকাতরতা হয়তো দারিদ্র্যপীড়িত বাঙালীর সাম্যপ্রিয়তার বিকৃত রূপ, তাহার পরনিন্দাশীলতা হয়তো তাহার সমালোচক মনেরই বক্র পরিণতি, তাহার চাকুরিপ্রিয়তা হয়তো তাহার শিল্পীমনের অবসরপ্রিয়তার অবশ্যম্ভাবী রূপান্তর। বাঙালীর একতা হইবে কি করিয়া? বিভিন্ন ধর্ম, বিভিন্ন সংস্কৃতি, বিভিন্ন সভ্যতার সংঘাতে প্রতি বাঙালীর চরিত্রে এমন একটা উদার অথচ বিশিষ্ট ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ফুটিয়া উঠিয়াছে যে, কোনও একটা বিশেষ মতবাদের গণ্ডীতে একতাবদ্ধ হওয়া তাহার পক্ষে দুঃসাধ্য। গড্ডলিকাপ্রবাহে গা ভাসাইয়া দেওয়া বাঙালীর স্বভাবধর্ম নহে। তাহার চিন্তাধারা সত্যই ধারা, স্থিতিশীল নহে—গতিশীল। যে বাঙালী ইংরেজকে ডাকিয়া রাজপদে বসাইয়াছে, সেই বাঙালীই কংগ্রেস গড়িয়াছে, সেই বাঙালীই বোমা ছুঁড়িয়াছে, সেই বাঙালীই খদ্দর পরিয়া অহিংস সংগ্রাম

করিয়াছে এবং সেই বাঙালীই এখন আবার মহাত্মা গান্ধীর সমালোচনা করিয়া রুশদেশে প্রবর্তিত কমিউনিজ্‌মের সাম্য-স্বপ্ন দেখিতেছে। কিন্তু সাম্যনীতি-অনুমোদিত রাষ্ট্র স্থাপন করিতে হইলে যে একরঙা মনোবৃত্তি থাকা প্রয়োজন, তাহা বাঙালীর নাই। স্ব স্ব প্রধান থাকাই তাহার ধর্ম, তাই একই বাঙালী-পাড়ায় পাঁচটা ক্লাব, ছয়টা থিয়েটারের আখড়া, তাই একাধিক বারোয়ারিতে একাধিক পূজার জন্ম একাধিক মোড়ল ব্যস্ত। সকলে একত্র হইয়া কিছু করা আমাদের স্বভাব নয়

কেবল একটি ক্ষেত্রে বাঙালীর একতা আছে। সে ক্ষেত্রে সে তাহার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধকেও বোধ হয় কিছুক্ষণের জন্ম ভুলিয়া যায়। তাহার মস্তক অবনত হইয়া পড়ে যখন সে প্রতিভার দুর্লভ জ্যোতি দেখিতে পায়। প্রতিভাবান ব্যক্তির মতবাদকে বা কীর্তিকে সে হয়তো সমালোচনার তীক্ষ্ণ বাণে জর্জরিত করিয়া দেয়, কিন্তু প্রতিভাবান ব্যক্তিটি তাহার মাথার মণি। বৈদিক ধর্মকে বাঙালী পুরাপুরি গ্রহণ করে নাই, কিন্তু বেদ-উপনিষদের ঋষিরা আজও বাঙালীর নমস্য; বৌদ্ধধর্ম বাংলায় টিকিল না, কিন্তু বুদ্ধদেব বাংলার অবতারদের মধ্যে একজন; চৈতন্যদেবের শিষ্যানুশিষ্যগণ বাঙালীর কাছে অনেক স্থলে উপহসিত, কিন্তু নবদ্বীপের নিমাই বাঙালীর অন্তরের ধন; রঘুনন্দনের বিধান বাঙালী সম্পূর্ণ মানিল না, কিন্তু রঘুনন্দনকে লইয়া বাঙালীর গর্বের অন্ত নাই; রামমোহন রায়ের প্রবর্তিত ব্রাহ্মধর্ম বাংলা দেশের জনসাধারণ গ্রহণ করিল না, কিন্তু রামমোহন রায়ের ছবি প্রত্যেক শিক্ষিত বাঙালীর ঘরে ঘরে; বিদ্যাসাগরের সারা জীবনের সাধনা বিধবা-বিবাহ-প্রচলন বাংলা দেশে অপ্রচলিত, কিন্তু কোন্ বাঙালী বিদ্যাসাগরের নামে উল্লসিত হইয়া উঠেন না? শান্তিনিকেতনের সহিত সাধারণ বাঙালীর প্রাণের যোগ নাই, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রত্যেক বাঙালীর প্রাণের ঠাকুর। মহাত্মা গান্ধীর সমালোচনায় বাঙালী পঞ্চমুখ, কিন্তু মহাত্মা গান্ধী ব্যক্তিটিকে সে পূজা করিতে কখনও ইতস্তত করে নাই। আজকালকার কথাই ধরুন না, আমাদের প্রধান মন্ত্রীর প্রধান সমালোচক বাঙালী রাজনৈতিক; কিন্তু দুরন্ত দামাল হঠকারী তেজস্বী জওহরলালকে, শিল্পী সাহিত্যিক জওহরলালকে কোন্ বাঙালী ভাল না বাসে? কেবল স্বদেশী নয়, বিদেশী প্রতিভা সম্বন্ধেও বাঙালীর এই মনোভাব। বাঙালী শিল্পী এবং শিল্পীর সমঝদার। তাহার

চরিত্রও শিল্পীসুলভ। বাহবা পাইবার জন্য, কৃতিত্ব দেখাইবার জন্য সে অসাধ্যসাধন করিতে পারে, কিন্তু আধিভৌতিক সুখ-সুবিধার জন্য কিছু করিতে সে অপারগ। বড় বড় সাম্রাজ্যের বড় বড় আপিসের আয়ব্যয়ের নিখুঁত হিসাব বাঙালীই চিরকাল রাখিয়াছে, কি করিয়া অর্থাগম হইতে পারে তাহার নানা বুদ্ধি সে অপরকে বলিয়া দিতেছে, নিজে কিন্তু সে দরিদ্র। টাটানগরের বিরাট সম্ভাবনা বাঙালী প্রমথনাথ বসুর মনীষাতেই একদা প্রতিভাত হইয়াছিল, কিন্তু তাহাকে রূপ দিল অন্য আর একজন অবাঙালীর কর্ম্মদক্ষতা। বাঙালী আপিসের বেতনেই সন্তুষ্ট। যে একটানা অধ্যবসায় থাকিলে অর্থোপার্জন করা যায়, তাহা বাঙালীর নাই। অথচ অর্থের প্রতি তাহার বৈরাগ্যও নাই, দারিদ্র্য তাহার প্রতিভাকে বিকৃত করে। সে ভোগী, সে শিল্পী। তীক্ষ্ণ বুদ্ধিবৃত্তি, বিশুদ্ধ আদর্শনিষ্ঠা, বিভিন্ন সংস্কৃতির সংঘাত-সমন্বয় বাঙালী চরিত্রে বস্তুতান্ত্রিকতার ও ভাবপ্রবণতায়, শক্তির ও দুর্বলতার অসামঞ্জস্য সৃষ্টি করিয়াছে। এক দিকে সে যেমন শক্তিধর, অন্য দিকে সে তেমনি অসহায়। এই শিল্পীজাতিকে যদি কোনও রাষ্ট্র সন্তুষ্ট রাখিবার ব্যবস্থা না করিতে পারেন, তাহা হইলেই বিপ্লবের সম্ভাবনা। শিল্পপ্রতিভা অনেকটা আগুনের মতো। তাহাকে যদি ঠিকমতো যথাস্থানে রাখা যায় তাহা হইলে সে রাষ্ট্রের পরম বন্ধু। সে অমাবস্যার অন্ধকারকে দীপালীর মহিমায় উদ্ভাসিত করে, দুর্গমপথযাত্রীদের হস্তে মশাল-আলোকে প্রজ্জ্বলিত হয়, ফ্যাক্টরি চালায়, কামানে গর্জন করে, রান্নাঘরের চুল্লীতে থাকিয়াও অন্নব্যঞ্জনের বৈচিত্র্য সম্ভব করে। কিন্তু এই অগ্নি লইয়া অবহেলাভরে খেলা করিলেই বিপদ, অগ্নি তখন ধ্বংসলীলায় মাতিয়া উঠে।

অনুভব করিতেছি, বাঙালীর জীবনে তাহার এই অগ্নি আজ কল্যাণকর মূর্তিতে নাই। ইতিহাসের ইহাই সাক্ষ্য যে, যখনই একটা রাষ্ট্রের অবসান হইয়া নূতন রাজ্যের অভ্যুদয় হইয়াছে, তখনই বাঙালী জাতির জীবনে এই অগ্নির, বাঙালীর শিল্পীমনের বিকৃতি ঘটিয়াছে। তখন দারিদ্র্যের পেষণে পুরুষরা অর্থহীন, আশাহীন, উদ্যমহীন, বাগাড়ম্বরপ্রিয়, আর নারীরা অপমানিতা, ধর্ষিতা বা ভ্রষ্টা। ইংরেজেরা প্রথমে যখন এ দেশে আসিয়াছিল, তখন বাংলা দেশের সামাজিক অবস্থা ভয়াবহ; সাহিত্য-শিল্প মৃতপ্রায়, ধর্ম কুসংস্কারাচ্ছন্ন, মন্বন্তর-রাক্ষসের অট্টহাস্যে বাংলার আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত;

কিন্তু কিছুদিন পরে ইংরেজের সংস্পর্শে যে-ই সে আধিভৌতিক সুখ-সুবিধা এবং মানসিক প্রশান্তি লাভ করিল, অমনি সঞ্জীবিত হইল তাহার প্রতিভা। সাহিত্যে সমাজে ধর্মে বাঙালী-প্রতিভার অগ্নি অভূতপূর্ব জ্যোতিতে সমগ্র ভারতকে উজ্জ্বল করিয়া দিল। ইংরেজ আমলের শেষের দিক হইতেই কিন্তু সে অগ্নি ম্লান হইয়া আসিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার লইয়া অত্যধিক আস্ফালন যেন আমাদের মানসিক দৈন্য সূচিত করিয়াছে। কবিদের পুরস্কার-প্রাপ্তি প্রসঙ্গে একটা গল্প মনে পড়িতেছে। কবি কৃত্তিবাস একদিন নাকি গৌড়েশ্বর কংসনারায়ণের সভায় আসিয়া তাঁহাকে স্বরচিত কয়েকটি কবিতা আবৃত্তি করিয়া শুনাইয়াছিলেন। শুনিয়া গৌড়েশ্বর পরম হৃষ্ট হইলেন, তাঁহার পারিষদেরা বলিলেন, "গৌড়েশ্বর আপনার উপর খুশি হইয়াছেন, এখন আপনি কি পুরস্কার চান বলুন। যাহা চাহিবেন তাহাই পাইবেন।" কৃত্তিবাস উত্তর দিয়াছিলেন, "আমি কবি, আমি ভিক্ষুক নই। কবিতার বিনিময়ে সম্পদলাভ করিতে আমি আসি নাই। 'কারো কিছু নাহি লই গৌরব মাত্র সার'।" কোন কবিই পুরস্কার লাভের আশায় কাব্য রচনা করেন না, রবীন্দ্রনাথও করেন নাই, পুরস্কারটা আকস্মিকভাবেই তাঁহার জীবনে আসিয়া গিয়াছিল। কিন্তু ইহা লইয়া আমাদের আস্ফালনটা যেন একটু বেসুরা হইয়া গিয়াছে। তাহার পর হইতেই বাঙালীর সাহিত্য-সাধনাও যেন মূলত একটা অর্থকরী পেশা হইয়া উঠিয়াছে, কোথাও একটু বাহবা পাইবার জন্য, একটা পুরস্কার পাইবার জন্য, আমরা যেন আজ লোলুপ। ইহা লইয়া প্রতিযোগিতার অন্ত নাই। সাহিত্য-সাধক তাঁহার সাধনার জন্য অর্থলাভ করুন, পুরস্কার লাভ করুন—ইহা তো আনন্দের কথা। কিন্তু যখনই তিনি অর্থ বা পুরস্কারের লোভে ক্রেতা বা পুরস্কার-দাতাদের মনোরঞ্জনের প্রয়াস পাইবেন তখনই তাঁহার পতন। নিদারুণ অর্থাভাবের সহিত বিলাস-লালসা সংযুক্ত হইয়া আজ অনেক প্রতিভাবান বাঙালী লেখককে বিভ্রান্ত করিতেছে। সিনেমা-অধিপতিদের নিকট আত্মসম্মান বিকাইয়া অনেকেই আজ যে কর্মে নিযুক্ত, তাহা দেশের এবং জাতির পক্ষে অকল্যাণকর, কারণ আজকাল দেখিতেছি অধিকাংশ সিনেমারই লক্ষ্য আমাদের পশুত্বকেই উত্তেজিত করা।

যে স্বাধীনতার জন্য বাঙালী তাহার সর্বস্ব খোয়াইয়াছে, সেই স্বাধীনতা আজ সমাগত। কিন্তু বাঙালী-জীবনের সেই অগ্নি কোথায়? নির্বাপিত হয় নাই, রূপ পরিবর্তন করিয়াছে। শিল্প-প্রতিভা, কবি-প্রতিভা যখন বিকৃতরূপ ধারণ করে তখন তাহা আতঙ্কজনক, নারী যখন নগ্নিকা হয় তখন সে ভয়ঙ্করী কালী হইয়া উঠে—শিবের বুকে পা দিতেও তখন তাহার আপত্তি নাই, বরং তাহাতেই তাহার উল্লাস। ইংরেজ-রাজত্বের অবসানে এবং স্বাধীন রাষ্ট্রপত্তনের সূচনায় অভাবের, অন্যায়ের, অবিচারের কবলে পড়িয়া বাঙালী জাতি আজ আর্তনাদ করিতেছে। ইতিহাসে তাহার এই আর্তনাদ শুনিয়াছি মাৎস্যন্যায়ের যুগে, পালরাজ্যের অবসানে, সেনরাজ্যের অধঃপতিত অবস্থায়, মুসলমান-রাজত্বের শেষভাগে। আজও বাঙালীর দুর্দশার নানা অভিব্যক্তি চতুর্দিকে করাল ছায়া বিস্তার করিতেছে দেখিতে পাইতেছি। ঘরে বাহিরে কোথাও তাহার স্থান নাই, সর্বত্রই সে যেন প্রবাসী, তাহার উপার্জনের পথ রুদ্ধপ্রায়, তাহার সামাজিক বন্ধন শিথিল, তাহার ভাষা বিপন্ন, তাহার প্রতিভা অস্বীকৃত এবং সেই জন্যই উন্মার্গগামী, প্রতিদিনই মুখোশধারী ক্ষমতাপ্রাপ্ত রাজনৈতিক নেতারা তাহার আদর্শপ্রীতিকে ক্ষুণ্ণ করিতেছেন, তাহার পুত্রকন্যারা গতানুগতিক পন্থায় পঠদ্দশা শেষ করিয়া অবশেষে অনিশ্চিত তিমিরে অবলুপ্ত হইয়া যাইতেছে। বর্তমান সাহিত্যেও ইহার প্রভাব সুস্পষ্ট, কারণ পেটের দায়ে পপুলার হইবার জন্য অধিকাংশ বাঙালী সাহিত্যিক আজ সাহিত্যকর্মে নিযুক্ত। প্রকৃত সাধক সংখ্যায় খুব বেশি নাই। তাই দেখি আমাদের দুঃখদুর্দশার কাহিনী নানা সুরে ইনাইয়া-বিনাইয়া বলা, অন্তঃসারশূন্য বীরত্বের ফাঁকা আওয়াজ করা, নানা ছুতায় জঘন্য যৌন-প্রকৃতিকে উদ্দীপ্ত করা, শ্রমিক-মজদুরদের লইয়া নকল ক্ষোভ প্রকাশ করা, পরনিন্দার মসলায় মুখরোচক করিয়া গালগল্প সাজাইয়া-গুছাইয়া বলা—এই সবই বর্তমানে অধিকাংশ বাঙালী কবির উপজীব্য। রবীন্দ্রোত্তর বঙ্গ-সাহিত্যের সমৃদ্ধিরও দিক আছে, আমি আজ সে আলোচনা করিতেছি না। সে আলোচনা উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত লোকে নিশ্চয়ই একদিন করিবেন, কিন্তু আজ আমি নিঃসংশয়ে অনুভব করিতেছি যে আমাদের সাহিত্য ও জীবন একপ্রস্থ ফসল ফলাইয়া আবার নূতন ফসলের আশায় রিক্তশ্রী হইতেছে। যে আবর্জনা ও জঞ্জাল আজ আমাদের জীবনে স্তূপীকৃত

হইতেছে তাহাই একদিন সারে পরিণত হইয়া নবীন সৃষ্টিকে প্রাণরসে সঞ্জীবিত করিবে। তাহার এই দীনতা, তাহার এই ক্ষোভ, তাহার এই উচ্ছৃঙ্খলতা আসন্ন বিপ্লবেরই প্রাথমিক ভূমিকা। বাঙালী বারম্বার বিপন্ন হইয়াছে, কিন্তু তাহার আদর্শ-উদ্বুদ্ধ শিল্পচেতনা তাহাকে বারম্বার সঞ্জীবিতও করিয়াছে। অন্যায়কে অসত্যকে অসুন্দরকে অশিবকে উৎখাত করিবার জন্য সে বহুবার জীবনপাত করিয়াছে, আশা আছে আবার করিবে।

আর আমার বিশেষ কিছু বলিবার নাই একটি ক্ষুদ্র কবিতা পাঠ করিয়া আমি আমার বক্তব্য শেষ করিতেছি।

জয়যাত্রায় বাহির হয়েছি কতকাল আগে মোরা
যাত্রা হয় নি শেষ
গিরি-মরু-বন কত অগণন একে একে হ'ল ঘোরা
বদল হ'ল যে বেশ,
দূর দিগন্ত পানে বার বার চাই
সেদিনের সাথী-সঙ্গীরা কেহ নাই
বুকভরা আশা ছিল যাহাদের
দেখিবে নূতন দেশ
দুর্গম পথে চলিতে চলিতে
হ'ল তারা নিঃশেষ।
তোমরা আসিবে নূতন পথিক নূতন বার্তা নিয়া
নূতন পথের বাঁকে
নবীন যুগের যুগন্ধরেরা দশদিশি সচকিয়া
ঝাঁকে ঝাঁকে লাখে লাখে
তোমাদের মুখে শুনিব বিজয়বাণী
হবে হবে জয় হবে হবে জানি জানি
স্বপনে যাহারে দেখেছি আমরা
পাব তার উদ্দেশ
কণ্টক ভেদি' হবেই একদা
কুসুমের উন্মেষ।

"বনফুল"

সংবাদ-সাহিত্য

ভারতবর্ষের ভাষা-সমস্যা উত্তরোত্তর জটিল হইয়া উঠিতেছে। ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠন এক সমস্যা, নিজ কেন্দ্রে অর্থাৎ দিল্লীতে এবং কেন্দ্রের সহিত অনিবার্য যোগাযোগে প্রাদেশিক রাজধানীগুলিতে রাষ্ট্রপরিচালন ব্যাপারে কোন্ ভাষা ব্যবহৃত হইবে তাহাও কম জটিল সমস্যা নয়, কিন্তু সর্বাপেক্ষা গুরুতর সমস্যা হইতেছে ভারতীয় ছাত্রদের উচ্চতম শিক্ষার মাধ্যম নির্ধারণে, বিশেষ করিয়া বিজ্ঞানের শিক্ষায়। আরও একটা কথা আছে—আন্তর্জাতিক সংস্কৃতি, রাজনীতি ও ব্যবসায় পরিচালন করিতে হইলে কোন্ ভাষা আমরা আয়ত্ত করিব ?

সাহিত্যসৃষ্টির প্রশ্ন এই সমস্যার অন্তর্ভুক্ত নয় এই কারণে যে, সারা পৃথিবীতে দুই-চারিটি বিচিত্র ব্যত্যয় বাদ দিলে যাবতীয় উল্লেখযোগ্য সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়াছে লেখকদের মাতৃভাষাতে ; সাহিত্যের সহিত জাতীয় অথবা আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রভাষার কোনই সম্বন্ধ নাই। সাহিত্য ও ভাষা সম্পর্কে আধুনিক ভারতে—শুধু ভারতে কেন, বর্তমান জগতে কথা বলিবার দাবি যাঁহার সর্বাধিক ছিল সেই রবীন্দ্রনাথ এই সমস্যা-উদ্ভবের পূর্বেই সকল সমস্যার অতীত হইয়াছেন। তথাপি তিনি এমন একটা ইঙ্গিত দিয়া গিয়াছেন, হিন্দীকে সর্বভারতীয় ভাষা করার যাহা বিপক্ষে দাঁড়ায়। তিনি বলিয়াছেন, নাগরী হরফ আধুনিক মানুষের জীবনের গতি ও প্রকৃতির সহিত তাল রাখিয়া চলিতে অক্ষম ; এই গুরুতর অক্ষমতা ইহার ব্যাপক প্রসারের পক্ষে অন্তরায়।

স্বাধীনতা-লাভের অব্যবহিত পরে দিল্লীর কন্‌স্টিটিউশন-হাউসে সর্বভারতীয় রাজভাষা নির্ধারণের জন্য যে অধিবেশন হয় তাহাতে স্থির হয়, সংস্কৃত-আশ্রিত হিন্দীই রাজভাষা হইবে, লিপি হইবে দেবনাগরী এবং পনের বৎসরের মধ্যে হিন্দী ইংরেজীর স্থান সম্পূর্ণ অধিকার করিবে। মহাত্মা গান্ধী তখন জীবিত ছিলেন না, কিন্তু তাঁহার মতাবলম্বী জওহরলাল ছিলেন ; ইঁহারা উভয়েই হিন্দুস্থানী বা

উর্দু ভাষার এবং দেবনাগরী ও আরবী উভয় লিপিরই প্রসারের পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু ইঁহাদের দল ভোটে হারিয়া যান। যাঁহারা চিরকালের জন্য ইংরেজী বজায় রাখার পক্ষপাতী ছিলেন, তাঁহারাও পরাজিত হন।

চারি বৎসর গত হওয়ার পর দক্ষিণ ও পূর্ব ভারতে হিন্দীভাষা-শিক্ষার ব্যাপক প্রয়োগ করিতে গিয়া ভারতের চিন্তাশীল ব্যক্তিরা আবার একবার চকিত হইয়া উঠেন। আরও এগার বৎসরের মধ্যে ইংরেজী সম্পূর্ণ বিদায় লইবে এবং হিন্দী তাহার স্থলাভিষিক্ত হইবে—সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ইহাকে তাঁহারা ঘোর বিপদ বলিয়া জ্ঞান করেন এবং প্রতিবাদে ঘোষণা করেন, ভারতের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি করিতে হইলে ইংরেজী বজায় রাখা একান্ত আবশ্যক ; হিন্দী কোনও দিনই ইহার স্থান লইতে পারে না। ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ, সার্ সি. ভি. রমন, এমন কি—রাষ্ট্রভাষা হিসাবে হিন্দীর একান্ত সমর্থক ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এই দলে।

বাংলা দেশের পূর্বতন কয়েকজন মনীষী—ভূদেব, রাজনারায়ণ ও কেশবচন্দ্র প্রভৃতি—সর্বভারতীয় একাত্মতাসাধনে হিন্দীভাষার ব্যাপক প্রসার চাহিয়াছিলেন। আর একদলের মত ছিল, নিখিল জাগতিক ইংরেজী ভাষা যে কারণেই হউক, যখন একবার চালু হইয়া গিয়াছে তখন তাহাকেই চলিতে দেওয়া উচিত। ইহা মোটেই দাসমনোবৃত্তি নহে, আধুনিক জগতের সর্ববিধ সুখ-সুবিধার সহজ সুযোগ গ্রহণের কথা।

গত শনিবার ১৪ই ফেব্রুয়ারি তারিখে কলিকাতা বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয়-বিজ্ঞান-পরিষদের পঞ্চবার্ষিকী সভায় আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় বলেন, "মানুষের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য বিজ্ঞানের যে ব্যাপক প্রসার চাই—এ কথা সর্ববাদিসম্মত, শিক্ষার বাহন কোন্ ভাষা হইবে ইহা লইয়া অবশ্য মতভেদ আছে। এই ব্যাপারে ইংরেজীকে অনেকে বজায় রাখিতে চান। কিন্তু আমি এই মতাবলম্বী নই। আমার স্পষ্ট

ও দৃঢ় ধারণা এই যে, পশ্চিমবঙ্গে বাংলা-ভাষার মধ্যস্থতায় বিজ্ঞান-শিক্ষা প্রবর্তন না করিলে এখানে বিজ্ঞানের প্রসার কখনই হইবে না।" তিনি স্বীকার করেন, "বিজ্ঞানের পরিভাষা বাংলা-ভাষায় এখনও সম্পূর্ণ গঠিত হয় নাই; কিন্তু সকলের সমবেত চেষ্টায় এ অসুবিধা দূর করিতে সময় লাগিবে না। তাহা ছাড়া, বহু বৈদেশিক আন্তর্জাতিক শব্দকে আমরা ইতিমধ্যেই গ্রহণ করিয়াছি, আরও অনেক প্রয়োজনীয় শব্দ আমরা সহজেই গঠন করিতে পারিব, যেখানে পারিব না সেখানে আন্তর্জাতিক বৈদেশিক শব্দ ব্যবহারে লজ্জা পাইবার কারণ নাই।" আচার্য বসু আরও বলেন, "ভারতবর্ষে ইংরেজী প্রচারের শতবর্ষব্যাপী সরকারী চেষ্টা সত্ত্বেও দেশের লোকের অতি সামান্য ভগ্নাংশই ইংরেজী শিখিয়াছে—এ কথাটা আমাদের মনে রাখা দরকার। গত যুগের তুলনায় আজকাল ছাত্রদের ইংরেজী সম্বন্ধে জ্ঞান কম। জনশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানের শিক্ষার প্রচলন করিতে হইলে মাতৃভাষাকে শিক্ষার বাহন অবশ্যই করিতে হইবে।" ডক্টর জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ও আচার্য বসুকে সম্পূর্ণ সমর্থন করেন।

ইঁহাদের কথা সত্য হইলে, হিন্দীর মাধ্যমে বিজ্ঞান-শিক্ষা সম্পূর্ণ সম্ভব। এই কারণে ইংরেজী বজায় রাখার প্রশ্নই উঠিতে পারে না। কংগ্রেসের জেনারেল সেক্রেটারি অধ্যাপক এস. এন. আগরওয়াল গত কল্য (১৫ই ফেব্রুয়ারি) আমেদাবাদে এক বক্তৃতায় বলেন, ইংরেজীকে শিক্ষার মাধ্যম করিবার জন্য সম্প্রতি কয়েকজন নেতা যে প্রস্তাব করিয়াছেন তাহা তাঁহাদের বিচারবিমূঢ়তার পরিচায়ক। প্রকৃতপক্ষে নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে সাধারণভাবে এবং ওয়ার্ধা কলেজে বিশেষভাবে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে হিন্দী ও মারাঠী প্রবর্তিত হওয়ার পর শিক্ষার মান উন্নত হইয়াছে।

বাংলা দেশের রাজ্যপাল ডক্টর হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় গত ১লা অক্টোবর দার্জিলিঙে বঙ্গভাষা-প্রসার-সমিতির বার্ষিক সম্মেলনে ইংরেজী সম্বন্ধে তাঁহার সুস্পষ্ট অভিমত এইভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন:

I have been teaching, for the greater part of my life, the great literature of the English language and I am convinced, along with a large percentage of the *intelligentsia* of our country, among whom are to be counted the foremost thought-leaders of present-day India, that the English language with its literature is something which we cannot forego at the present moment or, for the matter of that, for any time. English supplies us with the most sustaining pabulum for our intellectual life. Through it, is made available to us in India, the entire achievement of the whole of humanity in the domains of the spirit and the intellect. I need not mention the value of English for science and technology. The acknowledged advance of a language like Bengali in its present-day literature is unquestionably due to our vital touch with English.

সর্বশেষে আচার্য যদুনাথ সরকারের কথা। গতকল্যকার (১৫ই ফেব্রুয়ারি) 'হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড' দৈনিক পত্রিকার রবিবাসরীয় অংশে তাঁহার একটি অতিশয় সুচিন্তিত নিবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে—"Compulsory Hindi for all India : Can it work ?"—"নিখিল ভারতের পক্ষে হিন্দীকে অবশ্য শিক্ষণীয় করা সম্ভব কি না ?" যুক্তিপূর্ণ বিচারের পর তিনি তাঁহার মত দৃঢ় ও স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন—"না, সম্ভব নয়।" এই নিবন্ধটি সকল ভারতীয়ের পড়িয়া দেখা কর্তব্য। কিছু অংশ আমরা উদ্ধৃত করিতেছি—

From 1962, Hindi in the Nagari script has been decreed to be the sole official language, discarding English which had so long occupied that position. The far-off effects of such a radical change ought to be considered beforehand. With Hindi as the sole medium of communication between the higher authorities and all people except the poorest, the higher education and the expression of the higher thoughts of the people are bound in the long run to be conducted in Hindi exclusively.

We must judge the proposed change from the points of view of (1) administrative convenience and cost and (2) its effect on our culture. The first of these considerations may be ignored by a reckless Finance Minister who glories in framing deficit budgets in peacetime. But how can the nation escape the fatal consequences of the second?

Apart from its desirabillity, is it humanly possible to impose the Hindi language on all the provinces of India? The answer given by human experience as recorded in history is an emphatic NO.

Officially Hindi may be declared as the only language of higher

education and official work ("above the taluqa level") all over India, and the parliamentary bosses in New Delhi may disregard the confusion, hardship and intellectual atrophy that such a change is bound to cause to nearly three-fourths of the Indian population. But the consequence should be clearly seen beforehand. Six centuries of Muslim rule failed to make the Bengali race (Muslims no less than Hindus) adopt Persian as their cultural or even popular speech, though during all these centuries the higher public offices (civil and military) were reserved for men who wrote Persian and spoke Persian (latterly Urdu), the religion of the dominant race was taught through Persian interpretations of Arabic, and the higher medical practice for all upper class people was conducted by Persian physicians. No Persian literature was born in Bengal and today that tongue has entirely disappeared from this province; the Bengali Hindus and Muslims alike create their literature in Bengali and speak Bengali at home and the market place.

ভারতের ভাষা সম্পর্কে নূতন করিয়া প্রশ্ন যখন সর্বত্রই উঠিতেছে, আর একবার সর্বভারতীয় ভিত্তিতে ইহার বিচার আবশ্যক। এই চার বৎসরেই হিন্দীওয়ালাদের মাথা গরম হইয়া উঠিয়াছে; সরকারী সমর্থনের জোরে কেহ কেহ সাম্রাজ্যবাদী মনোভাব স্পষ্টত ব্যক্ত করিতেছেন। গত ৫ই—৬ই ফেব্রুয়ারি আসানসোলে অনুষ্ঠিত প্রান্তীয় হিন্দী-সাহিত্য-সম্মেলনের উদ্বোধক শ্রীপুরুষোত্তমদাস ট্যাণ্ডন কবিরের দোহার দোহাই পাড়িয়া রবীন্দ্রনাথের সমগ্র কাব্যসাহিত্যকে নস্যাৎ করিয়া দিতে লজ্জিত হন নাই। পাগলের প্রলাপ বলিয়া তাঁহার অশ্রদ্ধেয় কথা উড়াইয়া দিতে পারি না, কারণ রাজর্ষির মতাবলম্বী প্রজা অনেক। এদিকে বাংলা দেশের স্কুলে ইতিমধ্যেই ইংরেজীর প্রতি এমন অবহেলা আরম্ভ হইয়াছে যে এই ধারা চলিতে থাকিলে দশ বৎসরের মধ্যে আমাদের সন্তান-সন্ততিরা ইংরেজী সম্পূর্ণ ভুলিয়া যাইবে। হিন্দীর প্রতি শ্রদ্ধা জন্মায় নাই, সুতরাং হিন্দীও যে ভাল শিখিবে তাহা মনে হইতেছে না। এ অবস্থায় এখনই একটা সিদ্ধান্তে আসা একান্ত প্রয়োজন। ইংরেজী থাকিবে, না, হিন্দী আসিবে, অথবা মাতৃভাষা সর্বত্র সকল কাজের বাহন হইবে? আবার সর্বভারতীয় মনীষীদের একটি সম্মেলন আহ্বান করিয়া ভাষা সম্পর্কে ভবিষ্যতের কর্মপন্থা অচিরাৎ নির্ধারণ করিয়া ফেলা হউক। একবার একটা সিদ্ধান্তে

উপনীত হইয়া মাঝপথে সোরগোল তুলিয়া স্বভাবত-অব্যবস্থিতচিত্ত দেশের লোকের মাথা গুলাইয়া দিলে দেশের কল্যাণ হইবে না।

*   *   *

নাগরী-লিপির অক্ষমতা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের উক্তি আচার্য যদুনাথ উদ্ধৃত করিয়াছেন। যাঁহারা পূর্বাপর চিন্তা করিবেন তাঁহারাই উপলব্ধি করিবেন যে, বাংলা দেশে মুসলমান আমলের পূর্ব হইতে ইংরেজ আমল পর্যন্ত সংস্কৃত দর্শন কাব্য ন্যায় অলঙ্কার তন্ত্র জ্যোতিষ প্রভৃতির চর্চা প্রভূত পরিমাণে চলিলেও দেবনাগরী লিপি বাঙালী হজম করিতে পারে নাই। গৌড়-রামকেলি, নবদ্বীপ-ভট্টপল্লী, কোটালিপাড়ার পণ্ডিতদের প্রসিদ্ধি সারা ভারতবর্ষব্যাপী; কিন্তু তাঁহারা যে বাংলা লিপিরই সমধিক পক্ষপাতী ছিলেন, তাহার প্রমাণ বেদ উপনিষৎ রামায়ণ মহাভারত পুরাণ, ন্যায় ও তর্কশাস্ত্র, ষড়দর্শন, বিবিধতন্ত্র, কাব্য অলঙ্কার প্রভৃতির যত পুঁথি বাংলা দেশে পাওয়া যায় তাহার অধিকাংশই বঙ্গাক্ষরে লিখিত। উনবিংশ শতকের গোড়া হইতে বর্তমান বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি কাল পর্যন্ত, রামমোহন ভবানীচরণ হইতে আরম্ভ করিয়া বঙ্গবাসী বসুমতী পর্যন্ত যত শাস্ত্রগ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে ও হইতেছে সবগুলিতেই বাংলা লিপি ব্যবহৃত হইয়াছে ও হইতেছে। সংস্কৃত ভাষায় ভারতের শেষ প্রসিদ্ধতম কবি জয়দেব সম্ভবত বঙ্গাক্ষরেই তাঁহার গীতগোবিন্দম্ রচনা করিয়াছিলেন। দেবনাগরী লিপির প্রতি বাঙালী কোনকালেই আনুগত্য দেখায় নাই। বাংলা হরফে হিন্দী চর্চার অধিকার লাভ করিলে বাঙালী হিন্দী ভাষা ও সাহিত্যে যে দক্ষতা দেখাইতে পারিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। অনেকে দেবনাগরী লিপিতে বাংলা বই ছাপার পরামর্শ দিতেছেন, আমাদের মনে হয় তদ্দ্বারা কোনও পক্ষেরই কোন সুবিধা হইবে না।

যাহা হউক, নিরপেক্ষভাবে ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া এই বিষয়ে বিবেচনা করিবার সময় আর একবার আসিয়াছে। বাংলা দেশের স্কুলগুলিতে পাঠ্যবিষয়সমূহের বিপর্যয় ঘটাইয়া ইংরেজী তথা বিশ্ব-সংস্কৃতির সহিত বাঙালীর চিরন্তন বিচ্ছেদ ঘটাইবার পূর্বে বাংলা দেশের নেতারা অন্তত আর একবার চিন্তা করুন। সংস্কৃতি ও শিক্ষা বিষয়ে যাহা বাংলা দেশ সম্পর্কে সত্য, তাহা সমগ্র ভারতবর্ষ সম্বন্ধেও সত্য।

রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, মৃত্যু একটা কঠিন কালো কষ্টিপাথরের মত। বঙ্গীয় বিধান-সভা ও বিধান-পরিষদের বর্তমান অধিবেশনের প্রথম দিনে নলিনীরঞ্জন সরকারের মৃত্যু সত্য সত্যই কষ্টিপাথরের কাজ করিয়াছে, কমিউনিস্টরা যে আসলে কি পদার্থ তাহা ওই পাথরে নাক ঘষিয়া তাঁহারাই আর পাঁচজনকে জানিতে দিয়াছেন। স্টালিনকে যাঁহারা দেবতাজ্ঞানে পূজা করেন তাঁহাদের পক্ষে সরকার মহাশয়ের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন না করাটা সমীচীন হয় নাই, কারণ তিনি এই কমিউনিস্টদের মতো মহাত্মা স্টালিনের সমগোত্রজ ছিলেন, বড় হইবার জন্য কোনও পথই তাঁহার পক্ষে অপথ ছিল না। স্টালিন যেন, নিউকর্ড, লুপ, গ্র্যাণ্ডকর্ড সকল লাইন ধরিয়া বড় হইয়া সর্বজনপূজ্য হইলেন, নলিনীরঞ্জন সরকারও যখন তাঁহার সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া সর্বশ্রেষ্ঠ পদবী আরূঢ় হইয়াছিলেন, তখন তিনিই বা অনুরূপ সম্মান পাইবেন না কেন? তবে অবশ্য স্টালিন আবার ট্রট্স্কি-নিসূদনও বটেন। ট্রট্স্কিকে সর্বত্র সকল ক্ষেত্রে শুধু অস্বীকারের দ্বারা উচ্ছেদ করার পন্থাও তাঁহারই। নলিনীরঞ্জন কি ট্রট্স্কির মত সমান সম্মান পাইবার অধিকারী?

*　　*　　*

কমিউনিস্টরা যাহাই মনে করুন, নলিনীরঞ্জন সরকার বাংলা দেশের একজন স্মরণীয় সন্তান। শৈশবে বাল্যে কৈশোরে স্কুল-কলেজে যথোপযুক্ত শিক্ষা না পাইয়াও অসাধারণ ধীশক্তি বলে তিনি যে শুধু অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছেন তাহা নয়, নানা সুপরামর্শ দিয়া অনেক সঙ্কট ও বিপর্যয় হইতে দেশকে নানা সময়ে রক্ষা করিয়াছেন। তাঁহার জীবনের ব্যবসায়লব্ধ অভিজ্ঞতা রাষ্ট্রীয় ব্যাপারেও সুপ্রযুক্ত হইয়াছে। হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইনসিওরেন্স কোম্পানির বর্তমান বিপুল প্রসার ও উন্নতি তাঁহারই কীর্তি। তাঁহার মৃত্যুতে বাংলা দেশ একজন অর্থনীতিবিদ্ পণ্ডিতকে হারাইয়াছে।

শনিরঞ্জন প্রেস, ৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, বেলগাছিয়া, কলিকাতা-৩৭ হইতে
শ্রীসজনীকান্ত দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ফোন: বড়বাজার ৬৫২০

২৫শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, চৈত্র ১৩৫৭

মহতের স্মৃতি

ভারতবর্ষে আজ স্বাধীন প্রজাতন্ত্র রাষ্ট্র। মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে ও অনুপ্রেরণায় অসংখ্য মানুষের অক্লান্ত চেষ্টায় এবং সানন্দ আত্মত্যাগে এই স্বাধীনতা আমরা অর্জন করিয়াছি। আমাদের স্বাধীনতা-সংগ্রামের পুরোভাগে যাঁহারা ছিলেন, তাঁহাদের অনেকেই আজ আর নাই। তাঁহাদের সেই দেশ সেবার কথা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ না করিলে, তাঁহাদের স্মৃতির যথাযোগ্য মর্যাদা না দিলে আমাদের এই স্বাধীনতার মাহাত্ম্য অনেকখানি কমিয়া যাইবে।

চিত্তরঞ্জন ছিলেন সেই যুদ্ধের এক মহান সেনানায়ক, যিনি কখনও দ্বিধা করিতে বা পিছু হটিতে জানিতেন না—জাতির কাজে যিনি আপনার সর্বস্ব বিলাইয়া দিয়াছিলেন।

অত বড় আইনজীবী সি. আর. দাশ কেমন করিয়া দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন হইয়া উঠিলেন, আমাদের জাতীয় ইতিহাসের সেই অধ্যায়ের কথা আমি এখানে বলিব না। মহাত্মা গান্ধীর আহ্বানে হাইকোর্টের বিপুল পসার পরিত্যাগ করিয়া দেশের দরিদ্রতম জনগণের পাশে আসিয়া যখন তিনি দাঁড়াইলেন, সমগ্র জাতি দেশের এই বন্ধুকে "দেশবন্ধু" বলিয়া সেই দিনই অভিনন্দিত করিয়াছিল। আমাদের এই পুরাতন দেশে রাজারা সিংহাসনের বিলাস-ঐশ্বর্য ত্যাগ করিয়া স্বেচ্ছায় বনবাসে গিয়াছেন—এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই। চিত্তরঞ্জন প্রাচীন ভারতবর্ষের সেই চিরন্তন আদর্শের প্রতীক ছিলেন। তাঁহার মধ্যে ভারতবর্ষ বহুকাল-বিস্মৃত আপনার আদর্শকে খুঁজিয়া পাইয়াছে।

চিত্তরঞ্জন জাতিকে অনেক কিছুই দিয়া গিয়াছেন; তাঁহার দেশ-সেবার সত্যই তুলনা হয় না। কিন্তু বোধ হয় জাতিকে তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ দান হইতেছে, আত্মোৎসর্গের ঐতিহ্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠায় এবং মহৎ উদ্দেশ্যে একনিষ্ঠ আত্মনিবেদনের আদর্শ-স্থাপনে। আমাদের প্রাচীন ঋষিরা ত্যাগের দ্বারাই আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন, চিত্তরঞ্জন

সেই মহৎ আদর্শই আমাদের সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছেন। জাতির জন্য, স্বাধীনতার জন্য কোন ত্যাগই চরম নয়—নিজের দৃষ্টান্তে এই শিক্ষাই তিনি আমাদের দিয়া গিয়াছেন।

সেই দেশবন্ধুর উত্তরাধিকারী আমরা। তাঁহার অমূল্য উত্তরাধিকার রক্ষার দায়িত্ব তাই আমাদের উপরই বর্তিয়াছে। সে কাজ সহজ নহে। দেশবন্ধুর তিরোধানের অব্যবহিত পরেই জাতির জনক মহাত্মা গান্ধী স্বয়ং তাঁহার স্মৃতিরক্ষার কাজে আগাইয়া আসিয়াছিলেন। তাঁহার স্মৃতি চিরজাগরূক রাখিবার উদ্দেশ্যে একটা নির্দিষ্ট পথে জাতির সেবাকার্য চালাইবার জন্য গান্ধীজী একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। চিত্তরঞ্জনের বাসগৃহে, তিনি যাহা নিজেই জাতিকে দান করিয়া গিয়াছিলেন, আজ এক বিরাট সেবাসদন বিরাজ করিতেছে। ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় ও তাঁহার সহকর্মীগণ সেই জন্য সমস্ত দেশের ধন্যবাদের পাত্র। এই সেবাসদন দেশের এক গর্বের বস্তু।

চিত্তরঞ্জনের নামের সহিত বিজড়িত সমস্ত কিছুই মূল্যবান জাতীয় সম্পত্তি। দেশবন্ধু যেখানে স্বাস্থ্যান্বেষণে গিয়া আর ফিরিয়া আসেন নাই, দার্জিলিঙের আরণ্য সৌন্দর্যের মধ্যে সেই নির্জন গৃহখানির কথাও আজ আমাদের স্মরণ করিতে হইবে। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত স্বরাজ্য পার্টির জয়লাভের পর বিদেশী শাসকদের দ্বৈতশাসনের মুখোশ খুলিয়া দিয়া তিনি যখন নূতন আন্দোলন চালাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন এবং সমগ্র দেশ যখন সেই আন্দোলনের আশায় উদ্গ্রীব হইয়া প্রতীক্ষা করিতেছিল, ঠিক সেই মুহূর্তে তিনি আমাদের ছাড়িয়া চলিয়া যান। দার্জিলিঙের সেই গৃহখানি ভারতের সেই মহান সন্তানের স্মৃতি বহন করিয়া আজও বিরাজ করিতেছে। এই পবিত্র ভবনদ্বারে শত শত যাত্রী আজও ভিড় করিতেছে।

এই গৃহখানি দেশবন্ধুর স্মৃতিমন্দিররূপে গড়িয়া তুলিতে জাতির পক্ষ হইতে আয়ত্ত করা আজও সম্ভব হয় নাই। ইহা শুধু দুঃখের কথা নহে, লজ্জার কথাও বটে। এতদিন বিদেশী শাসনের আওতায়

আমরা বাস করিতেছিলাম এবং আমাদের সমস্ত শক্তি সেই শাসনমুক্ত হইবার জন্য ব্যয়িত হইয়াছিল বলিয়া কোন কিছু করা অসম্ভব ছিল— এই কৈফিয়ৎ হয়তো আমরা দিতে পারি। কিন্তু আজ দেশ স্বাধীন হইবার পর সে কৈফিয়ৎ আর কি দেওয়া চলে? এই বিষয়ে আজও যদি আমরা নিষ্ক্রিয় ও নীরব থাকি, তাহা হইলে আমাদের লজ্জার পরিসীমা থাকিবে না। এই গৃহটিকে অধিকার করিয়া দেশবন্ধুর যথাযোগ্য স্মৃতিমন্দিরে রূপান্তরিত করিবার মহান দায়িত্ব আজ আমাদের গ্রহণ করিতে হইবে।

আমি আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে, ইতিমধ্যেই এ সম্বন্ধে এক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে। এই বাড়িটি অধিকার করিয়া ইহার দ্বিতলে, দেশবন্ধু যেখানে শেষনিশ্বাস ত্যাগ করিয়াছেন সেখানে, অসুখের সময় তাঁহার ব্যবহৃত দ্রব্যাদি, তাঁহার আলোকচিত্র, তাঁহার চিঠিপত্র, তাঁহার লেখার পাণ্ডুলিপি ইত্যাদি দেশের চারিদিকে বন্ধু ও ভক্তদের হেফাজতে যাহা ছড়াইয়া পড়িয়া আছে তাহা সংগ্রহ করিয়া সংরক্ষিত হইবে এবং নিম্নতলে একটি শিশুচিকিৎসাগার ও একটি স্বাস্থ্যকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইবে। হয়তো বা অদূরভবিষ্যতে সমাজশিক্ষা-ব্যবস্থার এক প্রতিষ্ঠানও এখানে স্থাপন করা সম্ভব হইবে।

পরিকল্পনার স্থূল খসড়া হইতেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে যে, সেই মহাপুরুষের স্মৃতিরক্ষার যোগ্য ব্যবস্থাই হইতেছে। এই পরিকল্পনাকে কার্যে রূপান্তরিত করিবার উপায় এখন আমাদের চিন্তা করিতে হইবে। আমাকে অসম্ভব-আশাবাদী বলিয়া আপনারা মনে করিলেও আমি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত বিশ্বাস করিয়া যাইব যে, কোন মহৎ কর্ম অর্থাভাবে কখনও বন্ধ হইতে পারে না।

গত অক্টোবরে আমি দার্জিলিং হইতে কলিকাতায় ফিরিয়া আসি। তখন এই "স্টেপ অ্যাসাইড" ভবনটি সংগ্রহ করার ব্যাপারে আমার দেশবাসীর নিকট কি পরিমাণ অর্থের জন্য ভিক্ষা চাহিব ঠিক বুঝিতে পারি নাই। আমি আমার বহু বন্ধুর সহিত এ বিষয়ে পরামর্শ করিয়াছি এবং তাঁহাদের মতামতও জানিয়াছি।

কলিকাতার সন্নিকটে এক ক্ষুদ্র শহরে এই সময় আমার যাইবার সুযোগ ঘটে। অনুষ্ঠানের শেষে স্থানীয় লোকেরা আমাকে একটি ৫০১৲ টাকার তোড়া উপহার দেন। এই টাকা লইয়া "দেশবন্ধু দার্জিলিং স্মৃতিরক্ষা-তহবিল" প্রতিষ্ঠা করিতে তাঁহারা আমাকে অনুরোধ জ্ঞাপন করেন; আমার পরিকল্পনা তাঁহারা কেমন করিয়া জানিলেন জানি না। মনে হয়, যে সব বন্ধুর সহিত আমি পরামর্শ করিয়াছি, তাঁহাদের কেহ এই কথা ইঁহাদের জানাইয়াছিলেন।

ইহার পর একটি ১১।১২ বৎসরের মেয়ের নিকট হইতে একটি মাত্র টাকা আমি পাই। মেয়েটি বলে যে, তাহাদের বাড়িতে দেশবন্ধুর ছবি আছে, স্বাধীনতা-সংগ্রামে তাঁহার দানের কথা সে জানে, তাঁহার স্মৃতিরক্ষার জন্য সে এই টাকাটি আমাকে দিতেছে।

এই ঘটনায় আমি এতই উৎসাহিত হইয়া উঠি যে, একটি সমিতি গঠন করি এবং "স্টেপ অ্যাসাইডে"র মালিকের সহিত আমাদের উভয়ের এক বন্ধুর দ্বারা কথাবার্তা চালাইতে থাকি ও এক আবেদন প্রচারের ব্যবস্থা করি।

দেশের উচ্চ ও নিম্ন মধ্যবর্তী সমাজের মধ্যে আমার এই আবেদন আজও পর্যন্ত সীমাবদ্ধ আছে। আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে, ইঁহাদের নিকট হইতেই ২৪এ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৩ তারিখের মধ্যে ১,৮০,০৪৯৸/২ সংগৃহীত হইয়াছে।

দেশবন্ধুর আগামী মৃত্যুবার্ষিকীর মধ্যে "স্টেপ অ্যাসাইড" জাতির অধিকারে আসিবে এবং সেখানে অন্তত শিশুচিকিৎসাগার ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রের কাজ আরম্ভ হইয়া যাইবে—এ আশা আমার আছে। দেশবন্ধু সমস্ত জাতির বন্ধু—এ কথা স্মরণ রাখিতে হইবে। সুতরাং তাঁহার উপযুক্ত স্মৃতিরক্ষার জন্য দেশের প্রত্যেকটি লোকের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সাহায্য লইয়া আগাইয়া আসা কর্তব্য—এই কথা আমি তাঁহাদের স্মরণ করাইয়া দিতেছি।

(রাজ্যপাল) শ্রীহরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়

বাংলা দেশে প্রথম রেলগাড়ি

১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই এপ্রিল ভারতবর্ষে রেলগাড়ি-চলাচলের শতবার্ষিকী দিবস, ১৮৫৩ সালের ওই তারিখে বোম্বাই হইতে কল্যাণ (থানা) এই তেইশ মাইল পথে সর্বপ্রথম রেলগাড়ি চলে। ভারতবর্ষে রেলগাড়ি প্রবর্তনের তোড়জোড়ের বিস্তৃত ইতিহাস যাঁহারা মাতৃভাষার সাহায্যে জানিতে চান, তাঁহাদিগকে (১) 'বিশ্বকোষ' ষোড়শ ভাগ "রেলওয়ে" শব্দ ৭১১-৭৩৩ পৃষ্ঠা এবং (২) ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে প্রকাশিত কালিদাস মৈত্র প্রণীত 'বাষ্পীয় কল ও ভারতবর্ষীয় রেলওয়ে' সমগ্র বইখানি (৩২০ পৃষ্ঠা) পড়িতে বলি। ইংরেজী ভাষায় অজস্র উপকরণ আছে। মোটামুটি যে সকল সংবাদ আমাদের কাজে লাগিতে পারে তাহা এই :

১৮৪৪, ২৩ জুলাই—১৮৪৮, ১২ জানুয়ারি বড়লাট ভাইকাউণ্ট হার্ডিঞ্জের শাসনকালে রেলওয়ে স্থাপনের প্রস্তাব হয়। ১৮৪৪ সনের ৮ই নবেম্বর মেসার্স হোয়াইট অ্যাণ্ড বরেট নামক ইংলণ্ডীয় বণিক সম্প্রদায় দক্ষিণ-ভারতবর্ষে রেলওয়ে স্থাপনের জন্য গ্রেট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে কোম্পানি গঠন করেন। ইঁহারাই নয় বৎসর পরে গ্রেট ইণ্ডিয়ান পেনিনসুলার রেলপথের সূত্রপাত করিয়া বোম্বাই হইতে কল্যাণ রেলগাড়ি চালান—১৮ই এপ্রিল ১৮৫৩। ১৮৪৪ সনের ২রা ডিসেম্বর রেল-ইঞ্জিন-নির্মাতা বিখ্যাত জর্জ স্টিফেনসনের আত্মীয় ম্যাকডোনাল্ড স্টিফেনসন ঈস্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে কোম্পানি স্থাপন করিয়া স্বয়ং কর্মাধ্যক্ষ হন। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কোর্ট অব ডিরেক্টরদের সহিত রেল কোম্পানিগুলির পত্রালাপ চলিতে থাকে। ১৮৪৮ সনের ১২ জানুয়ারি আর্ল অব ডালহৌসি বড়লাট হন। ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের ১লা মে ফ্রেড্‌রিক জেম্‌স্ হালিডে বাংলা দেশের সর্বপ্রথম ছোটলাট নিযুক্ত হন। ম্যাকডোনাল্ড স্টিফেনসনকে রেল-চালনা ব্যাপারে তিনি প্রভূত সাহায্য করিয়াছিলেন। লর্ড হার্ডিঞ্জ

ভারতে রেল চালাইবার প্রস্তাব অনুমোদন করিয়া যান। লর্ড ডালহৌসির আমলে তাহা কার্যে পরিণত হয়।

বঙ্গদেশে স্থাপিত প্রথম রেলপথের কথা আমাদের বক্তব্য। ১৮৪৯ সালের আগস্ট মাসে হাওড়া হইতে রাণীগঞ্জ পর্যন্ত রেললাইন পাতা হইবে স্থির হয় এবং রাস্তা নির্মাণের কন্‌ট্রাক্ট বিলি হইতে থাকে। ঈস্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের প্রথম প্রধান ইঞ্জিনিয়ার মিঃ টার্নবুল ১৮৫০ সনের মে মাসে কলিকাতায় আসেন; ১৮৫১ সনে ভূমি পত্তন হয়। ওই বৎসর জানুয়ারি মাসে হাওড়া হইতে পাণ্ডুয়া পর্যন্ত রাস্তার জমি জরিপ করা হয়। জঙ্গল কাটিয়া মাটি সমতল করিয়া লাইন পাতিতে আরও দুই বৎসর সাত মাস সময় লাগে এবং ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই আগস্ট তারিখে বাংলা দেশে প্রথম রেলগাড়ি চলিতে আরম্ভ হয়। এই তারিখটি সম্বন্ধে কোনও মতভেদ নাই, তবে হাওড়া হইতে প্রথম কতদূর পর্যন্ত রেলগাড়ি চলে সে সম্বন্ধে দুই রকম মত আছে। কেহ কেহ বলেন, প্রথম দিন হাওড়া হইতে হুগলী—তেইশ মাইল পথে গাড়ি চলে; কাহারও কাহারও মতে, প্রথম দিনেই হাওড়া হইতে পাণ্ডুয়া— এই আটত্রিশ মাইল পথ অতিক্রান্ত হয়। পূর্ববঙ্গ রেলপথের প্রচার-বিভাগ হইতে ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'বাংলায় ভ্রমণ' পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ডের ৬৭ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে :

> "ঈষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে কোম্পানি নামক একটি ব্যবসায়ীসঙ্ঘ ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই আগষ্ট তারিখে হাওড়া হইতে হুগলী পর্য্যন্ত ২৩ মাইল রেলপথ খুলেন। ইহাই পূর্ব্বভারত রেলপথের সূচনা। ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসের মধ্যে এই রেলপথকে রাণীগঞ্জ পর্য্যন্ত বিস্তৃত করা হয়।

'বিশ্বকোষ' (পৃ. ৭২৭) বলেন :

> ১৮৫১ সালের জানুয়ারিতে কার্য্যারম্ভ হইয়া ১৮৫৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে পাণ্ডুয়া পর্য্যন্ত ৩৭ মাইল রেলপথের কার্য্য সম্পূর্ণ হইল এবং ১৮৫৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে লর্ড ডালহৌসী কলিকাতা হইতে

রাণীগঞ্জ পর্য্যন্ত ১২১ মাইল রেলপথ খুলিয়া দিলেন। বর্দ্ধমানে তদুপলক্ষে মহাড়ম্বরে সাহেব-ভোজন হইয়া গেল। ডালহৌসী হাবড়া হইতে গাড়ী ছাড়িবার সময় উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু বর্দ্ধমানে যান নাই। সেই ১৮৫৫ খ্রীঃ ১লা ফেব্রুয়ারী বঙ্গদেশের এক স্মরণীয় দিন। সে দিন হাবড়া, শ্রীরামপুর, চন্দননগর, হুগলী ও বর্দ্ধমানে সহস্র সহস্র নরনারী লোকারণ্যের অপূর্ব্ব শোভা প্রদর্শন করিয়াছিল। চতুর্দ্দিক শঙ্খঘণ্টা এবং হুলাহুলী ধ্বনিতে বিদীর্ণ হইয়াছিল। বঙ্গবাসী বিস্ময়সম্বলিত কৌতুকে-নিমগ্ন মুগ্ধনেত্রে ইংরাজের অপূর্ব্ব কীর্ত্তি দেখিয়াছিল। প্রথমে অনেকে রেলগাড়ীতে চলিতে সাহস করে নাই। পরে বহুসংখ্যক যাত্রী যাতায়াত করিতে লাগিল এবং তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীর সংখ্যা প্রত্যহ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

ডক্টর নলিনাক্ষ সান্ন্যাল ১৩৩৯ মাঘ সংখ্যা 'বঙ্গশ্রী' পত্রিকায় (পৃ. ৯০) "ভারতে রেলগাড়ির আগমন" প্রবন্ধে লিখিয়াছেন :

"১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই আগষ্ট তারিখে ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলের কলিকাতা হইতে পাণ্ডুয়া পর্য্যন্ত লাইন খোলা হয়।"

এইগুলি পরবর্তী কালের রচিত ইতিহাস। সমসাময়িক সাক্ষ্য যাহা পাওয়া যায়, তাহাও নিম্নে সঙ্কলন করিয়া দিলাম। কালিদাস মৈত্র মহাশয়ের 'বাষ্পীয় কল ও ভারতবর্ষীয় রেলওয়ে' বইটি ১৮৫৫ সালের আগস্ট মাসে বাহির হয়। সুতরাং তাঁহার সাক্ষ্য সমসাময়িক বলা চলে। তিনি লিখিয়াছেন (পৃ. ৫৬-৫৭) :

হাওড়া অবধি পাণ্ডুয়া পর্য্যন্ত সাড়ে সাঁইত্রিশ মাইল প্রথমতঃ প্রস্তুত হইয়া ১৮৫৪ সালের ১৫ আগষ্ট বাসরে চলিতে আরম্ভ হয়, তাহার পর ১৮৫৫ সালের ফেব্রুআরি মাসের তৃতীয় বাসরে রাণীগঞ্জ পর্য্যন্ত বাষ্পীয় শকটের প্রথম গমন হয়। এতদ্দেশে রেলওয়ে নির্ম্মাণে প্রতি মাইলে এক লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে...

একেবারে সমসাময়িক দৈনিক সংবাদপত্রের সাক্ষ্যও পাওয়া যাইতেছে। তখন কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত জীবিত, 'সংবাদ প্রভাকর'

"প্রাত্যহিক পত্র" নিয়মিত বাহির হইতেছে। ১২ আগস্ট ১৮৫৪ শনিবারের 'প্রভাকরে' এই সংবাদটি রহিয়াছে :

> ১৬ আগষ্ট তারিখে রেইলরোড হুগলি পর্য্যন্ত খোলা হইবেক, এইক্ষণে কেবল ১ নম্বরের গাড়ি চলিবেক, অন্য দুই প্রকার গাড়ি প্রস্তুত হইতেছে, তাহা সেপ্টেম্বর মাসের ১ তারিখ অবধি চলিবার কল্পনা আছে, হাবড়া হইতে এক ব্যক্তির হুগলি যাইবার ভাড়া ৩ টাকা, আসিবারও তিন টাকা। বালী শ্রীরামপুর এই দুই স্থানেও গাড়ি থামান হইবেক, আর প্রাতে বেলা ৯ ঘটিকার মধ্যে একখানা গাড়ি আসিবেক ও চারিটার পর যাইবেক, এবং বেলা ৩॥ টার পরেও একখানা হুগলি হইতে ছাড়িবেক, অতএব যাঁহারা কলিকাতায় কার্য্য করিয়া এখান হইতে গমনপূর্ব্বক শ্রীরামপুরাদি স্থানে থাকিবার মানস করেন এই নিয়ম তাঁহারদিগের পক্ষে অতিশয় উপকারজনক বলিতে হইবেক।

ডেলি প্যাসেঞ্জারি ব্যাপারটার ইহাই সর্বপ্রথম উল্লেখ। কিন্তু কোনও অজ্ঞাত কারণে ১৬ আগস্ট তারিখকে আগাইয়া ১৫ই আগস্ট করা হয় কারণ ১৯শে আগস্ট শনিবারের 'প্রভাকরে' এই সম্পাদকীয় মন্তব্য বাহির হয় :

> গত ১৫ আগষ্ট মঙ্গলবার দিবসাবধি প্রতিদিবস রেইলরোডে বাষ্পীয় শকট গমনাগমন করিতেছে, ঐ শকটে আরোহণ পূর্ব্বক বালী, শ্রীরামপুর, চন্দননগর ও হুগলিতে গমন করিবার অভিলাষে রেইলওয়ে কোম্পানির কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত আর মেকডোলেও ষ্টিফেন্সন সাহেবের সমীপে এত অধিক লোক উপস্থিত হইতেছেন যে তিনি তাহারদিগকে টিকিট দিতে পারেন না, শকটে যত স্থান আছে, তাহারই টিকিট প্রস্তুত হইয়া থাকে, অতএব স্থান না থাকিলে তিনি কোথা হইতে টিকিট দিবেন, প্রথম দিবসে প্রায় ২০০ ব্যক্তি পত্র লিখিয়া হতাশ হইয়াছেন, আমরা অবগত হইলাম যে বর্ত্তমান আগষ্ট মাসের মধ্যেই শকট সংখ্যা বৃদ্ধি হইবেক, সেপ্টেম্বর মাসের প্রথমাবধি আর কোন ব্যক্তি হতাশ হইবেন না, রেইলরোডে যে তিন প্রকার শকট গমনাগমন করিতেছে, তাহার মধ্যে প্রথম শ্রেণীর শকট অতি উত্তম তাহাতে পাল্কিগাড়ির

স্থায় বসিবার গদি ও সাসি খড়খড়ি ও ছাদ আছে, তাহাতে আরোহিরা সুখে বসিয়া যাইতে পারেন, দ্বিতীয় শ্রেণীর শকট যদিও তাদৃশ নহে তথাচ মন্দ বলা যায় না, তাহার উপরিভাগে আচ্ছাদন ও প্রত্যেক ব্যক্তির বসিবার নির্দ্দিষ্ট স্থান আছে, কিন্তু তৃতীয় শ্রেণীর শকটের ছাদ নাই, ও তাহাতে আরোহিদিগের বসিবার স্থানও নির্দ্ধারিত নাই যিনি যেখানে বসুন বা দণ্ডায়মান থাকুন। আমরা শ্রবণ করিলাম ত্বরায় ঐ শকটে ছাদ হইবেক, অধুনা, আরোহিদিগের যে ক্লেশ হইতেছে তাহাও অনেক নিবারণ হইবেক। প্রথম ক্লাসের শকটে প্রত্যেক আরোহির প্রতি এইরূপ মূল্য অর্থাৎ ভাড়া নির্দ্ধারিত আছে, যথা বালী ৷৹ আনা। শ্রীরামপুর ১৶৹ আনা। হুগলি ৩ তিন টাকা। দ্বিতীয় ক্লাসে বালী ৶৹ আনা। শ্রীরামপুর ।৶৹। হুগলি ১৶৹ আনা। তৃতীয় ক্লাসে বালী /৹ শ্রীরামপুর ৶৹ আনা চন্দননগর ।/৹ হুগলি ।৶৹ আনা। এই নিয়মে রেইলওয়ে কোম্পানিদিগের যত্তপি অধিক লভ্য হয় তবে ক্রমে দর ন্যূন হইবেক।...রেইলরোড নির্ম্মাণ জন্য আমারদিগের বর্ত্তমান গবরনর জেনরল লার্ড ডেলহৌসি সাহেব প্রজাসমাজে যথেষ্ট সুখ্যাতি ভাজন হইবেন।

আর একটি খবর ১৬ই আগস্টের 'প্রভাকর' অর্থাৎ মাস-পয়লার (১লা ভাদ্র ১২৬১) কাগজে "শ্রাবণ মাসের ঘটনার সংক্ষেপ বিবরণে" পাইতেছি—

আগামি ১৬ আগষ্ট তারিখে আমারদিগের গবরনর জেনরল বাহাদুর পেঁড়ুয়া [পাণ্ডুয়া] কিম্বা রাণীগঞ্জ পর্য্যন্ত রেইলওয়ে শকট চালাইবেন।

বলা বাহুল্য, ওই তারিখে রাণীগঞ্জ পর্যন্ত গাড়ি চলে নাই। কারণ, ২রা ফেব্রুয়ারি ১৮৫৫ শুক্রবারের 'প্রভাকরে' সম্পাদকীয় স্তম্ভে দেখিতেছি:

শনিবার দিবসে [৩রা ফেব্রুয়ারি] রেইলরোড প্রকাশ্যরূপে রাণীগঞ্জ পর্য্যন্ত খোলা হইবেক, তাহার অনুষ্ঠান হইতেছে, হাবড়ায় গেট বাঁধা হইয়াছে, এপারেও গেট উঠিয়াছে, গবরনর জেনরল সাহেব অতি·

সমারোহ পূর্ব্বক বর্দ্ধমানে যাইবেন, মহারাজ বর্দ্ধমানাধীশ্বর আপনার রম্য আবাস অতি মনোহররূপে সজ্জীভূত করিতেছেন, কলিকাতার বিখ্যাত খাদ্যবিক্রেতা উইলসন সাহেব ঐ উদ্যানে ছয় শত সাহেবের খানা সাজাইবেন, রাজোদ্যানে অতি অল্প আমোদ প্রমোদ হইবেক না, বোধ হয় আমারদিগের গবরনর জেনরল সাহেবও ঐ খানার টেবিলে উপবেশন করিবেন।

রাণীগঞ্জেও তাম্বু পড়িয়াছে, সম্ভ্রান্ত সাহেবদিগের নিমিত্ত নিমন্ত্রণের টিকিট বাহির হইয়াছে, রেইলওয়ের কর্ম্মাধ্যক্ষ সাহেবেরাও নিমন্ত্রণের পত্র বাহির করিয়াছেন, অতএব ঐ দিবস অল্প সমারোহ হইবেক না, রজনীযোগে রেইলরোডের মঙ্গলার্থে আতোষবাজী হইবেক, এবং অপর এক দিবস টৌনহালে খানা হইবেক।

৫ই ফেব্রুয়ারি (১৮৫৫) সোমবারের 'প্রভাকরে' আসল ঘটনার বিবরণ সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত এইভাবে দিয়া সকল সন্দেহের নিরসন করিয়াছেন :

গত শনিবার পূর্ব্বাহ্ন বেলা অষ্ট ঘটিকাবধি ১১ ঘটিকা পর্য্যন্ত কলিকাতার সম্মুখস্থ গঙ্গার উত্তর তীরে মহাসমারোহ হইয়াছিল, স্থানে স্থানে গেট ও নানা বর্ণের পতাকা উড্ডীয়মানা হওয়াতে যে রমণীয় শোভার উদ্দীপন হয় তাহা লিখিয়া ব্যক্ত করা যায় না, সুমধুর স্বরে বণবাদ্য হয়, বেলা অনুমান ৯ ঘটিকার সময়ে গবরনর জেনরল বাহাদুর আপনার পারিষদ ও শরীররক্ষক সামন্তগণ কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া চতুরশ্ব সংযোজিত শকটারোহণে আরমাণি ঘাটে আগমন পূর্ব্বক নিজ সোণামুখী নৌকারূঢ় হইয়া গঙ্গার পরপারে অবতরণ করেন। গঙ্গাতে বাষ্পীয় তরী ও অন্যান্য জাহাজ সকল অতি মনোহররূপে সজ্জীভূত হইয়াছিল, সাহেব ও এতদ্দেশীয় ব্যক্তিদিগের শকটাদি দ্বারা গঙ্গার উত্তর তীরস্থ রাজবর্ত্ম একেবারে অবরোধ হইয়াছিল, সাহেব, বিবি ও অন্যান্য লোক কত গিয়াছিল তাহার সংখ্যা হয় না। গবরনর জেনরল সাহেব হাবড়ায় উত্তীর্ণ হইলে তাঁহার সম্মানসূচক তোপধ্বনি হয়, রেইলওয়ে সংক্রান্ত কর্ম্মচারিরা অগ্রসর হইয়া শ্রীশ্রীযুতকে গ্রহণ

করেন, সেনাবলী পথের উভয় ভাগে দণ্ডায়মান হয়। লার্ড সাহেব রেইলওয়ের শকটারোহণের স্থানে গমন করিয়া, উক্ত বর্ত্ম স্থাপিত হওয়াতে এদেশের যে মহোপকার হইয়াছে তাহা বক্তৃতা দ্বারা ব্যক্ত করিয়া আত্মীয়গণ সহিত শকটারোহণ করেন। গাড়ি বাষ্পীয় কলের বলে বায়ু অপেক্ষা দ্রুতবেগে গমন করিল, তদনন্তর লোককোলাহল কি বর্ণনা করিব, দাঁড়িমাঝির হাঁকডাক ও গাড়ির শব্দে মহাগোলযোগ হইয়া উঠিল।

গবরনর জেনরল সাহেব আত্মীয়গণ সহিত রাণীগঞ্জে গিয়া তথাকার তাঁবুতে খানা খাইয়া রজনী অনুমান সপ্ত ঘটিকার সময়ে হাবড়ায় প্রত্যাগমন করেন, ঐ সময়েও তাঁহার সম্মানসূচক তোপধ্বনি হয়।

হাবড়া হইতে রাণীগঞ্জ পর্য্যন্ত রেইলরোডের প্রথম শ্রেণী নির্ম্মিত হইল, দ্বিতীয় শ্রেণী রাজ[ী]গঞ্জ পর্যন্ত যাইবেক, তাহারও অনুষ্ঠান হইয়াছে। প্রথম শ্রেণী নির্ম্মাণকরণে যে কালবিলম্ব হইয়াছে, দ্বিতীয় শ্রেণী নির্ম্মাণে সেরূপ বিলম্ব হইবেক না, অতি অল্প সময়ের মধ্যেই রেইলরোড মুজাপুর পর্য্যন্ত যাইবেক। এই বর্ত্ম নির্ম্মাণ ও ইলেকট্রিক টেলিগ্রাফ স্থাপন দ্বারা [১৮৫৩] লার্ড ডেলহৌসি সাহেব বিলাতে ও এতদ্দেশীয় প্রজাসমাজে বিলক্ষণ প্রতিষ্ঠাভাজন হইয়াছেন, নচেৎ তিনি এদেশে আগমনাবধি এপর্য্যন্ত এমন কার্য্য করেন নাই যাহাতে তাঁহার সুখ্যাতি লেখা যাইতে পারে, তিনি এদেশে আসিয়া অবধি এপর্য্যন্ত কেবল পররাজ্য অপহরণ ব্রতেই নিযুক্ত হইয়াছেন···।

কিন্তু আসলে বড়লাট বাহাদুর শারীরিক অসুস্থতাবশত ডাক্তারের পরামর্শমত শেষ পর্যন্ত হাওড়াতেই ট্রেনে আরোহণ করিতে পারেন নাই। কলিকাতার লর্ড বিশপ, সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি সার্ আর্থার বুলার ও মাননীয় মিঃ ডরিন্স প্রভৃতি "প্রায় ১০০ সম্ভ্রান্ত ইংরেজদিগের সমভিব্যাহারে রাণীগঞ্জে গিয়াছিলেন, বেলা অনুমান ২॥টার সময় গাড়ি তথায় পৌহুঁছে।" ৮ই ফেব্রুয়ারি বৃহস্পতিবারের প্রভাকরে' সম্পাদক স্বয়ং এই ভ্রম-সংশোধন করিয়া লেখেন :

মান্তবর শ্রীযুত ষ্টিফেন্সন সাহেব সভাপতির পদে উপবেশন পূর্ব্বক গবরনর জেনরল সাহেবের অনাগমন জন্ত কিঞ্চিৎ আক্ষেপ প্রকাশ পূর্ব্বক পরিশেষে রেইলরোড বিষয়ে এক দীর্ঘ বক্তৃতা করেন…এইরূপ ক্রমশঃ বক্তৃতা ও মন্তপান হইলে সকলেই আমোদে গদ গদ হইয়া গাত্রোত্থান করত অপরাহ্ন বেলা ৪ ঘটিকার পূর্ব্বে শকটারোহণ করিয়া রজনী অনুমান সাত ঘটিকার সময়ে হাবড়ায় আসিয়া উত্তীর্ণ হয়েন।

১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা ফেব্রুয়ারি হাওড়া-রাণীগঞ্জ রেলগাড়ি চলাচল আরম্ভ হইবার দুই-তিন মাসের মধ্যে বর্ধমানের ৮ মাইল পশ্চিমে কানু নামক স্থান হইতে রাজমহল পর্যন্ত লুপ লাইনের নির্মাণ আরম্ভ হয়, এবং আরম্ভ কাল হইতেই এই কানু গ্রাম জংশনরূপে খ্যাত হয়। এই কানু জংশন আজকাল আমাদের কাছে খানা জংশন নামে পরিচিত*। এই সময়ে [১৮৫৫] ইস্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে কোম্পানি হাওড়া-রাণীগঞ্জ রেলপথের ভাড়ার তালিকাসহ যে নিয়মাবলী প্রকাশ করেন তাহা নিম্নে পুনর্মুদ্রিত হইল :

কারপেট-ব্যাগ অর্থাৎ থলেবিশেষ অথবা অন্ত কোন দ্রব্য যাহা চড়ন্দার স্বয়ং বহিয়া লইয়া যাইতে পারে অথচ যে ব্যক্তি লইয়া যায় তাহার বসিবার স্থানের নিম্নভাগে থাকিতে পারে এমত দ্রব্য ভিন্ন অন্ত দ্রব্যের কি মোনের কাত প্রত্যেক ৩ মাইলের প্রতি এক /• আনার হিসাবে ভাড়া দিতে হইবেক এবং সেই ভাড়া দিলে তাহার রসিদ পাইতে পারিবেন। গাড়িতে আরোহণকারিদিগের যে দ্রব্য লইয়া যাওয়ার ভাড়া দি ত হইবেক না তাহা নির্ব্বিঘ্নে পহুছিয়া দেওয়ার নিমিত্তে শ্রীযুত রেলওয়ে কোম্পানি দায়ী নহেন।

এক বৎসরের ন্যূন যাহার বয়স তাহার ভাড়া দিতে হইবেক না এবং যাহাদিগের বয়স আট বৎসরের ন্যূন তাহাদিগের অর্দ্ধেক ভাড়া দিতে হইবেক।

(৬৮১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

* পুরাতন বর্ণনায় পাইতেছি—"বর্দ্ধমানের এক মাইল পরে মহারাজার ১০৮ মন্দির। তাহার পর কানু জংসন। রেল পৃথক্‌ভূত। বামদিকে বৈদ্যনাথ হইয়া কর্ড লাইন ও ডাইন দিকে রাজমহল হইয়া লুপ লাইন চলিয়া গিয়াছে। উভয়ে লক্ষ্মীসরাইয়ে পুনরায় মিলিত হইয়াছে। পূর্ব্বে কানুর ধুমধাম ছিল, এখন ভগ্নাবস্থা। নিকটে বনপাসের লৌহদ্রব্যাদি প্রসিদ্ধ"।—শ্রীপদ্মনাথ ঘোষাল : 'ভারতভ্রমণ'

আমার সাহিত্য-জীবন

এগারো

শ্রীযুক্ত পি. আর. দাশ মহাশয় সেকালে পাটনার সাধারণ বাঙালী-বেহারী সমাজে গল্পের মানুষ ছিলেন। আইনজ্ঞ হিসেবে তাঁর যোগ্যতা, তাঁর দানশীলতা, তাঁর বৈষ্ণবধর্মে অনুরাগ, তাঁর উপার্জন—সবই ছিল বিস্ময়কর। তাঁর যুক্তিতর্কে সওয়ালে জবাবে দিনকে রাত্রি করতে চাইলে তাই হয়, রাত্রিকে দিন ব'লে প্রমাণ করতে উঠলে কোন প্রতিপক্ষই রাত্রিকে রাত্রি ব'লে কায়েম করতে পারেন না। তিনি উপার্জন করেন লক্ষ লক্ষ টাকা। কিন্তু তাঁর দান এমনি, খরচ এমনি যে, মধ্যে মধ্যে বা মাসের শেষে রিক্তহস্ত হয়ে পড়েন। সকালে সন্ধ্যায় তাঁর বাড়িতে খোল-করতালের বাজনা শোনা যায়, কীর্তনগান শোনা যায়—কীর্তন শুনতে শুনতে দাশ মহাশয় বিভোর হয়ে যান। আবার বিকেলবেলা বাড়ির সামনে যখন টেনিসের আসর পড়ে, তখন দাশ মশায় আর এক মানুষ;—নিজে খেলেন না, কিন্তু বেতের চেয়ারে ব'সে খেলা দেখেন, প্রতিটি মারের সমালোচনা করেন। খেলে ভারতবিখ্যাত খেলোয়াড়েরা, বিশ্ববিখ্যাত খেলোয়াড়েরা। খেলার মাঠের সঙ্গে সংস্রব আমি তখন অনেক দিন ছেড়েছি। প্রতিজ্ঞা ক'রে ছেড়েছি। ও-পথ হাঁটি না। এবং পথ-হাঁটা ছাড়ার সঙ্গে ক্রমে ক্রমে ও-দিকের খবর রাখাও ছেড়েছি। সে সেই মোহনবাগান-কুমোরটুলির মধ্যে সেমিফাইনালে মোহনবাগানের এক গোলে হারের খেলার পর। সে যে কি দুর্ভোগ আর আমাদের নিজেদের হীনতার কি পরিচয় ফুটে উঠেছিল, তা আজও মনে রয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে হাসিও পায়। সে যে কি হাস্যকর ঘটনা, সে আর কি বলব! বর্ণনা ক'রে বোধ হয় সে দৃশ্য পাঠক-মানসে পরিস্ফুট করা অসম্ভব। আমার সাহিত্য-জীবনের সঙ্গে তার সম্পর্ক অবশ্য অতি ক্ষীণ। তবে তারই ফলে আজও মাঠের সামনে খেলার সময় খেলা-ফেরত কর্দমাক্ত ছিন্নবস্ত্র উন্মত্তপ্রায় লোকগুলিকে যখন বাড়ি ফিরতে দেখি, তখন লজ্জা অনুভব করি, বেদনাও পাই। একবার মোহনবাগান-ঈস্টবেঙ্গলের

খেলার শেষে ট্রামে যে কদর্যতা দেখেছি এই নিয়ে, তার নমুনা আমার খাতায় লেখা আছে। এই নিয়ে একটি গল্পও লিখেছিলাম সেবার। সে কি মুখভঙ্গি ক'রে পরস্পরকে ভ্যাংচানো, কি ইঙ্গিত, কি গালাগাল সে সব সাহিত্যের আসরে ঠাঁই পায় না। তবে হ্যাঁ, মধ্যে মধ্যে এমন বোলচালও শোনা যায় যে, তারিফ না ক'রে পারা যায় না। সব ভুলে হাসতে হবে সেই মুহূর্তে। দুটো কথা আমার মনে গাঁথা হয়ে আছে। কোন্ দলের জানি না, খেলোয়াড়েরা বল প্রতিপক্ষের গোলের কাছে নিয়ে গিয়েও গোল করতে পারে নি, বলটা খোলা গোলের সামনে দিয়ে গড়িয়ে চ'লে গেল সীমানার বাইরে, কেউ ছুটে এসে ধরলে না বলটা, গোল লক্ষ্য ক'রে মারলে না. বিবরণটা এই। এই নিয়ে আলোচনা করতে করতে বক্তা ব'লে উঠল, আরে বাবা, চেঁচিয়ে গলা ফাটিয়ে দিলাম, ওরে, যা যা যা। তা নড়ল না একপা; কপাল চাপড়ে তারপরই বললে, তখন কি জানি মাইরি, ও জা নয়, ননদ। রাধা নয়, কুটিলে।

কথা অসংলগ্ন, তবুও প্যাঁচ আছে বইকি।

আর একবার এক পক্ষ অন্য পক্ষকে বলছে, ক্যায়সা হয়েছে! একেবারে দই দানিয়ে ছেড়ে দিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে উত্তর হ'ল, ঘাঁটাদের দই বাবা। ঘাঁটিয়ে ঘোল ক'রো না। খাওয়া যাবে না, মাথা চেঁচে মাথায় ঢালতে হবে।

অপ্রাসঙ্গিক ভাবে খেলার কথা এসে পড়েছে। তবুও কিছু না ব'লে থামতে পারছি না। 'কল্লোল-যুগে' বন্ধুবর অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত খেলার কথা উল্লেখ করেছেন, বলেছেন, মোহনবাগান তখনকার দিনে গোরা খেলোয়াড়দের হারিয়ে খেলার মাঠে বাঙালীর জাতীয় চেতনার আশ্রয়স্থল হয়ে উঠেছিল। মোহনবাগানের জিত হ'লে বাঙালী জাত ভাবত, এ তার জাতীয় জয়।

কথাটা অস্বীকার করার উপায় নেই। খেলার মাঠেই যেন জাতীয় চরিত্র, জাতীয় ভবিষ্যৎ একেবারে ভবিষ্যৎচিত্রের মত ফুটে উঠেছিল।

মহমেডান স্পোর্টিংএর আবির্ভাব, তার কয়েক বছরের দুর্দান্ত খেলা, মুসলিম দর্শকদের সম্প্রদায়গত উল্লাস—ছেচল্লিশের দাঙ্গার এবং বঙ্গদেশ-খণ্ডনের পূর্বচিত্র। শুনেছি, সেকালে ওদের ধুরন্ধর খেলোয়াড়দের কোন শটের, কোন পাসের প্রশংসা ক'রে কোন হিন্দু যদি বলত—ওয়াণ্ডারফুল খেলেছ, তবে সঙ্গে সঙ্গে আশপাশ থেকে তার মাথায় চাঁটি প'ড়ে যেত একসঙ্গে দু-তিনটে কি তারও বেশ। এবং ঘাড় ফেরালে সে দেখতে পেত, কয়েকটি দাড়িশোভিত মুখমণ্ডল দণ্ডবিকাশ ক'রে তার দিকে চেয়ে আছে আর বলছে, আবে, রসিদ খেলবে না তো তোরা বাপ খেলবে! এখন বাংলা ভাগ হয়ে ওদের খেলাও পড়েছে, তার দম্ভও নেই, এমন কি জিতলেও নেই। কিন্তু এখন বাঙালী দলের মধ্যে, বিশেষ ক'রে সমর্থকদের মধ্যে, যে কদর্য কলহদ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে, তাতেই এখন আমাদের রাজনৈতিক জীবনের প্রতিচ্ছবি ফুটে বেরুচ্ছে। মোহনবাগান-ঈস্টবেঙ্গলের খেলা নিয়ে ঝগড়া ক্রমবর্ধমান। ওটার মধ্যে কোন ইঙ্গিত আছে কি না বিশেষজ্ঞরা বলবেন। থাক্। এবার মোহনবাগান-কুমোরটুলির সেই স্মরণীয় খেলার কথা বলি।

তখন আমি শ্বশুরকুলের কলকতায় কয়লা-আপিসে কাজ শিখি। ওঁরা পাকড়ে এনে কাজে লাগিয়েছেন—কাজের মানুষ তৈরী হচ্ছে। রীতিমত কোট পেণ্টালুন টাই পরি, মাথায় হ্যাট পরি। দুর্ভাগ্যের কথা, সে অপরূপ বেশের ছবি নেই। বেড়াল-বাচ্চার-চোখ ফোটানো পদ্ধতিতে কয়েক মাসে কয়লা, হার্ডওয়ার—দুটো ডিপার্টমেণ্টের চার-পাঁচটা ব্রাঞ্চ ঘুরিয়ে এক অভিনব ডিপার্টমেণ্টে দিয়েছেন। কোম্পানির নাম—এন. মিটার অ্যাণ্ড কোম্পানি। লিমিটেড অবশ্যই। এন. মিটার কলকাতার কোন প্রাচীন মিত্র-বংশের সন্তান, এখানে লেখাপড়ায় কি অসুবিধে হয়েছিল বলতে পারি না, ফার্স্টক্লাসে বা ফার্স্ট আর্টস অর্থাৎ আই. এ. পড়তে পড়তে বিলেত চ'লে যান। যে ভাবে বাঙালীর ছেলেরা পালিয়ে বিলেত যায়, সেই ভাবেই যান

এবং বছর আট-দশ সেখানে থেকে ইঞ্জিনীয়ার হয়ে এক বেলজিয়ান পত্নী সহ কলকাতায় ফেরেন। এ দেশে তখন নিজের গণ্ডিতে নেটিভ স্টেট্‌সের প্রতাপ এবং প্রমোদস্পৃহা পুরোদমে বজায় আছে। মিত্র মশায় সন্ধান ক'রে গোয়ালিয়রের মহারাজার এক প্রমোদ-তরণী—হাউসবোট তৈরীর কন্‌ট্রাক্ট সংগ্রহ ক'রে ফেললেন। বিশ হাজার টাকার কন্‌ট্রাক্ট। খরচ খুব জোর বারো হাজার। মাস কয়েকের মধ্যে আট হাজার মুনাফা। এই টোপ নিয়ে লালবাজার অঞ্চলে তিনি ঘুরছিলেন। সেই টোপ গিললেন আমার শ্বশুরকুল। সায়েব-মিত্তির বেলজিয়ান পত্নীসহ গেলেন গোয়ালিয়রে, সঙ্গে চীনে মিস্ত্রী কাঠ বোল্ট নাট প্রভৃতি। এখানে রইল হেড অফিস। এখানে তিনি তাঁর তরফে বসিয়ে গেলেন তাঁর এক ভাইকে, এবং আমাকে বসালেন আর এক পক্ষ। মিত্তির সাহেবের ভাইয়ের নাম বোধ হয় ডি. এন. মিটার। একখানি খাঁটি কলকাতার ছেলে। কথা-বার্তায়, চালে-চলনে, ঠোঁটের কোণে সিগারেট ধরায় শরৎচন্দ্রের দর্জিপাড়ার দাদার মত কলকাতার মহিমা ঘোষণা করেন। তবে এটা ঠিক যে, দর্জিপাড়ার দাদার মত অবজ্ঞা ছিল না। কথাবার্তা শোনবার মত। তুবড়ির মত ফুলঝুরি ফোটাতে পারতেন ভদ্রলোক। দুনিয়ায় জীবনটাকে সাবানের মত ঘ'ষে ফেনায় পরিণত ক'রে রাঙন ফানুসের মত উড়িয়ে উড়িয়ে শেষ ক'রে দেওয়ার আইডিয়া ছিল তাঁর। কথায় কথায় বলতেন দি আইডিয়া! কলকাতার কত গল্প যে করতেন! কাজ আমাদের খুব কম ছিল। গোয়ালিয়রের দু-তিনখানা চিঠির জবাব আর বরাত থাকলে জিনিস কিনে পাঠানো। বাকি অধিকাংশ সময়টাই ওই বাক্‌চাতুর্য এবং গল্প চলত। আমার সাহিত্যপ্রীতির কথা জেনে লাফিয়ে উঠে বলেছিলেন, মাই গুড লাক্‌! বলেন কি? আমি নিজে অথর। ড্রামাটিস্ট। মিলবে ভাল! ট্রা লা ট্রা লা।

এই ধরনের মানুষ। তাঁর 'মৎকরাক্কা' ব'লে একখানি প্রহসন আমাকে দিয়েছিলেন। তাঁর বাক্‌ভঙ্গি ভাল লেগেছিল। সত্যিই ভাল ছিল।

তিনটে সাড়ে-তিনটে বাজতেই মিত্তির আমাকে টেনে নিয়ে চলতেন খেলার মাঠে।

মোহনবাগান সেবার ফাস্ট´বা সেকেণ্ড রাউণ্ডে দুর্ধর্ষ ডি. সি. এল. আই.কে বেকুব বানিয়ে হারিয়ে দিলে। খেলার শেষে মিত্তির ফেল্টহ্যাট-খানা শূন্যে ছুঁড়ে দিয়ে বিচিত্র ক্ষিপ্রতার সঙ্গে অভ্যাস-করা সুকৌশলে মাথায় প'রে নিয়ে বললেন, ইন দিস ওয়ে, ব্যানার্জি, জাস্ট ইন দিস ওয়ে মোহনবাগান উইল উইন দ্য শিল্ড্ দিস ইয়ার।

'ইয়ার'টা অবশ্য 'ইয়া' ব'লেই শেষ করলেন।

এই এঁর সঙ্গে সেদিন একটার সময় গেলাম ক্যালকাটা মাঠে—মাঠের ধারে চেয়ারের টিকিট কিনে বাক্স চারেক সিগারেট পকেটে নিয়ে বসলাম। তার তিন দিন আগে আপিস থেকে মিত্তির সে আমলের অয়েলস্কিনের ওয়াটারপ্রূফ আদায় করেছেন, সেইটে তাঁর কাঁধে, আমার কাঁধেও একটা। সিগারেট ফুঁকি, মিত্তির গল্প ক'রে যান, সময় চ'লে যায় হাওয়ায় উড়ে। তিনটে নাগাদ এল বৃষ্টি। সে কি বৃষ্টি! আমি বললাম, ওরে বাপ, এ যে মুষল ধারে নামল!

মিত্তির বললেন, লাইক ক্যাট্স্ অ্যাণ্ড ডগ্স্, অ্যাঁ! পকেটে পুরুন।

ভিজে একেবারে চুপসে গেলাম। শুকনো খটখটে মাঠ জলে ভ'রে গেল। এরই মধ্যেও লোকের চাপ বাড়তে শুরু করল। সাড়ে চারটে নাগাদ অবস্থা হ'ল, দুই বাঁধের মাপের মধ্যে কানায় কানায় ভর্তি জলের আবর্তের মত। সে জল মুহূর্তে মুহূর্তে বাড়ছে। ওদিকে গ্যালারির সামনে গ্রাউণ্ড ঘেরা দড়ির সীমারেখা। অবস্থা দেখে বাঁধ রক্ষা করতে সারি সারি পুলিস এসে দাঁড়িয়েছে ব্যাটন হাতে। পিছনের গ্যালারির ওপর থেকে গ্রাউণ্ডের ধার পর্যন্ত সকলে দাঁড়িয়ে উঠেছে। পিছন থেকে চাপ আসছে সামনের দিকে—সামনের উদ্যতব্যাটন পুলিসের ঠেকায় ধাক্কা খেয়ে সামনের মানুষ দিচ্ছে পেছনে ঠ্যালা। মানুষ প'ড়ে যাচ্ছে, পাশের মানুষের জামা আঁকড়ে ধরছে—সে ছিঁড়ুক আর থাক্ যাই হোক, তাকে বাঁচতে হবে। মাঠের মাটির ওপর

গোড়ালি-ঢাকা জল পায়ে পায়ে তলতলে কাদায় পরিণত হয়েছে, ছিটে লেগে সর্বাঙ্গ চিত্রিত করেছে, মুখে কাদা লাগছে, চোখে কপালে লাগছে, পা পিছলোচ্ছে। শ্বাস প্রায় রুদ্ধ হয়ে আসছে। সমস্ত জনতা চাপবন্দী হয়ে একবার সামনে, একবার পিছনে অহরহ দোল টলমল করছে। আজও মনে করতে পারি যে, সেদিন মনে হয়েছিল বোধ করি প'ড়ে গিয়ে মানুষের পায়ের চাপে থেঁতলে যাব অথবা দম বন্ধ হয়ে যাবে। মিত্তির আমার পাশে, তার টুপিটা কোথায় চ'লে গেছে, টাইটা বেচারা নিজেই শ্বাস-প্রশ্বাসের কষ্টে খুলে ফেলেছে অয়েলস্কিনের ওয়াটারপ্রুফটা কাদায় ভ'রে গেছে, ছিঁড়ে ফর্দাফাঁই হয়ে গেছে, লম্বা ভিজে চুলগুলো চোখে নাকে এসে প'ড়ে আছে—সে হাঁফাচ্ছে। আমিও তাই। তবে আমি এতখানি অধীর হই নি। মিত্তির অধীর হয়ে গেছে—তারই বুকে একটা হাত রেখে সামনে পুলিস ঠেলছে। সে হঠাৎ ব'লে উঠল সেই পুলিস কন্‌স্টেব্‌লটিকে, একেবারে খাঁটি মাতৃভাষায় সরল সহজ অকৃত্রিম ভঙ্গিতে, বাবা দয়া ক'রে এখান থেকে বার ক'রে দাও বাবা।

সে লোকটা ভেঙিয়ে ভাঙা বাংলায় ব'লে উঠল, হাঁ, আভি বলছে বা-বা, দয়া করকে হিঁয়াসে বাহার ক'রে দাও বাবা! ঘুষথা কাহে? অাঁ? হাম বোলা ঘুষনে লিয়ে? বাহার করকে দাও বাবা! হটো—হটো—পিছু হটো। চলো।

মিত্তিরের পিছনে কেউ প'ড়ে যাচ্ছিল, সে তার আমার কলার ধরলে চেপে। মিত্তির এবার পড়ল, তার সঙ্গে আমিও পড়লাম। পুলিস মারলে ব্যাটন।

তারপর খেলা শুরু হতে জনতা একটু স্থির হ'ল। আমার পাশেই উত্তর দিকের গোলপোস্ট, পাঁচ হাত তফাত। সেকেণ্ড হাফে মোহনবাগান ও-দিকে খেলছে। একটা বল এসে ধপ ক'রে প'ড়ে কাদায় ব'সে গেল এইটিন ইয়ার্ডের লাইনের ওপর। কুমোরটুলির খেলোয়াড়রা অন্তত বিশ-পঁচিশ গজ দূরে। মোহনবাগানের গোলি

পাল ছুটলেন মারবার জন্যে। পা তুললেন, পড়লেন, পিছলে চ'লে গেলেন গজ দশেক, তারপর ছুটলেন পরামাণিক। তিনিও পা তুলতে গিয়ে প'ড়ে ঠিক এমনি ভাবে চ'লে গেলেন গজ পনের। গোল-কীপার ছুটলেন, কিন্তু বলের কাছে পৌঁছুবার আগেই মুখ থুবড়ে পড়লেন। গজ বিশেক দূরে ছিল হুইট্‌লে—কুমোরটুলির সেণ্টার ফরোয়ার্ড। সে এবার বেড়াতে বেড়াতে এল, টুপ ক'রে মারলে, বলটাও এসে জালে পড়ল—কাতলা মাছের মত। বাস্, দেহের নির্যাতনের ওপরে মনের উৎসাহ-আশার মস্তকে একখানি ছিন্ন পাদুকার চাঁটি। আমাদের দেশের একটা প্রচলিত কথা মনে পড়ছে—মারকে মার তার উপর পাঁচ সিকে জরিমানা। খেলার মাঠ থেকে বেরিয়ে মিত্তির কান মলেছিলেন, সত্যি সত্যি, আর যদি খেলা দেখতে আসি তো—

আমি কান মলি নি, তবে মনে মনে সঙ্কল্প করেছিলাম, খেলা আর দেখব না। সে সঙ্কল্প রক্ষা ক'রেই এসেছি। বোধ করি সমগ্র সাহিত্যিক-জীবনে দিন চার-পাঁচ পাল্লায় প'ড়ে গেছি। এর মধ্যে একদিনের কথা মনে আছে, শ্রীযুক্ত নৃপেন চট্টোপাধ্যায়ের কাছেই বোধ হয় শুনেছিলাম যে, শ্রীসৌম্যেন ঠাকুর দেশে ফিরেছেন, তিনি মাঠে আসবেন। সেদিন গিয়েছিলাম সৌম্যেনবাবুকে দূর থেকে দেখতে।

আর একদিন শৈলজানন্দের সঙ্গে গিয়েছিলাম।

আর একদিন, এই সেদিন ১৯৫০।৫১ সনে কমনওয়েলথ ক্রিকেট টীমের সঙ্গে ভারতীয় টীমের ক্রিকেট ম্যাচ দেখতে গিয়েছিলাম। ঘণ্টা দুয়েক ছিলাম। ক্রিকেট ম্যাচ দেখা সেই প্রথম, সেই শেষ।

নিজে এককালে উনিশ-কুড়ি বছর বয়স পর্যন্ত ফুটবল হকি খেলেছি। টেনিসও খেলতে চেষ্টা করেছি। ব্যাডমিণ্টন ভাল খেলেছি। ফুটবল খেলার ঝোঁকের জন্যে ইস্কুল-জীবনে পাঁচ টাকা জরিমানা দিয়েছি। আমাদের ওখানকার কীর্ণাহার ফুটবল টীমকে ম্যাচ খেলায় নেমন্তন্ন ক'রে ভাল ক'রে খাওয়াতে পারি নি ব'লে তারা না খেলে চ'লে গিয়ে আমার নামে আমাদের হেডমাস্টারের কাছে অভিযোগ করেছিল।

হেডমাস্টার মশায় জরিমানা করেছিলেন, তাঁকে না জানিয়ে চ্যালেঞ্জ করার জন্যে। এই ঝোঁক আমার জীবন থেকে ওই একটি ঘটনায় মুছে গেছে।

তাই পাটনায় গিয়ে যখন মজলিসে পি. আর. দাশ মশায়ের বাড়িতে আগন্তুক বিখ্যাত খেলোয়াড়দের নাম শুনতাম, তখন তাদের ঠিক চিনতাম না। আজও সে সব নাম মনে করতে পারি না। তবে দুটো নাম মনে আছে। একজন ওয়াই. সিং। আর একজন ফরাসী দেশের খেলোয়াড়—ক্রোচে কি ক্রোসে। দাশ মশায়ের দুই ভাইপো তখন বালক। একজন ফার্স্ট ক্লাসে উঠেছে, একজন টেস্ট দিয়েছে—খসু সেন ও নসু সেন।

এই নসু সেন এবং খসু সেনকে বাংলা পড়াবার ভার আমাকে দিলেন দাশ মশায়। প্রথম দিন রাত্রে তাঁর সঙ্গে পরিচয় হ'ল। গৌরবর্ণ, শুক্লকেশ, সুস্থদেহ মানুষ, সরল সরস বাক্যালাপ। চোখ দুটি তাঁর প্রতিভার পরিচয় বহন করে। এক কথায় বললেন, এক শো টাকা মাসে দেব আমি। ওদের বাংলার সঙ্গে পরিচয় ক'রে দিন। এই টাকা থেকে আমার সাহিত্যিক-জীবনের প্রথম ফাউণ্টেন পেন কিনেছিলাম। সেটি আজও রয়েছে।

সেবার পাটনায় তিন মাস ছিলাম। মধ্যে মধ্যে দাশ মশায় এক-একদিন ডাকতেন। একটি ছোট ঘরে ব'সে আলাপ করতেন। আমার কখানি বই তাঁকে দিয়েছিলাম। 'রাইকমল' তাঁর ভাল লেগেছিল। একদিন বলেছিলেন, আমার সময় থাকলে আমি ইংরিজীতে অনুবাদ করতাম আপনার এই বইখানি। এতে বাংলার অপরূপ প্রাণের পরিচয় আছে।

আর বলতেন, আমার এক সময় কিছু লেখবার ইচ্ছা ছিল। এখনও মধ্যে মধ্যে ইচ্ছে হয়। প্লটও তৈরি করি। কিন্তু সে আর লেখা হয়ে ওঠে না। আমার লেখার ইচ্ছে নাটক। আপনি নাটক লেখেন না কেন?

আমি 'মারাঠা-তর্পণের' কথা বলেছিলাম। বলেছিলাম, নাটক এই জন্যেই আর লিখি না।

দাশ মশায় বলেছিলেন, তা হ'লে আর একবার লিখুন নাটক। আমার একটা প্লট আপনাকে দেব আমি।

প্লটটির কালের পটভূমি বৌদ্ধযুগ। বলতে শুরু করলেন তিনি। অল্প কিছুদূর বলার পরই সেদিন দু-তিনজন খ্যাতনামা ব্যক্তি এসে উপস্থিত হলেন। পাটনার বাঙালী। একজন তার মধ্যে পাটনা হাইকোর্টের রেজিস্ট্রার (তখন রিটায়ার করেছেন) অমর মুখোপাধ্যায়। তাঁরা এসে বেহারে বাঙালীদের সমস্যা তুলে আলোচনা শুরু করলেন। সেই দিন সেই ঘরে আমার সামনেই, বেহার-বেঙ্গলী-অ্যাসোসিয়েশনের পত্তন হ'ল। স্থির হ'ল, সভা আহ্বান করা হবে এবং সমিতি তৈরি হবে। তার মুখপত্র থাকবে। কর্মী সন্ধানের কথা উঠল। আমিই সেই সভায় মণি সমাদ্দারের নাম করেছিলাম। মুখোপাধ্যায় মশায় বলেছিলেন, দেখি সন্ধান ক'রে কেমন ছেলে। অল্প-স্বল্প জানি। তবু ভাল ক'রে জানি, সকলকে জিজ্ঞেস করি। কিন্তু দাশ মশায় বলেছিলেন, দরকার নেই। এঁরা হলেন সাহিত্যিক, তরুণ-সমাজের খাঁটি পরিচয় ওঁরাই জানেন নির্ভুল ভাবে। বুঝলেন, এঁরা ছেলেদের খুব প্রিয়জন। মণিকেই নিন। মাথার ওপরে শচী বোস আছে।

পি. আর. দাশ মশায় পৃথিবীর নিন্দা-প্রশংসাকে গ্রাহ্য করেন না। উদার হৃদয়বান মানুষ। একটি বিশিষ্ট যুগের জীবন-দর্শনের প্রতীক। সব থেকে ভাল লেগেছিল মানুষটির সরলতা।

পাটনায় প্রবাসী-বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলন হ'ল। তার অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি হয়েছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের রিটায়ার্ড জজ মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় মশায়। দাশ মশায় সহকারী সভাপতি। সানন্দে পদ গ্রহণ করলেন, পাঁচ শো কি বেশি টাকা চাঁদাও দিলেন। অর্পণা দেবী তাঁর কীর্তনের সম্প্রদায় নিয়ে আসবেন, নিজের বাড়িতে তাঁদের থাকবার ব্যবস্থা করলেন। এরই মধ্যে কেউ তাঁকে বুঝিয়ে

দিলে, এতে আপনার মর্যাদার হানি হয়েছে। দাশ মশায় তাই বুঝে গেলেন এবং আয়োজন শুরু করলেন এই সময়টায় যাবেন রাজগীরে। তাঁবুর বরাত হ'ল, আয়োজন হ'ল। এখানকার বাঙালীরা রত্নীনদার নেতৃত্বে গিয়ে বললেন—সে কি ক'রে হয়? আপনি থাকবেন না, সম্মেলন হবে কি ক'রে?

দাশমশায় ঘাড় নেড়ে বললেন, উঁহু। সে হয় না। আমাকে যেতেই হবে।

একেবারে সরল ছেলেমানুষের মত।

লোকে তাঁকে দাম্ভিক বলেছিল।

কিন্তু আমি মানুষটিকে যতটুকু জেনেছিলাম, তাতে ওই অভিমান বা দাম্ভিকতার মূলে দেখেছিলাম একটি সারল্য।

দাশ মশায়ের দরজায় এসে দাঁড়াল একটি ছেলে—গরিব, পড়বে, সাহায্য চাই।

বেরিয়ে এসে অসহিষ্ণুর মতই প্রশ্ন করলেন, কি, কি চাই?

সাহায্য।

নেই। নেই। আমায় কে সাহায্য করে ঠিক নেই।

ঢুকে গেলেন ভিতরে। আবার বেরিয়ে এলেন, কিসের জন্য সাহায্য?

পড়ব।

পড়বে?. কি পড়বে? কোথায় বাড়ি? কত সাহায্য চাই?

উত্তর শুনলেন। বললেন, আচ্ছা, মাসে মাসে এসে নিয়ে যাবে। যাও। এখন যাও। যাও।

ভিতরে চ'লে এলেন।

ঘটনাটি আমারই সামনে ঘটেছিল।

দাশ মশায়ের সঙ্গে পরিচয় পাটনায় যাওয়ার মস্ত বড় লাভ।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

পাগলা-গারদের কবিতা

[পাগলা-গারদে অবস্থানোচিত বদ্ধ-পাগল ও অন্যান্য
অবস্থায় রচিত পদ্য-কবিতা, গদ্য-কবিতা ও ছন্ন-কবিতা]

চৈতালী

নবীন চৈত্তে বহিছে চৈতী হাওয়া
হায় ওরে কবি, হায় কবি, হায় হায় রে !
ফাগুন হারায়ে এখনো কি তোর ফাগুনের গান গাওয়া,
"হারানো ফাগুন আয় ফিরে আয়, আয় রে" ?

সোনালী ফাগুনে অনেক নাচা তো নাচলি,
ওরে বাছা মোর, অনেক বাছা তো বাছলি,
শোনালি অনেক গান—
বৈতালিকের চৈতালী সুরে পেতে দে এবার কান—
(কেন) ভূতের মতন পিছু-পায়ে মিছে ফাগুনের পিছে ধাওয়া ?

ওরে উন্মাদ, এক মাঘে শীত যায় না,
এক ফাল্‌গুনে বসন্ত না ফুরায় রে।
মহাকাল-পথে বছরের চাকা অবিরাম ঘোরে ঘর্ঘর,
আসে মাসগুলো পালা ক'রে ক'রে পর পর—
(ওরে) ফাগুন গিয়েছে, আবার ফাগুন আসবে
রঙের আগুন বনে বনে আর
মনে মনে জ্বেলে হাসবে
কে জানে তখন আগামী ফাগুনে তুই র'বি কি না র'বি
ওরে উন্মাদ কবি ?

অসীম ফাঁকায় যবে হয়ে যাবি ফাঁক
তোরে কি খুঁজিবে কোনো ফাগুনের ডাক
হায় কবি, হায় হায় রে ?
ক'বে কি ফাগুন, "কোথা তুই ওরে ফাগুন-পিয়াসী কবি ?
হারানো বন্ধু, আয় ফিরে আয় আয় রে !" ?

(ওরে) ফাগুন যে যায় আবার ফিরিবে ব'লে
মোরা চ'লে গেলে আর কভু নাহি ফিরি।
মোদের জীবন ছোট্ট দীপের শিখা,
অসীম আঁধার রয়েছে তাহারে ঘিরি ;
হাওয়ায় সে দীপ নিবে গেলে হায়,
আলোকের শিখা কোথা যে মিলায়
সন্ধান তার ফাগুন কভু কি চায় রে ?

ফাগুনের তরে মিছে কেন তবে কাঁদা ?
আয় কবি আয়, আয় রে আমার দাদা,
ফাগুন হারায়ে পেয়েছি চৈত্র সাথী—
ফাগুনের ফুল ঝ'রে গেছে ? যাক্ ঝ'রে।
প্রাণ ভ'রে আয় চৈতী ফসলে মাতি ॥

বিদ্যুতের প্রতি মেঘ-ওয়ালা

আমার মেঘেরে তুমি কেন হানো চোখের ইশারা
হে বিদ্যুৎ ?
বৃথা—বৃথা—বৃথা তব এ চেষ্টা অদ্ভুত।
মোর মেঘ যদি দেয় সাড়া
তোমার চমকে,
কাঁপাইবে অন্তরীক্ষ প্রচণ্ড ধমকে।

হে বিদ্যুৎ, মনে হয় সুদূর অদূরে
কালো আকাশের স্লেট জুড়ে
কোনো মহা-খোকা
তোমার পেন্‌সিল দিয়ে করে লেখা-জোখা।
আমার মেঘের বুকে পড়ে তার এলোমেলো ক্ষণিক আঁচড়
ঝলসিয়া দিক্-দিগন্তর।

হে বিদ্যুৎ, হে চির ক্ষণিক
স্বর্ণ-বণিক !
কু-বর্ণ মেঘের ভালবাসা
বৃথা তুমি কর আশা।
আমার এ মেঘ
ধীর-বেগ, সংযত-আবেগ,
বক্ষভরা জলে তার মিটাবে না তোমার পিপাসা ;
বৃষ্টি যবে হবে শুরু
মৃদু মৃদু কিংবা গুরু গুরু,
বর্ষণ-মুখর কোনো দিনে কিংবা রাতে ঝুরু ঝুরু,
পৃথিবীরে ফিরাইয়া দিয়া পৃথিবীর জল তবে
মোর মেঘ রিক্ত হয়ে ঋণমুক্ত হবে ॥

ঠিকানা

(ওমর খৈয়াম, ফেরদৌসী, জালালুদ্দীন রুমী, শেখ সাদী, মহাকবি গ্যেটে ও হোমারের মিশ্র অনুপ্রেরণায়)

ঠিকানা তোমার হারায়ে ফেলেছি নর্মদায়,
হে সুন্দরি !
যে বাণী তোমায় কোনোদিন বলা হয় নি হায়,
না-বলা রহিল, মরি !
একা আনমনে ন্যাণ্ডো-গেঞ্জি গায়ে
বৃথা পথে ঘুরি ছেঁড়া স্যাণ্ডেল পায়ে
এ পথে তোমায় কারো মনে নাই
ব্যর্থ ব্যথায় হিয়া কাঁদে তাই,
সুদূর-পিয়াসী বিধুর চক্ষে বৃথা দূরবীন ধরি—
তোমারে সে দূরে দেখি না তো সুন্দরি !
যে সাদা দেয়ালে কালো পেন্‌সিলে
লিখেছিলে তব নাম

তারি 'পরে হায় হয়ে গেছে সখি,
বেদরদী চুনকাম।
যে গাছের বুকে হানিয়া তীক্ষ্ণ ছুরি
এঁকেছিলে তুমি নামটি তোমার—
কাটা গেছে তার গুঁড়ি।
তারি কাঠে গড়া চেয়ার টেবিল
বেঞ্চি ও টুল, দরজা ও খিল
খরিদ্দারের মুখ চেয়ে আছে
ছুতোর-দোকানে পড়ি'—
হে সুন্দরি!

তবে আর মিছে ঠিকানার পিছে
কেন বা ধাওয়া?
ঠিকানা তোমার থাকুক গোপন
চির-না-পাওয়া।
মনে মনে র'য়ে গেল সংশয়,
যদি কোনো পথে কভু দেখা হয়
চিনিতে তোমারে পারিব কি তব
চেহারা স্মরণ করি—
হে সুন্দরি?

৺কঠোপনিষদ্

মাগুর মাছের গান আর ৺কালিদাসের অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্-
তলিয়ে দেখলে আসলে এরা দুই-ই এক,
কোনো ভেদ নেই।
আকাশের মেঘ, আর মেঘের আকাশ;
বাঁশের বাঁশী, আর বাঁশীর বাঁশ—
এরাও মূলত এক।

স্থূলদৃষ্টি বুদ্ধুরা দেখতে পায় না এই মৌলিক একত্ব,
তাই অদ্বৈতবাদের অদ্বৈতকেই বাদ দিয়ে বসে।
হায় !!!!……!!!!……!!!!

আমি আর তুমি, তুমি আর আমি নিয়ে মাথা ঘামাস্ ?
ওরে মূর্খ, আমিও যে, তুইও সে। মূলত কোনো ভেদ নেই।
নিখিল-বিশ্বে ছড়িয়ে আছে একই আত্মা—
সর্ব ঘটে, সর্ব পটে, সর্ব তটে।
শাস্ত্রে বলেছে "আত্মানং বিদ্ধি।"
কি ? না, আত্মাকে বিদ্ধ কর্।
ওরে মূঢ়, আত্মাকে আগে চেন্, তবে তো বিদ্ধ করবি ?

এই আত্মাকে চিনতে হ'লে "সোঽহম্" হতে হবে—
মানে আমিই সে, আর সে-ই আমি।
আমিই সবাই, আর সবাই-ই আমি।
এই হ'ল অদ্বৈতাত্মবাদের মূল-তত্ত্ব।
এ তত্ত্ব শোন্ তবে বোঝাই সোজা ক'রে।…
(আমি) খ্রীষ্ট, বুদ্ধ, শ্রীচৈতন্য, আমি মহাত্মা গান্ধী।
(আমি) জান্-মার হয়ে জান্ নিই, আর
শহীদ্ হয়েও জান্ দি।
(আমি) নিজাম হায়দ্রাবাদের,
(আমি) হাড়-ভাঙা কুলী আঁধার কয়লা-খাদের,
আমিই রমেন, রহমান ; আমি কেদার এবং কাদের।
(আমি) জবাহরলাল নেহেরু
ভয় করি নেকো চোখ-রাঙানিকে কেহেরু।
আমিই ছিলেম নরেন গোঁসাই, সত্যেন আর কানাই ;
(আমি) ভৈরব রাগে বন্দুক ধরি, ভৈরবী সুরে সানাই,
(আমি) কান পেতে শুনে জানি, আর চিৎকার ক'রে জানাই।

অসহায় যারা গৃহ-হারা হ'ল দেশ-বিভাগের ফাঁদে
আমারি আত্মা তাহাদের মাঝে ভিখারী হইয়া কাঁদে।
(আমি) বহু ফুটপাথে অনাহারে মরি, বহু ভোজে খাই খানা
ছেলে হয়ে করি বহু কাপ্তানি, বাপ হয়ে করি মানা।
আমিই পকেট মারি, আর যায় আমারি পকেট মারা,
আমি খানদানী আমীর, আমিই ফকির সর্বহারা
(আমি) দর্শক হয়ে নাচ দেখি, আর নর্তক হয়ে নাচি
(আমি) প্রতি মুহূর্তে বহু মরি, বহু বাঁচি।
(আমি) এক হয়ে বহু, বহু হয়ে এক, নিখিল-বিশ্বময়—
আত্মার কোনো ভেদাভেদ নাই, গাহি আত্মার জয় ॥

শোক-সঙ্গীত

(নিম্নে যে শোক-সঙ্গীতটি যে রূপে দেওয়া হইল তজ্জন্য পুরা কৃতিত্ব আমার নহে। একটি শোকসভায় গীত হইবার জন্য আমি মূল গানখানি রচনা করিয়া দিয়াছিলাম। জনৈক মহাগুণী সংগীতজ্ঞ—যিনি ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা, ঠুংরি, কীর্তন, রাগপ্রধান, আধুনিক, ভাটিয়ালী, চিত্রপটী ইত্যাদি সর্বপ্রকার বিভিন্ন জাতের সঙ্গীতে সিদ্ধকণ্ঠ, এবং বাঁয়া-তবলা, স্বরলিপি ইত্যাদিতেও সিদ্ধহস্ত—গানখানিতে স্বয়ং সুর-সংযুক্ত করিয়া, এবং সুরের খাতিরে এখানে সেখানে কথা বদলাইয়া উক্ত শোকসভায় যে ভাবে তান, সারগম, বাট, বোলতান ইত্যাদি সহ গাহিয়াছিলেন, তাহারই কিঞ্চিৎ মাত্র আভাস নিম্নে দেওয়া হইয়াছে। গানখানি তিনি শেষ পর্যন্ত গাহিতে পারেন নাই, কেন না শেষের দিকে কোথা হইতে অদৃশ্য-হস্ত-নিক্ষিপ্ত যুগপৎ দুইটি ইষ্টকখণ্ড তাঁহার শিরঃ-স্পর্শ করায় তাঁহাকে অবিলম্বে স্থানান্তরিত করিতে হইয়াছিল।)

নে দ্রে দ্রে দ্রে দ্রেনেনে ধ্রেনেনে ধ্রেনেনে
নোম্ না তোম্ না তোম্ না না না না
না দ্রে দ্রে দ্রে দ্রোম...

তুমি নাই, তুমি নাই গো, তুমি নাই।
হিয়ায় মোদের বেদনার ঝড়
সদাই বহিছে তাই।
বেদনা—আ—আ—আ—আ—আ
ওগো বেদনা, ওগো বে ওগো বে
ওগো বেদনার ঝড়
সদাই বহিছে তাই।
(সদা বহিছে।
বেদনার ঝড় হু-হু ক'রে আহা, সদা বহিছে।
মোদের হিয়ায় সদা বহিছে।)
বেদনার ঝড় হু-হু ক'রে আহা
সদাই বহিছে তাই।
নিসা গামাপাপা, মাপা গামাপাপা,
গামা পানি ধাপা, গামা গারে সা
নিসা গামা পানি সাসা গারে সাসা
নিসা নিধা পামা গামা গারে সাসা
নিসা গামা পা, নিসা গামা পা,
নিসা গামা............হাঁ।
হিয়ায়মো দেরবেদ নারঝড়
সদাইব হিছেতাই হিছেতাই হিছেতাই
হিয়ায় মোদের বেদনার ঝড়
সদাই বহিছে তাই।
ধা ধেরেকেটে ধিন্‌ ধা, ধাগি ধেরেকেটে ধিন্‌ ধা,
না তেরেকেটে তিন্‌ তা, ধাগে ধেরেকেটে ধেটে ধিন্‌
ধা.........
মহা আদর্শ গেছ তুমি রাখি',
পালিব আমরা, দিব নাকো ফাঁকি—
(ফাঁকি দিব না।

অসহায় যারা গৃহ-হারা হ'ল দেশ-বিভাগের ফাঁদে
আমারি আত্মা তাহাদের মাঝে ভিখারী হইয়া কাঁদে।
(আমি) বহু ফুটপাথে অনাহারে মরি, বহু ভোজে খাই খানা
ছেলে হয়ে করি বহু কাপ্তানি, বাপ হয়ে করি মানা।
আমিই পকেট মারি, আর যায় আমারি পকেট মারা,
আমি খান্‌দানী আমীর, আমিই ফকির সর্বহারা
(আমি) দর্শক হয়ে নাচ দেখি, আর নর্তক হয়ে নাচি
(আমি) প্রতি মুহূর্তে বহু মরি, বহু বাঁচি।
(আমি) এক হয়ে বহু, বহু হয়ে এক, নিখিল-বিশ্বময়—
আত্মার কোনো ভেদাভেদ নাই, গাহি আত্মার জয়॥

শোক-সঙ্গীত

(নিম্নে যে শোক-সঙ্গীতটি যে রূপে দেওয়া হইল তজ্জন্য পুরা কৃতিত্ব আমার নহে। একটি শোকসভায় গীত হইবার জন্য আমি মূল গানখানি রচনা করিয়া দিয়াছিলাম। জনৈক মহাগুণী সংগীতজ্ঞ—যিনি ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা, ঠুংরি, কীর্তন, রাগপ্রধান, আধুনিক, ভাটিয়ালী, চিত্রপটী ইত্যাদি সর্বপ্রকার বিভিন্ন জাতের সঙ্গীতে সিদ্ধকণ্ঠ, এবং বাঁয়া-তবলা, স্বরলিপি ইত্যাদিতেও সিদ্ধহস্ত—গানখানিতে স্বয়ং সুর-সংযুক্ত করিয়া, এবং সুরের খাতিরে এখানে সেখানে কথা বদলাইয়া উক্ত শোকসভায় যে ভাবে তান, সারগম, বাট, বোলতান ইত্যাদি সহ গাহিয়াছিলেন, তাহারই কিঞ্চিৎ মাত্র আভাস নিম্নে দেওয়া হইয়াছে। গানখানি তিনি শেষ পর্যন্ত গাহিতে পারেন নাই, কেন না শেষের দিকে কোথা হইতে অদৃশ্য-হস্ত-নিক্ষিপ্ত যুগপৎ দুইটি ইষ্টকখণ্ড তাঁহার শিরঃ-স্পর্শ করায় তাঁহাকে অবিলম্বে স্থানান্তরিত করিতে হইয়াছিল।)

নে দ্রে দ্রে দ্রে দ্রেনেনে দ্রেনেনে দ্রেনেনে
নোম্ না তোম্ না তোম্ না না না না
না দ্রে দ্রে দ্রে দ্রোম…

তুমি নাই, তুমি নাই গো, তুমি নাই।
হিয়ায় মোদের বেদনার ঝড়
সদাই বহিছে তাই।
বেদনা—আ—আ—আ—আ—আ
ওগো বেদনা, ওগো বে ওগো বে
ওগো বেদনার ঝড়
সদাই বহিছে তাই।
(সদা বহিছে।
বেদনার ঝড় হু-হু ক'রে আহা, সদা বহিছে।
মোদের হিয়ায় সদা বহিছে।)
বেদনার ঝড় হু-হু ক'রে আহা
সদাই বহিছে তাই।
নিসা গামাপাপা, মাপা গামাপাপা,
গামা পানি ধাপা, গামা গারে সা
নিসা গামা পানি সাসা গারে সাসা
নিসা নিধা পামা গামা গারে সাসা
নিসা গামা পা, নিসা গামা পা,
নিসা গামা............হাঁ।
হিয়ায়মো দেরবেদ নারঝড়
সদাইব হিছেতাই হিছেতাই হিছেতাই
হিয়ায় মোদের বেদনার ঝড়
সদাই বহিছে তাই।
ধা ধেরেকেটে ধিন্ ধা, ধাগি ধেরেকেটে ধিন্ ধা,
না তেরেকেটে তিন্ তা, ধাগে ধেরেকেটে ধেটে ধিন্
ধা.........
মহা আদর্শ গেছ তুমি রাখি',
পালিব আমরা, দিব নাকো ফাঁকি—
(ফাঁকি দিব না।

তুমি চ'লে গেছ জানি, তবু মোরা
ফাঁকি দিব না।
ফাঁকি দিব না দিব না।
চ'লে গেছ ব'লে সেই ফাঁকে ফাঁকি দিব না।—
সা নি ধা পা মা পা গা মা পা নি সা—)
তব পথ-রেখা অনুসরি' মোরা
তবপ থরেখা অনুস রিমোরা
চলিতে যেন গো পাই।
(তব) পথরে খাঅনু সরিমো রাচলি
নিসা গামা পাপা পামা গামা গা
চলিতে যেন গো পাই।
(পথ-রেখা।
তোমার পায়ে পায়ে চলা পথের রেখা।
তব চরণ-চিহ্ন পিছে পিছে মোরা
চলিতে যেন গো পাই।)
ওদানি দেরে না তানা, তাদিয়ানা দ্রেতানানা,
নাদের দের দ্রিম্ তা না না
দ্রিম্ দ্রিম্ তানা নানা
ওদের দ্রিম্ দ্রিম্ তাদের দ্রিম্ দ্রিম্
নাদের দ্রিম্ দ্রিম্
ওদানি দেরে না তানা দ্রিম্
ওদানি দেরে না তানা দ্রিম্
ওদানি দেরে না তানা......

(ইহার পর তেহাইয়ের "দ্রিম" গাহিবার অব্যবহিত পূর্বেই পূর্বোল্লিখিত ইষ্টকখণ্ডদ্বয় দুই দিক হইতে আসিয়া একই মস্তকে মিলিত হওয়ায় শোক-সঙ্গীতটি আর অগ্রসর হইতে পারে নাই।)

শ্রীঅজিতকৃষ্ণ বসু

উজ্জ্বলকান্ত

চৈত্র মাসের সুন্দর সন্ধ্যা। সকলে সেই ঘরটিতে জড়ো হইয়া অভ্যাসমত গল্প জমাইয়া বসিয়াছি। শ্রীকণ্ঠবাবু বলিতেছেন, আমরা শুনিতেছি :

মানুষ যে কি ভেবে কখন কি করে তার হিসেব যদি সহজে পাওয়া যেত, তা হ'লে মানুষের জীবন এতখানি দুঃসহ হ'ত না। লক্ষ্য ক'রে দেখো—। বাধ্য হইয়াই থামাইয়া দিতে হইল। জানি, শ্রীকণ্ঠবাবুর বক্তৃতা আরম্ভ হইলে আর শেষ হয় না। উপন্যাসবিশেষ হইতে নাম চুরি করিয়া আমরা আড়ালে তাঁহাকে 'বক্তিয়ার' বলিয়া ডাকিতাম। কিন্তু একটা গুণের জন্য আমরা তাঁহার মুখে বক্তৃতা পছন্দ না করিলেও গল্প শুনিতে ভালবাসিতাম। তিনি রসজ্ঞ ও বহুজ্ঞ লোক ছিলেন, আর ভারতচন্দ্র যে বলিয়াছেন—'সে কহে বিস্তর মিছা যে কহে বিস্তর', তাহা অনেকের সম্বন্ধে প্রযোজ্য হইলেও শ্রীকণ্ঠবাবুর বেলায় খাটিত না। সেইজন্য তাঁহার বক্তৃতার মধ্যেই বাধা দিয়া বলিয়া উঠিলাম, শ্রীকণ্ঠদা, আপনি যে কথাটা আমাদের বোঝাতে চেষ্টা করছেন, সেটা তত্ত্ব হিসেব অত্যন্ত পুরনো। ওতে আমাদের রুচি নেই। তার চেয়ে একটা গল্প বলুন, শুনি।

শ্রীকণ্ঠবাবু একটুও নিরুৎসাহ না হইয়া বলিলেন, বেশ। গল্পই বলছি, কিন্তু গল্পের খিড়কি দরজা দিয়ে যদি তত্ত্ব ঢুকে পড়ে, তা হ'লে আমায় দোষী করতে পারবে না।

আমাদের মধ্যে সীতেশ সেন বসিয়া ছিলেন। তিনি বুদ্ধিবাদী পণ্ডিতম্মন্য নবীন অ্যাডভোকেট। সব কথাকেই একটু বাঁকা হাসি দিয়া অভ্যর্থনা করেন। তিনি শ্রীকণ্ঠবাবুকে বলিলেন, বেশ তো, শোনাই যাক গল্পটা, কিন্তু প্রেমের গল্প নয় তো? এই অন্নবস্ত্রের সমস্যার দিনে প্রেমের গল্প কিন্তু ভারি অবাস্তব শোনাবে। শ্রীকণ্ঠবাবু চটিয়া গেলেন। বলিলেন, দেখ সীতেশ, সুকুমার সরকার ব'লে একজন আধুনিক কবি কাব্যের জন্যে আত্মহত্যা করেছিল, তার কথা

পড়েছ ? সে বলেছিল, তোমাদের এ সময়ে রুটি নিয়ে ঢের রোমাণ্টিসিজ্‌ম্‌ চলেছে। কিন্তু যাই বল, সব খিদেই মেটে, প্রেমের ক্ষুধাই অতৃপ্য। সীতেশ, তুমি কি কখনও ভেবে দেখেছ যে, মানুষ অন্ন খোঁজে তার শরীরটাকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্তে; অথচ প্রেম শুধু শরীরটাকে নয়, সমস্ত জগৎ-সংসারকে তুচ্ছ করে। অ্যাণ্টনি আর ক্লিয়োপেট্রা, ট্রিস্টান আর ইসোল্‌ডি, পার্নেল—এরা সকলে প্রেমের আগুনে ধ্বংস হয়েছিল। আর তুমি সীতেশ সেন, ব্রীফ বগলে ক'রে আদালতে যাও, তুমি কিনা বলছ—

আবার শ্রীকণ্ঠবাবুকে থামাইয়া দিতে হইল। সীতেশ সেনের জন্ত সুন্দর সন্ধ্যাটা মাটি হইতে দিতে আমরা কেহই প্রস্তুত ছিলাম না। শ্রীকণ্ঠবাবুকে বলিলাম, শ্রীকণ্ঠদা, সীতেশের কথা বাদ দিন, ছেলেমানুষ ব'লে ওকে মাপ করুন। আপনার গল্পটা বলুন এবার। শ্রীকণ্ঠদা একটু শান্ত হইলেন। একটা সিগারেট ধরাইয়া কিছুক্ষণ নিঃশব্দে বসিয়া রহিলেন, তাহার পর ধীরে সুস্থে তাহাতে একটা টান দিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন :

দেখ, সাহিত্যিকের মর্মযাতনার কথা তোমরা অনেক গল্প উপন্যাস আর আত্মকাহিনীতে পড়ছ আজকাল। আমার গল্পটা একজন গানের গুণীকে নিয়ে।

আমি তখন ইউ. পি.তে থাকি। লক্ষ্ণৌ শহরে আমিনাবাদের কাছে আস্তানা ছিল আমার। সেখানে একটি ছেলের সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল। তার নাম উজ্জ্বলকান্ত রায়। সেই আলাপ ক্রমে ঘনিষ্ঠতায় এসে দাঁড়ায়। সব জিনিসেরই একটা উপলক্ষ্য থাকে। এ ক্ষেত্রে সেই উপলক্ষ্য হয়েছিল গানবাজনায় রুচি। উজ্জ্বলকান্ত এমন আশ্চর্য স্বরোদ বাজাত যে, তার বাজনা শুনে আমার মনে হ'ত লিরিকাল কবিতা শুনছি। ওস্তাদের কাছে বহুদিন বাজনা শিখে সে যে নৈপুণ্য আয়ত্ত করেছিল, সে নৈপুণ্যের পেশাদারী জৌলুসটাকে সে ভারি সহজে ত্যাগ করেছিল। জানই তো, আমরা জ্ঞানে জানি বিষয়কে, ভাবে জানি আপনাকেই।

তার বাজনার কথা যে এখন এত ক'রে বলছি তার কারণ আছে। এই স্বরোদ বাজানোই তার জীবনে দুটো মোটা দাগ কেটে দিয়েছিল। একটাকে লাল পেন্সিলের দাগ বলতে পার, অন্যটাকে নীল পেন্সিলের। সেই কথাই বলব এবার।

উজ্জ্বলকান্ত জজসাহেবের ছোট ছেলে। তার বড় ভাই বিলেত থেকে ডিগ্রী নিয়ে এসে আপনি বেঁচেছিলেন, বাপের নামও বাঁচিয়েছিলেন। কিন্তু উজ্জ্বল ইস্কুলের গণ্ডিও পার হতে পারে নি; বরং আর একটা গণ্ডি পার হয়ে নিজেও ডুবেছিল, বাপের নামও ডুবিয়েছিল। সে যে-ওস্তাদের কাছে বাজনা শিখতে যেত, তাঁর বাড়ি ছিল লক্ষ্ণৌয়ের একটা বিশেষ পাড়ায় যেখানে বাঈজীরা থাকেন। উজ্জ্বল দু বেলা সেই পাড়ায় যাওয়া-আসা করত। উজ্জ্বলকান্তের চেহারাটা নামের চেয়ে কম ছিল না, কিন্তু বয়স ছিল কম। সংসার সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা ছিল বয়সের চেয়েও কম। সে পাড়ায় যাঁরা থাকতেন, তাঁরা দু বেলা উজ্জ্বলকান্তের মত একটা লোভনীয় শিকারকে আসা-যাওয়া করতে দেখে ছটফট করতেন।

আগে বলবার সুযোগ পাই নি, উজ্জ্বলের মা ছিলেন অতিশয় বড়লোকের মেয়ে। তিনি ছোট ছেলেকে অতিরিক্ত ভালবাসতেন। বাপ তাকে আমল দিতেন না, কিন্তু মায়ের দৌলতে উজ্জ্বলের কোনও অভাব ছিল না। নিজের ভাল গাড়ি ছিল, ভাল জামাকাপড় ছিল, শহরের প্রত্যেক দোকানে অফুরন্ত ক্রেডিট্ ছিল। উজ্জ্বল লোকটি ছিল ভারি শৌখিন। দুধ-গরদের পাঞ্জাবি গায়ে, ফরাসডাঙার ধুতি প'রে, আঙুলে পোখরাজ আর হীরের আংটির বাহার দিয়ে যখন নিজের প্রকাণ্ড গাড়িখানা চালিয়ে বাঈজীপাড়ায় প্রবেশ করত, তখন পথের লোক তাকে লক্ষণাবতীর খুদে নবাব ব'লে ভুল করলে তাদের দোষ দেওয়া যেতনা। কিন্তু নবাব না হ'লেও উজ্জ্বলকান্তের মেজাজে একটা নবাবোচিত অথচ নবাবদুর্লভ গুণ ছিল: ঐশ্বর্যে তার আগ্রহ ছিল, কিন্তু আসক্তি ছিল না। শুধু ঐশ্বর্যের কথা বলি

কেন, বস্তুর যা-কিছু সঞ্চয়, তাকে সে দিনান্তে বা নিশান্তে পথপ্রান্তে ফেলে দিয়ে যেতে কিছুমাত্র আপত্তি করত না। লোকটা খাঁটি আর্টিস্ট ছিল।

উজ্জ্বলকান্ত একদিন তার ওস্তাদের বাড়িতে ব'সে বাজনার তরকীব শিখছে, এমন সময়ে একটি মুসলমান যুবতী সেই ঘরে ঢুকে ওস্তাদ আর শিষ্য দুজনকেই আদাব জানিয়ে গালচের একধারে ব'সে পড়ল। উজ্জ্বলের একটু অবাক হবার কথা। কিন্তু গুরুদেব সে সুযোগ দিলেন না। বললেন, রায় সাহেব, আপনি এঁর গোস্তাকি মাফ করবেন। ইনি আমার ছাত্রী, ভাল ঠুংরি শিখেছেন। আপনার বাজনা দূর থেকে শুনে এঁর কলিজা ওঠা-বসা করে। তাই আজ সামনে ব'সে বাজনা শুনবেন ব'লে কসম খেয়ে ঘরে ঢুকে পড়েছেন। যদি রায় সাহেবের মর্জি না হয়, ইনি এখান থেকে উঠে চ'লে যাবেন। উজ্জ্বল তখন অবাক না হয়ে বিরক্ত হ'ল। তবু ভদ্রতা করতে হ'ল; লক্ষ্ণৌ শহরে বাস ক'রে নিজেকে অভদ্র ব'লে পরিচয় দিতে পারে কোন্ ভদ্র-সন্তান! সে বললে, আমার বাজনা শুনতে চেয়েছেন—এ তো এঁর মেহেরবানি। কিন্তু এঁর গান শোনাবার কিসমত হবে তো আমার? যুবতী শুনে লজ্জা পেয়ে মাথা নীচু ক'রে একটু হাসলেন, একেবারে সৌদামিনী-হাসি, আসমানী রঙের ওড়নার মধ্যে দিয়ে গালের গোলাপী আভা দেখা গেল। উজ্জ্বলকান্ত তখন চেয়ে দেখলে ভাল ক'রে। যুবতী যে সুন্দরী তাতে আর সন্দেহ রইল না। ওস্তাদ বললেন, সে তো হবেই। মালকাবাঈ তো গান গাইবেনই। দেখুন রায় সাহেব, গাইয়ে-বাজিয়ে অনেক পাওয়া যায়, কিন্তু সত্যিকারের কদরদান দুর্লভ। এ কথাটা উজ্জ্বলের মনে ধরল। কে এমন সত্যিকারের আর্টিস্ট আছে যে, সমানধর্মার অভাবে নীরবে বা সরবে আক্ষেপ না করেছে?

এই সব শিষ্টাচারের পালা সাঙ্গ হ'লে উজ্জ্বলকান্তের বাজনা আরম্ভ হ'ল। তখনকার দিনে সে ওস্তাদী ঢঙটাকে চোখের সামনে ধ'রে

দিয়ে নিজের আত্মাকে পেছনে রেখে বাজনা বাজাত, যেমন আর পাঁচজনে ক'রে থাকে। কিন্তু সঙ্গীতের সেই হঠযোগেও সে অনেকখানি এগিয়ে গিয়েছিল। যাঁদের রসবোধ নিতান্ত সূক্ষ্ম, তাঁদের ছাড়া আর সকলের ভালই লাগত তার বাজনা। সে যাই হোক, মালকাবাঈ তার বাজনা শুরু থেকে শেষ অবধি এমন নিবাত-নিষ্কম্প প্রদীপের মত তন্ময় হয়ে শুনলে যে, উজ্জ্বলের বেশ ভাল লাগল নিজেকে, ভাল লাগল নিজের বাজনাকে, আর ভাল লাগল সেই হৃদয়বতী শ্রোত্রীকে। তার পর মালকার গান হ'ল। বাঈদের গান শেখার পক্ষে একটা মস্ত সুবিধে এই যে, গানই তাদের পেশা, গান তাদের নেশা, গানই তাদের ধর্ম। মালকাবাঈয়ের ওস্তাদ তাকে যত্ন ক'রে ভাবপ্রধান গান শিখিয়েছিলেন, মালকাবাঈয়ের ভগবান তাকে প্রাণ-কাড়ানো গলা দিয়েছিলেন, আর— বাকিটাই বা বাকি থাকে কেন, এই ভেবেই বোধ হয় অতি মনোহারিণী চেহারাও দিয়েছিলেন। বলা বাহুল্য, উজ্জ্বলের বেশ ভাল লাগল তার গান, আর বেশ ভাল লাগল তাকেও।

ফলে, দুই আর দুইয়ে চার হ'ল। মানে, দুই আর দুইয়ে বাইশ হ'ল না। উজ্জ্বল আর মালকার ঘনিষ্ঠতা দিন দিন বাড়তে লাগল চন্দ্রকলার মত। ষোলকলা যেদিন পূর্ণ হ'ল, সেদিন উজ্জ্বল ওই পাড়ায় একটা বাড়ি ভাড়া ক'রে মালকাকে সেই বাড়িতে রেখে দরজায় একটা গুর্খা দারোয়ান বসিয়ে দিলে। আগেই বলেছি, মায়ের কল্যাণে সে টাকার অভাব কাকে বলে জানত না। বাঈজীর জন্যে গয়না এল, খাট এল, শাড়ি এল, রেডিও এল, আর যা যা এসে থাকে—সবই এল। বছর খানেক এমনি ক'রে কেটে গেল।

উজ্জ্বলকান্তের মা ইতিমধ্যে মারা গেলেন। মৃত্যুকালে উজ্জ্বলকে নগদ পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়ে গেলেন। মালকার কল্যাণে পাঁচ মাসে সেই পঞ্চাশ হাজার টাকা পাঁচ হাজারে দাঁড়িয়ে গেল। উজ্জ্বলের ঐশ্বর্যে আসক্তি ছিল না, সে কথা তোমাদের বলেছি। এই পাঁচ

হাজারের শেষ ক্রান্তি অদৃশ্য না হওয়া অবধি সে যে বেপরোয়া খরচ ক'রে যেত, তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। কিন্তু ইতিমধ্যে মালকা-বাঈ নিজেই অদৃশ্য হয়ে গেল। একজন আসল নবাবের নেকনজরে প'ড়ে মেকি নবাবের দেওয়া গয়নাগাঁটি টাকাকড়ি সব সঙ্গে নিয়ে বাঈজী ঝঞ্ঝাশেষের মেঘের মত মিলিয়ে গেল।

মালকা ছিল জাত-কেউটের বাচ্চা। দংশন করলে আর ওষুধ নেই। কিন্তু উজ্জ্বলকান্তও সে হিসেবে একেবারে নীলকণ্ঠ ছিল। ভাবছ বোধ হয়, মালকা তাকে ছেড়ে চ'লে যাবার পর সে দেওয়ানা হয়ে লক্ষ্ণৌয়ের পথে পথে গালিবের গজল গেয়ে বেড়াতে লাগল! কিন্তু সে এসব কিছুই করে নি। উজ্জ্বলের রোজকার জীবনে একটা মাত্র পরিবর্তন ঘটল। যে সময়টা সে মালকার বাড়িতে কাটাত, সেই সময়টা সে নিজের বাড়িতে স্বরোদ-সাধনা ক'রে কাটাতে লাগল। ওস্তাদের নতুন কিছু আর শেখাবার ছিল না, তিনিও সাগরেদের তহবিলের অবস্থা দেখে তাকে ছাড়পত্র দিয়ে বললেন—বৎস, এবার চ'রে খাও।

এর পর বছর দুয়েক স্বরোদ বাজিয়ে উজ্জ্বলকান্ত তার বাদন-পরিপাটি একেবারে বদলে ফেললে। দেহের তৃষ্ণা তার অনেকটা মিটে গিয়েছিল ব'লেই বোধ হয় এই সময়ে তার বাজনায় সেই গুণ হয়েছিল, যার কথা গোড়াতেই তোমাদের বলেছি।

এই পর্যন্ত বলিয়া শ্রীকণ্ঠবাবু থামিলেন। সীতেশ সেন এতক্ষণ ধৈর্য ধরিয়া চুপ করিয়া ছিলেন। আর পারিলেন না। বলিলেন, অহো, প্রেমের কি অতৃপ্য ক্ষুধা—She makes hungry where most she satisfies! আমার তো শুনে চোখে জল আসছে। শ্রীকণ্ঠবাবু সীতেশের এই ব্যঙ্গে রাগ করিলেন না। হাসিয়া বলিলেন, সীতেশ, এ তো সবে লাল পেন্সিলের লাল দাগটা দেখলে, এখনও নীল দাগটা বাকি আছে যে! আর একটা সিগারেট ধরাইয়া আবার তিনি গল্প আরম্ভ করিলেন:

আমার সঙ্গে উজ্জ্বলের পরিচয় হয় এই সময়ে। আমি তার বাজনা ভালবাসতুম। আর মানুষটার মধ্যেও এমন একটা অলক্ষ্য অথচ দুর্বার আকর্ষণ ছিল যে, আমার তাকে ভাল না লেগে উপায় ছিল না। তার স্বভাবে প্রখর চঞ্চলতা ছিল না, তার যৌবনবেগ বাইরে থেকে অনুভব করা যেত না, তবু কি একটা সর্বনাশা অস্থিরতা যেন স্তম্ভিত স্তিমিত হয়ে তার হৃদয়কে বেহালার চড়া তারের মত ক'রে টেনে বেঁধে রেখেছিল। সে যেন নিশিদিন কি একটা খুঁজছে, যেমন ক'রে ক্ষ্যাপা পরশপাথর খুঁজেছিল। কিন্তু তার ব্যবহার ছিল সংযত, নিখুঁত, আত্মসমাহিত।

সমাজ বাঈজীদের ভাল চোখে দেখে না। উজ্জ্বলের ও-পাড়ায় যাওয়ার কথাটা সকলেই জানত, উজ্জ্বলও জানত যে সকলেই জানে। জজসাহেবের ছেলে ব'লে মৌখিক অভদ্রতাটা কেউ তার সঙ্গে করত না, কিন্তু সমাজে সে পাংক্তেয় ছিল না। শুধু কোথাও গানবাজনার জলসা হ'লে উজ্জ্বলকান্তের ডাক পড়ত, তা সে জলসা অফিসারদের পাড়ায়ই হোক, অথবা বাঈজীদের পাড়ায়ই হোক। সেই সব জলসায় তার খাতির ছিল খুব, লোকে এমন কুর্নিশ করার ভঙ্গিতে তাকে সম্মান জানাত—যেন উজ্জ্বল আসেন নি, স্বয়ং ওয়াজেদ আলি শাহ্ কবর থেকে উঠে এসেছেন।

উজ্জ্বল যে বুঝত না, এমন নয়। সে জানত, এই সব কদরদান ভদ্রলোক অন্য দিন পথে দেখা হ'লে মুখ ফিরিয়ে না দেখতে পাবার ভান করবেন। কিন্তু তার মন এসব জিনিসকে গুরুত্ব দিত না। কিসের স্বপ্ন সে দেখত সে-ই জানে, কি যন্ত্রণা তার বুকে ছিল সে-ই জানে। সমস্ত সামাজিক তুচ্ছতা আর খুঁটিনাটির ওপরে সে নিজের আত্মার যাতনাময় লোকে বাস করত। সেখানকার দাবি মেটাতেই দেউলে হয়ে যেত সে, তার এমন সঞ্চয় ছিল না যে সংসারের হাটে বেচাকেনা করে।

আমাকে উজ্জ্বল তার সব কথাই বলেছিল। আমিই ছিলুম তার

ফ্রেণ্ড, ফিলোসফার অ্যাণ্ড গাইড। কিন্তু নিজের মধ্যে যে অস্থিরতা সে অনুভব করত, সে সম্বন্ধে সে আমাকে বলে নি। বোধ হয় সে নিজেই জানত না যে, সে কি চায়! একদিন আমি তাকে স্পষ্ট ক'রেই জিজ্ঞেস করেছিলুম, উজ্জ্বল, তোমার দুয়ার-ভাঙা পাখীটি যে ফাঁকি দিয়ে উড়ে গেছেন, সে জন্যে কি তোমার প্রাণে ভারি কষ্ট হয়? উজ্জ্বল হেসে বলেছিল, তা যদি হ'ত, তা হ'লে তো বাঁচতাম। পাখী উড়ে গেল—সে জন্যে যে আমার একটুও দুঃখ হ'ল না, সে কথা ভেবেই আমার দুঃখ হয়। আবার জিজ্ঞেস করেছিলুম, তবে তোমার কিসের কষ্ট? সে বলেছিল, কিসের কষ্ট জানি না। উজ্জ্বলের আমি সব বুঝতুম, কেবল এইখানটা একেবারেই বুঝতুম না।

একদিন এক ভদ্রলোক তাঁর বাড়িতে ঘরোয়া জলসায় উজ্জ্বলকে নেমন্তন্ন করলেন। ইনি একজন রিটায়ার্ড আই. সি. এস., ভারতীয় সঙ্গীতের পরম অনুরাগী। নিজের একমাত্র মেয়ে মীনাক্ষী মল্লিককে ইউনিভার্সিটির শেষ পরীক্ষা পার করিয়ে সাগরপার থেকেও ঘুরিয়ে এনেছেন। মীনাক্ষী একালিনী মেয়ে, বুদ্ধি আর স্টাইলের ধারে ক্ষুরকে হার মানাতেন। বিশেষ খরচ ক'রে গানবাজনা শিখেছিলেন, কিন্তু যে দীর্ঘ সাধনা থাকলে ও-জিনিসে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করা যায়, তা করবার তাঁর অবসর বা নিষ্ঠা ছিল না। তবু তাঁর বাবা পেনশন নিয়ে লক্ষ্ণৌ সহরে বসলে ভাল গায়িকা ব'লে মীনাক্ষীর নাম সেখানকার হাই সার্কেলে খুব ছড়িয়ে পড়ল, যেমন হয়ে থাকে বড়লোকের মেয়েরা একটু গান শিখলে। এই আসরে উজ্জ্বলের বাজনা শোনার সঙ্গে সঙ্গে মেয়ের গানের গৌরবটাকেও উজ্জ্বলতর করবার সদিচ্ছা যে তাঁর ছিল না, এ কথা আমি হলপ ক'রে বলতে পারি না।

উজ্জ্বল যখন তাঁদের ড্রয়িংরুমে গিয়ে উপস্থিত হ'ল, তখন সন্ধ্যা হয়েছে। দেখলে, সেখানে সোফা-কৌচ সরিয়ে ফেলে মেঝেয় গালচে পেতে গোটাকয়েক তাকিয়া ছড়িয়ে রাখা হয়েছে। চড়া আলোর নীচে এক পাশে নব্য অফিসারেরা ট্রাউজার-মোড়া হাঁটু ভেঙে ভব্য

হয়ে বসবার বিফল চেষ্টা করছেন, অন্য দিকে শিফন-জর্জেটের ঢেউ সামলে নব্যা তরুণীরা রীতিমত ভব্যা হয়ে বসেছেন। উজ্জ্বল বাইরে থেকে একটি মেয়ের গলা শুনতে পেয়েছিল। একটি বাক্যের শেষে অতিশয় জ্ঞানগর্ভ ভাবে তিনি বলছিলেন—তাই বলছিলাম, শুধু লম্বা মীড় আর আলগা জোড়ের কাজ দিয়ে স্বরোদ বাজানোর কোনও মানে হয় না; তোমাদের উজ্জ্বলকান্ত তাই করেন। উজ্জ্বল ঘরে ঢোকবার পর তাঁরা দয়া ক'রে সে প্রসঙ্গ বন্ধ করলেন। গৃহস্বামী উঠে দাঁড়িয়ে খাতির ক'রে তাকে বসালেন। ঘরে যাঁরা ব'সে ছিলেন, তাঁদের দু-একজন মুখে স্মিতহাস্য ফুটিয়ে অস্ফুটস্বরে যে দু-একটা অভ্যর্থনার শব্দ উচ্চারণ করলেন তার ধ্বনি উজ্জ্বলের কানে পৌঁছল, কিন্তু অর্থ প্রাণে পৌঁছল না।

গৃহস্বামী সমবেত ভদ্রমহোদয়দের উদ্দেশে বললেন, ইনিই উজ্জ্বল-বাবু—মিস্টার রায়ের ছোট ছেলে। আপনাদের কাছে এঁর অপূর্ব বাজনার পরিচয় ইনি নিজেই দেবেন একটু পরে। তারপর তিনি উজ্জ্বলের দিকে ফিরে নিজের মেয়ের পরিচয় দিলেন। বিনয়-বিগলিত হাস্যে বললেন, ইনি আমার মেয়ে মীনাক্ষী, কিছু কিছু গান-বাজনা শিখেছেন। তাঁর মুখের কথা শেষ হবার আগেই একটি সুবেশ তরুণ মুখ থেকে সিগার সরিয়ে ব'লে উঠলেন, আমাকে বলতে দিন মিস্টার মল্লিক। বুঝলেন উজ্জ্বলবাবু, মিস্ মল্লিক হচ্ছেন ক্ল্যাসিকাল গানের আকাশের তারকা। এঁর গলায় একটা গান শুনে স্বয়ং মণ্টুদা—মানে, আপনাদের দিলীপকুমার রায় এঁকে গান শেখাতে চেয়েছিলেন। ইনি আমাদের সঙ্গীতে একটা যুগান্তর এনেছেন। উজ্জ্বল এতক্ষণে সেই অপূর্ব গায়িকার দিকে তাকাল। দেখলে, তিনি কপট-কোপে তরুণ স্তাবককে লক্ষ্য ক'রে কটাক্ষনিক্ষেপ করছেন। তার পর মীনাক্ষী দেবী যখন উজ্জ্বলকে বলিলেন, 'এ সব এঁদের বাড়াবাড়ি উজ্জ্বলবাবু। তবে আমি আপনাদের মত বিটন ট্র্যাকে চলি না সে কথা সত্যি'—তখন উজ্জ্বল মিলিয়ে দেখলে এই সেই

গলার আওয়াজ যা সে ঘরের বাইরে থেকে শুনেছিল : তোমাদের উজ্জ্বলকান্ত তাই করেন। উজ্জ্বল একটু হাসল শুধু। কিন্তু বেচারা মনমরা হয়ে গেল। প্রতিকূল পরিবেশে যুদ্ধ করা চলে, ভানও করা চলে, কিন্তু গান করা চলে না। মীনাক্ষীর যে তরুণ স্তাবকটি ইতিমধ্যে আঁখির প্রসাদলাভ ক'রে ধন্য হয়েছিলেন, তিনি ব'লে উঠলেন, মিস্ মল্লিক, আর কথা ব'লে অমূল্য সময় নষ্ট ক'রে কি হবে ? একখানা গান আরম্ভ করুন। সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত তরুণ-সম্প্রদায় থেকে রব উঠল, হ্যাঁ, হ্যাঁ, আরম্ভ করুন। ও মধু থেকে কতক্ষণ আর বঞ্চিত থাকব ; মীনাক্ষী বিনয়ের ভান করলেন না। তিনি তানপুরাটা মিলিয়ে নিয়ে আলাপ করতে আরম্ভ করলেন। কিছুক্ষণ আলাপ ক'রে গান ধরলেন। উজ্জ্বল খানিকটা শোনবার চেষ্টা ক'রে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল। বহু বছর ধ'রে বহু ভাল গানবাজনা শুনে তার কান ও মেজাজ এমন তৈরী হয়ে গিয়েছিল যে, খেলো গানে সে মনোনিবেশ করতে পারত না। মীনাক্ষীর গান শেষ হবার পর উজ্জ্বলকে আর ভদ্রতা ক'রে তারিফ করতে হ'ল না ; সমস্ত ঘর ভ'রে প্রশংসাধ্বনির এমন একটা তুমুল কলরোল উঠল যে, কে কি বলছে না-বলছে সে দিকে কান দেবার অবসর কারোই হ'ল না। উজ্জ্বল দেখলে, মেয়ে-পুরুষ সকলে মিলে যেন প্রশংসার প্রতিযোগিতা চালিয়েছেন, কেবল একটি মেয়ে আর সকলের পেছনে আত্মগোপন ক'রে চুপ ক'রে রয়েছে। মেয়েটি দেখতে ধারালো নয়, বেশবাসেও আভিজাত্যের তীক্ষ্ণতা নেই, চড়া আলোর তলায় মাটির প্রদীপের মত ভীরু চোখে চেয়ে আছে, যেন নিবে গেলেই বাঁচে। উজ্জ্বল একটু অবাক হ'ল।

তারপর গতানুগতিকভাবে উজ্জ্বলকে বাজানোর জন্যে অনুরোধ করা হ'ল। উজ্জ্বলের মনটা তৈরী ছিল না। তবু, বাজাতে যখন এসেছে, বাধ্য হয়েই তারে দু-একটা ঘা দিয়ে বাজনা আরম্ভ করতে প্রস্তুত হ'ল। উজ্জ্বলের বাজানোর প্রধান গুণ ছিল অলঙ্কারবাহুল্যের বর্জন। সে জানত, অলঙ্কারের বাড়াবাড়িতে স্তুপই বাড়ে, রূপ বাড়ে

না। পাকা ছবি-আঁকিয়ে দুটো-একটা রেখার টানেই অসীমের ইশারা দেন, পাকা নাট্যকার একটি-দুটি শব্দেই শ্রেষ্ঠ নাটকীয়তার সৃষ্টি করতে পারেন, উজ্জ্বল তেমনই স্বল্পের মধ্যে ধ্বনির শ্রেষ্ঠ গুণকে ধ'রে ফেলতে পারত। মন মেজাজ যেমনই থাক্, তার হাতের এই অদ্বিতীয় গুণ যে তার বাজনায় সেদিন প্রকাশ পেয়েছিল তাতে আর সন্দেহ নেই। তবু তার বাজনা যখন শেষ হ'ল, তখন দু-একজন শুধু দু-একটা প্রশংসার বাণী উচ্চারণ করলেন, যেমন সুকুমার রায়ের হাসির কবিতা আবৃত্তি করবার পর কোন ছোট ছেলেকে উৎসাহ দেবার জন্যে লোকে ক'রে থাকে।

তার পরে ঘরসুদ্ধ লোক আবার সমস্বরে অনুরোধ করলেন মীনাক্ষীকে, মিস্ মল্লিকের আর একখানা গান হোক, যেন তাঁরা অপেক্ষা করছিলেন কখন উজ্জ্বলের বাজনা শেষ হবে আর তাঁরা এই অনুরোধটি করবার অবসর পাবেন। উজ্জ্বল লক্ষ্য ক'রে দেখলে, সেই সবার-পিছনে-বসা মেয়েটির মুখে এবারেও কোন কথা নেই, কিন্তু চোখে যেন কিসের একটা আলো দেখা যাচ্ছে। উজ্জ্বল মনে ক'রে দেখলে, বাজনা বাজাতে বাজাতে এক মুহূর্তের অনবধানতায় সে যখন হঠাৎ একবার মুখ তুলেছিল, তখনও যেন এই আলো সেই চোখে দেখেছিল। উজ্জ্বল আর একবার অবাক হ'ল মেয়েটিকে দেখে।

ইতিমধ্যে মীনাক্ষী দেবীর গলা কানে এল। বলছেন, আপনারা ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? আমি শেষে আবার গাইব। সরস্বতীবাঈয়ের বীণাটাও তো হওয়া দরকার। ওঁকে যে এই জন্যেই ডেকে আনা হয়েছে। উজ্জ্বল এবার চমকে উঠল। এখানেও বাঈ! তার পর মীনাক্ষী যখন কুণ্ঠিত মেয়েটির দিকে তাকিয়ে বললেন—বাঈ, এবার আপনার বাজনা হোক, তখন উজ্জ্বলের বিস্ময়ের পরিসীমা রইল না। সেই স্বল্পাভরণা ম্লানমুখী মেয়েটি সরস্বতীবাঈ! উজ্জ্বল শুনেছিল, অনূপ-শহর থেকে সরস্বতীবাঈ লক্ষ্ণৌয়ে এসেছেন কদিন আগে। তিনি যে এমন হবেন তা সে ভাবে নি।

সরস্বতীবাঈ বীণা বাজালেন। তিনি শুধু আলাপ করলেন। অপূর্ব বাজনা। ঘরের তরুণ-সম্প্রদায় সে বাজনা শুনলেন না মন দিয়ে। তাঁদের মন প'ড়ে ছিল মীনাক্ষী মল্লিকের দিকে। তাঁরা অপেক্ষা করছিলেন, কখন বীণা শেষ হবে আর তাঁরা মীনাক্ষীকে গান গাইতে অনুরোধ ক'রে কৃতার্থ হবেন। কিন্তু উজ্জ্বল শুনলে। মন দিয়ে শুনলে।

বাজনা শুনতে শুনতে তার মন চ'লে গেল অমৃতলোকে। তার মনে হতে লাগল, একটা পর্দা থেকে বিলম্বিত স্বর যখন অন্য পর্দায় যাচ্ছে, তখন যেন একটা পেয়ালা থেকে আর একটা পেয়ালায় গাঢ় অমৃত ঢালা হচ্ছে। কি তার বর্ণ, কি তার গন্ধ! উজ্জ্বলের প্রাণ ভ'রে গেল। তার মনে হ'ল, এই বীণাবাদিনী মেয়েটি বুঝি সত্যি স্বর্গলোকবাসিনী সরস্বতী। চেয়ে দেখলে মুখের দিকে। দেখলে, মুখের ওপরকার সেই ম্লান ছায়া কোন্ মন্ত্রে স'রে গেছে, যেন একটা জ্যোতির্মণ্ডলের আলো ঘিরে রয়েছে মুখখানাকে; যে ছিল কুণ্ঠিত অবনতমুখী অন্তঃশীলা, সে সেই মুহূর্তে দেবী হয়ে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। উজ্জ্বল যেন নিজেও সেই আলোর ছোঁয়া পেলে। তার মনে হ'ল, সেও যেন কোন অন্তরীক্ষের আলোক-পারাবারে ডুব দিয়েছে, তার সর্বচেতনা যেন দ্যুতিময় হয়ে উঠেছে। যখন বাজনা শেষ হ'ল, তখন সে আবার মাটির পৃথিবীতে ফিরে এল। চেয়ে দেখলে, ম্লান হাসি হেসে অপ্রতিভ মুখে বাঈ নিজের জায়গায় ফিরে যাচ্ছেন।

উজ্জ্বলের আর সেখানে থাকতে ইচ্ছে হ'ল না। মীনাক্ষী দেবী তখনই একটা গানের দমকা হাওয়ায় তার এমন দুর্লভ অনুভূতির অভিজ্ঞতাটা উড়িয়ে দেবেন, এ চিন্তাও তার অসহনীয় হ'ল। সে শরীর ভাল না থাকার অজুহাতে সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ঘর থেকে চ'লে গেল।

পথে বেরিয়ে সে কোন্ দিকে যাচ্ছিল খেয়াল ছিল না, পৃথিবীর কোথায় কি আছে মনেও ছিল না। ধ্যানের ঘোরে যেন চলেছে।

এমন সময়ে একজনের গলার আওয়াজ কানে এল—রায় সাহেব যে, কোথায় চলেছেন? মুখ তুলে দেখলে, স্থানীয় একজন সঙ্গীতরসিক, আগেকার পরিচিত। উজ্জ্বল বললে, বাড়ি যাচ্ছি। মিস্টার মল্লিকের বাড়ি সরস্বতীবাঈয়ের বীণা শুনে এলাম। ভদ্রলোক বললেন, তাই নাকি? মশাই, আশ্চর্য এই সরস্বতীবাঈ আর তার বাজনা। উত্তরে উজ্জ্বলকে বলতেই হ'ল, বাজনা আশ্চর্য সে তো শুনে এলাম, কিন্তু সরস্বতীবাঈ আশ্চর্য কি রকম?

জানেন না বুঝি। গন্ধর্ব-কন্যার কথা শুনেছেন তো? একটা প্রথা আছে বাঈদের মধ্যে। যাকে গন্ধর্ব-কন্যা করা হয়, ছেলেবেলায় একটা অনুষ্ঠান ক'রে ফুলগাছের সঙ্গে সেই মেয়ের বিয়ে দিয়ে দেওয়া হয়। আমরণ গানের সাধনা ক'রে সেই মেয়ের জীবন কাটে। কোনও পুরুষের সঙ্গে দৈহিক ঘনিষ্ঠতা করলে তার ব্রত ভঙ্গ হয়। আজকাল খাঁটি গন্ধর্ব-কন্যা বড় একটা দেখতে পাওয়া যায় না। কিন্তু সরস্বতীবাঈকে যে-সব বাঈ হিংসে করে তারাও স্বীকার করে যে, তিনি এ পর্যন্ত ব্রত ভঙ্গ করেন নি।

উজ্জ্বল শুনে বললে, তাঁকে দেখলে কথাটায় আর অবিশ্বাস হয় না।

ভদ্রলোকের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সে বাড়ি ফিরে গেল।

বাড়িতে ফিরে বিছানায় শুয়ে ঘুমোতে চেষ্টা করলে। কিন্তু ঘুম এল না। তার মনে হ'ল যেন অনুভূতির তীব্রতায় তার সমস্ত স্নায়ু ছিঁড়ে যাবে। সারারাত একটা অজানা আবেগে ছটফট ক'রে শেষে ভোরের দিকে সে ঘুমিয়ে পড়ল। যখন চাকরের ডাকে ঘুম ভাঙল, তখন খানিকটা বেলা হয়েছে। চাকর বললে, বাইরে একজন লোক তার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে অপেক্ষা করছে। উজ্জ্বল গিয়ে যাকে দেখলে, সে তাকে বললে, বাবুজী, আমি সরস্বতীবাঈয়ের ড্রাইভার। বাঈ গাড়িতে অপেক্ষা করছেন, আপনি যদি তাঁর সঙ্গে দেখা করেন তো বড় মেহেরবানি হবে। উজ্জ্বল ব্যস্ত হয়ে পথে নেমে গিয়ে দেখলে, পথের অন্য দিকে গাড়ির মধ্যে সরস্বতীবাঈ ব'সে আছেন। তিনি

উজ্জ্বলকে হাতজোড় ক'রে নমস্কার ক'রে বললেন, রায় সাহেব, আপনার বাড়িতে গেলে আপনার বাড়ির লোকে কি মনে করবেন, তাই আপনাকে পথে ডেকে এনেছি। অভদ্রতা ক্ষমা করবেন। এমন অবাক হয়ে গিয়েছিল যে, উজ্জ্বলের কোনও উত্তর মুখে এল না। সে বাক্যহীন হয়ে দেখতে লাগল, সকালবেলার আলোয় কি অপরূপ শুভ্র পবিত্র দেখাচ্ছে রাত্রের সেই ম্লানমুখী মেয়েটিকে। সরস্বতীবাঈ বললেন, আপনার বাজনা কাল শোনা হ'ল না ভাল ক'রে। যেটুকু শুনেছি, তাতে আরও শুনতে ইচ্ছে করে। আপনার বাড়িতে আমি এলে হয়তো আপনার অখ্যাতি হবে। যদি দয়া ক'রে আমার বাড়িতে আজ সন্ধ্যায় পায়ের ধুলো দেন, তা হ'লে বাজনা শুনে কৃতার্থ হব।

উজ্জ্বল এতক্ষণে কথা খুঁজে পেলে। যথোচিত সৌজন্যের সঙ্গে জবাব দিলে, আপনি আমার বাজনা শুনবেন, সে তো আমার পরম সৌভাগ্য। আমি সন্ধ্যাবেলা হাজির হব।

সারাদিন তার মন আনন্দে ভ'রে রইল। সভাসুদ্ধ লোকের হাততালি পায় অনেকে, কিন্তু একজনের হৃদয়ে সাড়া জাগানো সহজ নয়। সুর আর ছন্দ সেদিন তার প্রতিটি মুহূর্তকে ছেয়ে রইল। কাব্য রচনা করবার জন্যে যেমন বিশেষ একটা মানসিক আবেগের অবস্থা দরকার, গানেও তেমনই। সারাদিন তার মন যেন অরূপ-রতনের আশায় সমুদ্রে ডুবে রইল। সন্ধ্যাবেলায় যখন সরস্বতীর বাড়িতে পৌঁছল, তখন তার মেজাজ তৈরী।

বাঈ নিজে দরজায় এসে তাকে অভ্যর্থনা ক'রে নিয়ে গেলেন। সকালে তাকে পথে ডেকে এনে কথা বলতে হয়েছিল ব'লে আবার ক্ষমা চাইলেন। উজ্জ্বল তখন বললে, কলঙ্কী ব'লে বহুদিন আগেই আমার খ্যাতি র'টে গেছে, আপনার পরিচয়ে নতুন ক'রে সম্ভ্রমহানি হ'ত না আমার বাড়ির লোকের। তা ছাড়া, আপনি তো গন্ধর্ব-কন্যা, আপনার মত মেয়ে আমাদের সমাজেই বা কজন আছেন? সরস্বতীবাঈ বললেন, রায় সাহেব, আমরা যদি দেব-কন্যা হই, তা হ'লেও আমরা

…য় বাঈজী—সে কথা লোকে ভুলবে কেন? উজ্জ্বল হাসল। বললে, দেখুন, লোকে কতটুকু জানে বাঈজীদের সম্বন্ধে। আমি যতখানি জানি তার চেয়ে তারা তো বেশি জানে না। সরস্বতীবাঈ জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তার দিকে তাকালেন যখন, তখন উজ্জ্বল নিঃসঙ্কোচে নিজের পদস্খলনের কাহিনী তাঁর কাছে ব'লে গেল। কি হারিয়েছে, কি সে পেয়েছে, কি পায় নি—কিছু আর বলতে বাকি রাখলে না। সরস্বতী-বাঈয়ের মধ্যে সে যেন তার দোসর খুঁজে পেলে। কি জানি কেন, তার মনে হ'ল, এঁকে বললে ইনি বুঝবেন। শুনতে শুনতে সরস্বতীবাঈয়ের চোখ ছলছলিয়ে উঠল। তিনি বললেন, থাক্ রায় সাহেব, ও-সব কথা শুনলেও কষ্ট হয়। চলুন, বাজনার ঘরে যাই।

সেদিন উজ্জ্বল স্বরোদে যেমন আলাপ করলে, সে রকম বাজনা তার আগের দিন সরস্বতীবাঈও বাজান নি। যে ভাষাহীন ধ্বনি মানুষ আর তার সৃষ্টিকর্তাকে এক ক'রে দেয়, তাই দিয়ে যেন সেতু রচনা ক'রে দিলে সে। জীবনে কখনও যে আনন্দ সে চেয়ে পায় নি, সেই রাত্রিতে সেই আনন্দ তাকে পেয়ে বসল। ধ্বনি দিয়ে সেই ছোট ঘরে এমন আনন্দলোকের সৃজন করলে যে, মনে হ'ল, পৃথিবীর জড় রূপ মিথ্যা। মনে হ'ল, ঈশাবাস্যমিদং সর্বম্। তার আমিত্ব হারিয়ে গেল।

বাজনা শেষ হ'লে উজ্জ্বল তাকিয়ে দেখলে, সরস্বতীবাঈয়ের দু চোখে জলের ধারা নেমেছে। তিনি যেন কি রকম বাহ্যজ্ঞানশূন্যের মত হয়ে গেছেন। উজ্জ্বল চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল সেই গন্ধর্বকন্যাকে, যিনি গানের জন্য ইহলোকের সর্বস্ব উৎসর্গ করেছেন। খানিক পরে সে ধীরে ধীরে ডাকলে, বাঈ! জবাব পেলে না। আর একবার ডাকলে, বাঈ! এবারেও উত্তর পাওয়া গেল না। তখন উজ্জ্বলকান্ত তার স্বরোদযন্ত্রটি তাঁর পায়ের কাছে রেখে দিয়ে নিঃশব্দে ঘর থেকে চ'লে গেল।

সরস্বতীবাঈয়ের বাড়ি থেকে সে আমার বাড়িতে এসেছিল, বাড়ি

ফেরবার আগে। আমি যেন উজ্জ্বলের মুখে একটা অপূর্ব ভাব দেখতে পেলুম। কিন্তু আমি কিছু জিজ্ঞেস করবার আগেই সে বললে, শ্রীকণ্ঠদা, পেয়ে গেছি। আমার সব কষ্টের শেষ হয়েছে। আমি বললুম, ব্যাপার কি হে? কি পেলে? সে বললে, কাল সকালে জানতে পারবেন, আজ যাই। আপনার সঙ্গে দেখা করতে ইচ্ছে হচ্ছিল, তাই দেখা ক'রে গেলুম। আমি তো কিছুই বুঝলুম না। কিন্তু তার খেয়ালী স্বভাবের সঙ্গে আমার বিলক্ষণ পরিচয় ছিল, তাই আর সে রাত্রে কিছু জিজ্ঞেস করলুম না। সে চ'লে গেল।

পরদিন সকালে উজ্জ্বলের চাকর একখানা চিঠি নিয়ে এল। বললে, বাবু বলেছিলেন—ভোরে উঠেই এই চিঠি দিয়ে আসবি। চিঠিখানায় সে মীনাক্ষীদের বাড়িতে গানবাজনার জলসার বর্ণনা থেকে পরদিন রাত্রির ঘটনা পর্যন্ত যে সব কথা লিখেছিল, সেগুলো নিজের ভাষায় আমি এতক্ষণ তোমাদের বললুম। কিন্তু তার চিঠির শেষ লাইনটা প'ড়ে আমি আতঙ্কে চমকে উঠলুম। যে মানুষ সব পায়, সে কি সব ছেড়ে সমুখের পথ দিয়ে চ'লে যায়? আর তার সঙ্গে ফিরে দেখা হয় না? ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে তাদের বাড়ি গিয়ে দেখি, উজ্জ্বলের মৃতদেহের শিয়রে ব'সে বৃদ্ধ জজসাহেব নিঃশব্দে চোখের জল ফেলছেন। বিষের ক্রিয়ায় তার মুখ অবধি নীল হয়ে গেছে।

গল্পের শেষটা শুনিয়া আমরাও চমকাইয়া উঠিলাম। শুধু সীতেশ সেন একটা ভ্রূ ঊর্ধ্বে তুলিয়া বলিলেন, শিয়ার মর্বিডিটি। শ্রীকণ্ঠবাবু বলিলেন, কেন যে উজ্জ্বলকান্ত বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করলে সে নিয়ে তোমরা যত ইচ্ছে আলোচনা কর, কিন্তু মনে ক'রে দেখো প্যাস্ক্যাল বলেছেন, দি হার্ট হ্যাজ ইট্‌স রিজনস হ্যাট রিজন টেক্স নো অ্যাকাউন্ট অফ।

শ্রীগোপাল মিত্র

সাধের সন্ধ্যা

বহুদিন পরে

মাটির মরমী ছোঁয়া পেলাম অন্তরে।
ইঁট-কাঠ-লোহা-ঘেরা নগরীর রুদ্ধ কারাগারে
কোনমতে প্রাণ নিয়ে বন্দী হয়ে থাকি এক ধারে।
বঞ্চনা সঙ্কোচ স'য়ে, লোকলাজ সযত্নে সংবরি
নিয়মিত দিনগত পাপক্ষয় করি।
কবে কোন্ তিথি আসে, কোন্ ঋতু এসে চ'লে যায়
মনে তা পাই না টের, লেখা থাকে পাঁজির পাতায়।
তাই তো যা কিছু দেখি, মনে হয়—আহা, কি সুন্দর!
দু পাশের গাছপালা, পথঘাট, চাষীদের ঘর!
উপরে উদার নীল নিঃসীম আকাশ,
প্রান্তরের বুক জুড়ে নীচে কচি ঘাস,
আমন ধানের গাছ,
সোনালী ধানের শীষে বাতাসের নাচ,
বাবুইপাখির ভিড় দেখে তার ফাঁকে
হাতের পাচনি তুলে বৃদ্ধ চাষী ছেলেদের ডাকে।
রাখালেরা ঘরে ফেরে দিনশেষে ধেনুদল-সাথে,
বৈকালী রোদ্দুর পড়ে গ্রাম্য কুটীরের আঙিনাতে।
বেলা যায়, চারিদিক অন্ধকারে হয়ে ওঠে হারা,
ঘরে জ্বলে সন্ধ্যা-দীপ, আকাশে অগণ্য ম্লান তারা;
মৃদঙ্গ-খঞ্জরী-রোলে কীর্তনের সুর ভেসে আসে,
অদূরে প্রহর ঘোষে শিবাদল মনের উল্লাসে।
দেখা দেয় নীলাকাশে ধীরে শুক্লা পঞ্চমীর চাঁদ—
পথ চলি, দেখি, শুনি মিটিয়ে মনের যত সাধ।
হয়তো এমন সন্ধ্যা এ জীবনে আসিবে না আর,
মন বলে—খুলে দাও, খুলে দাও যত রুদ্ধ দ্বার।

শ্রীশিবদাস চক্রবর্তী

মহাস্থবির জাতক

পাঁচ

আমাদের প্রশ্ন শুনে পরেশদা কিছুক্ষণ চুপ ক'রে রইল। তারপর বললে, সে কথা থাক্। তবে এইটুকু শুনে রাখ যে, আমি আমার পূর্বজন্মের রূপ দেখলুম, বাড়িঘর দেখলুম, আর দেখলুম একটা নির্জন জায়গায় এই সন্ন্যাসীই আমাকে দীক্ষা দিচ্ছেন।

গুহার এক কোণে এতক্ষণ একটা লোক বসে ছিল। লোকটার মাথা মুখ সব একটা ময়লা কাপড়ে ঢাকা, শুধু চোখ দুটো আর নাকটা বার করা—ঠিক ধুনির পাশেই সে ব'সে ছিল। দেখলুম, পূর্বজন্মে আমার দীক্ষার সময়েও সেই লোকটা দূরে ব'সে আছে। যে জায়গাটাতে আমার দীক্ষা হয়েছিল তার একটু দূরেই একটা বড় নদী দেখতে পেলুম।

অল্পক্ষণ পরেই দৃশ্যপট বদলে গেল। চোখের সামনে ফুটে উঠল সেই গুহা, সেই অর্ধনিভন্ত ধুনি, আমার সামনে ব'সে আছেন সেই সন্ন্যাসী, অদূরে সেই মুখঢাকা লোকটি।

সন্ন্যাসী বললেন, বৎস, যদিও তোমার আসল দীক্ষা হয়ে গেছে, তবুও জন্মে জন্মে দীক্ষার অনুষ্ঠান করতে হয়। আজই তোমাকে আমি সেই দীক্ষা দেব—প্রস্তুত হও।

তোমরা হয়তো বিশ্বাস করবে না, সন্ন্যাসীদের ওপরে আমার যতই ভক্তি শ্রদ্ধা থাকুক না কেন, সেই চোদ্দ পনেরো বছর জীবনের মধ্যে কোনদিনই সন্ন্যাসী হবার আকাঙ্ক্ষা মনের মধ্যে জাগে নি। অজ্ঞাত মানসলোকের কোন আহ্বানও কখনও জানতে পারি নি। কিন্তু গুরু যখন বললেন—বৎস, প্রস্তুত হও, তখন আমার সুপ্ত মন হঠাৎ জেগে উঠে বললে—আমি প্রস্তুত।

তারপরে গুরু আমাকে একখানা ছোট গেরুয়া রঙের কাপড় দিলেন পরতে। আমার অঙ্গে একটা পিরান ছিল, তার পকেটে সেই আংটি-বেচা টাকাগুলো ছিল, সব গুরুর হাতে তুলে দিলুম। তিনি সেগুলো নিয়ে সামনের দিকে হাত বাড়াতেই সেই লোকটা ধুনির পাশ

থকে উঠে এসে সেগুলো তাঁর হাত থেকে নিয়ে গুহার আর এক কোণে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

আমাকে সামনে বসিয়ে গুরু কিছুক্ষণ মন্ত্র পড়ালেন। শেষকালে একটি নাম দিয়ে বললেন, পাঁচশো বার একাগ্র হয়ে ঐ নাম জপ কর।

আমি গুরুর সামনে থেকে উঠে গিয়ে একটা আলো-আঁধারি জায়গায় ব'সে নাম জপ করতে আরম্ভ ক'রে দিলুম। কিন্তু কিছুক্ষণ জপ করতে না করতে আমি সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়লুম। কতক্ষণ সেইভাবে ছিলুম বলতে পারি না; তবে জ্ঞান ফিরে আসবার পর অনুভব করতে লাগলুম যে, একটা অপূর্ব আনন্দে আমার মন কাণায় কাণায় ভ'রে উঠেছে। গুরুদেব কাছেই ব'সে ছিলেন, তাঁরই একটু দূরে সেই লোকটা—আমি উঠে গুরুকে প্রণাম ক'রে গুহার বাইরে চ'লে গেলুম।

বাইরে এসে যে দৃশ্য দেখলুম তা জীবনে এর আগে কখনও দেখি নি। দেখলুম, তখন রাত্রির অন্ধকার নেমেছে পৃথিবীতে, কিন্তু দূরে কাছে সব গাছগুলো জ্বলছে। দাউ দাউ ক'রে জ্বলছে না—প্রতিটি পাতা ঘিরে একটা ক'রে সরু আলোর রেখা। কখনও প্রত্যেক পাতা থেকে বিদ্যুৎ বিচ্ছুরিত হচ্ছে, কখনও বা সেই আলো স্নিগ্ধ স্থির হয়ে যাচ্ছে। সে দৃশ্য বর্ণনা করা তো দূরের কথা, কল্পনা করা যায় না।

খুব ধীরে ধীরে বাতাস বইছিল। বাতাসের মধ্যে যেন গান শুনতে পেতে লাগলুম। ক্রমে আমার চারিদিকের গাছ, পাথর, বাতাস সবই যেন জীবন্ত হয়ে উঠে বিশ্বনিয়ন্তার প্রশস্তি গাইতে আরম্ভ ক'রে দিলে। আমারও ইচ্ছা করতে লাগল, তাদের সঙ্গে ঈশ্বরের নামগান করি, কিন্তু আমি মোটেই গান জানতুম না। আমাদের ইস্কুল বসবার আগে ছাত্ররা সুর ক'রে একটা সংস্কৃত স্তোত্র পড়ত—আমি সেইটেই গাইতে আরম্ভ ক'রে দিলুম। আনন্দে আমার শরীরটা থেকে থেকে থরথর ক'রে কাঁপতে আরম্ভ করল।

সে রাত্রি এমনি ক'রেই কাটল।

তার পরে রোজ সকাল সন্ধ্যায় প্রায় এক ঘণ্টা ক'রে গুরুর কাছে উপদেশ শুনতে হ'ত আর বিকেলে ঘণ্টাখানেক নামজপ, এই ছিল কাজ। আমি কোথা থেকে এসেছি, কে আমি, আমার নাম কি কিছুই মনে নেই। আমার অতীত সম্পূর্ণরূপে মন থেকে মুছে গেল।

একদিন গুরু তাঁর সেই লোকটিকে বললেন, ওরে জুগ্নু, এবার আশ্রমটা পরিষ্কার-ঝরিষ্কার কর্, আমাদের ফেরবার সময় হ'ল। বরফ পড়া আরম্ভ হয়েছে কি না দেখিস।

জুগ্নু চুপ ক'রে রইল।

গুরুদেবের এই জুগ্নু লোকটি ছিল অদ্ভুত। আমি যে কদিন সেখানে ছিলুম তাকে একদিনও কথা বলতে শুনি নি, কোনদিন তাকে স্নান করতে কিংবা খেতেও দেখি নি। দিনরাত গুরুদেবের সামনে ব'সে থাকত—কখনও ঘুমুতেও দেখি নি। গুরুদেব যদি তাকে কোন কাজে পাঠাতেন সে চ'লে গিয়ে তখুনি ফিরে এসে তাঁর সামনে দাঁড়াতেই তিনি বুঝতে পারতেন, জুগ্নু কি বলছে।

প্রতিদিন জুগ্নু আমাদের খাবার নিয়ে আসত, কোথা থেকে আনত কে জানে! যেত আর দশ-পনেরো মিনিটের মধ্যেই কাঁচা শালপাতায় জড়িয়ে খাবার আনত—একেবারে গরম। অথচ সেখানে চার-পাঁচ মাইলের মধ্যে লোকালয় ছিল না। সকালবেলা একটি বড় কমণ্ডলু ভরা দুধ, বোধ হয় দু সের হবে—কোথা থেকে এসে উপস্থিত হ'ত তা জানি না। তারপরে বেলা প্রায় একটা দেড়টার সময় জুগ্নু নিয়ে আসত গরম পুরি ও তরকারি। রাত্রেও তাই, কখনও কখনও ওর সঙ্গে কিছু মিঠাই বা চাটনিও থাকত।

এই রকম কতদিন কেটে গেল তার সঠিক জ্ঞান ছিল না। পরে হিসাব ক'রে দেখেছি, এক মাস সাতাশ দিন আমি গুরুর কাছে ছিলুম।

একদিন পাহাড়ে এক জায়গায় ব'সে আছি। পশ্চিমে সূর্য চ'লে পড়েছে। আকাশটা অসম্ভব রকমের লাল হয়ে উঠেছে—সেই দিকে একমনে চেয়ে আছি, হঠাৎ আমার বিস্মৃতির আবরণ ভেদ ক'রে মার

কণ্ঠস্বর কানে এসে লাগল। স্পষ্ট শুনতে পেলুম, মা যেন আমায় ডাকছেন—ও বাবা পরু রে!

নিমেষের মধ্যে স্মৃতিপটে সব ফুটে উঠতে লাগল। আমি তো ভয়ানক উতলা হয়ে উঠলুম—ভাবতে লাগলুম, মার দুঃখ দূর করবার জন্যে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলুম, আর আমি কি করছি! আমার মনে হতে লাগল, মার প্রতি কর্তব্য সবার আগে। সেখান থেকেই উঠে চ'লে যাব, না, গুরুকে জিজ্ঞাসা ক'রে যাব ভাবছি, এমন সময় দেখলুম গুরু আমার সামনেই দাঁড়িয়ে রয়েছেন। আশ্চর্য! তাঁকে আমার কোন কথা বলতেও হ'ল না। তিনি আমার কাছে এসে সস্নেহে বললেন, কি বেটা, মার কথা মনে পড়ছে?

বললুম, আমার মা বড় দুঃখিনী, আমি ছাড়া তাঁর আর কেউ নেই।

গুরু বললেন, সে কি বেটা! তুমি যখন জন্মাও নি, তখন মার কে ছিল? সবার চাইতে বড় মা যিনি, তিনি তোমাকে আমাকে তোমার মাকে—সবাইকে দেখছেন। তাঁর ওপর নির্ভর কর, তাঁর ওপর বিশ্বাস রাখ।

কিন্তু গুরুর কথায় কোনও সান্ত্বনাই পেলুম না, শেষকালে আমি কাঁদতে আরম্ভ করে দিলুম।

সেদিন সন্ধ্যার পরে নাম জপ করতে অসুবিধা হতে লাগল। যতবার একাগ্র হবার চেষ্টা করি, মার বিষণ্ণ মুখখানা চোখের সামনে ভেসে উঠতে থাকে—শেষকালে জপ বন্ধ ক'রে ব'সে রইলুম।

পরের দিন আবার গুরুকে আমার মনের অবস্থার কথা বললুম, তিনি কোনও কথা না ব'লে চুপ করে রইলেন। গুরুর কাছেই একটা বড় হরিণের চামড়ায় আমি শুতুম। সে রাত্রে শোবার আগে গুরুদেব হাসতে হাসতে জুগ্নুকে বললেন, জুগ্নু, পরেশনাথের জামা কাপড় নিয়ে এসে ওকে দিয়ে দে—কাল সকালে ও চ'লে যাবে।

জুগ্নু অদৃশ্য হতেই গুরু বললেন, বেটা পরেশনাথ, কাল সকালে তুমি মার কাছে চ'লে যেও। কিন্তু যাবার আগে তোমাকে একটি

প্রতিজ্ঞা করতে হবে। তুমি পরমাত্মার কাছে নিবেদিত, সংসার তুমি করতে পাবে না। মার মৃত্যুর পরে তোমাকে আবার এই জীবনে ফিরে আসতে হবে।

আমি গুরুদেবকে বললুম, প্রভু, সংসারে মা-ই আমার একমাত্র বন্ধন। মাকে সুখে রাখব—এ ছাড়া আমার অন্য কাম্য নেই। মার মৃত্যুর পর সেখানে আমার কোনও আকর্ষণই থাকবে না। আমি প্রতিজ্ঞা করছি, তাঁর মৃত্যু হ'লেই আমি চ'লে আসব—কোথায় আপনার দেখা পাব ব'লে দিন।

গুরুদেব বললেন, সে তোমায় ভাবতে হবে না, দেখা ঠিক পাবে।

পরের দিন সকালবেলায় গুরু আমাকে আমার জামা কাপড় ও টাকা কটা দিয়ে বললেন, আমি তোমাকে যে মন্ত্র দিয়েছি তা প্রতিদিন রাত্রে শোবার সময় জপ করবে। খুব বিপদে পড়লে আমাকে ডেকো, আমি দেখা দেব।

গুরু আমাকে যে কাপড় দিয়েছিলেন তা ছেড়ে নিজের ধুতি জামা পরলুম, তারপর তাঁকে প্রণাম ক'রে বেরিয়ে পড়লুম। রাত্রেই মনে মনে স্থির ক'রে রেখেছিলুম, আর কলকাতায় না গিয়ে সিধে দিল্লিতে মার কাছে চ'লে যাব। তবুও যাবার আগে আমার সেই আশ্রয়দাতার সঙ্গে দেখা ক'রে যাই মনে ক'রে প্রথমেই সেখানে গিয়ে দেখলুম যে, সে বাড়িতে অন্য ভাড়াটে এসেছে। কাছেই এক মুদীর দোকানের মালিকের সঙ্গে আমার আলাপ-পরিচয় হয়েছিল। তার কাছে গিয়ে জানতে পারলুম যে, আমার সেই আশ্রয়দাতা ভদ্রলোক কদিন ধ'রে আমার অনেক খোঁজ ক'রে অত্যন্ত নিরাশ হয়ে কলকাতায় ফিরে গিয়েছেন। হিসাব ক'রে দেখলুম, সন্ন্যাসীর কাছে এক মাস সাতাশ দিন ছিলুম—এই সময়ের কোনো জ্ঞানই আমার ছিল না।

সেই দিনই বিকেলের ট্রেনে পাটনায় এসে রাত্রি এগারোটার ট্রেনে চ'ড়ে দিল্লি রওনা হলুম।

এই অবধি বলেই পরেশদা চুপ করল

কিছুক্ষণ কি যেন চিন্তা ক'রে পরেশদা আবার শুরু করলে, সে আজ দশ বছর কি তারও কিছু বেশি হবে। এই দশ বছর মাকে ছেড়ে আর কোথাও যাই নি। মা চলে গেলেন, পৃথিবীর সমস্ত বন্ধন থেকে আমাকে মুক্ত ক'রে দিয়ে গেছেন। আমি বিয়ে-থা করলুম না ব'লে মার মনে ক্ষোভ ছিল। কাল রাতে তিনি এসে আমায় ব'লে গেছেন, তাঁর আর কোন ক্ষোভ নেই।

জিজ্ঞাসা করলুম, শ্রাদ্ধের পর কি তুমি চ'লে যাবে?

—কোথায় যাব?

—তবে!

—গুরুদেব বলেছিলেন, সে বিষয়ে তোমায় কিছু ভাবতে হবে না। তবে আমাকে সর্বদা প্রস্তুত হয়ে থাকতে হবে। আমায় যে যেতে হবে সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত। আজ কাল কি হয়তো দুদিন দেরি হতে পারে—এই অনিশ্চয়তার মধ্যে আমি কি ক'রে আর তোমাদের ভরসা দিতে পারি, বল! তোমাদের যখন প্রথম নিয়ে আসি সেই দিনই এ কথা ব'লে রেখেছিলুম—কিন্তু আমার আশা ছিল, মা আরও কিছুদিন বাঁচবেন। তিনি আর বছরখানেক বাঁচলেও তোমাদের স্থিতি ক'রে দিয়ে যেতে পারতুম, কিন্তু ঈশ্বরের তা ইচ্ছা নয়।

এবার পরেশদা মিনতির সুরে বললে, তোমাদের কাছে আমার একটি অনুরোধ এই যে, আমার কিছু একটা হেস্তনেস্ত হয়ে না যাওয়া পর্যন্ত তোমরা এইখানেই থাক। এবারের যাত্রায় যিনি আমার মা ছিলেন, পূর্ব পূর্ব কোনো জন্মে তিনি তোমাদেরও মা ছিলেন। সেই সম্বন্ধে তোমরা আমার ভাই হও—তোমাদের কাছে আমার এইটুকু জোর নিশ্চয় খাটবে, কি বল?

প্রতিজ্ঞা করলুম, তোমার কিছু না হওয়া পর্যন্ত আমরা এইখানেই থাকব।

পরেশদা হেসে হেসে বললে, আশা করি, বেশি দিন তোমাদের ধ'রে রাখব না।

শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা হ'তে লাগল। কথা হ'ল ঐ-দেশীয় ব্রাহ্মণেরা যখন ভোজনে বসবেন তখন আমরা অর্থাৎ ম্লেচ্ছ মছলি-খোর বাঙালী ব্রাহ্মণেরা কাছে আসতে পারব না। দূর থেকে ভোজনপর্বের তদারক করলে অবিশ্যি তাঁরা কোনও আপত্তি করবেন না। সেখানকার শ্রাদ্ধভোজী ব্রাহ্মণদের খবর দেবার ভার নিলেন পরেশদার ঐ-দেশীয় দুজন বন্ধু।

পরেশদা যাঁর বাড়িতে থাকত, অর্থাৎ তার বাড়িওয়ালার কাছাকাছিই আর একটা বড় বাড়ি ছিল—সেই বাড়িটা খালি ছিল। ঠিক হ'ল সেইখানেই শ্রাদ্ধ, ব্রাহ্মণভোজন ও খাবার-দাবার তৈরি সবই হবে। খাবারের মধ্যে পুরি, একটা আলু-কুমড়োর ঘ্যাঁট, হিং দিয়ে কাঁচা তেঁতুলের খাট্টি-মিঠ্‌ঠা চাটনি আর লাড্ডু।

লাড্ডু কি রকমের হবে তাই নিয়ে কয়েক ঘণ্টা ধ'রে কি আন্দোলন! লাড্ডু তৈরি সম্বন্ধে অনেকগুলি বিশেষজ্ঞ এসে উপস্থিত হলেন। কারু বাড়ি আগ্রা, কেউ বা দিল্লির ওস্তাদ, কেউ বা মথুরার, কেউ বা সাণ্ডিলার কারিগর—লক্ষ্ণৌয়ের কাছে সাণ্ডিলা ব'লে জায়গা আছে, সেখানকার লাড্ডু ভারতবিখ্যাত। যা হোক, সবাই মিলে অনেক তর্কাতর্কি আলাপ-আলোচনা ক'রে স্থির হ'ল যে, এক পোয়া ওজনের এক হাজারটি লাড্ডু তৈরি হবে। এতে সওয়া শো থেকে দেড় শো টাকা খরচ হবে। লাড্ডু কি রকম হবে তার নমুনা একদিন ব্রাহ্মণেরা এসে বাড়িতে তৈরি ক'রে আমাদের খাইয়ে গেল।

শ্রাদ্ধের আগের দিন পরেশদা মাথা নেড়া করলে। বললে, তোমাদের আর মাথা কামাতে হবে না, শুধু শ্রাদ্ধ করলেই চলবে।

সেই রাত্রে সারারাত্রি ধ'রে আমরা পালা ক'রে ভিয়েনের কাছে ব'সে রইলুম। পরদিন খুব সকালে যমুনায় স্নান ক'রে আসা গেল। বেলা যখন আটটা—তখনও শ্রাদ্ধের ক্রিয়াকর্ম শেষ হ'তে অনেক দেরি, তখন থেকেই ব্রাহ্মণেরা একে একে আসতে আরম্ভ করলেন। সাড়ে নটা দশটার মধ্যেই বারোটি বিরাট মনুষ্য-পর্বত এসে হাজির হলেন।

কিছুক্ষণ পরেই ব্রাহ্মণেরা ভোজনে ব'সে গেলেন। তাঁরা আমাদের বলতে লাগলেন, আমরা অতি উদারমতাবলম্বী। তোমরা কাছে এলে আমাদের খাওয়া পণ্ড হবে না, অক্লেশে কাছে এসে আমাদের ভোজন দেখতে পার—তবে বাপু খাদ্যদ্রব্যে হাত-টাত দিও না যেন।

ব্রাহ্মণদের পরিবেশন করবার জন্যে আগে থাকতেই অন্য ব্রাহ্মণ নিযুক্ত করা হয়েছিল, তারা পরিবেশন করতে লাগল, আর আমরা দূর থেকে স্পর্শ বাঁচিয়ে তদারক করতে লাগলুম।

ঘণ্টা দুয়েক কেটে গেল, কিন্তু তখনও ব্রাহ্মণেরা সমান উৎসাহে লাড্ডু ওড়াতে লাগলেন। বাংলা দেশে কে কবে আধ মণ খেতে পারত ব'লে যাঁরা সেকালের গৌরব করেন, তাঁরা দয়া ক'রে একবার এখানকার ব্রাহ্মণদের খাওয়া দেখে আসবেন—বেশি খোঁজাখুঁজি করতে হবে না, খাওয়াবেন শুনলে তারা আপনিই এসে হাজির হবে।

পরেশদার কাজ শেষ হয়ে গেলে সেও আমাদের পাশে এসে দাঁড়াল। ব্রাহ্মণেরা খেতে খেতে নিজেদের মধ্যে গল্প করতে লাগলেন—খালি খাওয়ার গল্প। মথুরার চোবেরা কি রকম খেতে পারে। কোন্ কোন্ চোবে খেতে খেতে আসনে ব'সেই দেহত্যাগ করেছিলেন—সেই সব মহাত্মাদের চরিত্র-কথা।

এদিকে পুরি তরকারি বিশেষ ক'রে লাড্ডু মণ মণ উড়তে লাগল অথচ তাঁদের ক্ষুন্নিবৃত্তির কোনও লক্ষণই নেই। বেলা প্রায় দুটো বাজল তখনও তাঁরা খেয়েই চলেছেন—বোধ হয় তিন-চার শো লাড্ডু চেখেই মেরে দিলেন। যদি খাবার কম প'ড়ে যায় সেই ভয়ে কাছেই এক হালওয়াইকরের দোকানে কি কি মিষ্টান্ন মজুত আছে তার খোঁজ নিয়ে আসা গেল।

খাওয়া চলেছে—বেলা তখন প্রায় তিনটে। শীতের বেলা, রোদের ঝাঁজ ক'মে এসেছে। নিমন্ত্রিতদের কাছে বেইজ্জৎ হবার আশঙ্কায় আমরা সব কাঁটা হ'য়ে আছি, এমন সময় দেখা গেল দরজা দিয়ে মাথা নীচু ক'রে এক সন্ন্যাসী প্রবেশ করলেন। সন্ন্যাসীর বিরাট দেহ,

বোধ হয় সাত ফুট উঁচু ও সেই অনুপাতে দেহের পরিধি, তার ওপরে মাথায় প্রকাণ্ড জটা। সন্ন্যাসীর পেছনে আর একজন ঢুকল—যার মুখখানা একটা কাপড় দিয়ে পেঁচিয়ে বাঁধা শুধু চোখ দুটো খোলা রয়েছে।

এই লোকটাকে দেখেই আমি বুঝতে পারলুম—এই হচ্ছে সেই জুগ্নু, যার কথা পরেশদার মুখে আগেই শুনেছি। পরেশদা আমার পাশেই দাঁড়িয়েছিল। তার দিকে চেয়ে দেখলুম, ঠিক সম্মোহিত ব্যক্তির মতন দৃষ্টিহীন চোখে সে চেয়ে রয়েছে। সন্ন্যাসী চারিদিকে চেয়ে অতি মধুর কণ্ঠে বললেন, কাঁহা হয় মেরা বেটা পরেশনাথ!

পরেশদা ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে গিয়ে সন্ন্যাসীকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করলে। তার পরে সে উঠে দাঁড়াতেই সন্ন্যাসী দু হাত বাড়িয়ে তাকে আলিঙ্গন ক'রে আমাদের দিকে পেছন ফিরে দাঁড়ালেন, তারপরে দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলেন—জুগ্নু তাঁদের পেছু পেছু বেরিয়ে গেল। জুগ্নুর চলন দেখে মনে হ'ল সে যেন একটু খুঁড়িয়ে চলে।

উঠোন ভর্তি লোক থ হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইল, কারুর মুখ দিয়ে একটু টুঁ শব্দ বেরুল না।

ব্রাহ্মণভোজন তখনও চলেছে। আরও ঘণ্টাখানেক ধ'রে খেয়ে সমস্ত খাবার নিঃশেষ ক'রে পান চিবোতে চিবোতে যখন তাঁরা বেরুলেন, তখন সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে।

এ-বাড়ির কাজকর্ম মিটিয়ে ও-বাড়ি অর্থাৎ পরেশদা যেখানে থাকতেন সেখানে গিয়ে দেখি, সব ভোঁ ভাঁ—কেউ কোথাও নেই। আমরা আলো জালিয়ে বাজার থেকে খাবার এনে খেলুম। আশা করেছিলুম যে, পরেশদা তার গুরুকে নিয়ে এখানেই এসেছে—অন্তত মাতৃশ্রাদ্ধের দিনটাতে সে চ'লে যাবে না, কিন্তু কোথায় সে! রাত্রি দ্বিপ্রহর অবধি অপেক্ষা ক'রে আমরা শুয়ে পড়লুম।

ভোর হতেই বাড়িওয়ালার সঙ্গে পরামর্শ করবার জন্যে তাকে ডাকা হ'ল। পরেশদা যখন সন্ন্যাসীর সঙ্গে বেরিয়ে যায়, সেও

সেখানে উপস্থিত ছিল। আমরা তাকে বললুম, এবার আমরাও চলি। কারণ আমরা ছিলুম পরেশদার আশ্রিত লোক। সে-ই যখন চলে গেছে, তখন আর আমাদের এখানে থাকার কোনও মানে হয় না।

বাড়িওয়ালা জিজ্ঞাসা করলে, পরেশবাবু কি আর আসবেন না? আপনারা ঠিক জানেন?

—ঠিক জানি।

বাড়িওয়ালা বললেন, আচ্ছা, আপনারা আজকের দিনটা তো থাকুন এখানে।

সেদিন বাড়িওয়ালা আপিস থেকে ফিরে আসবার পর তাকে ডেকে পরেশদার সমস্ত মাল-পত্র জিম্মা ক'রে দিয়ে পরদিন সকালে আমরাও সেখান থেকে বেরিয়ে পড়লুম।

বেরিয়ে তো পড়লুম, এখন যাই কোথায়! যে বাড়িখানা আমরা ভাড়া নেব ব'লে ঠিক করেছিলুম, দেখলুম তখনও সেটার দরজায় তালা দেওয়া রয়েছে। বাড়িওয়ালার কাছে চাবি চাইতে গেলে এবারে সে আর সহজে ছাড়লে না, একটি মাসের ভাড়া আগাম নিয়ে নিলে। যা হোক, আমরা বাড়িতে গিয়ে ধোওয়া-মোছা ক'রে তিনজনের জন্যে তিনখানা দড়ির খাটিয়া কিনলুম। সেদিন আর রান্নাবান্নার হাঙ্গামা না ক'রে একটা দোকানে কচুরি-জিলিপি মেরে সারাদিন তাজমহলে কাটিয়ে দেওয়া গেল। সন্ধ্যার একটু আগে পরেশদার বাড়িতে খবর নিয়ে জানা গেল, সে এখনও ফেরে নি। বাড়ির দিকে যেতে যেতে এক জায়গায় দেখলুম একটা লোক রাস্তার ওপরেই একটা টেবিল পেতে তাতে চায়ের কাপ, বোতল-ভর্তি বিস্কুট প্রভৃতি সাজিয়ে রেখেছে।

আগ্রায় এসে অবধি চা পেটে পড়ে নি। এ সব জায়গায় সে সময়ে চা-খাওয়ার তেমন চলন ছিল না। শীতকালে কোনো কোনো ইংরেজী-ভাবাপন্ন শৌখিন মাঝে-সাঝে চা খেতেন বটে, কিন্তু রাস্তাঘাটে চায়ের দোকান বড় একটা দেখতে পাওয়া যেত না। সে

সময় কলকাতা শহরেই দু-চারটে মাত্র চায়ের দোকান দেখতে পাওয়া যেত। চা দেখে আমাদের মহাপ্রাণী উল্লসিত হয়ে উঠল। তখুনি দোকানদারকে তিন কাপ চায়ের হুকুম ক'রে চেয়ারে ব'সে পড়া গেল। একটু পরেই দোকানদার ঝকঝকে পাত্রে আমাদের চা এনে দিলে। বেশ আরাম ক'রে চা খাচ্ছি ও রাস্তার নানারকম ফেরিওয়ালার মজাদার বুকনি শুনছি—এমন সময় এক বাঙালী ভদ্রলোককে দেখলুম গট্ গট্ ক'রে হেঁটে যাচ্ছেন। ভদ্রলোক কিছুদূর এগিয়ে গিয়ে আবার ফিরে সোজা আমাদের কাছে এসে বললেন, মশাই, আপনাদের দেখে তো বাঙালী হিন্দু ব'লে বোধ হচ্ছে।

আমরা বললুম, হ্যাঁ, আপনার অনুমান ঠিকই হয়েছে।

ভদ্রলোক কণ্ঠস্বরে একটু ধমকের রেশ মিশিয়ে বললেন, আপনারা করছেন কি! উঠে আসুন—উঠে আসুন—

বললুম, এখনও চা খাওয়া শেষ হয় নি যে!

—তা হোক, চলুন আমাদের বাড়িতে, সেখানে চা খাবেন।

এই ব'লে ভদ্রলোক পকেট থেকে চারটে পয়সা বের ক'রে দোকান-দারকে দিয়ে চোস্ত উর্দুতে তাকে বললেন, মাপ ক'রো ভাই, এরা আমার আপনার লোক, এদের নিয়ে যাচ্ছি ব'লে কিছু মনে ক'রো না।

আমরা পুরো কাপ শেষ করতে পারি নি—প্রত্যেকের কাপেই অর্ধেকটা চা তখনও রয়েছে।

আমরা শশব্যস্তে উঠে পড়লুম। দোকানদার অবাক হয়ে একবার আমাদের দিকে আর একবার সেই ভদ্রলোকের দিকে চাইতে লাগল।

লোকটি দেখতে খুবই মোটা, লম্বাও মন্দ নয়। বয়স পরে শুনেছি ত্রিশ বৎসর, কিন্তু প্রথম দৃষ্টিতে চল্লিশের কম মনে হয় না। মাথার চুল উঠতে আরম্ভ করেছে। মুখে খুব বড় একজোড়া গোঁফ, দাড়ি কামানো। ধুতি মালকোঁচা ক'রে পরা, কিন্তু দৈহিক স্থূলত্বের দরুন তা প্রায় হাঁটুর ওপরে উঠেছে। গায়ে গেঞ্জির ওপরে খুব পাতলা মসলিনের মতন সাদা কাপড়ের ঢিলে-হাতা পাঞ্জাবি। জামাও কুঁচকে-

‥চকে নানা স্থানের মাংসপিণ্ডের চাপে—মনে হয় ছোট হয়েছে। এর
‥পরে পাট করা একখানা সিল্কের চাদর পৈতের মতন ক’রে বুকে
‥ধা। সেই পশ্চিমের শীতে ভদ্রলোকের অঙ্গে র‍্যাপার তো নেইই,
‥ং দেখলুম তাঁর কপাল ও মুখ বিন্দু বিন্দু ঘামে ভর্তি। এক মুখ
‥ন রয়েছে—গালফোলা সে অবস্থা দেখলেই বুঝতে পারা যায় যে
‥ক্কা টানার অভ্যেস আছে।

ভদ্রলোকের সঙ্গে কিছুদূর এগিয়ে যাবার পর তিনি বললেন,
‥পনাদের দেখে মনে হচ্ছে এখানকার লোক নন। যা হোক, ওখানে
‥ খেতে আছে! জানেন লোকটা মুসলমান!

তখন হিন্দু পানি-পাঁড়ে ও মুসলমান-ভিস্তির যুগ। আমাদের
‥শোদ্ধার কল্পে নেতারা হিন্দু-মুসলমান-মিলনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে
‥তই গলাবাজি করুন না কেন, প্রকাশ্যে মুসলমানের দোকানে ব’সে
‥নাহার চালানো তাঁরাও তখন কল্পনা করতে পারেন নি। বিশেষ
‥’রে যুক্তপ্রদেশের মতন জায়গায় হিন্দুরা সুদূর ভবিষ্যতেও এ ব্যাপার
‥ম্ভব হবে ব’লে মনে করতে সাহসী হ’ত না। ভদ্রলোকের কথা শুনে
‥মরা বললুম, তাতে কি হয়েছে মশায়! আমরা হিন্দু-মুসলমানে
‥ভদাভেদ মানি না। এই ক’রেই তো আমাদের দেশ উচ্ছন্নে গেল।

আমাদের মুখ থেকে এমন উত্তর ভদ্রলোক আশা করেন নি।
‥তনি কিছুক্ষণ আমতা আমতা ক’রে বললেন, খুব সত্যি কথা,
‥াপনারা যা বলছেন তা খুবই সত্যি কথা। কিন্তু আমি বেশ ভাল
‥’রে জানি যে, ঐ দোকানদার বিলিতি চিনি ব্যবহার করে।
‥াপনারা বিলিতি চিনি নিশ্চয় ব্যবহার করেন না!

—নিশ্চয়ই না।

—যাক্ গে, যা দু-এক ঢোঁক পেটে গিয়েছে তার আর কি হবে!
‥অজানতে খেলে কোন দোষ নেই।

আরও কিছুদূর এগিয়ে ভদ্রলোক বললেন, চলুন আমাদের বাড়িতে,
‥সেখানে চা খাবেন।

চলতে চলতে ভদ্রলোকের বাড়ি গিয়ে পৌঁছনো গেল। সেখানে পরস্পরের পরিচয় গ্রহণ করা হ'ল। ভদ্রলোক তাঁর নাম বললেন, শ্রীসত্যসেবক চক্রবর্তী। তাঁর বাবা সরকারী উচ্চ কর্মচারী ছিলেন। তাঁরা পুরুষানুক্রমে পশ্চিমেই বাস করেন। কাশীতে বাড়ি-ঘর আছে কিন্তু এ জায়গাটা বাবার ভাল লাগে আর জিনিসপত্রও কাশীর চেয়ে সস্তা, তাই এইখানেই তাঁরা বাস করেন। তাঁরা তিন-চারটি ভাই, কেউ এম. এ., কেউ বি. এ., দুজন এখানেই চাকরি করেন, তিনি কিন্তু কিছুই করেন না।

কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর বুঝতে পারলুম অর্থাৎ তিনি বুঝতে দিলেন, আপাতত তিনি পরের উপকার করে বেড়ান, স্বদেশসেবাও কিছু কিছু ক'রে থাকেন তবে গোপনে। আমরা নেহাৎ সদ্য বাংলা দেশ থেকে আসছি আর তিনি লোক দেখলেই চিনতে পারেন—এই কারণেই 'স্বদেশসেবা'র কথাটি আমাদের কাছে প্রকাশ করলেন।

কথাবার্তার মধ্যে ভদ্রলোক একবার বললেন, আপনারা আমার চেয়ে বয়সে অনেক ছোট, আমি আপনাদের 'তুমি'ই বলব—অবিশ্যি যদি কোন আপত্তি না থাকে।

এতে আমাদের আর কি আপত্তি থাকতে পারে! তখন থেকেই আমরা তাঁকে 'সত্যদা' ব'লে ডাকতে আরম্ভ ক'রে দিলুম আর তিনি আমাদের নাম ধ'রে ডাকতে লাগলেন।

কিছুক্ষণ বাদেই চা আর তার সঙ্গে কিছু মিষ্টি এল। খাবার খেতে খেতে পরেশদার কথা উঠল—দেখলুম পরেশদার সঙ্গে সেখানকার কোন বাঙালীর পরিচয় না থাকলেও তার বিস্ময়কর অন্তর্ধানের খবরটি সকলেই জানে। যা হোক আহারাদির পর আমরা তখনকার মতন বিদায় নিলুম। কথা রইল কাল বেলা সাড়ে তিনটের সময় আমরা তাঁর কাছে আসব, তিনি আমাদের সেখানকার কোন কোন বাঙালী বাসিন্দার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবেন।

পরের দিন সত্যদা আমাদের একটি আড্ডায় নিয়ে গেলেন।

এখানে আগ্রা শহরের প্রায় অধিকাংশ বাঙালীই সন্ধ্যাবেলা এসে জমায়েত হন। সেদিন কি একটা ছুটি থাকায় আড্ডায় জন সমাগম অন্য দিনের চেয়ে বেশি হয়েছে। আমরা যখন উপস্থিত হলুম, তখন তাঁদের মধ্যে সন্ন্যাসীর সঙ্গে পরেশদার অন্তর্ধান নিয়ে খুব জোর আলোচনা চলেছে। আমরা যাবার একটু পরেই সে আলোচনা থেমে গেল।

সেই সভায় উপস্থিত প্রায় সকলেই সত্যদার চেয়ে বয়সে অনেক বড়, কিন্তু সত্যদা তাঁদের সঙ্গে বেশ সমানভাবেই কথাবার্তা বলতে লাগলেন। একটু পরেই একজন মুরুব্বী গোছের ভদ্রলোক আমাদের দেখিয়ে সত্যদাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তার পরে সত্য, এই বালখিল্যদের যোগাড় করলে কোথা থেকে?

সত্যদা বেশ রহস্যপূর্ণ হাসি হেসে বললেন, অনেক দিন থেকেই এদের এখানে চ'লে আসবার জন্য লেখালেখি করছিলুম, কিন্তু বাবুরা আর সময় ক'রে উঠতে পারছিলেন না। সম্প্রতি শ্বশুরবাড়ির লোকেরা বড়ই জ্বালাতন আরম্ভ করায় দিনকতক একটু গা-ঢাকা দেবার প্রয়োজন হয়েছে। লিখলুম, এখানে কোন শালা কিছু করতে পারবে না, পত্রপাঠ চলে এস—তাই চলে এসেছে। এখন কিছুকাল থাকবে এখানে।

সত্যদার কথায় উপস্থিত সকলে—আমরা শুদ্ধ—চনমনিয়ে উঠলুম। আড্ডার যাঁরা এতক্ষণ আমাদের উপস্থিতি সম্বন্ধে পরম উদাসীন হয়ে বসেছিলেন তাঁরাও বিস্ফারিত লোচনে আমাদের দেখতে লাগলেন। সত্যদা গোপনে অথচ সশব্দে পাশের লোকটিকে বলতে লাগলেন, ওদের কথা তো আগে কতবার বলেছি তোমাদের। কি সব ছেলে! এক-একটি হীরের টুকরো বললেই হয়। যেমন ঘোড়ায় চড়তে পারে তেমনি সাঁতারে ওস্তাদ। বন্দুক দাও—একশোর মধ্যে একশোটাই 'বুল'স আই'-এ হিট করবে। তেমনি তীরধনুক বল, তলোয়ার বল কিছুতেই কম যাবে না। ঐ যে সেদিন—ব'লে সত্যদা কণ্ঠস্বর একটু নামিয়ে বলতে লাগল, একজন পুলিস অফিসার খুন হ'ল—ব'লেই সে চুপ ক'রে আকাশের দিকে চেয়ে রইল।

সকলে বিস্ময়মিশ্রিত সম্ভ্রমের সঙ্গে আমাদের দেখতে লাগলেন। বোধ হয় তাঁরা আমাদের চেহারা ও বয়সের সঙ্গে সত্যদা-বর্ণিত গুণাবলীর মিল খুঁজতে লাগলেন। আড্ডার দু-একজন লোক একটু একটু ক'রে আমাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে আরম্ভ করলেন। একজন জিজ্ঞাসা করলেন, হ্যাঁ মশায়, শুনেছিলুম যে কোন্ একজন বাঙালীর নায়কত্বে এক লক্ষ নাগা সন্ন্যাসী নাকি অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে একেবারে তৈরি হয়ে আছে—এ কি সত্যি কথা ?

সত্যদা একটু দূরে ব'সে আর একদলের সঙ্গে কি সব বলাবলি করছিলেন, সেই নাগা সৈন্যদের কথা কানে যাওয়া-মাত্র তিনি সেখান থেকেই ব'লে উঠলেন, ওদের কোনও কথা জিজ্ঞাসা ক'রো না, কারণ কোন কথা প্রকাশ করা ওদের বারণ আছে। আমাকে জিজ্ঞাসা কর। তারপর বললেন, হ্যাঁ, নাগা সন্ন্যাসীদের কথা যা শুনেছ তার সবটা সত্যি না হ'লেও বারো আনা সত্যি—যা রটে তার কিছু বটে।

একটু চুপ ক'রে থেকে সত্যদা বলে উঠলেন, কিন্তু তোমাদেরও সব তৈরী হতে হবে। ঘরে বসে আরাম করলে আর চলবে না।

সবাই চুপ ক'রে রইলেন।

সত্যদা সেদিন সেখানে ব'সে আমাদের সম্বন্ধে এমন সব সব গাল-গল্প ছড়াতে লাগলেন যে তাঁর উদ্ভাবনী-শক্তির প্রচণ্ড বিস্ফোরণে আমরা চম্‌কে চম্‌কে উঠতে লাগলুম। যা হোক, পরের দিন বিকেল-বেলা আবার দেখা করতে ব'লে সেদিন বিদায় নিলেন।

যত দিন যেতে লাগল সত্যদার আসল পরিচয় পেয়ে আমরা ততই মুগ্ধ হতে লাগলুম। এমন সার্থকনামা ব্যক্তি ইতিপূর্বে অন্তত আমার চোখে আর পড়ে নি। নাম ছিল তার সত্যসেবক, কিন্তু সত্যের ত্রিসীমানার মধ্যে সে চলাফেরা করত না। শুধু তাই নয়, এমন সবজান্তা ব্যক্তিও সংসারে দুর্লভ। সত্যদাকে যখন যা জিজ্ঞাসা করা যেত অমনি সঙ্গে সঙ্গে তার উত্তর পাওয়া যেত। একটা দৃষ্টান্ত দিই,

আগ্রার কেল্লার চারিদিকে গভীর পরিখা আছে। তার পরেই খানিকটা ঘাসওয়ালা জমি ও তার পরে রাস্তা। পরিখার পরেই যে জমি আছে সেখানে এক জায়গায় লাল পাথরের একটা ঘোড়ার মূর্তি আধখানা পোঁতা আছে—এখন আছে কিনা তা বলতে পারি না, অন্তত সে সময় ছিল। একদিন সত্যদাকে জিজ্ঞাসা করলুম, এই ঘোড়ার মূর্তিটা এখানে কেন সত্যদা ?

সঙ্গে সঙ্গে সত্যদা উত্তর দিলেন, সম্রাট আকবর প্রতিদিন সকালে কেল্লার ছাত থেকে ঘোড়ায় চ'ড়ে লাফ মেরে নীচের রাস্তায় প'ড়ে বেড়াতে যেতেন। ঘোড়া একেবারে পরিখার এ পারে পড়ে মারত দৌড়—তার পরে পঞ্চাশ মাইল ঘুরে আবার তিনি কেল্লায় ফিরে আসতেন। একদিন এই রকম লাফ মারতে গিয়ে ঘোড়াটা আর পরিখা পার হতে পারলে না। পরিখার মধ্যে ছিল পাঁক, ঘোড়াটা সেই পাঁকের মধ্যে ডুবে ম'রে গেল আর সম্রাট তার ওপরে ছিলেন ব'লে বেঁচে গেলেন। বিশ্বাসী ঘোড়ার স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ তার পাথরের প্রতিমূর্তি তৈরি ক'রে তিনি ঐখানে স্থাপন করেছেন।

সত্যদা বলতেন, আমি প্রতিদিন সকালবেলা ছাতের ওপর বসে সূর্যের দিকে চেয়ে যোগ করি। সূর্যের দিকে চেয়ে আমার গুরুর দেওয়া মন্ত্র উচ্চারণ করতে থাকি: অনেকক্ষণ মন্ত্র পড়তে পড়তে আমার মনে হয়, আমি যেন একটা বিন্দুতে পরিণত হয়েছি। তার পরে হু-হু ক'রে উড়তে উড়তে একেবারে চ'লে যাই সূর্যের কাছে। কখনও বা সূর্যটাই একটা বিন্দুর মত হয়ে ছুটতে ছুটতে চলে আসে আমার কাছে।

একদিন সুকান্ত ন্যাকা সেজে বলে ফেললে, আচ্ছা সত্যদা, সূর্যটা কি রকম ?

সত্যদা অমনি সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন, ওঃ, সে একেবারে জবাকুসুম সংকাশং—!

সত্যদা বলতেন, আগে আমাদের দেশে সূর্যে যাওয়ার ব্যাপারটা

খুবই চলতি ছিল—তা না হ'লে কি সূর্যসিদ্ধান্তের মতন বই লেখা যায়!

সে সময় তাজমহল ও কেল্লার পরিচর্যার জন্য একজন উচ্চশ্রেণীর কর্মচারী নিযুক্ত হতেন। সে সময়ে এই কাজে একজন ইংরেজ নিযুক্ত ছিলেন। তাজমহলের বাগানটি তাঁর দেখাশোনার ফলে খুবই সুন্দর হয়ে উঠেছিল। সে বাগানের গাছের ফুল ফল বা পাতা ছেঁড়া বারণ ছিল। যে সব জায়গায় গাছ ছিল না, সেখানকার ঘাসগুলো সর্বদা এমন পরিষ্কার ও সমান ক'রে ছাঁটা থাকত যে সেদিকে চেয়ে দেখতে হ'ত। আমাদের দেশীয় লোকেরা তাজ দেখতে গিয়ে দলে দলে এই সব ঘাস-জমিতে বসত আর ঠোঙা, পাতা, শিশুদের ময়লায় জায়গাগুলো অত্যন্ত নোংরা ক'রে দিয়ে চলে যেত। সেই ইংরেজ পরিদর্শক এই সব নোংরামিতে আপত্তি করত এবং মাঝে মাঝে চাবুক হাতে লোক তাড়া করত—কখনো কখনো বা এর তার ঘাড়ে দু-এক ঘা চাবুক বসিয়েও দিত।

একদিন সত্যদা বললেন, কাল তোমাদের রিভলভার দেব। এই লোকটা রোজ সন্ধ্যেবেলা যমুনার পোলের ওপর বেড়াতে আসে, ব্যাটাকে সাবড়ে দাও।

সত্যদার প্রস্তাব শুনে বুকের মধ্যে ঢিপ ঢিপ করতে লাগল। মনে হ'ল, বেশ তো নাগা সন্ন্যাসী নিয়ে দিন কাটছিল—কিন্তু এ সব আবার কি! বললুম, অনেক দিন রিভলভার চালানো অভ্যেস নেই যে দাদা!

সত্যদা বললেন, আচ্ছা, আগে দিনকয়েক ভাল ক'রে অভ্যেস ক'রে নাও। কাল রিভলভার নিয়ে যাওয়া যাবে প্র্যাকটিস করতে।

"মহাস্থবির"

মোদ্দা কথা

চার্চিল কয়, মোদ্দা কথা শোন ব্রাদার ইকে,
ইনি-উনি নামেই আছেন, আমরা আছি টি'কে।

উপন্যাসের উপকরণ

২০

মহত্ত্বের প্রলোভন জগতের বহু মহৎ কার্যের কারণ হ'লেও, তার একটা অনিষ্টের দিকও আছে। স্বার্থপর পিতা ও বিদ্রোহী পুত্রের অপর এক ঐতিহাসি দ্বন্দ্বের ফলভোগ আজীবন আমাকেই করতে হয়েছে।

আমার সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত হ'ল জীবনেতিহাসের কয়েকটি স্নিগ্ধোজ্জ্বল পৃষ্ঠা যৌবনের আগমনীতে ভরপুর প্রাণ—তার কাছে সবই সুন্দর, সবই মহান্। কি তার পরবর্তী ইতিহাস মেঘাচ্ছন্ন।

বন্ধুর শুভবিবাহে বরযাত্রী গিয়েছি। কন্যার পিতা বড়লোক, উৎসবমুখরি প্রকাণ্ড বাড়ি—আদর-আপ্যায়নের অন্ত ছিল না। সবচেয়ে বেশি দৃষ্টি ছিল তাঁদে বরের বন্ধুদের উপর।

সন্ধ্যার পরেই লগ্ন ছিল একটা। বহুসংখ্যক বরযাত্রী ও কন্যাযাত্রী সময়োচি বেশভূষায় সুসজ্জিত হয়ে আলোকোজ্জ্বল বিবাহ-সভা অলঙ্কৃত করছেন। যথাকা সালঙ্কারা কন্যা সভাস্থ হ'ল। একেই বলে সালঙ্কারা। মাথা থেকে পা পর্য প্রসিদ্ধ অপ্রসিদ্ধ কোনও অলঙ্কারই বাদ ছিল না। কিন্তু মেয়েটির গায়ের র অত্যন্ত কালো, বাস্তবিক আপত্তিজনকভাবে কালো।

পিতার নির্বাচনে অসন্তুষ্ট হয়ে পাত্র গেল বিগড়িয়ে। সবার মুখে এক কথা ছি ছি, এই ছেলের ওই বউ! ভদ্রলোকের কি চোখ ছিল না? আমরাও বির হয়েছিলাম, তবু ব্যাপারটা মিটিয়ে দিতেই চেষ্টা করেছিলাম।

তিনি নিজে অনেক অনুনয়-বিনয় করলেন, কিন্তু কিছু ফল হ'ল না। বন্ধুবর অর্থাৎ আমাদের বন্ধু এবং সেই বিবাহের বর—আসন ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়ল বোঝা গেল, তার পিতার চোখ ছিল এবং সেই চোখের দৃষ্টিও ছিল সবিশেষ তীক্ষ্ণ কিন্তু তার লক্ষ্য ছিল অন্য দিকে। পুত্রের পছন্দ-অপছন্দের দিকটা তিনি ভে দেখাও দরকার বোধ করেন নি। তাঁর ছেলে যে এতবড় আকাট-মূর্খ—এ ছি তাঁর কল্পনাতীত। রূপ-যৌবন দু দিনের, কিন্তু সোনারূপা যত্ন ক'রে রাখ পারলে চিরকালের।

ভদ্রলোক রেগে বললেন, আমাকে তুমি দশের সামনে অপদস্থ করলে, আ তোমাকে ত্যাজ্যপুত্র করব। কথাটা অসার আস্ফালনের মত শোনাল। আমাদে অজ্ঞাত ছিল না, উপার্জনক্ষম পুত্রকে পরিত্যাগ করলে তাঁর নিজের দারিদ্র্য ছাড় আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না।

ও-দিকে কন্যাপক্ষে হুলুস্থুল প'ড়ে গেল। কেউ বললে, মাথা ফাটিয়ে দাও। কেউ বললে, কেস করব—হাইকোর্ট পর্যন্ত লড়ব। কেউ বললে, সহজে ছাড়ছি না। কনের বাপ-ভাইরা কিংকর্তব্যবিমূঢ়, মেয়েমহলে কান্নাকাটি।

যারা মাথা ফাটিয়ে দিতে চেয়েছিল, গণনায় তাদেরই মাথা ক'মে আসতে লাগল। যারা কেস করবে বলেছিল, তারা যেন আদালত খোলার অপেক্ষাতেই দাঁড়িয়ে রইল। যারা কিছুতেই ছাড়বে না, ধীরে ধীরে সে স্থান পরিত্যাগ করল। হার্ট-দুর্বল মেয়ের মায়ের ফিট হওয়ায় মেয়েদের ক্রন্দনধ্বনি হট্টগোলে পরিণত হ'ল। কন্যাকর্তা বুক চাপড়াতে লাগলেন।

কিন্তু এ সবে আমি তত বেশি বিচলিত হই নি। আমার কবি-হৃদয়কে বিচলিত করেছিল আসনে উপবিষ্টা কনেটি, যে লজ্জায় মাটির সঙ্গে মিশে যেতে চাইছিল। এই অতি নীচ অপমানকর অবস্থা বোঝবার বয়স তার হয়েছিল এবং এই বিবাহপূর্ব বয়োবৃদ্ধির কারণ ছিল তার গায়ের রঙ।

আমি উচ্ছ্বসিত হয়ে পড়লাম। কন্যাকর্তার কাছে গিয়ে সবিনয়ে নিবেদন করলাম যে, যদি কোন বাধা না থাকে, আমি তাঁর মেয়েটিকে বিয়ে করতে প্রস্তুত আছি। আমার বংশ এবং গোত্র-পরিচয় তাঁর অবিদিত ছিল না। তা ছাড়া, তাঁকে আমার পিতৃবন্ধুও বলা চলে।

ভদ্রলোক হাতে স্বর্গ পেলেন। আশ্বস্ত হয়ে বললেন, বেঁচে থাক বাবা, তুমি আমার জাতকুল রক্ষা করলে। আবেগে বুকে জড়িয়ে ধরলেন।

এই কথা রাষ্ট্র হতেই বরকর্তা, বর এবং তাদের নিকট আত্মীয়স্বজন অতি সত্বর গা-ঢাকা দিলে। ভূতপূর্ব ও বর্তমান বরের ক্ষুধার্ত বন্ধুবর্গ মহত্ত্ব ও লুচির প্রলোভনে ফিরে এল। দ্বিতীয় লগ্নে বিয়ে হয়ে গেল। মহত্ত্বের পুরস্কারস্বরূপ বন্ধুবর্গ আমাকে কাঁধে ক'রে নাচতে লাগল। এমন কি খবরের কাগজে আমার নাম বেরিয়ে গেল। হেডিং দিলে—যুবক জমিদারের অতুলনীয় মহত্ত্ব।

এই ভাবে আমার দাম্পত্যজীবনের সূত্রপাত। এই অস্বাভাবিক মিলনের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি—পাপের মত মহত্ত্বেরও যে অনুতাপ থাকতে পারে, সে কথা আমি ক্রমে ক্রমে বুঝতে পারি। এক দিকে করুণা, অন্য দিকে কৃতজ্ঞতা—এই নিয়ে, আর যাই হোক, প্রথম যৌবনের পতিপত্নীপ্রেম গ'ড়ে উঠতে পারে না। আবেগহীন উচ্ছ্বাসহীন ভালবাসায় যৌবনের ক্ষুধা মেটে কি?

এ সত্য গোপন ক'রে লাভ নেই যে, মহত্ত্বের মাদকতা যে পরিমাণে কাটতে

লাগল, দিনের পর দিন ঠিক ততটাই নিজেকে ক্ষতিগ্রস্ত ব'লে বিবেচনা করি। আমার প্রাণের প্রবল রূপ-পিপাসা নিদারুণ নৈরাশ্যের রূপ পরিগ্রহ ক'রে অন্তরময় হাহাকার ক'রে ওঠে। শত চেষ্টা সত্ত্বেও, নিজের মনের সঙ্গে প্রাণপণ যুঝেও সরলাকে আমি ভালবাসতে পারি নি।

তবু তার দেহমনের দিকে আমার দৃষ্টি ছিল অত্যন্ত সজাগ। আমি যা দিতে পেরেছিলাম, প্রচুর ক'রেই দিয়েছিলাম ; কিন্তু যেখানে আমি শক্তিহীন, সেখানে আমি করব কি ? বরং এই দিকটার শূন্যতা পূর্ণ করতে বাইরের দিকটা প্রয়োজনের বেশি হয়ে ছাপিয়ে উঠছিল যতই, ভিতরে ভিতরে ততই আমি হাঁপিয়ে উঠছিলাম। এটা নিছক দয়া, তার প্রতি আমার এই স্নেহব্যবহারে অভিনয়ের লেশমাত্র ছিল না।

ধীরা ও সুধীরের সঙ্গে অনেকটা মেলে। চা ও গরম সিঙাড়া কি জুড়িয়ে গেছে ?

কিন্তু তার বিষয়ে আমার মনের গোপন কথা তার চোখে একটুখানিও ধরা পড়েছিল ব'লে মনে হয় না। আমাকে পেয়ে তার সন্তোষ ও আনন্দের সীমা-পরিসীমা ছিল না। আর পাঁচজনের সঙ্গে তার মেলামেশা খুব কমই ছিল, যেটুকু ছিল, তাদের সম্বন্ধে তার চক্ষুকর্ণ মোটেই সজাগ ছিল না। তার মন ছিল অহোরাত্র আমারই পূজায় নিমগ্ন। রামায়ণ-মহাভারতের গল্প থেকে তার মনে ধারণা জন্মেছিল যে, স্বামীরূপী পুরুষরা সব দেবতাবিশেষ। স্বচক্ষে দেখলেও তাই, অতএব সংশয়ের অবকাশ কোথায় ? এর চেয়ে নিশ্চিন্ত জীব আর কি হতে পারে ? চিত্ত-বিলাসের স্বপ্নময় দেশ তার কাছে চিরজীবনই অনাবিষ্কৃত র'য়ে গেল।

প্রেমের চেয়ে পূজা অনেক বড়। প্রেম টলায় মানুষকে, পশুকেও হয়তো মানুষ করে ; কিন্তু পূজা গলায় প্রস্তর-দেবতার মনকে। একদিন সন্ধ্যার পর ঘরে ঢুকে দেখি, সরলা আমার ফোটোর সামনে দাঁড়িয়ে আছে। তার মুগ্ধ দৃষ্টি ছবিটার দিকে একান্ত নিবদ্ধ। আমাকে তো সে অনবরতই দেখছে, ছবিতে নূতন ক'রে কি দেখছে ও ? খুব সম্ভব, এমন একান্তে ও পরিপূর্ণভাবে দেখবার সুযোগ পায় নি। লজ্জা করে যে।...আমাকে ঢুকতে দেখে সলজ্জ হাসি হেসে স'রে দাঁড়ায়।

গোলাপও হাসে, অপরাজিতাও হাসে। গোলাপের খিল-খিল নির্লজ্জ রঙিন হাসি মূর্খের কাছেও ধরা পড়ে, কিন্তু সবুজের পাশে নীলরঙের ওই ছায়াশীতল শান্ত নীরব সলাজ হাসিটুকুর মূল্য ও মাধুর্য বুঝতে দার্শনিক দৃষ্টির প্রয়োজন হয়। কবি ও দার্শনিক হবার স্পর্ধা রাখি, কিন্তু আমি কি মূর্খ! মনুষ্যচরিত্র দুর্জ্ঞেয়, রূপও কি তাই ? রঙ ? রঙই কি সব ? ওই হাসি আর কোনও রঙে খাপ খেত না।

এই প্রথম আমি রূপতৃষ্ণার পূর্ণ আবেগে তার মুখচুম্বন করি।...

গভীর রাত্রে ও যখন ঘুমিয়ে পড়ে, আলো জ্বেলে ব'সে ব'সে নারীর রূপ-বিষয়ে সুদীর্ঘ একটা কবিতা লিখি। লিখতে লিখতে বার বার ওর ঘুমন্ত মুখের দিকে চেয়েছিলাম। কবিতাটা হারিয়ে গেছে, মনেও নেই কিছু, ভাবটা শুধু মনের সঙ্গে গাঁথা আছে—

অসুন্দর নারীর রূপ একটিও আমার দৃষ্টিগোচর হয় নি
অনর্থক রূপ-মৃগতৃষ্ণিকার পিছন পিছন ঘুরে মরেছি—
সৌন্দর্য-বোধোদয়ের প্রথমপাঠেরও অর্থ জানি না।
মা-যশোদা ও যীশু-মাতার নতচক্ষের করুণ কোমল মায়া
ক'জন চিত্রকর ফুটিয়ে তুলেছে ?
রন্ধন-প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত ভগিনীর আনন্দোজ্জ্বল মুখচ্ছবির আভা
কোন্ যন্ত্রের কোন্ ফোটোতে ধরা পড়বে ?

কোন্ কবিতায় ব্যক্ত করব সরলার সেই হাসিটুকু ?...কিন্তু এ ক্ষণোচ্ছ্বাসমাত্র। সকল খণ্ডকবিতাই ক্ষণোচ্ছ্বাসের ফল।

বিবাহের পর দুই বৎসর কেটে গেছে। অবশেষে সকল অন্তর্দ্বন্দ্বের অবসান ঘটায় দ্বিতীয় একটি সজীব কবিতা। হায়, সেটিও হারিয়ে গেছে।

মেয়েটার রঙ হয়েছিল তার মায়ের মতই কালো। কিন্তু নাক মুখ চোখ দেখে মনে হ'ত, যেন পাকা কারিগরের তৈরি একটা কাঁচা মাটির পুতুল, এখনও রঙ লাগানো হয় নি। আর তার চোখের সেই অসহায় চাহনি ? আমার মন স্নেহ-রসে পূর্ণ হয়ে গেল, কোথাও কিছু ফাঁক রইল না।

বাড়িতে রূপলাল নামে আমার এক পুরনো চাকর ছিল। পৈতৃক 'পুরাতন ভৃত্য'। বয়সে প্রৌঢ় হ'লেও তার দেহে ছিল শক্তি, আর মনে ছিল ফূর্তি। তার বেশভূষা ও চালচলন দেখে কেউ তাকে ভৃত্য ব'লে মনে করতে পারত না। কোন্ খেয়ালে সে আজীবন অবিবাহিত রইল তা সেই জানে। সম্ভবত সঙ্গীত-সাধনাই এর মূল কারণ ছিল। শুনেছিলাম, তার বাল্যকালে তার গান শুনে মুগ্ধ হয়ে বাবা তাকে সংগ্রহ করেছিলেন। আমার জ্ঞানে তাকে দু-তিনবারের বেশি দেশে যেতে দেখি নি।

রূপলাল বললে, খোকাবাবু, খুকীকে আমি বিয়ে করব, তোমার মত কি বল ? বউমার মত আছে।

কেন, এতদিন পরে আবার এ শখ হ'ল কেন?

হ্যাঁ, হয়েছে। খুব বেশি রকম ঝোঁক।

করলেও তাই। সেই যে খুকী তার কাঁধে চড়ল, সেখান থেকে তাকে আর নামতে দেখি নি। এই বিবাহের ফলে তার শৌখিনতা কিন্তু একেবারেই ধ্বংসে গেল। কেমন ক'রে থাকবে? ঘণ্টায় ঘণ্টায় খুকী তার কাপড় ময়লা ক'রে ফেলছে। সব কিছু বাবুগিরির মূলে তো সেই মাসান্তে পাঁচটি টাকা? খুকীর জামা-কাপড়-খেলনার কোনও অভাবই ছিল না। কিন্তু অনেক সময় তার হাতে অদ্ভুত নূতন খেলনা, গায়ে অসভ্য ছিটের জামা আমার নজরে পড়ত। বাধা দিলে শুনত না, দামও নিত না। এক কথায় মেয়েটা তার সর্বস্ব হয়ে উঠল।

প্রতি সন্ধ্যায় রূপলালের ঘরখানিতে যে গানের আসর বসত, তাও গেল বন্ধ হয়ে। স্তন্যদান ব্যতীত খুকীর প্রতি সরলার কোনও কর্তব্য ছিল না। রূপলালের মতে, আমরা ছেলেমানুষ, এ সবের মর্ম কি জানি! দেখা গেল, ও-রসে-বঞ্চিত রূপলাল কিন্তু যে-কোনও বর্ষীয়সী গৃহিণীকেও হার মানিয়ে দিতে পারে।

এখন মনে হয়, এ ব্যবস্থা উর্ধ্ব হতে এবং পূর্ব থেকে স্থির হসে ছিল। উর্ধ্বলোকের কর্তৃপক্ষের জানা ছিল, ফল প্রসব ক'রে বনফুল ঝ'রে পড়বে। খুকীর বয়স যখন প্রায় এক বৎসর, টাইফয়েডে ভুগে সরলার মৃত্যু হ'ল। যমে-মানুষে দীর্ঘকাল টানাটানির পর মানুষের ঘটল পরাজয়। রূপলালের সেবাযত্ন চিত্রগুপ্তের খাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। হয় সে পূর্বজন্মে সরলার কাছে ঋণী ছিল, না-হয় সরলাই তার কাছে পরজন্মের জন্য ঋণী র'য়ে গেল। পাটিগণিতের যোগ-বিয়োগ মানি ব'লেই জন্মান্তর মানতে বাধ্য, নইলে দেনা-পাওনার জের মেটে না।

সরলার মৃত্যুর পর খুকীকে রূপলালের হাতে সম্পূর্ণরূপে সমর্পণ ক'রে এখানে-ওখানে ঘুরে বেড়াই। একদিন পশ্চিম থেকে ফিরে এসে বললাম, রূপলাল, আমি দূর বিদেশে যাব, কাজ আছে। এত দূর যে, ফিরতে অনেক দেরি হবে, দু-তিন বছরও হতে পারে। মানুষের জীবনের ভরসা কি। খুকীর ভার তোমার ওপর রইল, আর সেই জন্যে একটা পাকা বন্দোবস্ত ক'রে যেতে চাই।

রূপলাল হাতে-পায়ে ধরলে, খুব খানিকটা কাঁদলে; কিন্তু আমার সংকল্পের নড়চড় হ'ল না। দেশের সমস্ত সম্পত্তি, কলকাতার দুটো বাড়ি, নগদ দশ হাজার টাকা খুকীর নামে লিখে দিয়ে রূপলালকে তার অভিভাবক নিযুক্ত করলাম। দুখানা বাড়ির মাসিক আয় অন্তত দু শো টাকা হবে, এতেই তাদের স্বচ্ছন্দে চ'লে যাবে।

দেশের সম্পত্তির আয়ও বড় কম ছিল না। তবে, বাবার মৃত্যুর পর থেকে বিশেষ কিছু পাওয়া যেত না, অধিকাংশই কর্মচারীরা লুটেপুটে নিত। বাড়িতে শুধু বৃদ্ধ পিসীমা ছিলেন, তিনি ভালমন্দ কিছুই বুঝতেন না। বন্দোবস্ত রইল, এই সমস্ত আয় থেকে রূপলাল খাওয়া-পরা ছাড়া পারিশ্রমিক স্বরূপ মাসিক দশ টাকা হিসাবে পাবে। খুকীর কোনও প্রয়োজনে কিংবা তাকে নিয়ে কোনও দায়ে ঠেকলে, রূপলাল এই সব সম্পত্তি, কি তার যে কোনও অংশ বিক্রি করতে পারবে।

পিসীমা ক্রমেই অসহায় হয়ে পড়ছিলেন। সব দিক বিবেচনা ক'রে রূপলাল ও খুকীকে দেশের বাড়িতে দিয়ে কলকাতায় ফিরে আসি। পিসীমাও কাঁদলেন। স্টেশনে গাড়ি ছাড়লে, খুকীকে কোলে ক'রে রূপলাল চোখ মুছতে মুছতে গ্রামে ফিরে গেল। ট্রেন ছাড়বার আগে খুকীকে কোলে নিয়ে চুমু খেয়েছিলাম, সে শুধু হেসেছিল। সেই হাসি, মনের পাতায় আজও তার সুস্পষ্ট ছাপ দেখতে পাই।

নির্দিষ্ট দিনে, শুভ কি অশুভ জানি না, কলকাতা থেকে নিরুদ্দেশ যাত্রায় বেরিয়ে পড়ি। প্ররোচনা দিয়েছিলেন আমার এক মধ্যপ্রদেশবাসী বন্ধু, নাম—হাসান শহিদ। তাঁর বুদ্ধিবলে দেশ-বিদেশে ব্যবসায় ক'রে আমরা প্রচুর অর্থ উপার্জন করি। তিনিই মাঝে মাঝে পণ্য-সংগ্রহ করতে দেশে আসতেন। অর্থোপার্জন ও ভবঘুরেগিরির নেশায় আমাকে পেয়ে বসেছিল, ভারতবর্ষে আসতে মন সরত না।

প্রথম তিন বৎসর রূপলাল ও কর্মচারীদের সঙ্গে চিঠিপত্রের আদান-প্রদান অক্ষুণ্ণ ছিল। খুকীর সংবাদ নিয়মিত ও বিস্তারিত পাওয়া যেত। একবার রূপলাল লিখলে, পিসীমা মারা গেছেন, তার নিজেরও বয়স বাড়ছে, অতএব পত্রপাঠ যেন দেশে ফিরে যাই। এইবার আমার পক্ষে দেশে ফিরে যাওয়া অনিবার্য হয়ে উঠল। তবে, লণ্ডনে একটা জরুরি কাজ শুরু করেছি, পত্রপাঠ যাওয়া অসম্ভব। লিখলাম, এক বৎসরের মধ্যে ফিরে যাচ্ছি, সাত-আট মাসেও হতে পারে।

কিন্তু ছয় মাস অতীত হতে না হতেই অঘটন ঘটল। হঠাৎ দেশ থেকে চিঠিপত্র আসা বন্ধ হ'ল। চিঠির পর চিঠি লিখি, টেলিগ্রামের পর টেলিগ্রাম পাঠাই, জবাব নেই। আরও তিন মাস পরে জনৈক কর্মচারী লিখলে, দেশে কলেরার প্রাদুর্ভাব হয়েছিল। প্রাণভয়ে প্রায় সকলেই দেশ ছেড়ে পালিয়ে যায়। খুকীকে নিয়ে রূপলাল যে কোথায় গেছে কেউ জানে না। পরিশেষে উক্ত কর্তব্যপরায়ণ কর্মচারী জানিয়েছেন যে, তারা ফিরে এলে টেলিগ্রাম করবেন।

আমার বত্রিশ নাড়ী মোচড় দিয়ে উঠল। কাজকর্মে ইস্তফা দিয়ে, আবোল-

গাবোল নিজের ভাগ বুঝে নিয়ে ভারতবর্ষে ফিরে আসি। স্বগ্রামে এসে জানতে পারি, তারা ফিরে আসে নি। সারা বাংলা দেশ, পরিশেষে সমগ্র ভারত তোলপাড় ক'রেও তাদের সন্ধান পাওয়া গেল না। তার নিজের দেশের সঙ্গে রূপলালের সম্বন্ধ ছিল খুব কম, সে কথা আগেই বলেছি। তার দেশের ঠিকানা কানে শুনলেও, মনে ক'রে রাখি নি। কিছুতেই স্মরণ হ'ল না।

রূপলাল বেঁচে থাকলে, নিশ্চয় তারা আমার দেশে ফিরে আসত। মেয়েটা যদি বেঁচেই থাকে, দেখাই যদি পাই, কেমন ক'রে চিনব তাকে? একমাত্র ভরসা, তার কাছে আমার কিছু কিছু অভিজ্ঞান থেকে যেতে পারে।

ঘুরে ঘুরে হয়রান হয়ে, ফের বিদেশে গিয়ে হাসান সাহেবের সঙ্গে মিলিত হই। একটা কিছু তো করতে হবে। বন্ধনহীনেরই উপযুক্ত জীবন, লণ্ডন থেকে প্যারিস, সেখান থেকে বার্লিন, বার্লিন থেকে টোকিও এবং কারণে-অকারণে দেশ-দেশান্তর। এইভাবে আরও পঁচিশ বৎসর কাটিয়ে, একান্ত ক্লান্ত হয়ে এখানে এসে বাসা বেঁধেছি।

অতিক্ষীণ শেষ দুর্বল নির্ভর—খবরের কাগজে আমার দেওয়া বিজ্ঞাপনগুলো। যদি সে বেঁচে থাকে ··যদি সে লেখাপড়া শিখে থাকে···যদি তার কাছে আমার কিছু পরিচয়-চিহ্ন ঘটনাক্রমে আবিষ্কৃত হয়···। কিন্তু কোথায় সে? বেঁচে আছে কি?

২১

দুপুরবেলায় শয্যা গ্রহণ ক'রে এই সব অতীতের কথা ভাবছি। বাইরের ঘরের দরজা ভেজানো ছিল। দুপুরে এই ঘরটাতেই যা হোক কিছু কিংবা গড়িমসি করি; জোরে ধাক্কা দিয়ে দরজা ঠেলে শশব্যস্তে কিশোর এসে জিজ্ঞাসা করলে, আপনার কাছে পিস্তল আছে স্যার?

আমি বললাম, আছে। কিন্তু তুমি ব'স। পিস্তল নিয়ে কি করবে?

সে বললে, দরকার আছে। বসল এবং শান্তভাবেই ব'লে চলল, জানি, আপনাকে খুলে না বললে আপনি সাহায্য করবেন না।···বিভূতিবাবুটা অত্যন্ত পাজী।

আমি তাকে জানালাম যে, এসব সংস্রবে আমি থাকতে চাই না।

আপনি না শুনেই বলছেন স্যার?

তুমি যা বলবে, আমি তার কতক কতক জানি। যা জানি, তাই আমার পক্ষে যথেষ্ট। আর আমি জানতে চাই না।

আপনাকে জানতেই হবে। আপনি কেন, এই বিষয়ে আমি যে-কোন

লোকের সাহায্য দাবি করতে পারি। আগে সবটা শুনুন, তারপর বিচার করবেন।

তা হ'লে ব'লে যাও। তুমি যদি শুনতে বাধ্য কর—

একজন ভদ্রমহিলার সম্মান রক্ষার জন্তে আমাদের সব কিছু করা উচিত। নয় কি?

সন্দেহ কি?

ডক্টর রায় এখানে নেই। সেই সুযোগে বিভূতিবাবু মিসেস রায়কে অপমান করেছেন…মানে, ভদ্রমহিলার…মানে, নারীর পক্ষে অপমানকর ব্যবহার…মানে…

আমি তা জানি।

কিশোর বিস্মিত হ'ল। বললে, আপনি কেমন ক'রে জানলেন?

সে কথা পরে হবে। কিন্তু তার এতটা স্পর্ধা হ'ল কেমন ক'রে?

বিভূতি তাঁর ছেলেবেলাকার মাস্টার ছিল। সেই সময় কি সব চিঠিপত্রের আদান-প্রদান হয়। মিসেস রায়ের লেখা সেই সময়ের চিঠি সব তার কাছে আছে। এই চিঠিগুলিই তার স্পর্ধার কারণ। সে আমাকে বলেছে যে, ভবিষ্যতে সে মিসেস রায়কে 'নন্দিনী' প্রকাশে বাধ্য করবে?

ভয় দেখিয়ে?

অনেকটা তাই। যাকে বলে 'ব্ল্যাক-মেলিং'।

কিন্তু চিঠিগুলো তো জাল নয়?

না। মিসেস রায় বিশ্বাস করেন যে, এই ধরনের চিঠি এখনও তার কাছে আছে।

তা হ'লে এই সব ব্যাপারে আমাকে টানছ কেন? তুমিই বা যাচ্ছ কেন?

ঢোক গিলে বললে, তবে শুনুন স্যার। ওগুলোকে ঠিক চিঠি বলা চলে না। চিঠির আকারে লিখিত কবিতা, প্রত্যেকটিতে তারিখ দেওয়া। কি ভেবে এবং কোন্ খেয়ালে লিখেছিলেন, আজ তিনি তা ধারণা করতে পারেন না। সবগুলি একসঙ্গে বাঁধানো, আসলে কবিতার খাতা।

তবে এত ভয় কিসের?

কবিতাগুলো ইয়ের কবিতা…অথচ চিঠির কায়দায় লেখা…বুঝেছেন স্যার!

বুঝেছি। বুঝেছি ব'লেই গোড়াতে বলেছি, আমি ওসবে নেই। বুঝেছ?

আর একটু শুনুন স্যার। মিসেস রায়ের কাছে তাঁর বাবার পুরনো ডায়েরি আছে। চিঠিগুলো হস্তগত হ'লে তিনি দেখিয়ে দিতে পারবেন যে, সেই সময়ে

তাঁর বয়স ছিল বারো কি তেরো। বাল্যরচনার দ্বারা বর্ধিষ্ণু কবির বিচার করা চলে না, নয় কি স্যার ?

বাল্যপ্রেমও তাই। অসার্থক বাল্যরচনা ক্ষতিকর নয় মোটেই, বরং নির্দোষ খেলার মতই মনের পক্ষে স্বাস্থ্যকর, কিন্তু অসার্থক বাল্যপ্রেম সমাজ ও নীতির দিক থেকে বিপজ্জনক।

অসার্থক বাল্যপ্রেম ?

হ্যাঁ, যে প্রেম বিবাহের দ্বারা সার্থক হয়ে ওঠে না। অবশ্য, সব ক্ষেত্রে বিবাহের দ্বারাই যে নীতি রক্ষিত হয়, সে কথা বলা চলে না, তবু তো মুখরক্ষা হয়! কিন্তু এ ক্ষেত্রে তা আলোচ্য বিষয় নয়। আমরা সাধারণ মানুষ বহুর পথ মেনে চলব। বহুর মধ্যে যদি মত-মন্বন্তর ঘটে, আমরাও না-হয় ধর্মান্তর গ্রহণ করব। নীতি মানে নির্দিষ্ট গতি।

যদি বিপ্লবের প্রয়োজন হয় ?

বিবাহও একদিন বিপ্লবরূপেই এসেছিল। যুগে যুগে তা দোষ সংগ্রহ করেছে এইজন্যেই যে, সংসারে কিছুই নিখুঁত নয়। তাই ব'লে আমি মনে করি না যে ওটা একেবারেই বর্জনীয়। একটি ছিদ্রপূর্ণ কলসীর পরিবর্তে অন্য একটি গ্রহণ করার নাম বিপ্লব নয়। যিনি উচ্চতর আদর্শ জানতে এবং আনতে পারেন, তিনিই সার্থক বিপ্লবী।...কিন্তু মিসেস রায় তো এত কথা ভাবে নি। তার তখনকার মনোভাব যদি নির্দোষই ছিল, এখন এত শঙ্কিত হচ্ছে কেন ?

শেষ জীবন পর্যন্ত বাল্যরচনার স্মৃতি থেকে যায়।

বাল্যপ্রেমেরও।

ঠিক তাই। সেইজন্য অনেক পরে নিজের কাছে তার দোষ ধরা পড়ে। গোড়ার দিকে বিভূতিবাবুর খাতাখানা নিজের বাক্সে রাখতে সঙ্কোচ বোধ করেন নি। যদিও শেষে নষ্ট ক'রে ফেলেন।

ওগুলোও কি কবিতা ?

একই ধাঁচের।

মিসেস রায়ের পক্ষে ওই বয়সে এই ধরনের কবিতা লিখবার কারণ ? না বুঝেই লিখেছিল ?

খুব সম্ভব। হতে পারে বাল-সুলভ অনুকরণ-প্রিয়তা। বাল্যপ্রেমের মতই।

সে তার স্বামীকে সব কথা জানাচ্ছে না কেন ?

ডক্টর রায় এখানে নেই। মিসেস রায় আমাকে ছোট ভাইয়ের মত স্নেহ করেন, সব কথা খুলে বলেছেন। যতদিন না ডক্টর রায় এখানে ফিরে আসেন, ততদিন ওই লোক্‌টা যাতে তাঁদের বাড়িতে না আসতে পারে, এই সাহায্যটুকু তিনি আমার কাছে চান।

পিস্তল নিয়ে কি হবে?

ভয় দেখিয়ে খাতাখানা আদায় করব।

আমার কাছে পিস্তল নেই। থাকলেও তা দেব না।

তা হ'লে দেখছি, যে কাজটা ভয় দেখিয়ে করা যেত, জোর ক'রে তা করতে হবে।

তোমার যা খুশি তাই করতে পার। আগেই বলেছি, এ-সবের মধ্যে আমি থাকতে চাই না।

তবে থাক্‌, এ কাজ আমি একাই পারব। শুধু একটা বিষয়ে আপনার সাহায্য প্রার্থনা করছি।

কি?

সন্ধ্যের পর, ধরুন আটটা পর্যন্ত, মিসেস রায়ের ওখানে আপনাকে খানিক বসতে হবে। বড্ড ভয় পেয়েছেন তিনি।

অর্থাৎ তোমরা মারামারি করবে, আর আমি হব তার সাহায্যকারী। আমি কিছু পারব না। তুমি যেতে পার।

অপ্রসন্নভাবে সে উঠে চ'লে গেল। একটু পরে উঠে, কাপড়চোপড় ছেড়ে, বাক্স থেকে পিস্তলটা বের ক'রে টোটা পুরলাম। সেটা পকেটে ফেলে বেরিয়ে পড়ি।

অতসীর সঙ্গে দেখা হতেই সে আমার পা দুটো জড়িয়ে ধ'রে ছেলেমানুষের মত কাঁদতে থাকে।

ছেলেমানুষই তো, আমার কাছে চিরকালই সে ছেলেমানুষ। ওরাই তো ভুল করবে। আমরা যদি ক্ষমা না করি, হায়, ওদের নরকে ঠেলে দেওয়া কত সহজ! প্রভাতকে ও সব কথা খুলে বলুক। তারপর যা-হয় হবে। বাকি দায়িত্ব আমার। মনে মনে ওকে আমি কন্যারূপে গ্রহণ করি।

সস্নেহে তুলে ধ'রে সান্ত্বনা দিলাম, তোমার কিছু ভয় নেই। আমরা সব ঠিক ক'রে দিচ্ছি। কিন্তু তুমি তোমার স্বামীকে সব কথা বলতে প্রস্তুত?

সাশ্রুনয়নে জানালে যে, সে সেই অপেক্ষাতেই বেঁচে আছে। অগ্নি-পরীক্ষায়

কৃতকার্য না হ'লে তাকে সেই আগুনেই পুড়ে মরতে হবে।—এই ব'লে বাক্স খুলে বাঁধানো খাতাখানা বের ক'রে আমার হাতে দিয়ে দিলে। নোটবুকের সাইজের খাতাখানা, কিছু না দেখেই আমার কোটের পকেটে রাখলাম।

কিশোর এসে বললে, তাকে বিশেষ কিছু করতে হয় নি। বিভূতিবাবু বাড়িতে ছিলেন না। চাকরের চোখে ধুলো দিয়ে তাঁর বাক্স থেকে সে খাতাখানা চুরি করেছে। কিশোর ডক্টর রায়ের ল্যাবরেটরি-ঘরে আশ্রয় নিলে। স্থির হ'ল যে, ডক্টর রায় ফিরে না আসা পর্যন্ত সেইখানেই থাকবে।

ফিরে আসবার সময় পিস্তলটা তার হাতে দিয়ে বললাম, এটা বরং তোমার কাছেই থাক্। কিন্তু গুরুতর প্রয়োজন ভিন্ন ব্যবহার করবে না। এই বিষয়ে বার বার সাবধান ক'রে চিন্তিতমনে বাসায় ফিরি।

২২

কয়েক দিন ওদিকে যাই নি। কিশোর এসে নিয়মিত অতসীর খবর দিয়ে যায়। আজ সকালে কিশোর এসে জানালে যে, প্রভাত ফিরে এসেছে এবং তার লেখা একখানা চিঠি আমাকে দিলে। প্রভাত লিখছে যে তার মনো-বিকলনযন্ত্র সম্পূর্ণ হয়েছে। আজ সন্ধ্যায় 'নন্দিনী' কার্যালয়ে তার পরীক্ষা চলবে। এই পরীক্ষায় দু-চারজন আত্মীয় বন্ধু ছাড়া আর কেউ উপস্থিত থাকবে না। আমার উপস্থিতি একান্ত বাঞ্ছনীয়। পুনশ্চ দিয়ে লিখেছে, অতসীর খাতাখানা যেন সঙ্গে আনি।

যন্ত্রে ধরা পড়েছে যে, গাছেরও জীবন আছে। মানুষের মনও যন্ত্রে ধরা পড়বে। বিজ্ঞানের নূতন দ্বার উদ্‌ঘাটিত হবে, মনোরাজ্যে আসবে বিপ্লব। এত বড় একটা আবিষ্কার—এমন একটা আনন্দ-সংবাদ নিজে এসে জানিয়ে গেল না। তার কারণ বোধ হয় খাতাখানাই। সব কথা তা হ'লে তাকে জানানো হয়েছে। কিন্তু এই যন্ত্রপরীক্ষার ব্যাপারের সঙ্গে খাতাখানার কি সম্বন্ধ থাকতে পারে, বুঝতে পারলাম না। এর সঙ্গে এই অপ্রিয় প্রসঙ্গ যোগ করা কেন?

সন্ধ্যাবেলায় "নন্দিনী"তে পৌঁছে দেখি, একটি ক্ষুদ্র কক্ষ উজ্জ্বল আলোকে উদ্ভাসিত। উঁচু টেবিলের উপর যন্ত্রটা রাখা হয়েছে। সেই ঘরে উপস্থিত ছিল অতসী, অনু, কিশোর, পূর্ণিমা, বিভূতি। ডক্টর রায় তো ছিলই।

আমাকে দেখে ডক্টর রায় সোৎসাহে বললে, এই যে, আপনি এসেছেন। আপনার অপেক্ষাতেই ব'সে ছিলাম। আসুন, আপনিই আসুন, আপনার আশীর্বাদ নিয়েই আমার প্রাথমিক পরীক্ষা শুরু হোক।

আমি যন্ত্রের কাছে উঠে যেতে, আমার মুখে একটা প্রকাণ্ড মুখোশ পরিয়ে দিলে। স্টেথোস্কোপের মত দেখতে একটা মস্ত মোটা রবারের নল যন্ত্র-লগ্ন হয়ে টেবিলের ওপর প'ড়ে ছিল। সেই নলের মুখটা আমার বুকে লাগিয়ে বললে, এইবার চোখের সামনে যে প্রশ্নটা লেখা আছে দেখতে পাবেন, সমনোযোগে প'ড়ে দেখবেন। আপনাকে কোনও জবাব দিতে হবে না, কিছুই করতে হবে না। আপনার মনের কথা আমার যন্ত্রে কাচের ওপর ফুটে উঠবে।...রেডি ?

ইয়েস্।

ওয়ান, টু, থ্রি—বলতেই মুখোশটার ভিতর বৈদ্যুতিক আলো জ্ব'লে উঠল। চোখের সামনে জ্বলন্ত অক্ষরে ভেসে উঠল একটিমাত্র প্রশ্ন—"তোমার জীবনে সবচেয়ে প্রিয় কে ?" অক্ষরগুলোর চোখ-ঝল্‌সানো দীপ্তির জন্যই হোক, কিংবা যে পিতলের প্লেটটার উপর খালি পায়ে আমাকে দাঁড় করানো হয়েছিল তাতে বিদ্যুৎ-পরিচালনা করেছিল কি না বলতে পারি না—এক মুহূর্তে আমি চৈতন্য হারিয়ে ফেলি। কিন্তু সে কয়েক সেকেণ্ডের জন্য।

পড়া হয়েছে ?

হ্যাঁ।

মুখোশ খুলে দিয়ে বললে, আপনি যেতে পারেন। শুধু তার প্রশ্নের বিষয় আপাতত আর কাউকে জানতে দিতে নিষেধ করলে। আমি গিয়ে বসলাম। একই প্রক্রিয়ায় সকলেই এই পরীক্ষার বিষয়ীভূত হ'ল। শুধু প্রত্যেকের বেলায় যন্ত্রের কাচটা পাল্‌টে দিলে। আমাদের বসবার বন্দোবস্ত এমনভাবে করা হয়েছিল যে, ডক্টর রায়ের অজ্ঞাতসারে প্রশ্নের কথা কেউ কাউকে জানাতে পারত না।

সবশেষে ডক্টর রায় বললে, কাচের প্লেটগুলো নিয়ে আমার একটু কাজ আছে। আধ ঘণ্টার বেশি লাগবে না। আধ ঘণ্টা পরে দেখতে পাবেন, আমার প্রশ্নের উত্তর কাচের গায়ে আঁকা রয়েছে। একই প্রশ্ন আমি সকলকে করেছি, অতএব প্রশ্নটা কি আর কারও তা জানতে বাকি রইল না।

কাচের প্লেটগুলো হাতে ক'রে অন্য ঘরে চ'লে গেল। সকলেই নীরবে ব'সে রইলাম, প্রশ্নটা নিয়ে আমাদের মধ্যে কোনও আলোচনা হ'ল না। অতসীর মুখখানা কাগজের মতো সাদা—যেন রক্তহীন। কিশোর পূর্ণিমা লজ্জায় চোখ তুলে চাইতে পারছে না। অনু এবং বিভূতির মুখে ভাবান্তর লক্ষিত হ'ল না—হয়তো একটু কৌতূহল ছিল। একটা কথা ভেবে আমি চিন্তিত হয়ে পড়লাম।

প্যারিসের সেই মেয়েটি! যদি তারই ছবি ফুটে ওঠে আমার প্লেটটায়! লজ্জার বিষয় হবে সন্দেহ নেই। মনে মনে প্রভাতের উপর বিরক্ত হয়ে উঠলাম। এইভাবে আমাকে ধ'রে জাঁতাকলে ফেলা তার উচিত হয় নি। আমিও তো রাজী না হ'লেই পারতাম। কিন্তু তখন এতটা তলিয়ে বুঝি নি।

পুরো আধ ঘণ্টা যেতে না যেতে কাচের প্লেটগুলো হাতে ক'রে ডক্টর রায় আমাদের ঘরে ফিরে এল। তার মুখে-চোখে আনন্দ ও কৌতুকের দীপ্তি। আমাকে লক্ষ্য ক'রে বললে, আপনার প্লেটে উঠেছে একটি এক বছর কি দেড় বছরের শিশুমূর্তি।

প্লেটটা হাতে নিয়ে দেখি, তাতে ফুটে উঠেছে একটি ফ্রক-পরা ছোট্ট মেয়ের ছবি। আমার স্মৃতিসমুদ্র আলোড়িত ক'রে ভেসে উঠল এক হতভাগ্য মাতৃহীন পিতৃপরিত্যক্ত বালিকা।

প্রভাত বললে, তার পর অনু-বউদি। তোমার প্লেটটায় উঠেছে সুরেনদার ফোটো।

অনু ধীরে ধীরে উঠে গিয়ে ফোটোটার নীচে মাথা ঠেকালে। বুঝলাম, সুরেন তার স্বর্গীয় স্বামীর নাম। তার সারাজীবনের ধ্যান—পূর্ণিমাও যা ভাঙতে পারে নি। তারপর কিশোর-পূর্ণিমা। এরা দেখছি পরস্পরকে ভালবেসে ফেলেছে।— এই ব'লে সকৌতুকে অনুর দৃষ্টিতে দৃষ্টি মেলালে।

কিশোর ও পূর্ণিমা দুজনে দুই দরজা দিয়ে দৌড়ে পালায়। অনু চমকে ওঠে।

অন্য একটা প্লেট তুলে নিয়ে বিভূতিবাবুকে লক্ষ্য ক'রে বললে, আপনার একটা প্রিয় পোষা কুকুর আছে?

বিভূতি বললে, ছিল। এক বৎসর হ'ল মারা গেছে। ধব্‌ধবে সাদা কুকুর— নাম ছিল গোরা।

গায়ের রঙ এতে ওঠে না। দেখুন এসে।

বিভূতি ততক্ষণে ডক্টর রায়ের কাছে উঠে গেছে। উল্লসিতভাবে ব'লে উঠল, অবিকল সেই। প্লেটটা আমায় দেবেন?

স্বচ্ছন্দে। একখানা দু আনা দামের কাচ বই তো নয়!

বাকি শুধু অতসী। তাকে দেখে মনে হচ্ছিল, সে যেন নিজেকে আর ধ'রে রাখতে পারছে না। ডেকে বললে, অতসী, এদিকে এস। তোমার প্লেটটা তুমি নিজেই দেখে যাও। ধীরে ধীরে উঠে গিয়ে প্লেটটা হাতে তুলে নিতেই অতসীর

হাত দুটো থরথর ক'রে কেঁপে উঠল। চার-কোণা পাতলা কাচ হাত থেকে খ'সে মেঝের ওপর প'ড়ে ঝনঝন শব্দে টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে গেল। তার স্বামীকে প্রণাম করতে গিয়ে মূর্ছিত অতসী তার পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়ল।

কিন্তু সেটা মূর্ছা ছিল না, ক্ষণিক ভাবাবেগ মাত্র। তাকে দু হাতে তুলে ডক্টর রায় একটা ঈজি-চেয়ারে বসিয়ে দিলে। অতসী একটু সামলে নিয়ে স্নিগ্ধদৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে বললে, সব কথা আমি আগেই জানতে পেরেছিলাম। আমার বুঝতে বাকি ছিল না, 'নন্দিনী'-প্রকাশে তোমার সে অশেষ উৎসাহ হঠাৎ কেন নিবে গেল, দিন দিন কেন তুমি নির্জীব এবং অসুস্থ হয়ে পড়ছিলে—তোমার অসুখটা ছিল মানসিক। আমি আশা করেছিলাম, আমাকেই তুমি তোমার মনের কথা খুলে বলবে। অন্তত অনু-বউদিকে বলা উচিত ছিল। আমি যদি না জানতে পারতাম, মানসিক অশান্তির ফলে এবং অন্যান্য কারণে তোমার প্রাণহানি পর্যন্ত ঘটতে পারত।…না, না, তোমাকে অমন ক'রে আমার দিকে চাইতে হবে না। ক্ষমা সে আমি অনেক আগেই করেছি, নিজেরই অজ্ঞাতসারে, কারণ তোমার অপরাধই আমি খুঁজে পাই নি। তুমি ভারি বোকা, এই সব ছেলেখেলা নিয়ে মাথা ঘামাও।

আমার কাছে এসে খাতাখানা চেয়ে নিলে। খাতা দেখে বিভূতি চমকে উঠল। তার মুখ বিবর্ণ—বেশ বোঝা গেল, তার ভিতরের কাপুরুষটা ভয়ে কাঁপছে।

খাতাটার মলাট তুলে প্রথম পাতা থেকে উচ্চকণ্ঠে প'ড়ে গেল—

হে মোর প্রেমের গুরু,
তোমা হতে হ'ল মোর প্রেম-পাঠ শুরু।
আকাশে চাঁদের আলো
হৃদয়ে বেসেছি ভালো,
সেই প্রেমে হিয়া মোর কাঁপে দুরু দুরু।

শেষের লাইনটা শুনে আমার মনে হেডমাস্টারের শোকোচ্ছ্বাস উদ্বেলিত হ'ল—

তোমার অভাবে গুরু
হিয়া কাঁপে দুরু দুরু।

অতসী লজ্জিত হয়ে উঠছিল। প্রভাতরবি তবু ছাড়ে না—

টলটল নিরমল দীঘি-কালোজল,
তার বুকে জ্যোৎস্না করে ঝলমল।

ওই কালো, ওই আলো,
ওরা কি বেসেছে ভালো ?
বনে বনে সুরভিত প্রেমের অগুরু—
তোমা হতে হ'ল মোর প্রেমপাঠ শুরু।

এই পর্যন্ত প'ড়ে প্রভাতরবি মন্তব্য করলে, তেরো বৎসর বয়সে যে বালিকার মনে এমন উচ্চশ্রেণীর প্রেমবীজ অঙ্কুরিত হয়, তার ভাবী স্বামীর পত্নী-সৌভাগ্য এ সংসারে এক বিরল বস্তু।—লেখক-দাদু কি বলেন ? জিজ্ঞাসাটুকু আমাকে লক্ষ্য ক'রে।

বিভূতিবাবুকে লক্ষ্য ক'রে বললে, আপনার বিরুদ্ধে আইন ছিল, সাক্ষী ছিল, টাকার জোরও ছিল কিছু। গায়ের জোরও কম ছিল না। আমার স্ত্রীর মত আমি সম্মান-ভীরু নই, তবে আমার রুচি হ'ল না। আপনি যেতে পারেন।

প্রভাত-রবির হাত ধ'রে কাতরভাবে বিভূতি বললে, আমাকে আপনি ক্ষমা করুন। না পারেন শাস্তি দিন।

শান্তকণ্ঠে প্রভাত বললে, না, কোনও যোগ্যতাই আপনার নেই। তবে অন্য একটা বিষয়ে আপনার যোগ্যতা আমি লক্ষ্য করেছি। কলকাতার বাইরে প্রথম সংখ্যাতেই একখানা উচ্চশ্রেণীর সাহিত্য-পত্রিকা গ'ড়ে তোলা কম কৃতিত্বের কথা নয়। আমার ইচ্ছা, কাল থেকেই আপনি নিজের কাজে লেগে যান। আমরা সকলে সাহায্য করলে 'নন্দিনী'র ভবিষ্যৎসাফল্য সুনিশ্চিত।

এ প্রস্তাবে বিভূতি সম্মত হ'ল না। বললে, আপনারা আমাকে ক্ষমা করেছেন। কিন্তু আমি এখানে থাকতে চাই না। সে নত-মস্তকে বেরিয়ে গেল।

আপনারা বসুন।—ব'লে ডক্টর রায়ও ঘর থেকে চ'লে গেল। বিভূতির অনুসরণে নয়—অন্য দরজা দিয়ে। আমরা মন্ত্রমুগ্ধের মত চুপ ক'রে ব'সে রইলাম। যেন যাদুকর তার যাদুদণ্ড ছুঁইয়ে দিয়েছে।

এ-ঘর ও-ঘর খুঁজে খুঁজে কিশোর-পূর্ণিমাকে গ্রেপ্তার ক'রে এনেছে। দু হাতে দুজনকে টানতে টানতে নিজের টেবিলের দুই পাশে দাঁড় করিয়ে দিলে। দড়ি ছিঁড়ে বকনা বাছুর যেমন লাফিয়ে পালায়, হাত-ছাড়া পেয়ে পূর্ণিমাও তাই করলে। একেবারে রাস্তায়। কিশোর হেসে ফেললে। সস্নেহে রায় বললে, এর ফল কি জান ? অনেক সময় দুঃখ পেতে হয়। নানা কারণে তোমাদের মিলতে দেওয়া অসম্ভব হতে পারে। হয়তো তুমি স্বাধীন নও, পূর্ণিমা তো নয়ই।

ঠিক যে পরাধীন তাও বলা যায় না। আমি নিজের কথা বলছি।

তোমার বাড়ি কোথা?—প্রভাতের জিজ্ঞাসা।

আপাতত ডক্টর রায়ের বাড়িতে এবং অতসীদির চরণাশ্রয়ে।

তোমার বাপ-মা আছেন?

আছেন। বাবা, মা, ঠাকুরদা, ঠাকুরমা, আমরা পাঁচ ভাইবোন।

তবে এ রকম উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছ কেন?

তাঁরা কলেজের খাঁচায় পুরতে চেয়েছিলেন, অগত্যা আমি উড়ে পালিয়েছি।

তারপর এখানে এসে ধরা দি,লে?

আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার। এই শহরেই ছিলাম। 'নন্দিনী'র এই নষ্টনীড় তখন নতুন গ'ড়ে উঠছিল। খুব ভাল লাগল, তাই জুটে গেলাম।

চালাতে পারবে?

বলতে পারি না। ছবি, কবিতা, গানের স্বরলিপি দিতে পারি।

বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের ভার আমার। ভাষাটা তোমরা সংশোধন ক'রে নিও। মনস্তত্ত্বের গল্প এবং প্রবন্ধ লেখবার লোক ঘরেই আছেন। বাকি সংগ্রহ আমিই করব।...পূর্ণিমাকে সংসার-সাথী ক'রে নিতে রাজী আছ?

অন্তত ইহজন্মের জন্য। ওর যতকাল খুশি। পরজন্মের কথা পরজন্মে বিবেচনা করা যাবে।

অম্বুর দিকে চেয়ে প্রভাত শুধোয়, অম্বু-বউদির মত কি?

অম্বু সানন্দে সম্মতি দিলে।

২৩

সংসারে এমন কোন্ বস্তু আছে, যা যতই টানা যায় ততই বাড়ে? আপনারা বলবেন, রবার। আমি বলব, উপন্যাস। রবারও বেশি টানলে ছিঁড়ে যায়।

এ যেন ঠিক অসীম শূন্যে ঘুড়ি ওড়ানো। সারাদিন আকাশপানে চেয়ে চেয়ে লাটাই ঘুরিয়ে আর আগুপাছু হেঁটে হস্তপদ ক্লান্ত—এবার উল্টো পাকে সুতো গুটোতে হবে। নইলে, পাঠকের সমালোচনা-ঘুড়ি আকাশে উড়বে, তাঁর সুতোয় ধারালো মাঞ্জা, আমার ঘুড়ি হবে ভাগ্-কাটো।

পুতুলের বিয়ে মনে আছে নিশ্চয়—এতবড় একটা ঘটনা ভোলবার নয়। কিশোর-পূর্ণিমার বিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব আমার উপর বর্তে, উপন্যাসের আর্ট এমন কথা বলে না। কিন্তু এমনি আমার অদৃষ্ট, সব-কিছুতে জড়িয়ে পড়া। দেখতে

পাবেন, আর্ট বজায় রাখতে গেলে আমার নিজের 'পার্ট' অসম্পূর্ণ থেকে যেত। তা ছাড়া, আমি তো আর উপন্যাস লিখছি না ঠিক, মালমসলা সংগ্রহ করছি মাত্র।

প্রস্তাবিত বিবাহ দুই দিক থেকে অসবর্ণ। শুনলাম, অমুর বংশপরিচয় সে নিজেই জানে না। শুধু এইটুকু জানা আছে যে, সে বাঙালীর মেয়ে—পশ্চিমদেশে লালিত-পালিত। তার কথায় বৈদেশিক টান চতুর শ্রোতার কাছে আজও ধরা পড়ে। তার স্বামী ছিল বাঙালী কায়স্থ। এক দিক থেকে এই বিবাহকে বর্ণহীনও বলা যেতে পারে। অতএব পিতৃপরিচয়ে পূর্ণিমা কায়স্থ-কন্যা। কিশোর বৈদ্যবংশ-জাত। ডক্টর রায় বললে, কিশোরের বাপ-মাকে জানানো উচিত। কিশোর বললে, অনর্থক অপ্রিয় ব্যাপারের সৃষ্টি করা হবে। এই বিবাহে সম্মতি তাঁরা কিছুতেই দেবেন না এবং সে নিজে কিছুতেই তার মত পরিবর্তন করবে না। বলেছিল, সৃষ্টি যদি রসাতলে যায় আর এ পক্ষের যদি মত না বদলায়, পূর্ণিমাকে বিয়ে সে করবেই।

অমুর পক্ষে মতবদলের হেতু ছিল না; এই রকম অবস্থায় পূর্ণিমার জন্য যোগ্যতর পাত্র মেলা অত্যন্ত কঠিন।

আনুষ্ঠানিক বিবাহের দিন স্থির হয়ে গেল। আইন-ঘটিত কাজ পরে হবে। নিমন্ত্রণ-পত্র এবং বিয়ের পদ্য ছাপা হ'ল। বিয়ের পদ্য আমিই লিখেছিলাম।

এই প্রকারের ক্ষুদ্র শহরে এবং এই ধরনের অসামাজিক বিবাহে নিমন্ত্রিতের সংখ্যা খুব বেশি হবার কথা নয়। ডক্টর রায়, মিসেস রায় এবং অমুর সঙ্গে সঙ্গীত-শিক্ষা সম্পর্কে পরিচিত জন কয়েক ভদ্রলোক, ভদ্রমহিলা, ছেলেমেয়ে। এই সজীব দুটি পুতুলের বিয়েতে প্রভাত সেজেছিল কনেকর্তা, বরকর্তা আমি। স্বীকার করি, এই নিয়োগের দ্বারা আমাকে প্রচুর পরিমাণে সম্মানিত করা হয়েছে। বিশেষ কিছু দায়িত্ব নেই—বরকর্তাদের থাকেও না।

অতিথিদের সঙ্গে ব'সে আলাপ করছি, অমুর কাছে গিয়ে প্রভাত যেন কি বললে। যার ফলে অমু এসে আমাকে ডাকলে, আপনি একটু এদিকে আসুন।

আমি তার পিছু পিছু উঠে আসি। পাশের একটা নিরিবিলি ঘরে বসিয়ে বললে, বিয়ে শেষ হয়ে খাওয়াদাওয়া হতে অনেক দেরী। আর আপনি তো সেসব কিছু খাবেন না। একটু বসুন, আপনার জন্যে কিছু ফল মিষ্টি দুধ নিয়ে আসি।

আমি যোগ দিলাম, তার সঙ্গে একটু চা। হাসতে হাসতে সে চ'লে গেল।

যে সব ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা এই বিবাহে উপস্থিত ছিলেন, আর্থিক ও

সামাজিক মর্যাদায় সবাই তাঁরা অনুর বহু উর্ধ্বে। কিন্তু তাঁদের আন্তরিক আনন্দ ও আগ্রহ দেখে বোঝা গেল, তাঁরা এই নিরাশ্রয়া বিধবাটিকে কত বেশি স্নেহের চক্ষে দেখেন। একটু দেরিতে হ'লেও, অনুর অনুচ্ছল আন্তরিকতা সকলকেই আকর্ষণ করে, বলা বাহুল্য, আমাকেও করেছিল।

ঘরখানি ছোট, আসবাব-পত্রও কম, কিন্তু যা ছিল সব রুচিসম্মত ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। আমাকে বসিয়েছিল একটা সোফার ওপর—ইচ্ছা করলে শুতেও পারতাম। একটা অল্পদামী ক্লক টিক্‌ টিক্‌ করতে করতে টং টং ক'রে উঠল—চেয়ে দেখি, রাত্রি তখন নটা। ক্লকটার ঠিক নীচে দেওয়ালে টাঙানো পাশাপাশি দুখানি ফোটোর প্রতি আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হ'ল—বাঁধানো ফোটো। ফোটো দুটিতে টাটকা ফুলের মালা ঝোলানো। তার মধ্যে একখানা ছবি দেখে আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম। আমার চিন্তাশক্তি আরও কিছু অগ্রসর হতেই আমি সোফা থেকে লাফিয়ে উঠে দ্রুত অগ্রসর হয়ে ফোটোর নীচে দাঁড়াই। আমার বুকের ভিতর কে যেন জোরে জোরে হাতুড়ি পিটতে লাগল।

খাবার হাতে অনু ঘরে ঢুকতেই অতিকষ্টে আত্মসংবরণ ক'রে ইঙ্গিতে তাকে কাছে ডেকে ফোটো দুখানির পরিচয় জিজ্ঞাসা করি। যুক্তকরে ফোটোর উদ্দেশে প্রণাম ক'রে অনু বললে, একখানি তার স্বামীর, অন্যখানি তার বাপ-মায়ের।

বাপ-মায়ের! অনুরই বাপ-মায়ের ছবি! এ যে আমার আর সরলার যৌবনের ফোটো! জোরে তাকে বুকের মাঝে জাপটে ধরি, খাবারগুলো চারিদিকে ছিটকে পড়ে। ভাগ্যক্রমে আমার বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হবার আগেই বুদ্ধিমতী অনু আমাকে ধ'রে ফেলেছিল।

চেতনা ফিরে এলে দেখলাম, সেই সোফাটায় শুয়ে আছি। আমার বালিশ এবং চুল দাড়ি গোঁফ জলসিক্ত। শয্যাপার্শ্বে দাঁড়িয়ে আছে প্রভাত, অতসী, অনু, কিশোর, পূর্ণিমা এবং সেই ডাক্তারবাবু—অতসীর অসুখের সময় যাঁকে আমি ডক্টর রায়ের ওখানে প্রথম দেখেছিলাম। ধীরে ধীরে উঠে বসি—ডাক্তারের বাধাসত্ত্বেও অনু আমার বালিশ পালটে দিলে, অতসী দিলে মাথা মুছিয়ে।

ডাক্তারকে লক্ষ্য ক'রে বললাম, আপনারা ব্যস্ত হবেন না। অপ্রত্যাশিত আনন্দে একটুখানি মানসিক আঘাত ভিন্ন এ আর কিছুই নয়। তবে শুনুন।

সংক্ষেপে সব কথা খুলে বলি। আরও বলি যে, ওই দুখানা ফোটোর পিছনে আমার নাম দস্তখত আছে, তারিখও আছে—যে তারিখে আমি দেশ ত্যাগ করি।

দূর বিদেশে কি জানি কখন কি হয় ভেবে ফোটো দুখানি রূপলালকে খুব সাবধানে রাখতে বলেছিলাম, আর বলেছিলাম, খুকীর জ্ঞানবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ফোটোর ছবির সঙ্গে যেন তার পরিচয় করিয়ে দেয়।

ফোটো দুটোর ফ্রেম খুলে ফেলে ডক্টর রায় দেখলে, তারিখ-সম্বলিত ইংরেজী স্বাক্ষর আজও সমুজ্জ্বল। আমার সংশোধিত দাম্পত্য জীবনের একান্ত নীরব সাক্ষী, পাশাপাশি দাঁড়িয়ে ছবি তুলিয়েছিলাম। খুকী তখন পৃথিবীতে এলেও পৃথিবীর মাটিতে পা ফেলে নি। ওকে আমরা 'খুকী' ব'লেই ডাকতাম, অদ্বিতীয় ব'লে নামকরণের প্রয়োজন হয় নি।

অম্বু আমার পায়ের কাছে প'ড়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে। সত্যই তার অভিমানের কারণ ছিল। পূর্ণিমা এসে গলা জড়িয়ে ধ'রে ছলছল চোখে বললে, দাদু। ভাবাবেগে কিশোর আমার সাদা দাড়িতে চুমু দিলে।

রাত্রি বারোটায় দ্বিতীয় লগ্নে শুভবিবাহ নিষ্পন্ন হ'ল। অনুষ্ঠান হিন্দুমতেই হ'ল, পৌরোহিত্য করলেন কলেজের এক প্রফেসর। আপ্যায়িত অভ্যাগতের দল আমার ঘরে ঢুকে আমার স্বাস্থ্যবিষয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে বাড়ি ফিরলেন। আমার আর কিছুই হয় নি—দেহে না হোক, মনে তখন শতহস্তীর বল।

২৪

আমার উপন্যাসের উপকরণ সংগ্রহ আপাতত শেষ হ'ল, যদিও গল্পের এখনও অনেক বাকি। কে জানত, ঘটনাচক্রে আমিই আমার উপন্যাসের শ্রেষ্ঠ উপকরণ হয়ে পড়ব।

অম্বুর হারিয়ে যাওয়ার ইতিহাস অপর একটি উপন্যাসের উৎকৃষ্ট উপকরণ। রূপলালের মৃত্যুর পর কেমন ক'রে কার আশ্রয়ে সে বড় হ'ল, কি ভাবে তার বিয়ে হ'ল, কোন্ সূত্রে বিলাতে প্রভাতরবির সঙ্গে তার স্বামীর বন্ধুত্ব হ'ল এবং বিলাতেই তার মৃত্যু ঘটল এবং কেমন ক'রে ভাসতে ভাসতে অম্বু-পূর্ণিমা অবশেষে এসে ডক্টর রায়ের উদার বন্দরে নোঙর ফেললে—এসব বৃত্তান্ত এখন আমি বলব না। আজ-কালকার আর্টের বাজারে 'ফাউ' সিস্টেম উঠে গেছে।

পরদিন সন্ধ্যাবেলায় ডক্টর রায়কে বললাম, এইবার তুমি তোমার মনোবিকলন-যন্ত্রে ফের আমাকে পুরে দেখতে পার, কার ছবি ফুটে ওঠে। তোমার যন্ত্রের কাচের এক বৎসরের শিশুটি অম্বু ভিন্ন আর কেউ নয়। এবারে ঠিক অম্বুর ফোটো ফুটে উঠবে।

প্রভাত হেসে বললে, কাজ নেই, অতসী হিংসে করবে। তা ছাড়া যন্ত্রটা আমি ভেঙে দিয়েছি। 'হাতের সুখে গড়লাম, পায়ের সুখে ভাঙলাম'—ছড়াটা বালির ঘর তৈরি ক'রে সন্ধ্যেবেলায় তা ভাঙতে ভাঙতে ঘরে ফিরবার আগে ছেলে-মেয়েরা আবৃত্তি ক'রে থাকে।

ভেঙে দিয়েছ? অবাক করলে তুমি! ভাঙলে কেন?

থিওরিতে ভুল ছিল। কাঠ-লোহায় তৈরী প্রাণহীন যন্ত্রের সাধ্য কি, নরনারীর পবিত্র ভালবাসা ধ'রে রাখবে? মাত্র ক্ষণিক মনোভাব ওতে ধরা পড়ত। মেঘের ছবি আঁকবে কে? আঁকতে আঁকতে রূপ পালটে যায়। কতজনই তো আসছে, পর পর এসে আমাদের অন্তর-দ্বারে করাঘাত ক'রে বলছে, মে আই কাম ইন?—কজনকে আমরা জায়গা দিতে পারি? তারা শুধু দুয়ারের কাছে ছায়া ফেলে দূরে চ'লে যায়। সেই অস্থির ছায়াও আবছায়া হয়ে কাচের গায়ে ফুটে উঠবে। এবং দ্বারা শুধু ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হবে—একেই তো চলতি জগতে তার অন্ত নেই।

কিন্তু অমর প্রেম, যা যুগ-যুগান্তর ধ'রে মানুষের মনে স্থায়িত্ব পেয়েছে?

সাহচর্য-জাত অপরিহার্য ভালবাসা ছাড়া আর কিছুতে আমার আস্থা নেই।

'লোহার বাসর ঘরে' পুতুল দুটো এখনও পাশাপাশি শুয়ে আছে।...কূটতর্কে প্রবৃত্ত হতে ইচ্ছা হ'ল না। আমার মন তখন যন্ত্রটার শোকে হাহাকার করছে; এমন একটা আবিষ্কার হতে বঞ্চিত হ'ল বিশ্বের মানুষ! স্বগতোক্তির মত মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, না না, এ ভারি অন্যায়, খুব খারাপ। খামখেয়ালী ছাড়া কিছুই নয়। যন্ত্রটা নষ্ট ক'রে ফেলা উচিত হয় নি।

কেন উচিত হয় নি? ভারতীয় বৈজ্ঞানিক এমন কোনও যন্ত্র আবিষ্কার করবেন না, যদি তিনি বুঝতে পারেন, তার দ্বারা মানুষের—এমন কি জীবজগতের অকল্যাণ হতে পারে।

আবিষ্কার কখনও দোষী হতে পারে না, মানুষের দোষেই কলুষিত হয়।

বিজ্ঞান আজ দেবগুরু বৃহস্পতির হাত থেকে দৈত্যগুরু শুক্রাচার্যের হাতে গিয়ে পড়েছে। স্বার্থপর লোভী বৈজ্ঞানিক দৈত্যরাজদের কাছে আত্মবিক্রয় করেছে।

পৃথিবীর ভবিষ্যতের জন্য মানুষের মানসিক পরিবর্তনের আশাই আমরা করব—বিজ্ঞানকে পিছু হটিয়ে নয়।

সেই মানসিক পরিবর্তন আনতে পারেন শুধু সাধু বৈজ্ঞানিক—কল্যাণময়

আবিষ্কারের দ্বারা এবং অকল্যাণকর দূষিত বিজ্ঞানকে বর্জন ক'রে। কিন্তু দাদু, আপনি নিশ্চিন্ত হোন, এ রকম কোনও যন্ত্রই আমি তৈরী করি নি। চেষ্টা চলছে হয়তো, কিন্তু আজও কেউ করতে পারে নি। আমার চেষ্টা ও-পথে নয়।

সে কি! তা হ'লে? ছবিগুলো উঠল কেমন ক'রে?

ঘষা কাচের ওপরে এক আর্টিস্ট এঁকে দিয়েছে—আমার নির্দেশমত।

আমার হারানো মেয়ের ইতিহাস তোমার জানা ছিল না।

খবরের কাগজে আপনার দেওয়া বিজ্ঞাপন প'ড়ে আমার মনে কৌতূহল জাগে। ক্রমে কৌতূহল সন্দেহে পরিণত হয়।

তোমার জানা সম্ভব ছিল না যে, বিজ্ঞাপনটা আমারই। ওতে আমার নাম-ঠিকানা দেওয়া ছিল না।

কলকাতা থেকে যেদিন আমি চিঠি লিখি, দুদিন পরে আর একখানা চিঠি পেয়েছিলেন—কলকাতার কোনও ডিটেকটিভ আপনার মেয়েকে খুঁজে দেওয়ার ভার নিতে চাইছেন? বিনিময়ে দশ হাজার টাকা পুরস্কার?

হ্যাঁ, পেয়েছিলাম, কিন্তু তাতে কি? আমার স্বীকতি ও অনুরোধ সত্বেও ডিটেকটিভ আমার সঙ্গে দেখা করে নি। চিঠিও লেখে নি আর।

সেই ডিটেকটিভ আমিই।

এত কাণ্ড করবার দরকার ছিল না। আমাকে জিজ্ঞাসা করলেই সন্দেহ মিটত।

যদি না মিটত? শুধু নামের ওপর নির্ভর ক'রে এমন একটা গুরুতর ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা চলে না। আশা পেয়ে আশা ভঙ্গ হ'লে কি প্রাণে বাঁচতেন? আপনার যৌবনের ফোটোর সঙ্গে এখনকার চেহারার কোনও সাদৃশ্যই খুঁজে পাই নি।

অনু আমার নাম জানত না? তার বাপের নাম নিশ্চয় তার জানা ছিল।

ছিল। কিন্তু আপনার সঙ্গে আলাপ হবার পর আপনার নাম জানতে সে কোনও চেষ্টাই করে নি। খুব সম্ভব দরকার বোধ করে নি। বয়োবৃদ্ধ পুরুষের সম্বন্ধে মেয়েরা তা করেও না। কিংবা কর্মব্যস্ত অনু-বউদির এদিকটায় খেয়ালই ছিল না। এতে আমার সুবিধাই হয়েছে। অনুসন্ধানের সুবিধা। কি বলেন?

তোমার কোনও কথাই আমি বিশ্বাস করি না।

বিষম ঠকেছেন, দাদু, বিষম ঠকেছেন। বৈজ্ঞানিকের কাছে গল্প-লেখকের এই গভীর পরাজয়।

তুমিই ঠকেছ। আত্মপরিচয় দিয়ে দশ হাজার টাকা পুরস্কার হারালে।

আমার পুরস্কার অন্যত্র। আশীর্বাদ করুন, আমার বিশ্বকল্যাণকর বিজ্ঞান-সাধনা যেন সফল হয়। উঠে দাঁড়িয়ে প্রণাম করলে।

তারপর এল অতসীর কথা। 'নন্দিনী'-সম্পাদকরূপে বিভূতির নিয়োগে অতসীর ঘোরতর আপত্তি এই মনস্তাত্ত্বিক বৈজ্ঞানিকের মনে সন্দেহ জাগায়। কিশোর-পূর্ণিমা-ঘটিত ব্যাপার আমারও স্থূলদৃষ্টিতে ধরা পড়েছিল। এই সব খুঁটিনাটি পৃথক একখানি উপন্যাসের সৃষ্টি করতে পারে। ডিটেকটিভ উপন্যাস। মনস্তত্ত্বে জ্ঞান না থাকলে পাকা ডিটেকটিভ হতে পারে না।

মুহুরীবাবুর আব-ফাটানোর ষড়যন্ত্র নিয়ে কিশোর-পাঠ্য একখানি চমৎকার উপন্যাস লিখতে পারা যায়।

উকিল-পরিবারের খবর রাখি না। তাঁদের বাড়ি থেকে পাকিস্তানী ভাড়াটে উঠে গেছে। ছোট ছেলে মেডিকেল কলেজ থেকে পাস ক'রে এসে সেই বাড়িতে বাস করছে। প্র্যাকটিস বোধ হয় ভালোই জমছে, ডক্টর রায়ের ঋণ পরিশোধিত-প্রায়। উকিল-দম্পতীও মাঝে মাঝে আসেন। নিরীহ হ'লেও একখানা উপন্যাসের বীজ এরই মধ্যে র'য়ে গেছে।

ঘুড়ি উড়োতে উড়োতে ছাদ থেকে প'ড়ে ইপ্সিন মারা গেছে। আমার প্রিয় ইপ্সিন। হরেন্দ্রর মহত্ত্বের সঙ্গে মিশ্রিত ক'রে ইপ্সিনের মৃত্যুর সূত্র ধ'রে জয়েন্ট হিন্দু ফ্যামিলির পার্টিশানের দেওয়াল যদি ভাঙতে পারি, উপন্যাস হয় না?

জংলার ঘর ব্যালফুল বেশিদিন করতে পারে নি। সেই গ্রামের কোনও এক চরিত্রহীন ভদ্রবংশীয় যুবকের সঙ্গে কোথায় যেন চ'লে গেছে। অনেক খোঁজাখুঁজি ক'রেও সন্ধান মেলে নি। সেই শোকে 'শিশিরবিন্দু' শুকিয়ে গেল। এই ধরনের ঘটনার জন্য মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস-লেখক ওৎ পেতে থাকেন।

সরলার মৃত্যুকালে আমি তার কাছে ছিলাম। আমার চিরশুষ্ক চক্ষু বেয়ে জল ঝরছিল। হাত তুলে সে মুছিয়ে দিতে চাইলে, হাতখানা নেতিয়ে পড়ল। মৃত্যু-যন্ত্রণার চেয়েও আমার চোখের জল তার কাছে অসহ্য ছিল। আমার চোখ থেকে তার বুকের উপর ঝ'রে পড়ল—একটি নয়, কয়েকটি শিশিরবিন্দু।

এ নিয়ে আমি উপন্যাস লিখতে পারব না। তীব্রতম ব্যক্তিগত ব্যথা উপন্যাসের বিষয়বস্তু হতে পারে না।

এক বৎসর হ'ল এই শহরে এসেছি, যা-কিছু পেলাম কুড়িয়ে নিলাম। এই

শহরের বড় রাস্তাতেই আমার আনাগোনা, অলিতে-গলিতে আরও অনেক আছে। এই সব এবং সেই সব একত্র ক'রে যদি কোনদিন আপনাদের দুয়ারে গিয়ে হাঁকি—

মে আই কাম্ ইন্?—আমি কি ভিতরে আসতে পারি?

দয়া ক'রে দরজাটা একটু খুলে দেবেন।

মে আই কাম্ ইন!—যার মন্ত্রবলে আমার হারিয়ে-যাওয়া ভালবাসার ধন ফিরিয়ে পেলাম।

মে আই কাম ইন!—অন্তরতর কথায় মিষ্টতর কবিতা আমার জানা নেই—

মানুষের ঘরে ঢুকতে চায় মানুষ—

মানুষের মনে ঢুকতে চায় মানুষের মন।

শেষ

শ্রীভোলা সেন

যাত্রী

তখন সকাল সবে, ছেড়ে দিল ট্রেন।
জাপানী ছবির মত ছায়া-ছায়া সব,
কালির আঁচড়ে আঁকা মৌন নীরব,
যাত্রীরা সময়ের দিকে তাকালেন।
ছোট ছোট কথা ভাসে, লেগেছে মশাই,
কিছু নয়,···থাক্ থাক্···ভয়ানক ভিড়,
নেহেরুজী কি বলেন? বলিহারি যাই—
সময়ের স্রোতে এক পলাতক নীড়।

চারিধারে ঝোপঝাড়, পুরনো জলায়—
খাড়া আছে একা বক, বেলা বেড়ে যায়,
সরু ছায়া-ছায়া পথ, আশেপাশে গ্রাম—
বনেদী বাংলা দেশ, কি জানি কি নাম!
(আমি জানি ঐ গাঁয়ে আছে এক বিধবার বাড়ি
শহরে যাবার পর ছেলে তার দেয় নিক চিঠি—

সে যে কতদিন হ'ল ! তবু আশা যায় নি তো ছাড়ি
আশা নিয়ে আজও তার রাতে জ্বলে দীপ মিটিমিটি ।)

এ দিকেতে কত কথা, কত আফসোস
স্টেশন ঘনায় ক্রমে,—মুদীর দোকান
(আমি জানি নাম তার নটবর ঘোষ
গলায় কণ্ঠি বাঁধা মুখে খিলি পান ।)

* * *

ক্রমশ বসতি ফিকে, ধূ-ধূ করে ধানকাটা মাঠ—
ও কি ও ? রূপোর রেখা ? বিস্ময়ে সংহত মন
আকাশ অবাধ বড়, মনে হয় পৃথিবী বিরাট !
সকালে আলোয় জ্বলে অপরূপ রূপনারায়ণ !
সময়ের সীমা থেকে কোনদিন ছুটি পাই যদি—
ছুটি পাই দূরাকাশে, ছুটি পাই আপনার মনে,
জানি আমি সেই দিন প্রাণে প্রাণে এই মহানদী
পাব আমি সেই দিন অপরূপ রূপনারায়ণে ।

* * *

কেউ নেই, জনা দুই শুধু গোলাদার
বকে আর বিড়ি খায়, বাদামের খোসা
ছড়িয়ে বেঞ্চি-মেঝে করে একাকার,
বলে, ভাই, ঝকমারি, ঘরে বউ পোষা ।
ঘাটেতে খেজুর-গুঁড়ি সবুজ পুকুর
তার ওপরে নত হয়ে হলুদ দুপুর,
কলমীলতায় হাসে, সবুজ পাখায় ।
একাকার মনে হয় জানা-অজানায় ।
একটি বাঁশের সাঁকো, একা হয়ে পার
সেখানে গিয়েছি আমি মলিন বিকেলে
যখন ঝিঁঝির ডাকে, ঘনাল আঁধার
শুনেছি,—এখানে কেন ? কেন তুমি এলে ?

মাটিতে হলুদ আভা কালো হয় লাল
এবার রক্তরাঢ় রূঢ় উদাসীন
আলোয় হলুদ আভা গাঢ় হয় দিন।
কোথায় হারাল সেই কিশোর সকাল?
উঁচু নিচু লাল মাঠ, পুরনো খোয়াই,
কোনখানে শালবন, জলমরা নদী,
অবাধ হলুদ দিন, মন মেলে চাই—
শেষ নেই চিরদিন, চেয়ে থাকি যদি।
সাবুই ঘাসের ডাঙা, বালুচরে কাশ,
কাঁটাগাছে থর দেহ খাড়া-খাড়া পাড়—
ওপরেতে মোহনীল শীতের আকাশ,
দূরে ধূ-ধূ শুশুনিয়া ছায়ার পাহাড়।
ব্যাপ্ত বিশাল দেহ অবিচল রাঢ়
(রাখাল গরুর পাল নেয় নাকো মাঠে)
এখানে ফোটে না ফুল মরকামনার,
বলিরেখা গূঢ় রূঢ় মাটির ললাটে।
মনে হয় চিরদিন একই দিন কাটে
চিরকাল ভাষাহরা সীমাহীনতায়
দেখে আপনার ছায়া আকাশ-ললাটে
মুছে ফেলে স্মৃতি-সাধ হাওয়ায়, হাওয়ায়॥

"অসিতকুমার"

গ্রাহকগণের প্রতি নিবেদন

এই চৈত্র সংখ্যায় যাঁহাদের চাঁদা শেষ হইতেছে, তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া বৈশাখ সংখ্যা বাহির হইবার পূর্বে ২৫এ চৈত্রের (৮ই এপ্রিল) মধ্যে মনি-অর্ডার যোগে চাঁদা পাঠাইয়া দিয়া আমাদের কার্যের সহায়তা করিলে বাধিত হইব। ওই তারিখের মধ্যে টাকা না পাইলে ভি. পি. করিয়া পরবর্তী সংখ্যা পাঠানো হইবে। যাঁহাদের আর গ্রাহক থাকিবার ইচ্ছা নাই, তাঁহারাও অনুগ্রহপূর্বক পত্র দ্বারা জানাইবেন। নচেৎ ভি. পি. ফেরত আসিলে আমাদের অনর্থক ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে।

শাঁখের করাত

১

বিবেকানন্দ রোডের বিচালি-ভবনে সংসারযাত্রা চলিতেছে সাধারণ-ভাবেই। কণ্ট্রাক্টর ভজহরি ঘরে ও বাহিরে সর্বদাই ব্যস্ত। বেলারই বা অবসর কোথায়? সকাল হইতে রাত্রি পর্যন্ত কাজের পর কাজেই দিন কাটে। পালিতা ভগিনীটিও বসিয়া থাকে না। সারাদিন নানাপ্রকার টুকিটাকি কাজ লইয়া এ-ঘর ও-ঘর করিয়া বেড়ায়।

একদিন ভজহরি সকালে তাহার টেবিলে বসিয়া দেখিতে পায়, তাহার টেবিলের এক কোণে একটি ছোট টিকটিকি মরিয়া চ্যাপটা হইয়া আছে। বেলাকে ডাকিয়া ভজহরি বলিল, ওটাকে পরিষ্কার ক'রে ফেল তো। বেলা বলিল, হ্যাঁ, টেবিল ঝাড়তে যখন আসবে, তখন সবই পরিষ্কার হয়ে যাবে।

ভজহরি বাথরুমে ঢুকিয়া দেখে, এক কোণে কিছু ঝুল জমিয়াছে। বেলাকে ডাকিয়া এটা পরিষ্কার করিয়া ফেলিবার কথা বলিলে বেলা বলিল, তোমাকে ভাবতে হবে না। আমি বুধুয়াকে দিয়ে ঝাড়িয়ে ফেলব।

কোন এক ফাঁকে ভজহরি লক্ষ্য করিল, বেলার কানের দুল হইতে দুইটি মুক্তা পড়িয়া গিয়াছে। ভজহরি বলিল, ওটা সেরে নিলেই হয়। বেলা উত্তর দিল, সারব বইকি। এত তাড়াই বা কিসের?

ভজহরি জিজ্ঞাসা করে, ধোপা কাপড় নিয়েছে কবে? বেলা বলিল, এই তো গত বৃহস্পতিবারে নিয়ে গেছে। কেন বল তো? ভজহরি বলিল, না, তাই বলছি। ইদানীং ধোপাটা বড় দেরি করতে আরম্ভ করেছে।

ভজহরি সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিবার সময়ে লক্ষ্য করিল, কয়েকটি ছোট ছোট বিড়ালের বাচ্চা কুণ্ডলী পাকাইয়া শুইয়া আছে। বেলাকে ডাকিয়া বলিল, এসব উৎপাত এখানে কেন? যা হোক একটা ব্যবস্থা কর। বেলা বলিল, দেখি, কি করা যায়! আর একটু বড় না হ'লে তো একটু সরাতে গেলেই ম'রে-ট'রে যাবে। ভজহরি বলিল, যা হয়

একটা ব্যবস্থা কর। অতগুলো বেড়াল বড় হয়ে উঠলে মহা মুশকিল হবে কিন্তু। বেলা বলিল, তোমায় অত মাথা ঘামাতে হবে না।

পালিতা শ্যালিকা কণিকাকে ডাকিয়া ভজহরি বলে, একটু দেখ তো, আমার ওই আলমারির মাথার ওপরে একটা টিনের কৌটোর মধ্যে কতকগুলো তালার চাবি ছিল, সেগুলোর মধ্যে আমার ড্রয়ারের ডুপ্লিকেট চাবিটা আছে কি না! কণিকা বলিল, কেন, আপনার রিঙের চাবিটা কি হারিয়ে গেছে? ভজহরি বলিল, না, সেজন্য নয়। ভাবছিলাম, ডুপ্লিকেটটা ঠিক আছে কি না! কণিকা বলিল, আচ্ছা, আমি এক সময়ে ভাল ক'রে খুঁজে দেখে রাখব!

ভজহরি বেলাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা, বছর পাঁচেক আগে আমরা যে গ্রুপ কোটো তুলেছিলাম, তার একখানা ছিল না তোমার কাছে?

বেলা বলিল, ছিল তো।

আমাকে একবার দেখাতে পার?

কি জানি কোথায় আছে। খুঁজে যদি পাই তবে বের ক'রে রাখব।

ভজহরি তাহার অফিসে যাইবার সময়ে কাপড় পরিতে পরিতে জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা, ও-বাড়ির গণেশবাবুর স্ত্রীটি সর্বদা এত চেঁচায় কেন? বেলা উত্তর দেয়, কার সংসারে কি অশান্তি তা কি বাইরে থেকে বোঝা যায়? তা নিয়ে তুমিই বা ভাবছ কেন?

বেলা এই কথা বলিয়া চলিয়া যাইতেছে, এমন সময়ে ভজহরি বলিল, একটা কথা হঠাৎ মনে পড়ল।

কি?

আচ্ছা, একখানা প্লেট খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না, পেয়েছ?

না।

ঝি-চাকরকে ভাল ক'রে জিজ্ঞাসা করেছ?

করেছিলাম, তারা বলে—তারা কিছু জানে না। আচ্ছা, এসব নিয়ে তুমি ভাব কেন বল তো?

আচ্ছা, সেদিন গণেশবাবুরা আমাদের থারমোমিটারটা চেয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন, ফেরত দিয়েছেন ?

না।

চেয়ে পাঠিও।

আচ্ছা।

ভজহরি অফিস হইতে ফিরিয়া কাপড় ছাড়িয়া একটু বিশ্রাম করিয়া চা খাইতে বসিয়াছে। টেবিলে কণিকা এবং বেলাও বসিয়াছে। ভজহরি লক্ষ্য করিল, কণিকার চুলগুলি উস্কোখুস্কো। বলিল, তুমি আজ চুল বাঁধ নি যে ?

এমনি। বড্ড আলস্য হ'ল।

ভজহরি বেলাকে জিজ্ঞাসা করিল, গোয়ালাটা দুধ ঠিক দিচ্ছে তো ?

দিচ্ছে। তবে ঠিক দিচ্ছে কি না, বলতে পারব না।

একটু লক্ষ্য রাখতে হয়। কাল গোয়ালা এলে আমাকে ব'লো, একটু ব'কে দেব।

লাভ নেই।

তবু।

ভজহরি বলিল, সিঁড়ি দিয়ে ওঠবার সময়ে শুনলাম, ঠাকুর আর ঝি ঝগড়া করছে। ব্যাপারটা কি ?

কি জানি ?

বাড়ির মধ্যে ও-রকম ঝগড়াঝাঁটি কি ভাল ?

তুমি ওসবে কান দাও কেন ? তেমন গুরুতর কিছু হ'লে আমিই তার ব্যবস্থা করব।

ভজহরি বলিল, ও-বেলা তাড়াতাড়ি খেয়ে যাবার সময়ে মনে হ'ল, মাছটা যেন একটু বেশি নরম ছিল। চাকরটাকে একটু ধমকে দিও।

সে আমি আগেই দিয়েছি। তোমার বলবার অপেক্ষা রাখি নি।

ভজহরি জিজ্ঞাসা করিল, কাল তোমার যে শাড়িখানা কিনেছ, বলছিলে তার পাড়টা তোমার পছন্দ হয় নি। বদলে আনলে পারতে।

সে যা হয় আমি করব 'খন।

এখন যাবে ?

এখুনি কেন ? গেলেই হবে এক সময়ে। আর না গেলেই বা কি ? পাড় পছন্দ আর এমন কি গুরুতর ব্যাপার !

ভজহরি কণিকাকে বলিল, তোমার নতুন স্যাণ্ডেল জোড়া নাকি পায়ে ছোট হয়েছে ? বদলে আনলেই তো পারতে।

এমন বেশি কিছু ছোট হয় নি। কাজ চ'লে যাবে।

চা খাওয়া শেষ হইল। ভজহরি উঠিয়া গিয়া ছড়ি হাতে করিয়া বাড়ির বাহির হইয়া গেল। পার্কে খানিকক্ষণ ভ্রমণ করিয়া সন্ধ্যার পর বাড়ি ফিরিয়াছে।

বাহিরের বারান্দায় একখানি চেয়ারে বেলা, আর একখানি চেয়ার টানিয়া লইয়া ভজহরি আসিয়া বসিল।

দুই-একটা কথার পর ভজহরি বলিল, তোমার ব্রুচটার আংটা ভেঙে গিয়েছিল। সারাতে দিয়েছ ?

দেওয়া যাবে গো, দেওয়া যাবে। ব্রুচের অভাবে যেন আমি ম'রে যাচ্ছি।

না, তা নয়। তবে ভাঙা জিনিসটা সময়মত একটু উদ্যোগ ক'রে সারিয়ে নিলেই হয়।

হ্যাঁ, নেব। শিগগিরই যাব জুয়েলারের দোকানে। কণিকার লকেটটাও সারিয়ে আনব।

হ্যাঁ, এনো।

কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর ভজহরি একখানা বই লইয়া পড়িতে আরম্ভ করিল। বেলা রাত্রির খাবারের ব্যবস্থা দেখিতে গেল।

আহারাদির পর ভজহরি পান মুখে দিয়া শুইতে যাইবে, এমন সময়ে বেলাকে ডাকিয়া বলিল, আজকে যে দুধটা বেশি হয়েছিল, ঠাকুরকে কি বলেছ সেটা দই পেতে রাখতে ?

বলেছি, বলেছি। সে ভাবনাটা তোমাকে ভাবতে হবে না।

পান চিবাইতে চিবাইতে বেলা বলিল, দেখ, একটা কথা বলব ?

ভজহরি বলিল, একটা কেন, দুটো তিনটে চারটে—যতগুলো ইচ্ছে কথা বলতে পার।

ঠাট্টা নয়। শোন। দেখ, তুমি বড্ড সংসারের খুঁটিনাটি নিয়ে মাথা ঘামাও। কেন সব সময় এই সব ছোটখাট বিষয় নিয়ে উদ্বেগ কর? মনটাকে একটু ওপরে রাখতে হয়।

ভজহরি হঠাৎ কোনও উত্তর দিতে পারিল না।

বেলা বলিল, রাগ করলে?

না।

ভজহরি ভাবিতেছে, তাই তো। সংসারের খুঁটিনাটি লইয়া চিন্তা-ভাবনা করাটা ঠিক নয়। সত্যই, সাংসারিক জীবনের এমন অনেক বিষয় আছে, যা আমাদের স্ত্রীরা ভাল করিয়া বুঝাইয়া না দিলে আমরা বুঝি না।

একটু চিন্তার পর ভজহরি বলিল, সত্যি আমি এখন থেকে আর সংসারের ছোটখাট ব্যাপারের মধ্যে থাকব না। তুমি ঠিকই বলেছ। আমি এখন থেকে এই উপলক্ষ্যে একটু বৈরাগ্য প্র্যাকটিস করতে আরম্ভ করব।

২

ভজহরি বৈরাগ্য প্র্যাকটিস করিতেছে। খায়, ঘুমায়, নিজের নির্দিষ্ট কাজগুলি করে, অফিসে যায় আসে। এই পর্যন্ত। সংসারের খুঁটিনাটি লইয়া আর মাথা ঘামায় না। কখনও কিছু মনে আসিলে বা বলিতে ইচ্ছা করিলে মনে মনেই চাপিয়া যায়।

এমনি করিয়া বেশ কিছুদিন কাটিয়া গেল।

ভজহরির এক সময়ে মনে একটা সন্দেহ উপস্থিত হইল। তাহার মনে হইতেছে, তাহাদের দাম্পত্য-আকাশে যেন কিঞ্চিৎ মেঘসঞ্চার হইতেছে।

আরও কিছুদিন পরে তাহার সন্দেহ নিরসন করিয়া মেঘের মধ্যে বেশ কয়েকটি বিদ্যুতের ঝিলিক খেলিয়া গেল।

অবশেষে একদিন অফিস হইতে ফিরিয়া চা খাইতে বসিয়া ভজহরি সবিস্ময়ে দেখিল, বেলা টেবিলে নাই।

কণিকাকে জিজ্ঞাসা করিয়া ভজহরি জানিতে পারিল, বেলা শুইয়া আছে।

এমন অসময়ে বেলা কখনও শয়ন করে না। ভজহরি বুঝিল, ঝঞ্ঝা সমাগত। চা খাওয়া শেষ করিয়া বেলার নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কি হয়েছে ?

হবে আবার কি ?

নিশ্চয় কিছু হয়েছে।

তুমি কি ভেবেছ বলতে পার ?

আমি কি ভেবেছি ? আমি তো কিছুই ভাবি নি।

তুমি মনে কর, দুটো পয়সা এনে ফেলে দিলেই সংসারটা অমনি গড়গড় ক'রে চলতে থাকে।

কেন, তা মনে করব কেন ?

নিশ্চয়ই মনে কর। নইলে কোন দিকেই একটু লক্ষ্য নেই কেন ?

কোন্ কোন্ দিকে লক্ষ্য নেই, বুঝতে পারছি নে।

লক্ষ্য রাখলে তবে তো বুঝবে ?

তুমিই বল না।

এই যে কদিন থেকে চিলের ঘরের জানলার একটা ছিটকিনি ভেঙে গেছে, বাতাসে জানলাটা ধপাস ধপাস ক'রে পড়ছে, ওটা অমনই থাকবে ? ওপরের সিস্টার্নটা থেকে জল পড়ে না, ঘটাং ঘটাং ক'রে টানতে টানতে হাত ব্যথা হয়ে যায়, শুনতে পাও না ? এই যে দু দিন অন্তর ঠাকুর আর ঝিতে ঝগড়া ক'রে বাড়ি ফাটিয়ে দিচ্ছে, পুরনো হয়েছে ব'লেই অমন করবে ? একটু ধমকেও তো দিতে পার ? গয়লাটা দুধের জল ক্রমশ বাড়িয়েই চলেছে, একটু তাড়া-টাড়া দিলেও একটু কমতে পারে।

বেলা একটু থামিল। সম্ভবত তাহার অভিযোগের ফর্দটা মনে করিয়া লইবার জন্য। ভজহরি বলিল, তা আমাকে সময়মত একটু বললেই তো পার।

কেন আমি বলতে যাব ? তোমার চোখ নেই ? কান নেই ? অমন উদাসীন হয়ে থাকলে সংসারে চলে না। বড়বাজার থেকে

কণিকার জন্যে যে আলোয়ানখানা এনেছ, তার এক জায়গায় কাটা, সে কি আমি যাব বদলে আনতে? আজ পনর দিন হ'ল ধোপাটার খবর নেই। একবার লোক পাঠিয়ে একটু খবর নিলে কি দোষ হ'ত? এই যে রেশনের গমগুলো ভাঙিয়ে আনে, চাকরে কতখানি আটা চুরি করে, মাঝে মাঝে একটু দেখলে ভাল হয় না? মাসিমা বলছিলেন তাঁকে কিছু লঙ্কার আচার ক'রে দিতে। কিছু আচারের লঙ্কা আনিয়ে দিতেও তো পার। চাকরে কি ছাই বোঝে লঙ্কার মর্ম! এই যে শিলে ধার ম'রে গেছে, ধনেগুলো আস্ত আস্ত ঝোলে দিচ্ছে। বারান্দায় তো ঘণ্টার পর ঘণ্টা ব'সে থাক। একটা শিল-কাটা ডাকতেও তো পার। এক রাশ শিশি-বোতল জমেছে, একটা শিশিবোতল-ওয়ালা ডেকে দিলেও তো পার। জঞ্জাল দূর হয়।

বেলা একটু থামিল।

ভজহরি বলিল, এসব সংসারের খুঁটিনাটির জন্যে তো তুমিই রয়েছ। আমার পক্ষে এসব তুচ্ছ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করাটা কি যুক্তিসঙ্গত?

বেলা বলিল, আমি করছি না তো কে করছে! কিন্তু একটু এসব দিকে খেয়াল না থাকলে কি সংসার চলে? ইচ্ছে করলেই কি সব আমি পারি? শুধু কটা টাকা ফেলে দিলেই সংসার চলে না। সংসারের খুঁটিনাটির দিকেও নজর রাখতে হয়। বুঝলে?

ভজহরি বুঝিল। সংসারের এমন অনেক বিষয় আছে, যাহা আমাদের স্ত্রীরা ভাল করিয়া বুঝাইয়া না দিলে আমরা বুঝি না।

ভজহরির বৈরাগ্য-প্র্যাকটিস মুলতুবি আছে। তাহার দাম্পত্য-আকাশের মেঘ কাটিয়া গিয়া সুনির্মল জ্যোৎস্না ফুটিয়া উঠিয়াছে।

"ভাস্কর"

বাংলা দেশে প্রথম রেলগাড়ি

(৫৯৬ পৃষ্ঠার পর)

হাবড়া হইতে রাণীগঞ্জাভিমুখে গমন ও কত মাইল এবং ভাড়ার নিরূপণ।

মাইল	১ শ্রেণী	২ শ্রেণী	৩ শ্রেণী	মাইল	১ শ্রেণী	২ শ্রেণী	৩ শ্রেণী
৩ বালি গমন	৷৶০	৷৴০	৴১০				
৯ কোন্নগর	৸০	৷৶০	৶০	৭৫ জঙ্কসন	৭৲	৩॥০	১৵০
১২ শ্রীরামপুর	১৶০	॥৴০	৵০	৮১ বাহলা রাস্তা	৭৷৶০	৩৸৴০	১৷১০
১৩ ভদ্রেশ্বর	১॥০	৸০	৷০	৮৭ খড়িয়ানালা	৮৷০	৪৶০	১৷৶০
২০ চন্দননগর	১৸৶০	৸৵০	৷৴০	৯০ মানকর	৮৷৶০	৪৵০	১৷৶১০
২৪ হুগলি	২৷০	১৶০	৷৶০	৯৭ পানিগড়	৯৲	৪৷০	১৷০
২৯ মগরা	২৸০	১৷৶০	॥০	১০৩ বাঁসকোপাকাঁকসা	৯৷৶০	৪৸৴০	১॥৶০
৩৮ পাণ্ডুয়া	৩॥৶০	১৸৴০	৷৶০	১০৮ তামলানালা	১০৲	৫৲	১৷৵০
৫১ মেমারি	৪৸০	২৷৶০	৸৴০	১১৫ অণ্ডাল	১০৸০	৫৷৶০	১৸১০
৬৬ বর্দ্ধমান	৬৲	৩৲	১৲	১২১ রাণীগঞ্জ	১১৷০	৫৷৶০	১৸৶০

কৌতূহলোদ্দীপকবোধে রেল-কোম্পানি-সংক্রান্ত ১৮৫৫ সনের কিছু নিয়মকানুন ও খবর নিম্নে দেওয়া হইল :

প্রতি রবিবারে বাষ্পীয় শকট চলিবে না। কোনদিন অতিরিক্ত গাড়ি গেলে অথবা গাড়ির গমনের কাল পরিবর্ত্তন হইলে তাহার ইশ তাহার দেওয়া যাইবেক।

যে গাড়িতে মনুষ্য গতায়াত করে তাহাতে কেহ কুকুর লইয়া যাইতে পারিবেক না কিন্তু সেই কুকুর গার্ডস ব্যান অর্থাৎ অগ্রবর্ত্তি কোতবালি গাড়িতে যাইবে এবং তাহার ভাড়া প্রতি ষ্টেসনের যেরূপ বন্ধান করিয়া দেওয়া গিয়াছে তম্মত দিতে হইবেক এবং যাঁহার কুকুর তাঁহাকে ঐ কুকুরের গলাচি ও শিকল এবং মুকশ দিতে হইবেক।

শ্রীযুত রেইলওয়ে কোম্পানির এরূপ চেষ্টা আছে। যদি ষ্টেশনের বাহিরে রেলওয়ে কোম্পানি এই সমস্ত মাল ডিলিবার দেন তাহাতে কি মাইলে অতিরিক্ত ইংরাজি আড়াই পাই বেসি লইবেন।

তামাকু খাইবার যে স্থান কি গাড়ি বিশেষমতে নিরূপণ হয় তদ্ভিন্ন উক্ত কোন রেলওয়ে কোম্পানির বাটীতে কি তাঁহারদের কোন গাড়ির ভিতরে কি তাহার উপর যদি কোন ব্যক্তি তামাকু খায় তবে

সেই ব্যক্তি এমত প্রত্যেক অপরাধের নিমিত্তে বিশ টাকার অনধিক জরীমানার যোগ্য হইবেক। এবং যদি কোম্পানির কোন চাকর কোন ব্যক্তিকে তামাকু খাইতে নিষেধ করিলেও সে ব্যক্তি এই বিধান লঙ্ঘন করিতে থাকে তবে পূর্ব্বোক্ত জরীমানার যোগ্য হওয়ার অতিরিক্ত কোম্পানির কোন চাকর তাহাকে উক্ত প্রকার কোন গাড়ি-হইতে এবং কোম্পানির বাটীহইতে বাহির করিয়া দিতে পারে এবং তাহার ভাড়াও জব্দ হইবেক ইতি।

যে কোন ব্যক্তি কোন রেলওয়ের গাড়িতে কিম্বা উক্ত প্রকার কোন রেলওয়ে কোম্পানির বাটীর কোন স্থানে মাতাল হইয়া থাকে কি কোন অনিষ্ট কিম্বা লজ্জাকর কার্য্য করে, অথবা যে কেহ জানিয়া-শুনিয়া ও আইনসিদ্ধ ওজর বিনা এমত রেলওয়ের উপর চড়নদার কোন ব্যক্তির সুবিধার খর্ব্বতা করে সে ব্যক্তি বিশ টাকার অনধিক জরীমানার যোগ্য হইবেক এবং ঐ জরীমানার যোগ্য হওয়ার অতিরিক্ত কোম্পানির কোন চাকর এমত কোন গাড়িহইতে এবং কোম্পানির বাটীহইতে অপরাধিকে বাহির করিয়া দিতে পারে এবং তাহার ভাড়া জব্দ হইবেক ইতি।

আট মাস পূর্ব্ব ৪ সপ্তাহের মধ্যে রেলওয়ে কোম্পানির সাকল্যে (১৬,৮৫৫) ষোল হাজার আট শত পঞ্চান্ন টাকা এবং গত আপ্রেল মাসের ৪ সপ্তাহের মধ্যে (৪৭,৬৭৮) সাতচল্লিশ হাজার ছয় শত আটাত্তর টাকা আদায় হইয়াছে।

বাষ্পীয় শকটে নিত্য দুই হাজারের অধিক লোক গমনাগমন করিয়া থাকে, তন্মধ্যে পোনের আনা লোক তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ির আরোহণকারী এতাবতা তৃতীয় শ্রেণীর গাড়িহইতে অধিক টাকা উৎপন্ন হইতেছে।

বরফের বাক্স এমত লওয়া যাইবেক যাহাতে জল নিঃসরণ না হয়।...খালি ফেরত বরফের বাক্স অমনি যাইবে। যে দ্রব্য ১/০ মোনের ন্যূন হইবেক তাহার এক মোনের পুরা খরচা দিতে হইবেক। এক মোনের উপর যে দ্রব্য তাহার ২/০ মোনের খরচা দিতে হইবে ইত্যাদি। ইহাতে ডিলিবারি খরচা বুঝাইবে না।

সংবাদ-সাহিত্য

বহুভারনিপীড়িতা ধরিত্রী মাঝে মাঝে বিচলিতা হইয়া উঠেন, তাঁহার সাধারণ আটপৌরে সন্তানদের কল্যাণের জন্য তখন তিনি বিনা দ্বিধায় দামাল পোশাকী তোলা দু-লালদের কোল হইতে টানিয়া ফেলিয়া দেন। মাতা সাময়িকভাবে মুহ্যমান হইলেও সংসার শান্ত হয়। ১৯১৭ সনের পূর্বে হইলে এই কথাটাই অন্যভাবে বলিতাম, বলিতাম—সংসার-গড্ডিয়াসের রথের মেরু- বা মধ্য-দণ্ডের সঙ্গে জোয়ালের বাঁধনে যখন গ্রন্থি পড়ে বা জট পাকাইয়া যায়, তখন সম্রাট আলেকজাণ্ডারের মত স্বয়ং ভগবান ধীরে ধীরে গ্রন্থিমোচনের ধৈর্য দেখান না, তরবারির সাহায্যে তাহা ছেদন করিয়া সকল সমস্যার মীমাংসা করিয়া দেন। তিনি বহুবার এইরূপ করিয়াছেন। মহাভারতের আমল হইতেই ধরি। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের পর সমগ্র মহাভারত যখন শ্রীকৃষ্ণ-মুখাপেক্ষী হইয়া একান্ত তাঁহাতেই নির্ভর করিতেছে অর্থাৎ তিনি যখন একটি গুরুতর গাঁট হইয়া উঠিয়াছেন, তখন ভগবান ব্যাধরূপে শাণিত শরের সাহায্যে সে গ্রন্থি ছেদন করিলেন। সাধারণ মানুষ একটা প্রচণ্ড নাড়া খাইয়া আবার আত্মস্থ হইল। আমাদের কালেও আমরা হিটলার, মুসোলিনি, মহাত্মা গান্ধীকে দেখিয়াছি। কি গাঁট! মনে হইয়াছিল, ইঁহাদের চিরন্তন অবলম্বন ছাড়া জার্মানি ইতালি ভারতবর্ষ বাঁচিবে না। প্রথম দুই ক্ষেত্রে পৃথিবীর আতঙ্কিত বহু মানুষ ভাবিয়াছিল, বাপ রে, উদ্ধার পাইব কিরূপে! আমাদের সকল কল্পনাকে বিস্মিত পরাভূত ও স্তব্ধ করিয়া তিনি অস্ত্রোপচার করিলেন, কুচ কুচ করিয়া গ্রন্থি ছিন্ন হইয়া গেল। এ ক্ষেত্রেও তাহাই হইল, রুশ বৈজ্ঞানিকেরা যখন বস্তুতান্ত্রিক গর্বে বলসেবীপ্রধান স্টালিনকে দেড় শত বৎসর জীয়াইয়া রাখিবার বড়াই করিতেছিলেন, ঠিক তখনই মাথার শিরা ছিঁড়িয়া দিয়া তিনি গ্রন্থিমোচন করিলেন। হাহাকার থামিয়া গেলে রুশিয়ার সাধারণ মানুষ আবার আত্মস্থ হইতে পারিবে—পৃথিবীর এই শোচনীয়তম ট্র্যাজেডির ইহাই সান্ত্বনা।

* * *

হিসাব করিয়া দেখিতেছিলাম, বিগত ১৯৪১ সনের ৭ই আগস্ট হইতে যে যুগ পৃথিবীতে আরম্ভ হইয়াছে, তাহা ব্যাপক গ্রন্থিছেদনের যুগ। মাত্র বারো বৎসর কালের মধ্যে এত অধিক গ্রন্থিমোচন পৃথিবীর ইতিহাসে আর কখনও ঘটে নাই। যুগ এখনও শেষ হয় নাই, আগামী ৬ই আগস্ট শেষ হইবে; কিন্তু ইতিমধ্যেই যে সকল মেজর অপারেশন ঘটিয়া গিয়াছে, ঈশ্বর করুন, আর কিছু না ঘটিলেও চলিবে। রবীন্দ্রনাথকে দিয়া গ্রন্থিমোচনের এই যুগ শুরু। স্মরণ করিয়া দেখুন, তাহার পর গ্রন্থিমোচনের নামে ভগবান পর পর এই অসহায় ধরণীর কি বিপর্যয়ই না ঘটাইয়াছেন! হিটলার, মুসোলিনি, তোজো; ফ্রাঙ্কলিন ডি. রুজভেল্ট, সুভাষচন্দ্র, মহাত্মা গান্ধী; বার্নার্ড শ শ্রীঅরবিন্দ, এবং শেষ-মেষ মহামান্য স্টালিন—দশজনকে দশাবতার বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, তন্মধ্যে একা ভারতবর্ষের চারিজন! লিও ডেভিডোভিচ ট্রট্‌স্কিকে এই যুগের অন্তর্ভুক্ত না করিয়া ভাগ্যদেবতা বিশেষ সুবিবেচনার পরিচয় দিয়াছেন, ট্রট্‌স্কি ঠিক পূর্ববর্তী যুগের শেষ বৎসরে অর্থাৎ ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে মেক্সিকোতে দেহরক্ষা করিয়াছিলেন।

* * *

স্টালিন বর্তমান পৃথিবীর শান্তিকামী নরপতিদের প্রধানতম ছিলেন, দিকে দিকে শান্তির বাণী পাঠাইয়া তিনি পরস্পর যুযুধান মানব-সমাজকে প্রায় ঠাণ্ডা করিয়া আনিতেছিলেন, এমন সময় এই দুর্ঘটনা ঘটিল। যেদিন কলিকাতার গঙ্গাতীরে এই শান্তিকামী মহাপুরুষের চেলারা জেনারেল আইসেনহাওয়ারের কুশ-পুত্তলিকা দাহ করিয়া প্রিন্সেপ ঘাটের নিবিড় নিস্তব্ধ শান্তি খণ্ডিত করিয়াছিলেন, সেই দিনই আমরা একটা বিপদের আশঙ্কা করিয়াছিলাম। 'পরাশর-সংহিতা' খুলিয়া দেখিয়াছিলাম, তাহাতে লেখা আছে—"যদি কেহ ঈর্ষা বা খলতা প্রণোদিত হইয়া জীবিত কোনও ব্যক্তির কুশ-পুত্তলিকা দাহ করে, তাহা হইলে অচির-কাল মধ্যে দাহকারীর আত্মীয়-পরিজনবর্গের কাহারও না কাহারও অমঙ্গল সংঘটিত হয়, ইহার অন্যথা হয় না।" সুতরাং আমরা সত্য সত্যই

ভয়ে ছিলাম। অমঙ্গল যে এমন নিদারুণ মূর্তি লইয়া দেখা দিবে, তাহা আমরা ঘুণাক্ষরেও ভাবিতে পারি নাই। যাহা হউক, আশা করি, ইহা হইতে অশান্তিকারীরা শিক্ষা পাইবেন। আমরা সর্বদাই যেন স্মরণে রাখি যে, গাঁটকাটা ভগবানকে উস্কাইয়া দিলে তিনি অকাল-বোধনে জাগ্রত হন; তিনি সর্বমঙ্গলময় হইলেও ইহার ফলে সাময়িক অকল্যাণে বসুন্ধরা পীড়িত হয়।

আর একটি কথা। সেদিন বঙ্গীয় বিধান-সভায় ধীমান নলিনীরঞ্জন সরকারের মৃত্যুতে শোক-প্রস্তাবে বিরোধিতা করিয়াও স্টালিন-ভক্তেরা ভাল কাজ করেন নাই। নিজেদের অবাঞ্ছিত মানুষের বিয়োগেও যে ভদ্রভাবে শোকপ্রকাশ করা যায়, সারা পৃথিবীর ভদ্রসমাজ তাহা সম্প্রতি প্রমাণ করিল। আশা করি, ইহা হইতেও সেদিনকার উন্মার্গগামীরা শিক্ষা লাভ করিবেন।

—

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ বাংলা দেশে সর্বপ্রথম প্রশস্ত রাজপথের রাজনীতিতে প্রচণ্ড আত্মত্যাগ করিয়া সমগ্র ভারতের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেন; অবশ্য অলিগলি ও ঘুঁড়িপথে যে শহীদেরা আত্মদান করিয়া স্বদেশ ও দেশবাসীকে ধন্য করিয়াছেন, তাঁহারা সর্বকালে সর্বত্র সকলের নমস্য। চিত্তরঞ্জন শুধু দেশবন্ধু ছিলেন না, তিনি মহৎ ছিলেন—সুতরাং দেশপূজ্যও ছিলেন। মহতের স্মৃতিপূজা আমরা একরকম ভাবে করিতেছিলাম, দেশের নামে তাঁহারই উৎসর্গীকৃত পৈতৃক বাস্তুভিটার উপর আমরা "চিত্তরঞ্জন সেবাসদন" প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করিতে-ছিলাম। বাংলা দেশের আর একজন মহৎ ব্যক্তির তাহাই চিত্তরঞ্জনের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা-নিবেদন বলিয়া মনে হইতেছে না। আমাদের রাজ্য-পাল শ্রীহরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়ের কথা বলিতেছি। তিনিও স্বদেশ ও স্বসমাজের জন্য জীবনের অর্জিত অর্থ অকাতরে দান করিয়াছেন। সুতরাং তিনি এই দাবীর অধিকারী। দার্জিলিঙে যে-গৃহে চিত্তরঞ্জন দেহরক্ষা করিয়াছিলেন, সেটিকেও জাতির কল্যাণকর প্রতিষ্ঠানে পরিণত

করিতে তিনি বদ্ধপরিকর। বাঙালী মাত্রেরই তাঁহার এই চেষ্টায় সহায়তা করা একান্ত কর্তব্য। সাহায্য তিনি পাইতেছেনও। এই সংখ্যা 'শনিবারের চিঠি'র প্রথম প্রবন্ধে তিনি স্বয়ং স্মৃতিমন্দিরের প্রয়োজনীয়তা ও মধ্যবিত্ত সমাজের সাহায্যপ্রাপ্তির কথা নিবেদন করিয়াছেন। অদ্যকার (২০.৩.৫৩) সংবাদপত্রে দেখিলাম, ধনীরাও তাঁহার আবেদনে কর্ণপাত করিয়াছেন, কলিকাতা শহরের প্রায় কুড়িটি চিত্রগৃহে চিত্রপ্রদর্শন-মারফৎ অর্থ চলচ্চিত্র-শিল্পপতিরা তাঁহাকে দান করিতেছেন। আমরা আশা করি, উচ্চনীচ ধনীদরিদ্র সকলেই এ বিষয়ে অবহিত হইবেন এবং আগামী ২রা আষাঢ় তাঁহার মৃত্যুবার্ষিকীর পূর্বেই দার্জিলিঙে "স্টেপ-অ্যাসাইড"-ভবনে দেশবন্ধুর নামে একটা কিছু করা সম্ভব হইবে।

বাংলা দেশ এককালে পদাবলী-কীর্তনের জন্য বিখ্যাত ছিল, কীর্তন বাংলারই একান্ত নিজস্ব সম্পদ। সম্ভবত বাংলা-ভাষার আদিমতম যুগে রচিত চর্যাপদগুলিও বাঙালী-প্রবর্তিত সঙ্গীতের কোনও বিশেষ ঢঙে গীত হইত। তাহার পর গোপীচন্দ্রের গীত, ময়নামতীর গান, পাঁচালী, গম্ভীরা, খেমটা, খেউড়, বাউল, দেহতত্ত্ব, ভাটিয়ালি, টপ, মুর্শীদ্যা, গাজির গান, ভাদুগান, মায় যাত্রা কথকতা কবিগান দাঁড়াকবি পর্যন্ত বাঙালী-প্রতিভার নিজস্ব সৃষ্টি। বিভিন্ন স্থানের বিভিন্ন আখড়া হইতে আখড়াই গানের সৃষ্টি হয়, পরে হাফ-আখড়াই। তুক্কগীত, থিয়েটার-সঙ্গীত, বেশ্যাসঙ্গীত প্রভৃতিও ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা দেশে প্রাধান্য লাভ করে। দুঃখের বিষয় আজকাল বঙ্গ-সঙ্গীতের অনেক অঙ্গই মাত্র ইতিহাসের পৃষ্ঠারই অঙ্গ হইয়া আছে, আমরা আর চোখে দেখিতে বা কানে শুনিতে পাই না। যুগে যুগে মানুষের রুচির পরিবর্তন হইতেছে, আগেকার ভাল এখন আর ভাল লাগে না। পুরাতনের ভিত্তিতে নূতনকে গড়িয়া তুলিবার জন্য প্রতিভার প্রয়োজন। বাঙালীর প্রতিভা এখন অন্য খাতে কার্যকরী। সুতরাং বাংলার খেউড়-পাঁচালী মর মর হইয়া আসিয়াছিল। দেখিয়া প্রীত হইলাম, স্বাধীন

বাংলার নবনির্বাচিত বিধান-সভা ও বিধান-পরিষদে নূতন এক ধরনের খেউড়-গাহনার প্রবর্তন করিতে কয়েকজন প্রতিভাশালী ব্যক্তি উদ্যোগী হইয়াছেন এবং এক ধরনের রীতি খাড়াও করিয়াছেন, যাহাকে খাড়া-খেউড় নামে অভিহিত করা যাইতে পারে। শান্তিপুরের শ্রীহরিপদ চট্টোপাধ্যায় অনেকের সঙ্গে এই কাজে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন দেখিয়া আমরা খুশি হইয়াছি, কারণ ১৮৫৪ সনের ১৬ই আগস্টের 'সংবাদ-প্রভাকরে' সম্পাদক স্বয়ং ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের বর্ণনায় দেখিতেছি :

"সর্ব্বাগ্রে শান্তিপুরস্থ ভদ্র-সন্তানেরা আখড়াই গাহনার সৃষ্টি করেন, ইহা প্রায় ১৫০ দেড়শত বৎসরের ন্যূন নহে, কিন্তু তাঁহারা 'ভবানী বিষয়' গাহিতেন না, কেবল 'খেউড় ও প্রভাতী' গাহিতেন, সেই সকল গীতে 'ননদী ও দেওরা' এই শব্দ উল্লেখ থাকিত, এবং রচকেরা অতিশয় অশ্রাব্য কদর্য্য বাক্যে গীত সমুদয় রচনা করিতেন, তৎকালে তাহাতেই অত্যন্ত আমোদ হইত। তচ্ছ্রবণে শান্তিপুরের স্ত্রী-পুরুষ মাত্রেই অশেষ আনন্দ প্রকাশ করিতেন। এই মহাশয়েরদের সময়ে যন্ত্রের বিশেষ বাহুল্য এবং সুরের তাদৃশ পারিপাট্য ও আধিক্য ছিল না, সামান্য টপ্পার ন্যায় সুরে গান করিয়া তাহাকেই 'আখড়াই' নামে বিখ্যাত করিয়াছিলেন। শান্তিপুরের আখড়াই গাহনার দৃষ্টান্ত ক্রমে চুঁচুড়া ও কলিকাতাস্থ সংগীত বিদ্যোৎসাহীজনেরা সুর ও বাদ্যের বিশেষ সুশৃঙ্খলা করত অনেকাংশ পরিবর্তন করিয়া আখড়ায়ের আমোদে আমোদি হইলেন।...চুঁচুড়ার দলেরা বৎসরে দুই একবার কলিকাতায় আসিয়া যুদ্ধ করিতেন, ইহাঁরা হাঁড়ী কলসী প্রভৃতি ২২ খানা যন্ত্র বাজাইতেন, ইহাতে তাবতেই চুঁচুড়ার দলকে 'বাইশেরা' বলিতেন। ঐ সময়ে সখের আখড়াই লড়াই কলিকাতাস্থ বড়বাজার নিবাসী ৺কাশীনাথবাবুর ফুলবাগানেই হইত, অন্যত্র হইত না। তৎকালে কেবল আড়া তালে বাদ্য হইত, অপর তাল ব্যবহৃত ছিল না। ঐ সময়ের কিছু পরে পেসাদারদিগের যে কয়েকটা দল স্থাপিত হয়, তাহারদিগের সেই সকল দলের গীতযুদ্ধ এতন্নগরস্থ হালসীর বাগানে নিয়মিতরূপে সর্ব্বদাই

হইত। ধনি ও সৌখিন বাবুলোকেরা ইহারদিগের এক এক পক্ষ হইয়া অর্থ.দান প্রভৃতি নানা প্রকারেই সাহায্য করিতেন। উক্ত মহাশয়দিগের মধ্যে গোঁড়ামি সূত্রে পক্ষ প্রতিপক্ষে নিয়ত কথায় কথায় কতরূপ বিবাদ কলহ হইত।"

বিধানবাবুকে ধন্যবাদ। তাঁহার সভায় ও পরিষদে প্রধানত বামীদের চেষ্টায় বাংলার গুপ্ত-লুপ্তরত্নোদ্ধার আরম্ভ হইয়াছে। বামী বলিতেছি বামপন্থীদের, দক্ষিণপন্থী রামীরাও অবশ্য কম যান না—রামী অর্থে গান্ধীজীর রামরাজ্যের ধুয়া তুলিয়া যাঁহারা আরাম করিতেছেন তাঁহারা। একসঙ্গে পাঁচালী চপ কীর্তন খেমটা বাউল ভাটিয়ালি ভাদু গম্ভীরা আখড়াই প্রভৃতির বিচিত্র সংমিশ্রণে অধিবেশনের প্রত্যেক দিন উভয়ত্র খাড়া-খেউড়ের যা গাহনা চলিতেছে, তাহাতে বাংলা দেশের পুরাতন কবিসভা সঞ্জীবিত হইয়া পোয়ে-ছৌ-মণিপুরী-শান্তিনিকেতনী ঢঙে নাচিতে শুরু করিয়াছে। এই কানিভাল দেখিবার ও খেউড় শুনিবার জন্য বাঙালী দর্শকের মধ্যে হুড়াহুড়ি লাগিয়া গিয়াছে। শেষ খেউড় চলিয়াছে—ডাক্তারীমতে, চুঁচুড়া অঞ্চলেরই ডাক্তার রাধাকৃষ্ণ পালে ও ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ে। ইংরেজী এল্.-এর ব্যবহার-ভেদ লইয়া দুইজনে তুমুল মাউথ ফাইট হইয়াছে, রায় পালকে বলিয়াছেন—লাই কিনা মিথ্যাসম্রাট, পাল রায়কে বলিয়াছেন—লাভ কিনা প্রেম-সম্রাট। আমরাও শাস্ত্রমতে ভালবাসিয়া থাকি, সুতরাং আজীবন ব্রহ্মচারীর প্রতি এই মিথ্যা-আখ্যানিক্ষেপে ডাক্তার পালের আর একটি মিথ্যা ভাষণেরই পরিচয় পাইতেছি; ডক্টর রায়কে ডি. আই. এল. বলিলে আমরা কদাপি আপত্তি করিতাম না।

আর এক কথা, বিধান-সভায় বা বিধান-পরিষদে এতাবৎকাল হাঁড়ি কলসি প্রভৃতি বাইশ প্রকার যন্ত্রের ব্যবস্থা না থাকাতে আখড়াইয়ের অঙ্গহানি ঘটিতেছে। কাঠের টেবিল চেয়ার বেঞ্চি যত ভালই বাজুক, মাটির কাছে তাহার সব কেরামতিই মাটি। যে দেশের মাটিতে মৃদঙ্গ হয়, সে দেশের মাটিতে নির্মিত খানকয়েক থান অথবা আধলা-সিবি

ইট সভা-পরিষদ্‌কক্ষে সভ্যদের হাতের কাছাকাছি রাখিবার ব্যবস্থা হইলে তাঁহাদের সভ্যতা-প্রকাশের আরও সুবিধা দেওয়া হইবে।

—

কিছুকাল পূর্বে আমরা লিখিয়াছিলাম, আচার্য বিনোবা ভাবের চাণ্ডিলে অবস্থান বিশেষ উদ্দেশ্যমূলক হইতে পারে। মানভূম অঞ্চলের বঙ্গভাষাভাষী ব্যক্তিদের উপর ভাষার ভিত্তিতে সত্যই অত্যাচার হইতেছে কি না, তাহা স্বচক্ষে দেখাই বোধ হয় তাঁহার গূঢ় অভিপ্রায়। তিনি মহাত্মা গান্ধীর মন্ত্রশিষ্য, দৃঢ়চিত্ত সাধুপুরুষ, অন্যায় যেখানে হইতেছে সেখানে অন্যায়ের প্রতিবিধানই তাঁহার ধর্ম, বর্তমান রাজশক্তির প্ররোচনায় অন্যায়কে সমর্থন তিনি কখনই করিবেন না। তাই একটু অবাক হইয়াছিলাম যখন সেদিন রাজেন্দ্রপ্রসাদীয় সভায় উপস্থিত শতকরা ৮০ জন বাঙালী শ্রোতার কাছে বাংলা ভাষায় ভাষণ দিতে গিয়া অসভ্য ভাবে প্রতিহত হইয়াও তিনি তীব্র প্রতিবাদ তোলেন নাই। কিন্তু গত কল্যকার (১৯. ৩. ৫৩) সংবাদপত্রে বিহারের মানভূমবাসী বঙ্গভাষাভাষীদের সম্পর্কে তাঁহার সুচিন্তিত মতামত পাঠে আমাদের ক্ষোভ ঘুচিল এবং আমাদের পূর্বের অনুমান সত্য হইয়াছে দেখিয়া আনন্দও হইল। সংবাদপত্রে প্রকাশ, তাঁহার বিবৃতি তারযোগে প্রেরণে স্থানীয় ডাকঘর পর্যন্ত বাধার সৃষ্টি করিয়াছিল, অর্থাৎ বিহারে হিন্দী-সাম্রাজ্যের প্রকোপ কত দূর পর্যন্ত তাহার করাল দংষ্ট্রা বিস্তার করিয়াছে তাহা আমরা জানিতে পারিতেছি। সংবাদ এই, গত ১৮ই মার্চ আচার্য ভাবে পুরুলিয়ায় তাঁহার প্রার্থনা-সভায় বলেন, "মানভূমের কতকগুলি বিশেষ সমস্যা আছে, তন্মধ্যে ভাষা-সমস্যা একটি; মানভূমে জোর করিয়া হিন্দী ভাষা প্রচলনের কোন অর্থ হয় না। এইরূপ চেষ্টা বাস্তবিক নিন্দনীয়। বাংলা ভাষা অত্যন্ত সমৃদ্ধ; ইহার সহিত ভারতের অন্য কোন ভাষার তুলনা চলে না। এখানে জোর করিয়া হিন্দী চালাইলে হিন্দীরই ক্ষতি হইবে।" নিতান্ত পরিতাপের বিষয়, আমরা গত পাঁচ বৎসর লক্ষ্য করিতেছি, রাষ্ট্রভাষার রাষ্ট্রীয় অধিকার

পাইয়া যেখানে হিন্দীর বিনয়নম্র-ধীরতার সহিত ভারতের অহিন্দী-অধ্যুষিত অঞ্চলে প্রবেশ করিবার কথা, সেখানে ভোজপুরী মনোবৃত্তি নিদারুণভাবে প্রকট হইয়া উঠিতেছে এবং অকারণ দম্ভের স্ফীতি হিন্দীর গাত্রচর্মের প্রসারণসীমাও অতিক্রম করিতে বসিয়াছে। এই কারণেই, যেখানে বিরোধিতা নাই, সেখানেও বিরোধিতা জাগিতেছে। অন্য প্রদেশের কথা জানি না, বাংলা দেশে এবং বাংলার বাহিরে বাঙালীরা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া হিন্দী ভাষা ও সাহিত্যের উৎকর্ষসাধনে দীর্ঘকাল আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, এখনও কলিকাতা শহরে পশ্চিমবঙ্গের রাষ্ট্রভাষা-প্রচার-সমিতি হিন্দীকে বাঙালী জনসাধারণের সহজ আয়ত্তের বিষয় করিবার জন্য চেষ্টিত। ইঁহারা ভালবাসিয়া এই কার্য করিতেছেন, কিন্তু অন্য পক্ষের দম্ভ সেই ভালবাসার মূলে কুঠারাঘাত করিতেছে; এই প্রতিষ্ঠানের স্থায়ী সভাপতি সুনীতিকুমারও প্রকাশ্য সভায় হিন্দী-সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তীব্র ভাষায় প্রতিবাদ জানাইতে বাধ্য হইয়াছেন। এখন আচার্য ভাবের ধীর সুচিন্তিত উক্তি যদি বিহার-সরকারের চৈতন্য সম্পাদন করিয়া মানভূমের বঙ্গভাষাভাষীদের এই সাম্রাজ্যবাদ হইতে মুক্তি ও আরাম দিতে পারে, তবে তাঁহার এই কষ্টকৃত সফর সার্থক হইবে। নতুবা অদূরভবিষ্যতে সংঘর্ষ অনিবার্য।

* * * *

শ্রীহরেকৃষ্ণ মহাতাব মহাশয় গত ১৬ই মার্চ সোমবার বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে অনুষ্ঠিত সভায় "ওড়িয়া ভাষা ও সাহিত্য" বিষয়ক বক্তৃতা-প্রসঙ্গে একটি গুরুতর তথ্য উদ্‌ঘাটন করিয়াছেন। তিনি দায়িত্বশীল ব্যক্তি। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী-পরিষদের ভূতপূর্ব সদস্য ও উড়িষ্যার ভূতপূর্ব প্রধান মন্ত্রী হিসাবে স্বাধীনতা-পরবর্তী ভারতের বহু সমস্যার সম্মুখীন তাঁহাকে হাতে-কলমে হইতে হইয়াছে, সুতরাং তাঁহার উক্তি অভিজ্ঞের উক্তি। তিনি বলিয়াছেন, স্বাধীনতা-অর্জনের পর ভারতের সংস্কৃতির ক্ষেত্রে প্রাদেশিক সঙ্কীর্ণতা দিনে দিনে বাড়িয়া চলিয়াছে, ইংরেজ আমলে যে সকল বিরোধ ধামাচাপা ছিল, তাহা আবার প্রবল

আকার ধারণ করিতেছে। এই সকল বিরোধ প্রধানত ধর্মগত, সম্প্রদায়গত ও ভাষাগত। স্বাধীন ভারতের শাসনতন্ত্র যাঁহারা পরিচালনা করিতেছেন, তাঁহাদিগকে এবং ভারতের যাবতীয় শিক্ষিত মানুষকে এখনই এ বিষয়ে সজাগ ও সচেতন হইতে হইবে ; জাতি-ধর্ম প্রদেশ বা সম্প্রদায় যেন কোন ব্যাপারেই আমাদের দাঁড়াইবার ভিত্তি না হয় ; সর্ব-ভারতীয় ভিত্তির উপর আমরা যেন সর্বদা সকল বিষয়ে দাঁড়াইতে পারি। ভাষা বিষয়ে সঙ্কীর্ণ মনোবৃত্তি সর্বথা পরিত্যাজ্য, কারণ ভাষা মানুষে মানুষে মিলনের বাহন মাত্র, বিরোধের কারণ নয়। সাহিত্যিক সমাজের উপর তিনি সর্বাধিক দায়িত্ব চাপাইয়াছেন, কারণ তাঁহারাই অল্প আয়াসে না-কে হাঁ এবং হাঁ-কে না করিতে পারেন। দেশে দেশে প্রদেশে প্রদেশে পরস্পর আদান-প্রদানের তাঁহারাই বহতা নদী, সংস্কারের শৈবালদাম হইতে তাঁহাদিগকে সর্বদাই মুক্ত থাকিতে হইবে।

বাংলা দেশের কয়েকটি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে অনাচারের অভিযোগ লোকপরম্পরায় প্রবল হইয়া উঠিতেছে, দুই-একটি প্রতিষ্ঠানের কর্তাদের বিরুদ্ধে বিধান-সভাতেও আলোচনা হইয়াছে। শাস্ত্রের মত এই যে, সমাজকে সুস্থ সবল ও সজীব রাখিতে হইলে সর্বপ্রথম ইহার নারীদের সতীত্ব ও শালীনতা রক্ষা প্রয়োজন, তৎপরই প্রয়োজন শিক্ষকদের নৈতিক ও চারিত্রিক বল বজায় রাখা। গৃহস্থের গৃহে যেমন ভ্রষ্টা নারী চলে না, জাতির শিক্ষালয়ে তেমনই ভ্রষ্ট শিক্ষক অচল। আমাদের শিক্ষামন্ত্রী পান্নালাল বসু মহাশয় সাধু-সজ্জন ব্যক্তি, তিনি সমাজের কল্যাণের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া চোখ ও কান একটু খুলিয়া রাখিলে অন্তত তাঁহার বিভাগকে কলঙ্কমুক্ত করিয়া জাতির ভবিষ্যৎসন্তানদের সম্মুখে মহৎ আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবেন। আমাদের কাছে যখন খবর আসে, তখন নিশ্চয়ই তাঁহার কাছেও যায় ; সরাসরি যাহা তাঁহার আয়ত্তে, তাহা ছাড়া ভারত-সরকারের অধীন যে সকল প্রতিষ্ঠান সেগুলি সম্বন্ধেও তাঁহার দায়িত্ব

আছে। তথাকথিত জালকে খাঁটির মর্যাদা দিয়া যিনি নিজে খ্যাত্যাপন্ন হইয়াছেন, অন্যায়কে ন্যায়ের মর্যাদা তিনি কখনই দিবেন না।

জলপাইগুড়িতে আবার পঁয়ত্রিশ ইঞ্চি মাপের পা দেখা দিয়াছে; বহুকাল পূর্বে ওই একই স্থানে আবিষ্কৃত পদচিহ্ন লইয়া আমরা বহু গবেষণা করিয়াছিলাম, কিন্তু এবারে গবেষণার অবকাশ নাই। ইহা যে-পাপ ভারতের উত্তরাঞ্চল ভেদ করিয়া শনৈঃ শনৈঃ ভারতের দিকে আসিতেছে তাহার প্রথমার্ধ—পাপেরই পায়ের ছাপ; সম্মিলিত জড়শক্তির প্রাবল্যে এই পাপ বিপুল দৈত্যাকার, সুতরাং ইহার পায়ের মাপ অস্বাভাবিক হইবারই কথা। মহাচীন পার হইয়া ঘুমন্ত তিব্বতের উপর দিয়া পা জলপাইগুড়িতে আসিয়া পৌঁছিল, এখন ভারতবর্ষের গীতগোবিন্দের পালা—দেহিপদপল্লবমুদারং।

হিরোশিমো নাগাসাকিতে যখন আণবিক বোমা পতিত হয় তখনই আমরা আশঙ্কা করিয়াছিলাম, ঘরে-বাইরে বিভ্রাট ঘটিল বলিয়া। বাহিরে বিভ্রাট সেই দিন হইতেই চলিতেছে, ঝড় ঝঞ্ঝা মহামারী টাইফুন দুর্ভিক্ষ শীতাতপ-বিপর্যয়। সম্প্রতি ঘরে যে বিভ্রাট আরম্ভ হইয়াছে, তাহা মারাত্মক। রাত্রে নির্ভরনিদ্রাসুখপ্রবৃত্তি অন্তে স্ত্রী দেখিতেছেন, স্বামী আর স্বামী নাই, তাঁহাকে 'সখী' সম্বোধন করিতেছেন। স্বামী দেখিতেছেন, গৃহিণী কাঁধে থাবড়া মারিয়া 'কম্‌রেড' সম্বোধনে হো-হো অট্টহাসি জুড়িয়া দিয়াছেন। ইলাবৃতবর্ষে ইহাতে আমাদের ঘাবড়াইবার কথা নয়, কিন্তু বড় ঘন ঘন রদবদল হইতেছে। 'অমৃতবাজার'-'যুগান্তরে' এক শ্রীমানের শ্রীমতীত্ব কাহিনী শেষ হইতে না হইতেই আজ (২০.৩.৫৩) দেখি, জাপানে বিপরীত কাহিনী। যেরূপ ব্যাপার দেখিতেছি, সঙ্গে রীতিমত সাজসরঞ্জাম না লইয়া অতঃপর পথে বাহির হওয়াই কঠিন হইবে। তোবা, তোবা!

শনিরঞ্জন প্রেস, ৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, বেলগাছিয়া, কলিকাতা-৩৭ হইতে
শ্রীসজনীকান্ত দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ফোন: বড়বাজার ৬৫২০

শনিবারের চিঠি

কার্তিক ১৩৫৯—চৈত্র ১৩৫৯

ষাণ্মাসিক সূচী

সম্পাদক

শ্রীসজনীকান্ত দাস

গ্রাহকগণের প্রতি নিবেদন

এই চৈত্র সংখ্যায় যাঁহাদের চাঁদা শেষ হইতেছে, তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া বৈশাখ সংখ্যা বাহির হইবার পূর্বে ২৫এ চৈত্রে (৮ই এপ্রিল) মধ্যে মনি-অর্ডার যোগে চাঁদা পাঠাইয়া দিয়া আমাদের কার্যের সহায়তা করিলে বাধিত হইব। ওই তারিখের মধ্যে টাকা না পাইলে ভি. পি. করিয়া পরবর্তী সংখ্যা পাঠানো হইবে। যাঁহাদের আর গ্রাহক থাকিবার ইচ্ছা নাই, তাঁহারাও অনুগ্রহপূর্বক পত্র দ্বারা জানাইবেন নচেৎ ভি. পি. ফেরত আসিলে আমাদের অনর্থক ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে।